সুন্দরবন সমগ্র

শিবশঙ্কর মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলকাতা ৯

সূচীপত্র

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিকে ভূমিকা লেখার অনুরোধ করা মাত্র উৎসাহিত হয়ে বলেন, জীবনে তো অনেক কবিতাই লিখেছি কিন্তু তার মধ্যে একটি মাত্র কবিতা আমার আজও আদ্যোপান্ত মুখস্থ আছে এবং সেটি সুন্দরবনকে নিয়েই। বলেই তিনি তাঁর অপরূপ আবেগ নিয়ে আবৃত্তি করে শোনান। 'সুন্দরবন সমগ্র'-এর ভূমিকায় দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে তখনই স্বহস্তে গোটা কবিতাখানি লিখে স্বাক্ষর করে দেন। সেদিন ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬০।

—গ্রন্থকার

ভৌগোলিক

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হিমালয় নামমাত্র
আমাদের সমুদ্র কোথায় ?
টিম টিম করে শুধু
খেলো দুটো বন্দরের বাতি,
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা,
তাম্রলিপি সকরুণ স্মৃতি।

দিগন্ত বিস্তৃত স্বপ্ন
আছে বটে সমতল সবুজ ক্ষেতে।
কত উগ্র নদী সেই
স্বপনেতে গেল মজে হেজে ;
একা পদ্মা মরে মাথা কুটে।
উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর
মাঠ ভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া তরণীর
তারে কভু তুষ্ট করা যায় !
ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতন শহর
যত পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো,
তারাদের পানে,
তবু জেনো আরো এক মৃত্যুদীপ্ত মানে
ছিল এই ভূখণ্ডের
ছিল এই সাগরের পাহাড়ের
দেবতার মনে।

সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে, তাই
আমাদের সীমা হ'ল
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে তরাই।

রচনার সালতামামী

বেদে বাউলে
বনবিবি
সুন্দরবনে আর্জান সর্দার
সুন্দরবন
রয়্যালবেঙ্গলের আত্মকথা
গল্পগুচ্ছ :
সুন্দরবনের ছাটাবাড়ি লাঠি
সুন্দরবেনর সততা
আইরাজ
বনের চোরের উপর শহরের বাটপাড়ি
বীরাঙ্গনা, না সুন্দরবনের মা
বিশু বাউলে
দুর্গ্যোসদ্দার
বাঘের দেখা
সুন্দরবনের হঠকারিতা
এক যে ছিল সুন্দরবন

সুন্দরবনে জটার দেউল। মাওলা নদীর কূলে মথুরাপুরের নিকটে (১১৬ নং লাট) এই কীর্তি প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এ অঞ্চলে কোন বন নেই। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্রের অনুমান, এটি রাজা প্রতাপাদিত্যের এক বিজয় স্মৃতি স্তম্ভ। হয়ত পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কোনও যুদ্ধে। তবে এটি অনুমান মাত্র।

মুখবন্ধ

সুন্দরবন। নামটি লোকে সাধে দেয়নি। ভারি সুন্দর দেখতে এই বন। পাহাড়ী বনের মত বড় বড় গাছ না থাকলে কি হবে, ছোট ছোট গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। দেখলে মনে হয়, কেউ বুঝি তার এই বিশাল বাগান সাজিয়ে রেখেছে। ঝোপঝাড় বিশেষ নেই বললেই হয়। তবে মাথার উপর ঘন পাতার ছাতা গোটা বনকে ছায়ার আবরণে ঢেকে রেখেছে। দিনের বেলায় বনতলে আলো-ছায়ার খেলা, রাতে ঘুটঘুটে আঁধারে ভীষণ জীব-জানোয়ারের আনাগোনা। সাঁঝের বেলায় এক পা-ও এগুতে কারও সাহস হবে না এই বনে।

তাহলেও সুন্দরবন শুধু গাছের সারিতে সুন্দর নয়। অগুণতি নদ ও নদী যেন জালের মত ঘিরে রেখেছে এই বনকে। বড় বড় নদীও বুঝি গুণে শেষ করা যায় না। বড় নদী থেকে খালে পড়া যাবে। কত যে খাল, তার অবধি নেই। তারপর খাল থেকে বেরিয়ে গেছে বনের ভিতরে ভিতরে শতশত পাশ-খাল। পাশ-খাল ধরে বনের গহনে ডিঙ্গি বেয়ে যে-কোন এলাকায় হাজির হতে এতটুকুও বেগ পেতে হবে না। এখানেই শেষ নয়; তারপরও আছে পাশ-খাল থেকে খাড়ি। খাড়িতে ডিঙ্গি না চললেও, জোয়ার-ভাটায় জলের আসা-যাওয়া লেগেই আছে নিয়ত। এত নদী-নালা যে, সবকিছু মিলে সুন্দরবনের তিন ভাগের মাঝে এক ভাগেরও বেশি জল।

সতেজ সবুজ গাছের সাজান সারি আর নদ-নদীর তর্‌তর্‌ করে চলমান জলধারা—এই দুইয়ে মিলে করে তুলেছে এই বনকে সুন্দরবন। শুধু সুন্দর নয়। এই জল তো আটক করা বাঁধা জল নয়। বেগবতী জল[illegible]রা; জোয়ার-ভাটার টানে দিনে দুবার ছুটে যায় সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে, আবার দুবার ছুটে আসে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবার মত। তাই পাহাড়ী বনের মত এই বন গমগম্‌ করে না, জীবনের সাড়া জাগিয়ে যেন তর্‌তর্‌ করে। জীবনে ভরপূর এই বন। জীয়নকাঠির মত যেন মানুষকে জাগিয়ে তোলে। এব ধারে কাছে গেলে কারও থির থাকবার উপায় নেই। বন যেন ডাকতে থাকে তার গহনে ছুটে যাবার ইসারায়। মোহ জাগে বনচারীর মনে। তাই সুন্দরবন এতো সুন্দর।

বিশাল এই বনানী। বাঙলার সাগরের কূল বরাবর পূবে ও পশ্চিমে ১৫০ মাইল। উত্তর ও দক্ষিণে কোথাও বেশি, কোথাও কম, গড়ে ৫০ মাইল। গোটা সুন্দরবনের তিন ভাগের এক ভাগ পশ্চিম বাঙলায়, বাকিটা পূবের ব[illegible]য়। ২৪ পরগণার আবাদ এলাকার সাগরকূল বরাবর ১৬৩০ বর্গ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে পশ্চিম বাঙলার অংশ। এই অংশের পূবের সীমানা রায়মঙ্গল নদী, আর পশ্চিমের সীমানা বলা যায় সাগরসংগমের পীঠভূমি অবধি।

ভাগীরথীর মিঠে জল আর সাগরের লোনা জল এখানে জো-ভাটার টানা পোড়েনে মেলামেশা করে। তাই গাছ-গাছড়াও এক বিশেষ ধরনের। সে সব গাছ মিঠে জলের দেশে হয় না। কতো নতুন নতুন গাছ। তাদের নামেরও কি বাহার!—সুন্দরী, গর্জন, গরাণ, বাইন, পশুর, সিংগুর, গামুর, গোল, গেঁয়ো, কেওড়া, কাঁকড়া, ওড়া, হেঁতাল, তবলা, হোদো,—গাছেরও যেন শেষ নেই, নামেরও যেন শেষ নেই।

এতো গাছ, তা' বলে শুধু বনের আগাছা নয়। এদের গুণের পরিসীমা নেই। সুন্দরীর ডগ্‌ডগে গাঢ় লাল রঙের কাঠ না হলে লোনা জলের নৌকো বানাতে কারিগরদের মন চায় না। লোনাজাত কাঠই লোনা জলের দাপটির সঙ্গে লড়ে টিকে থাকে বহুদিন। চামড়া রঙ করবার কাজে গরাণের ছাল অতুলনীয়। বাঙলার বিশেষ বাজনা ঢোলক ও তবলার খোল তৈরিতে গেঁয়ো কাঠ না হলেই নয়। বাঙলার মাটির পুতুলের রঙ চক্‌চক করতে গর্জনের তেল চাই। 'হেঁতালের নড়ি'র কথা তো আমাদের সব পুরনো কাহিনীতে ছড়িয়ে আছে। ভাটিদেশের মানুষের ঘর ছাউনির কাজে বোধহয় গোলপাতা 'সবে ধন নীলমণি'। এ ছাড়া সাধারণ কাজের উপযোগী কাঠ এই সব গাছ থেকে তো মেলেই।

সুন্দরবনে ফুলের ও ফলের বাহার না থাকলেও একটা জিনিসের কদর অশেষ। মধু ও মোম। কমলালেবুর ফুলের মধুর মত সুবাস না থাকলেও গরাণ ফুলের মধুর আদরও কম নয়। সুন্দরবন সময়কালে মধু যেন ঢেলে দেয়। চিরকাল মানুষের লোভ মধুকে ঘিরে। আর এই মধু আহরণ করতে গিয়ে আবাদের কত সাহসী মানুষ যে বাঘের হাতে জীবন দেয়, তার খতিয়ান দেখলে অবাক হতে হবে। এক-এক সময়ে একটা বাঘে এক মাসে ৭/৮ জন মানুষকে খেয়ে ফেলবার নজির আছে। তবু মানুষ পিছপাও হয় না। মধু যে এখানে অপরিমেয়।

অপরিমেয় সুন্দরবনের মাছের ঝাঁকও। এতো মাছ যে গোটা বাঙলা দেশের মানুষের মাছের আশ অতি সহজেই মেটাতে পারে। শুধু আশ নয়, বাঙালীর রসনার বাসনাও মেটাতে পারে। লোনা নদীর মাছের সোযাদই আলাদা। ছোট ছোট খালে জাল ফেললে, তাকে মাছের ভারে টেনে তোলাই দায়। এই মাছ ধরে দূর দূর দেশে চালান দেবার আয়োজন নেই বলে মেছো বাঙালী আজও মাছের কাঙালী হয়ে ঘোরে। বাঙালীর অতি পরিচিত সব মাছ তো আছেই ; তা ছাড়া আছে এক মণ দুই মণ ওজনের কইভোল। এতো মাছের ছড়াছড়ি যে সুন্দরবনের বাঘেও মাছ খায়।

বলতে গেলে সুন্দরবন বাঙলাদেশের এক বিশেষ ধনাগার। সেই ধনকে আহরণ করবার সঠিক আয়োজন করতে পারলে অঢেল আয়ের পথ খুলে যাবে বাঙলাদেশে। কত রকমের যে কাঠ আছে, আর কত রকম ভাবে যে তা মানুষের কাজে আসতে পারে, তার হিসাব নিকাশ আজও হয়নি। মধু ও মোম অধুনা যা আহরণ করা হয় তা তো খুবই সীমিত পরিমাণে। তাও বনের উপকূলবাসীরা পেটের তাড়নায় জীবন হাতে করে বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে আহরণ করে। খালি হাতেই তাদের লড়তে হয় বাঘের সঙ্গে। আর মাছের কথা তো বলবার নয়। সেই আদিকালের রীতি অনুসরণ করে আবাদী মানুষেরা কোনমতে হাতে বোনা জালে কিছু মাছ ধরে। অঢেল মাছ অঢেলভাবে ডিঙ্গি বোঝাই করে তো লাভ নেই। আজও তো সে মাছ দূরদেশে আনবার তোড়জোড় নেই।

এ তো গেল সুন্দরবনের আয়করীর দিক। সবাই জানে বাঙালীরা জীবন-মরণকে আমলে না এনে বীরের মত লড়ে। এই বীরের মন কেমন করে বাঙালীরা পায়, তার হদিস মিলবে সুন্দরবনের জীবের কাছে। ভীষণাকার, অতুলনীয় সাহসী আর অভাবনীয় সামর্থ্যের অধিকারী এই গহন বনের 'রাজকীয় বাঙালী বাঘ'। সে যখন দু বাহুর উপর ভর করে বীরদর্পে রোষকষায়িত চাহনী হানতে থাকে—তার সামনে এমন কোনও জীব নেই যে অবশ না হয়ে পড়ে। কি সুন্দরই না দেখতে এই বাঘ—হলুদ রঙ আর আঁকাবাঁকা কালো রেখায় দেহের সবল কাঠামোতে যেন আরও সবলতা মূর্ত হয়ে ওঠে। পলিমাটি আর সবুজ ঝোপের সামনে ঝক্‌ঝক করে ওঠে।

অসীম বলশালী বাঘের পাশে আর এক সুন্দরতম জীব সারা সুন্দরবনের চাতালে দলে দলে ঘুরে বেড়ায়। হরিণের পাল। তার কমনীয়তা তার নমনীয়তা, তার নিরীহ চাহনীর কথা কেই বা না জানে। সবচেয়ে অবাক লাগে—সে যে সুন্দর সে বিষয়ে সে সজাগ। সুন্দরবনের এতো কাদা আর কাদামাটি ভরা লোনা জলে থেকেও তার দেহকে এতটুকুও বিবর্ণ হতে দেয় না। যেন পরীর মত ঝক্‌ঝকে হয়ে চপল চরণে ঘুরে বেড়ায় সারা বনে।

তা ছাড়া আছে শুয়োর, কুমীর ও সাপ। রঙ বেরঙের অগুণতি বিষধর সাপ। সুন্দরবনে সাপকুলের মাঝে কয়েক রকম আইরাজ সাপই ভয়াবহ বিষধর। চেহারার হেরফেরে এদের নানা নাম আছে—পাতরাজ, দুধরাজ, মণিরাজ, ধনীরাজ, ভীমরাজ। বিশালকায় সাপের মাঝে আছে অজগর জাতীয় ময়াল সাপ। এতবড় যে গোটা একটা ছোট হরিণ গিলে ফেলে।

সুন্দরবন যেমন ধনের আগার, তেমনি সেই আগারকে আগল দেবার কাজে রয়েছে—জীবের রাজা দুর্জয় তেজী বাঘ, সর্পিল গতিতে বিষ-বাণ হানবার বিষধর জীব, আচমকা আঘাতে ঘায়েল করতে কুমীর ও কামোটের মত ঘাতক। তবু দুঃসাহসী বাঙালীরা সে যকের ধন লুঠে নিতে পিছপাও হয় না।

হয় না বটে, তবুও একটা বিষয় সজাগ না থাকলে ভুল হবে। এই আয়ত কানন শুধু ধন ও জীবের লালন করে না। লালন করে গোটা বাঙলাদেশকে। একদিকে, বেলাভূমির পাশে দাঁড়িয়ে এই কানন গাঢ় সবুজের সমারোহে টেনে আনে সাগরের বুক থেকে মেঘমালাকে। টেনে আনে বাঙলার ফসলের জলের তিয়াস মেটাতে। তেমনি আরেক দিকে, এই বন শতপথে শিকড়ের জাল পেতে দিয়ে নদী-ধারায় আগত পলিমাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে নতুন ভূমিগঠনের কাজে। বাঙলাদেশের নদীর হিমালয়ধৌত গৈরিক ও পলিমাটির ধারা অতুলনীয়। অতুলনীয় তার ভূমিগঠন সামর্থ্য। এই ভূমিগঠনের আয়োজন অবিরাম চলেছে বাঙলার তটভূমিতে, আর সুন্দরবন সেই আয়োজনকে পরিপূরণ করে যেন অতি মমতাভরে শিকড়ের শত হাত মেলে পলিরাশিকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে।

সর্বোপরি সুন্দরবনের উপকূলবাসীরা। এরা কিন্তু খোদ অরণ্যে বাস করে না। তা না করলেও এরা জীবিকার তাগিদে আর মনের তাড়নায় অবাধ বনচারী। সুন্দরবনের সীমানা বরাবর টানা নদী ও খালের এপারে ধু-ধু করা আবাদ অঞ্চলের কোলে-কোলে এদের বাস। এদের সাহসিকতা ও লড়াকু মনোভাবের তুলনা নেই। যেমন ব্যাঘ্রসম তেজোময়, তেমনি এরা একে অন্যের প্রতি ভালবাসায় ভরপুর। বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে, বাদা-আবাদের ঝঞ্ঝা-ঝাপটে, আনন্দ ও উৎসবে এরা যেন পরস্পরে জড়িয়ে থাকে। বাংলারই সমাজ। তবু অভিনব এক চরিত্র নিয়ে এই সমাজ গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের ছত্রছায়ায়। ছত্রছায়া কেন, সুন্দরবনের শৌর্য, বীর্য, সৌন্দর্য ও মাধুর্য—সবই প্রতিফলিত হয়ে আছে এদের জীবনে।

এই প্রাকৃতিক পীঠস্থানের দর্শনপ্রার্থীরা সুন্দরবনের বন ও বনানী, নদ ও নদী, বন্য ও জলজ প্রাণীদের—এক কথায় নিসর্গ-সৌন্দর্য দেখতে আসেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সুন্দরবনের মানুষ ও সমাজকে না দেখলে অঙ্গহানি হবে। এরা যে সুন্দরবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুন্দরবনের মানুষেরা কেমন করে যে নবাগতকে ভালবাসার আকর্ষণে আপনার করে নেয়, তা বোঝাই দায়। প্রাকৃতিক লালনে এদের বলিষ্ঠ হৃদয়ের আকর্ষণ যেন চুম্বক-আকর্ষণ!

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে রচিত কাহিনী ও ছোটগল্পের মাধ্যমে সুন্দরবনের সবকিছুর এক সামগ্রিক ছবি তুলে ধরবাব প্রচেষ্টায় 'সুন্দরবন সমগ্র'-এর এই আয়োজন।

আর এই আয়োজনে যে-সব ঘটনা ও ছবি তুলে ধরা হয়েছে, তার একটিও অবাস্তব বা

অলীক নয়। ঘটনাগুলি যেমন সত্য, তেমনি প্রধান চরিত্রগুলিও সত্য ; তাদের নামগুলিও হারাতে চায়নি, অবিকল আছে। এই চরিত্রগুলির অনেকে হয়ত ইহলোকে আর নেই, আবার অনেকেই আজও জীবিত। এরা সবাই এক দুর্ধর্ষ বনের সম্মুখে বাঙালীর বীরত্ব ও মহত্ত্বের প্রতিভূ।

গ্রন্থকার

বেদে বাউলে

এই রোমাঞ্চময় কাহিনী, এই বেদনায় আসিক্ত ও আনন্দে আপ্লুত কাহিনী কেমন করে কথা-সাহিত্যে তুলে ধরলাম—এই প্রশ্ন অনেক বন্ধুবান্ধব আমার কাছে করেছেন। তার উত্তর একটাই আছে : এই গাঁথার নায়ক, নায়িকা ও প্রতিটি পার্শ্বচরিত্রই আমার কাছে যেন জীবন্ত। আমি এদের সঙ্গে মিশেছি একান্ত আপনজন হিসেবে, ভালবাসায় একাত্মা হয়ে গেছি যেন। এদের বেদনার কাহিনী যা লিখেছি তা পুনরায় যখনই আমি নিজে পড়তে গেছি, আমার চোখে অশ্রুধারা নেমে আসে ! তেমনি বিপদের মুখে এদের বীরদর্পমণ্ডিত পদক্ষেপগুলির কথা পড়তে গেলে পুনরায় তার ধ্বনি আমার কানে আসে—আমার মেরুদণ্ড খাড়া হয়ে ওঠে। এমনই একাত্মা হয়েছি এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির সঙ্গে। তবুও মনে হয়, এদের মনের তরঙ্গগুলি আর এই কাহিনীর পটভূমি সুন্দরবনের অব্যক্ত ইশারাগুলি পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে অপারগ হয়েছি আমার লেখনীর অক্ষমতার জন্য।

আমার একাত্মবোধটা হঠাৎ একদিনে আসেনি। এসেছে সুন্দরবন ও ততোধিক সুন্দর উপকূলবাসী মানুষগুলির সঙ্গে সুদীর্ঘকালের যোগাযোগের ফলে। সেই ১৯২৮ সাল থেকে যখন আমি সবে যৌবনে পদার্পণ করি। প্রথমেই বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিক। মনে কামনা ছিলো স্বাধীনতা সংগ্রামী সশস্ত্র এক সৈন্যদলের পরিচালনায় সুন্দরবনের পটভূমিকে কাজে লাগাতে হবে। পিতৃদেবের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' ও তাঁর মুখ থেকে শোনা সুন্দরবনের গল্পগুলি এই ব্যাপারে আমাকে কম প্রেরণা দেয়নি। তখন থেকেই সুন্দরবনের নদী-নালার রেখাচিত্র ও মানুষের ইতিবৃত্ত নিয়ে যেমন মেতে উঠি, তেমনি এই বনে ও এই অঞ্চলে আসা-যাওয়া শুরু করি। বৈপ্লবিক সংগ্রাম আমলে পলাতক জীবনে এই অঞ্চলের নদী-নালা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাই। তারপর দীর্ঘ আট বছর জেলে বন্দীদশায় কাটে। তখনও আমার পড়াশুনা চলে সুন্দরবন সম্পর্কে বইপত্র যা কিছু যোগাড় করতে পারি।

কারাবাসের প্রথমেই পিতৃদেবের তিরোধান হয়। মৃত্যুর আগে সংসারের অন্ন সংস্থানের জন্য খাস সুন্দরবনবেষ্টিত এক খণ্ড জমি সংগ্রহ করেন। দীর্ঘ কারাবাসের পর এই জমিখণ্ড পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব যেমন আসে, তেমনি আমার জীবনে এক মহাসুযোগ আসে সুন্দরবনের চাষীদের সংস্রবে আসা এবং তাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে একত্র বসবাস করার। এই সম্পর্ক নিবিড়তর হয় তাদের সঙ্গে একত্রে তে-ভাগা আন্দোলনে মেতে ওঠাতে।

তারপর থেকে আজ অবধি এপার-ওপার সুন্দরবনের উপকূলবাসী অতুলনীয় মানুষদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোনও দিন ছিন্ন হয়নি।

ছিন্ন হবে কি করে ! অপূর্ব সুন্দরবনের যেমন যে-কোনও মানুষকে মোহগ্রস্ত করার মোহিনী শক্তি আছে, তেমনি ততোধিক অপূর্ব এই মানুষদের যে-কোনও ব্যক্তিকে কাছে টেনে একান্ত আপনার করে নেবার, একাত্মা করে নেবার এক অসাধারণ চুম্বক-সম আকর্ষণ আছে। কেননা, এমন সরল, এমন দুর্ধর্ষ, এমন সবল ও তেজময় মানুষগোষ্ঠী মেলা দায়। ফলে আমি যেমন বনের মোহিনী শক্তিতে আবিষ্ট হই, তেমনি এইসব মানুষের আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট হই একান্তভাবে একাত্মা হয়ে।

গভীর অরণ্যে ঘুমপাড়ানি গুলিতে আহত সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল

উঠতি-বয়সের রক্ত বিলাসবাবুর গায়েও। সঙ্গী পেয়ে ঝট করে বলে,—তা কার না ইচ্ছে করে, বলো? কিন্তু বাপে কি ছাড়বে!

—তুমি তো আচ্ছা, বাপে জানবে কোত্থেকে? সুন্দরবন তো এক গোনের পথ, ভাটিতে যাবো আর জো-তে ফিরে আসবো। সকালে যাবো, বিকেলে ফিরে আসবো। ধরা পড়লে, সটান বলতে বাধা কী—দোকানের বাকি-বকেয়া আদায় করতেই তো গিয়েছিলাম!

এমনি করেই একদিন শুরু হয় ওদের সুন্দরবন অভিযান। সুন্দরবনের সংস্পর্শে এসে বিলাসবাবুর কী হয়েছিল বলতে পারবো না। তবে, অনিল যেন একদম মজে যায়। সুন্দরবনের সঙ্গে বেশিদিন দেখা না হলে যেন ওর মন উশখুশ করতে থাকে।

প্রথম যেদিন যায় সেদিন সঙ্গে বন্দুক ছিল বটে, কিন্তু শিকারের কথা মোটেই ভাবতে যায় নি। ভয় ছিল দুটো—প্রথমত, বাঘের, আর দ্বিতীয়ত, বনকর পেট্রলবোটের। এই দুইয়ের খপ্পরে যাতে ওদের না পড়তে হয়। অঘোষিত ভাবে সুন্দরবন তো বাঘের রাজ্য; আর বন মানে তো শুধু বন আর বাঘ নয়, বন এক মহাসম্পদ, আর সে সম্পদের ঘোষিত রাজা হলেন বনকর অপিস। দুই-ই দুভাবে বনের রক্ষক। বনের আওতায় এলে কখন যে এরা আচমকা ছোবল মারবে, তার হদিস পাওয়া দায়।

বনের সীমানা বরাবর বড় নদী থেকে একটি খাল বনের মধ্যে সর্পিল গতিতে প্রবেশ করেছে। খালটি খুব বড়ও না, আবার খুব ছোটও না। ভাটি শেষ আর জো আগন্তুক; জলের গতি থমকে আছে। অনিল ডিঙির মুখ খালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ডিঙিতে ওরা মাত্র দুজন—পেছনের গলুইতে অনিল বোঠে হাতে, আর সামনের গলুইতে বিলাসবাবু বন্দুক হাতে। ধারে-কাছে চোখের দৃষ্টির মধ্যে যেমন কোনও জীবন্ত জীব নেই, তেমনি কোনও তৃতীয় মানুষের সাড়াও নেই। নিঝুম—এত নিঝুম যে ওদের গা শিরশির করে ওঠে। ওদের কথাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। আশপাশের কাকলি যেমন মানুষকে সরব করে তোলে, নিদারুণ নির্জনতাও তেমনি মানুষের কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দেয় যেন। অনিলকে বোঠে চালাতেই হচ্ছে। কিন্তু বোঠে এখন জল থেকে না তুলেই চালাতে থাকে—যাতে বোঠে আর জলের আঘাতে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দে ওদের আগমনবার্তা আগেভাগেই ঘোষিত না হয়ে যায়।

একটা বাঁক ঘুরতেই অনিল চমকিত এবং পুলকিতও বটে। খালের দুপারের বড়-বড় গাছগুলি যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই হেলে একে অপরের শাখার বাহু-বিস্তারে আলিঙ্গনাবদ্ধ। একে অপরে জড়াজড়ি করে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করেছে। নীচে পলিসিক্ত শুভ্র জলধারা, আর মাথার উপর গাঢ় সবুজ পাতার ছাদ। এমন সুড়ঙ্গ পথে এগুনো ঠিক হবে কি না, তা না ভেবেই অনিল এগিয়ে নিয়ে যায় তার ডিঙি এই মজার পরিবেশে।

আলো-আঁধারে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ-পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে। এতক্ষণ রোমাঞ্চকর পরিবেশ ছিল, এবার ওদের ভয়গ্রস্ত ও আশঙ্কান্বিত হবার পালা। খাল হঠাৎ বিস্তৃত হয়ে একটা গোলাকার জলাশয় সৃষ্টি করেছে বনের গহিনে! এই ফাঁকা জলাশয় সূর্যালোকে আলোকিত। আর তাকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে ঠাসা গোল-ঝাড়ের বলয়। ডিঙির মাথা এই জলাশয়ে প্রবেশ করতেই দূরে যেন কোনও বড় জলজীব জলকে তোলপাড় করে তুলল। বড় কইভোল মাছ, না কুমির—তা পরখ করার অপেক্ষা না করে অনিল মুহূর্তমধ্যে ডিঙি ঘুরিয়ে দিয়ে পশ্চাৎগামী। এবার ধীরেসুস্থে নয়, ঝপ্‌ঝপ্‌ করে বোঠে চালালো। বিলাসবাবুও বিপদ গুনে বন্দুক রেখে ক্ষিপ্রবেগে বোঠে চালালো। যে-কোনওভাবে দ্রুত ফিরে আসতে হবে বড় নদীতে, তারপর অন্য চিন্তা।

ফিরে এলো ওরা সে-বারের মতো। ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে এলো। ফিরলে কী হবে,

সুন্দরবনের উপকূলবাসী যুবক ভয়ের প্রথম ঝলকে সন্ত্রস্ত হলেও পিছপাও হয় না। ওরাও হয় নি।

এরপর বারবার কতবার যে ওরা দুজনে বনে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বড়দলের হাটে কোনও শিকারির সন্ধান পেলে তো কথাই নেই ; তাকে আপন করে নিয়ে বাঘ বা হরিণ শিকারের গল্পে মেতে উঠতো। বাঘ-শিকারের গল্পে ততটা উৎসাহিত হতো না। কারণ, ওরা ধরেই নিয়েছিল ওটা ওদের এখন এক্তিয়ারের বাইরে শুধু নয়, সাধ্যের বাইরেও। কিন্তু কোথায় হরিণ পাওয়া যায়, কী ভাবে পাওয়া যায়, আর কীভাবেই বা শিকার করা যায়, তা জানবার জন্য ওদের ব্যগ্রতার শেষ ছিল না। শুনতে শুনতে আর বারবার বনে গিয়ে শোনা কথা পরখ করতে করতে ওদের আত্মবিশ্বাস এসে গেছে—ওরা একদিন না একদিন হরিণ শিকার করতে পারবেই। পারতেও দেরি হয় নি। এখন ওরা সুযোগ পেলেই বনে যায়, আর প্রায়ই শিকার করে নিয়ে আসে।

একবার একই দিনে এবং এক যাত্রায় দুজনে তিন তিনটে হরিণ শিকার করে আনলে বড়দলে 'ধন্যি-ধন্যি' পড়ে যায়। তিনটির মধ্যে দুটি ছিল শিঙেল। শিং নিয়ে বড়দলের দোকানিদের মধ্যে রেষারেষি দেখা দেয়। সে নিজেই তিনটি হরিণ শিকার করেছিলো এবং বড়দলের অনেক অনেক দোকান-ঘরে মৃগ-মাংসের ভাগ দিতে পেরেছিলো—তাতেই অনিল পরম পরিতৃপ্ত। উৎসাহে তার মা-কেও টেনে নামায় ঘর-ঘর মাংস বিতরণের কাজে। 'শাবাশ' কথাটা এবার মা-র মুখ থেকেও শুনে বেদে যেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে যায়। সে নিজের জন্য কিছুই রাখে নি —মাংস, চামড়া বা শিং, কিছুই না। সবই বিলিয়ে দেয়।

বড়দলের স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আদর-আপ্যায়ন পেয়ে অনিলের দিনগুলি সহজ হয়ে এসেছিল। মা তো বেদের বিয়ে-থাতে রাজি করাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কাল হলো ১৯৫০ সাল। খুলনার ১৯৫০ সালের দাঙ্গা। তার রেশ বড়দলেও পৌঁছতে দেরি হয় না। দাঙ্গা অবশ্য এখানে হয় নি। কিন্তু হিড়িক পড়েছে সরে পড়বার। ডিঙির পর ডিঙি জুটিয়ে হাঁড়িকুড়ি, বিছানা-পেটরা নিয়ে জো'তে ভাসিয়ে দিচ্ছে আশাশুনি-হিংগলগঞ্জ পথে।

একে একে নয়, দলে দলে। দলে দলে বটে, তবে হৈ-হল্লা বিশেষ নেই। বিপদে-আপদে দলে দলে চলার নেশা সর্ব মানুষের। এমন অবস্থায় দেশ-ভুঁই ছেড়ে যাবার পেছনে অকাট্য যুক্তি থাকলেও, কিসে যেন ওরা ম্রিয়মাণ ! বাঘের ভয়ে নয়, বন্যার ভয়ে নয়, প্লাবনের ভয়ে নয়, মহামারীর ভয়ে নয়—এসবের বিরুদ্ধে ওরা রুখে দাঁড়াতে জানে। শেষ পর্যন্ত কিনা মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাসের আগুনে ওরা পলাতক ! ওরা যেন মাথা তুলে কথা ব[illegible] না আর। তাই হৈ-হল্লা বিশেষ ছিল না। একমাত্র ছোটদের কাছে এটা একটা মজার য[illegible] ছিল—মা-বাবা, পাড়াপড়শি সবাই একত্র চলেছে। এতেই যা একটু সরবতা দেখা দেয় মানুষের ভিড়ে।

হিংগলগঞ্জ পশ্চিম-বাংলার সীমানায় কালিন্দী নদীর তীরে। তারপর এক জো'তে পৌঁ[illegible] যাবে সবাই হাসনাবাদ-কলকাতার রেলপথ ধরতে। কলকাতামুখী হলে আশ্রয় নিশ্চয় মিলবে, এটা এ দেশের সবারই বদ্ধমূল ধারণা। কলকাতা মহানগরী, মহান তার আতিথ্যও।

অনিল ও তার মা ভিড়ে পড়েছে এই দলে। বিলাসবাবুই ওদের ডিঙি জুটিয়ে দেয়। বিলাসবাবুদের ডিঙির বহরও এই সঙ্গে চলেছে। মা-র এক মহা বিশ্বাস ছিল—আর কিছু না হোক, বিলাসবাবু ওদের একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবেই দেবে।

বিলাসবাবুর বহরের পাশেই অনিলের ডিঙি। এক ফাঁকে কিছু সময়ের জন্য বিলাসবাবু সে-ডিঙিতে এক লাফে এসে পাটাতনের উপর লেপটে বসে মা-র সঙ্গে গল্প করে যায়। গল্প যাইহোক, তার মধ্যে অনিলের নানা গুণের তারিফই ছিল বেশি। মা বিশেষ কথা বলেন নি।

'হ্যাঁ' বা 'না' বলেই সব প্রশ্নের উত্তর শেষ কল্পর দেন। শুধু বারবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন—এই ছেলেটাই আজ ওঁর ভরসার স্থল। বারবার কামনা করেছেন, বেদে যেন ওর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে মুহূর্তের জন্য কোনদিনও ভুলে না যায়!

বড়দল থেকে কয়েক বাঁক উত্তরে এগিয়ে ওরা আশাশুনির খাল ধরেছে। এবার সোজা পশ্চিমে যাবে কালিগঞ্জ অবধি। গোটা পথটা কিন্তু একটানা যাওয়া যায় না। আশাশুনি খাল দোয়ানি; দুদিক থেকে জোয়ারের জল ঢোকে। এই দীর্ঘ খালপথে প্রথমার্ধে জোয়ারের টানে এগুতে হবে, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ভাটির টানে কালিগঞ্জ পৌঁছতে হবে। মাঝপথ থেকে ভাটির টান ধরতে কিছুটা গড়িমসি করতে হয়, অথবা লগি পুঁতে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয় যাত্রীদের। দুদিকের জো'র জল ধাক্কা খেয়ে এখানে দুপাশে বিস্তৃত বিল সৃষ্টি করেছে। এখানেই যতো ডাকাতের ভয়। ছিপ্ নৌকোয় তীর-বেগে এসে লুটপাট করে বিলের মাঝ দিয়ে রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে। কিন্তু তেমন ডাকাতের ভয় আজ মিছে—নৌকো ও ডিঙির বহর চলেছে গায়ে গায়ে, প্রায় গোটা খালটা জুড়ে। খালটা যেন লোকে-লোকারণ্য।

বড়দল থেকে আশাশুনি অবধি অনিল যাত্রা শুরুর প্রাথমিক তোড়জোড় ও গোছগাছ নিয়েই ব্যাপৃত ছিল, মা-কেও ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলো। আশাশুনি আসতে যেমন সন্ধ্যাও নেমে এসেছে তেমনি ব্যতিব্যস্ততাও কমে এসেছে। স্থির হয়ে বসে অনিল এবার ডিঙির হাল ধরেছে। স্থির হলো বটে, কিন্তু মনের মাঝে একটা বেদনাসিক্ত তোলপাড় শুরু হতে থাকে—এ কোথায় চলেছি দে' ভুঁই ছেড়ে; বনকে পেছনে ফেলে এ কোন ইট-পাথরের দেশে চলেছি। পাকা ঘরবাড়ি আর পাথরের রাস্তায় আমার স্থান কোথায় হবে! শেষ পর্যন্ত আমাদের ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে না নিতে হয়!

যতোই এগিয়ে চলে ততোই যেন অনিল পিছনের টান অনুভব করতে থাকে। কিন্তু এই টান কিসের জন্য তার কার্য-কারণ তখনকার মতো ধরতে পারে না। যুক্তি পায় না, তবুও পিছুটানকে অবজ্ঞা বা অবহেলাও করতে অপারগ হয়ে উঠেছে। এই সবুজ গাছ, এই তরতরে নদী, এই ধুধু আবাদ! না, সে তো আগেই দেখেছে কলকাতার উপকূল অবধি গাছের ওপর গাছের সবুজ ঝাড়, দেখেছে খাল ও নদীর জল, দেখেছে ধান খেতের ফাঁকা ঠ। তাহলে কিসে ওকে পেছনে টেনে ধরছে!

মা তো বেদের এই ভাব দেখে জিজ্ঞাসা করেন,—কীরে! তুই যে চুপ মেরে গেছিস! হলো তোর? এধার-ওধার সবাই কত কথা বলছে, তুই যে চুপ্সে গেলি! আরে তোকে অতো ভাবতে হবে না। বিলাসবাবুই তো তোকে ভরসা দিয়েছে একটা কিছু বিহিত হবেই। দেয়নি তোকে ভরসা!

বেদে মা-র কথা শুনে কেমন যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ভরসা!! বিলাসবাবুই তো তার ভরসায় বনে উঠতো, তাই না! ওর ক্ষুব্ধ মনে বনের কথা উঠতেই নিজের বেদনার মূল যেন হঠাৎ খুঁজে পায়—যে-বনে সে নিজেই অন্যের ভরসা, সেই বন ছেড়ে সে আজ কোথায় চলেছে? না, না, বন ছেড়ে কোথাও যাবো না।...বনই আমার ভরসা। বন আছে, আর আছে আমার এই ডিঙি...কে আমাকে জীবন-যুদ্ধে হারাবে!!

তোলপাড় করা এই আবেগ বেদের মনে এলো বটে, কিন্তু মা-কে কিছুই বলতে পারে না। মা-র মনে যে ব্যথা লাগবে। বলুক, মা বলতে থাকুক। গৃহ-হারা গৃহিণীকে পাগল করে তোলা বড় বেদনাদায়ক। চুপ করেই রইলো বেদে। আর বিড়-বিড় করে বলেই চললেন মা।

রাত গভীর, ভাটাও অনেকক্ষণ এসে গেছে। সামনেই কালিগঞ্জ। মাঝারি ধরনের গঞ্জ। না, ডিঙির বহর এখানে থাকবে না। সোজা কালিন্দী নদীতে পড়েই ভাটি থাকতে ওপার হিঙ্গলগঞ্জের চরে লগি পুঁতবে। যাতে জো'র প্রথম টানেই ওরা নৌকো ভাসিয়ে দিতে পারে—উত্তরমুখো। হিঙ্গলগঞ্জ থেকে প্রায় এক জো'র মুখে হাসনাবাদ—তারপরই কলকাতার পথে বা ছোট রেলগাড়িতে। কিন্তু তারপর ? আর কোনও হদিশ নেই। নাই বা থাকলো, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তো পা দেবে ওরা !

কালিন্দী নদীতে পড়বার মুখে মা তো শেষ রাতের আবছায়া আলোতে বিলাসবাবুর ডিঙির সন্ধান হারিয়ে ফেলেছেন। বিড়বিড় করে বলেন,—হাঁ রে বেদে ! সে ডিঙি তো দেখছি না !

—রোসো ! এবার বড় নদীতে, সাবধানে আঁকড়ে ধরে বসো।···বিলাসবাবু··· বিলাসবাবু··· !

বেদের ঝাঁঝালো সুরে মা প্রমাদ গুনলেন। এবার হিঙ্গলগঞ্জের চরে সবাই লগি পুঁততেই ভোরের আলোয় পাটাতনে দাঁড়িয়ে বিলাসবাবুর ডিঙি খুঁজতে থাকেন। সেই ডিঙির পাশাপাশি থাকতে মা বড় ব্যস্ত।

বেদে চরে নেমে ভেড়ির ওপর দোকানগুলির দিকে হাঁটু-কাদা ভেঙে এগুতেই মা কেঁদে ওঠেন।

বেদের রুদ্ধ আবেগ এবার রুক্ষ হয়ে যেন ফেটে পড়লো,—না মা, আমি যাব না, যাব না উত্তরমুখো। এপার যখন এসেছি, ওপার আর যাবো না। কিন্তু··· বন, বন আমি ছাড়বো না। বনের পাশেই আমি থাকবো। যাবো না ওদের সঙ্গে !

যেমন দৃঢ়ভাবে কথাগুলি বললো, তেমনি দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটুকাদা ভেঙে উপরে উঠে যায়।

ক্রন্দনরত মা-কে ফেলে অনিল বেশিক্ষণ বাজারে থাকতে পারে না। কোনো মতে চিড়ে-বাতাসা কিনে যেন ছুটে চলে আসে ডিঙিতে।

তখনও মা ডুকরে-ডুকরে কাঁদছেন দেখে বেদে আর থাকতে পারে না—চলো মা ! তোমার যখন এতই সাধ, তোমাকে বিলাসবাবুর ডিঙিতে দিয়ে আসি। তুমি কলকাতা যাও। আমি যাবো না···কিছুতেই যাবো না।

কথাগুলি শুনতেই মা-র কান্না থেমে গেছে। চুপ করে কালিন্দীর থম মারা জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বেশ আস্তে আস্তেই বললেন,—বেদে ! তুই কি পাগল হয়েছিস ! আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যাবো ! তোর যা খুশি তাই কর।

এবার বেদের চোখে জল আসার পালা। ভিজে চোখের পাতায় ধরা গলায় বললো,—মা, চিড়ে খাবার ব্যবস্থা করো। জো' এসে গেছে। এখনই ওরা লগি তুলতে ব্যস্ত হবে। যাক্‌গে ওরা যে চুলোয় যেতে চায়। আমরা এবার চান করে খেয়ে-টেয়ে নি। তারপর ভাটির টানে আমরাও চলে যাবো উল্টো দিকে।

শ'খানেক ডিঙি আর নৌকো-বোঝাই ভাবনায় শঙ্কিত মানুষের দল দেখতে দেখতে জোয়ারের টানে আর পালের হাওয়ায় 'ভাসিয়ে দিল তাদের তরী'।

★ ★ ★
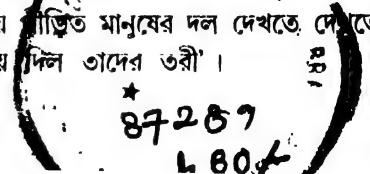
দুপুর গড়াতে না গড়াতে ভাটি এসে গেছে। কাপড় ঠেকা দিয়ে ডিঙিতে খুপরি বানিয়েছিল অনিল। গায়ে আড়মোড়া দিয়ে তারই ভিতর থেকে বাইরে উঠে এসে বলে ওঠে,—দেখেছো মা! আমরা একা নই। কতো নৌকো একে একে ছাড়ছে ভাটির টানে। এরা সব নিশ্চয় এসেছিল মালপত্র নিয়ে হিঙ্গলগঞ্জের হাটে। মালপত্র ওপার পাচার করে এখন সব ঘরমুখো। চলো, আমরা এদের সঙ্গেই চলে যাবো।

মা এখন শান্ত। ছেলের ওপর একান্ত নির্ভরশীল। বললেন, —ভালই হলো, বেদে। ওদের সঙ্গে সঙ্গেই চল। তাড়াতাড়ি লগি তোল।

স্রোতের টানে বনের উপকূলে আসতে দেরি হয় না। বন দেখতেই অনিল যেন চিৎকার করে বলে ওঠে,—মা! মা! দেখেছো বন। তুমি তো কোনোদিন বনে ওঠোনি। এবার দেখে নাও সুন্দরবন কাকে বলে।

মা-ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন,—এগুলি কী গাছ? এ গাছ তো বড়দলে দেখিনি।

—দেখবে কোত্থেকে? এ গাছ বনে ছাড়া আর কোথাও মেলা দায়। ঐ দ্যাখো গরান আর গেঁয়ো গাছের ঝাড়। বনের এই 'ঘেরের' নামও আমি জেনে নিয়েছি। এটা হলো গিয়ে ঝিলার বন। এখানেও বেশ হরিণ পাওয়া যায়।

কাপড়ের খুপরিতে একটু গা এলিয়ে দিতে গিয়ে মা মাদুরে মোড়া কাঁথা-বালিশ বের করতে গেছেন। বের করবেন কি! আঁতকে উঠে চাপা গলায় যেন আর্তনাদ করলেন,—বেদে! বেদে! এটা কী রে?

—ওঃ তাইতো! আশাশুনি বড্ড ডাকাতের ভয়! ভয়ে বিলাসবাবু ডাকাত তাড়াতে বন্দুকটা আমার হাতে দেন। আমিও ভুলে গেছি, উনিও ভুলে গেছেন নিতে। যেটা যার ভাগ্যে থাকে। যাকগে, ভালই হলো।

—ভালই হলো? ওর জিনিস তুই রেখে দিবি? এটা কেমনধারা কথা হলো?

—রেখে দাও ওটা কাঁথা-বালিশ চাপা দিয়ে। না হয়, পাটাতনের নিচে রেখে দাও। পিটেল-পুলিশ দেখলেই হুজ্জত করবে।...আরে, তোমার অত ভালমন্দ বিচার করতে হবে না।

মায়ের বিবেককে শান্ত করতে অনিল আরও বললো—আরে, আমরা তো পশ্চিম দিকেই যাব। কলকাতাও নিশ্চয় কাছে-পিঠে পড়বে। না-হয় একবার কলকাতায় গিয়ে বিলাসবাবুর খোঁজ করা যাবে।

সত্যি-সত্যি মা এবার শান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন, ঘুমিয়েও পড়লেন।

অনিলের ডিঙি অনেক দূর এসে গেছে। বিশাল রায়মঙ্গল নদীও পার হয়ে এসেছে। কিন্তু বড়নদী পার হবার পর নৌকোর বহরও হালকা হযে এসেছে। এ-খাল সে-খাল ধরে যে যার বাড়িমুখো হয়েছে। তবুও ক্যানিং যাবার দলের সংখ্যাও খুব ছোট নয়। তাদের নৌকোর পাশে-পাশেই অনিল এগিয়ে চলেছে।

মাঝপথে দু-একটা ছোট-বড় গঞ্জ যে পড়েনি তা নয়। কিন্তু কোনোটাই অনিলের পছন্দ হয় না। গোসাবায় ওরা যখন হাজির, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। সেদিন রবিবার। জম্‌জম্ করছে গোসাবা ডিঙি আর মানুষের মেলায়। অনিল ডাঙ্গায় উঠতেই যেন বড়দলের গন্ধ পায়! চরের উপর সারি-সারি ডিঙি। নদীর ধারে রাস্তার দুপাশে দোকানের সারি। ভিতর দিকে পাকা বাড়ির মহল্লাও দেখা যায়। বড়দলের মতো স্টিমার স্টেশন নেই বটে, তবে লঞ্চ-ঘাট আছে। হঠাৎ অনিল সিদ্ধান্ত নেয়—এটাই হবে আমার আস্তানা। মা-র সম্মতি

পেতেও দেরি হয় না। দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার অনেক কিছু আছে। তা থাকুক। বড়দলের ছোট ভাই এই গোসাবা।

বাদা আছে, ডিঙি আছে, আর বন্দুকও ভাগ্যক্রমে হাতে এসে গেছে। তা পাশি বা বে-পাশি বন্দুক হোক। বে-পাশি বন্দুক কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, তার খবরাখবর আগেভাগেই অনিলের রপ্ত হয়ে আছে বড়দল থাকা কালে। কাজেই অনিলের পক্ষে গোসাবায় আস্তানা গাড়তে কোনোই বেগ পেতে হয় নি। শরণার্থী তাকে হতে হয়নি—এই গর্বেই সে গর্বিত। সে গর্ব অনিলের চোখে-মুখে সর্বত্র ফুটে থাকতো।

দুটি প্রাণীর জীবন-যাপনের জন্য কোনোদিন চিন্তান্বিত হয়নি, আজও নয়। বনের অঢেল সম্পদ তো ওর নাগালের মধ্যে। সুন্দরবনের মানুষের মনে বনের সম্পদ আহরণের ব্যাপারে কোনও সংকোচ বা দংশন নেই। আইন মোতাবেক যাই হোক, এই কাজ ওরা কখনও অন্যায়ের মধ্যে ধরে না।

এবং এই কাণ্ডকারখানায় একে অপরকে সাহায্য করতে ওরা কার্পণ্যও করে না। কাজেই অনিলের জীবনটা ক'বছরের মধ্যে গোসাবায় সহজ হয়ে এসেছে।

সহজ হয়ে এলে হবে কি, অনিলের মনের দুটি আবেগ ওকে স্থির থাকতে দেয় না। ছেলেবেলার কবি-কবি ভাব এখন গোসাবার গানের আসরে আশ্রয় নিয়েছে। গান মানে ওর কাছে ভাটিদেশের ভাটিয়ালি গান। সে গানে সুরের সূক্ষ্মতা ও লহমার ওস্তাদি না থাকলে কি হবে, দীর্ঘ কপালে চন্দন-ফোঁটা টেনে হালকা বাবরি চুলের জটগুলি দোলা দিয়ে গলা ছেড়ে ঢেউয়ের দোলার মতো ভাটিয়ালির টান যখন দেয় তখন আশপাশের লোকেরাও তন্ময় না হয়ে পারে না। বিশেষ করে গোসাবার ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবুকে এই গের্দের সবাই খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। সবারই তিনি প্রিয়। এই ডাক্তারবাবুই অনিলের গানের সেরা সমজদার।

তা হলে কী হবে ? ডাক্তারবাবু তো সবাই নয়। অনিল এই অঞ্চলের সর্বমানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। তাদের সবার কাছেই 'শাবাশ' পেতে চায়। কিন্তু সুনদরবনাঞ্চলে বনের উপর আধিপত্য না দেখাতে পারলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দায়।

তখন শীতকাল। হিমেল সন্ধ্যায় যে যার ঘরে এসে পড়েছে। বেদেও মা-র কাছে এসে গেছে। ভারী হাসিখুশি আর কথায় কথায় ছড়া কাটছে।

—কী রে বেদে ! আজ কী হল তোর ? এত খোশমেজাজ কেন ?

—আছে, আছে, কাল এক মজার ব্যাপার আছে।

—কিসের মজা রে ! কেন, কাল বুঝি মেয়ে দেখতে যাবি ?

—তা দেখাদেখির আর কি আছে ! তুই তো বেদে, তোর সব মেয়েকেই ভালো লাগবে। আমি আর পারি না, কত কাল একা-একা তোর হাঁড়ি ঠেলবো !

মা-কে হতাশ করে দিয়ে বেদে বললো,—কাল যাবো বনভোজনে।

—বনভোজন !

—না, ঠিক বনভোজন না। বাদায় কি বনভোজন হয়। যাবো হরিণ-শিকারে।

—সেটা আর নতুন কথা কি ? সে তো তুই রোজই যাচ্ছিস।

—না, সে-শিকার না। সে তো যাই বে-পাশি বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে শিকার করতে। কাল যাবো বিয়ের বরযাত্রীর মতো। জনা বারো যাবো। ডাক্তারবাবু যাবেন, বড় ইস্কুলের মাস্টাররা যাবেন, আরও অনেকে যাবেন। সঙ্গে থাকবে তিন-তিনটে বন্দুক। তা ছাড়া আমার বন্দুক।

—আমার বন্দুক কী রে? ও তো বিলাসবাবুর বন্দুক।

—ঐ হলো। এখন তো আমার।

রাত বারোটা। ভাটির টানে ওরা যাত্রা করেছে। বিরাট একখানা পানসি নৌকোয় জনা তেরো হৈ-হল্লা করে চলেছে। পানসির সঙ্গে দুখানি জালি ডিঙি। একেবারে ছোট্ট ডিঙি, কোনোমতে চারজনে চাপা যায়। সঙ্গে চারটি বন্দুক। ডাক্তারবাবুর বন্দুকটা ঠিক বন্দুক নয়, রাইফেল। হাজার হোক বাদা তো, সুন্দরবনের বাদা। বলা যায় না কখন কি হয়। মনের বাসনা, ওরা গের্দের সব্বাইকে হরিণের মাংস খাওয়াবে।

গন্তব্যস্থান সুধন্যখালের বনবিবির টাট্। গোসাবা থেকে দুগ্যোদোয়ানির পথে গুমোর নদীতে পড়বে। সেখান থেকে সজনেখালির দিকে যেতে ডান হাতে সুধন্যখালি। সুধন্যখালি খালও বলা যেতে পারে, নদীও বলা যায়। এই খালের তিন বাঁক এগুলে বনবিবির টাট্ তিন নম্বর পাশ-খালে। টাট্ মানে এই মালে বছর-বছর পলিমাটির চরের চত্বরে এদেশের মানুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বনবিবির আরাধনা করে, মানত করে। এক কথায় তখন যেন নির্জন নিস্তব্ধ নিবিড় বনে শোরগোল তুলে মেলা বসিয়ে দেয়।

ওদের এই টাটে পৌঁছতে শেষ রাত হয়ে যাবে। ভোর না হতেই শিকারের তোড়জোড় করা চাই। এতগুলি লোকে জড়ো হয়েছে যেন এক উৎসবের মুখে; কাজেই ঘুম কারো চোখেই নেই। ক'জনে মিলে লেগেছে কাঁকড়া মাছ ধরতে। শক্ত দড়িতে 'থোপ' দিয়ে কাঁকড়া মাছ সহজে ধরা যায়। ওরা ধরলেও প্রায় এক ঝুড়ি। শিকার হোক না হোক, আগেভাগে আগামী দিনের ভাতের উপকরণ জুটে গেলো বিনা তোড়জোড়ে।

পুবে ঊষার আলোর আভা দেখা দিতেই ওরা বনে উঠেছে। তিন দলে তিনটি বন্দুক নিয়ে এগিয়ে গেল নদী বরাবর। এক-এক দলে দুজন, আর একটি করে বন্দুক। বাকি সবাই নৌকোয় রইলো; তবে তাদের কাছেও একটি বন্দুক থাকলো। কে জানে বিপদ কখন কোন পথে আসবে।

ছ'জনেই দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায়। সুধন্যখাল বেশ কিছুটা দক্ষিণে এগিয়ে পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। এই বাঁকের মাথায় একে একে এবং বেশ দূরে দূরে অনিল দুটি দলকে কেওড়া গাছে উঠিয়ে দিল। নিজে বেশ খানিকটা আরও এগিয়ে সঙ্গী মন্মথকে নিয়ে একটা কেওড়া গাছে ওঠে। সুন্দরবনের হরিণ গোয়োর পাতা, বানের পাতা ও ফল বা কাকড়াগাছের চাপান ফুল খায়, কিন্তু কেওড়া গাছের পাতা ও ফলই সবচেয়ে প্রিয় ওদের। কেওড়া গাছ বাছাই করার কারণও তাই।

সবাই যে যার গাছে চুপচাপ বসে। চরে ও গাছের তলায় রোদ পড়তেই ওরা বানর ডাকা আর বানরে বানরে ঝগড়ার নকল করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু ডাল-পাতা ভেঙে নিচে ফেলে। এ বিষয়ে অনিল খুবই সাবধানী—গাছের ডাল এমনভাবে ভাঙে যাতে পাতায় হাতের কোনও স্পর্শ না লাগে। পাতায় মুখ দেবার আগে গন্ধ শুঁকে হরিণে ঠিক বুঝে নেয় কারা এই ডাল ভেঙেছে। পাতায় মানুষের হাতের গন্ধ পেলেই সোজা ছুটে পালাবে।

একটু পরেই অনিলও হরিণের ডাক নকল করতে থাকে। দেখতে না দেখতে একটা হরিণ-শিশু এসেছে। শিশুকে দেখে অনিলের গুলি করতে মন চায় না। ডাকাও থামিয়ে দিয়েছে। এমন সময় দেখে দূরে একটা বড় শিঙেল ঝোপের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অনিল মেয়ে-হরিণের স্তিমিত ডাক 'উ...উ' নকল করতে শুরু করে। শিঙেল হরিণের ডাক বড় উচ্চগ্রামে। এত উচ্চগ্রামে যে অনেক সময় শিকার বুঝে ফেলে আসল না নকল। কিন্তু হরিণীর স্তিমিত ডাকে আসল কি নকল তা সহসা ধরা দায়।

শিঙেল এগিয়ে আসতে থাকে ধাপে ধাপে অতি সন্তর্পণে। এখনও অনিলের বন্দুকের আওতার মধ্যে আসেনি। ত্রিশ ইঞ্চি নলের বন্দুক, রেঞ্জ কম। অনিল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আর দেরি করতে ভরসা পায় না, চোট করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে শিঙেল এক লাফ দিয়ে ছুটে গেলো। অনিল চিন্তিত, তাহলে কি গুলি লাগাতে পারেনি!

ভাল করে তাকিয়ে দেখে, চত্বরে পলিমাটি প্রলেপের উপর গুলির চিহ্ন। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত হয় না গুলি ঠিকমত লেগেছে বলে। ইঙ্গিতে মন্মথর কাছে জানতে চাইলে সে-ও নিচের ঠোঁট উলটে জানিয়ে দেয়, সেও বুঝতে পারেনি।

অনিল একটু ইতস্তত—নামবে কি নামবে না। মনে আশঙ্কা নেমে এগিয়ে গেলে দূরে অন্য দুটি দলের শিকার ব্যাহত হতে পারে। দোমনাভাব কাটতে অবশ্য বিশেষ দেরি হয় না। সাঙাতদের কাছ থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসে। আওয়াজটা বাঁধা আওয়াজ; বিদ্যুৎগতিতে ফর্‌ফর্‌ শব্দে ডাল-পাতা ভেদ করে যাবার আওয়াজ নয়। নিশ্চয় শিকারের দেহ ভেদ করেছে। পরপর কয়েকটি চোটের আওয়াজ।

অনিল ও মন্মথ নেমে এলো। কিছুটা এগিয়ে দেখে, ঝাঁকাল বনগাছের আড়ালে ওদের শিঙেল গলাটা লম্বা করে এগিয়ে দিয়ে মরে পড়ে আছে। ভাল করে একবার দেখে নিয়ে অনিল খুশি মনে বলে,—সাঙাত, কলজেতেই লেগেছে, তা না হলে অমন করে মরতো না! চলো যাই, এখানে দেরি করো না।

ওদিকে অন্য সাঙাতেরা সবাই নেমে জড়ো হয়েছে। অনিল সেদিকে দ্রুত এগিয়ে খুব ব্যস্তভাবেই ওদের বলে,—তোমাদের কি হয়েছে তা বুঝতে বাকি নেই। যাও তোমরা আমাদের শিঙেলটা বেঁধে ধরাধরি করে নিয়ে যাও নৌকোয়, আমি আর মন্মথ যাচ্ছি তোমাদের শিকারের খোঁজে।

মন্মথকে প্রায় হাতে ধরে টেনে নিয়ে অনিল রক্তের চিহ্ন দেখে দেখে এগিয়ে যায় ওদের শিকারের সন্ধানে। এইভাবে আহত হরিণের পেছনে যাওয়ায় সুন্দরবনে এক মহা বিপদ আছে। বহু সময় বাঘের মুখোমুখি হয়ে পড়তে হয়। অজস্র হরিণ দলে দলে ঘোরে এই বনে। তাহলেও বাঘকে বহু মেহনত করে এদের শিকার করতে হয়। কাজেই সে এমনি ধারা সুযোগের তাকেতাকে থাকে। আহত হরিণকে বাগে আনতে ওদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। অনিল এ কথা জানে। জানে বলেই ওদের না যেতে দিয়ে নিজেই এই দায়িত্ব নিয়েছে। তাছাড়া অনিলের মনটাও খুব তেজী হয়ে আছে। অত বড় শিঙেলটা যে এইমাত্র মেরে এসেছে।

ওরা দুজনে এখন গভীর বনে। সারা পথ শিকার মাঝে মাঝে শুয়েছে আর রক্ত ঝরে পড়েছে সেখানে, আবার এগিয়ে গেছে। গুলি নিশ্চয় ওর পেটে লেগেছে, বুকে লাগে নি। সামনে একটা ছোট নদী ভরন্ত জোয়ার। সুধন্যখালের জলে কামোট ও কুমিরের বড় দাপটি, জোয়ার হলে তো কথাই নাই। এ অঞ্চলের বনবাসী জীবেরও সে খেয়াল নিশ্চয় আছে কিন্তু নিতান্ত প্রাণে বাঁচার আশায় সটান নদী পার হয়ে ওপারে যেতে আহত হরিণ দ্বিধা করে নি।

'খলসে' গাছের একটা মোটা ডাল পুঁতে চিহ্ন রেখে অনিল সঙ্গীকে বলে,—চল, জলে নামা ঠিক না, ডিঙিতে পার হওয়াই ঠিক। চল, ফিরে যাই।

নৌকোয় ফিরে এসে দেখে, ডাক্তারবাবুর তদারকিতে কাঁকড়া মাছের শাঁস আর শিঙেলের মেটের ঝোল টগবগ করে ফুটছে। ডাক্তারবাবু বললেন,—সবাই যখন নৌকোয় এসে গেছে, তাড়াতাড়ি খাওয়ার পাটটা সেরেই নাও।

অনিল মাথা চুলকিয়ে বলে,—কিন্তু...

ডাক্তারবাবু মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,—তোমার আবার কিন্তু কিসের ! না, না, আগে বাদার বনভোজন চুকে যাক, তারপর যা করার তা করা যাবে। শিকারের সন্ধানে যাবার কথা বলতে চাও তো ? তা বেশ ! আগে পেটে কিছু দাও, তারপর আমরা সবাই মিলে যাবো। ওকে তো পাবই। পালাতে গিয়ে যখন বারবার শুয়ে পড়তে হচ্ছে, জাদুকে বেশিদূর যেতে হবে না ! —একনাগাড়ে কথাগুলি বলেই নিজে ছইয়ের ভিতর থেকে মাটির শানুক আনতে গেলেন।

অনিল আবার বলে ওঠে,—তা তো হল, ডাক্তারবাবু ! কিন্তু···

—আবার তোমার কিন্তু ! বলো, কি তোমার কিন্তু।

—আমার একটা আর্জি ছিল। দুটো হরিণে তো গোসাবার সব বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ানো যাবে না। আমি বরং ডিঙি নিয়ে···

তা বেশ ! যেতে হয় যেও, আগে শানুক নিয়ে বসো তো !

গভীর নির্জন ভয়ঙ্কর অরণ্যে পানসির পাটাতনে বসে রসাল গল্পের আর হাসি-ঠাট্টার মধ্যে বনভোজন-পর্ব শেষ হতেই অনিল আর একটুও দেরি করতে চায় না। মন্মথ ও আর একজন সাঙাতকে সঙ্গে নিয়ে দুটি বন্দুক হাতে ছোট্ট ডিঙিতে বসে পড়েছে। হরিণ পেতে হলে সূর্যের রশ্মি তির্যক হবার পূর্বেই গাছে উঠতে হবে।

অনিলের কাণ্ডকারখানা আর ভাবগতিক দেখে ডাক্তারবাবুর কি যেন একটা সন্দেহ হয়। হঠাৎ বললেন,—শিকেরি ! তোমার বন্দুকের বদলে এবার আমার রাইফেলটা নিয়ে যাও।

দ্বিধাগ্রস্ত মনে অনিল নিজের বন্দুকটা হাতছাড়া করতে চায় না। বে-পাশি বন্দুক, বলা যায় না, বিপদে পড়লে অন্যে হয়ত নদীগর্ভে ফেলে দিতেও কসুর করবে না ! তা হলেও যাত্রার মুখে ডাক্তারবাবুর ইচ্ছাকে আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করে নিজের বন্দুকটা আলগোছে রেখে রাইফেলটাই নিয়ে গেলো।

স্রোতের টানে ওদের ডিঙি সাঁ-সাঁ করে চলে সোজা দক্ষিণে। সুধন্যখালি এখানে পূব দিকে বাঁক নিয়েছে। তারই ফলে এই ট্যাঁক ! ট্যাঁক ঘুরে অনিল ডিঙি নিয়ে গেল সুন্দরবনের আরও এক-বাঁক পথ।

মালে উঠেছে তিনজন। পছ···সই স্থানে এসেই অনিল ফস করে এক কেওড়া গাছে উঠে গেল। গাছে উঠতে উঠতে বাকি দুজনকে ফিসফিস করে বলে,—যা, তোরা উ-ই দূরের গাছটায় উঠে বোস। দুজনেই এক গাছে, বুঝলি।

মন্মথ ও তার সাঙাতের সঙ্গে একটি বন্দুক। বন্দুকটি দোনলা, আর ওরা ফাঁদ পাতছে হরিণের আগমন উপলক্ষে। কাজেই ওরা নির্ভয়ে ধীর পদক্ষেপে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে।

অনিল গাছে উঠেই দেখে, বনে পাতার ছাতির বেশ নিচুতে এক তে-ডালাতে শকুনের বাসা। অত বড়ো বাসা, তাতে আবার কোনও শকুন নেই দেখে অনিলের একটু আশঙ্কা জাগে। রাইফেলের নল দিয়ে নেড়ে দেখলো—না, কোনও সাপ-টাপ নেই। উঠে গিয়ে পাখির বাসার উপর নিজের গামছাখানা বিছিয়ে আরাম করে পেতে ডালায় বসতে গেছে। বসবে কি ! থ মেরে গেছে। ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে দ্যাখে, কালো ও হলদে রঙের লম্বা ডোরা লম্বা লম্বা শূলোর সঙ্গে মিশে আছে। তারই ডানদিকে বেশ কিছুটা দূরে। লক্ষ্য তার ঐ সাঙাতদের দিকেই। মুহূর্তের মধ্যেই অনিল যেন কেমন হয়ে যায়। হাত-পা কাঁপতে আরম্ভ করেছে। কয়েক সেকেণ্ড কাটতেই সচেতন হয়ে ভাবে—সে কি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখছে ? না, তার মতিভ্রম ? নিজের গায়ে চিমটি কেটে দ্যাখে—না, তার চেতনা তো সজাগই। তবে ! তবে আর কি !! তা ওদের গতি এতো ধীর কেন ? তাড়াতাড়ি গাছে

উঠতে পারিস্ না ! বিকট চিৎকারে সাবধান করে দেবো ? কিন্তু তাতে যদি হিতে বিপরীত হয়ে যায় ? মরুক গে ! বনে কে কাকে সাবধান করতে পারে, যার-যার 'সাবধান' তার-তার কাছে। অনিলের এক বুদ্ধিভ্রম অবস্থা।

হঠাৎ নিঃশব্দে বাঁ হাটু ভেঙে তেডালার এক ডালে চেপে বসলো। ঠিক বসলো না—দেহের ওজন আর শক্তি জড়ো করেছে নিচের ডালের উপর রাখা টান্‌টান্ করা ডান পায়ের উপর।

না, তার কাছে তো রাইফেল আছে। শিকারী জীব এবার গুটি মেরে গুঁড়ির আড়ালে দুই সাঙাতের দিকে কয়েক হাত এগিয়েছে।...রাইফেল ! রাইফেলে তো এল্ জি গুলি নেই। বুলেট, একটাই মাত্র বল্ ! যদি ফশকে যায় !!

রাইফেলটা ধরে হাঁটুর উপর বাঁ হাত রেখেছে। এতক্ষণে বুঝি হাতের কাঁপুনি কমে এসেছে। পরপর পাঁচবার নিরিখ করলো। পাঁচবারই রোমাঞ্চিত লোমে ঢাকা বুকে তাক হয়। ও যে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুচ্ছে। আবার ক্ষণিকের জন্য মনে হয় এই বুঝি ভীষণ বেগে ঝাঁপ দিলো। না, আরও একটু এগুতে চায়। সুনিশ্চিত হতে চায়—চকিতে এবং বিদ্যুৎসম. গতিবেগের এক ঝাঁপে হাতের থাবা যাতে শিকারের ঘাড়ে মারতে পারে। উবু হওয়া মানুষকে ওরা প্রথমেই এক কামড়ে শূন্যে তুলে ধরতে চায়। কিন্তু খাড়া মানুষকে ঘাড়ে থাবার আঘাতে বেহুঁশ করে মাটিতে ফেলে দেওয়াই ওদের লক্ষ্য।

সাঙাত দুজন এবার গাছে উঠতে যেতে পারে। সুন্দরবনের নরখাদক সে সুযোগ দেবে না। অনিলও আর দেরি করতে চায় না। যমদূত পেছনের পা গুটিয়ে নিয়ে এসেছে। লেজের ডগা মাটিতে বাড়ি মারার জন্য উঁচু হয়ে উঠেছে। মানুষের মতো বোধ হয় ১-২-৩ গুনে মাটিতে লেজের আঘাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ এক হুঙ্কারে ধনুকের জ্যা থেকে মৃত্যুবাণের গতিবেগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মানুষের বেলায় যেমন সজোরে উচ্চারিত 'তিন' কথাটা দেহে এগিয়ে যাবার ধাক্কা আনে, সমভাবে ওদের লেজের ডগার সজোরে শেষ বাড়িটাও বুঝি দেহকে ঊর্ধ্বমুখী করে লাফ দিতে সাহায্য করে। সাহায্য সামান্যতম হলেও, শেষ মুহূর্তের এই সাহায্য কম কিসে ! দেহের তুলনায় কান দুটি যৎসামান্যই উঁচু, কিন্তু শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে তাও হেলিয়ে দিয়েছে পেছনের দিকে এবার। না, অনিল এক মুহূর্তও আর দেরি করতে চায় না। করেওনি। বুকের নিরিখেই রাইফেলের চোট্ করে দিল।

চোট্ করার পূর্বক্ষণে রাইফেলের সেফ্ তুলবার সময় অনিলের আশঙ্কা ছিল সেই সামান্য শব্দটা বিমনা করলেও করতে পারে, আর তখন নিজেই হয়তো হয়ে পড়বে এই মৃত্যুদূতের প্রধান লক্ষ্য। না, তা হয় না। নরখাদকের এই মুহূর্তের একনিষ্ঠতা যে অর্জুনের লক্ষ্যভেদের তন্ময়তার মতো। ওদের দেহ-মন, শিরা-উপশিরা যেন এই হিংস্রতম কাজের জন্য উদগ্র থাকে।

অনিল গুলি করেছে, বাঘও হুঙ্কারে লাফ দিয়েছে। বাঘের হুঙ্কার আর গুলির আওয়াজ যেন মিশে গেল। বাঘ শূন্যে লাফ দিয়েছে। লাফ দেবার মুখোমুখি গুলির আঘাতে বোধহয় একটু অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বে উঠেছে। শুধু ঊর্ধ্বে নয়, তার গতিমুখও খানিকটা ঘুরে গেছে। ঘুরে যাবি তো যা—একেবারে অনিলের গাছের বরাবর।

অনিলের চিন্তাশক্তি স্তব্ধ। জীবনের তাগিদে মাথার উপরের ডাল আঁকড়ে ধরে উঁচুতে উঠবার চেষ্টা। কিন্তু ঐ চেষ্টাই মাত্র।

লাফের পর মাটিতে পড়েই ছুট দিলো একেবারে অনিলের গাছের গুঁড়ি ঘেঁষেই নয়, গুঁড়িতে ধাক্কা খেলো। আর যেন চার পায়ে ছুটতে পারছে না। ছোটার গতিবেগে মাটিতে

উপুড় হয়ে পড়ে সড়সড় করে এগিয়ে গেল বেশ খানিকটা। দেহের ওজনে আর এগিয়ে যাবার ধাক্কায় গাছের শুলোগুলি মড়মড় করে ভেঙে যেতে লাগে। বাঘের মুখের গজরানি কিন্তু থেমেও থামতে চায় না।

নরখাদক বুঝি থমকেছে। না, ঠিক থমকায়নি। আবার খাড়া হয়ে দ্রুত কয়েক কদম টলতে টলতে ছুটে গেলো ডানদিকের গরান-বনে। কিছুক্ষণ ধরে গরান-বনের আড়ালে হুড়মুড় শব্দ। তারপর শান্ত। বনও শান্ত।

অনিলের চিন্তা—গুলি লেগেছে ঠিকই, কিন্তু ঠিকমতো লেগেছে তো। ইত্যবসরে বেশ উঁচুতে মগডালে উঠে নিশ্চিন্ত হয়েছে, বাঘ ফিরে এলেও ওকে নাগাল পাবে না। রাইফেল কাঁধে ঝুলছে। এতক্ষণে আবার গুলি পুরে রাখবার খেয়াল হলো।

সহসা গরান-বন থেকে দীর্ঘ একটা হাঁফ ছাড়বার ফড়ফড় শব্দ, অনিলও হাঁফ ছাড়লো। না, তবুও বিশ্বাস নেই এই দুর্ধর্ষ জীবকে। প্রায় পনেরো মিনিট কেটে যাবার পর অনিল মতি স্থির করতে চায়। কিন্তু এক কু-ই দেবে, না, জোড়া কু-ই দেবে? পাখির ডাকের নকলে এই কু-ই দেবার রীতি, যাতে কিনা অন্য কোনো জীব সন্ত্রস্ত বা সজাগ না হয়। এক কু-ই মানে—আমিও গাছ থেকে নামলাম, তোমরাও নেমে এগিয়ে চলো। আর জোড়া কু-ই ইঙ্গিত করে—তোমরা সবাই নেমে আমার গাছের তলায় ছুটে এসো।

ইতস্তত করে অনিল জোড়া কু-ই দিয়ে বসে। দুই সাঙাত অমনি গাছ থেকে দ্রুত ছুটে এসেছে। গাছ থেকে নামতে নামতে অনিল বেশ সাহসভর করে জোরে জোরে বলে,—অতো কী নিচে দেখছিস্! খবরদার! দেখলেই গুলি করবি! খবরদার পিছুবি না!

—দেখেছো! কী রক্ত! কলসখানেক রক্ত!

—দেখেছি, আমার কথা কানে গেছে তো! দেখলেই গুলি···দ্যাখ, দ্যাখ, ভাল করে চারদিকে দ্যাখ···দেখলেই গুলি!

অনিল নিচে নেমে রাইফেলের সেফ তুলে ওদের প্রায় হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেলো গরান-বনের ঝোপে।

চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়ে আছে: এ জীবকে বিশ্বাস নেই। অনিল রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে নলের মুখটা [illegible] ধাক্কাধাক্কি করে পরখ করে। এতটুকু নড়লে ট্রিগার টিপে দেবে।

ওদের এখন আনন্দ ও দাপটির কোনও সীমা নেই। নদীর ধারে এক গাছের মাথায় উঠে সবাই মিলে প্রাণপণে জোড়া কু-ই দিতে থাকে।

দেখতে না দেখতে ওদের বড় নৌকো এসে হাজির। ডাক্তারবাবু তো ছইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে হাত-পা নাড়ছেন সুখবরটার ইঙ্গিত পেতে।

ডাঙায় নেমে ডাক্তারবাবু তো ঘোষণা করার মতো করে বললেন,—আমি তো আগেই বলেছি, অনিল বাউলে না হয়ে যায় না! তা না হলে ও আগে থাকতে জানলো কী করে এখানে বাঘ আছে! সাধে কি আমি ওর হাতে রাইফেলটা তুলে দিয়েছিলাম!

গোসাবায় ফিরে আসতে দুটি বড় বড় হরিণ আর ততোধিক বিশালকায় বাঘ গোটা গোসবাগঞ্জকে কাঁপিয়ে তুললো। ডাক্তারবাবু তো বলেই চলেছেন, তোমরা শাবাশ দিয়ে যাও বেদে বাউলেকে। অনিলের আদুরে নাম যে 'বেদে' সে কথা অনেকেই জানে ওর মা-র দৌলতে।

প্রাথমিক চমক ও উল্লাস স্তিমিত হতেই অনিল সহসা চললো ছুটে নিজ গৃহমুখো। আজ কি আর কেউ বেদেকে অমন করে চলে যেতে দেবে। বাচ্চারা তো বটেই, বড়দের একদল

চললো ওর সঙ্গে, ওর গতিপথকে স্তিমিত করে আর ওর কাহিনী সবার কাছে সবার আগে কাড়া পিটিয়ে দিতে।

হৈ-হল্লা শুনে মা এসেছেন আঙিনায় হুড়কোর কাছে। পরণের থানের আঁচল বেশ আঁটোসাটো করে ফোকলা দাঁতে আধো-আধো ভাবে বললেন,—কি রে বেদে ! তুই নাকি আজ 'বেদে বাউলে'…'বেদে- বাউলে' !

অনিল সামনে এগিয়ে এসেছে। মুখে হাসি নিয়ে কথা নেই বার্তা নেই ঢিপ করে মা-কে প্রণাম করলো।

দুই

বেদের প্রতি গোসাবার মানুষের এই অভিনন্দন মায়ের মনে এক অসাধারণ তৃপ্তি এনে দেয়। এনে দিলেও মা কিন্তু বিলাসবাবুর বন্দুকটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত একদিন রাতে শোবার সময় বেদেকে প্রশ্ন করেই বসেন,—আচ্ছা বেদে, তুই বাঘটাকে মারলি কি করে ? তোর সেই বন্দুকটা দিয়ে মেরেছিস তো ?

—না মা, এতো বড়ো বাঘকে কি ঐ বন্দুকে অতো সহজে ঘায়েল করা সম্ভব ! ভাগ্যি, দ্বিতীয়বার যখন বনের ভিতরে যাই, তখন ডাক্তারবাবু তাঁর রাইফেলটা আমার হাতে তুলে দেন। বাঘটা যে কি ভীষণ জোরালো আর কি ভয়ঙ্কর তেজী ছিল, তা তুমি ভাবতেই পারবে না !

সুযোগ পেয়ে মা এবার তাঁর মনের যাতনাটা খুলেই বলেন,—তা ভালোই হলো। ডাক্তারবাবু একবার যখন খুশি মনে বন্দুকটা তোর হাতে দিয়েছেন, তখন তোর আর কোনও অসুবিধা হবে না। চাইলেই তো তুই পাবি নিশ্চয়।

মায়ের বক্তব্যটা আগাম অনুমান করেই বেদে ঝমাৎ করে বলে বসে,—তা মা, অন্যের বন্দুক আর নিজের বন্দুকে অনেক তফাৎ। নিজের বন্দুকে যেমন হেলেফেলে যেমন-তেমন ভাবে চোট্ করা যায় তা কি··

মা-ও কম নয়। ছেলের কথা থামিয়ে তৎক্ষণাৎ বললেন,—সে কি আর বুঝি না, নিজের ছেলে আর পরের ছেলে !!—বলি, বন্দুকটা তোর নিজের হলো কি করে ?

—না, না, তা ঠিক বলছি না। তোমাকে তো প্রথম থেকেই বলেছি, যাবো একদিন কলকাতায় বিলাসবাবুর খোঁজে। তুমি তো বোঝো না, কলকাতা কি জিনিস ! এ কি বড়দল না গোসাবা, যে লোকের নাম জানলেই ঠিকানার হদিস পাওয়া যায়।

—কেন, 'বাঘবাজার' বলে তো তোর জানাই আছে ঠিকানা।

—যা জানো না তা নিয়ে কেন মাথা ঘামাও ! কলকাতা যা, 'বাঘবাজার'ও তাই। তুমি ভেবো না, আমি নিশ্চয় একদিন যাবো, বলছি যাবো।

সে-রাতের মতো আর কথা কাটাকাটি হয় না বটে, তাহলেও বন্দুকটা গোড়া থেকেই বেদের মনে একটা দ্বন্দ্ব এনেছে। ভারি টান ওর বন্দুকটার ওপর ; সুন্দরবনের উঠতি বয়সের মানুষের কাছে অস্ত্রের প্রতি লোভ ও আকর্ষণ দুর্নিবার।

তাহলেও বেদের মতো গান-পাগলা ও কবি মনের কাছে সততার প্রতি বিশ্বস্ত থাকাও কম দুর্নিবার নয়। কাজেই মনের মধ্যে নিদারুণ দ্বন্দ্ব চলে।

রক্ষে, বন্দুকটি ওর বাড়িতে কখনই রাখতো না। চোখের সামনে থাকলে তো অহরহ

মনের মধ্যে খচ্খচ্ করতো। তাছাড়া মা-ও মানসিক যন্ত্রণায় দিবানিশি ভুগতেন।

সুন্দরবনের মানুষের আছে অজস্র বে-আইনী বন্দুক। তারাও পারতপক্ষে সে-সব বন্দুক কখনও নিজেদের ঘরে রাখে না। বনের গভীরে রেখে দেয়। বেদেও তাই করেছে। নদীর ওপারে বনের বেশ গভীরে এক বানগাছের খোঁড়লে বন্দুকটা রেখেছে।

সজনেখালি বনকর অপিসে লোকের বড্ড আনাগোনা। সে-অঞ্চল এড়িয়ে পীরখালি বনের গভীরে একটা বানগাছের খোঁড়লে বেদে লুকিয়ে রেখেছে। তেমন দরকার হলে ডিঙি করে ছুটে গিয়ে বন্দুকটা নিয়ে আসে।

একবার তো আনতে গিয়ে এক মহা আপদের মুখে পড়ে। খোঁড়লের মুখটা বেশ একটু উপরে। ওর মধ্যে রাখলে গোটা বন্দুকটাই ঢাকা পড়ে যায়। গাছে একটু উঠে তবে বন্দুকটা হাতের নাগালে আসে। গুড়িটাও বেশ মোটা। এরকম মোটা বানের গুড়িতেই খোঁড়ল হয়। অবশ্য গাছ অনেক পুরনো হলে তবেই খোঁড়ল দেখা দেয়।

তখন বর্ষাবাদলের দিন। বৃষ্টির জলে গুড়িটা বেশ পিছোল হয়ে আছে। কোনমতে ধরাধরি করে উঠতে গিয়েই একটু-আধটু শব্দ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই খোঁড়লের ভেতরে কি যেন নড়াচড়া করে ওঠে।

বেদে মুহূর্ত মধ্যে গাছ থেকে লাফিয়ে মাটিতে। দাঁড়িয়ে পড়ে কান পেতে বুঝবার চেষ্টা করে, কি হতে পারে? বনে জন্তু-জানোয়ারের তো অভাব নেই, কিন্তু কোন জীবই বা হতে পারে!

সাবধানের মার নেই। ভেবেই, কোমরে ঝোলা কুড়ুলের দু-তিন কোপে একদলা কাদামাটি নিয়ে খোঁড়লের ঠিক পাশেই গরান বল্লার ছোট গাছটায় উঠে পড়লো। বেশ খানিকটা উঠলো যাতে খোঁড়লেব মুখটা ভাল ভাবেই দেখা যায়।

এবার মাটির গোল্লা বানিয়ে বানিয়ে খোঁড়লের ভিতর টিপ করে ফেলতে লাগে। যেই থাকুক খোঁড়লে নরম মাটির গোল্লায় কতোটাই বা আঘাত পেতে পারে. তাহলেও শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই বুঝি মুখ বাড়িয়েছে। সে-মুখ দেখামাত্র আঁতকে ওঠার কথা। বেদে এবার সশব্দেই বলে ওঠে,—অবশেষে তুই এসে যক্ষের ধন পাহারা দিচ্ছিস!! কিন্তু পরক্ষণেই সাবধানী হয়ে ওঠে।

সাপ! বিষধর সাপ! সুন্দরবনের কালকেউটে। কালো মিশমিশে, চোপসানো ফণার পদ্মচিহ্ন স্পষ্ট।

একদম নিঃসাড় ও নিঃশব্দ হয়ে গেছে বেদে। অন্য কেউ হলে কথা ছিলো; এ যে কালকেউটে. দেখামাত্র দূর থেকে ছুটে এসে ছোবল মারে। এ সাপ বড় ভিতু, নিজের প্রাণভয়ে তেড়ে ছুটে এসে শত্রুকে আগেই নিধন করতে চায়, ক্রোধ বা হিংসার জন্য নয়। এর দংশনে বিষও মোক্ষম। অসহ্য যন্ত্রণায় প্রায় তৎক্ষণাৎই মৃত্যু অনিবার্য, এতটুকু সময় পাওয়া দায়।

বেদে নিস্তব্ধ হয়ে তার গতি দেখে বুঝবার চেষ্টা করছে. ওকে সে দেখতে পেয়েছে কিনা। কালনাগিনীও নিশ্চল। কিন্তু ও যদি ওর শত্রুকে কোথাও ঠাহর করতে পারে একবার, তাড়া সে করবেই। দুরন্ত বেগে ছুটে আসবেই।

মনে আতঙ্ক আনে বটে, কিন্তু কি সুন্দর দেখতে! সারা দেহটা চক্চকে কালো, রক্ত জবার মতো চোখ, মাথায় শ্বেতপদ্মের চক্র, দৃঢ় ওষ্ঠ বলয়ের ফাঁকে লকলকে বিদীর্ণ জিহ্বার মুহূর্তে মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমক্। সৌন্দর্য বটে, কিন্তু তা বিহ্বল ও বিমোহিত করার সৌন্দর্য।

একবার ঘাড় বেঁকিয়েছে গরান বল্লার দিকে, আর বুঝি রক্ষা নেই! বেদে নিশ্বাস বন্ধ

করে দিয়েছে। চোখও প্রায় বন্ধ করেছে, চোখের পাতির আড়ালে কোনমতে আবছায়াভাবে দেখছে যাতে আপন চোখের দ্যুতি নাগিনীর লাল চোখে ছায়াপাত না করে !!

কয়েক লহমা কেটে যায়। তারপর নাগিনী ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে সরসর করে চলে যায় বেদের দিক থেকে অন্যদিকে। নজরে নিশ্চয় আনতে পারেনি বেদেকে।

বেদে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বাঁচে বটে, কিন্তু আরেক আশঙ্কা ওকে পেয়ে বসে। খোঁড়লে ওর কোনও সঙ্গী আছে কিনা ? থাকলে এতক্ষণে সে-ও বেরিয়ে আসতো, একা একা পড়ে থাকবে কেন ? তা না থাকুক, বাচ্চার দল তো মায়ের অপেক্ষায় চুপচাপ খোঁড়লে পড়ে থাকতেও পারে। আছেও হয়ত, সজনেখালি অঞ্চল সুন্দরবনের পাখির বড় এক আলয়। হাজার হাজার পাখি যেমন উড়ে এসে বসে, তেমনি অজস্র বাসা বানায় গাছের মাথায়। দমকা বাতাসে ওদের অনেক ডিম নিচে পড়ে যায়। এই ডিমের লোভে সাপ তো দূরের কথা, বাঘেরও আনাগোনা কম নয়।

সুন্দরবনে প্রবেশ করে অতো সব ভাবতে নেই। ভাবতে নেই বলেই বেদে এবার গরান বল্লা থেকে দ্রুত নেমে খোঁড়লের পাশে গেল। আবার কয়েকটা ছোট ছোট গোল্লা বানিয়ে আলগোছে পায়ের পাতায় উঁচু হয়ে খোঁড়লের মুখে আস্তে ফেলে দিলো। গুড়ির গায়ে কান লাগিয়ে পরখ করতে চায় আর কোনও জীবের সাড়া পায় কিনা।

না, সাড়া পায় না। এবার সটান গাছে উঠে নজর দেয় খোঁড়লে। ঠিকই দেখতে পায় বন্দুকের নল। ধরতে গিয়েও ধরে না। তাহলেও একবার স্পর্শ না করেও বুঝি পারে না। কি সুন্দর এই বন্দুকের লোহা—এতো জলবৃষ্টিতেও এতোটুকু মরচে ধরে নি।

ভাবে, না থাক, আজ নিয়ে কি করবো। কিন্তু মা-কে যে কথা দিয়েছি। তা হোক, আগে আমি বিলাসবাবুর কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি। তারপর না হয় নেওয়া যাবে। ভালোভাবেই তো আছে। যক্ষের ধনের তো ভালো পাহাবাদাব জুটে গেছে। কেউ আর এই খোঁড়লে হাত দিতে সাহসী হবে না। না, থাক।

নিরাপদে থাকবে ধারণা হতেই নেমে পড়লো খোঁড়লের মুখ থেকে। সটান ফিরে এলো সে-বারের মতো বন থেকে।

তিন

এসে মা-কে কিন্তু কালনাগিনীর কথা কিছুই বলে না। বললে হিতে বিপরীত হয়ে বসতে পারে। তার বদলে বললো,—মা, এবার আমি কলকাতা ঘুরে আসি।

—কেন রে, কলকাতা কেন ?

—না, উনি জানেন না ! কলকাতা যাব না তো কোথায় যাবো ? বিলাসবাবু ! বুঝলে, বিলাসবাবু !

মা তো হকচকিয়ে যান। বললেন,—এতদিনে তোর সুবুদ্ধি হলো ! যাবি তো যা, কিন্তু খুব সাবধানে থাকবি। কলকাতার কথা কতো শুনি ! কতো যে বিপদ সেখানে, তা বলার নয়। গাড়ি-ঘোড়ার চাপেই যে কতো লোক খুন-জখম হয় রোজরোজ ! তাছাড়া ছেলে-ধরা লোকও নাকি ঘোরাফেরা করে।

ছেলেধরা লোকের কথা শুনে বেদে তো হেসেই উঠলো,—বলো কি, আমাকে ছেলে-ধরার ভয় করতে হবে ! তুমি কি আমাকে ছোট্ট খোকা বলতে চাও !!

—তা না তো কি ! এখনও বিয়ে-থা করলি না । বিয়ে-থা না করলে কেউ কি বড় হয় ! আর বড় না হলে তো লোভের অন্ত নেই। দেখিস, খুব সাবধানে থাকবি।

—না, মা-র কাছে বোধহয় কোনো ছেলে কোনোদিনই বড় হয় না।

—তা তুই তো যাবি, কিন্তু বন্দুকটা কই ? সেটা নিতে হবে তো।

—তোমাকে নিয়ে তো বড্ড মুশকিলে পড়লাম। পাশ ছাড়া বন্দুক নিয়ে কলকাতায় যাবো ! এ কি গোসাবা ! মোড়ে মোড়ে সব পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে কলকাতায়। তারা তোমার বনকর পিটেল পুলিশ নয়, তক্ষুনি হাতকড়া পরিয়ে হাজতে টেনে নিয়ে যাবে।

—তাহলে উপায় কি হবে ?

—যার বন্দুক সে পাশ সঙ্গে করে এখানে এসে নিয়ে যাবে তার জিনিস।

—বলিস কি রে ! বিলাসবাবু নিজে গোসাবায় এসে নিয়ে যাবে। তোর তো খুব বুদ্ধি ! যা, যা, শীগ্গীর করে যা কলকাতায়।

কলকাতায় যেতে বললেই সুন্দরবনের মানুষের কেমন যেন গড়িমিশি ভাব আসে। বনের কোথাও যেতে বলো—তা রায়মঙ্গলের মোহানা বা বিদ্যার মোহানায় যেতে বলো না কেন, ওরা প্রায় তখন-তখুনি বেরিয়ে পড়বে ডিঙি আর বোঠে নিয়ে। কিন্তু কলকাতার মতো মানযালয়ে আসতে ওদের কেমন যেন অনীহা।

বেদে কিন্তু এবার নিশ্চিত কলকাতায় আসবেই বলে স্থির করে ফেলেছে। এর আগে সে অনেকবারই এসেছে কলকাতায়। সেই যখন বড়দলে থাকতো তখনও এসেছে। সেবার যখন আসে তখন এসেছিল হিংগলগঞ্জ-হাসনাবাদ পথে ছোট রেলগাড়ি করে। খেলনার মতো এই রেলগাড়ি, ভারি মজাই লাগে বেদের বা অনিলের। ঘুটঘুট করে ঐ গাড়িতে ঘণ্টা তিনেক চড়ে বাগুইহাটি আসে। নামটা শুনে খটকা লাগে ওর। ভাবে, লোকে বলছে বটে বাগুইহাটি, ভুল বলছে। ওটা হবে নিশ্চয় বাঘুইহাটি। এখানে স্তূপাকার কয়লা আর ছোটো ছোটো ইঞ্জিনের সারি। বারবার তাকিয়ে-তাকিয়ে দ্যাখে, কেমনভাবে একটা ইঞ্জিন তার পেটে হুড়হুড় করে জল পুরে । কি জোর এই ইঞ্জিনগুলির ! কতো লোককে টেনে নিয়ে এলো ঘটাং ঘটাং করে। এক একটা ইঞ্জিনের জোর বাঘের থেকে বেশি না হয়ে যায় না।

এরপর ঘুটঘুট করে আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছিল পাতিপুকুর স্টেশনে। তারপরই কলকাতা আসার শেষ স্টেশন, শ্যামবাজার। পশু হাসপাতালের বাগান বাড়ি ছাড়িয়েই বাঁ হাতে কয়েকটা বাড়ির গা ঘেঁষে গোটা গাড়িখানা যেন ঢুকে পড়েছিলো একটা খুপরির মধ্যে।

ইতিমধ্যে বেদে গোসাবা থেকে ক্যানিং হয়ে বড় রেলগাড়িতে শোঁ শোঁ করে কলকাতায় এসেছে। বেদের কিন্তু বড় গাড়ি ভাল লাগে না। ছোট রেলগাড়ি চড়ার আনন্দের কথা আজও সে ভুলতে পারে না। আর শিয়ালদায় এসে বেদে যেন খেই হারিয়ে ফেলে। বনের বাসিন্দার এতো হৈ-চৈ যেমন ভাল লাগে না, তেমনি ভাল লাগে না এতো শব্দ। ভাবে, দিন নেই রাত নেই কলকাতার লোকে এতো শব্দের মধ্যে থাকে কি করে ! এখন যদি আমাকে কেউ গান করতে বলে, তাহলে তা ওরা শুনবে কি করে ! ওরা বোধহয় গান-টান ভালবাসে না !

এবার সে কিন্তু ছোট বা বড় কোনো গাড়িতেই আসবে না। এবার সটান ডিঙি করেই কলকাতা আসবে। সুন্দরবনের মানুষ ডিঙি-বোঠেতেই যেন মনের জোর পায়। তার উপর যদি ডিঙি নিজের হয়, তাহলে তো কথাই নেই। যেমন খুশি, যেদিকে ইচ্ছে সাইসাই করে

চলে যেতে পারবে। যখন ইচ্ছে হয়, শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারবে, আবার যখন ইচ্ছে হয়, বোঠের খোঁচে তরতর করে চলে যাবে। সঙ্গে হাড়ি আর চুলো থাকলে তো খাবারও ভাবনা নেই।

সুন্দরবনের নদীপথে ডাকাত ও খুনীর অভাব নেই, কিন্তু কলকাতার মতো চোর-ছ্যাঁচোড়ের দাপট নেই। কলকাতার মানুষকে বড়ো ভয়, কেমন করে যে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে যাবে তার পাত্তা পাওয়া দায়। এই শহরের মানুষগুলো যেন জলের কামোট। চুপিসারে তোমার হাত-পা কেটে নিয়ে যেতে পারে বোধহয়। তুমি এতোটুকুও জানতে পাবে না।

এতো কথা অবশ্য বেদে আগে থাকতে ভাবেনি। এবার একজন সঙ্গী নিয়ে যাবে। গণেশ মণ্ডলের ছোট ছেলে সবুরকেই সাথী করে বেদের বড়ো ইচ্ছে। সবুর বেদের বড়ো এক ভক্ত। বয়সে ওর থেকে অনেক ছোট। ছোট হলেও খুব তেজী। বনের কোলের ছেলেপুলেরা যেন আপনা থেকেই তেজী হয়ে ওঠে। কিন্তু তার জন্য বেদের ওর প্রতি এতো টান না। সবুর ভাটিয়ালি গান বড্ড ভালবাসে। শুধু ভালবাসে না, বেদের কাছ থেকে শিখেও নিতে চায়। তাই দুজনের কোথাও একত্রে যাবার কথা উঠলেই দুজনারই আনন্দ আর ধরে না। তার উপর ডিঙিতে যাবার কথা উঠতেই ওরা তো উৎফুল্ল। তাই ডিঙিতে কলকাতা যাবার সুবিধা-অসুবিধার কথা মনে আসতে থাকে বা কথাবার্তাও ওঠে।

ওদিকে মায়েরও উৎফুল্ল হয়ে ওঠার যেন সীমা নেই। তাঁর মনে একটা কথাই—বেদে যাচ্ছে বিলাসবাবুর কাছে বন্দুক ফিরিয়ে দিতে। ফাঁকতালে পরের জিনিস আত্মসাৎ করার চাপা বিবেক দংশনের অন্ত ছিলো না। সেকেলে মায়ের মনে এ এক মহাপাপ বলে মনে হতো। এবার বেদে নিজেই যাবার কথা পাড়াতে মায়ের মন থেকে বুঝি এক মহা বোঝা নেমে গেলো। মা জীবনে রেলগাড়ি চড়েননি। বেদে রেলে যাবে, না ডিঙিতে যাবে তা নিয়ে ওঁর মাথাব্যথা ছিলো না। বেদে বিলাসবাবুর কাছে যাচ্ছে, তাতেই মা আনন্দিত।

শীতকাল। ফসল ঘরে উঠে গেছে। এখন কারও এদিক-ওদিক যাবার বাধা নেই। সবুর তো ডিঙি গোছাতে মত্ত। ডিঙিতে বাখারি বেঁধে প্রায় অর্ধেকটা পাটাতন করাই আছে। শুধু ছইটাই যা করে নিতে হবে। বনের সীমানায় পড়ার আগেই দুগ্যোদেয়ানির মুখে এক ঝাঁক বেটে গোলগাছ ছড়িয়ে দেখা দিয়েছে। এতো ছোটো যে তাতে ঘরের ছাউনি হবার মতো নয় বলে কেউ এযাবৎ কেটে নেয়নি। সবুর সেই ঝাঁক থেকে কিছু পাতা এনে আর সুন্দরী বল্লা ও বাখারি চেঁছে নিয়ে ছিমছাম ছই বানিয়ে ফেললো দেখতে না দেখতে। এখন তো বর্ষাকাল না, বৃষ্টির ভাবনা নেই। শুধু পথে ভাত ফুটিয়ে নেবার একটু আড়াল, আর গভীর রাতে নীয়ের বা হিম এড়াবার জন্যই সামান্য ছাউনি হলেই হবে।

টুকটাক জিনিস যা নিতে হবে বেদে ও সবুর দুজনে তড়িঘড়ি গুছিয়ে নেয়, নেবেই বা কি আর। সবুরকে তড়িঘড়ির কথা বলাই বাহুল্য। ওর নামটাই চালু হয়েছে—চলাফেরায়, কাজকর্মে ওর ব্যস্ততার জন্য। সবাই ওকে সর্বদাই 'সবুর' 'সবুর' করে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। নামটা ভাটি-বাঙলার মুসলমানী নাম হলেও এটা যেন ওর সহজাত নাম। এদেশের হিন্দু ও মুসলমান এমন একাত্মা হয়ে মিশে থাকে যে এই ঘটনা মোটেই বিরল নয়—বিশেষ করে মেয়েদের নামের বেলায় তো নয়ই।

ডিঙিখানি, না এখন আর ডিঙি বলা ঠিক উচিত নয়, এখন ছইওয়ালা পানসী বলা যেতে পারে। পানসীখানি জলের কিনারায় পোতা লগিতে বাঁধা। বেদে চরের কাদায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখছে—সবই তো এসেছে, চোঙায় লবণ, হলুদ, তেল, সবই তো ছইয়ের গায়ে

ঝুলছে। কাঁথা ও বালিশও এসেছে। মায় দুটো মাদুরও এসে গেছে।

বেদে হঠাৎ বলে ওঠে—আরে ব্যস্তবাগীশ ! সব তো এনেছিস, আমার জিনিসটাই তো আনিস নি !

—তোমার জিনিসটা কী ? বন্দুকটা !

—না, না, তা হবে কেন ? আমি কি বনে যাচ্ছি ? যা, যা, শীগ্‌গীর নোড়া। আমার হর্‌চি, টিপ্‌লি আর সুতোর বল্‌টা। সবই দাওয়ার কোণে আছে। যা।

—ও দিয়ে কী হবে ? কলকাতায় যাবে আবার জালও বুনবে ?

—যা না তুই।

সবুর চরের উপর দিয়ে ভক্‌ভক্‌ শব্দে ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মা-কেও নিয়ে এসেছে। ঠিক নিয়ে আসেনি, মা নিজেই তখন আসছিলেন। এসেই তবনের ছোট্ট আঁচলে মাথার চুল ঢেকে কোণাটা ওপাশে দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছেন। দুগ্যোদোয়ানি নদীর কূলে তখন ভোরের বাতাস। সে-বাতাসে নদীর বুকও যেমন ঝিরঝিরে দোলায় দুলে উঠেছে, তেমনি মায়ের দোপরতা বেড় দেওয়া তবনেও ঢেউ উঠেছে।

মায়ের কাছে এগিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বেদে ডিঙিতে উঠতেই সবুর চিৎকারে যেন মা-কে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো,—'বদর ! বদর !'

বেদে যেন মমতাভরে বলে উঠলো,—কেন. তোর বুঝি আর দেরি সয় না। দাঁড়া, যাত্রামন্ত্রের পুরো বয়ানটা বলে নিই :

> 'বদরের পায়ে দিয়ে ফুল।
> বেয়ে ওঠো নদীর কূল ॥
> মুখে বলো হরি হরি।
> গুরু আছেন কাণ্ডারি ॥
> লাও ভাই বদরের নাম।
> গাজী আছে লেখাপান ॥
> [illegible]য়ায় পাঁচ পীর।
> গাজী বদর বদর ॥'

বলেই বেদে দু-হাতের কোশে নদীর জল তুলে ছিটিয়ে দিলো ডিঙির গলুইতে, নিজের মাথায় আর সবুরের মাথায়। মন্ত্রপূত জলে যেন সকল বিপদকে আড়াল দিল। সঙ্গে সঙ্গেই লগি টেনে তুলে ধরে সেই হাতেই মা-কে দূর থেকে আবারও প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলো বিদ্যাধরীর স্রোতের টানে !

চার

বিদ্যাধরী। ভাগীরথীর পূর্বপারে ভাটি অঞ্চলের মানুষের কাছে আজ বিদ্যাধরী যেন বৃদ্ধা মায়ের মতো। মায়ের কাছে ঋণের কি কোনও সীমা-পরিসীমা আছে ! দু'হাজার বছরের ইতিহাসে যেটুকু জানা গেছে, তাতে বলা যায়, একদা দুর্দান্ত এই জলস্রোত গঙ্গার পলিমাটি বহন করে আপন মমতায় পলির প্রলেপ দিয়ে দিয়ে এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর সৃষ্টি করে নিজে এখন শীর্ণ কায়া। এই বিদ্যাধরীর কূলে অতীতে দু-হাজারও বেশি বছর পূর্বে গঙ্গারিডির মতো সমৃদ্ধ নগর বিরাজ করতো ; পলিস্তরের গভীর পরতে পরতে তার হাজার নজির মিলছে

এখন। পাঠান আমল তো সেদিনের কথা, সে যুগের কত কীর্তি চিহ্ন আজও যে ছড়িয়ে আছে এই বিদ্যাধরীর কূলেই।

বৃদ্ধা মা-কে মানুষ কিন্তু আজও ছেড়ে চলে যায়নি। মায়ের বুকের শীর্ণ জলধারাকে কোনোমতে নানা কলাকৌশলে বাঁচিয়ে রেখে তারই কূলে কূলে বসতি, বাজার ও গঞ্জের স্পন্দন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে যেন মেতে আছে। কুলটি, ভূষিঘাটা, হাটগাছিয়া, হাড়োয়া, কালিনগর, ন্যাজাট, সন্দেশখালি, রামপুরহাট, চুনাখালি, আর তারপরই রাঙাবেলিয়া ও গোসাবার পাশ কাটিয়ে বাঘের রাজ্য। বাঘের রাজ্যে এসে আজও বিদ্যাধরী যেন তার তেজময়ী রূপ বজায় রেখেছে। তেজী বাঘের চারণভূমি সুন্দরবনকে তেজী রাখতে তেজী স্রোতধারার যে একান্ত আবশ্যক।

দুগ্যোদোয়ানি বেঁকে এসে বিদ্যাধরীতে পড়েছে। সেই ত্রিমোহানায় উজান ঠেলে ওদের পানসী উত্তরমুখী বিদ্যাধরীর জোয়ারের টানে এবার পড়েছে। সাঁ সাঁ করে এগিয়ে চলেছে। বেলা সাড়ে আটটা বাজে। আজ দ্বিতীয়া, কাজেই নদীতে ইতিমধ্যে জো'র টান বেশ ধরেছে। ডিঙি দ্রুত এগুলেও বেদে সবুরকে বলে,—কি রে ? চুপ করে বসে আছিস কেন, পালটা টাঙানা। দেখবি কেমন বেগে ছুটবে। লঞ্চের চেয়েও বেশি জোরে।

—তোমার বুঝি দেরি সহ্য হচ্ছে না ! দাঁড়াও না, রাঙাবেলিয়া পার হতে দাও না !

—কেন, তুই বুঝি রাঙাবেলিয়ার মায়া ছাড়াতে পাচ্ছিস না।

—না, না, তুমি কিছু জানো না। দিদি বলেছিলো, সেই গোমর নদীর কূল থেকে সাতজেলে ছুটে পার হয়ে রাঙাবেলিয়া এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবে। দ্যাখো না, ও নিশ্চয় এখনই এসে যাবে।

—দিদিটা কে রে ?

—না, উনি জানেন না ! মাধুরীদি ! দিদির কলকাতা দেখার কি সখ ! হ্যামিল্টন স্কুলে পড়ে কিনা, কলকাতার কথা পড়ে পড়ে কলকাতা দেখার জন্য কি যে কান্নাকাটি করে তা বলার নয়।

—তা, ওকে তুই সঙ্গে নিয়ে এলি পাত্তিস্।

—পাগল নাকি, তাহলে ওর পিঠে কি ছাল থাকতো ! এক ক্রোস পথ হেঁটে গিয়ে স্কুলে পড়ে তা-ই মা ও বাবা সহ্যই করতে পারে না। আর কলকাতা ! তাও আবার আমার ও তোমার সঙ্গে !!

রাঙাবেলিয়ার ঘাটগুলি এসে গেছে দেখে সবুর বলে,—তা বাউলেদা, ওপার দিয়ে চলো না।

—বললেই কি যাওয়া যায়। এখন সবে জো। ভাটির শিরা এখনও ওপার বয়ে গেছে নিশ্চয়। দেখি কতটা যাওয়া যায়। তুই পালটা মেরামত কর।

পালের মাস্তুলটা গুরোর ফোকরে বসাতে বসাতে সবুর দেখতে পায়, দিদি যেন সামনের ঘাটে এসেছে। মাঝনদী থেকে ঘাট অনেক দূর। তাহলেও স্পষ্ট বোঝামাত্র চিৎকার করে ওঠে,—দি-দি, আমরা চললাম। দি—দি, দি—দি......

নদীতে দূরের লোকের সঙ্গে কথা ভেঙে-ভেঙে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারতে হয়। দিদি তো এতো সবে অভ্যস্ত নয়, কি যে সে বললো কিছুই বোঝা যায় না। বাউলে তো হাতের বোঠে শূন্যে তুলে দোলায়। সবুরও আনন্দে হাতের হলদে-পানা পালখানা বাতাসে দোলাতে থাকে।

ডিঙি তর্তর করে এগিয়ে যায়। মাধুরী এবার আড়ালে পড়ে গেছে। বাউলে বলে ওঠে,—সবুর, নে এবার তড়িঘড়ি পালটা টাঙা। আর মোটেই দেরি করিস না।

ডিঙি পালের হাওয়ায় মেতে উঠেছে। কল্‌-কল্‌ শব্দে যেন কথা বলে উঠেছে। বাউলে গুরোয় জড়ানো পালের দড়ি তার পায়ের বুড়ো আঙুলে আটকে নিয়েছে ; আর বাঁ হাতের চাপে বোঠে গলুইতে চেপে ধরে ডান হাতে হাল ঘোরায়। ডিঙি নৌকো, ঠিকমতো শক্ত হাতে হাল না ধরলে কখন যে হেলিয়ে পালের নৌকো জলের তলে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। বাতাসের তেমন দাপটি এখন না থাকলেও, সাবধানের তো মার নেই।

সবুরের কোনও কাজ নেই বললেই চলে। ঘোড়ায় চড়ার মতো গলুই-এর দুপাশে পা ছড়িয়ে বসেছে। যেন ঘোড়ায় চেপে কলকাতা পাড়ি দেবে। ফুরফুরে বাতাসে সবুর গুনগুন করে ওঠে।

বাউলেও আর থেমে থাকতে পারে না। প্রাণখোলা সুরে ভাটিয়ালি গেয়ে ওঠে :

'ও বিদেশী বন্ধু...'

ঝমাং করে সবুর যেন বাউলেকে থামিয়ে দেয়,—আঃ তুমি কি গো বাউলেদা !!

—কেন কি বলতে চাস ?

—কি আর বলবো। একটু আগে তুমি এই গান গাইতে পারতে না ? মাধুরীদি কি ভালবাসে না এই গানটি ! জানো সে-বার গোসাবার রবিঠাকুরের মাঠের জলসায় পরপর দুদিন এই গানটি তুমি গেয়েছিলে। তখন সেই সুর দিদি ধরে নেয় তোমার গলা থেকে। আর তখন থেকে যখনই একলা ঘোরাফেরা করে তখনই গুনগুন সুরে এই গান ওর মুখে। গাও, গাও, এখনও দিদি শুনলেও শুনতে পারে। গাও, গলা ছেড়ে গাও।

গলায় খাঁকার দিয়ে বাউলে আরও চড়া ভাটিয়ালির টানে গেয়ে ওঠে :

'ও বিদেশী বন্ধু !
তুমি রোজ বিকালে
গাঙের কূলে
রোজ বেয়ে যাও তরী।

আমি একলা ঘাটে
বসে যে ভাবি
ভাসায়ে গাগরী।
রোজ বেয়ে যাও তরী।

ভাটির টানের সাথে
ও তোর ভাটিয়াল সুরে
চোখের কাজল যায় ধুয়ে মোর
নয়ন আমার ঝরে।
বন্ধু ! নয়ন আমার ঝরে।

তুই যদি গাঙ হোস বন্ধু
আমি তাইতে ডুবে মরি,
বন্ধু ভাসায়ে গাগরী।
ও বিদেশী বন্ধু !'

দরাজ গলায় ভাটিয়ালির সুর বুঝি সবুরের মনেও ঢেউ তোলে। এ ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ

নয়, কুলকুলও নয়। নদীর বুকের জল অনেকখানি নিজেকে টেনে নিয়ে যেন তুঙ্গে ওঠে। কিন্তু তুঙ্গে উঠেও সেই দোলায়িত জল কলরবে ভেঙে পড়ে না। আবার নিচে নামার মোলায়েম টানের পরক্ষণই উর্ধ্বমুখী হয়ে তুঙ্গে ওঠে। মনের আবেগকে যেন ভাটিয়ালি সুর একইভাবে ছন্দায়িত দোলায় দুলিয়ে দেয়।

গান দীর্ঘায়িত করার বাসনায় বাউলে যেন পঙ্‌ক্তিগুলি বারবার তিনবার করে গাইলো। বাতাসে বিক্ষুব্ধ বিস্তীর্ণ নদীর বুকে ভাটিয়ালি সুর এমনভাবে নাড়া দেয় তা বলার নয়। সবুরের তাগিদের অপেক্ষা না রেখে বাউলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটা গান গেয়ে উঠলো।

সে-গান শেষ হতেই বাউলে এক সময়ে মোলায়েম ভাবে ধরা-গলায় বললো,—সবুর সোনা ! জানিস আমরা কতদূর এসে গেছি ? ঐ দ্যাখ, দূরে দেখা যায় আমতলী নদীর তেমোহানা। তার মানে চুনাখালি অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম পশ্চিম পারে রামপুর হাটে একবার ডিঙি ভেড়াবো ! ভুলেই গিয়েছিলাম রামপুর হাট বসে তো সোম ও শুক্কুর। আজ তো রোববার। তাই চল্ সোজা সন্দেশখালি গিয়ে ডিঙি লাগাবো। যেতে যেতে জো' শেষ হয়ে যাবে, ভাটিটা ওখানেই কাটিয়ে নেবো।

—বাউলেদা, তাই করো। ভালই হবে, আজ তো রোববার সন্দেশখালির হাট আজই তো। তাই না ?

—তোর দেখি সব খবর জানা আছে। তা অতো ভাবছিস কি ?

—বাউলেদা ভাববো আর কি ! ভাবছিলাম দিদির কথা। মনে ভারি হাসি পাচ্ছিলো। দিদি বলে কি, তোমার চেহারাটা কাপালিক সাধুর মতো। তাইতেই তো, তোমাকে দেখে বাঘও ঘাবড়ে যায়।

—ধ্যুৎ, বাঘ আবার ঘাবড়ে যায় কখনও। ও-জীব সে-জীব না। রাখ্ ও-সব কথা। কদমতলী নদী ছাড়িয়ে বিদ্যা নদীর দু-বাক যেতে না যেতেই আমরা এসে যাবো রায়মঙ্গল নদীর মোহানা, এটাও তেমোনা।

—রায়মঙ্গল ! রায়মঙ্গল তো কালোপানির নদী ! তাই না বাউলেদা ?

—হ্যাঁ, কালোপানির নদীই। ভাবি গাঙ। জো'র তোড়ও বড্ড বেশি। তেমোহানার মুখে বড্ড ঘোলা। বিদ্যার জল আর রায়মঙ্গলের জল মিশে তোলপাড় করতে থাকে যেন। জলে ঘূর্ণি ওঠে বারবার। তাইতেই তো পশ্চিম পার ঘেঁষে হাল ধরেছি। ঘোলার ফেরে যাতে না পড়ি।

—বাউলেদা, ঠিক ধরেছো ! মোহানা পেরিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলেই হবে। তারপর নলছ্যাঁও দিয়ে ওপারে সন্দেশখালি যাওয়াই নিরাপদ। তাই চলো।

—তুই দেখি ওস্তাদ নেয়ের মতো কথা বলছিস।

ওদের পানসীখানা এখন খুবই কূল ঘেঁষে চলেছে। কূলে হরকোচা গাছের ঝাড় মাথা নুইয়ে গাঙের জলে ঝুঁকে পড়েছে। ঝাড় ছাড়ালেই উপরে ভেড়ি। মেছো-ঘেরির ভেড়ি।

হঠাৎ বাউলে চিৎকারে দাবড়ি দিয়ে ওঠে,—সবুর ! করছিস কি, এখনও জলে পা ঝুলিয়ে ! তুরন তোল ! পা উপরে তোল। তোল বলছি !

—কেন অমন করছো !

—করবো না ! দ্যাখ, ঐ ওদিকে দ্যাখ। কতো বড়ো একটা সাপ হরকোচা ঝাড়ের ফাঁকে ঢুকবার চেষ্টা করছে।

বোঠেখানা লাঠির মতো উঁচিয়ে ধরে বাউলে বলে,—জানিস, ওটা কি সাপ ? দাঁড়াস সাপ। ওরা গরুর পা জড়িয়ে ধরে বাঁট থেকে দুধ খেয়ে যায়।

—আমি কি গরু !

—তা না ; তোর জল-ছোয়া পা পেলেই ঝমাৎ করে পা বেয়েই ডিঙিতে উঠে পড়তে দেরি করতো না। তখন ডিঙি থেকে ওকে জলে ফেলা এক দায়।

—বাউলেদা, তুমি ওদিকে নজর দিলে কি করে ?

—আমি কি সাপ দেখছিলাম ? দেখছিলাম কুমির। বাঁ-পারে জানিস শুধু ভেড়ি আর ভেড়ি। মাছের ভেড়ি। মাছের তল্লাসে কুমির নদী থেকে ভরা কোটালে উঠে উঠে যায় ভেড়িতে। ভাবছিলাম, আমাদের পরে কোনও হামলা না করে।

সবুরের মেছো কুমির নিয়ে তেমন উৎকণ্ঠা আছে বলে মনে হয় না। যতো উৎকণ্ঠা ওর সাপ নিয়েই। সাপের কিলবিল করে চলা দেখলেই ওর গোটা শরীরটা কেমন যেন তিড়বিড় করে ওঠে।

পা দুটো তাড়াতাড়ি তুলে গোটো হয়ে বসে বলে,—আচ্ছা বাউলেদা, তুমি তো বাঘের বাউলে, তুমি কেন সাপের মন্তর শিখলে না ?

—সাপের ? হবে, পরে সে কথা হবে। আগে সন্দেশখালি পৌঁছে নি তো। জো' তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। ধর বোঠে, খোচ্ মার। এখান থেকে নলছ্যাঁও দিলে সন্দেশখালি হাটের ঘাটে গিয়ে ঠিক উঠবো। কই ? ধরেছিস ?

উঠতি বয়সে কোনও কাজের মত কাজ পেলে কি রক্ষে আছে। সবুর ঝমাৎ করে বোঠের খোঁচ মারতে শুরু করেছে। বাউলেও পায়ের আঙুলে আটকানো পালের দড়ি ছেড়ে দেয়। পালখানা মাত্র পৎপৎ করে বেখাপ্পা হাওয়ায় দুলছে। সবুরের খোলা পাল ভালো লাগে না। এক লহমায় বোঠে ছেড়ে পাল গুটিয়ে মাস্তুল নামিয়ে রাখে।

কোণাকুণি পার হয়ে ওরা ঠিকই সন্দেশখালি হাটে এসে ভিড়েছে। এবার ওদের দুজনের বেড়ানো আর টুকটাক বাজার করা ; তারপর রান্না-বান্না সেরে রাতের সুজনের জন্য অপেক্ষা করা।

সন্দেশখালি হাট লোকে লোকারণ্য। লোকের থেকে নৌকাই বেশি বোধহয়। দুই বড় নদীর ত্রিমোহানা। নৌকো সব এসেছে এবং আরও আসছে দুই নদী বেয়ে। কতো রকমারি মালে বোঝাই সব। কেউ এসেছে বনের সম্পদ—কাঠ, পাতা, মধু ও মাছ নিয়ে, কেউ আবার এসেছে বাঙলাদেশের নানা সম্পদ নিয়ে রায়মঙ্গল নদীর স্রোতের টানে। এদের মধ্যে হয়ত অনেকে এসেছে বিদেশী চোরাগোপ্তা মাল বোঝাই করে। আবার হয়ত মেদেনিপুর থেকে মাতলা নদী পথে এসে চলেছে বিদ্যাধরী ধরে খাস্ কলকাতায়। তাদের মধ্যে হাড়ি-কলসী আর খড়কুটোর নৌকোই বেশি।

ভাতেভাত আর চিংড়ীভাজা—বনেবাদাড়ে এ তো রাজভোগ। পেটপুরে খেয়ে দুজনে বিশ্রাম নিচ্ছে। এমন সময়ে দ্যাখে, ব্যাপারী নৌকোগুলি একে-একে রাতের জোয়ারে ভাসিয়ে দিচ্ছে। সবুর আর থাকতে পারে না। বলে,—বাউলেদা, আর ঢিলে দিয়ে কি লাভ। চলো আমরাও রওনা দিই। দল বেঁধে যাবো। ভয় পেয়ে দেরি করি কেন ?

—ভয়ের কথা তোর মনে এলো কেন ? ডাকাতির ভয় ? ছ্যাচড়া ডাকাতি বিদ্যাধরীর কূলে হয় না, আমাদের ওসব নিয়ে ভাববার কিছু নেই।···তবে আমরা পুরো জো'টা কাজে লাগাতে পারবো না। ন্যাজাট আর তিন-পো জো'র পথ। ন্যাজাটের পর শেষ সিকি জো'তে এগিয়ে বিশ্রাম নেবার মতো বড় হাট-বাজার পাবো না। তাই ভাবছি, চল যাই ব্যাপারীদের সঙ্গেই চলে যাই ন্যাজাট পর্যন্ত। সেখানেই সময় কাটিয়ে পরের জো' ধরবো দুপুর গড়ালে।

পাঁচ

ন্যাজাটকেই বোধহয় সুন্দরবনাঞ্চলের শেষ উত্তর সীমা বলা যায়। সুন্দরবনের পরিবেশ, সুন্দরবনের গন্ধ, সুন্দরবনের ছায়া যেন এই অঞ্চল থেকেই বিলুপ্ত। সুন্দরবন থেকে সোজা উত্তরমুখী হয়ে বিদ্যাধরী এখানে এসেই পশ্চিমে বাঁক নিয়ে সোজা চলে গেছে সুদূর বেলেঘাটা অঞ্চলে—কলকাতার শহর সভ্যতার আওতায়। বিদ্যাধরীই যেন এই সীমানা টেনে দিয়েছে।

ন্যাজাটে এলেই যেন শহর-সভ্যতার ব্যস্ততা ও কর্মযজ্ঞের উন্মত্ততা অনুভূত হতে সময় লাগে না। ফলে সুন্দরবনের ভয়হীন বেপরোয়া কিশোর সবুর এখানে কেমন যেন স্তিমিত হয়ে গেছে। হাজার চেষ্টা করেও বাউলে যেন সহসা এই শিশুর সহজ সবল উম্মাদনা ফিরিয়ে আনতে পারে না।

এরপরে ওরা একটানা সেই জো'তেই হাড়োয়া আসে। রাতে হাড়োয়া কাটিয়ে শেষরাতের জো'তে কলকাতার দিকে এগিয়ে যাবে। এতক্ষণ ওরা পশ্চিমমুখে মালঞ্চ ও হাড়োয়া নদী ধরেই এগিয়েছে। ভিন্ন নাম দিলেও এসব নদীও বিদ্যাধরী, তবে এগুলি স্থানীয় নাম মাত্র। এবার ওরা শীঘ্রই উত্তর-পশ্চিমমুখী ভাঙ্গুর খাল এবং শেষমেশ কেষ্টপুর খাল ধরে এগিয়ে খোদ কলকাতায় এসে পড়বে।

হাড়োয়াতেও ন্যাজাটের পরিবেশ। কলকাতার গন্ধ আরও ঘন হয়ে এসেছে। এখানে রাতে দূরদিগন্তের আকাশে আলোর ছটা বলে দেবে যে তোমরা কলকাতার কাছেই এসে গেছো। মাঝে মাঝে খালের দুপাশে শুধু মাছের ভেড়ি আর ছোট ছোট গ্রামের গাছ-গাছড়া। এই গোটা অঞ্চলেই জলধারার শাখা-উপশাখা যেমন বিদ্যাধরীর, আর এর মাটিরও ধাত্রী তেমনি বিদ্যাধরী। কলকাতার যান্ত্রিক সভ্যতা আজ কোথাও মাটি কেটে, কোথাও বাঁধ বেঁধে, কোথাও খাল কেটে, কোথাও বা মাটি ভরাট করে ক্রমে ক্রমে সুন্দরবনের দিকে বাহু বিস্তার করে চলেছে।

ওদের ডিঙি এখন বাঙ্গুর খালের মধ্যে। হঠাৎ এক ঘটনা ওদের মনকে টেনে নিল সুন্দরবনের দিকে। দ্যাখে, ভোরসকালেই একজনকে খোলা পাটাতনে শুইয়ে এক ডিঙি চলেছে কলকাতার দিকে। জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পেলো, শেষরাতেই লোকটাকে কাল-সাপে কেটেছে। জনাদশেক জোর দাঁড়-বোঠে বেয়ে সাঁ সাঁ করে চলেছে, কলকাতার হাসপাতালে যদি বাঁচানো যায়। যেন ওরা তীরের বেগে চলেছে। সেদিকে সবুর সামনের বাঁকের মাথা অবধি এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো। বাঁকের মাথায় ওরা মিলিয়ে গেলে মন-মরা মুখ নিয়ে আজও আবার বাউলেদাকে প্রশ্ন করে, —আচ্ছা বাউলেদা, তুমি বাঘের বাউলে, কিন্তু সাপের বাউলে হলে না কেন?

উত্তরে বাউলে তার ছোটবেলার এক দীর্ঘ কাহিনী পাড়ে। কাহিনী দীর্ঘতর করে যায় ছেলেমানুষের মনকে চাঙ্গা করার মানসে। শোন তবে :

শপাং শপাং......বেতের বাড়ি, যাকে বলে কষাঘাত! কি যে মার খেয়েছি একদিন ছেলেবেলায়! পিঠের ছাল উঠে যাবার মতো।

আমার আদি বাড়ি ছিলো কোথায় জানিস! সেই বড়দলের কাছে। দেশ-বিদেশে যার খ্যাতি—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাড়ির কাছাকাছি। তাঁর ভাইপো—যামিনীবাবু। জানিস্ তাঁর মতো সাপের ওঝা এই গেরদে আর কেউ ছিলো না। সুন্দরবনের বাদা ও আবাদে ক'জনকে আর বাঘে খায়! তার চেয়ে সাপে কাটে ঢের বেশি মানুষ। তাই যামিনীবাবুর নাম-ডাক

ছিল সকলের কাছে ও সর্বত্র। মানুষটির সাধুর মতো চলাফেরা। বিয়ে-থা করেননি। পরনে ধুতি, গায়ে কোনো জামা নেই। কোঁচার খুঁটই গা ঢাকার কাজ মেটাতো। মুখে দাড়ি আর খালি পা। এই মানুষ সুন্দরবনে আইরাজের মতো ভয়াল বিষধর সাপ সব ঝমাঝম ধরে ধরে বিষ ঝেড়ে ঝাঁপিতে পুরতেন।

এমন মানুষকে ভক্তি না করে কি উপায় ছিলো। কতো মানুষ যে তাঁর হাতে সাপে কাটা থেকে বেঁচে গেছে তার হিসেব নেই। ছেলেবেলায় তাঁর মত একজন ওঝা হবার ভারি বাসনা হয় আমার। হলে কি হবে, তাঁর দ্বারস্থ হবার উপায় ছিলো না। দেখেছি, তেমন ইচ্ছে নিয়ে কেউ এলে এই মানুষ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো। এমনিতে খুব হাসিখুশি। কিন্তু সাপের কথা উঠলে তাঁর মুখ হয়ে যায় গম্ভীর। কে তখন তাঁর কাছে এগুবে!

শেষমেশ, এক বেদে সাধু পথের ধারে এক গাছতলায় এসে হাজির। সেখানেই আগুন জ্বেলে রাত কাটাবার মতলব। তার ঝাঁপিতে কয়েকটা সাপও ছিলো। আমার পাঠশালায় যাবার পথেই পড়ে তার গাছতলা। একদিন তাকে ও তার ঝাঁপিগুলো দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে যাই। মনের খুশিতে তাকে দু-আনা পয়সা দিয়ে ফেলি। সেই হলো কাল। সাধু তো আগে বেড়ে প্রশ্ন করলো,—খোকা, সাপের মন্তর শিখবে? যদি শিখতে চাও তাহলে রোজ আমাকে কিছু দিও।

কি করে সাধু-ওঝা আমার মনের কথা জানলো জানি না। আমি আশায় আশায় আমার পাঠশালার খাবার পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রোজ সাধুকে এক-আনা বা দু-আনা দিতাম। বাড়িতে দাদা বাবাকে কিচ্ছু বলিনি। আমি রোজই পয়সা দিয়ে চলি। আমার জন্য সাধু তো কেমন যেন ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এলেই মুখরা হয়ে কত যে এটা-সেটা প্রশ্ন করে তার ঠিক নেই। কিন্তু কিছুতেই সাপের মন্তরের কথা পাড়ে না।

একদিন তো হঠাৎ বলে বসে,—খোকা, আমি চলে যাবো। আমার যেতেই হবে। ডাক এসেছে। কামাখ্যা তীর্থে যাবো। তোমার কাছে যা পয়সা আছে সবই দিয়ে দাও, তোমার মঙ্গল হবে।

—কিসের ছাই মঙ্গল হবে! কৈ, তুমি আমাকে সাপের মন্তর শেখাবে বলোনি?

—আচ্ছা দাঁড়াও, শেখাচ্ছি, শেখাচ্ছি—বলেই ঝাঁপি থেকে একটা সাপ বের করে বিড়বিড় করে কি সব বললো। বলেই সাপটাকে আবার ঝাঁপিতে রেখে দিয়ে বললো,—নাও, লিখে নাও।

আমি তাড়াতাড়ি স্লেট-পেনসিল বের করেছি দেখেই ওঝা বলে,—না, না, ওতে হবে না। ওতে কি সাপের মন্তর লেখা যায়! কলাপাতা নিয়ে এসো আর ঐ ছোটো খেজুরগাছের একটা কাঁটা। কলাপাতার উল্টোদিকে খেজুরের কাঁটা দিয়ে লিখতে হবে। দেখো যেন, আড়াআড়ি লিখো না, না-হলে পাতাই কলা ফেঁড়ে যাবে। লেখো—

"কেঁচো ধরো, কুঁচে ধরো;
ওস্তাদের নাম জাহির করো,
শালা কেউটে ধরেছো কি মরেছো।"

আরও লেখো:

"এই বলেই পিঠেই তিন চাপড়,
ভাণ্ডারের বিষ আপছে নেমে আসবে।"

পরে বাড়ি গিয়ে লালকালি আর খাগের কলমে ওঝার এই মন্তর বেলে কাগজে লিখে

নিবি। খবরদার! সেই কালি ও কলমে আর কোনও কিচ্ছু লিখবি না। তাহলে কিন্তু সব মন্তরই ফস্-মন্তর, কোনও কাজে দেবে না।

আমি তো বাড়ি গিয়ে কাউকে কিচ্ছু বলি না। মাটির সরায় লালকালি আর খাগের কলমও যোগাড় করেছি। একখানা বালি কাগজে মন্তরটা লিখে বারবার পড়ে ভাল করে নাম্তার মতো মুখস্থ করে ফেলি। চলতে ফিরতে বারবার মনে-মনে আউড়ে নেবার বিরাম নেই, পাছে ভুলে যাই। তারপর, দূরে ভাটির চরে নেমে কাদার তলায় মাটির সরাখানা আর খাগের কলমটা বেশ করে চেপে উপরে মাটি লেপটে দিই।

পরদিন বিড়বিড় করে মন্তরটা আওড়াতে আওড়াতে বাড়ির খিড়কি খুলতেই তো থ মেরে গেছি। দেখি, একখানা বেত হাতে বাবা গুম্ মেরে সামনে দাঁড়িয়ে। বাবার সেই কট্‌মটানি চাহনি দেখে আমার আত্মারাম খাঁচা। শুধু একবার হেড়ে গলায় বাবার আওয়াজ এলো—আ-য়।

বাবার বাঁ-হাতে মন্তরের সেই বেলে-কাগজখানা। আমি তো যাবার সময় হাতনের চালায় গুঁজে রেখে গিয়েছিলাম। কেমন করে খুঁজে পেলো? ভাববো কি···, হাতের মুঠোয় লোনাপানির বেত লিক্‌লিকিয়ে উঠেছে······সে কি মার!! বাবার মুখে একবার মাত্র কথা বেরিয়েছিলো—যাবি আর মন্তর শিখতে!···সেই সপাং সপাং মারে তিনদিন বিছানা নিতে হয়েছিলো আমার।

সবুর কিন্তু সপাং সপাং বেতের কষাঘাতের বর্ণনায় নির্বিকার। মন্তরটা নিয়েই তার যতো মাথাব্যথা। বললো,—আচ্ছা বাউলেদা, তুমি মন্তরটা কখনও পরখ করে দেখেছো?

—ধ্যুৎ!···জানিস এতোবড়ো ওঝা যামিনীবাবুর শেষমেশ কি হয়েছিলো? অতো নাম-করা ওঝাকে সাপের কামড়েই মরতে হয়েছিলো। ওসব মন্তর-টন্তর কিচ্ছু না!

ছয়

সাপের গল্প শেষ হতেই সবুর কিছুটা বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। এদিকে দুপুরও গড়িয়ে গেলো প্রায়। কেষ্টপুর টোল অপিস আসতেই বেদে মিষ্টি হেসে বলে,—সাঙাত। চল একটু জোরে বেয়ে চল। আর তো কলকাতা এসে গেছে।

—কি করে বুঝলে এসে গেছে, বাউলেদা?

—দেখছিস না, কতো নৌকো। এই সরু খাড়িতে কতো আর ধরবে! চল পাশ-কাটিয়ে পাশ-কাটিয়ে, আমাদের ছোট্ট ডিঙি, ঠিকই এগিয়ে যাবো। দূরে ঐ দেখছিস 'লালকুঠি'। লালকুঠি ছাড়ালেই কোলাঘাট পৌঁছে যাব। কত রকমারি নৌকো ও ডিঙি সব আটক পড়ে গেছে—মাছের নৌকা, পানের ডিঙি, পাঁঠা-ছাগলের নৌকো, গুড়ের লম্বা ডিঙি, মুরগীর নৌকো—টোল আদায় না অবধি এদের কাউকে ছাড়বে না। আমাদের তো খালি ডিঙি, চল আমরা এগিয়ে যাই। আমাদের মিছেমিছি কেন ঠেকাবে। জানিস্, কোলাঘাট ছাড়িয়েই উল্টাডিঙির কোল ঘেঁষে বেলগাছিয়ার পাকাপুলে পৌঁছে যাব। সেখান থেকেই তো খাস কলকাতা শুরু।

দেখতে দেখতে ওদের ডিঙি সেই পুলের পাশে এসে গেছে। এলে কি হবে, ডিঙি ভেড়াই দায়। ছোটো বড়ো ডিঙি ও নৌকোয় ছয়লাপ। ডাঙা ছুঁতে না পেরে এক বড়

ডিঙির গায়ে ওদের পানসী বেঁধে দিলো। এ-সব কাজে বেদে তো বড়দল থেকেই অভ্যস্ত, মায় গোসাবায়ও এমন জিনিস ঘটে প্রতি হাটবারে।

কলকাতার মাটিতে নেমেই খালের উঁচু পাড় বেড়ে উঠতে উঠতে সবুর আশ্চর্য হয়ে বলে,—কি প্রকাণ্ড ভেড়ি দিয়েছে বাউলেদা ? কতো বড়ো আবাদ এই কলকাতা ?

কলকাতার ভেড়ির ওপর উঠেই নাক ফুলিয়ে ফুলিয়ে বলে,—পাচ্ছ বাউলেদা ?

—কি পাচ্ছি রে ?

—কেন, সুন্দরবনের গন্ধ পাচ্ছো না ?

—ঠিকই বলেছিস, ঐ দ্যাখ খালের পাড়েই সুন্দরী গাছের বল্লার পাহাড়পানা। টিনের চালায় সব সার বেঁধে বসে সুন্দরী বাল্লার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে। ঐ ছালে কি হয় জানিস ? রঙ বানায়, চামড়া ট্যান করার রঙ। কতো কি দেখবি !! শুধু দেখবি কেন, কতো কি শুনবি—কলকাতার পাড়ার নাম শুনবি—বাঘ-বাজার, বাঘমারি, বাঘডোরা, বাঘপোতা, বাঘুইহাটি, হরিণবাড়ি—কলকাতা এক সময়ে যে সুন্দরবনই ছিল।

সুন্দরীগাছের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে, আর বাঘ হরিণের নাম শুনতে সবুরের মনে হতে থাকে, সে সুন্দরবনের আওতাই যেন আছে। বনের ছেলের মনে বুঝি আত্মবিশ্বাস আসে,—না, সে কলকাতায় খেই হারিয়ে বসবে না।

অতো উঁচু ভেড়ি দেখে সবুরের মজাই লাগে। এক দৌড়ে উপরে এসে হাঁপাচ্ছে। হাঁপাবে কি, স্তম্ভিত হয়ে গেছে বেলগাছিয়ার পুলের উপর দিয়ে ট্রাম গড়গড় শব্দে ছুটে আসছে। বোধহয় রেললাইন। একটু ছুটে গিয়ে দেখবার চেষ্টা করে, সত্যি রেললাইন আছে কিনা। দূর থেকে অবাক হয়ে দ্যাখে, সোজা কালো রাস্তায় ট্রামগাড়ি যাচ্ছে গড়গড় করে।

ছুটে যেতেই বাউলে ওকে তাড়া দিয়ে ওঠে,—ছুটবি না, খবরদার ছুটবি না। তোকে ধরে নিয়ে পালাবে।

—কে ধরবে আমাকে ? বাঘ আছে নাকি ?

—বাঘ কেন ? মানুষই তোকে নিয়ে পালাবে।

—মানুষ !!

পদে পদে সবুরকে অবাক হতে হচ্ছে। মানুষের ভীড়, ছুটোছুটি কোলাহল, নানা ধরনের গাড়ির রকম-বেরকম হর্ন ওকে সমানেই আকৃষ্ট করছে। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে আসতেই তো থ মেরে গেছে। মোড়ের মাথায় বলিষ্ঠ ও ছুটন্ত ঘোড়ার উপর নেতাজীর মূর্তি। নেতাজীর কথা ইতিপূর্বে শুনেছে, ইতিহাসের পাতায়ও পড়েছে। ওকে এখন আকৃষ্ট করেছে ঘোড়ার দৃঢ় পদক্ষেপগুলি। অন্য সব কিছু ফেলে সেদিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই।

বেশ কিছুটা সময় কেটে যাবার পর বাউলে সবুরের কাঁধে ঝাঁকা দিয়ে বলে,— চল, চল যাই বাঘবাজারের রাস্তা ধরি। বেশি দেরি করা ঠিক না।

একে ওকে জিজ্ঞাসা করে তো বাগবাজারের রাস্তায় পড়েছে। ভাবে, এবার কাকে ধরি। সবাই যেন হন্নে হয়ে ছুটেছে, কারও বুঝি অন্যের কথায় কান দেবার অবকাশ নেই। একজনের একটু ঢিলেপানা চলা দেখেই তাকে জিজ্ঞাসা করে,—আচ্ছা শুনবেন, বিলাসবাবুর কোন্ বাড়িটা হবে ?

—আপনারা কোত্থেকে আসছেন ? দেখেই মনে হচ্ছে, গ্রামদেশের লোক।

—আমরা ? আমরা সুন্দরবনের লোক।

—তা, কোথায় এসেছেন ?

—এসেছি বাঘবাজারে।

—সোঁদরবনের লোক বাঘের বাজারে !! —ফোঁড়ন কেটেই পাশ কাটায়।

হাঁটতে হাঁটতে বাগবাজার রাস্তার প্রায় শেষ মাথায় এসে গেছে। কতজনকে যে বিলাসবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কোনও হদিশ মেলে না। সহসা সবুর একবার বিরক্ত হয়েই বলে,—আচ্ছা বাউলেদা, তুমি না একদিন বলেছিলে বিলাসবাবুর কি যেন একটা আসল নাম ছিলো ?

—দাঁড়া, সবুর···তুই ঠিকই বলেছিস ! আসল নাম···আসল নাম···অবিনাশ সাহা !!

নতুন উৎসাহ নিয়ে একের পর এক অবিনাশ সাহার খোঁজ করতে থাকে। তবু কোনও হদিশ মেলে না। শেষমেশ এক গলির মুখে বাচ্চা কোলে নিয়ে রকে বসা বুড়ো গোছের একজনকে প্রশ্ন করতেই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খোঁজ নিয়ে বলে,—অতো তো বলতে পারবুনি। তোমরা বরং হাতিবাগানে যাও। সেখানে কাপড়ের দোকান অনেক। কেউ না কেউ বলতে পারবে। একই ব্যবসা তো !

ইঙ্গিত পেয়েই ওরা হাতিবাগানের পথ ধরে। সবুর তো জায়গাটার নাম শুনতেই চমক খায়, হয়তো অনেক হাতি এবার দেখবো। মশগুল হয়ে আছে সেই প্রত্যাশায়। তাছাড়া আরেক ব্যাপারে এক মহা তৃপ্তি এনে দিয়েছে তার মনে। বাউলেদাকে মনে করিয়ে দিয়েছে অবিনাশ সাহার নামটা। বাউলেদা তো তখন হা-হা করে হেসে ওঠে—'শাবাশ্ সবুর ! ভাগ্যি, তোকে সঙ্গে এনেছিলাম। সবুর তখন তবতর করে এগিয়ে চলে, ভুলে যায় আশপাশের বাড়ি ও মানুষ দেখতে।

হাতিবাগানে সামান্য কিছু এ-ঘর ও-ঘর করতেই বড রাস্তার উপরই অবিনাশ সাহার গদি মিলে যায়। বাউলে তো কার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে তা ধরতেই পারে না—মায়ের প্রতি, না সবুরের প্রতি, না কলকাতার মানুষের প্রতি !

বিলাসবাবুকে সামনে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছে বাউলে। বিলাসবাবুও উল্লাসে উৎফুল্ল। একটানা বলে চলেন,—তা কন্তুলে তুমি কোথায় উঠেছো ? আমি তো এখন গদি ছেড়ে যেতে পারবো না। এক মুহূর্ত নজর না রাখলে কি দিয়ে কি হয়ে যাবে। এ যে কলকাতা। তুমি অবশ্য রাত্রে আমার কাছ আসবে, এখানে নয়, আমার বাড়িতে। তখন সব কথা হবে, নিশ্চিত আসবে। এই নাও আমার ঠিকানা, বেশি দূরে নয়। ঐ যে দেখছো গলিটা সেটা ফুঁড়ে যাবে—এই যেমন বাদায় দোয়ানি খাল ফুঁড়ে এ নদী থেকে আরেক নদীতে পড়তে। দোয়ানির অন্য মাথায় আরেক বড় রাস্তা পড়বে। সামনেই একটা বাদার শিষের চেয়েও আরও সরু গলি। সেই গলির মুখেই আমার বাড়ি। এ নাও আমার ঠিকানা। কাগজটা হারিও না কিন্তু।

অতো সাবধানী হতে দেখে বাউলে নিজেও সাবধানী হয়ে ওঠে। বলে,—তা নয় হলো, আমরা আছি আমাদের ডিঙিতে, কেষ্টপুরের খালের মুখে ; সেখানে ফিরতেই হবে। ডিঙিটা যাতে খোওয়া না যায়।

দোকানে সন্ধ্যের খদ্দেরের ভিড়ে কোনমতে ওদের দুজনকে বিদেয় দিয়ে বিলাসবাবু বলেন,—তুমি আসবে, নিশ্চয়ই আসবে, অনেক কথাবার্তা আছে, আসবে।

রাতে ওরা ঠিকমতই এসেছিলো। তখন পাশে বসে অতিথি আপ্যায়ন করলেন নিতান্ত আপনজনের মতো। বড়দলের কতো পুরনো কথা উঠলো। সে-সব গল্প সবুর যেন গো-গ্রাসে গিলে মনের মধ্যে জমিয়ে রাখে। বাউলেদা সম্পর্কে দিদির কত প্রশ্নের জবাব পেয়ে যে কি পরিমাণ আহ্লাদিত হয়, তা বলার নয়। সারাক্ষণ তার মুখখানাকে ভেবাচেকা

করে রেখে সে কিন্তু মনের আহ্লাদকে চাপা দিয়ে রাখে।

সবশেষে বেদে বন্দুকের কথা পাড়ে। যে-কথা পাড়তে বাউলে এতো দূর ঠেঙিয়ে আর এতো আড়ম্বর করে এসেছে। আদ্যোপান্ত সবই সে বলে। বন্দুকের কথায় এলেই মায়ের কথা ওঠে।

—আচ্ছা বাউলে, বন্দুকের কথায় আসছি। আগে বলো মায়ের খবর কি ? ভালো আছেন তো ?

—মায়ের কথা কি আর বলবো। সে কি মা-র কান্না হিংগলগঞ্জে, কিছুতেই তার মন চায় না অন্য কোথাও যেতে। বিলাসবাবুর সঙ্গেই কলকাতায় আসবে।

—আচ্ছা বাউলে, সেদিন অমন নিরুদ্দেশ হলে কি করে ? হাসনাবাদ পৌঁছে দেখি, তোমার ডিঙি নেই। ভাবি, হয়তো কোথাও বাঘের পাল্লায় পড়েছে ? না হয়, গাঙের কুমির টেনে নিয়ে গেলো বা !

—না বিলাসবাবু। তেমন কিছু হয়নি। কেন জানি না, আমার যেন তখন ভূতে পাওয়া অবস্থা। বাদা ফেলে আসতে মন যেন কেমন করে উঠলো। কিছুটা অপেক্ষা করেই ভাটির টানেই ডিঙি ভাসিয়ে দিলাম বাদামুখো। বাদার কোলে আসতেও দেরি হয় না। মা তখন একটু কাৎ হতে গিয়ে বিছানা খুলতেই আপনার বন্দুকটা দেখামাত্র চিৎকার করে ওঠে,—'এ কি করিছিস্ বেদে ! এ কি করিছিস্ !' মা-কে কিছুতেই শান্ত করতে পারি না। কতোবার বললাম, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমার মাথায় তখন পাগল-করা উদ্বেগ—কলকাতা আর বাদা নিয়ে। আমার ভুল হয়ে গেছে। মা কি তাতে শোনেন। শেষে বারবার কথা দেই, আমি নিজে কলকাতায় এসে অতি-অবশ্য বন্দুকটা দিয়ে যাবো। কথা দিলেও মা-র মন কি শোনে !

—না বেদে, তোমার শোনাতে হবে না। মা-কে বলো…

—না, না, তা হয় না। আমি বন্দুকটা সঙ্গে নিয়েই কলকাতা আসছিলাম ; কিন্তু ভেবে দেখলাম, বিপদ হতে পারে, লাইসেন্স তো আমার কাছে নেই। আপনার কলকাতা তো পুলিশের রাজত্ব। হাতে-নাতে ধরা পড়ে শেষে যদি হিতে-বিপরীত হয়। তাই ঠিক করি—না, আপনাকেই গোসাবা নিয়ে যাবো। আপনিই পাশ সঙ্গে নিয়ে বন্দুকটা নিয়ে আসবেন। মা-ও খুব খুশি হবেন। তাই আপনাকে নিতে এসেছি।

—পাশ আমার কাছে এখনও আছে নাকি ! থাকলেও সে পাশ তো পাকিস্তান সরকারের। বড়দলের নদীপথে গুঁতোখালির কথা তো জানোই। রাতের গোনে ওখানে ডাকাতি হবেই হবে। সেই অজুহাতে আর আশাশুনি থানার দারোগার দয়ায় সদর খুলনা থেকে বন্দুকের এই পাশ পাই। সে-পাশ কি এখানে চলবে ? উল্টে ঝামেলায় পড়তে হবে। বন্দুকটা প্রথমেই জমা দিতে হবে। দিতে গেলেই এখানকার পুলিশ কতো কৈফিয়ৎ চাইবে তার ঠিক নেই। কেন এতো দেরি হলো ? কে এতোদিন ব্যবহার করেছে, ইত্যাদি। জবাবদিহি করার অন্ত থাকবে না। এ তো আর আশাশুনির দারোগা নয়। কতো যে মুশকিলে পড়তে হবে—কতো যে টাকা-পয়সা লাগবে তারও হিসেব নেই। কাজেই…না, না। আমি বন্দুক চাই না। তাছাড়া কলকাতায় আমি বন্দুক দিয়ে করবোই বা কি ? না, না,…ও-বন্দুক তুমি তোমার করেই রেখে দাও, আমাকে ঝামেলায় ফেলো না। বুঝলে ! কলকাতায় কি বাদা আছে, বিপদে কোথায় গিয়ে রক্ষা পাবো ? না, না, তুমিই রেখে দাও।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বাউলে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে ঝুলন্ত আলোটার দিকে। সবুর পাশেই ছিলো ; সব কথা নিবিষ্ট মনে শুনছিলো আর বিক্ষিপ্ত হয়ে মনে মনে ছট্ফট্

করছিলো, কেন বাউলেদা রাজি হচ্ছে না, একবার যদি আমার দিকে তাকাতো......

বাউলে অবশেষে আস্তে আস্তে বলে,—তা আমি মা-কে কি বুঝ্ দেবো !...তাই-ই যদি চান তাহলে মা-কে একটা চিরকুট লিখে দিন । তাতে যদি মা-কে শান্ত করতে পারি ।...তাই করুন ।

সবুর আনন্দে মেতে ওঠে । সশব্দে উল্লাস করতে বাধে । হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে বাউলেদার হাতখানা জোরে চেপে ধরেছে ।

মা-কে লেখা বিলাসবাবুর একখানা চিরকুট নিয়ে সে-রাতে ভারি খুশিমনে দুজনে ডিঙিতে ফিরে আসে । পরদিন আর এতোটুকুও দেরি করতে চায় না । হাড়োয়া গাঙে যাতে ভাটির টানে পড়তে পারে দুপুরের মধ্যে রওনা হতে চায় । কেষ্টপুর খালে তেমন ভাটির টান তো মিলবে না । তাই সকাল সকাল ডিঙি ভাসান দিতে হবে ।

যাবার আগে শ্যামবাজার থেকে এটা-ওটা কিনবাব পর সবুর মিনতি করে,—তা বাউলেদা, দিদির জন্য একটা কিছু নেবে না ?

—ঠিক বলেছিস, সবুর ! নোড়া, দিদির জন্য তুই কি নিবি বল্ ?

—আমি কাল সারারাত ধরে ভেবেছি : দিদির জন্য লাল চক্চকে কিছু টিপ নিয়ে যাব । ভারি ভাল লাগবে দিদিকে ! চওড়া কপাল তো, টিপ না হলে ওর মন খচ্খচ্ করে । তা যা হয় কেনা যাবে : কিন্তু বাউলেদা, তুমি কিচ্ছু নেবে না ? একটা কিছু !

—আরে মা-র জন্য একখানা সাদা তবন কিনতেই তফিল তো প্রায় শূন্য । কি কিনি বল তো ?

মুখটা চিন্তা ভারাক্রান্ত করে সবুর বলে,—আমি অনেক ভেবেছি, কিছুই ঠিক করতে পেরে উঠিনি । তা বাউলেদা, তুমি এক কাজ করো না ! তোমার কাছ অনেক গান দিদি তার গলায় ধরে নিয়েছে । মাঝে মধ্যে ফস্ কাগজে তার দু-একটা লিখেও রাখে । তুমি এক কাজ করতে পারো, বেশ ভালো একখানা বাঁধাই খাতা ওর জন্য নিতে পারো । সে-খাতায় দিদি তোমার সব গান তুলে রাখবে ! সব গান ।

—ঠিক, ঠিক বলেছিস—এ কথাগুলো বলতেই বাউলের মুখেও যেন রক্তের আভা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

বাঙলা দেশের সংসারে দশ-এগারো বছরের ভাইরা এক অসাধ্য সাধন করে চলেছে কতো যুগ-যুগ ধরে তা বলার নয় । হয়তো বা সর্বদেশেই, ধনী-গরিব বা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে । ঘটক বৃত্তি অবশ্য এ দেশে খুব পুরোনো প্রথা । তারা আর কতোটা যুবক-যুবতী মিলনের পথ করে দিয়েছে ; যাও বা করেছে তাও পুঁথি, পঞ্জিকা আর ঠিকুজীর জোরে । কিন্তু এ দেশেব দশ-এগারো বছরের ভাইরা কোনো পরিকল্পনা মতো যে এ-কাজ করে তা নয় । যেন তাদের হৃদয়ের তাড়নায় অতি সহজ ও সরল পথে দিদিদের মনের মতো মানুষকে কাছে টেনে নেয় । কোনও যুক্তি দিয়ে নয়, কোনও বিচার দিয়েও নয়—কেমন করে যেন ওরা বুঝে ফেলে কে কার মনের মতো মানুষ ।

সাত

পাউরুটির সঙ্গে গুড় ও কলা মেখে কোনমতো গবগব্ খেয়ে নিয়ে ওরা এবার বাড়িমুখো । কলকাতায় এসেছিল আধুনিক জীবনের তীর্থ দেখতে, শহর-জীবনের চাঞ্চল্যময় লীলাক্ষেত্রের স্পর্শ পেতে । কতোটা কি দেখলো বা কতোটা কি বুঝলো—তা ভাবার এখন

সময় নেই। আপাতত বেলা গড়াবার আগেই হাড়োয়া গাঙের ভাটির টানে পড়তে হবে।

বাদার মানুষের চলাচল নদী ও খালের স্রোত ধরে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ওদের জীবন চালিত হয় না। হয় জোয়ার-ভাটার তালে তালে। সে তাল ওরা কেটে দিতে চায় না, কখনও না। আর পারেও না সে-তাল কেটে বেতালে চলতে।

আপ্রাণ বোঠের খোঁচায় ওরা এসে পড়ে প্রায় সময় মতো। এই টানেই ওরা পৌঁছে যাবে ন্যাজাটে। এবার ওদের বিশ্রাম—মাত্র হাল ধরে থাকলেই হবে। বাউলে সবুরকে বলে,—তুই শুধু এবার হালটা ধরে থাক। কোনও কিছু বাইতে হবে না। আমি এখন গোছল সেরে ভাতটা করে নেবো। দেখিস যদি কোনও মাছের ডিঙি ন্যাজাট-মুখো আসে তাহলে ভাল দেখে মাছ নিতে হবে।—আজ বাউলে দিলদার মনে। পেলে বেশ বড় দেখেই মাছ কিনে ফেলবে।

দুজনেই গোছল সেরে যা রান্নার তা রেঁধে ফেলেছে। কিন্তু এখন খেয়ে নিতে চায় না। ন্যাজাটে পৌঁছে তো ভাটির অপেক্ষা করতেই হবে। আজ ষষ্টি, আবার ভাটির টান ধরবে রাত ন'টা নাগাদ। সে-ভাটিতে যাবে না। রাতে অতোটা পথ ঠেঙিয়ে যেতে চায় না। গরিবের দেশ, কলকাতা থেকে মালপত্র নিয়ে আসছে মনে করে লুঠপাট করতে পারে। কি আর নেবে! তবুও ভুল করে চড়াও হতে পারে। তাই মনস্থ করেছে, ন্যাজাটেই রাতে খাওয়া-দাওয়া করবে আর পরদিন সকালের ভাটি ধরবে। রাত্রে ন্যাজাটে কাটবে ভালো। চারিদিকে বড় বড় ফিসারির অপিস আর আলোয় আলো। অনেক রাত অবধি লোকে গম্‌গম্‌ করে। তাছাড়া আজ আবার ন্যাজাটের হাট।

বাউলে হর্‌চি আর টিপালি নিয়ে আরামে জাল বুনতে বসলো। সুতোর জাল বুনবে কি! তার মনের জালও বুনে চলে। আনন্দে ভাবে, এবার বন্দুকটা তো আমার, বন্দুকটা দুনো কথা বলবে। কেমন করে বাঘে মানুষ খায় দেখে নেবে। আমাদের কারো গায়ে যদি নখের আঁচড় বসায়, তবে তার গায়ের চামড়া খুলে নেবো। না, তাই বলে হঠকারিতা করবো না। বনবিবির জীবের সঙ্গে কোনো হঠকারিতা করতে নেই। যে করেছে সে মরবেই।

সবুর চুপচাপ থাকতে পারে না বেশিক্ষণ। বাউলেদাকে গান গাইবার তাগিদ দেয়। বাউলেও পরপর কয়েকটা গান করে। সবুরও ছাড়ার পাত্র নয়। দুটি গান পরপর কয়েকবার গাইয়ে নিলো। কথাগুলি যেমন মুখস্থ করে নিতে চায়, তেমনি সুরটাও নিজের গলায় তুলে নিতে চায়। বাউলের গানের ব্যাপারে কোনও ঢিলেমি নেই।

সন্ধ্যার দিকে দূর থেকে ন্যাজাটের আলো দেখা যায়। পরপর কতকগুলি ফিসারির হ্যাজাক বাতিগুলো যেন আকাশ আলোকিত করে রেখেছে। কিছুটা নিকটে এলে হাটুরে দোকানিদের কেরোসিনের টেমিগুলি যেন দীপালীর আলোর সারি মনে হবে। আসা-যাওয়ার নৌকো, পানসি ও ডিঙির ভিড়ের মধ্যে ডাইনে-বায়ে ঠেলাঠেলি করে ভাটির চরে রাতের মতো বাউলে লগি পুঁতে দিলো। লগির বাঁধন বেশ ঢিলে করে রাখে। তা না হলে জোয়ারের জল ফুলতে থাকলে দড়ি আটকে ডিঙি জলের তলে যেতে পারে। জোয়ারের হিসেব করেও ঠিকমতো জায়গায় লগি পুঁততে হবে। কেননা, এটা ত্রিমোহানা। বিদ্যাধরী দিয়ে জোয়ারের জল এসে প্রবলভাবে দুদিকে ছুটবে। একটা ধারা যাবে পশ্চিমে কলকাতামুখো মালঞ্চ নদী ধরে। অন্যধারা যাবে পুবে হাসনাবাদমুখো বেতনী নদীর খাড়ি দিয়ে। জোয়ারের স্রোতের টান পুবে না পশ্চিমে সেই বুঝে ডিঙির লগি পুঁততে হবে,—বেশ শক্ত করেই পুঁততে হবে।

বেতনী নদীর খাড়িকে আজ হয়তো অনেকে উপেক্ষা করে, কিন্তু এই সেদিনও

বাঙলাদেশ ভাগ হবার আগে এই খাড়ি গম্‌গম্ করতো। সাতক্ষীরা, খুলনা ও বরিশালের মালবোঝাই নৌকো এই খাড়ি পথেই কলকাতার সোজাপথ তখন ধরতো। সেদিন ন্যাজাট ত্রিমোহানার সোরগোল ছিলো রমরমা—দক্ষিণ থেকে বিদ্যাধরী এনে ঢেলে দিতো সুন্দরবনের সম্ভার, আর পূব থেকে বেতনী আনতো গোটা পূর্ববঙ্গের অঢেল সম্পদ।

এখন কিন্তু এই ত্রিমোহানার বড় আকর্ষণ হলো বড় বড় ফিসারিগুলি আর কিছু ধানচালের কারবার। আর তার চেয়েও বেশি আড়ম্বর দেখা দিয়েছে বোধহয় কলকাতার পণ্য সম্ভারে। কতো কিছু যে পাওয়া যায় তার ইয়ত্তা নেই। মনে হয় এদের আর কলকাতায় না গেলেও চলে।

পরদিন ভোরে উঠে দ্যাখে পিঠেম বাতাস দিয়েছে। কালবিলম্ব না করে শেষ জোয়ারের মরা টান উপেক্ষা করেই পাল তুলে যাত্রা করে। যাত্রা করে সোজা দক্ষিণে। সেই টানে-টানেই ভাটি শুরু হতে না হতে সন্দেশখালি। ডিঙি ভিড়িয়ে কোনমতে কিছু পান-তামাক আর চিড়ে-বাতাসা কিনে আবার ভাটির টানে পড়ে। সাই-সাই করে ওদের পানসী ছুটেছে। স্রোতের টান, পালের টান, ওদের বোঠের টান আর সেই সঙ্গে ওদের মনের টান। লঞ্চও বুঝি ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠবে না। ধামাখালি ছাড়িয়ে তুষখালির রামপুর হাট। নাম-করা হাট, আর তুষখালি অনেক ফিসারিও আছে। তারপর একে একে গাববেড়ে, চুনোখালি, ঝাউখালি, কচুখালি, বেলতলী—এতোগুলো হাট পেরিয়ে যায়। সারাপথ সবুর দিদির কথা ভাবে। ভাবে, কি খুশিই না জানি হবে লাল টিপ আর বাউলেদার দেওয়া গানের খাতা পেয়ে! মাঝে একবার মনে পড়ে নেতাজীর ছুটন্ত ঘোড়ার বলশালী পায়ের গোছাগুলি : ওরাও বুঝি অমনি দুরন্তবেগে ছুটে চলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে বোঠের খোঁচা মারে।

বাউলেও চুপচাপ। কোনোমতে হালের চাপে কাৎ হয়ে দুরন্ত পিঠেম বাতাসের হঠাৎ আসা ধাক্কার পর ধাক্কা সামলাচ্ছে। কিন্তু সব পরিশ্রমই ওর কাছে হালকা হয়ে আসে মায়ের কথা মনে করে। কি আহ্লাদিত হবে না যে মা!...বন্দুকটা আজ থেকে তারই! হ্যাঁ তারই। যক্ষের ধনের রক্ষক তো আছেই!...বাতাস বাদামে চাড় দিয়েছে, ওর হালও চড়চড় করে ওঠে। মাধুরীর কথাও মনে ঝিলিক দ্যায়। ...ভারি মিষ্টি মেয়েটি। কি গান না ও ভালবাসে! দূরে এসে গেছে রাঙাবেলিয়া। বাউলেও ক্লান্ত গলায় গানের পদ গেয়ে ওঠে,—'ও বিদেশী বন্ধু—'

সবুর আর থাকতে পারে না, হু হু বাতাসে চিৎকার করে ওঠে ;—বাউলেদা, ও বাউলেদা, চলো এবার সাতজেলিয়া হয়ে যাই। চলো না আমাদের বাড়ি হয়েই। একই ভাটির টানে গোমর নদী ঘুরে তুমি না হয় বাড়ি যেও।

বাউলের গান থেমে গেছে। বলে,—ধ্যুৎ, তাই হয় নাকি! আগে মায়ের কাছে যেতে হয়। তুই চল্ গোসাবায়। মা-র সঙ্গে দেখা করে তারপর তুই হাঁটাপথে সাতজেলিয়া যাস্। আমি না হয় তখন তোর সঙ্গে যাবো। বলেই গলায় খাঁকার দিয়ে আবার গানটা ধরে।

সবুর খানিকটা মন-মরা হয়ে বলে,—করো, যা ভালো বোঝো।

আট

বন্দুকের একটা নিষ্পত্তি হবার পর থেকেই মায়েরও যেমন মনটা হালকা হয়ে উঠেছে, বাউলের মনটাও তেমনি উৎফুল্ল। এতো উৎফুল্ল যে বন্দুকটা একবার দেখে না আসা পর্যন্ত

স্থির হয়ে থাকতে পারে না। বন্দুকটা এতোদিন ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে যেন আপন সন্তানের প্রতি মমতা পেয়ে বসেছে। শুধুই কি নাড়াচাড়া করেছে ? কতো আপদে-বিপদে, কতো দুর্ধর্ষ কাজে-অকাজে, কতো জীবন-মরণ সমস্যায়—এই বন্দুকই ওর ফেলে-আসা দিনগুলিতে হয়ে আছে এক পরম বিশ্বস্ত সাথী ও সহচর ! বড়দলের দোকানে নদীর মৃদু হাওয়ার দোলায়িত বন্দুকের ছবি ভাবতে ভাবতে আনমনে এই মারণ অস্ত্রটির গায়ে অসীম মমতায় হাত বোলায়। তখন আর মারণ অস্ত্র নয়, মনে হবে বাউলের বুঝি জীবনসঙ্গিনী। তাই ইতিমধ্যে একবার বাদায় ছুটে গিয়ে তার যত্ন-আত্তি করে এসেছে। এই বন্দুক আজ তার নিজের, একান্তভাবে নিজের।

মনটা হালকা হয়ে ওঠার পর বাউলে এখন গান-বাজনায় মেতে উঠেছে। গোসাবা যেন কেমনভাবে লোকের মনকে আনন্দ ও উৎসবে মাতিয়ে তোলে। দুর্দান্ত হিংস্র বনের কোলে বড় বড় গাছের পাতার মর্মর শব্দ আর ছোটো-বড় নদীর কুলকুল ধ্বনি, সেই সঙ্গে নদীর স্রোতের ঢেউ ও বাতাসের দোলায়িত তরঙ্গ যেন আপনা থেকে মানুষের মনে সুরের ঝঙ্কার আনে। ঝঙ্কার আনে বলেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পদধূলিতে এক সময়ে ধন্য হবার সুযোগ পেয়েছিলো এই গোসাবা। কবির আসা থেকে এই অঞ্চলে গোসাবা হয়ে উঠেছে যেন এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। গান, বাজনা, নাটক, যাত্রা, কতোকথা, কবির তর্জা, মায় সিনেমাও—একটা না একটা লেগেই থাকে, বিশেষ করে পুজোর সময়। বর্তমান গোসাবার প্রাণস্বরূপ ডাক্তারবাবুর এ বিষয়ে উৎসাহের সীমা নেই।

ডাক্তারবাবু একদিন বেদে বাউলেকে ডেকে বললেন,—বুঝলে ! এবার একটা নাটক মানে থিয়েটার করা যাক্। কি বলো, নাটক জমবে না ?

মাথা চুলকিয়ে বাউলে বলে,—ভালো একটা দল আনলে না-জমার কি আছে ? নিশ্চয় জমবে ?

—আরে, সে কথা নয়। বাইরের দলটল নয়। এবার এসো আমরা নিজেরা, গোসাবার লোকজন নিজেরা একটা থিয়েটার করি। ধরো, তুমি থাকবে, আমি থাকবো, আর ভালভাবে বাছাই করে কিছু লোকজন নিয়ে।

—না, ডাক্তারবাবু, আমি পাট করতে পারবো না। বলেন তো কিছু গান-টান করতে পারি। পাট আমি কিছু করতে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। ও-কাজ আমার দ্বারা হবে না।

—আরে, কলকাতা থেকে মেক-আপ করার লোক আনবো। তারা এমন মেক-আপ করবে, তোমাকে কেউ চিনতেই পারবে না। জানো, কোন্ থিয়েটার করছি ? এবার 'বর্গী এলো দেশে' পালা। তোমাকে করতে হবে ভাস্কর পণ্ডিতের পাট। তোমার ভালো গোঁফদাড়ি আছে—খুব ভালো মানাবে।

—ভালো গোঁফদাড়ি থাকলে কি হবে ! বাঘের সামনে আমার হাঁটু কাঁপে না, কিন্তু পাটের কথা বলাতে আমার হাঁটু এখনই কাঁপছে। ডাক্তারবাবু ! পাট ভুলেই যাবো। কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে, ডাক্তারবাবু ! তখন কি বলতে গিয়ে কি বলে বসবো—না হয়, স্টেজ থেকে সরে পড়বো। না, অমন প্রস্তাব করবেন না, ডাক্তারবাবু !

—আরে, না, না ! ও বিষয়ে তোমার ভাবতে হবে না। কলকাতা থেকে প্রম্পটার আনার ব্যবস্থা করছি। দেখবে, তুমি গড়গড় করে বলে যাবে। কাল সন্ধ্যের গোনে আসবে—সব আলোচনা হবে। আসবে কিন্তু।

সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল। 'বর্গী এলো দেশে'-ই হবে। বাউলে যেন কেমন গম্ভীর হয়ে

গেছে। মনে মনে পার্ট মুখস্থ করে আর রাতদিন ভাবতে থাকে—কোনটা জোরে, কোনটা আস্তে বলবে ; অঙ্গভঙ্গি বা কেমন হবে। ভাবার অন্ত নেই, কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তিকর—আমার হাত-পা না কেঁপে যায়, আমার গলা না শুকিয়ে যায় !

কলকাতা থেকে প্রম্পটার ও পেইন্টার এসেছে। তারা তো বাউলের কপালে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্র লাঞ্ছন, প্রশস্ত বুকে মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, তেজী গোঁফদাড়ি আর লম্বা বাবরি দেখে তো অবাক,—শুধু অবাক নয়, মোহিতও বটে। বলে,—হ্যাঁ, তোমাকেই মানাবে 'ভাস্কর পণ্ডিত'।

চুপিচুপি বাউলে ওদের বলে,—তা নয় হলো ! কিন্তু এখন থেকেই ভয়ে মরছি, আমার হাঁটু না কেঁপে যায়, পার্ট না ভুলে বসি !! কোনও দিন পার্ট-টার্ট করিনি তো।

ওরা দুজনেই হেসে ফেললো। সে হাসিতে বেদে ভাবে, না জানি সে কতখানি ছেলেমানষেমি করছে ! প্রম্পটাব বললো,—বাউলে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তুমি তো এখন থেকে আর বেদে বাউলে নও, তুমি ভাস্কর পণ্ডিত। সেই দুর্দান্ত, সেই উন্মত্ত, দুঃসাহসী ভাস্কর। তোমার কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি সে-রকমই হবে। তোমার সামনে যে অসংখ্য লোক বসে থাকে—ওরা আর কেউ নয়, ওরা দেখতে চায় কতোটা দাপটি তুমি করতে পারো। কেন, তুমি না বাঘের শিকারী, বাঘের সামনে তুমি দাপটি করো না ? ভাস্কর পণ্ডিত বাঙলাদেশে এসে সেই দাপটি করে গেছে। পারবে না সেই দাপটি দেখাতে স্টেজের ওপর ? চলো বাউলে, তারই জন্য আমরা তৈবি হই। তুমি এখন থেকে আব 'বেদে বাউলে' নও—তুমি ভাস্কর পণ্ডিত। চলো ভাস্কর পণ্ডিত, আমরা তৈরি হই।

এই দীর্ঘ উপদেশে বেদে বাউলে চমৎকৃত হয়ে যায়। সত্যই তো ওরা ঠিকই বলেছে। ওর মনে গান এসে যায়। না, গান চেপে গেল। হাঁটুর ওপর এক বলিষ্ঠ থাপ্পড় মেরে উঠে পড়ে চন্‌মন্‌ করে।

পরদিন সাজঘরে বাউলেকে পেইন্ট করাচ্ছে। সমস্ত দাড়িগোঁফটা কাচা-পাকা করে দিয়েছে। দীর্ঘ কপালে মারাঠি পণ্ডিতের রক্ততিলক এঁকে দিয়েছে। বাহুতে কঙ্কন। গলায় মেকি মুক্তোর মালা। ঠাসা রঙে ওকে সাদা ধবধবে করে দিয়েছে। মাথায় রক্ত বঙের ফেটা। বাবরি ও ভ্রূ-ও আধাপাকা। দাড়ি-ও দুভাগ করে টানা কান পর্যন্ত পাকিয়ে দিয়েছে। ভারিক্কি গলায় পার্ট বলার জন্য বারবার মহড়া দিয়েও নিয়েছে।

—দেখে নাও এবার, এই আয়নার সামনে। তুমি বেদে, না ভাস্কর পণ্ডিত ?—বলেই পেইন্টাব একটু পাশ নিয়েছে।

বাউলে আয়নায় নিজেকে যেন নিজেই চিনতে পেরে ওঠে না ! আমি কি বেহুঁস্‌ হয়ে গেছি ? বনের গহনে গাছের ডালে বসে এমন অবস্থা হলে যা করে তাই করলো—নিজের গায়ে চিম্‌টি কেটে দেখে নিলো সে ব্যথা পায় কি না, সে সত্যি বেদে কি না ! জিব বের করে সে নিশ্চিত হয়ে নিলো—আয়নার ছবিও জিব কেটেছে কি না ?

পাড়ার ছেলেপুলেরা সাজঘরের এক কোণ থেকে উঁকি মারছিলো। সেদিকটা আড়াল করে ঘুরে ভাস্কর পণ্ডিত বসে রইলো। ভাবতে থাকে, সামনেই মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যরা মাথায় রক্তাভ ফেটির পেখম উড়িয়ে ঝক্‌ঝকে বল্লম উঁচিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একটা কিছু শব্দ হলেই ভাবে, এই শব্দ আর কিছু নয়, ঐ সৈন্যদলের ঘোড়ার খুরের দাপটির শব্দ। ঘাড় বেঁকিয়ে বড়বড় চোখে চাহনি দেয় যেন গোটা অশ্বারোহী বাহিনীর দিকে। এদেরই তো আমার আদেশ দিতে হবে !!

একবার ওর মনে ঝিলিক আসে,—মাধুরীও ওকে আজ চিনতে পারবে না !

প্রথমেই রণবাদ্যের ব্যাণ্ড বাজনা। বাজনা থামতেই ছিল মাধুরীর একটা গান—ঘুমপাড়ানি গান :

মনি ঘুমলো, পাড়া জুড়ালো,
বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়ে গেলো
খাজনা দেবো কিসে ॥
ধান ফুরালো, পান ফুরালো
খাজনার উপায় কি ?
আর কটাদিন দেরি করো
রসুন বুনেছি ॥

গান শেষ হতেই প্রম্পটারের ইঙ্গিত এলো ভাস্কর পণ্ডিতের অনুপ্রবেশের জন্য।

ভাস্কর এখন সবার সামনে। সবাই জানে, কানেকানে সবাই জানতো, বেদেই ভাস্কর পণ্ডিত হবে। তাহলেও সহসা কেউ চিনতে পারে না, ভাবে—হয়তো প্রম্পটারদের সঙ্গে কলকাতা থেকে কোনো ওস্তাদ এসে পাট করছে। কী তার বীরদর্পমণ্ডিত পদচারণ স্টেজের ওপর। এক-একটা ঝাঁকি মেরে যখন নাভিদেশ থেকে গুরুগম্ভীর আওয়াজে শব্দগুলি ছুঁড়ে মারে, তখন গোটা স্টেজটাই কেঁপে ওঠে। ভাস্কর পণ্ডিত তো বল্লমধারী দীর্ঘ মারাঠী অশ্বারোহী বাহিনীর সামনে কথা বলছে, তাদের সবাইকে তো উদ্বুদ্ধ করতে হবে!

সবাই তো একসময়ে চোখ বড়ো করে থ মেরে শুনছে— 'পেশোয়া বলেছেন মহারাষ্ট্র মারাঠাদের জন্য…রাজস্থান রাজপুতদের জন্য…পাঞ্জাব পাঞ্জাবীদের জন্য…কিন্তু বাংলা সবার জন্য। এই মধুচক্রের সবটুকু আমি শোষণ করে নিয়ে যাবো পেশোয়ার জন্য। আজ নিয়ে যাবো চৌথ, আজ দাবী করবো রাজ্যের অর্ধাংশ।…দেবে না আলিবর্দি খাঁ ??…তাহলে তাঁকে বাঙলার মসনদ থেকে টেনে এনে ভাগীরথীর জলে ডুবিয়ে মারবো! আমি ভুলিনি সরফরাজ খাঁ-র যুদ্ধে বন্ধু বিজয় সিংহের শোচনীয় মৃত্যু…'

অপূর্ব ভঙ্গিমায় দৃঢ় বাক্য উচ্চারণে যখন দুবাহু তুলে কাল্পনিক উচ্চ সিংহাসন থেকে টেনে এনে দক্ষিণ দিকে ভাগীরথীর সাগর সঙ্গমের পানে সবলে ছুঁড়ে মারলো, তখন দর্শকেরা মোহিত হয়ে বসা থেকে হাঁটুর উপর উঁচু হয়ে পড়েছে আর ভাস্কর পণ্ডিতও যেন বাহুদ্বয়ের ঝুলে সাগর-সঙ্গমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে—আর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে করতালি আর থামতে চায় না। জমাটি থিয়েটারে ডাক্তারবাবু আহ্লাদিত। বেদে এই ফাঁকে দর্শকের মধ্যে একবার কটাক্ষ করে দেখে নেয় মাধুরী ও সবুরকে। সামনেই বসেছিল ওরা—দুজনেই উদ্বেলিত ও মোহিত। হাততালির শব্দে চমক্ ভেঙে ওরাও প্রাণপণে হাততালি দিতে থাকে।

রীতিনীতি ভেঙে ডাক্তারবাবু তো স্টেজের উপর উঠে বেদের গলায় একটি রূপোর মেডেল পরিয়ে দেন। এই ব্যবস্থা তিনি কাউকে না জানিয়ে করে রাখেন। স্থির ছিলো, থিয়েটার শেষ হলে শ্রেষ্ঠ চরিত্রকে মেডেল দেওয়া হবে। কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিতের পাটে এমনই মুগ্ধ যে তিনি আর দেরি করতে পারেন না। মাঝপথে স্টেজে এসে সাদরে মেডেল পরিয়ে দিলেন ভাস্কর পণ্ডিতের কণ্ঠে।

থিয়েটার ভাঙতে বেশ দেরি হয়। শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর পণ্ডিতকে সমাদর করতেই সবাই ভিড় করে আসতে থাকে। কিছু না ভেবেই ভাস্কর পণ্ডিতের সাজেই বেদে

স্টেজের নিচে নেমে আসে। মাধুরী ও সবুর তো কাছে ঘেঁষতে পাত্তাই পায় না। ওদের দেখতে পেয়ে বেদেই লোকজন ঠেলেঠুলে এগিয়ে আসে।

কাছে এলেই মাধুরী বলে,—না বাউলেদা তোমাকে আর 'বাউলেদা' বলবো না, তুমি 'ভাস্করদা' এখন থেকে।

সে-কথায় কান না দিয়ে বেদে মেডেলটা গলা নিচু করে ওদের দেখায়। দেখাতে দেখাতে বলে,—এত রাত্রে সাতজেলিয়া যাবে কি করে তোমরা ?

—সে-ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। বাবা-মা দুজনেই এসেছেন।

—তাই নাকি ? চলো, চলো, তাদের সঙ্গে একবার দেখা করি। বলেই ওদের দুজনকে দুহাতে ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললো,—জানিস্ সবুর ! পার্ট বলবো কি, তোর দিদির গান শুনতে শুনতে আমার ঘুম এসেই গিয়েছিলো। বলেই বাউলে তার ধরে যাওয়া গলায় গান গেয়ে উঠলো—'মনি ঘুমোলো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে···'

মাধুরী তখন বেদের হাতে ঝাঁকা মেরে শুধু বললো,—যাও !!

সে বছরে আনন্দ ও উৎসবের সমাপ্তিকে মধুরেণ সমাপয়েতের আয়োজন করেন ডাক্তারবাবু। সকল উদ্যোক্তাদের মিষ্টি খাওয়ালেন পরদিন। এই আমন্ত্রণে কেউই বাদ যায়নি। মায় মাধুরী ও সবুরও বাদ যায়নি।

গোসাবা যেন তার পুরনো সাংস্কৃতিক সত্তা ফিরে পায় এ-বছর। ফিরে পায় বটে, কিন্তু একটা সামান্য চিড় ধরা দেয় এই সামগ্রিক জীবনে।

প্রথম প্রথম এটা একটা নিতান্ত ব্যক্তিগত বলে অনুমিত হলেও, কালভদ্রে এটা গোসাবার পরাভবের সূত্রপাত রূপে দেখা দেয়।

নয়

কিশোর যে কখন যুবক হয়ে ওঠে, বোঝা দায়। এই উত্তরণ তো দিনক্ষণ দেখে বা বয়স মেপে হয় না। অথচ এই সন্ধিক্ষণ আসবেই, এবং আসবে জলোচ্ছ্বাসের মতো উত্তাল হয়ে। সবুরের জীবনে সেই সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। গভীর স্নেহ করেই বোলে বাউলের নজর তা এড়ায় না। বাউলে যেমন সুন্দরবন নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে সবুরকেও তেমনি সুন্দরবন-পাগলা করে তুলতে চায় তার জীবনের এই সন্ধিক্ষণ থেকেই। ডেকে বলে,—কী রে সবুর, নবমীর মাংস খেতে চাস্ না ?

গোসাবায় অন্যবারের মতো এবারও ধুমধাম করে দুর্গোৎসব চলেছে। আজ সপ্তমী। সন্ধ্যায় আজ জলসা। মৌজার লোকেরাই সবাই মিলে এই জলসার আয়োজন করেছে। বাউলে তার প্রধান উদ্যোক্তা, আর সঙ্গে আছে সবুর ও তার দিদি মাধুরী। কাজেই সপ্তমীর দিন মাঝ-রাত অবধি ওদের নড়চড় করার অবকাশ নেই। অষ্টমীর দিন যাত্রা। যাত্রা হলে তো সবুর পাগল, সারা রাত জেগে যাত্রা শুনবে। ফলে বাউলে নবমীর মাংস খাবার লোভ দেখালো।

মাংসটা ছুতো মাত্র। আসলে, সবুর এখন যুবক হয়ে উঠেছে তো, তাই তাকে সুন্দরবনের ব্যাপারে সড়গড় করে তুলতে চায় বাউলে। বাদার যুবক সুন্দরবনের সঙ্গে লড়াই করবে না, সুন্দরবনের আকর্ষণে উন্মত্ত হয়ে উঠবে না, তাও হয় নাকি ?

বাউলে বলে,—বুঝলি সবুর, ভোরের সুজনে বাদায় যাব, আবার দুপুরের সুজনে ফিরে

আসতেই হবে। তা না হলে নবমীর মাংস খাবি কী করে ? ভাটি ও জো'র টান ঠিকমতো পড়েছে। এমন সুযোগে ভাল যোগাযোগ না হয়ে যায় না।

একটু থেমে আবারও জানালো,—ভোররাত্রিতে আমার বন্দুকটা এনে ঠিকঠাক করে রাখবো। তুই ঠিকই আসবি কিন্তু।

দুজনে মিলে ছোট্ট একখানা ডিঙি করে এসে গেছে নবমীর ভোর সকালে পিরখালির বনে। বনের এই দ্বীপটি তেতুলবেড়ে খালের উত্তরে। কেউ কেউ এই চক্‌কে বলে 'বত্রিশ একর বন'। নাবি বন। নতুন ভেসে ওঠা দ্বীপে তৈরি হয়েছে এই বন।

গোটা সুন্দরবনটাই যেন দ্বীপময় এক আশ্চর্য জগৎ। নদীর মোহনায় বা তেমাথায়, বা চৌমাথায় পলি পড়ে পড়ে প্রথমে ছোট একটা দ্বীপ দেখা দেয়। গঙ্গার ভূমি-গঠন-ক্ষমতা অপরিসীম। পৃথিবীতে এমন পলি-বহনকারী নদী দুর্লভ। হিমালয়ের বা হিমালয়ের পাদদেশের পলিকণা বহন করে উজাড় করে ঢেলে দেয় অববাহিকা অঞ্চলে। যেন মাতৃস্নেহে প্রলেপের পর প্রলেপ দিয়ে পলিমাটির দ্বীপ সৃষ্টি করে চলেছে আবহমান কাল ধরে। দ্বীপ দেখা দিতেই আসে পাখির দল, তারপর আসে গাছপালা। গাছপালা বলিষ্ঠ হতে না হতে আসে সুন্দরবনের হিংস্র-অহিংস্র প্রাণীরা। আসে বানর, আসে হরিণ, আসে সাপ, আসে শুয়োর, আসে বাঘ। আর সর্বশেষে আসে মানুষ, নানা সুযোগের সন্ধানে। এমনিভাবেই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সমস্ত হিংস্রতা ও মমতা নিয়েই এক-একটা দ্বীপ সুন্দরবনের সঙ্গে সংযোজিত হয়।

এই 'বত্রিশ একর বনে'ই আজ এসেছে বেদে বাউলে। পরনে তার ধুতি, গোটো করে পরা, গায়ে ফতুয়া, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে হালকা কালো দাড়ি, বাবরি চুল, দীর্ঘ কপালে, বাহুতে ও বুকে রক্ত-রাঙা চন্দনের বড় বড় তিলক, আর হাতে তার বন্দুক। সঙ্গে একমাত্র সহচর সবুর। পরনে তার হাফ্-প্যান্ট, গায়ে কামিজ আর চোখে সুন্দরবনকে চিনবার উদগ্র বাসনা।

খবর এসেছিল, এই বনে কদিন হল অনেক হরিণের পাল দেখা গেছে। কাজেই নবমীর মাংসের জন্য বাউলের স্থান বেছে নিতে দেরি হয়নি। ওদের ডিঙি বড়নদী থেকে পাশ-খালে ঢোকে। বড়নদীর মুখেই মালে উঠবে না। তাহলে অনেকে দূর থেকেই ওদের ডিঙি দেখে ফেলবে। খালের তিন-চারটি ছোট ছোট বাঁক পেরিয়ে ডিঙি পোঁতে। ভাল করেই পোঁতে, যাতে জোয়ার এলে ভাসিয়ে না নিয়ে যায়। মালের গাছের গুঁড়িতে এদেশের লোক কখনও কাছি বাঁধে না।

সব ঠিকঠাক করে পাশ-খাল থেকে একটু দূরে একটা কেওড়া গাছে বসে ওরা। বাউলে বেশ একটু উঁচুতে এক তে-ডালায় সবুরকে বসিয়ে দিয়েছে। বলে,—তোর তো আর গামছা দিয়ে ডালের সঙ্গে নিজেকে বাঁধতে হবে না ; তুই যা চালাক আর সাহসী, বলার নয় ! আমি থাকতে তোর শঙ্কা পাবার কিছু নেই ! না রে !

কিশোর-মনকে পিছনে ফেলে এসেছে সবুর। উত্তরে সে ফিস্ ফিস্ করে বলে,—বাঃ, তে-ডালায় বসে বসে কি সুন্দর দেখতে পাব সব ঝোপঝাড়।

বসতে-না-বসতেই বাউলে হরিণের নকল ডাক ডাকতে থাকে। মেয়ে-হরিণের ডাক দেয় ; এতে মদ্দা শিঙেলই প্রলুব্ধ হয়। ডাকটা একই প্রায়, তবে মেয়ে হরিণের ডাকে মোলায়েম ভাব থাকে। নবমীর মাংসের জন্য এসেছে, বহুলোক আপ্যায়ন করতে হবে। মেয়ে-হরিণ মারতেও জাত-শিকারিদের মনে বাধা আছে। একটা বড় শিঙেলের মতো

শিঙেল চাই।

সময় কেটে যায়। বাউলে ভাবে, তাহলে কী হলো! বেলাও গড়িয়ে গেছে অনেক। কার্তিকের শেষ। সকালের হিমেল ঝিরঝিরে বাতাস আছে ঠিকই, তবে সূর্যও উপরে উঠেছে অনেকখানি তীব্রতা নিয়ে। তা হলে? হরিণের অতি প্রিয় ধানিঘাসও আছে বেশ খানিকটা, খুব কাছেই, পাশখালির চরে। কেওড়া গাছটার যে-ডাল ভেঙে ভেঙে সে নীচে ফেলেছে বানরের নকল ঝগড়ার কিচিরমিচির-শব্দে, তার পাতাগুলিও কচি ও লোভনীয়। তা হলে? হরিণের কোনো পাত্তা নেই কেন এখনও?

বাউলে কেমন যেন হতবাক হয়ে যায়।

এমন সময়ে সহসা এক চোটের আওয়াজ! খুবই কাছে। বিস্মিত হয়ে বাউলে ভাবে, কিসের এই বন্দুকের চোট। তবে কি শিকারির পেছনে শিকারি! আমাদেরই লক্ষ করে নয় তো? আগে ঠাহর করতে হবে কাকে লক্ষ করে? হঠাৎ আমাদের কিছুই করার নেই। শুধু আড়ালে চুপচাপ থাকা। তবে সবুরকে সাবধান করা দরকার।

আকারে ইঙ্গিতে দু-একটা অস্ফুট ফিস্‌ফিস শব্দে স্ববুরকে বলল,—যেখানে আছিস সেখানেই থাক্। ডালটা এমনি করে শক্ত করে ধরে রাখ্; একদম নড়াচড়া করবি না, খবরদার না!

তখনও 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' হয়নি। লোকে বনে আসে, দু-একটা হরিণ মারে। সুন্দরবনে বাঘ মারতে আসা বলা বাতুলতা। বনকর অপিসের পেট্রোলবোট বা পিটেলবোট বন পাহারা দেয় বটে, কিন্তু চোরা শিকারীকে ধরে সদরে চালান দেওয়া তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ধরতে পারলে বা ধরার মতো অবস্থা বাগাতে পারলে, কিছু পয়সা, না হয় কিছু মাংসের ভাগ নেওয়া আর কিছু নকল শাসানি ও ধমকানির পালা। কাজ দেখানোর জন্য মাঝে-মধ্যে দু-একজনকে সদরে চালান দিতে হয় অবশ্য।

বাউলের অজানিতে অনেক দূর থেকে, বড় নদীর দূরের বাঁকের মুখ থেকেই পিটেলবোটের বাবু ওদের ডিঙিকে পাশখালিতে ঢুকতে দ্যাখে। পাশখালিকে নজরে রেখে রেখে পিটেলবোট শেষ পর্যন্ত পাশখালির মুখে হাজির। আসতে বেশ সময় লাগে। এখনকার মতো সুন্দরবনে ভট্‌ভটি বা লঞ্চের তখন আমদানি ছিল না। দাঁড় বেয়েই এক বাঁক জল ঠেলতে হয়েছে।

সাদা ধবধবে পিটেলবোট। সুন্দরবনের মানুষরা যেমন, তেমনি বাঘ-বাঘিনীও এদের ঠিক চিনে নেয়। আর এদের পিছু নিতে হলে যে খুব সাবধানী হতে হবে, বাঘেরা তাও জানে। বারবার দেখে বুঝে নিয়েছে, এই সাদা বোটে বন্দুক থাকেই। আর বন্দুক ওরা এমন চেনে যে বলার নয়। সামান্য কাকপাখিরও যেমন হাতের ঢিলকে চিনতে এতটুকু দেরি হয় না, তেমনি মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ী বন্দুকের নলকে চিনতেও বাঘকে বেশি বুদ্ধি খাটাতে হয় না।

কাজেই, নদীর কূল ঘেঁষে ঝোপঝাড়ের আড়ালে-আড়ালে বাঘ অতি সাবধানে পিটেলবোটের পিছু নিয়েছে। বোটের বেশ পিছনে। মাঝে-মাঝে উঁকি মারে, আবার ঘাড়-পিঠ নিচু করে গুটিগুটি এগোয়। পাশখালের মুখে আসতেই বোট প্রায় থেমে গেছে। বাঘও এবার সচকিত।

পাশখালের মুখে পিটেলবাবু দোমনা। ভাবনা, শেষ পর্যন্ত এই সরু খাঁড়িতে বোট আটকে না পড়ে। বোটের গলুই খালের মধ্যে। বোধহয় ঘুরে বড় নদীতে পড়তে চায়। গলুই যে ঘুরতে চায় না। বাবুর আদেশমতো বড় লগি নিয়ে ওদের এক যুবক গলুইতে খোঁচা মারতে গেছে।

সুন্দরবনের বাঘ চলতি নৌকোয় সহসা আক্রমণ করতে চায় না। বাঘের ধোঁকা লাগে, হয়তো গলুই থেমে গেছে। যুবকটি লগির গোড়া কোমরজলে ফেলে খোঁচের চাড় দিয়েছে। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত ; কারও হাত আজোড় নেই। বাঘও এমন সুযোগ হেলায় বা দ্বিধায় হারাতে চায় না। তীর থেকে যুবককে লক্ষ করে চকিতে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হয়তো ভেবেছিলো, গলুইতে দু-পায়ে ভর দিতে পারবে। কিন্তু অঘটন ঘটে গেছে। লগির খোঁচাতে হয়তো গলুই একটু পাশ নিয়েছে। বাঘ গলুই ছাড়িয়ে নীচে জলে পড়তে চলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের টাল সামলাতে তার থাবা যুবকের বাহুতে বিদ্ধ করেছে। হিংস্র ও উদ্যত বক্র নখ পেশীতে সমূলে প্রোথিত। যুবকেরও টাল সামলানো দায়। লগির পেলায় কোনোমতে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরে যায়। কিন্তু বিদ্যুৎগতি লাফ আর বিশাল দেহের গুরুভার যাবে কোথায়। সোজা গিয়ে ওপাশে জলে পড়লো বাঘ, আর সেই সঙ্গে তার থাবার বক্র নখ যুবকের বাহুর পেশী ছিন্নভিন্ন করে ছিঁড়ে নিয়ে গেলো।

বোটের লোক সব মারমার করে ততক্ষণে গলুইতে। পিটেলবাবুও টোটাভরা বন্দুক হাতে বোটের কামরা থেকে হন্তদন্ত হয়ে গলুইতে ছুটে এসেছেন।

সকলে দল বেঁধে বেরিয়ে আসার আগেই বাঘ জল-কাদামাটি অগ্রাহ্য করে আবার চটাং করে লাফ দিয়ে মালে উধাও। সুন্দরবনের বাঘের এ এক অদ্ভুত প্রকৃতি। একবার আক্রমণ বিফল হলে, তখন-তখন সে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে না।

দেখতে না-পেলেও বাঘ সরে পড়ার পথ লক্ষ করে বাবু গুলি চালান। কতকটা ভয়ে, কতকটা আসর সরগরম করার জন্য। যুবক ওদিকে গলুইতে এলিয়ে পড়েছে যন্ত্রণায়। তার বাহু থেকে সমানে রক্ত ঝরছে।

পিটেলবাবুর নির্দেশে ওদের বোট এবার ছুটল হেল্‌থ সেন্টারে। যদি যুবকটিকে প্রাণে বাঁচানো যায়। ছোট চাম্‌টার খাল ধরতে ওরা এবার দ্রুত ধাবিত।

বাঘের আক্রমণ, হুঙ্কার, বোটের মানুষের হৈ-হল্লা, আর সর্বোপরি চোটের আওয়াজে সবুর যেন প্রাণ হাতে করে তে-ডালার দুটো ডাল নিঃসাড়ে সাপ্‌টে ধরে আছে। বাউলে ভাবে, নবমীর মাংস জোটাতে এসে এ কী ফাঁদে পড়লাম!

এতক্ষণে সব চুপচাপ। যেন শান্ত এই বন। যে শান্ত বন দূর থেকে মানুষকে হাতছানি দিয়ে মোহগ্রস্ত করে। তবু বাউলে বিন্দুমাত্র নড়চড় করে না, উসখুসও করে না। কোনোভাবে কোনো প্রাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলবে না এখন। হরিণ পাবার আর কোনো আশা নেই। বন যদি কোনো কারণে একবার তোলপাড় হয়, তবে সে-মুখো হবে না এই নিরীহ জীব। অন্তত সে-দিনের মতো তো নয়ই।

তবুও বাউলে অতি সাবধানীর মতো আরও অপেক্ষা করতে চায়! অপেক্ষা করতে হয় না। সামনের সামান্য ফাঁকা জায়গায় কাদা-জলে ভেজা মূর্তিমান। একেবারে চারহাতপায়ে ঘোড়ার মতো টান্‌টান্ দাঁড়িয়ে। এমন দাঁড়ানো বাঘকে দেখা সুন্দরবনে অতি দুর্লভ ব্যাপার। এ-জীব তো হঠাৎ আক্রমণে চমক লাগাতেই অভ্যস্ত, শত্রুর সামান্যতম ইঙ্গিতে পিঠ ও মাথা নিচু করে পাতা ও আগাছার আড়ালে গুটি মেরে চলাই তো এ-জীবের রণকৌশল। তা না, এ তো ঘোড়ার মতো টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! তাও আবার বন্দুকের আওতায়! একবার প্রবল ইচ্ছা হয়, ইঙ্গিতে সবুরকে এ-দৃশ্য দেখে নিতে বলে। না, তৎক্ষণাৎই তা থেকে নিরস্ত হয়। বাউলে বুঝি আর স্থির থাকতে পারে না। অতি সন্তর্পণে বন্দুকের নল ধীরে, অতি ধীরে, ইঞ্চি-ইঞ্চি করে যথাস্থানে এনেছে। কিন্তু এত সাবধানতায়ও শেষরক্ষা হয় না। বাঘের সঙ্গে বাউলের হঠাৎ চোখাচোখি।

আর চোখ ফেরাবার উপায় নেই। কট্‌মট্‌ করে আগুনের মতো দৃষ্টিতে সে-চোখের পরে চোখ রাখতেই হবে। একবার চোখ সরেছে কি রক্ষা নেই। মুহূর্তে প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে।

হঠাৎ বাউলের টনক নড়ে। নলে তো 'বাক্‌শট', হরিণ মারতেই এতক্ষণ তৈরি ছিল। ফতুয়ার ডান পকেটে এল জি গুলি। বনে উঠলেই এল জি গুলি ও সঙ্গে নেবেই নেবে। বুলেট বাউলের পছন্দ নয়। ধীরে, অতি ধীরে, ডান হাতখানা সে পকেটে দিয়েছে। যতটা সম্ভব আড়ালে-আড়ালে। বন্দুকের নল আর চোখের চাহনি এতটুকু সরায়নি।

এল জি ছাড়া অন্য টোটাও পকেটে ছিল। একবার চোখে দেখে নিশ্চিত হতে চায়। 'যা থাকে বরাতে' ভেবে, ঘাড় না নামিয়ে, অপাঙ্গে দেখে নিয়েই গুলি ভরে ফেলেছে। পলকের সময় মাত্র। চেয়ে দেখে, বাঘ সেখানে নেই।

নেই, বাঘকে কোথাও সে দেখতে পায় না। সবুরকে ডেকে বলে,—মরদ ! আমরা গাছে বলেই ও ব্যাটা আক্রমণ করেনি। কিন্তু ও আছে, ধারেকাছেই আছে। ভাল করে নজর দে।

তবুও ওরা কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না। হঠাৎ বাউলে অনুমান করে, এ জাত বড় চতুর জাত···ও নিশ্চয় কোনো ফাঁকে আমাদের ডিঙি দেখে ফেলেছে। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে,—আরে মরদ ! ডিঙির দিকটা দ্যাখ ! বলেই সে নিজেও ধীর স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকায়। ভাবে, নিশ্চয় মতলব করেছে, গাছ থেকে নেমে যখন আমরা ডিঙিতে উঠতে যাব, তখনই কাজ সারবে।

তন্নতন্ন করে দেখতে দেখতে হঠাৎ নজরে আসে একটা ছোট কানের মতো। গরান গাছের গুঁড়ির ছাল নয় তো ! না, আর দেখতে পায় না। চোখটা একটু মুছে নিয়েও দেখতে পায় না। কয়েক লহমা পরেই আবার গুঁড়িটার ওপাশে ডান দিকে যেন একটা কানের মতো। বাউলের আর অনুমান করতে হয় না। ব্যাটা ! গুঁড়ির আড়ালে একবার এ-পাশে, আরেকবার ও-পাশে এক চোখে উঁকি মারছে। গোটা মুখটা কোনো দিকেই বের করছে না।

বাউলে বন্দুকের তাক্‌ সূক্ষ্মভাবে করে আছে। কিন্তু কিছুতেই মাথা বের করছে না। গুলি করলেও করা যায়। লাগলে হয়তো বাঘের মাথার তেল্‌সা পিচ্ছিল হাড়ে আঁচড় লেগে বেরিয়ে যাবে। কোন পথ না পেয়ে বন্দুকের নিরিখ আরও তীক্ষ্ণ করে নিজের জিভ টাকরায় লাগিয়ে জোরে একটা 'ট' শব্দ করে। নিঝুম বনে সেই শব্দও প্রতিধ্বনিত হয়। কী ব্যাপার তা সঠিক বুঝবার জন্য বাঘ এবার পুরো মাথাটা হেলিয়ে দু'চোখ দিয়ে দেখতে গেছে। দেখতে আর হয় না—সঙ্গে সঙ্গে বেদে বাউলের বন্দুকে গুড়ুম আওয়াজ।

বাঘ লুটিয়ে পড়ে না। কাত হয়ে পড়েই আবার উঠে ঝোপ-ঝাড় হুড়মুড় করে ভেঙে টলতে-টলতে সেই ফাঁকা চত্বরটার উপর টালমাটাল ভাবে আড়ালে চলে যায়।

বাউলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, বেশ জোরেই বলে,—চল মরদ, এবার আমরা চলি, তুরন্ত নেমে চল ডিঙিতে। এখন ওর পেছনে আর নয়। পরে দেখা যাবে। চল্‌।

জো' এসে গেছে। ডিঙি সুজনে ভাসিয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্ত বাউলে আদরের সুরে বলে,—কী দেখলি, কী বুঝলি নতুন মরদ ?

উত্তরের অপেক্ষায় না-থেকে বেদে বাউলে বলে,—জানিস,···আর দেখলিও তো, আমাদের বাদায় কে শিকার আর কে শিকারী তা বোঝাই দায় !

দশ

ঘটনাস্রোতের টানে এক অঘটন এনে দিলো জীবনে। গোসাবার জীবনে এ এমন কিছুই নয়। পাশের গাঁয়ের একটি মেয়ে গোসাবার হেমিল্টন স্কুলে পড়ে। ছেলেবেলা থেকে

গান-বাজনা তার প্রিয়। সেই সূত্রে গোসাবার বেদে বাউলের প্রতি আকর্ষণ। একই সূত্রে বেদে বাউলেও তার প্রতি আকৃষ্ট। এমন গান-পাগলা ও তার কণ্ঠসুরের এমন ভক্ত যে কোনও মেয়ে হতে পারে তা বাউলেরও ধারণা ছিলো না।

গোসাবার আনন্দময়তার সঙ্গে যে একবার জড়িত হয়েছে সে জীবনে ভুলতে পারবে না হেমিল্টনের কীর্তিকলাপ, ভুলতে পারবে না এক দুর্ধর্ষ বনের সংলগ্ন গোসাবার মতো এমন সুষমা-মণ্ডিত পরিবেশকে ও তার অধিবাসীদের।

সেই পরাধীনতা আমলের কথা। বিলাতের রাজবংশের নীল রক্ত গায়ে নিয়ে জন্মেছিলেন ডেনিয়াল হেমিল্টন সাহেব। অগাধ সম্পত্তির মালিক যেমন, তেমনি বৃটিশ শাসকযন্ত্রের উপর আধিপত্যও অগাধ। আসলে তাঁর মনোভাব ছিল প্রজাবৎসল জমিদারের। এই ধরনের প্রজাবৎসল অনেক জমিদার আমরা দেখেছি এই বঙ্গদেশেও। যাদের জন্য নুব্জেপড়া বহু চাষীরাও সহসা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি বৃটিশ আমলে। হেমিল্টন সাহেব নানাভাবে বৃটিশ শাসকদের বোঝান, ভারতের চাষীরা আজ শোষণের শেষ সীমায়, এরজন্য তাদের মধ্যে সমবায় আন্দোলন গড়ে না তুললে কখন যে আগুন জ্বলে উঠবে তার ঠিক নেই। সমবায় আন্দোলন গড়ে দেখাতে হবে যে তারা একত্রিত হয়ে মাজা খাড়া করে নিজের অন্ন ও বস্ত্র জোটাতে পারে।

হেমিল্টন তখন ভারতে আসেন 'পি-এণ্ড-ও' জাহাজ কোম্পানির সর্বময় কর্তা হয়ে। বেরিয়ে পড়লেন জলযানে। সন্ধান চললো, কোথায় তাঁর সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত করবেন, কোথায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবেন। পরিক্রমা চলে চব্বিশ পরগনার গোটা সুন্দরবন অঞ্চল ঘুরেঘুরে পুবে রায়মঙ্গল নদী থেকে পশ্চিমে মেদিনীপুর এলাকা পর্যন্ত। শেষমেষ গোসাবা অঞ্চলই হয় তার মনঃপূত। সরকারের কাছ থেকে বনের তিনটি পাশাপাশি দ্বীপ—গোসাবা, সাতজেলিয়া ও রাঙাবেলিয়া বন্দোবস্ত করে নিয়ে কাজে নামেন ১৯০৮ সালে। বাদার এই তিনটি দ্বীপকে প্রথমে আবাদে পরিণত করলেন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও উড়িষ্যার আদিবাসীদের আমন্ত্রণ করে ও তাদের বসতি বানিয়ে দিয়ে।

গোসাবায় গড়ে উঠতে লাগলো একের পর এক সমবায়গুলি —সমবায় ব্যাঙ্ক, সমবায় চালকল, সমবায় বিপণি, সমবায় মৎস্যজীবি ও আরও কতো নতুন ধারার সমবায়। পরীক্ষা চলতে থাকে —কীভাবে নোনাজলের দাপটকে উপেক্ষা করে ধান ফলানো যায়, কীভাবে ও কি সারের সাহায্যে খেজুর গাছের রস নোনতা না হয়ে উঠতে পারে, কীভাবে জমিকে এক-ফসলার জায়গায় তে-ফসলা করা যায়, কীভাবে আপৎকালীন ধর্মগোলা সমবায় পদ্ধতিতে গড়ে তোলা যায়, গভীর ও ভয়ঙ্কর শ্বাপদ সঙ্কুল সুন্দরবনে মাছ ও মধু আহরণের অভিযানগুলি কি করে নিরাপদ করে তোলা যায়। এমনি ধরনের অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার আবেগের যেন অবধি ছিলো না। গোসাবায় সে এক রমরমা অবস্থা।

গোসাবার মানুষের মধ্যেও উৎসাহ ও কাজের যেন জোয়ার আসে। হেমিল্টন সাহেব দেখলেন—এতো সব তো হলো, কিন্তু চাষীরা সবার আড়ালে মারা পড়ছে মহাজনী ঋণের দায়ে। যাকিছু চাষীরা আয় করে তার বাড়তি অংশটাই প্রতি সনে ঋণের সুদ মেটাতে মহাজনের ঘরে রেখে আসতে হয়। তিনি তখন প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে নিজে এক টাকার কাগুজে নোট ছাপিয়ে চালু করার অনুমতি আনেন। এই কাগুজে নোট গোসাবার গোটা সমবায় সংস্থাগুলিতেই মাত্র গ্রাহ্য ছিল। কাজেই কাজের মরসুমে নিজেদের সংসার চালাতে চাষীদের আর মহাজনের কাছে হাত পাঁততে হতো না।

সবই হলো। মায় রবীন্দ্রনাথও শ্রীনিকেতনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সমবায় হোতা হেমিল্টনের সঙ্গে শুধু যোগাযোগ করেন না, গোসাবায় এসে কদিন কাটিয়েও যান। গোসাবা এই পর্বে প্রায় সমবায় রাজ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। আশপাশের সমাজ ও গোটা দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা না বদলালে কেমন করে একটা দ্বীপ সমবায়-রাজ্য হয়ে টিকে থাকে। হেমিল্টন সাহেব মারা যান ১৯৩৯ সালে। তারপর থেকেই বাইরে থেকে ও ভিতর থেকে ধনী-মানুষেরা লোভের বাসনা মেটাতে কুরেকুরে ঘুণ ধরিয়ে দেয় সমবায়-রাজ্যে অসমবায়ের বিষে। এ-বিষয়ে কীভাবে নিজের কোলে ঝোল টানার কাজে এগুতে হয় তা ধনী মানুষদের করায়ত্ত। তাহলে কি হবে, সমবায় রাজ্য ভেঙে পড়েছে বটে, কিন্তু এ অঞ্চলে সাধারণ গরীব কৃষকদের মনে মনে এক গভীর টান রয়ে গেছে সমবায় প্রথায় দশে মিলে কাজ করার।

ফল্গুনদীর ধারার মতো মনের তলে এই টান ছিলো বলেই সাধারণ চাষীরা গোসাবার অতি সন্নিকটে রাঙাবেলিয়ায় আবার নড়েচড়ে উঠেছে ত্রিশ বছর কাটতে না কাটতে। শুধু উঠেছে না, সাতজেলিয়ায় মাধুরী ও সবুরকেও নাড়া দিয়েছে।

সূত্রপাত অতি সহজ ও সরলভাবে এসে পড়ে। পূর্বতন এক বিপ্লবী কর্মী গ্রামের আকর্ষণে রাঙাবেলিয়ায় হেমিল্টন উচ্চ শিক্ষালয়ে প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন। তাঁকে ডাকে সব ছাত্রছাত্রী এবং পাড়ার লোকও 'মাষ্টারদা' বলে। একদিন নিচের ক্লাসের একটি ছেলে তাঁর কাছে সকাল-সকাল ছুটি চাইতে আসে। ছেলেটি পড়াশুনায় ভারি ভালো ছিলো।

ছেলেটি আবেদন করে, —আমাকে আজ একটু আগে যেতে দিন মাষ্টারদা।

মাষ্টারদা হাতের বইয়ের দিকে মুখ রেখেই বলেন, —কেন রে, কি বল্ খেলতে যাবি ? তাই কি হয় !

—না, মাষ্টারদা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, পেট দুমড়ে উঠছে। বাড়িতে গিয়ে খেতে হবে।

—কেন, খেয়ে আসিস নি ?

—না, মাষ্টারদা আজ তিনদিন কিছু খাইনি। বাড়িতে খাবার কিছু ছিলো না। ভাতও বাড়ন্ত।

তাঁর নিজের ছেলের বয়সী ছাত্রটির দিকে বড় বড় চোখ করে বললেন, —কি বল্‌লি, তিনদিন খাস্‌নি !!

মাষ্টারদা তো হতবাক্। কি করা যায়, কি করা যায়—ভাবতে ভাবতে তো কিছুক্ষণ থমকে থাকেন।

সহসা আদেশ দিলেন, —যাও, সব ক্লাসে গিয়ে খবর দাও। যারা যারা তোমার মতো অভুক্ত আছে, তাদের সবাইকে আমার সঙ্গে এখনই দেখা করতে। আমার এই ঘরেই।

মুহূর্ত মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি কচি কচি ছেলেমেয়েরা মাষ্টারদার ঘরে হাজির।

মাষ্টারদা এবার শুধু হতবাক্ নয়, হতভম্বও বটে। মনে মনে ভাবেন, এ কেমন করে হয়। কেমন করে আমি এদের অভুক্ত রেখে পড়াই !! না, তা হয় না।

প্রথম ধাক্কায় ভেবে বসেন, এদের স্কুলেই খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য সব মাষ্টারদের ডেকে তাদের মতামত নিয়ে ঠিক করে ফেলেন, স্কুলেই এদের খাবার খাওয়াতে হবে। সব মাষ্টাররা মিলে চাঁদা তুলে খিচুড়ি বানিয়ে খাওয়াতে হবে। হলোও তাই।

হলো বটে, অন্তত শিশুদের খালি পেটে পড়া মুখস্থ করতে হচ্ছে না। কিন্তু মাষ্টারদার মন আবারও বিচলিত হয়ে ওঠে— খয়রাতির অন্ন খাইয়ে চাষী পরিবারদের যে ভিক্ষুক বানাতে বসেছি। না, এ হয় না ! না, এভাবে হয় না ! হওয়া উচিত নয়।

এক একজন মানুষ থাকে, তারা পথ খুঁজে না পেলে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। মাষ্টারদাও তেমনি একজন লোক। পথ খুঁজে না পেতে, পুরোনো ছাত্রদের জড় করে বললেন,—তোমরা এক কাজ করবে ? গ্রামের এবং তোমাদের নিজেদের ঘরগুলির কার কি অবস্থা তা খুঁজে পেতে জোগাড় করে আনবে ? তোমাদের সংসারে একটা কিছু বাড়তি আয় যে কোনও ভাবে আনতেই হবে। তারই জন্য এই কাজে নামতে হচ্ছে।

আমাদের সকলের বাড়তি আয়—এই আওয়াজ হেমিল্টনের আমল থেকেই বেশ চাউর ছিলো এই গের্দে। কাজেই এতে যে খুব একটা উৎসাহের জোয়ার এলো তা নয়। এবং উল্টো সুরে নানা লোকে নানা কথা পাড়ছে। বেশি জমির মালিকেরা তো সন্দেহবাতিক হয়ে উঠেছে—কি জানি, এ আবার কি নতুন মতলব!

কিন্তু ধীরে ধীরে কাজের পদ্ধতিটাই চাষীদের আকৃষ্ট করে তোলে। পাড়া কমিটি তৈরি হয়েছে। মাষ্টারদাকে অনেকে চুপেচুপে, কখনও বা সকলের সামনে প্রশ্ন করে,—কে কে এই পাড়া কমিটিতে কাজ করবে ?

মাষ্টারদা কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড় না করে বলেন,—কেন ? সবাই কাজ করবে, পাড়ার সবাই।

—তা না হয় হলো, খবরাখবর নেবার পর কি করা হবে ?

মাষ্টারদা তড়িৎ উত্তর দেন,—সে আমি জানি না। কেন, পাড়া কমিটিই সবই ঠিক করবে। কোনটা করলে তোমাদের ভালো হয় তা তো তোমরাই ভাল বুঝবে। তাই না ?

এই পাড়া কমিটি এক অভিনব জিনিস গড়ে উঠেছে রাঙাবেলিয়ায়। পাড়া কমিটির সভায় চত্বরভর্তি চাষীরা এসে বসে। সবাইকে এই সভায় মুখ খুলতে হয়। আলোচনা, তর্কাতর্কি অগোছালো ভাবে চলে সন্ধ্যা থেকে রাত দুটো-আড়াইটা অবধি। সবাই মিলে পথ খুঁজে বের করতে হবে। আর সে পথকে কাজে রূপ দিতে হবে সবাইকেই—যে যেমন ভাবে পারে।

দু বছরের মাথায় এই পাড়া কমিটি ঠিক করে— আমরা এবার ফসল তোলার পর যে-ছ সাত মাস জমি পড়ে থাকে তাতে লঙ্কার চাষ করে পরখ করতে চাই কিছু করা যায় কিনা।

চেষ্টাও হলো অনাবিল ভাবে। তেমনি মরসুমে লঙ্কাও দেখা দিল অপরিমিত ভাবে। যে মাঠ লঙ্কার সাদা সাদা ফুলে চিত্রিত হয়েছিলো, তা এখন ছেয়ে গেছে সবুজ আর লাল রঙের আভায়। ক্যানিং, বাসন্তী প্রভৃতি গঞ্জ থেকে ফড়েরা এসে কখনও লোভ, কখনও ভয়, কখনও বা গোমর দেখিয়ে দাম নামমাত্র পড়তায় আনার চেষ্টা করে। বসলো পাড়া কমিটি। সবাই মিলে ঠিক করলো—না, আমরাই নিয়ে গিয়ে কলকাতার পোস্ত-বাজারের আড়তে বেচবো। হলোও তাই। কিন্তু এখন মোক্ষম সমস্যা—টাকা কীভাবে বাটা হবে চাষীদের। আবার সেই পাড়া কমিটি। জমির পরিমাণ ও শ্রমের নিবিড়তা অনুযায়ী ভাগাভাগীটা নির্দিষ্ট হলো। বাকি টাকা পাড়া কমিটির নামে গচ্ছিত রইলো আগামী সনের কাজকারবারের জন্য। এই মীমাংসা করতে পাড়া কমিটিকে তিনদিন রাতভোর সভা করতে হয়েছে।

সর্বসম্মত মিটমাট হলো বটে, কিন্তু কোনো তিক্ততা যে আসেনি তা নয়। রেষারেষি, রাগারাগি ও বড়জোতের মালিকদের নষ্টামি যে হয়নি তা বলা যায় না। তবে সবকিছু মিলিয়ে এই লঙ্কাচাষের অভিজ্ঞতা এনেছে রাঙাবেলিয়ায় এক নতুন প্লাবন—উৎসাহের জোয়ার, আনন্দের তুফান, আর সর্বোপরি মানুষের মনের আত্মবিশ্বাসের পদচারণ। বনের বাঘ যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুন্দরবনে বিচরণ করে—রাঙাবেলিয়ার মানুষের পদক্ষেপে যেন সেই আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে।

দেখতে দেখতে কতো দিকেই না এই অঞ্চলের মানুষেরা সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নতুন ধরনের চাষ, তুলোর চাষ, আখের চাষ, দুধের কারবার, তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ, শুয়োর-হাঁস-মুরগী পালন, মাদুর বোনা, মায় কলের নাঙল চাষ আর তার মেরামতির কারখানা—এমনি ধারা অগণিত কাজে ও কারবারে রাঙাবেলিয়ার মানুষ পাড়া কমিটির অধীনে আর সমবায় কাজের পথে নতুন জীবন গড়ে তুলছে। এই নবতম জীবনের প্লাবন যে উপচে গোসাবা ও সাতজেলিয়ায় এসে পড়বে কোন্ পথে তা ভাবা যায়নি।

এগারো

ভাবা যায়নি বটে, কিন্তু রাঙাবেলিয়ার সে-প্লাবনের ঢেউ প্রথমেই এসে পড়েছে দুই ভাই-বোনের জীবনে এক বিচিত্র পথে।

সাতজেলিয়া আর গোসাবার সীমানা রাঙাবেলিয়া খালের খাদ। বর্ষাকালে এই খাল পার হতে হয় খেয়ায়। কিন্তু শীত ও গরমে এই খাল মাধুরী তার শাড়ি হাঁটু অবধি তুলেই পার হয়ে যায় গোসাবার হেমিল্টন স্কুলে। সঙ্গে অবশ্য তার ভাই সবুরও থাকে। আজও ছিল। খাদের কিনারা থেকে দিদিমণির ডাক। শুনতে পায় কি না পায় তাই হাতছানি দিয়েও দিদিমণি মাধুরীকে ডাকেন।

দূর থেকে দেখেই বুঝেছে—রাঙাবেলিয়ার দিদিমণি না হয়ে যায় না। ছুটে এসেছে খাদের পলিমাটির আস্তরণের উপর দিয়ে হরিণীর মতো। সঙ্গে সবুরও ছুটে আসে।

দুজনেই দিদিমণিকে প্রণাম করে ; মাধুরী তো প্রায় ঢিপ করে পলিমাটিতে মাথা ঠেকিয়ে পায়ের ধুলো নেয়।

—এসো মা! —বলেই দিদিমণি মাধুরীকে বুকে জড়িয়ে প্রশ্ন করেন, —তা মা এতো দেরি কেন ?

—গোসাবার স্কুল কি এখানে! খেয়া-ঘাটে আসতে কি কম ঘুরতে হয়। তা দিদিমণি, আপনি আমাকে চিনলেন কি করে ?

—চিনলাম কি করে। তা তোমাকে রাঙাবেলের কে না চেনে। সেই সেবার যে তুমি গাইলে থিয়েটারে, অভিনয় শুরু হলো তোমার গান দিয়ে—'মণি ঘুমলো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে।' ছত্রটি সুর করে গেয়ে দিদিমণি মাধুরীর আরক্তিম কর্ণমূলে কোমল হাতে স্পন্দন তুললেন, যেন মরা স্রোতের কূলেই তখন-তখুনি ঘুম পাড়াতে চান মাধুরীকে।

মাধুরী বিগলিত,—মা! সেদিন তুমি সেখানে ছিলে ?

—শুধু থাকিনি, সেদিন থেকেই ভেবে রেখেছি তোমাকে আমি আমার কাছে আনবো। জানো মা-মাধুরী, আমরা একটা সাংস্কৃতিক ক্লাব খুলেছি।

মাধুরী আর বলতে দিতে চায় না, আকুল আবেদন করে,—মা, বলবে আমার বাবাকে আমাদের রাঙাবেলে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে ?

সবুরের কান খাড়া হয়ে ওঠে উৎকণ্ঠায়। এতোক্ষণ খাদের শুকনো ঢালে বড় একটা কচুরিপানার ঝোপের ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে ছিলো। এবার গলা বাড়িয়ে দিদিমণির কপোল-দেশের ওপর চোখের পাতা মেলে ধরেছে।

দিদিমণি বলেন,—সে কথা পরে হবে। চলো মা, আমরা এবার এগুই। স্কুল থেকে এসেছ, এখন কিছু খেতে হবে তো! ...কিন্তু তোমার বাউলেদা, তোমার গানের গুরু তোমাকে গোসাবা ছাড়তে দেবে তো ?

—না মা, তুমি বাউলেদাকে চেনো না তো ! অমোন দিলখোলা মানুষ হয় না, কোনো দ্বেষ-বিদ্বেষ কারো প্রতি নেই। সে শুধু বাঘ-পাগলা আর গান-পাগলা। বাউলেদা খুশিই হবে। খুশি বলে খুশি! আমিই তাকে রাঙাবেলের গানের আসরে নিয়ে আসবোই।...বাউলেদার কথা উঠলে মাধুরী যেন থামতে চায় না। সবুরও বুঝি কাছে এসে দিদির হাত ধরে ঝুকেছে কিছু বলার জন্য ওদের বাউলেদার বিষয়ে।

দিদিমণি আবারও ব্যস্ত হয়ে বললেন,—চলো মা, সব হবে, সব হবে। চলো এবার এগুই।

কোমল 'মা' ডাক মায়ের জাতের মনের তারে আপনা থেকে ঝঙ্কার ওঠে। এই বনবাদাড়ের দেশেও তার ব্যতিক্রম নেই।

দিদিমণি ও মাধুরী এবার কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। দিদিমণির হাত মাধুরীর বাহুতে মমতা-ঝরা আঙুলে আঁকড়ে ধরা। আরেকজন বোধহয় ধরার মধ্যে নয় ; সে চলেছে বেশ কয়েক পা পিছে পিছে! ধর্তব্য নয় বটে, কিন্তু এমন ভাই-বোন পাওয়া বোধহয় সংসারে দুর্লভ। আমাদের মহাকাব্যদ্বয়ে ভাই-ভাইয়ে মিল-মিশের কথা আছে, আছে রামলক্ষ্মণের কথা। কিন্তু ভাই-বোনের কথা মেলা দায়। ইতিহাসে আছে অবশ্য হর্ষবর্ধন ও রাজশ্রীর কথা। সে তো জানা আছে একমাত্র লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েদের মধ্যে। তবে এই বাদা-বনে অবশ্য বনবিবি ও সা-জাঙ্গুলির কথা যেন সহসাই এদের মনে ভেসে ওঠে। মাধুরী ও সবুর যেন একাত্মা। একে অপরকে সর্বক্ষণ আগল দেয়। তাই বলে সবুর দিদির ন্যাওটা নয়। দরকার হলে দিদির কাজে বাধা দেয়, মান-অভিমান করে।

ওরা অনেক দূর এগিয়েছে। দুটি পাড়া পার হয়ে গেছে। কোথাও বাড়িগুলি ঘিঞ্জি, কোথাও বা ক্ষেতি জমি ফারাক, তবে ডাকের মাথায়। আবাদ অঞ্চল, বিপদের সীমা নেই। তাই কেউই অন্য বাড়ির ডাকের মাথার বাইরে থাকতে চায় না। আর কিছুটা দূর এগুলেই দিদিমণি ও মাধুরীদের দুদিকে যেতে হবে। বাঁ দিকে রাঙাবেলের পথে দিদিমণিকে, আর ডান দিকে সাতজেলের গোমর নদীর তীর অবধি যেতে হবে মাধুরীদের।

এমন সময় পাশের এক বাড়িতে ভীষণ চিৎকার—বাচ্চা একটি ছেলের তীব্র কান্নার চিৎকার আর সেই সঙ্গে বাঁশের বাখারির চটাং চটাং শব্দ। তাড়াতাড়ি ওরা এগিয়ে দ্যাখে, কানাই মণ্ডল ছোটো একটি ছেলেকে বেদম প্রহারে মত্ত। কানাই মণ্ডল সাতজেলের এক সম্পন্ন চাষী। কিছু ধান তার কাছে সব সময়ই থাকে, তবে গোলাজাত করার মতো নয়। মণ্ডল চিৎকার করছে,—করবি আর! বসে বসে সময় নষ্ট করবি! গরুটা জাব্‌না না খেয়ে মরে গেলে তোর শাস্তি! ধান নেবার সময় মনে ছিলো না! এক একটা কথা বলে আর গিরো-রাখা চটা বা বাখারির চটাং চটাং কষাঘাতে ছেলেটির পিঠ ও হাত রক্তাক্ত করে দিচ্ছে। মণ্ডল উত্তপ্ত।

সবুরকে ডেকে দিদিমণি জানতে চান ব্যাপারটা। সবুরের কাছাকাছি বয়স ছেলেটির। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। ওর মা মণ্ডলের কাছ থেকে গত সনে দুবস্তা ধান হাওলাত নেয়। সর্ত ছিলো, যতোদিন শোধ না হয় ততোদিন ছেলেটা মণ্ডলের বাড়িতে থাকবে ও খাটাখাটি করবে। ছেলেটার বাড়ি আরও কিছুটা এগিয়ে একটা ছিলে-ভেড়ির গায়ে।

বৃত্তান্ত শুনে দিদিমণির চোখে জল এসে যাবার মতো। বলেন, —চলো, আমরা সবাই ছেলেটির মা-র কাছে একবার যাই।

ছেলেটির বাবা বেশ কয়েক বছর আগে বনে মাছ মারতে গিয়ে বাঘের কামড়ে মারা

যায়। বাড়িতে বিধবা মা ও ছেলে। এদেশে তেমন রেওয়াজ থাকলেও মা আর বিয়ে করতে চায়নি। কাজেই এ বাড়িতে আর কোনও মরদ নেই।

ছেলেটির কান্নার চিৎকার ওদের বাড়ি থেকেও শোনা যায়। ওর মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলো সেই আর্তনাদ আর নিজের মনেই বিড়বিড় করছিলো। এদের তিনজনকে খিড়কিতে দেখেও এতোটুকু নড়চড় নেই। যেমন বিড়বিড় করে শাপান্ত করছিলো, তেমনি ভাবেই করতে থাকে,—মার্ছে, বেশ করছে !! পেটপুরে ভাত খাবার সময় মনে থাকে না ! মনে থাকে না !! এক সানুক ভাত না নিলে পেটই পোরে না ওনার ! তরকারি নেই, তবু শুকনো ভাত গোগ্রাসে গিলতে হবে ভর্তি এক সানুক ! মার খাচ্ছিস ? খা···খা···খা, ···ভাল করে বুঝে নে, বুঝে নে কতো ধানে কতো চাল ! —বিড়বিড় করেই চলে !

দিদিমণি মাষ্টারদার গিন্নি। নিজেও দু-ছেলের মা। আগে ছিলেন কলকাতার এক স্কুলের মাষ্টারনি আর সেই সঙ্গে করতেন 'মহিলা সমিতি'। রাঙাবেলিয়ায় এসে 'মহিলা সমিতি' করার চেষ্টা করছেন। জানা আছে কলকাতার চাকুরিজীবী মেয়েদের, বস্তির মেয়েদের নিয়ে কি করে সমিতি গড়ে তুলতে হয়। কিন্তু বাদাবনে চাষী মেয়েদের কেমন করেই বা জমায়েত করা যায়, এই তাঁর ভাবনা। ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে এখন খানিকটা দুরস্ত হয়ে উঠেছেন।

ছেলেটির মা যেমন বিড়বিড় করছে তেমনিভাবেই বিড়বিড় করতে দিলেন, আর মাধুরী ও সবুরকে সঙ্গে নিয়ে সোজা খুপরির সবে গোবর লেপা হাতনেটার দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা ছেঁড়া মাদুর মেলে পা তুলে লেপটে বসে পড়লেন তার ওপর। ওদেরও টেনে বসালেন।

মাধুরীকে আস্তে আস্তে বললেন,—দেখেছো মাধুরী, অভাবের যন্ত্রণায় এরা মায়ের মনও হারাতে বসেছে ! কোনও পথ না পেয়ে, মা হয়েও ছেলের বাপান্ত সমানে কেমন করে চলেছে। খালি পেটে যেমন লেখা-পড়া হয় না, তেমনি পেটের জ্বালানিতে পড়লে মা আর মা-ও থাকে না। কি করি বলো তো ?

—ও ছেলের মা—বেশ জোরেই ডাক দিলেন দিদিমণি। 'এসো না এদিকে'—বলতেই পাগলের মতো গোটা উঠোনটা এক ঘুরপাক খেয়ে আস্তে আস্তে কাছে এলো। তখনও মুখে গালির অন্ত নেই। দিদিমণি আর কিছু না বলে, হাতে বোনা পাশ-থলি থেকে এক খিলি পান ছেলের মা-র দিকে এগিয়ে দিলেন। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে এসে দিদিমণির এই পান খাওয়া অভ্যাস। পান মুখে দিলে কথা নেই, গ্রামের মেয়েরা তাদের সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে মাটি লেপটে বসে যায়। কাঁচা সুপুরি, আস্ত পান, যাঁতি আর চুন থাকলে তো রক্ষা নেই। তাই এ সবকিছু নিয়েও দিদিমণি এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘোরেন।

সত্যি সত্যি পান দেখে ছেলের-মা ডোয়াতে লেপটে বসে গেলো। শান্ত হয়েও এলো যেন। তখন দিদিমণি হঠাৎ বলেই বসলেন,—ধান তো ধার নিয়েছ বছর খানেক আগে, এবার শোধ দেবার ফিকির খুঁজতে হবে, তাই না ?

একটু ভাবনায় মাথা নিচু করে বলে,—দিদিমণি, আমার মাথায় তো কোনও ফিকির আসছে না। মাথায় আসবে কি, আমি তো পাগল হয়ে গেছি ?

—কেন, তুমি কোনও কাজ-টাজ জানো না ? ধরো, সুইফোঁড় জানো তো ? —আচ্ছা তোমাকে কিছুটা নতুন কাপড় এনে দিচ্ছি, তুমি সায়া কয়েকটা বানিয়ে ফেলো না। ···বিক্রীর কথা বলবে তো ?

এবার একটু থেমেই বললেন, —বেশ, এই আমার মা-মাধুরী রইলো। ও গিয়ে এ-বাড়ি

ও-বাড়ি থেকে আগাম অর্ডার নিয়ে আসবে । তারপর সায়া পৌঁছে দিয়ে দামটাও নিয়ে এনে তোমাকে দেবে ।

ছেলের মা এবার চিন্তিত । ভাবে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো ।

দিদিমণি আবারও বলেন, —তোমার ভাবতে কিচ্ছু হবে না । তবে সেই টাকাটা সবটা খেয়ে ফেলো না । বেশ কিছুটা রেখে দেবে । নতুন অর্ডারের জন্য আবার নতুন কাপড় এনে তোমাকে দিতে হবে তো । তাছাড়া, তোমার কর্জ-ধানটাও তো শোধ দিতেই হবে তো ।

দিদিমণি এবার পানের খিলি নয়, পানের বাটাও মেলে ধরেছেন । যাঁতি ও সুপুরি ছেলের-মার হাতে দিয়ে বললেন, —কাটো, খুব মিহি করে কেটো কিন্তু ।

সবুরের তো ছোট্ট যাঁতিখানা দেখে হাসি পেয়ে গেছে । সুপুরি কাটতে কাটতে সেই হাসির দিকে তাকিয়ে ছেলের মা-ও হেসে ফেলেছে । কিন্তু হাসবে কি, তার নিজের ছেলের কান্নার সুরটা যে তখনও বুকে বিঁধে আছে । তবুও সে হাসে ।

হাসে । দিশেহারা হয়েই হাসে । দিদিমণি এমন তড়িঘড়ি সব প্রস্তাব এনে ফেলেছে যে হাসি দিয়ে সবই মেনে নেওয়ার কথা যেন তাঁকে জানিয়ে দিলো ।

ধীরে সুস্থে পানের বাটা গুছিয়ে নিয়ে ওরা তিনজনে আবার পথ ধরলো । ছেলের মা-ও নিজের খাটো তবনখানা টেনেটুনে সভ্য-ভব্য হয়ে খিড়কি অবধি এসে বিদায় দিতে কসুর করে না ।

দিদিমণিকে এবার রাঙাবেলের পশ্চিমমুখো পথটা ধরতে হবে । মাধুরীকে আবার কাছে টেনে পিঠে হাত রেখে বললেন, —মা-মাধুরী, এবার তো তুমি আমাদেরই হয়ে গেলে । কাজে লেগে যাও । ঠিকমতো দুদিনের মধ্যে কয়েকটা সায়ার অর্ডার এনে ফেলো । আর কি ? তোমার স্কুল বদলাবার কথা বলবে তো ? দুদিনের মধ্যে তোমার বাড়িতে এসে তোমার বাবাকে সব বুঝিয়ে বলবো । তুমি নিশ্চিন্ত থেকো ।

সবুর একবার দিদির দিকে তাকায়, আরেকবার দিদিমণির দিকে ।

সবুরের গায়ে হাত দিয়ে দিদিমণি বলেন, —আরে বুঝেছি, তোকে ভাবতে হবে না । তোকে তো টেনে নিয়ে চলে আসবো । এমন দিদি আর ভাইকে কি আলাদা করা যায় । তোদের বাড়ি তো সাতজেলে, তোদের নিয়ে আসতে গোসাবার স্কুল কখনই আপত্তি করবে না । রাঙাবেলে তো বলতে গেলে সাতজেলের মধ্যে ।

সবুরের সে-ভাবনা নয় । সবুরের ভাবনা বাউলেদাকে নিয়ে । তার কাছ থেকে ওদের ছাড়াছাড়ি না হয়ে যায় । দিদিমণি বুঝতে না পারলেও মাধুরী ঠিকই ধরে ফেলে বলে, —আরে যা, তোর ও কথা ভাবতে হবে না ।

মাধুরীর শাসনের তোড় দেখে দিদিমণিরও বুঝতে আর বাকি রইলো না, —আরে, সে কথা তো তখনই বলেছি । বাউলেদাকে তো বলতেই হবে । অমন গুরুর কাছ থেকে কি অমন শিষ্যাকে বিনা অনুমতিতে ছিনিয়ে আনা যায় । ...আরে তা কেনো, আমি তো ভাবছি, বাউলেদাকে আমাদের গানের ক্লাবে নিয়ে আসবো । ঠিকই নিয়ে আসবো । ...মাধুরী, তোমাকে কিন্তু একদিন সেই গানটা আমাকে শোনাতে হবে ।

—কোন্ গানটা দিদিমণি ?

—আরে, সেই যে গানটা, —সুর টেনে বলেন, —'মণি ঘুমলো, পাড়া জুড়ালো...'

তিনজনে এবার একসাথেই হো-হো করে হেসে উঠলো । দিদিমণি সেই হাসির ঝোঁকেই রাঙাবেলের পথ ধরেছেন আর মায়ের গলার মিষ্টি সুরে সেই গানের লহরী দূর থেকে ভাই-বোনের দিকে ভাসিয়ে দেন ।

দুই ভাই-বোনে বাড়ির পথ ধরেছে। হাটি-হাটি করে ধীর পায়ে এগুচ্ছে। দুজনেরই অধরে হাসির রেশটা লেগেই আছে। মাথা হেলিয়ে কান খাড়া করে দিদিমণির সুরের শেষ টানটাও বুঝি শুনতে চায়। বেশ কিছু সময় দুজনারই কোনো কথা নেই। হঠাৎ সবুর উদ্বেলিত হয়ে বলে, —দিদি—দিদিমণি যেন একেবারে মিঠেপানি ! তাই না !

দিদি নিরুত্তর। নোনাপানির দেশে মিঠে পানির আকর্ষণ অমোঘ। দিদিমণির প্রতি এই টানের এক মহা কারণ হলো—দিদিমণিও যে আরেক গানের পাগল। শুধু সুরের পাগল নয়, গানের পদরচয়িতাও। এ দেশের চাষী, জেলে, তাঁতি ও আদিবাসীদের জীবনের ছন্দ তাঁর পদচারণায় তুলে ধরে তাতে সুর যোজনা করেন। সে সুরগুলিও এই নোনাদেশের হাওয়ায় যেন মিশে আছে—ভাটিয়ালি, বাউল, ঝুমুর বা টুসুগানের সুর। এই সব সুরের মেশাল দেওয়া দিদিমণির রচিত একটি গান এরই মধ্যে অনেকেরই পছন্দ :

রক্তে ভেজা মাটি সোনার চেয়ে খাঁটি,
দিনে রাতে খাটি করছি পরিপাটি।
জান দেবো তবু ধান দেবো না,
মাটির দাবি ছাড়বো না।
বাঘের সাথে লড়াই করে হটিনি
মোরা হটবো না।

এমন ধরনের দিদিমণি এই দুই ভাই-বোনকে এতো সহজেই যে নিজের কোলে টেনে নেবেন, তা মোটেই বিচিত্র নয়। শুধু কথায় নয়, কদিনের মধ্যেই দিদিমণি ওদের বাবা ও মা-র সঙ্গে দেখা করে তাদের রাজি করিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাউলেদাকেও পাকড়াও করেছেন। মাধুরী ও সবুর রাঙাবেলে তো আসবেই, বাউলেদাকেও রাঙাবেলে গানের ক্লাবে আসতে হবে গান শেখাতে। মাধুরী রাঙাবেলে যাচ্ছে শুনে বেদে বাউলের প্রথমে ওখানে যাবার লোভ হলেও, আপত্তি জানালো।

বিনীতভাবে বলে —আমি গিয়ে কী করবো। আমি তো কালোয়াতি গান জানি না, সুরের সূক্ষ্মভাঁজও জানি না। আমি ক্লাবে কেমন করে গান শেখাবো ?

দিদিমণি তক্ষুণি বলেন, —আমি কি তাই বলছি। তোমার কাছ থেকে কি সূক্ষ্ম কালোয়াতি গান শিখতে চাইছি ! সাদামাঠা গান, ধরো নদীর গান, বনের গান, চাষের গান, মাঝির গান, বনবিবি পুজোর গান, টুসু গান—এমনি ধরনের গান শেখাতে হবে। পারবে না ?

—মোটেই পারবো না বলি কি করে ? মাধুরী তো অনেকগুলিই শিখে ফেলেছে। তিনবারের বেশি চারবার ওকে শোনাতে হয় না গানটা। তবে পদগুলি মুখস্থ করতে যা একটু দেরি হয়। ভারি লক্ষ্মী মাধুরী।

—তোমার মুখে আর মাধুরীর খ্যাতি শুনতে হবে না !!

বাউলে উৎসাহিত হয়ে বললো, —দিদিমণি একটা গান শুনবে ?

উত্তরের অপেক্ষা না করে বাউলে গলা খাঁকার দিয়ে মোটা গলায় গান ধরলো :

'মাগো, রেশমী চুড়ি আর পরো না।
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্মসাক্ষী,
জগৎজুড়ে আছে জানা।
মাগো, রেশমী চুড়ি আর পরো না

—আরে, এ গান তুমি শিখলে কোত্থেকে ? এ স্বদেশী গান তো মুকুন্দদাসের !

দিদিমণির হাতে চারগাছা রেশমী চুড়ি ছিল, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বাউলে বললো,—আমার আদিবাড়ি তো তুমি জানো না দিদিমণি ! আমার আদিবাড়ি বাড়ুলি কাটপাড়া, খুলনা জেলায় । সেখানে ছেলেবেলায় মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রা গান শুনে আমি পাগল হয়ে যেতাম । বাবরি চুলে গেরুয়া ফেটা আর আলখেল্লা পরে গলায় সোনার মেডেলের মালা ঝুলিয়ে দরাজ গলায় সে কি গান তোমাকে বলবো ! মেয়েরা শুনে তো পাগল হয়ে যেতো, চিকের এপার থেকে শোনা যেতো, ঝম্‌ঝম্ করে সবাই হাতের রেশমী চুড়ি ভেঙে ফেলছে !!

দিদিমণি বাউলেদাকে উৎসাহ দেবে আর কি, নিজেই এখন উৎসাহিত ! বলেন, চলো বাউলেদা, চলো আমাদের আড্ডাতেই তোমার স্থান, চলো ।

বারো

শেষ পর্যন্ত যে যার সঠিক স্থানেই চলে এসেছে যেন । তবে গানবাজনা তো একটা মাধ্যম মাত্র । টাগোর সোসাইটির বুঝি প্রধান কাজ, মানুষের কোমরে বল এনে দেওয়া । যাতে কিনা তারা মাজা খাড়া করে দাঁড়াতে পারে সমবেত কাজের মধ্য দিয়ে । সে-কাজে মাধুরীই বা কম কি ! রাঙাবেলে থেকে মাধুরীকে হাতে খড়ির কাজ দিয়েছে—সাতজেলের বিধবাপল্লীর সমবায়গুলি পাড়া কমিটির মাধ্যমে সজীব করে তোলা । কতোটা সে নেত্রী হয়ে উঠবে, সে তো ভবিষ্যতের কথা । তবে সংগঠনকে সজীব করে তুলতে আপাতত আবশ্যক ঘোরাফেরা করা, পাড়ায় পাড়ায় প্রতি বাড়ি-বাড়ি যাতায়াত করা । এ-কাজে তো মাধুরীর নেশা অঢেল । সে-নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে সবুরের জন্য —সে তো দিদির পিছু-পিছু ফেউ-এর মতো সর্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে আছে ।

বিধবাপল্লী, এ এক অভিনব নাম । কোনও বসতির এমন নাম অন্য কোথাও মেলা দায় । নামের মধ্যে যেন একটা চাপা বেদনার ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে ওঠে । না, সেটাই শুধু নয় । সুন্দরবনের জীবন যুদ্ধে লড়াকু মানুষের বিক্রমও প্রতিষ্ঠিত এই নাম-করণে । সুন্দরবনে সবচেয়ে সাহসী শ্রেণী বোধহয় জেলেরা । ডিঙি ও জাল নিয়ে ওরা যায় সুন্দরবনের নদী, খাল, পাশ-খাল ও শিষের মুখে, রাতে ও দিনে । শুধু শিষের মুখে নয়, এরা যায় সাগরের মুখেও ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে । এরা একমনে নিজের শিকারের প্রতি বোধহয় অর্জুনের মতো স্থির, অপলক ও একাগ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দুনিয়া ভুলে থাকে । আর সেই সুযোগে বনের হিংস্রতম জীবও আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের লক্ষ্য করে । চলে হাতাহাতি । কারণ, এদের তো বন্দুক নেই । থাকলেও বন্দুক উঁচিয়ে রেখে. আর যাই হোক মাছ মারা দায় । এই হাতাহাতির ফলে কখনও বাঘ পালায়, কখনও বা জেলেদের প্রাণের মূল্য দিতে হয় । তাই বিধবার মতো অঘটন প্রায়ই লেগে থাকে জেলেদের সমাজে । সংসার ভাঙার মতো এমন 'সব্বনেশে' অবস্থাকে জেলে-বধূরাও বীরের মতো লড়ে যায় । কখনও নিজেরাই খেটে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে, কখনও বা বিধবা-বিবাহ মেনে নিয়ে নতুন করে সংসার গড়ে ।

নদীর চরা জমি বরাবর এদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই । আর কিছু না হোক এদের প্রতি সংসারে একখানা জেলে-ডিঙি ও জাল আছে । জাল শুকোবার ও ডিঙি মেরামতির কাজে এরা নদীর গায়ে চরা জমি বেছে নেয় । কোনও বিপদকে এরা বিপদের মধ্যে ধরে না —ঝড়, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণি, বন্যা, খরা, বাঘ, কুমির, সাপ—না কিছুই না । ডিঙিই এদের কাছে

সর্ববিপত্তারিণী। যেমন খুশি, যেদিক ইচ্ছে চলে যাবে গোটা সংসারটা নিয়ে, আবার ফিরে আসবে পয়লা সুযোগেই। সকল বিপদ-আপদে একমাত্র কামনা—নদীতে মাছের আকাল যেন না হয়!

সাতজেলে প্রথম বিধবাপল্লী সৃষ্টি করেন হেমিল্টন সাহেব। নানা সুযোগ সুবিধে দিয়ে জেলে-বিধবাদের প্রতি মঙ্গল কামনায় এই বিধবাপল্লীর অবতারণা। সমবায়ে কাজকর্ম করা এদের যেন সহজতর প্রবণতা। সে সমদ্দুরের মোহানাই হোক, আর বনের নদীর ত্রিমোহানাই হোক—বিস্তৃত জাল চাই আর দলবদ্ধ মানুষ চাই মাছের লাটকে ডাঙায় তুলতে। কাজেই হেমিল্টন সাহেবেরও এদের প্রতি টান ছিলো। সহজে এদের নিয়েই বুঝি সমবায় পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাবে।

সাতজেলের পুবে নদীর ছড়াছড়ি—গোমর নদী, গাড়াল নদী, কর্জরা নদী, কচুখালি নদী, মেলমেলে নদী। এই সব নদীর মুখে ও চরে সাতজেলের বিধবাপল্লী। এই নদীগুলি এতো কাছাকাছি যে সাতজেলের বিধবাপল্লীর তীরে দাঁড়ালে প্রায় সবগুলি নদীর হাওয়া এসে মাধুরীর বুকে ও আঁচলে মৃদু ঢেউ তোলে। মজাই লাগে মাধুরীর, আর সেই ফাঁকে সবুরও ছোট্ট একখানি ডিঙি বেছে নিয়ে যে-কোনও একটা মোহনার দিকে ভাসিয়ে দেয়। মাধুরী ভয়ে ভয়ে এক-নজরে তাকিয়ে থাকে ডিঙিখানির দিকে— পাছে সবুর ভুল করে গাড়াল নদী ছেড়ে অন্য কোনও গাঙে ঢুকে পড়ে। ঢুকলে মাধুরীর কিছু করার নেই। তবু ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে,—হয়তো দূর থেকে ওকে দেখে দিশেহারা হবে না ওর ভাই। মমতা জাগে ভাই-এর প্রতি অপরিসীম। আর সেই সঙ্গে মমতা উৎসারিত হয় ওর বুকে—বিধবাপল্লীর মানুষদের প্রতি, মমতা জাগে দিদিমণির প্রতি, মমতা জাগে বাউলেদার প্রতি। মাধুরী তখন গান গেয়ে ওঠে আনমনে।

অনেকদিন হলো মাধুরী বিধবাপল্লীর কাজে মেতে উঠেছে। এদের মূল সমস্যা খাতকের। যখনই দল বেঁধে এরা মাছ ধরতে যায়, তখনই এরা মহাজনের খপ্পরে পড়ে। মহাজনেরা যেন কতো কৃতার্থ হয়ে এদের টাকা ধার দেয়, মোটা টাকাই দেয়। জেলেরা তখন নিজের হাত-খরচা বাবদ সামান্য একটা অংশ রেখে বাকিটা বউদের হাতে সংসার খরচ বাবদ দিয়ে যায়। তাহলে কি হবে! ডিঙি ভর্তি মাছ ধরে আর বাড়ি ফিরতে হয় না ওদের। মহাজনেরা সুদে-আসল দেখিয়ে মাঝপথেই সব মাছই নিয়ে যায়। দুটো মাছও খাওয়ার বাবদ এরা আনতে পায় না বাড়িতে। এদিকে সুদের হিসেব বড় কড়া; ডবল সুদ দিয়েও এদের হাত থেকে বাঁচা দায়।

মহাজনের খপ্পর থেকে বাঁচনই জেলে-পল্লীর প্রধান সমস্যা। সমবায় পথে কীভাবে এগুনো যায় তারই প্রচেষ্টা বিধবাপল্লীর সমবায়গুলির। হেমিল্টন সাহেবও মাছের সমবায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি এখন মহাজনদের এবং চক্‌দারদের খপ্পরে পড়েছে। নিজেদের স্বার্থে কি করে সরকারী সমবায়-ঋণ আদায় করা যায় তা মহাজনদের ভালই জানা আছে। মরতে-মরণ খোদ জেলেদের। এরই হাত থেকে ত্রাণ পেতে পাড়া-কমিটি সব এখন গড়ে উঠছে। মাধুরীও যেন মনের মতো কাজ পেয়ে এখন রাত নেই দিন নেই তাতেই ব্যস্ত।

বাউলের কিন্তু এই সব কাজ নিয়ে মাধুরীর এতো মাতামাতি পছন্দ নয়। সত্যিই তো গানের বৈঠকও কমে এসেছে। অবশ্য গানের আসর বসলেই মাধুরীর আসার ঘাটতি নেই। আর কিছু না হোক, বাউলেদার সঙ্গে তো দেখা হবে। আর দেখা হতেই মাধুরী অতি উৎসাহ

নিয়ে তাকে বিধবাপল্লীর কাজের ফিরিস্তি দেবে, খুঁটিনাটি ঘটনার কথা সব বলবে। কতো বাধা এই কাজে, আর সে সব বাধাকে কীভাবে কাটিয়ে উঠতে চায় সে। হয়তো বলে,—জানো বাউলেদা, পদি-পিসী কেমন হতাশ হয়ে গেছে! পদি-পিসীকে তুমি চিনলে না? পদি-পিসী মঙ্গলা গাইনের বউ। মঙ্গলা গাইনকে বাঘের পেটে যেতে হয়েছে। নাকি সেদিন সে অনেক কানমাছ পেয়েছিলো, তাই মহাজন আবাদে ফিরে এসে আর ঋণের টাকার কথা তুলে বিরক্ত করেনি পদি-পিসীকে। তাই মহাজনের উপর কিছুতেই ওর রাগ ওঠে না। অনেক করে পিসীকে পাড়া-কমিটিতে এনেছি। দেখি, এখন কি করা যায়।

বাউলে চুপ করেই শোনে। হয়ত একটা গানের কথা মাধুরীর এক একটা কাহিনী শেষ হতেই তুলবার চেষ্টা করে। তখনই মাধুরী হয়ত বলে ওঠে,—পারবে না, পারবে না বাউলেদা ঐ বাঘটাকে তুমি শেষ করতে? বলেই বাউলেদার মুখের ও কপালের রেখাগুলি দেখবার চেষ্টা করে নিজের চোখ একবার এপাশ একবার ওপাশ নাড়িয়ে নাড়িয়ে।

দুরন্ত শিকারী বেদে বাউলেও যেমন করে গভীর বনের বাঘের আক্রমণের মতলবকে বুঝবার চেষ্টা করে নিঃসাড়ে, এখানেও মাধুরীর কোন কথার উত্তর না দিয়ে একমনে নিস্তব্ধে চোখের উপর চোখ মেলে ধরে বুঝবার চেষ্টা করে মাধুরীকে—কেমন করে সে আর্ত-মানুষকে আগল দেবার চেষ্টা করছে বাঘের দাপটের বিরুদ্ধে।

তেরো

কে ভেবেছিলো, সেই বাঘের দাপটের কবলে পড়তে হবে মাধুরীকেও। তবে সুন্দরবনের বাঘ নয়। মানুষ-বাঘ বলা যেতে পারে। বিপ্লবী নক্সালদের কবলে। খাল-পাড়ের সর্দারি বাড়ির কয়েকটি ছেলে কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়ে। তাদের একজন পড়াশুনায় বেশ ভালো, সুযোগও পেয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার। সেটাই হলো কাল। এই কলেজেই তখন নক্সাল বিপ্লবীদের এক প্রধানতম আড্ডা। অল্পদিনের মধ্যে সে দলের একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠে। বয়স আর কতো হবে, একুশ-বাইশ।

ইংরেজ আমলে স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবীরা যেমন দেখতে ছিলো, এরাও তেমনি। যেন আগুনের টুকরো। কথা বিশেষ বলে না, কিন্তু চোখে-মুখে যেন আগুন ঠিকরে বেরুতে থাকে। আর চলনে-ফেরনে অদম্য কর্মচঞ্চলতা যেন ফেটে পড়তে থাকে। এ জিনিস ঘটে শরীরের কাঠামোর দরুন নয়; ঘটে, মনের এক অতুলনীয় আত্মবিশ্বাস এবং আদর্শের প্রতি দৃঢ় আনুগত্যের জন্য। জীবন-মৃত্যু যেন এদের পায়ের ভৃত্য। বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন এরা বলতে পারে—'নিঃশেষে যে প্রাণ করিবেক দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে সৃষ্টি করেছে এদেশের প্রকৃতি, এ দেশের মাটি; তেমনি যুগে যুগে এই জাতের বিপ্লবীদেরও সৃষ্টি করেছে—বাঙলাদেশের প্রকৃতি ও মাটি।

সে সময়ে নক্সালদের নীতি ও দায়িত্ব ছিলো শত্রুর এক একটাকে প্রথম সুযোগেই যে-কোনোভাবে খতম করা। শত্রু হলেই তার বাঁচবার কোন অধিকার নেই। সমাজের গোটা শত্রুদলকে যখন একই সঙ্গে নিধন করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন একটা একটা করেই মারো। কৃষকদের প্রধান শত্রু কে? জোতদার ও মহাজন। সত্যিই তো, এরাই না কৃষকদের জোঁকের মতো রক্ত শুষে শুষে আধমরা করে ফেলছে। অতএব, খুবই সরল নীতি—এই সব শত্রুকে মারো, একটা একটা করে শেষ করে দাও, আর তাদের হাতের অস্ত্র কেড়ে নাও।

সর্দারি বাড়ির ছেলেটিও এই অমোঘ মন্ত্রে দীক্ষিত। সঙ্গীদের বললো,—তোরা

কলকাতার শত্রু খুঁজে পাচ্ছিস না, চল্ আমার গ্রামে। দেখবি সেখানে কতো মহাজন আর চক্দার পাবি। চল্।

এই সূত্রেই তিনজন নক্সাল এই অঞ্চলে আসে। এসেই পথ কিছুটা চিনে এক মহাজনকে খুন করে। ওরা জানতেও পায় না যে এই খুনের মধ্যে কোনও শরিকী বিবাদ জড়িত আছে কিনা। তার চেয়েও বড়ো কথা—ঠিকই মহাজনেরা চাষীর রক্ত শুষে খায় ; কিন্তু এটাও ঠিক, গরীব চাষীরা কাজের সুযোগ পেতে কার কাছে টাকার জন্য হাত পাতবে ? তারা বেশ বোঝে তাদেরই নিঙড়ে মহাজনেরা স্বচ্ছল জীবন যাপন করছে, তবু তারা ভাবে, আর কিছু না হোক দিনে একবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য এই মহাজনেরা তাদের সুযোগ করে দিচ্ছে, কৈ আর কেউ তো এটুকুও করে না।

কাজেই এই খুনীদের বিরুদ্ধে একত্র হয়ে এই তিনজন নক্সালকে তারা পিটিয়ে তাড়ায়। তাদেরই যারা মুক্তি দিতে এসেছিল তাদের নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করা হলো।

ফলে বেশ কিছুদিন নক্সালী অনুপ্রবেশ এখানে বন্ধ হয়ে যায়। আবার তারা এসেছে। এসেছে তাদের ধৈর্যের জোরে, এসেছে সুন্দরবনের টানে। বনবাদাড়ের রাজ্য, অসংখ্য নদী-নালার জাল এবং সবার ওপরে অসংখ্য গরীব চাষীর লড়াকু মানুষ সব। এদের সারা জীবনটাই লড়াই করে চলে। জীবন-মৃত্যুকে উপেক্ষা করে, বাঘের ও কুমিরের মুখোমুখি হয়ে, ঝড়-জলের দাপটকে অগ্রাহ্য করে, তেষ্টার জলের দুর্ভিক্ষকে অবহেলা করে লোনা জলের মধ্যে দাপাদাপি করে এরা জীবন-যুদ্ধ চালায়। কাজেই এমন সুফলা মাটি আর কোথায় পাবে এই বিপ্লবীরা !

এবার মাধুরীর কর্মচাঞ্চল্য ও উৎসাহ দেখে নক্সালেরাই আগে বেড়ে যোগাযোগ করেছে। নক্সাল দলে যোগ না দিলেও, এদের প্রতি প্রথম থেকেই মাধুরীর অসীম শ্রদ্ধা জাগে।

নক্সালরা তাদের দলের মধ্যে অলীক নাম রেখে পরস্পরকে ডাকে। কেউ কারো আসল নাম জানে না। নাম জানলেও কোনোকালেই তা উচ্চারণ করা কড়া নিষেধ। একবার কিছুদিনের জন্য এ অঞ্চলে এক নেতা আসেন। তাঁর অলীক নাম ছিলো—কর্ণ। মাধুরীকে ডেকে এক ডিঙিতে ছইয়ের আড়ালে বসে বলেন, —জানো মাধুরী, আমাদের দলে কিরকমভাবে চাষী মেয়েরা এগিয়ে এসেছে ?···

কথা শেষ করতে না দিয়েই মাধুরী বলে,—পুরুষের মতো মারপিট করতে পারে নিশ্চয় ? তাই তো ?

—না, মারপিট নয়, তারা শত্রুকেও নিজের হাতে খতম করতেও দ্বিধা করেনি। জানো, গোপীবল্লভপুরে আমাদের এক চাষীর মেয়ে যে-সাহস দেখিয়েছে তা ভাবতেই পারবে না। ছোটো ধারাল অস্ত্রে সে এক পুলিশের গলার নালি পলকের মধ্যে ছিন্ন করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার রাইফেলটাও ছিনিয়ে নিয়ে আসে। এতো সাহস ছেলেরাও দেখাতে পারবে কিনা সন্দেহ।

মাধুরী ডিঙির পাটাতনের ওপর কিছুক্ষণ চোখ বড়ো-বড়ো করে তাকিয়ে রইলো। তারপর মাথা উঁচু করে গোমর নদীর ওপারে সজনেখালি বনটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দ্যাখে। এক রাশ সাদা-কালো পাখায় দূর চক্রবালে ভাসন্ত কাকপাখির মালার দিকে দৃষ্টি ফেলে তন্ময় হয়ে যায়। বন দেখলেই ওর জীবনের বনমালির ছবি ভেসে ওঠে ওর মনে। পারবে সে ? পারবে ওর জীবনে অমন সাহসী কৃষক-রমণী হতে ?

চমকে ওঠে মাধুরী কর্ণের প্রস্তাব শুনে। ধাতস্থ হবার কিছুটা সময় দিয়ে কর্ণ সোজাসুজি

মোহগ্রস্ত কৃষক-যুবতীকে প্রস্তাব দিলেন,—পারবে ? পারবে তুমি ? আমরা শুনেছি বেদে বাউলের কাছে একটা বন্দুক আছে। সেটা তোমার আদায় করে দিতে হবে—যে-কোনও ভাবে আদায় করতে হবে। পারবে না ? শুনেছি তুমি তার খুব ঘনিষ্ঠ। পারবে না তুমি ?

মাধুরী চুপ করেই থাকে···

—আর যদি কোনও ভাবে না পারো, তাহলেও বন্দুকটা আমাদের চাই-ই। সোজা পথে না হলে আমরা ভিন্নপথ······

বাকি কথাটা মাধুরী যেন কিছুতেই শুনতে চায় না। সটান ছইয়ের বাইরে পা বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললো,—দেখি, দেখি কি করতে পারি।

বলেই সরু ডিঙিখানির দুপাশের ডান ও বাঁয়ের গুরোর ওপর ডান ও বাঁ পা ফেলে ফেলে মাধুরী দ্রুত নেমে আসতে চায়। চলার ধরনে ও ছন্দে গোটা ডিঙিও দুলে দুলে ওঠে। সেই দোলনে ও ছন্দে আপন দেহ দুলিয়ে মাধুরীও তার দোলায়িত মনকে যেন প্রকাশিত করলো। সাতজেলের মাটি স্পর্শ করতেই মাধুরী এবার স্থিতধী। স্থির করে ফেললো, এবার সে বাউলেদাকে একবার বলবে, তারপর যা করা তা তো বাউলেদাই করবে।

স্থির করলো বটে, সে-দিন ও সে-রাতেও মাধুরীর মনের অস্থিরতা চলে—কেমন করে সে বলবে বাউলেদাকে তার অস্ত্র দিয়ে দিতে ! বাউলেদাকে সে যেন নিরস্ত্র করতে চায় না। বনে সে যায়নি। বন্দুকের গল্প বাউলেদা কখনও তার সামনে করেনি। তাহলেও সে তো জানে—বনের যে কোনও বিপদে সবাই বাউলেদাকে ডাকে। আর সে কিনা সেই বাউলেদাকে নিরস্ত্র হবার কথা বলবে। কেমন করে সে এতখানি বেইমানির কাজ করতে যাবে···ভেবে ভেবে কূল পায় না মাধুরী। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে রাঙাবেলে যাবার আগে গোসাবার পথ ধরেছে। সবুরকেও সঙ্গে নিয়েছে। দুজনেই হন্‌হন্ করে চলেছে। দিদির মনটা বে-মনা দেখে সবুরও কোনও কথা পাড়েনি গোটা রাস্তাটায়।

জায়গামত এসে ছিলে-ভেড়ির ওপর সবুরকে দাঁড় করিয়ে বাউলেদার বাড়ি একাই ঢুকতে চাইলো। সামনে দুদিকেই খানিকটা ধানী ক্ষেত। ধানের শীষ মাথা উঁচু করে ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়ায় দুলছে। ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে একটা ছিলে ভেড়ি। ছিলে ভেড়িটা সোজা চলে গেছে বাউলেদার বাড়ি।

ছিলে পথে একটু এগুতেই বাউলে দেখতে পেয়ে প্রায় ছুটে এসেছে। সবে চান্ করে রুদ্রাক্ষ মালা পরে কপালে, বাহুতে ও প্রশস্ত বুকে কাপালিক সন্ন্যাসীর মতো ডগডগে লাল চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রলাঞ্ছন কাটা হয়ে গেছে। হন্তদন্ত হয়ে ছিলে-ভেড়ির মাঝখানে হাজির হয়ে বললো,—কি ব্যাপার মাধুরী, এমন সময়ে তোমার আবির্ভাব !

—না, এমনি এলাম। আচ্ছা বাউলেদা, তোমার তো একটা বন্দুক আছে ?

—আছেই তো, কিন্তু সে বন্দুক আমার কি করে হলো তা কি জানো ?······

সে-কথা শুনতে আসেনি আজ মাধুরী। বাউলেদাকে থামিয়ে দিলো বটে, কিন্তু নিজেও থেমে গেছে। বলতে গিয়েও বুঝি বলতে পারে না।

বাউলে প্রায় দাব্‌ড়ি দিয়ে বলে,—বলো। কি বলতে চাও।

—জানো, গতকাল এক নক্সাল নেতা, খুব বড় নেতা, আমার সঙ্গে অনেক গল্প করে শেষমেশ বলেন, ঐ বন্দুকটা তোমার দিয়ে দিতে হবে ওদের। আর নাকি আমাকেই আদায় করতে হবে তোমার কাছ থেকে।

—কেন, বন্দুক নিয়ে ওরা বনে উঠবে ? বাঘ মারবে ?

—না, না, বাঘ মারতে নয়।

—তবে কি মানুষ মারবে!—বাউলের কণ্ঠস্বর এবার দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

মানুষ মারার কথা যে মাধুরীর মনে এর আগে উঁকিঝুঁকি মারেনি তা নয়। কিন্তু এমন সোজাসুজি প্রশ্ন তোলাতে সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। বাউলের গলার স্বরেও আরও বেশি করে ঘাবড়ে যায়।

বাউলের দৃঢ় কণ্ঠে যেন আদেশের সুর,—চলো এখানে নয়, বাড়িতে এসো।

বাউলে আগে আগে। পায়ে কাঠের খড়ম। বাড়িতে বাউলে কাঠের খড়মই পরে। বনে অবশ্য খালি-পা। খড়মে চটাং চটাং শব্দ। এ-তো গানের তালের শব্দ নয়। এ এক দৃঢ় পদক্ষেপের দাপটি। মাধুরী যেন বুঝে নেয়—হবে না, কিছুতেই কোনও আবেদন খাটবে না। বাউলের পিছু পিছু চলতে চলতে আরও ভাবে, বন্দুক না দিলে কি বিপদ হতে পারে, সেটাও বাউলেদাকে আমার জানিয়ে দেওয়া উচিত হবে নিশ্চয়।

উঠোনে এসে বাউলে ডেকে বললো, —মা, দ্যাখো কে এসেছে! দ্যাখো!

অতি বৃদ্ধা মা কোনমতে মাদুর বিছিয়ে দিলেন হাতনেতে। তারপর কম্পমান হাত বুলিয়ে মাদুরের ধুলো ঝেড়ে দিয়ে বললেন, —বসো মা, বসো মা লক্ষ্মী।

ওরা দুজনে উঠোনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা পাড়ে।

—দ্যাখো বাউলেদা! তুমি তো সবই জানো নক্সালদের কাণ্ডকারখানা।

এবার বাউলে রীতিমতো গর্জে ওঠে,—সবই জানি। তোমরা ভাবছো বন্দুক আমার বাড়িতেই থাকে। কক্ষনো রাখি না বাড়িতে। সে-বন্দুক যেখানে আছে, আর যার জেম্মায় আছে, পারে তো সেখান থেকেই নিয়ে আসে যেন ওরা। বুঝবো ওদের হিম্মত! সে-বন্দুক আছে গভীর সুন্দরবনে। পথটাও বলে দিতে পারি। তোমাকেও বলে দিচ্ছি, শুনে নাও, ভাল করে শুনে নাও—প্রথমে গোমর নদী দিয়ে পঞ্চমুখানি খাল সবটাই ফুঁড়তে হবে, তারপর পাবে বড় চামটার খাল, সেটাকে ডাইনে রেখে ছোট চামটা খালে ঢুকতে হবে, তারপর এই খালের পাঁচ বাঁক ভাটিতে গিয়ে দেখবে একটা পাশ-খাল, সেই পাশখালের তিন বাঁকের মাথায় মালোতে উঠতে হবে, সেখান থেকে উত্তরমুখো একটা শিষে ডিঙিয়ে দুশো কদম এগিয়ে দেখবে কয়েকটা বান গাছ, সেই বান গাছের চতুর্থ গাছটায় একটা খোঁড়ল আছে। এই ঘেরে কিন্তু দেখে-শুনে এগোয় যেন। বাঘের বড্ড আনাগোনা, জায়গাটার নাম পীরখালির বন।

বাউলে আরও বলে,—কিন্তু বন্দুকটা কার জেম্মায় আছে জানো? আছে এক কালনাগিনীর জেম্মায়। এক কালকেউটে তার বাচ্চা-টাচ্চা নিয়ে আমার বন্দুকের খোঁড়লে বাস করে। ওরা গেলে যেন সাবধানে যায়।

মাধুরী এতোক্ষণ থ মেরে হাঁ করে শুনছিলো। সুন্দরবনের উপকূলবাসীদের সাতজেলের মেয়ের কাছেও বুঝি বনের অলিগলি নদী-পথকে গোলকধাঁধার মতো লাগে। বুঝেই বাউলে বলে,—তা না হয় আমিই পথটা এগিয়ে দিয়ে আসবো, কিন্তু বাঘের ও সাপের আক্রোশ থেকে তাই বলে ওদের রক্ষা করতে পারবো না। সেই বুঝে আমাকে ডাকে যেন!

বড়বড় চোখে বাউলে মাধুরীর চোখের উপর দৃষ্টি হেনে আছে। দম নিয়েছে বাউলে। এবার ফুলে ফুলে বলে,—আর যদি আমাকে মারতে চায়, আসে যেন পরখ করতে সুন্দরবনের বাঘের বাউলের কি তেজ! ভাবছো, ওদের পিস্তল আছে, তবে আর কি!! জানো মাধুরী, তোমাকে কোনওদিন বলা হয়নি, আমার মিলিটারি ট্রেনিং নেওয়া আছে। পিস্তলের নিরীখ কি করে গোলমাল করে দিতে হয়, তা আমার জানা। আসে যেন আমাকে

মারতে !!

উত্তেজনায় থরথর করে হাত কাঁপছে, বিস্ফারিত চোখের চাহনিতে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরোয়। দাঁত কড়মড় করে আবারও বলে,—আসে যেন আমাকে মারতে !!

বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজনায় গুম্‌ মেরে থাকে। কয়েক লহমা কেটে যাবার পর শান্তভাবে ক্ষোভের সুরে বাউলে বলে,—মাধুরী ওরা ছেলেমানুষ, একেবারে ছেলেমানুষ। দু-চারজন জোতদার আর মহাজন মেরে কি সমাজে পরিবর্তন আনা যায়। তাই যদি হতো তাহলে আমাদের সুন্দরবনের বাঘগুলিকে একবার মহাজনদের চিনিয়ে দিতে পারলেই তো কাম ফতে হয়ে যেতো। আসলে সব মানুষ মিলেঝুলে একটা কিছু করতে হবে। তা না হলে হয় না, হবেও না।

এদিকে বৃদ্ধা মা এসেছেন এক হাতে খুঁচিতে দুটো খই-মোয়া আরেক হাতে এক ফেরো জল। ফেরোটা কাঁপছে। অস্থির জল দেখে মাধুরী তাড়াতাড়ি নিজের হাতে ফেরোটি নিয়ে হাত্‌নেতে রাখলো। আর একটা মোয়া দাঁতে কামড়ে ধরে অন্য হাতে আরেকটা নিয়ে নিলো। নিয়েই বললো,—বাউলেদা, আর বলতে হবে না। যা বুঝবার বুঝে নিয়েছি। আমি এবার চলি। আসছে সপ্তাহে গানের আসরে দেখা হবে, তখন অন্য সব কথা হবে, আজ চলি।

বলেই একটা মোয়া বাঁ-হাতে নিয়ে অন্যটা খেতে খেতে হনহন্‌ করে ছিলে-পথ ধরলো।

বৃদ্ধা মা দূর থেকে থোবলা গালে বললেন,—ভারি লক্ষ্মী মেয়েটা। সেদিন সেই গানটা কি মিষ্টি করে গেয়েছিলো !

—জানো মা, সে গানটা কে শিখিয়েছিলো ওকে ?

—জানি, জানি, তুই ছাড়া আর কে শেখাবে ? তো তুই শুধু গান শিখিয়েই গেলি, তুই একটা অপদার্থ !!

আবার গানের আসরে ঠিকই ওদের দেখা হয়। দেখা হলেও আসরে কোনও কথাই হয় না বন্দুক নিয়ে। শুধু বাউলের চোখাচোখি হলে মাধুরী মুচকি হাসে। আসর থেকে বেরিয়ে সাতজেলের রাস্তায় পড়লে মাধুরী কথাটা পাড়ে। কথা পাড়বে কি, হেসেই খুন। হো-হো করে শুধু হাসে।

বাউলে ভাবে, মাধুরী কি পাগল হয়ে গেল ! বলে,—বলোই না কি হলো ?

—কি আর বলবো !—আবার হো-হো হাসি। এবার বুকে হাত দিয়ে দম নিয়ে বললো,—জানো বাউলেদা, আমি সব বললাম, তুমি যা যা বলেছিলে সব বললাম কর্ণদাকে। কালনাগিনীর কথাটাই ওদের মনে লেগেছে। ওরা তো বাদার বাঘকে দ্যাখেনি কখনও। বারবার কালনাগিনীর কথাটাই জিজ্ঞাসা করে। প্রশ্ন করলো—আচ্ছা, বাউলে তো মিছে ভয় দেখায়নি ? আমি বললাম,—না, না, বাউলেদা আর যা করুক, মিথ্যে কথা বলে না ; মিথ্যে বললে যে বাউলেগিরি করা যায় না। বন নিয়ে যারা মিথ্যে কথা বলে, তাদের বনে নিস্তার পেতে হয় না। বনবিবি কখ্‌খনো তাদের ক্ষমা করে না। কেন, বাউলেদা তো তোমাদের সঙ্গে করে জায়গাটায় পৌঁছে দেবেন বলেছেন, কিন্তু বাঘ ও সাপের হাত থেকে বাঁচবার তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। বলো, তোমরা যাবে কি না ?

মাধুরীর কথোপকথনের কাহিনী শুনতে শুনতে বাউলে কেমন যেন তন্ময় হয়ে গেছে। দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলো এক তেমাথায়। বাউলে দূর আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন একটা ছবি দেখছে। ছবি ভেসে ওঠে ওর মনেও—সেই বিগতদিনের ছবি, বিলাসবাবুর

দোকানে টাঙানো বন্দুকটির মৃদু দোলানি ; আবাদি নদীর দমকা হাওয়ার দোলানি।

মাথায় ছোট্ট ঝাঁকানি দিয়ে বাউলে তার মন থেকে ছবিটি সরিয়ে দেয়। বলে,—বলো, তোমাকে শেষে তোমার কর্ণদা কি বললো ?

—কর্ণদা চিন্তিত হয়ে বললো, ভেবে দেখে তোমাকে পরে জানাবো।

এরপর বেশ কিছুদিন সব চুপচাপ। নক্সালদের আর কোনও হদিশ মেলে না। আরও কয়েক মাস পরে শোনা যায় পুলিশ দলে-দলে এসে সাতজেলে ও আশপাশে যতোগুলি জেলে-পাড়া ছিলো—বাণীপুর, তারানগর ও মোল্লাখালিতে তারা তন্ন-তন্ন করে খোঁজে নক্সালদের সর্বময় এক নেতাকে। কিন্তু কিছুই পায়নি, কাউকেও পায়নি।

নক্সালরা তাদের আদর্শে না হলেও চরিত্রবলে অনেকের মন জয় করেছিলো। কলকাতার মতো বিশালকায় শহরের সংলগ্ন না হলেও অন্তত সহজ নদীপথে সন্নিকটে বলে সেই শহরের একটা ছন্নছাড়া ঢেউ আছড়ে পড়েছিলো এই বন-বাদাড়ের দেশেও।

চৌদ্দ

নক্সালেরা উধাও হবার পর মাধুরী যেন অধিকতর উৎসাহ নিয়ে সাতজেলের সমবায় কাজে, বিশেষ করে বিধবাপল্লীর পাড়াকমিটির কাজে মেতে ওঠে। বাউলেও গানের আসরে সময় পেলেই আসা-যাওয়া করে। আর বাউলে এলেই মাধুরী বাড়ি যাবার পথে সারাক্ষণ বাউলেদার সঙ্গে বক্‌বক্ করতে করতে যায়। অবশ্য বেশিদূর নয়। কেননা, গোসাবার পথটা খানিকটা এগিয়েই ডান দিকে চলে গেছে। সে-মোড় এলে বাউলে একটা হাসিঠাট্টার কথা তুলে গোসাবার পথ বেয়ে চলে যায় দ্রুত। এই দ্রুততা তার মনের কোন আবেগকে অবরুদ্ধ করার মানসে মনে হয়।

সাতজেলের বিধবাপল্লীর কথা উঠলেই মাধুরীর বকবকানির সামনে বাউলে চুপচাপ থাকে। কি যেন এইসব কাহিনী থেকে খুঁজে পেতে চায় নিজের অজানিতেই। শেষ পর্যন্ত কয়েক বছর পরে এবার বুঝি বাউলের ওপর মাধুরীর প্রভাব পড়বার পালা। মনে মনে ভাবে,—কেন, আমিও তো গোসাবায় একটা বিধবাপল্লী গড়ে তুলতে পারি। এটা তো হেমিল্টনেরই মনোবাঞ্ছা ছিলো নিশ্চয়। নিশ্চয় ছিলো। ওর গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে। গভীর বনে গাছের ডালে বসে বাঘের সন্ধান মিলতেই যেমন করে ওর গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। একই শিহরণ সে এখন অনুভব করে যেন।

গোসাবার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বাউলের আস্তানা। কয়েক পা এগিয়ে গেলেই উঁচু ভেড়ি দিয়ে ঘেরা দুগ্যোদোয়ানী নদী। অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমে আরও কিছুটা এগুলে প্রশস্ত গোসাবা নদী। তার ওপারেই বাদা শুরু। দূর থেকে দেখাই যায় হেঁতাল গাছের ঘন ঝাড়ের সবুজ-হলুদ মেশানো আবছায়া রেখা। এখানে এসেই বিস্তীর্ণ ও খরতর জলস্রোত ডাইনে বাঁক নিয়েছে। ফলে বাঁয়ে এপারে গোসাবাকে ঘিরে বহুদিন থেকে একটু একটু করে দীর্ঘ চর দেখা দিচ্ছিলো। এবছর শুধু পলিমাটিই জাগে নি, ধানীঘাসও চরের ওপর মাথা তুলেছে। নতুন বসতি করার কথাও উঠেছে। শুধু মাধুরীর প্রভাব বললে হয়তো ভুল হবে, বাদার নদীর এই অবদানেরও প্রভাব কম নয় বাউলের বিধবাপল্লী গড়ে তোলার কামনা ও বাসনার পেছনে।

কিন্তু গোসাবার গায়ে নতুন জমি তৈরি হলে হেমিল্টন এস্টেটের স্বাভাবিক মালিকানা

বর্তায়। কোনও দেরি নয়, বাউলে বিধবাপল্লীর নামে এস্টেটের কাছ থেকে জেলেদের বিধবা সংসারগুলির মধ্যে খণ্ডে-খণ্ডে বন্দোবস্ত করার কাজ শুরু করলো। এই জমি বন্দোবস্ত করাতে গিয়ে ধনী-চাষী ও মহাজনদের বেনামে কিছুখণ্ড দখলের যে প্রলোভন ও কূটচালের চক্রান্তে বাউলে পড়ে তাতে তার পক্ষে দ্রুত পাড়া-কমিটি গড়ে তোলা ছাড়া পথ থাকে না। এ বিষয়ে মাধুরীর সাহায্য ভিক্ষাও অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই অনিবার্যের কথা বাউলের মনের গভীরে প্রথম থেকেই সুপ্ত ছিলো কিনা কে বলতে পারে! তা না হলে বিধবাপল্লী গড়ার স্বপ্ন মনে জাগতেই তার দেহ ও মনে অমন শিহরণ জাগবে কেন সেদিন!

দেখতে দেখতে গোসাবার বিধবাপল্লী গড়ে উঠেছে। বিধবাপল্লী মানে শুধু বিধবাদেরই নয়; তাদের ভাই-ব্রাদারও সব সঙ্গে আছে, হয়তো বা তাদের কারো কারো নতুন মিন্‌সেরাও সঙ্গে আছে। প্রথমেই ওরা দীর্ঘ রিঙ-ভেড়ি দিয়ে লম্বা একফালি জমি চর থেকেই কেড়ে নিলো। চরের মাটি দিয়েই চরকে যেন ঘিরে ফেললো। জমি একটু শুকনো হতেই ছোট ও বেটে দোচালা খুপরির আস্তানা উঠতে থাকে। আসে উঠোন, আসে তুলসীতলা, আসে দু-একটা দেশী ফুলের গাছও। দেখা যায় লম্বা লম্বা বাঁশের আড়—ওদের ছোট-বড়ো জাল শুকুবার ব্যবস্থা। চরে শক্ত খুঁটিও পোতা হয়ে গেছে—ওদের ডিঙি নিশ্চিন্তে বেঁধে রাখতে। নোনা চর নাতি দীর্ঘ জায়গা জুড়ে সরগরম হয়ে উঠতে বেশিদিন লাগে না।

কিছুদিন কাটবার পর হঠাৎ এক সকালে মাধুরী এসেও হাজির। বিধবাপল্লীতে যাবার একটা পথ বাউলের উঠানের ওপর দিয়েই ছিলো। মাধুরী বাউলেদাকে সঙ্গে নিয়ে পল্লীতে যাবে বলেই এই পথ বেয়েই এসেছে।

আসতেই বাউলে স্মিতহাস্যে আর ত্রস্তপায়ে এসে বলে,—দ্যাখো মা, আমাদের বাড়িতে কে এসেছে!

মা রান্নার হাড়ি নামিয়ে দরজার ঝাঁপ ঠেলে মুখ বাড়িয়ে বললেন,—ও-মা, মাধুরী! ও তো আমাদের বাড়িতে আসেনি। আমি বুঝেছি, ও এসেছে পল্লীতে। তা এসো, এসো।

মায়ের খোটার জবাব এড়িয়ে মাধুরী বলে,—তা বাউলেদা, চলো আগে তোমার বিধবাপল্লী ঘুরে আসি। এতো লোক এসেছে তোমার আশ্রয়ে! তা সেদিন ওরা-মাসি কি বলছিলো জানো! আমি শুধেছিলাম, তা এতো লোক ভিড় করেছে কেন গোসাবার বিধবাপল্লীতে? তা ওরা কি বলে জানো! বল্‌না সবুর বাউলেদাকে...

সঙ্গী সবুরকে বলার অবকাশ না দিয়ে মাধুরী বকে যায়,—জানো, বলছিলো, বেদে বাউলের ভরসায় আমরা এসেছি; আর বেদে বাউলে আমাদের এপারের মহাজনদের ঠেকাতে না পারুক, ওপারের বাদার মহাজনকে তো ঠেকাতে পারবে। সেই বা কম কি!

বেদে সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটে,—তা এপারের মহাজনকে ঠেকাতে তো তুমি আছো। তুমিই ঠেকিও।

—বাঃ, বোঝাটা আমার ঘাড়েই দিয়ে বসলে, বাউলেদা! তা চলো, এবার পল্লীতে যাই।—আর মাচার উপর লিক্‌লিকে পুঁই ডগার ঝাড় দেখতে দেখতে মা-কে ডেকে বললো,—মা, আমরা ঘুরে আসি, ঘুরে এসে তোমার হাতে চচ্চড়িটা খেয়ে যাবো। শুনেছি তোমার হাতে পুঁই-চচ্চড়ি নাকি অপূর্ব। বেশি ঝাল দিওনা কিন্তু...

বলতে বলতে বাউলেদাকে এক রকম টেনে নিয়েই চললো পল্লীমুখো।

বিধবাপল্লীতে গিয়ে ওরা তখন কি কাজ করবে সে-কথা বাউলেও যেমন জানে না, মাধুরীও তেমনি জানে না। দুজনেরই ইচ্ছা একটা পাড়া-কমিটি করতে হবে—এই মাত্র।

মাধুরী এসে শুধু বাড়ি-বাড়ি ঘোরে। খোঁজ নেয় কজন মানুষ আছে এক-একটা সংসারে,

কজন সামর্থ পুরুষ বা কজন কর্মক্ষম মেয়েরা আছে। কার কিরকম সঙ্গতি আছে তাও আন্দাজে ও চাল-চলনে সমীক্ষা করে নেয়। ঘুরতে ঘুরতে বেলা গড়িয়ে গেছে। সবাই প্রশ্ন করে—দিদিমণি এখন কি করতে হবে ?

উত্তরে মাধুরী বলে,—তা আমি জানি না, কি করতে হবে তা তোমরাই ঠিক করবে। সেজন্যই তো সভা ডাকা হয়েছে পরের সপ্তাহে বুধবারে। সেদিন যেন সবাই হাজির থাকে। সভা হবে ভজহরির বাড়িতে, দেখলাম বেশ গোবর দেওয়া বড়ো উঠোন আছে ওদের।

—শুনলাম, পাড়া-কমিটি করবে।—অনেকে জানায়।

সবাইকে মাধুরী একই উত্তর দেয়,—সে করবে তো তোমরাই, তোমরা যদি সবাই চাও তো হবে। আর সে পাড়া-কমিটি কি করবে, তাও তো তোমরাই ঠিক করবে। আমি কিচ্ছু জানি না। সত্যি বলছি কিচ্ছু জানি না।

আবারও তারা প্রশ্ন করে,—সে পাড়া-কমিটিতে কারা থাকবে ?

—তাও আমি জানি না। তাতো তোমরা সবাই ঠিক করবে। আমরা তো এই নিয়মেই সাতজেলে চলি। জানো, রাতভোর বসে-বসে তারা সব কিছু একমত হয়ে তবে কাজ করে।

—তা বাউলেদা তো আছে, সেই সব কিছু ঠিক করে দিতে পারবে।

—না, তা হয় না। বাউলেদা মোটেই কিছু করবে না। যা কিছু করার তা তোমরাই করবে—বেশ জোর দিয়েই মাধুরী বলে।

—এইভাবে কি কিছু করা যায় ?—গুঞ্জনে প্রায় সবাই প্রকাশ করে।

মাধুরী যেন ঝলসে ওঠে। ঝাঁঝালো ঝঙ্কারে গুঞ্জনের প্রত্যুত্তর দেয়—যায়। নিশ্চয় যায় !!

পনেরো

বাদার বসন্ত। বসন্তে সবারই মন আনচান করে। গাছ-গাছড়া কচি সবুজে ভরে ওঠে। জীবজন্তুও একে অপরকে কাছে পেতে চায়। পাখিকুলের কাকলী যেন আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে। মৌমাছিও মধু আহরণে ও মনোহারি গুঞ্জনে অধিকতর ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মানুষও স্থির থাকতে পেরে ওঠে না। বিধবাপল্লীর মানুষেরাও চঞ্চল হয়ে ওঠে শিকারের সন্ধানে, মধু আহরণে আর সুন্দরবনের অঢেল সম্পদের টানে।

বেশ কিছুদিন ওরা এটা-ওটার সমস্যা মেটাতে পাড়া-কমিটি প্রয়াস করে যাচ্ছে। এমন সময়ে চৈৎ মাস এসে হাজির। এই মাসে জমির কাজ যেমন কমে আসে, তেমনি মাছ-ধরার হুল্লোড়ও খানিকটা নিস্তেজ হয়ে আসে। এই সময়ে থাকে অবশ্য ভেড়ি মেরামতির হিড়িক। তা ওদের আর কতটুকুই বা ভেড়ি। কাজেই হালকা মনে ওরা এই সময়ে মধু ভাঙতে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। মধু দিয়ে এরা বৎসরান্তে মিষ্টিমুখ করতে অভ্যস্ত।

এই তোড়জোড়ে যুবক ভজহরিই সবথেকে বেশি উৎসাহী। ভজহরি এক অদ্ভুত যুবক। দেখতে কালো মিশমিশে। গোঁফদাড়ি উঠতে না উঠতেই চেহারা যেমন লম্বা-চওড়া হয়ে উঠেছে, তেমনি দেখলেই মনে হবে অসীম শক্তিধর। মুখে কথা কম। নেহাৎ দরকার না হলে কথাই বলে না যেন। তবে বিনয়ের অবতার। শক্তিধর অথচ বিনয়ী—ধরে নেওয়া যেতে পারে এমন যুবক সাহসী না হয়ে যায় না। তাতেই বিধবা মায়ের চিন্তার অন্ত ছিলো

না, কখন কি জানি কি করে বসে।

বাউলেদার বাড়ি ঘুরে ঘুরে ভজহরি তাকে রাজি করিয়েছে ওদের মউলিদলের বাওয়ালি হতে। তারই হাতে গড়া বিধবাপল্লীর ছেলে-ছোকরার দল, রাজি না হয়ে কি উপায় থাকে। সবই তো হয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত মা-র কাছে কথাটি পাড়েনি। কিন্তু মা-র শুভেচ্ছা না নিয়ে বিপদসঙ্কুল কাজে যায় বা কি করে।

—মা, দাওনা আমাকে যেতে। তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই। কতো মানুষ আজ বনে উঠবে জানো! প্রায় জনা বিশেক আমরা। বাউলে-দাদা, বেদে বাউলেও সঙ্গে থাকবে।

—না, তা হয় না। তোর যা গোঁ, কি দিয়ে যে কি করে বসবি তার কি ঠিক আছে। বনবিবির গোঁসা হলে কি আর রক্ষে আছে।...বলেই মা হঠাৎ থেমে গেলেন। ভজহরি যে মায়ের বায়নাক্কার কাছে আজ এক মোক্ষম অস্ত্র ছেড়েছে।

—কি বললি ? বেদেও সঙ্গে যাবে ?... যা, যা ইচ্ছে করগে !...বেদেকে বলবি, আমিই বলেছি একথা বলে বলবি, সাঁজের শাঁখ বাজার আগেই যেন সবাই ফিরে আসে।

—মা, তুমি দেখি কিচ্ছু জানো না! বনে সন্ধ্যের অনেক আগেই আঁধার ঘনিয়ে আসে, তাও জানো না।

—না জানি, না জানি! তুই বাউলেকে বলবি, আমি বলেছি একথা।

এমন সময়ে বেদে বাউলে নিজেই এসে হাজির। এসেই ভজহরির মা-র পাশে বসতে বসতে বললো,—মা, জানো, 'রাখে কেষ্ট মারে কে ? মারে কেষ্ট রাখে কে ?'—বাদায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবার কাছে কেষ্ট মানে কিন্তু বনবিবি। বনবিবির দয়া হলে কেউই মারতে পারবে না। ভজহরির কাছে এটা প্রায় বীজমন্ত্র। সেকথা স্মরণ করেই বাউলে এই নির্ভয়বাণী মা-র কাছে বসে উচ্চারণ করলো।

এ এক অতি সাধারণ প্রবাদ বাক্য সারা বাংলায়। সুন্দরবনের আবহাওয়ায় এসে এই আপ্তবাক্য যেন সংগ্রামী বীজমন্ত্রের রূপ ধারণ করেছে। মনে হতে পারে, এই ধ্বনি তো অনিবার্যরূপে মানুষের মনকে নির্বীর্য করে দেয়—দৈবের ওপর ধীরে ধীরে তাকে একান্ত নির্ভরশীল করে তোলে, মানুষের উদ্যোগ নেবার ক্ষমতা বুঝি বা স্তিমিত করে আনে।

হয়তো তাই। কিন্তু সুন্দরবনের কোলে বসবাসকারী মানুষকে সংগ্রামী না হয়ে তো কোন উপায় নেই। খরস্রোতা নদী, গভীর বনাঞ্চল, জোয়ারের প্লাবনকারী উত্তুঙ্গ ঢেউ, প্রবল ঘূর্ণীবাত্যার দাপট, বিধ্বংসী ঝড়-ঝাপটা, আর সর্বোপরি ডাঙার ও জলের হিংস্রতম জীবের মুখোমুখি না হয়ে তো জীবিকা অর্জন করাই শুধু দায় নয়, বেঁচে থাকাও দায়।

ফলে এই ধ্বনিকে, এই মন্ত্রকে আশ্রয় করে কোনও বিপদ-আপদের মুখে বুক ফুলিয়ে এরা এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায়ও সুন্দরবনের এই যুবক ভজহরি মিস্ত্রী।

ভজহরি বেদে বাউলের অন্যতম প্রিয় পাত্র। শুধু ভজহরি নয়, সুন্দরবনের জেলে অধিবাসীমাত্রকেই বেদে ভারি শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। গোসাবার নবাগত পলিমাটির চরে জেলে বিধবাদের উপনিবেশ সৃষ্টির পেছনে বাউলের শুধু মাধুরী-প্রীতি ছিলো না, মাধুরীর সমকক্ষ হয়ে ওঠার প্রবল বাসনাই ছিলো না ; জেলেদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাও তাকে এ কাজে কম টেনে নামায়নি। নদীর কূলে কূলে বলতে গেলে চরের ওপর ভেড়ির কোলে কোলে ছোটো ছোটো ঘরগুলিতে শুয়ে শুয়ে যখন পূর্ণিমা ও অমাবস্যার গোনে মাথা-ভাঙা ঢেউগুলির কুল-কুল ধ্বনি জেলেরা শোনে, তখন যেন তারা পাগল হয়ে ওঠে। সেই পাগল-মন নিয়ে ওরা চরের জালি ডিঙিগুলি সড়সড় করে ঠেলে ভাসিয়ে দেয় সুন্দরবনের ভয়াল অসংখ্য নদী-নালায় মাছের সন্ধানে। আর সেই সুযোগ বনের বাঘ আর নোনাজলের

কুমির-কামোটের কাছে এক মহা সুযোগ। তাই এই সব জেলেদের কাছে এসে বসলে কতো যে বীরত্ব-গাথা, কতো যে জীবন-মৃত্যুর কাহিনী শোনা যাবে তার শেষ নেই।

সবাই বেশ খোশ মেজাজে আছে। এবার মাছের তল্লাসে নয়, ফুলের গন্ধে আমোদিত মিষ্টি মৌ-এর লোভে বনে চলেছে মৌলির দল। পঁচিশ জন মরদ। বেদে বাউলে ডিঙির হাল ধরেছে যেমন, তেমনি এই অভিযানের নেতাও সে।

ভজহরি প্রশ্ন করে,—বাউলেদা, আজ কোন বনে যাচ্ছি আমরা?

—আরে সেটা নির্ভর করে কোন্ ধরনের মৌ খেতে চাও তোমরা। তোরা সবাই জানিস কিনা জানি না ; বাদায় তিন রকমের মৌ পাওয়া যায়—ফুলপট্টি মধু, বালিহার মধু, আর লাল মধু। কোনটা চাও তোমরা?

—জানান দাও কোনটা কেমন সোয়াদের?

—শোনো তবে, ফুলপট্টি মধু হলো গিয়ে খল্‌সিলতার ফুল আর হেঁতাল বা বোগড়া গাছের ফুলের মধু ; গন্ধ ভুরভুর করে ; দেখতে সাদা ও গাঢ়। বালিহার মধু হলো গিয়ে বাইন ও কেওড়া গাছের ফুলের মধু ; দেখতে সাদা ও হালকা। আর লাল মধু গরান বা গর্জন গাছের ফুলের মধু ; দেখতে লালচে ; সোয়াদ মোটেই টনক না।

—তুমিই তো বলে দিলে কোন্‌টা চাই, ফুলপট্টি মধুই চাই।

—চলো যে-বনে যে-গাছের ঝাড় বেশি সেখানেই সে-ধরনের মধু মিলবে। চলো তবে চামটার বনে। ফুলপট্টির সোয়াদ পেতে হলে চামটা-বনেই যেতে হবে। চামটা বনটা কিন্তু বড্ড গরম। সাবধানে সে বাদায় উঠতে হয়, চলো তবে।

—বাউলেদা, তুমি আছো, তোমার বন্দুকও নিয়েছো, আমরা জনা পঁচিশেক, আর বনবিবি তো আছেন। কুচ্ পরোয়া নেই!—জোয়ানরা বাদার জেলের ছেলের মতো উত্তর দেয়।

দলে ভারি হলে কি হবে। বনে উঠেই দলের সব ভাগ-ভাগ হয়ে গোটা বনের চাতারে ছড়িয়ে পড়বে। এক-এক ভাগে তিনজন করে। তিনজন না হলে মৌ-ভাঙা যায় না। একজনে লম্বা লাঠির মাথায় হেঁতালের কচি ও শুকনো পাতা মেশানো মোড়ায় বা পোলেনে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়ার সাহায্যে চাক থেকে মৌমাছি তাড়াবে ; দ্বিতীয় জনে মন্তর পড়ে মানে, বনবিবিকে স্মরণ করে ছালা দিয়ে মাথা ও দেহ ঢেকে গাছে উঠে কাস্তের সাহায্যে চাক কাটবে ; আর তৃতীয় জনে নিচে ধামা পেতে চাকের খণ্ডগুলি ধরবে। তিনজনের এই নির্দিষ্ট কাজ বাঁধা।

কিন্তু তার আগে সবাইকে লাইন ধরে গাছের ডালে ডালে বা ঝোপের আড়ালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজে বের করতে হবে কোথায় চাক আছে। তিনজনেরই কাছাকাছি থাকারই কথা এবং সে চেষ্টাও তারা করে। কিন্তু বনের চাতাল, তাও আবার সুন্দরবনের চাতাল—কোথাও সিক্ত কাদামাটি, কোথাও পিচ্ছিল পলিমাটির প্রলেপ, কোথাও বা ঝোপঝাড়, আর সর্বত্র শূলো।

কাজেই চেষ্টা করলে কি হবে। তিনজনকে কিছুটা ছাড়াছাড়ি হয়ে চলতেই হয়। তাই চব্বিশ জনের আটটি ভাগে যেন চামটা বনের এই গের্দকে বহুদূর ব্যেপে বেড় দিয়ে এগিয়ে চলেছে লবণাক্ত দেশের মিষ্টিমধু নিঙড়ে নিতে।

লাইনটা সোজা উত্তরমুখেই এগুচ্ছিলো। বাউলের কড়া নির্দেশ ছিল, কেউই ডাইনে-বাঁয়ে হেলবে না, মোটামুটি বাউলের পেছন বরাবর সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাউলেই সবার আগে। এতোগুলি সঙ্গী, তাতে আবার হাতে বন্দুক। সহজে বেপরোয়া হয়ে উঠতে কতক্ষণ! মৌ-মাছির টানে আর বিধবাপল্লীর এতগুলি মানুষকে ফুলপট্টি মধু খাওয়াবার লোভে বাউলে অজানিতে নিজেই ডাইনে খানিকটা হেলে পড়েছে। বনে দিক ঠিক রাখা বড়ই দুরূহ।

ফলে এই দীর্ঘ লাইন এগুতে এগুতে কাস্তের আকার নিয়েছে। এখন অবধি ওরা কেউই মনের মতো মৌ-চাকের সন্ধান পায়নি। কোথাও ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায় না। সবাই প্রায় নিঃশব্দে চলতে চায়। বনে চলাফেরার আইন সহসা কেউ ভাঙতে চায় না। বলা যায় না—সোরগোলে মৌ-মাছিরাও সচকিত হয়ে উঠতে পারে। শত্রুর একবার হদিস পেলে মৌমাছিরাও মারমুখো হয়ে ওঠে। শতশত হুলে তখন বিধ্বস্ত করবে তাদের শত্রুকে! শতেক সহস্রের জমায়েতে ক্ষুদে মৌমাছিরাও বিশ্বাসী।

নিঃশব্দে চলার আইন বলীশ্রেষ্ঠ হিংস্রতম মানুষখেকোর জন্যও। এ জীবের বুদ্ধির ও সচকিততার তুলনা নেই। হঠাৎ দেখা দিয়ে হকচকিত করে পলকের মধ্যে তার খাদ্যকে নিয়ে কোথায় উধাও হবে, তার দিশাই মিলবে না। তার জন্যও নিঃসাড়ে বনে বিচরণ করার ওদেরও কড়া আইন।

যতই কেন তুমি কড়া আইন মেনে চলো, সে-জীব আড়ালে আড়ালে সব যেন নখদর্পণে বুঝে নিয়েছে। লাইনের দক্ষিণ প্রান্তে জোয়ান ভজহরিকেই সে তাক্ করেছে। কিন্তু ওর চিন্তা আর ভয় দীর্ঘ চক্রাকার লাইনটিকে। বেশি লোভ করতে গিয়ে চক্রের বেড়ে না পড়ে। চক্রের ব্যূহের মধ্যে ঘেরাও হয়ে পড়তে চায় না বনের কোনো জীবই, তা সে যতই শক্তিশালী হোক। তেমন বেড়ে পড়লে সে মরিয়া হয়ে ওঠে, নির্মম ও হিংস্রতম হয়ে ওঠে।

এই বেড়ে পড়ার ভয়ে নরখাদক এবার চঞ্চল—না, আর দেরি নয়, যা করা তা এখনই সারতে হবে।

সহসা এমনভাবে আবির্ভাব হয়েছে যে সে এবার ভজহরির মুখোমুখি, চোখাচোখি।

প্রথম চমকেই শক্তিধর ভজহরি বজ্রাঘাতে আহতের মত কাঠ হয়ে যায়নি। বনবিবির কথা মনের তলে ঝলক্ মারতেই প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে,—মা! মা! মা!

রাখে মা, মারে কে?—এতো কথা বলার অবস্থা নেই। বাঘও হুঙ্কারে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য লেজের মাথা দ্রুতলয়ে মোচড় দিয়েছে।

মুহূর্ত দেরি করার অবসর নেই। সুন্দরবনের নরখাদক কখনই ভাল করে সুলুক-সন্ধান না নিয়ে, পরিস্থিতিটা বেশ করে বুঝে না নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে এগোয় না। সে-শিকার জীব যদি মানুষ হয়, তাহলে তো কথাই নেই। মানুষের প্রতি ওদের বিশ্বাস নেই—কখন যে কি অঘটন ঘটিয়ে বসে তা বোঝাই দায়।

দীর্ঘ লাইনের যে-মাথায় ও এখন তাক্ করেছে, এতক্ষণে তার অন্য মাথাটা বেশ খানিকটা দূরে আর বেশ কিছুটা বেঁকে এগুচ্ছিল। যেন বেড় দেবার মতো। নরখাদক এবার মরিয়া—দ্রুত ছোঁ মেরে মুখে তুলে তাকে সরে পড়তে হবে। অতি দ্রুত।

ভজহরির 'মা—মা—মা' ডাক যেন গোটা লাইনে বিদ্যুতের শকের মতো কাজ করে। দ্রুত পরপর 'ভয় নেই' 'ভয় নেই' চিৎকার গোটা দীর্ঘ লাইন থেকে। বেদে বাউলে তো হরিণের বেগে বন্দুক উঁচিয়ে 'রোখ্, রোখ্, রুখে দাঁড়া' চিৎকারে ছুটে এসেছে। শুলো আর ঝোপঝাড় যেন মিছেই চেষ্টা করছে সেগতিকে স্তব্ধ করতে।

নরখাদক আর পলকেরও সময় দেবে না। ভীষণতর হাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিন্তু ভজহরি! পিঠের দিকে কোমরে গোঁজা কাস্তেখানা টেনে উঁচিয়ে ধরার অবকাশও

হয় না। হাতে একখানা ছোটো মোটা—বেশ মোটা লাঠি ছিলো, সেটাও উদ্যত করার সুযোগ ছিলো হয়তো। কিন্তু ভজহরি করাল মৃত্যুর সামনে আত্মরক্ষার তাগিদে ঝমাৎ করে ঠিক পেছনের গেঁয়ো গাছটার গুড়ি সাপ্‌টে ধরেছে দুবাহুতে এবং আপ্রাণ শক্তিতে। এ-হাত ও-হাতের কব্‌জি জড়িয়ে বাহু-বন্ধন যেন সিল করে দিয়েছে—না কিছুতেই ওকে টেনে নিয়ে যেতে দেবে না...না, কিছুতেই না ।।

নরখাদক উল্লম্ফনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গেঁয়ো গাছটার গোড়ায় ছিলো হাতদুই উই-এর ঢিবি, তারই উপর দাঁড়িয়ে ভজহরি গুড়ি জাপটে ধরেছিলো। বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝুলেই আবারও লাফ দিয়ে তার কাঁধ ও গর্দান কামড়ে ধরে টেনে নিতে চায়। প্রথমে এক থাবা পিঠে মেরে আমূল নখবিদ্ধ করেছে। আরেক থাবা ভজহরির ডান বাহুর উপর।

ভজহরি যেমন 'মা-মা-মা' করছে, তেমনি তার শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিষ্ঠ হাত দুটোকে কিছুতেই মুক্ত হতে দেবে না, মরে গেলেও না—এই তার পণ।

নরখাদক তার গলা এগিয়ে এবার ভজহরির ঘাড়কে করাল গ্রাসের মধ্যে আনতে চায়। কিন্তু আনবে কি! পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়েই তো গলা বাড়াতে হবে। উই-এর ঢিবির মাটি ওর সুঁচোলো বক্র নখের চাপে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নরখাদকও ঝুলে পড়ে।

ভজহরির পিঠে আমূল বসানো থাবার নখগুলি বাঘের ওজন ও দাপটির টান সামলাতে পারে না। বক্রনখবিদ্ধ মাংস টেনে ছিঁড়ে নিয়ে হিংস্র বাঘ গড়িয়ে পড়ে নিচের মাটিতে প্রায় চিৎ হয়ে।

ভজহরি এবার উন্মত্ত। হিংস্রতম আক্রমণকারীকে ধরাশায়ী দেখে তার উদ্দম ও প্রতিহিংসা ফেটে পড়ে। দুই উরুতের মধ্যে চাপা লাঠিখানা ঝমাৎ করে টেনে আপ্রাণে আঘাত করে বাঘের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসা গোটা লাইনের চিৎকার ঘনীভূত হয়ে আছড়ে পড়ে সারা বনাঞ্চলে।

দলবদ্ধ মানুষের হুঙ্কার আর বলিষ্ঠ হাতের লাঠির আঘাতে থতমত খেয়ে যায় নরখাদক। সুড়সুড় করে কেটে পড়ে শত্রুর বেড়ে পড়ার আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাবার তাগিদে।

বেদে বাউলে সবার আগে ছুটে এসে দ্যাখে, ভজহরি তখনও লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার পিঠ দিয়ে জলধারার মতো রক্ত ঝরে পড়ছে। 'শাবাশ্‌...শাবাশ্‌' বলতে বলতে বাউলে বাঘের গতিপথ একটা চোট্‌ করে যেন ত্রাস এনে দিতে চাইলো। ছুটে এগিয়ে ভজহরির বাহুতে হাত দিতেই সঙ্গে সঙ্গে সে এলিয়ে পড়লো মাটিতে।

মুহূর্তে সবাই জড় হয়েছে। বাউলে চিৎকার করে ওঠে,—করছিস কি! যা তুরণ তড়পা শালার সামনে, যা শীগ্‌গির যা, যা-হাতে আছে তাই নিয়ে তড়্‌পা। গালি দে, ঝোপঝাড় লাঠিপেটা কর্‌। শালা ধারে কাছেই আছে।

বলেই সে নিজে ছুটে বিদ্যাধরীর পলিমাটি এনে ক্ষতস্থানে চেপে লেপটে দিলো। যতটা পারে গামছা দিয়ে এঁটে বেঁধে দিলো। রক্তধারা স্তব্ধ না হলেও একটু বুঝি স্তিমিত হয়েছে।

বাইচের ডিঙির মতো সবাই মিলে প্রাণপণে তালে তালে বেয়ে ক্যানিং হাসপাতালে এসেছে। চার ঘণ্টার পথ দু-ঘণ্টায় বেয়ে এসেছে। বাউলে তার বিধবাপল্লীর ছেলেকে বাঁচাতে চায় যে-কোনও ভাবে। তা না হলে কী কৈফিয়েত দেবে ওর মা-কে!

ভজহরি যন্ত্রণায় কাতর হলেও কখনও কিন্তু চেতনা হারায়নি। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু প্রাথমিক যা করার তা করে এসে বাউলেকে বললেন,—বলতে পারি না বাঁচাতে পারবো

কিনা, ক্ষত বড় গভীর।

বাউলে চমকে উঠে বলে, —না ডাক্তারবাবু, যে ভাবেই হোক ওকে বাঁচাতেই হবে। যা টাকা লাগে, যা ওষুধ লাগে তার ব্যবস্থা করবো। আপনি বাঁচাতে পারবেন না?

বাউলের আকুল আবেদন শুধু বিধবাপল্লীর ছেলে বলে নয়, শুধু আপনজন বলে নয়! ওর বিবেক ওকে আঘাত করছে। সে-ই নিশ্চয় ফুলপট্টি মধুর লোভে নিজেই বুঝি লাইনকে বেঁকিয়ে দিয়েছিলো বাদায়। তাতেই ওর মানসিক আক্ষেপ। তা না হলে কি বাঘে অমন মরিয়া হয়ে ওঠে। কেন সে বাঘকে আগে দেখতে পেলো না। মনে মনে তার আপশোষেরও অন্ত নেই।

অন্য সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে বাউলে ক্যানিং-এ থেকে গেলো। দুদিন পরে ভজহরির নিদারুণ যন্ত্রণা বেড়ে যায়। ডাক্তারবাবু অনুমান করলেন, নিশ্চয় ক্ষত বিষাক্ত হয়ে গেছে।

যন্ত্রণায় কাতর ভজহরি তবু বলে,—না, আমি বাঁচবই। বনবিবি আমাকে বাঁচাবে।

ডাক্তারবাবু তো রুগীর দৃঢ়তা দেখে অবাক। পরদিন সকালে ডাক্তারবাবু এলেই ভজহরি বলে,—দেখুন ডাক্তারবাবু কি হয়েছে! আমি বলিনি আমি বাঁচবই। আমার গোটা পিঠ ও বিছানা পূঁজে ভর্তি।

ডাক্তারবাবু আনন্দে আত্মহারা। তিনমাস শুশ্রূষা করে ভজহরিকে ভাল করে তুললেন।

বাউলেরও আনন্দের পরিসীমা নেই। সে এখন বিধবাপল্লীতে গিয়ে মুখ দেখাতে পারবে। মুখ দেখাতে পারবে মাধুরীর কাছেও। পাল্লা দিয়ে বিধবাপল্লী গড়তে গিয়েছিলো। মাধুরী বুঝবে কি, ও তো তৈরি করা এক বিধবাপল্লীকে নতুন করে গড়ে তুলেছে। আর আমাকে শুরু করতে হয়েছে ভিতের থেকে। দুর্ধর্ষ জেলেদের তো একত্র করে রাখতে হবে আমাকে। আমার দায়-দায়িত্ব অনেক বেশি...অনেক বেশি।

বাউলেও জানে না, এই দায়-দায়িত্বের পরিমাপ করা কি পরিমাণে দায়। আগামী দিনে এমন এক ঝামেলা আসছে যা মোকাবেলা করতে বাউলেকে শেষ পর্যন্ত মাধুরীকেও হয়ত হারাতে বসতে হবে।

ষোলো

নতুন এক ঝামেলা দেখা দিয়েছে রায়মঙ্গলের পশ্চিমে। এই রায়মঙ্গল বরাবরই দেশ ভাগ হয়েছে। ওপার পুব-বাঙলা, এপার পশ্চিম বাঙলা। ভাগ হয়েছে সুন্দরবনও এই নদী বরাবর। ওপারে তখনও পূর্ব-পাকিস্তান, এপার পশ্চিমবঙ্গ। সীমানা নির্ধারিত হয়েছে কাল্পনিক রেখায় মাঝ-নদী বরাবর।

মগ-ফিরিঙ্গিদের আমল থেকেই সুন্দরবনের ডাকাতির 'সুনাম' আছে। সে-আমলে তো শুধু ডাকাতি ও লুঠপাট নয়, যাকে পায় তাকেই ধরে নিয়ে যেতো, মেয়েদের পেলে তো কথাই ছিল না। নিয়ে গিয়ে গরু ভেড়ার মতো তাদের বেচা-কেনা করতো মগ-ফিরিঙ্গিরা দেশ-বিদেশে। দাস-ব্যবসার অভিশাপ এমনি করেই নেমে আসে গোটা বাদা অঞ্চলে। বন্দীদের-হাতের তেলো ফুটো করে বেত চালিয়ে হালি বানাতো। এইভাবে বেঁধে জাহাজের খোলে গাদি মেরে রেখে দিতো বন্দরে বন্দরে দাস বিক্রীর জন্য। সুন্দরবন তখন 'মগের-মুল্লুক' হয়ে ওঠে। সেই অতীতকালে রাজা প্রতাপাদিত্যের দৌলতে এবং পরবর্তীকালে শায়েস্তা খাঁর কঠোর শায়েস্তাতে সুন্দরবনের মানুষ দাস-ব্যবসা আর লুঠপাটের অভিশাপ থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

অধুনা দেশ বিভাগের পর কয়েক বছর ধরে তো এপার-ওপার ছিন্নমূল মানুষের আনাগোনার হিড়িকে গোটা সীমানা ধরে সোরগোল চলে। মায় বাদা অঞ্চলও বাদ যায়নি। হিড়িক থিতিয়ে এলে নতুন আপদ দেখা দেয়। যদিও একে 'মগের মুল্লুক' বলা ঠিক নয়, তবুও ডাকাতি ও লুঠপাটেতে তা কম কিসে।

রায়মঙ্গলের এপারেও সুন্দরবন। দুই বনের সম্পত্তি অঢেল। আহরণ করাই যা একটা কষ্টসাধ্য। সেটাই বা করি কেন ? কাজেই এপারের মানুষ জীবন বিপন্ন করে যে-সম্পত্তি আহরণ করে তারই উপর হামলা শুরু হয়। এই দুর্দিন পুরোদমে শুরু হয় বাঙলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রক্কালে। পূর্বপাকিস্তান তখন ভারতের সীমান্ত বরাবর খান-সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়েছে। খাস বাদা অঞ্চলেও খান-সৈন্যরা কিছুদূর অন্তর অন্তর ফাঁড়ি গেড়ে বসে যায়। আর তাদেরই আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে ওপারের ডাকাতের দল এপারে হামেশা লুঠপাট চালাতে কসুর করে না।

তেমনি এক লুঠের ঝামেলায় পড়ে এপার গোসাবার বিধবাপল্লীর জেলেরা। ওরা জনা ছয়েক মিলে যায় পুবে রায়মঙ্গলের কাছাকাছি খালে মাছ ধরতে। এই খালটিকে বোধহয় মাছের আড়ৎ বলা যায়, বিশেষ করে কই-ভোল মাছের। পারসে ও পাতাড়ি মাছ ফাও হিসাবে তো আছেই। ওদের সঙ্গে দুখানা ডিঙি ও জাল। জোয়ার পুরতে ওরা খালের মুখে সবে জাল বাঁধছিলো। তখনও পর্যন্ত কোনও মাছ ধরেনি।

এমন সময়ে দশ-বারোজন ওপারের ডাকাত বন্দুক ও ধারাল সব অস্ত্র নিয়ে চোটপাট করে এসে পড়ে। মাছ লুঠ করে নেবে। মাছ না দেখে ডাকাতেরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বন্দুকের একটা আওয়াজ করে আর মারধোর করে বলে,—দে শালারা, দে তোদের কি আছে। দে বলছি।

জেলেরা বলে,—থাকার মধ্যে আছে এক হাড়ি চিড়ে আর এক শিশি মধু। নিতে চান তো নিয়ে যান।

—কেন শালারা, জালটা তো আছে। তোল্ জাল, তুলে দে ডিঙিতে, শিগগীর তোল্।

জাল তোলা হলে ডিঙি আর জাল নিয়ে ওরা বললো,—এই একখানা ডিঙি নিয়ে গেলাম। আজ মঙ্গলবার, তোরা শনিবার আসবি পাঁচশ' টাকা নিয়ে। কোথায় আসবি জানিস ? ঐ ওপার রায়মঙ্গলের ওপার, ১৭৯নং লাটে, কেওড়া গাছটার ঘাটে। টাকা দিলে তবে ডিঙি ফেরৎ পাবি। মনে থাকবে ? শনিবার, এই দুপুর গড়াবার আগেই। খান-সেনাদের দেখলি ভয় পাবি না, বলবি—নিধু সর্দারকে চাই, ব্যস্।

এই আদব-কায়দাটা ওরা সড়গড় করে তুলেছে। টাকাটা কমই বলে, তা না হলে টাকা দিতে লোকই আসবে না এমুখো। টাকা নিয়ে হাজির হলে ঠিকই ওরা ডিঙি ফেরৎ দেয়—কেননা লুঠের টাকা আদায়ের এটাই অতি সহজ পথ হিসাবে দেখা দিয়েছে। যদি জোর করে কেউ ডিঙি ছিনিয়ে নিতে চায় তো খান-সেনারাও মারমুখো হয়ে ছুটে আসবে—ওদেরও যে বখরা আছে এই ধরনের ডাকাতিতে।

ঘটনাটি শুনে বাউলে বলে,—তোরা কি করলি বল্তো। হাজার টাকার ডিঙিখানা খুইয়ে এলি। এখন উপায় ? টাকা, অতো টাকা ঝমাৎ করে কোত্থেকে পাবি ? তা হয় না।

সবাই বলে,—তা হয় না তো কি হয় ?

—দাঁড়া, ভেবে দেখা যাক্ কি করা।

—তোমার ঐ ভেবে দেখা। ভেবে দেখা মানে তো তোমার পাড়া-কমিটি বসানো আর মাধুরীদির সঙ্গে সলাপরামর্শ করা।

—না, না, তোরা দাঁড়া। আমাকে একটু ভাবতে দে।......

বেশ কিছুক্ষণ উসখুস করে বলে,—এক কাজ কর্ বুঝলি,...তোরা জনাছয়েক এক লম্বাপানা ডিঙি নিয়ে আমার সঙ্গে চল।

তারপর হাতের কর গুণে গুণে বলে চলে,—শনিবার হলো গিয়ে দ্বিতীয়া তিথি, প্রথম জো আসবে সকাল আটটায়। তখন ১৭৯নং লাটের এক বাঁক নিচে আমাকে নামিয়ে দিবি। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আমি খান-সেনাদের ফাঁড়িতে পৌঁছে ওদের গল্পে গল্পে মশগুল করে রাখবো। সেই সময় তোরা ওখানে কূল দিয়ে নিঃসাড়ে পৌঁছে ঘাটে তোদের বাঁধা ডিঙিখানা খুলে তুরণ বেগে কোন মতে রায়মঙ্গল পার হয়ে খাল ধরে ধরে চলে আসবি।

ওরা প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলে,—কিন্তু যদি ধরা পড়ি!!

—তা তো হতেই পারে। তাইতে তো বলছি, সঙ্গে একশো টাকা নিবি ; ধরা পড়লে টাকাটা ওদের হাতে গুঁজে দিয়ে কান্নাকাটি করে ডিঙিটা চাইবি। পেলি ভালো, না পেলে চলে আসবি। তোদের তো ভয় করার কিছু নেই। দেখি ওদের গল্পে মাৎ করতে পারি কিনা। তারপর যে-করে হোক আমি ফিরে আসবো।...তা অতো ভাবছিস কি?

—ভাবছি...

—না, ভাবতে হবে না, আমি আপাতত তোদের একশো টাকা জোগাড় করে দিচ্ছি। পরে পাড়া-কমিটি সব শুনে যা বলে তাই করতে হবে। কিন্তু তার আগে তোরা কাউকে কিচ্ছু বলবি না। মায় মাধুরীকেও না। ঠিক তো?

যা করণীয় তা সবই করা হয়েছে। বাউলেও পায়ে হেঁটে খান-সেনাদের ডেরায় হাজির। আজ সে পুরো সেজে এসেছে যেন কাপালিক সন্ন্যাসী। বড়-বড় ত্রি-পুন্ড্র-লাঞ্ছন কপালে, হাতে ও বুকে। বড় রুদ্রাক্ষের মালা যেমন ওর গলায় থাকে তেমনি তো আছেই, আজ আবার দুবাহুতেও রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করেছে। বাব্‌রি চুলের উপর লাল কাপড়ের ফেটা বাঁধা। ওর ঝোলায় নিয়েছে একখানা আতশী কাঁচ আর আজ-বাজে গাছের কিছু শিকড়।

এসেই দরাজ গলায় বলে,—আল্লা হো আক্‌বর। আল্লা হো আক্‌বর।

ছুটে এসে প্রধান খান-সেনা তো দেখেই অবাক্। হিন্দু সাধু আদমী, আল্লার নাম নিচ্ছে কি করে? ভেবেই প্রশ্ন করে,— তোমি তো হিন্দু সাধু আদমী, খোদাতাল্লাকো নাম ক্যায়সে নাড়া দেতে?

—আরে ভাইয়া যো ভী আল্লা সো ভী ভগবান। আভি তো হাম আ রহে টাঙ্গা মসজিদসে। টাঙ্গা মসজিদ কাঁহা আপকো মালুম হ্যায়?

—নেহি তো

—তব্ তোম ক্যায়সে মুসলমান হো! টাঙ্গা মসজিদসে আল্লাকো দয়া মাঙ্‌কে নূরনগর কৃষ্ণজীকা মন্দির হো কর্ সিধা আপকো পাস্ আয়া হ্যায়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কৃষ্ণজীকা মন্দির, মৈনে শুনা হ্যায়।

—তো খান্‌সাহেব আপকো বিবি আভী ক্যায়সী হ্যায়?

—ক্যোও! হামারা বিবিকো বাৎ ক্যায়সে মালুম হো গিয়া তোম্‌কো?

—ক্যায়েসে, ইধর্ দ্যেখো হামরা নখ, বুঢ়া আঙলিকা নখ্। যো নখ্ হ্যায় উস্‌মে আপ্‌কো বিবিকো তস্‌বিস্ লে আনতে সকে। লেকিন আপকো আখো মে নেহি আয়গা। সিরিফ্ হাম্ একেলা দেখ্ সকে।

বলেই বাউলে নিজের নখকে কাপড়ে পরিষ্কার করে পদ্মাসনে বসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। একটু পরেই বললো,—হ্যাঁ আ গিয়া। আপকো বিবিকা নাক্ বড়া উঁচা হ্যায়;

ক্যায়া ঠিক বাৎ বলা কি নেহী ?

—হ্যাঁ ঠিক, হ্যাঁ ঠিক্।

—তো উনকি একঠো লেড়কা দেখ্‌তে হ্যায় !

—নেহি, নেহি, লেড়কী হোগী।

—ঠিক্ ঠিক্ খানসাহেব ! উনকী গলামে একঠো পাত্থরকা মালা হ্যায়।

—এ তোমকো ক্যায়সে মালুম হো গিয়া ! দ্যেখাও, দ্যেখাও, হামকো ভী দ্যেখাও।

—নেহী, হামকো ছোড়কে কই দোস্‌রা আদমী নেহী দ্যেখ্ সক্‌তে।

দুজনে ভাঙা বাঙলা আর ভাঙা উর্দুতে মেতে উঠেছে। সেই সঙ্গে ধারে-কাছে অন্য সবাই এসে জড়ো হয়েছে।

হঠাৎ বাউলে বেশ জোরেই বললো,—দ্যেখো খান-সাহেব, আপ্ বহুৎ মহব্বৎ আদমী হ্যায়।

বলেই বাউলে আঙুল দিয়ে খান-সাহেবের ভ্রূ-যুগল দেখিয়ে বললো,—হ্যাম তো ভ্রূকা হিন্দী ভুল গিয়া···হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ আপকো জোড়-ভৌঁও হ্যায়, উসকো মানে ক্যায়া আপ্ জানতা ? মানে হ্যায়, কই দুস্‌মন আপকো গর্দান আউর শিরপর গোলি লাগানেকো সকেগা নেহি, কভি নেহি !

খান-সাহেব এবার বিগলিত। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে এসেছে, অন্য সবাইকেও মাতিয়ে রাখা আবশ্যক। তাই বাউলে কথার মোড় ঘোরালো। অন্যসবার দিকে তাকিয়ে বললো,—জানো তোমরা, আমি থাকি কোথায় ? আমি থাকি এই সোঁদরবনে, বাঘের রাজ্যে। ভাবছো বাঘের রাজ্যে থাকি কি করে ?

প্রশ্ন তুলেই কয়েক লহমা চুপ করে থাকে। তারপর নিজের গোঁফদাড়িতে হাত বুলিয়ে আর খান-সাহেবের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে,—তোমরা যদি আমাদের দুজনের মতো বড় মোচ আর দাড়ি রাখতে পারো তাহলে কোনও ভয় নেই। বাঘ এমন দাড়ি-গোঁফ দেখলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। বাঘের যেন কেমন বিতৃষ্ণা আসে।

—আর যদি সাপের কথা বলো—বলেই বাউলে ঝোলা থেকে শিকড়গুলো বের করে বললো,—এই শিকড়ের যদি সামান্য অংশও তোমাদের কাছে থাকে তার গন্ধে সাপ কোনওদিন ধারে কাছে আসবে না।

সবাই উল্লসিত হলো শিকড়ের একটু ভাগ নিতে। খান-সাহেবও এগিয়ে এসেছেন দেখে বাউলে তার হাতে বড একখানা শিকড় দিলো।

খান-সাহেব তো নাকের কাছে শুকতে শুকতে বলেন,—বাঃ শিরামে তো বহুৎ আচ্ছা বাস নিকাল্‌তে !

বাউলে দেরি না করেই বলেই চলে,—আমি সব জন্তুর ও পাখির ভাষা বুঝি, আর আমিও তাদের মতো করে তাদের সঙ্গে কথা বলি। তোমরা বানরের ডাক শুনেছো তো ! বলেই বানরের ডাকের নকল করে আওয়াজ করলো। জানো এই ডাকে ওরা কি বললো ? বললো, তুমি ওদিকে যেও না, ওদিকে ভয় আছে, এদিকে এসো। এই তিনটি কথা বললো। বলেই আবার বানরের নকল ডাক দিলো।

—এ তো গেলো বানরের ডাক। পাখির ডাক শুনবে ? বন্যকুক্কুট ডেকে কি বলে জানো ?—বলেই ভীষণভাবে কয়েকবার ডাক দিলো। এই ডাকে কি বলছে জানো ? বলছে—আর এগিয়ো না, সামনেই বাঘ ! আমিও তার উত্তরে ঝমাৎ করে চাতক পাখির কায়দায় ডাক ছাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে বাউলে চাতক পাখির নকল করে বিকট আওয়াজ করে বসে কয়েকবার। সবাই তো হেসেই খুন, মায় খান-সাহেবও হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠেন।

বাউলে আগেই তার জেলে-পাড়ার লোকেদের জানিয়ে রেখেছিলো,—চাতক পাখির এই ডাক শুনতে পেলে তোমরা বুঝবে, নিশ্চিন্তমনে কাজ করে যেতে পারো, আমি ওদের মাতিয়ে রেখেছি।

চাতক পাখির ডাকের শেষে বাউলে তার ঝোলা থেকে দ্রুত আতশী কাঁচখানা বের করলো। কাপড়ে মুছতে মুছতে বললো,—খান-সাহেব, আপকো হাথ দেখ্‌নেসে কই কসুর হ্যায় ?

—আরে সাধু ইসমেভী তুমকো এক্তিয়ার হ্যায়।

—দ্যেখাইয়ে আপকো হাত।—বলেই বাউলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে খান-সাহেবের হাতের রেখাগুলি আতশী কাঁচে দেখতে থাকে। অন্যেরা তখন গামছা দিয়ে তাদের হাত সাফাই করে নিচ্ছে অসীম আগ্রহে।

হাত দেখে প্রত্যয়ের ভাব নিয়ে বাউলে বলে,—আভী হ্যাম্‌ নিশ্চিন্ত্‌ হো গিয়া। আপকো এক সালভর কই লড়াই করনে হোগা নেই। কোন্‌ লড়নেওয়ালা হ্যায় খান-জোয়ানকো সাথ্‌। আপকো জলদিসে জলদি ছুট্‌টী মিল্‌ যায়গা।...লেখিন, এক বাৎ খান-সাহেব, কিধর যানেকো বকৎ, সে আপকো ঘর যানা, বলকি লড়াইকো ময়দান যানা—সব কইকো পহেলে দেখ লেনা কোন্‌ নাককো কোন্‌ পুরাসে শ্বাস নিকালতে। যব বাঁ পুরাসে পড়নেওয়ালা হ্যায় কভী উস্‌ টাইমমে কই কামমে মাৎ যাও ; লেকিন যব্‌ ডাইনে পুরাসে শ্বাস নিকালতে তব যো কই কামমে লাগো তোমকো জরুর ভালাই হোগা, মঙ্গল হোগা।

খান-সাহেব তো আনন্দে আত্মহারা। দুই আঙুলে দুই নাকের শ্বাস পরখ করতে করতে হাঁক দিলেন,—কই ভাই-সাব্‌, জলদি চা বানাও, আউর সব কইকো পিলাও।

সবাই চা-এর জন্য উদগ্র প্রতীক্ষায়। ওদের মধ্যে একজন মাদ্রাসায় পড়া বাঙালী মুসলমান যুবক ছিলো। খুবই চালাকচতুর। গোড়া থেকেই সে বাউলের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিলো। তবুও এইসব মেকলাগা কথাবার্তায় তন্ময় হয়ে যায়। হঠাৎ সজাগ হয়ে এবার বলে উঠলো,—কই ওরা তো এখনও এলো না। টাকা নিয়ে ডিঙি নিতে এলো না। দেখি একবার।—বলেই নদীর কিনারায় গিয়ে দ্যাখে, কেউ আসেনি, ডিঙিখানাও নেই।

তবে এই সাধু কি ওদেরই লোক !! —এই ভাবনা আসতেই ছুটে চলে আসে খান-সাহেবের কাছে। পাশে ডেকে নিয়ে সাহেবকে ওর মনের সন্দেহের কথা বলে। খান-সাহেবদের সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হতে দেরি হয় না। বিদেশ-বিভুইতে যুদ্ধ করতে এলে সৈন্যদের এ মনোভাবই হয়ে যায়—সন্দেহের কথা বললেই তৎক্ষণাৎ তারা বিশ্বাস করে বসে। যেখানে ছিল সেখানেই কয়েক লহমা দাঁড়িয়ে রইলো খান-সাহেব—মুহূর্তের মধ্যে মনের রাগ ও বিদ্বেষকে ধূমায়িত করার জন্য দাঁত কড়মড় করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চমক দিয়ে সাধুকে বলে ওঠে,—তোম্‌ থোড়াই সাধু। তোমকো হাম পাকড় লেতা। তুরণ্‌ সদর চালান কর্‌ দেউঙ্গা। বড়া অফিসার উধর তোমকো বিচার করেঙ্গে, তোম্‌ সাধু হ্যায় বল্‌কি ধোঁকাবাজ হ্যায়।

বাউলে সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে,—খান-সাহেব, যো আপকো বিচার হ্যায় ওভী মান লেতা।—মনে মনে ভাবলো, আগে তো এখান থেকে সরে পড়ি তারপর যা হয় হবে।

সতেরো

খুলনা শহরে মিলিটারির এক কর্তা মেজর খান-সাহেবের কাছে সাধুকে নিয়ে হাজির। মেজর সাহেব দাবড়ি লাগিয়ে প্রশ্ন করেন, —তোম্ পাকিস্তানকে খিলাফ কই কাম কিয়া, *কই দুসমনি কিয়া ?*

জীবনে এক সময়ে যখন সামরিক শিক্ষা নিতে যায় তখন বাউলে দেখেছে কোর্টমার্শালে কি ঘটে। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে মেজর সাহেবকে বলে,—হাঁ, কিয়া হুজুর।

মেজর সাহেবের তাৎক্ষণিক বিচার,—তব্ তোম্ তো দোষী হ্যায়।

—হুজুর হাম্ দোষী হ্যায় !

—বাস্, তোমাকে পাঁচ বরষ জেল—আবার ইংরেজি করে বলেন,— Five years imprisonment। তোম্ তো ফকির আদমি, উস্ লিয়ে not rigorous but ordinary......সমজ্ লিয়া ?

—জো হুজুর। —বলেই বাউলে আদাব জানালো।

বাউলে এবার খুলনা জেলে আটক কয়েদী। একজন সুন্দর চেহারার সাধুবেশধারী কয়েদী পেয়ে জেলার সাহেব যেন খুশি। বুকে ও হাতে লাঞ্ছন দেখে আদেশ দিয়ে বসলেন, সাধুকে কোর্তা পরতে হবে না, তবে হাফ প্যান্ট পরতেই হবে। কিন্তু কেষ্ট ফাইলে লাইন দেবার সময় কোর্তাও অবশ্য পরতে হবে আর থালা-বাটি হাতে তো নিতেই হবে। কয়েদী নম্বর প্লেটটা রুদ্রাক্ষের মালার পাশেই ঝোলাবার আদেশ হলো। কয়েদী নম্বর পড়লো ১৫৬০।

বাউলে সব তাতেই রাজি। তবে তিলক কাটা আর হাতদেখাটা ছাড়েনি। খাওয়া-দাওয়া, শোয়া কোনো তাতেই কোনো নালিশ নেই। জেলার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেই জানায়,—খুব খুশি, খুব খুশি। এতো খাবার যে সবটা খেয়ে উঠতে পারি না আমি।

খুলনা জেলখানা। ভৈরবনদীর তীর বরাবর লম্বা হয়ে ছড়িয়ে আছে। তবে চওড়া বেশি নয়। ছোটো জেল। মাত্র শ'দুয়েকের মতো কয়েদীর স্থান হতে পারে। তা হলে কি হবে, এই স্বল্প পরিসর জেলের মধ্যে বর্তমানে আছে দেড় হাজার চেয়েও বেশি কয়েদী। কালটা যে বড়ই আপদ্‌কাল। ১৫৬০ সালের এপ্রিল মাস। ৭ই মার্চ ঢাকার রমনা ময়দানে বঙ্গবন্ধু মুজিব ঘোষণা করেছেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। তারপরই শুরু হয়েছে শাসক ইয়াহিয়া খানের অমানুষিক অত্যাচার, মারধোর, জেল ও গুলি। ভরে গেছে এই ছোট্ট জেলখানা। আওয়ামী লীগের শুধু পাণ্ডারাই নয়, বহু চুনোপুটিও গিজ্‌গিজ্ করছে। জেলখানা সবসময়ই এখন গরম হয়ে আছে।

বাউলের ভাবনা, ওর কথাবার্তায় কোন্ লাইন নেবে। লাইন ওকে নিতেই হবে। কোনমতে বেঁচে দেশে ফিরতে তো হবে। মাধুরীর কথাও মনে পড়ে, মনে পড়ে মায়ের কথাও—বহুদিনই তো হলো ওদের সঙ্গে দেখা হয় না। ভেবে ঠিক করলো, আওয়ামী লীগকে মেনে না নিলে উপায় নেই, তবে জেলের কর্তাদেরও তো মন রেখে চলতে হবে। যাক্ গে ! আমি তো শুধু সবাইকে ভবিষ্যৎ বাণী শোনাই। তাই শোনাবো—হয় ভালো, না হয় মন্দ। আওয়ামী লীগকে বাহবা দেবো কিন্তু ভারতের মতলব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবো।

সেদিন এক আওয়ামী নেতা নেছের আলি সাহেব এসে বাউলের পাশে বসলেন।

জেলের ভেতর ছোট্ট একখানি উঠোন মতো ছিলো। তারই পাশে একটি শিউলিফুলের গাছ। শরৎকাল এসে গেছে। ফুল ঝরঝর করে তলায় পড়ে সাদা বিছানা যেন পেতে দিয়েছে। তারই মাঝখানে বাউলে ভোর সকালে চান-টান সেরে কপালে ত্রি-পুন্ড্র-লাঞ্ছন এঁকে বসে আছে। নেছের আলি সাহেব হাত এগিয়ে ধরে বললেন,—কি সাধু! বলো এবার আমাদের ভাগ্যে কি আছে?

বাউলে বলে,—না, আজ হাত দেখা নয়। ছক্ কেটে নিশ্চিন্ত হয়ে বলবো। বলেই আস্তে ও আলতো করে কিছু ঘন হয়ে ঝরে পড়া শিউলিফুল সরিয়ে রাখলো। শিউলিফুল অতো মিষ্টি হলে হবে কি, ভারি অভিমানী ফুল। এতটুকু অযত্নে নাড়াচাড়া করলেই মিইয়ে যায়, বিবর্ণ হয়ে যায়। তাই বাউলে প্রায় একটা একটা করে তুলে সরিয়ে রেখে মাটিতে তর্জনীর নখাগ্রে ছক্ কেটে ফেললো। মেঞাজানেরা তো বিশেষ তিথি-নক্ষত্রের আমোল দেন না। তাই বাউলে শুধু জেনে নিলো কি মাসে আর কি বারে জন্ম।

তারপর কতো যে নম্বর লিখলো ছকের বাইরে ও ভিতরে, তার ইয়ত্তা নেই। অবশেষে গম্ভীর হয়ে বলে,—তা সাহেব, মুজিব তো এখন জেলে, ছকে বলছে উনি শীঘ্রই ছাড়া পাবেন। ঠিক কখন তা এখন বলতে পারছি না। তবে কি জানেন, ভারত তো কোনও নাড়া দিচ্ছে না। আর দিলেই কি ভালো হবে? কার কি মতলব তা বোঝাই দায়। শেষকালে আমরা এক বিদেশীকে হটিয়ে আরেক বিদেশীকে এনে না বসাই। এইটুকু আমার ভাবনা। ছকের ঈশান কোণে যে ইঙ্গিত পাচ্ছি তাতে বাঙলাদেশের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গলের কোনও কিছু নেই। আর আপনার নিজের কথা। ...শিগগীর, খুব শিগগীর ছাড়া পাচ্ছেন। তৈরি থাকবেন। —শেষ কথাগুলো ওর কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে আস্তে আস্তে বাউলে বললো।

নেছের আলি সাহেব অতি উৎসাহে বলে বসলেন,—শাবাশ্ সাধু, শাবাশ্!

বেদে বাউলের অতি প্রেয় 'শাবাশ্' কথাটা ওকে সুদূর অতীতে নিয়ে ফেললো। বড়দলের কথা, গোসাবার কথা, রাঙাবেলের কথা, সাতজেলের কথা মনে ভেসে ওঠে। সর্বস্থানে সে কীভাবে এই 'শাবাশ্' কথাটা শুনতে চেয়েছে। এবার এই সুদূর খুলনা জেলখানার কয়েদী জীবনেও সেই বহুআকাঙ্ক্ষিত কথাটা শুনবার ভাগ্য হলো। ভাবে, হলো বটে তবে এ তো অপরের শুভকামনায় ভাগ্য-ছকের প্রতারণা মাত্র।

প্রতারণা কিন্তু বেশিদিন আর প্রতারণা থাকে না। শুভদিন বুঝি অতি দ্রুত ঘনিয়ে আসে। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১। খান সেনারা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। যশোহর দুর্গও ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তি বাহিনীর দখলে এলেও খুলনার তখনও পতন হয়নি। যশোহর দুর্গের খান সেনারা খুলনার পথে দ্রুত জাহাজে পাড়ি দেবার চেষ্টা করছে। তা করলেও শহরের পথে পথে তখন মুক্তিবাহিনীর সমানে আক্রমণ চলেছে। জেলে বসে বসে বাউলে ও আওয়ামীদলের লোকেরা শহরের কোথায় লড়াই চলেছে, গুলিগোলা চলেছে—তাই উন্মনা হয়ে অনুমান করে চলেছে—কারও ঘুম নেই, কারও বিশ্রাম নেই।

শেষ পর্যন্ত কদিনের মধ্যেই খুলনা শহর মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। দেখতে না দেখতে মুক্তিবাহিনীর স্টেনগানধারী যোদ্ধারা জেলে এসে সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করে নিয়ে গেছে। বাউলে সাধারণ কয়েদী, কাজেই ওর মুক্তি হয়নি। মুক্তি না এলেও কয়েক মাসের মধ্যে ওর পক্ষে এক আনন্দের সংবাদ এলো—ওকে বরিশাল জেলে বদলি করবে। বাউলে ইতিপূর্বে বরিশাল কোনও দিন যায়নি। বরিশাল যাবে বলে ওর আনন্দের সীমা ছিল না।

বরিশাল জেলে গিয়েও একইভাবে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে। সাধুলোকের প্রতি সবারই টান থাকে। বেশ কিছুদিন পর দেশের অবস্থা থিতিয়ে এসেছে। সেই সুযোগে

বাড়িতে একখানা চিঠি লিখবে বলে স্থির করে। এতোদিন কোনও চিঠিপত্র লেখেনি—পাছে কর্তৃপক্ষ ওর সব খবর পেয়ে যায়। এখন তো আর সে ভয় নেই, সব খবর পেলেও কোন কিছু আশঙ্কা করার নেই।

চিঠি দেখে জেলার সাহেব বললেন, —দ্যাখো সাধু, তোমার বাঙলা লেখা ভারি সুন্দর। আমি এক বিপদে পড়েছি ; মুজিব সরকারের এক কড়া আদেশ এসেছে, আমাদের সব চিঠি ও কাগজপত্র এখন থেকে বাঙলায় লিখতে হবে ; শুধু তাই নয়, কয়েদীদের যতো টিকিট আছে তা সবই একমাসের মধ্যে বাঙলায় লিখতে হবে। তা আমাদের জেলে কশো কয়েদী আছে জানো ? জেলের 'কেষ্ট-ফাইল' মানে কেস-ফাইল বলছে কয়েদী আছে ৭৫৫৫ জন, তাছাড়া মেয়ে কয়েদী আছে ১২০০ মতো, সাকুল্যে ৮,৭৫৫ জন। এতো টিকিট একমাসে বাঙলা করে ফেলা কি সোজা কথা ?

বাউলে না ভেবেই বলে বসে,—ভালই তো, করলে তো একটা কাজের মতো কাজ হয় !

জেলার সাহেব বললেন, —তুমি তো বললে ভালই হয় ! তা তুমি লিখে দিতে পারবে ?

—আমি ! তিরিশদিনের মধ্যে হাজার আটেক টিকিট !! ···দেখি কতোটা করতে পারি।

খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তের মতো সায় দিলেও মনে মনে কিন্তু ওর জেদ এসে গেছে। কোনও চ্যালেঞ্জের কাছে বাউলের পিছ-পা হওয়া ধাত নয়, অভ্যাসও নয়।

কাজেই মাথাচুলকিয়ে একটু পরেই বললো, —হুজুর পারবো, তবে আমাকে একখানা টেবিল ও চেয়ার আর সারা রাত ধরে কাজ করার মতো তেল-ভরা একটা হারিকেন দিতে হবে। ভালো দোয়াত ও কলমও চাই।

বাউলে যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে তাতে জেলার মহাখুশি। আরও খুশি হতে হলো চব্বিশ দিনের দিন যখন তাড়ার পর তাড়া টিকিট সব লিখে এনে হাজির করলো।

লাভের লাভ বাউলের জেল জীবন কমে এলো। শাস্তির মেয়াদের যা বাকি ছিল তার অনেকটাই জেলার রেমিশন করে দিলেন, মানে মুকুব করে দিলেন।

আঠারো

অবশেষে একদিন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বরিশাল-এক্সপ্রেসে খুলনায় হাজির। কোথাও দেরি করতে চায় না, এখন বাড়িমুখো। সীমানা পার হতে আবার ঝামেলায় পড়তে না হয়, তাই ঠিক করেছে, খুলনা থেকে ভোর সকালে সাতক্ষীরা স্টীমারে উঠে বেলা তিনটে নাগাত যাবে আশাশুনি। তারপর তো এ সব জায়গা বাউলের জানাশুনা। আশাশুনি নেমে সোজা হাঁটাপথ ধরলো। মাঝপথে দেবহাটায় এক আত্মীয় বাড়ি এসে তাদের সাহায্যে ডিঙিতে ইছামতী পার হয়ে সন্দেশখালি হাজির। এবার পথেই পড়বে সাতজেলিয়া। ভারি ইচ্ছে হয়েছিলো আগেই মাধুরীর খোঁজ নিয়ে বাড়ি যাবে। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত আগে মা-র কাছে যাবে বলেই স্থির করে। পথে চেনাশুনা লোকে ওকে ধরে বাড়ি বসিয়ে সব কাহিনী শুনতে চায়। কিন্তু কেউ-ই মা-র কথা বলে না। তাতেই, বনে বাঘ সন্ধানে অভ্যস্ত বাউলে কিছু-একটা হয়েছে বলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কোথাও কাল-বিলম্ব না করে 'আসছি, তখন কথা হবে' বলেই সটান বাড়ি আসে।

ধারে কাছে এসে দ্যাখে, নদীর পাড়ে সবই ঠিক চলছে। একই রকমভাবে সব লোকের আনাগোনা, চরের উপর অনেক ডিঙি উপুড় হয়ে পড়ে আছে, দুখানা লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে

ঘাটে, এই মাত্র খেয়া এলো ওপার বাসন্তী থেকে, কয়েকখানা ভট্‌ভটি টানা চলে গেলো—হয়ত মাছ নিয়ে ক্যানিং-এ যেতে ব্যস্ত। ব্যস্ত, সবাই ব্যস্ত। বাউলে এবার ভেড়ি থেকে বাড়ির ছিলা-ভেড়ি ধরবে। কয়েকখানা ভ্যানও হাজির লঞ্চ ঘাটায়—যাত্রীদের সাতজেলে নিয়ে যাবার প্রত্যাশা তাদের।

ছিলা ভেড়িতে পা দিয়ে কেমন যেন মনে হতে থাকে, ওর বাড়িটা বড়ই চুপচাপ। নিজেও চুপেচুপে পা ফেলে এগিয়ে এলো। থ-মারা ঘরগুলির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ওর মন কেঁদে ওঠ। কেউ নেই। কেউ নেই বাড়িতে। কয়েকবার ডাকলো,—মা, ও মা। কোনও সাড়া নেই। কিন্তু ঘরগুলি তো সবই সুন্দরভাবে নিকোনো। মায় দাওয়া ও উঠোনও। যেন ঝক্‌ঝক্ করছে। তবে? বাউলে আকুল হয়ে ডাকে, —মা! ও মা! এবারও কোনও সাড়া নেই। দাওয়ায় উবু হয়ে বসে পড়ে বাউলে। পরক্ষণই রান্নাঘরে এগিয়ে যায়; ঝাঁপি-দরজার হেঁতাল নড়ির আগলটা ঘুরিয়ে ভিতরটা দ্যাখে। দেখে আরও অবাক। সমস্ত বাসন-কোষন মাজা ও উপুড় করে রাখা!... তবে!

ফিরে এসে আরেকবার 'মা-মা' ডেকে দাওয়ায় ঝোলা রেখে উবু হয়ে বসলো। বসতেই বিধবাপল্লীর মানুষেরা এসে হাজির, সঙ্গে মেয়েরাও আছে। ওদের দেখেই ওর বুকটা ধড়াৎ করে ওঠে। কারও মুখে হাসি নেই। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা-মা ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে চোখ মুছতে মুছতে বললেন,—কি করবো বাবা। উনি গত হয়েছেন আজ ক'মাস হলো।

অনেকক্ষণ চুপচাপ সবাই। একান্তভাবে বাউলের রক্তজবা তিলকের দিকেই সবাই তাকিয়ে আছে।

বাউলেও মাথা নিচু করে চুপ হয়ে গেছে। একবার শুধু নিজের কাছে নিজে বললো,—তা হলে তো আমার শেষ চিঠিখানাও পেয়ে যাননি।

—না, এই নাও সে-চিঠিখানি।

বাউলেও চিঠিখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

কিছুটা সময় কেটে গেলে বাউলে জানতে চাইলো, —তা ঘরগুলির চাবি কোথায়? দেখছি দু-ঘরেই তালা দেওয়া।

—তোমার চাবি? সে তো মাধুরীদির কাছে। ও-তো দুদিন অন্তর আসে, বিধবাপল্লীর কাজকম্ম সেরে তোমার বাড়িতে আসে। নিজহাতেই সবকিছু করে, আর কাউকে কিছু করতে দেবে না। ঘর-বাইরে ঝাড় দিয়ে গোটা বাড়ি নিকিয়ে না দিলে যেন তার শান্তি হয় না। তা তাকে ডেকে দিচ্ছি, তুমি এয়েছো শুনলে এখনই ছুটে আসবে। ডাকতে পাঠাই তাহলে?

—না, না, ডাকতে হবে না। আমিই যাব তার কাছে। কাল সকালেই যাবো। আজ না, আমাকে তোমরা আজ একা থাকতে দাও। তোমাদের সকলের মঙ্গল তো? আজ আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

ওরা সবাই চলে গেলে বাউলে একা একাই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। মা-কে কোথায় দাহ করেছিলো, তা সব জেনে নিয়েছে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলে সে একা-একা সেই শ্মশান ঘাটে গিয়ে বহুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকে। চারিদিকে মিশমিশে ঘন অন্ধকার। এক যা, শুভ্র নদীর প্রতিফলিত আবছায়া আলো ছড়িয়ে পড়েছে আলগোছে গাছের মাথায় মাথায়। একই আলোতে চরের শেষপ্রান্তে কচি গোলগাছের উর্ধ্বমুখী পাতা ক্ষীণভাবে চিক্‌চিক্ করে উঠছে মৃদু বাতাসের দমকে দমকে। এই গোলগাছের গোড়ায় মা-র দাহ হয়।

কতোকথাই তো মনে পড়ে, মা ও তার জীবনের। ওপারের গাঢ় বন-রেখা বুঝি বাউলের মনকে শান্ত করে দিতে চায়। দূরে হলেও, এখান থেকে সোজা দক্ষিণে ধূপনির নেতা-ধোপানির মন্দির। অতীতের স্মৃতিজড়িত ধ্বংসস্তূপে পরিণত এই মন্দির সুন্দরবনের এক মহা সম্পদ। কেন জানি, আজ সেই মন্দিরের কথা মনে হোল বাউলের। দুহাত তুলে প্রণাম জানালো আর নিজের মায়ের কাছে শক্তি কামনা করলো। মা-ও যেমন তার জীবনকে ঘিরে ছিলেন, বনও তো তেমনি তার জীবনকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখেছে—শক্তি দিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে, দিয়েছে প্রশান্তি।

সেই প্রশান্তি নিয়ে ফিরে এলো শ্মশান থেকে গভীর রাতে। বাকি রাতটা দাওয়ায় শুয়ে আর আধোঘুমে কাটিয়ে দিলো। ভোর না হতেই দু-একবার 'মা-মা' ডেকে সব কাজ সেরে নিজের পুকুরে চান করে যেন নতুন জীবনে পদার্পণ করলো। এই পুকুরটা আর কিছুই নয়, একটা ডোবাকে কেটে একটু বড় করে নেওয়া নিজহাতেই। মায়ের সুবিধা আর বিধবাপল্লীর জল-ব্যবস্থা করার জন্য এই পুকুরের পরিকল্পনা। আশ্চর্যভাবেই এই পুকুরের জল বেশ মিষ্টি। নোনা দেশে এমন জল পাওয়াই দায়। বাউলে সবসময় বলতো আমার মায়ের আশীর্বাদেই তোমরা এই মিষ্টি জল পেয়েছো। মায়ের দেওয়া মিষ্টি জলে চান করে এবার যেন আরও শান্ত হলো। ওর যে এখন মাধুরীর কাছে যেতে হবে।

আগেরদিন সবাই মাধুরীকে খবর দেবার জন্য উশখুশ করছিলো। কিন্তু মাধুরীর কথা সামান্যতম উঠলেই বাউলে তৎক্ষণাৎ তাদের কথার মাঝেই বলে,—না, না, কিচ্ছু বলতে হবে না। হয়তো কথা পাড়তে গিয়েই ওরা বলে,—তা মাধুরী আমাদের ভারি লক্ষ্মী মেয়ে। ভারি...

—না না, মাধুরী লক্ষ্মী না দুষ্টু মেয়ে তা আমি কাল সকালে গিয়ে ওর কাছ থেকেই জেনে আসবো। তোমরা আমাকে এখন একটু শান্ত হয়ে বসতে দাও।

সকালে চান সেরে এসে ভালো করে এঁকে দিলো ওর ত্রি-পুন্ড্র-লাঞ্ছন। আজকে তিলকের টানগুলি আরও চকচকে লাল। বুকের লোমের উপর টানা তিলকগুলি জ্বল-জ্বল করছে ওর ফতুয়ার আলগা বোতামে। উঠবার সময় বড় রুদ্রাক্ষের দানাগুলি বুকে দুলে উঠতেই ওর মন যেন নতুন তেজে জেগে উঠলো।

বাউলে ছুটেছে, কোথাও এতটুকু দেরি করতে চায় না। একখানা ভ্যান পেলে হতো! এই ভোর-সকালে ভ্যান পাবে কোথায়? আর পেলেই বা তার পয়সা কোথায়? ছুটেছে প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে। সাতজেলে মাধুরীর বাড়ির কাছে ওর বুক দুরদুর করে ওঠে। সবুরের সঙ্গে প্রথমেই দেখা—দেখা হতেই সবুরের আনন্দের সীমা থাকে না। বলে,—বাউলেদা! বাউলেদা তুমি এসে গেছো। এসে গেছো!

—এসে গেছি তো দেখতে পাচ্ছিস; বল খবর কি? তোরা সব ভালো তো? তুই দেখি অনেক বড় হয়ে গেছিস?

—ভালো তো আছিই, দিদি কিন্তু এখানে নেই। কোথায় জানো? পাশেই দয়াপুরে। রাইচরণ মিস্ত্রীর বাড়ির পাশেই। সেখানে গেলেই দেখা হবে।

শুনতেই বাউলে যেন চুপ হয়ে গেছে। সবুরকে আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে, পরমুহূর্তে ছুটলো দয়াপুরের পথে। ছোটার মাঝে আজে-বাজে নানা কথা মনের মধ্যে ভাসে—আশঙ্কার কথা, আনন্দের কথা, বিস্ময়ের কথা। শুধু ছোটার আগে সবুরকে বলে এলো,—যা, তুইও কাপড়চোপড় পরে আমার পেছনে-পেছনে আয়, আসবি তো! আসবি

তো। আসিস্।

যুবক সবুরকে আর কতো পেছনে ফেলবে বাউলে। দয়াপুর পৌঁছতেই সবুর ধরে ফেলেছে বাউলেদাকে। মনের প্রশ্ন জেনে নিতে পারতো হয়তো সবুরের কাছ থেকে—কিন্তু সে ইচ্ছা হলো না, আর সবুরও দ্বিধাগ্রস্ত কোনও কিছু আগে থাকতে বলতে।

বাউলে খিড়কি দরজায় এসেছে, মাধুরীও সদ্যস্নাত হয়ে এসেছে। মাধুরীর কাছে এর মধ্যেই উড়ো খবর আসে, বাউলেদা জেল থেকে ফিরেছে, কোথায় কে যেন দূর থেকে বাউলেদাকে দেখেছে। কাজেই সকাল সকাল চান্ সেরে পরিষ্কার শাড়ী পরে কপালে ও সিঁথিতে রাঙা সিঁদুরের ফোঁটা ও টানা দিয়ে বাউলেদার সামনে এসে দাঁড়ালো আর গড় হয়ে প্রণাম জানালো।

প্রথমে থ মেরে গেলেও, পরমুহূর্তে নিচু হয়ে মাধুরীকে হাতে তুলে নিয়ে হাসি-মুখেই বললো,—বাঃ ভারি সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে।

কথাটার মধ্যে বিদ্রূপ থাকতে পারে মনে করে মাধুরী তার মনের কথা প্রকাশের জন্য আঁকুপাঁকু করে উঠলো। বললো,—তুমি যাই মনে করো, আগে আমার কথা শুনতে হবে, বাউলেদা!

—বলো মাধুরী, তোমার কি কথা?

—আমি যে পাগোল হয়ে উঠেছিলাম। শেষ পর্যন্ত কিনা আমাদের দিদিমণিও। মা ও বাবা কতদিন তো আমার পিছনে লেগেছিলেন। কিন্তু শেষমেষ দিদিমণি কি বললেন জানো?

—বলো মাধুরী, তুমি নিশ্চিন্তে বলো···বলো!

—দিদিমণি বললেন, দ্যাখো তুমি দশের মধ্যে কাজ করো, দশের মধ্যে কাজ করতে মেয়েদের এক মহা আপদ আছে। তোমার মতো সোমত্ত যুবতীর অনেক কথা শুনতে হবে। অনেকের তোমার দিকে তাকিয়ে চোখ টাটাবে। তুমি যতো শীঘ্র পারো বিয়ে করো। বলবে তো বাউলেদার কথা। আমি নিশ্চিত জানি, সে তোমাকে আশীর্বাদ করবে। আমি হলফ্ করে বলতে পারি, বাউলেদার ভালবাসা ম্লান হবার নয়। আজ প্রায় চার বছর তো তাঁর খোঁজ নেই। কিন্তু অমন লোক আর হয় না। কবে আসবে তার কোনও ঠিক নেই। যদি ইতিমধ্যে কোনও দুর্ঘটনা তোমার হয়ে যায়, তখন বাউলেদাই আমাকে দায়ী করবে। তুমি আর দ্বিধা করো না। বাউলেদার ভালবাসা ও আশীর্বাদ তুমি পাবেই।···পাবেই তুমি।

—ভালবাসা ও আশীর্বাদ!! বলেছে এই কথা?

—হ্যাঁ বাউলেদা, তুমি বলো তোমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ পাবো কিনা?

বাউলের একহাত তখনও মাধুরীকে ধরে আছে, এবার আরেক হাতের বেষ্টনে জড়িয়ে ধরে মাধুরীর মাথায় হাত দিয়ে বললো,— নিশ্চয় মাধুরী, তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ দুই-ই পাবে। তোমার মতো মেয়েকে ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানাতে না পারলে কাকে আর জানাবো!

আলিঙ্গন মুক্ত মাধুরী দ্বিতীয়বার গড় হয়ে পায়ের ধুলো মাথায় নিলো।

মাধুরী এবার ছুটে যায় বাড়ির ভেতর। সেই ফাঁকে মাধুরীর স্বামী ধীরু কয়ালের সঙ্গে বাউলে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। বাউলের তো গল্পের অন্ত নেই। জেল থেকে সবে এসেছে। কাজেই জেলখানার নানা গল্প পেড়েছে।

এমন সময়ে মাধুরী ছুটে এসে এক তাড়া চাবি, আরেকটা মাটির ভাঁড় এনে দিলো। বললো,—নাও বাউলেদা, এই নাও তোমার বাড়ির চাবি, আর এই ভাঁড়।

বেশ করে পলি মাটির প্রলেপে মুখটা আঁটা ভাঁড়—দেখে ঠাট্টা করে বাউলেদা বললো,—কিরে বাপুঁ! কোনও সাপ-টাপ তো রেখে দাওনি !!

তখন মাধুরীর চোখে জল এসে গেছে। বলে, —না বাউলেদা, অমন কথা বলো না! মা মৃত্যু-শয্যায় বলেন, এই ভাঁড়ে কিছু টাকা বেদে বাউলের জন্য জমিয়ে রেখেছিলাম, তুমিই হাতে করে বাউলেকে দিও! বলেই মাধুরী বিন্যস্ত চুলের আড়ালে মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সেই কান্না ঠেকাতে গিয়ে বাউলের হাত চোখের জলে আর সিঁথির সিঁদুরে মিশে লাল হয়ে ওঠে।

উনিশ

বছর না ঘুরতেই এ কে নতুন মাধুরী। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মহীয়সী নারী। শুধু নারী নয়, মা-ও বটে। এখন সে বাউলেদার সঙ্গে প্রায় শাসিয়ে কথা বলে। বলে, —তোমার বিয়ে করতেই হবে। কতোদিন এমন একা-একা থাকবে! এতোদিন যাহোক মা ছিলেন। এখন? তা হয় না, তোমার বিয়ে করতেই হবে। আমিই বা কতোদিন আর তোমার ঘর আর উঠোন নিকোবার কাজ করবো!

এমন বলার অধিকার ছিলো মাধুরীর। সেই অবধি, সেই জেলে যাবার কাল থেকে এ-বাড়ির দায়িত্ব যেন মাধুরীর ওপরে ছিলো। আর সেই সঙ্গে ছিলো বাউলেদার হাতে গড়া 'বিধবাপল্লীর' কাজকর্ম। তাই এই দাপটি মাধুরীর এমনি-এমনি আসেনি। এ ভালবাসার দাবী।

দাবীও কাজে পরিণত করতে মাধুরীর দেরি হয় না। সাতজেলের একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে-শাদি করিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি দেখতেও মিষ্টি, শুধু মিষ্টি না, ডানপিটেও—যেমন কিনা ভয়ঙ্কর বনের আওতায় ভাটি অঞ্চলে মেয়েরা গড়ে ওঠে। সে স্রোতের নদীতে ডিঙি চালাতেও জানে যেমন, তেমনি ধান কুটতেও ভালো জানে। তার চেয়ে বড় কথা মাধুরীর কাছ থেকে সে অনেক গানও শিখে ফেলেছে। মাধুরী জানে, এমন মেয়েকে বাউলেদা অবহেলা করতে পারবে না।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটে। যে-ঘটনা আবাব নতুন করে মাধুরী ও বাউলেকে এক নতুন সংগ্রাম ক্ষেত্রে একত্র করে দেয়। এবারের ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথের পদধূলিতে ধন্য গোসাবার সংস্কৃতি কেন্দ্র নয়, সামাজিক বিপ্লবী কর্মধারার ধারক ও বাহক রাঙাবেলেও নয়, মায়া ও মমতা ভরা দুটি বিধবাপল্লীও নয়—এবার পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ, সর্বাপেক্ষা তেজোময় এবং সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যময় সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মাধুরী ও বাউলেকে একত্র করে দেয়। কেমন করে বন্য ও হিংস্রতম ব্যাঘ্রের এই দুর্মতি হলো তা ভাবতেও অবাক লাগে। কেউই আজ অবধি এর কূলকিনারা করে উঠতে পারেনি।

সমকালে বনে বাঘ মারার আর কোনও উপায় ছিলো না। ১৫৬০ সালে টাইগার প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। শুধু বাঘ মারা নয়, বাঘ মারার কোনও ফিকিরের সন্ধান পেলেও ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হবে। ফলে বাঘ মারা হয়তো কমেছে কিন্তু বাঘের হাতে মানুষ মরার ঘটনা মোটেই কমেনি বরং বেড়েই চলেছে। বাঘে কত লোককে যে মেরে ফেলে তার সঠিক হিসাব পাওয়া এক দায়। কেননা, চাষীরা, মৌলিরা বা জেলেরা বাঘের হাতে মারা পড়লেও তার সংবাদ বন-কর বা টাইগার প্রজেক্ট অপিসে পৌঁছে না। বাঘের হাতে মরার

কথা জানালেই, তখনই উল্টে তাদেরই দায়ী হতে হয়—নিশ্চয় তারা বাঘ মারতে গিয়েছিলো। আর সে মামলা থেকে রেহাই পাওয়া জলের মতো টাকা খরচ করেও হয় না। কাজেই কেউই বাঘের হাতে মরার খবর দেয় না ; বলে, কুমীরের পেটে গেছে, না হয় সাপের কামড়ে মরেছে।

এই অবস্থায় বাঘেরা নিশ্চয় লাই পেয়ে গেছে। এ যাবৎ অন্য কিছুতে না হোক, বন্দুকের বড়ো ভয় করতো। বন্দুকের নল দেখলেই ওরা ক্ষেপে উঠতো—লাঠি-তলোয়ারকে ওরা থোড়াই কেয়ার করে। এখন ওরা দেখছে, বন্দুকে ওদের কেউই মারে না। বন্দুক শুধু ফাঁকা আওয়াজ করে। এখনও সম্পূর্ণ না হলেও টাইগার প্রজেক্টর ফলে দিনে দিনে এই বিশ্বাস ওদের মনে আরও প্রগাঢ় হবে।

সুন্দরবনের রক্ষিত বনে এই আইন চালু হওয়াতে বাঘেরা উল্টে বনাঞ্চল ছেড়ে মানুষালয়ে ভ্রমণ করতে শুরু করেছে। আগেও করতো, তবে এখন যেন বেশি বেশি। কিন্তু সুন্দরবনের মানুষেরাও সমান ভয়ালো ; বন্দুক দিয়ে না হোক, লাঠি-সোটা-বল্লম নিয়ে সমবেতভাবে সুযোগ পেলেই বাঘ মেরে কুপিয়ে মাটির তলে পুঁতে ফেলে। আইনের ভয়ে দামী চামড়াটাও সহসা বিক্রী করার মতলবে কলকাতায় আসতে সাহস পায় না। তবে চোরাগোপ্তা ব্যবসায়ও যে নেই তা কি করে বলা যায়। তা না হলে কলকাতার চামড়ার দোকানে অতো বাঘের চামড়া কি করে পাওয়া যায়!

ঘটনাটি ঘটে ১৫৬০ সালে মাধুরীর নিজস্ব গ্রামে, দয়াপুরে। ওদেরই নিকটতম পড়শী রাইচরণ মিস্ত্রীর বাড়িতে। বাঘটি সন্ধ্যের গোনে এই পাড়ায় এসে উঠেছে। উঠেই দু-তিনটা বাড়িতে গরু ও ছাগল খেয়েছে। এই সব বাড়িতে গোয়ালগুলি ছিলো শোবার ঘরের বেশ সামনে, আঙিনায় ঢুকবার মুখেই। গন্ধ পেতেই গরু-ছাগলরা তো তারস্বরে ডাকতে থাকে। পাড়ায় সাড়া পড়ে যায়—বাঘ এসেছে। পাড়ার চাষীরা সবাই যে যার ঘরে। সাড়া পড়তেই যে যার খিল এঁটে দিয়ে চিৎকার করতে আর টিন পেটাতে থাকে। অন্ধকারে কি আর করবে, কারও কাছে তো বন্দুক নেই। মহা সোরগোল—চিৎকার আর টিন পেটানো এবার আশপাশের গ্রাম-গুলিতেও ক হয়েছে। বাঘটির বয়স সাত-আট বছর, সবে যৌবন প্রাপ্ত।

চাষী আর জেলেদের বাড়িগুলি সবই ভেড়ির কোল ঘেঁষে বরাবর লম্বা লাইন হয়ে আছে। একদিকে ভেড়ি, অপরদিকে ধানক্ষেতের মাঠ, তাও আবার গলা-জলে থৈ-থৈ করছে।

ভয়ঙ্কর চিৎকার আর টিনের শব্দে—বাঘ হক্‌চকিয়ে যায় নিশ্চয়। একবার মাঠের জলে বেশ শব্দ করেই নেমেছিলো। গ্রামের লোকেরা ভেবে নেয়. হয়তো দুশমন মাঠ পেরিয়ে ওপার চলে গেল। তবুও ওদের কেউই দরজা খুলে বাইরে বেরুবার সাহস করেনি, উচিতও মনে করেনি। যা করার, তা করা যাবে কাল সকালেই। কোনও বাড়ি থেকে বাঘের চলাফেরার শব্দ আর পায়নি। বাঘ বড়ো নিঃশব্দ পদচারি। বিশেষ করে শিকার-মত্ত বাঘেরা।

রাইচরণ মিস্ত্রীর বাড়িটা মাটির দেয়ালে ঘেরা, আর উপরে খড়ের দোচালা। পাশাপাশি দুটি কামরা। দুটি কামরার চারদিকেই মোটা মাটির দেয়াল। তার মধ্যে একটি কামরা ঘিরে দুদিকে বারান্দা। অন্য কামরাটিতে বাড়ির সবাই মিলে ঢুকে দরজাটা আগল দিয়ে দেয় নানা কায়দা ও কসরৎ করে। বাকি ঘরটির দরজা বারান্দা ঘুরে পুব দিকটায়। তাড়াতাড়ি আশ্রয় নিতে গিয়ে সে দরজাটা হাঁ করে খোলাই পড়েছিলো।

এদিকে বাঘ নিশ্চয় ধানক্ষেতের গলাজল ঠেলে দীর্ঘপথ এগুতে চায়নি। ফিরে এসেছে চুপিসারে সাঁতরে সাঁতরে। এসে উঠেছে মিস্ত্রীর ঘরের পেছনে। গায়ের জল ঝাঁকা মেরে ঝেড়েছিলো বলে জানা যায় না, তবে যেমন করলেও নিঃশব্দেই করেছে। সামনে খোলা দরজা পেয়ে নিরাপদ আশ্রয় নেবার লোভেই বোধহয় সুড়সুড় করে ঐ ঘরটাতে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই কথা নেই বার্তা নেই হয়তো সটান শুয়ে পড়ে। সারা রাত কাটায়। কি মতলব ছিলো ওর মনে, তা বোঝাই দায়।

ভোর হয়েছে। সূর্যরশ্মির ছটা না এলেও গোটা এলাকা আকাশের আলোকে আলোকিত। ভোরের এই আলোকে ভয় কিসের! বনের বাঘ কি কুকুরের মতো কোণা ঘুপচিতে শুয়ে শুয়ে সারা রাত কাটাবে। বাড়ির একটি ছোট মেয়ে রোজকার মতো উঠোনে গোবর-জলের ছিটে দিচ্ছে। এমন সময়ে খোলা দরজার ফাঁকে দ্যাখে বাঘের ডোরা। ভাগ্যি আঁতকে ওঠেনি। পাশের বাড়ি মাধুরী সবে উঠে উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছিলো। তার দিকে উবু হয়ে নিঃশব্দে ছুটে গিয়ে আর কথা বলতে পারে না, শুধু দু-হাত দিয়ে হাড়ির মতো মুখ দেখায় আর বারবার আঙুল দেখিয়ে বোঝাতে চায়—ঐ ঘরে···ঐ ঘরে!

মাধুরীর বড়ো লোভ, বাঘের বাউলেকে তো সে ভালোভাবেই দেখেছে, বাঘকে সে একবার চোখের দেখা দেখে নেবে। সবাই জেগে উঠলে বাঘ নিশ্চয় সরে পড়বে, তখন হয়তো আর দেখতে পাবে না। দেখতে চায়, একবারটি সে দেখতে চায়। এই অবস্থায় বাউলেকে একবার স্মরণ করারও ফুরসুত নেই ওর। কোমরে আঁচল ভালো করে জড়িয়ে বুড়ো আঙুলে ভর করে টিপে টিপে বারান্দায় উঠে দরজার আড়ালে পাশ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তারপরেই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক দরজার মাথায় মোটা শিকলটা একবার নজরে পড়ে। কান খাড়া করে আছে, যাতে ঘরের ভেতর থেকে ছুঁচ পড়ার শব্দও ধরতে পারে। কিন্তু মাধুরী কতোটাই বা সতর্কিত হতে পারে! বনের এই হিংস্রজীব যে শিকারের গন্ধ, শব্দ ও ছায়া কতটা তীক্ষ্ণভাবে ধরার ক্ষমতা রাখে, সে খবর তো মাধুরী জানে না। মাধুরীর এখন যে মত্ততা এসেছে তাতে ও-সব জানবার আবশ্যকই বা কি! চকিতে দু-হাত উঁচু করে একহাতে শিকলি আর আরেক হাতে দরজার অন্য কপাটটি ধরে নিজের দেহকে যেন ধাক্কা মেরে ঝমাৎ করে খোলা দরজার সামনে এনে দাঁড় করালো···এক ঝলকে যা দেখলো তা জীবনে ভুলবার নয়—বলিষ্ঠ লোমশ দুই বাহু সামনে বাড়িয়ে ঘাড় যেন এইমাত্র উঁচু করে দরজার দিকে চোখ মেলে ধরেছে অপূর্ব চেহারায়, ভয়ালো কিন্তু হাল্‌কা আগুনের মতো সৌন্দর্যময়। ক্যামেরার ক্লীকের মতো পলকের মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে ধরা পড়ে শুধু ওর চোখের আরশিতে নয়, ওর ধুক্‌ধুক্ করা বুকের মাঝেও।

তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার অমোঘ তাগিদেই সশব্দে কপাট ভেজিয়ে কম্পিত হাতে শিকলি টেনে দেয়। দিয়েই অন্য কোনদিক না তাকিয়ে উবু হয়ে বারান্দা থেকে পড়ি-মরি করে ঝাঁপিয়ে উঠোনে পড়েই চিৎকার কর ওঠে। কই! চিৎকার তো হয় না!! কোমল হাতে বারবার জোরে গলায় হাত বুলিয়ে আর ঢোক গিলে স্বর বের করে বললো—আঘ্‌, আঘ্‌,···বাঘ! বাঘ!

উঠোনে মাধুরীর গলা শুনে যে যার সব বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কি ব্যাপার তা জানতে মাধুরীকে তখন কোথায় পাবে ওরা। মাধুরী নিজের বাড়িতে ছুটে সবুরকে টেনে তুলে বলতে বলতে হাঁপাচ্ছে,—যা, যা, শীগ্‌গির যা, জামা পরতে হবে না, যা ছুটে বাউলেদাকে ডেকে আন্। ঐ দ্যাখ ঐ ঘরে বাঘ আটক পড়েছে। আতঙ্কে আমিই শিকলি দিয়ে দিয়েচি। যা, নোড়া, নোড়া, জলদি নোড়া। বাউলেদাকে বলবি, আমিই ডেকেছি, বন্দুকটাও নিয়ে

আসে যেন।

জামাটা কাঁধে ফেলে আজও দোড় কালও দোড়—সবুর এসে বাউলেদাকে হাঁপাতে হাঁপাতে সব বলে। শুনতেই বাউলে যেন উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বলে,—চল্, ছোট্। রাস্তায় সব শুনবো।

বন্দুকটা সেদিন বাড়িতেই ছিলো। অনেক পুরনো, তবুও হাজার জল-ঝড়ে চামড়ার সিলিঙ্গটা এখনও আছে। ঘরের খুঁটিতে সেই কাঁধ-ঝোলানিতে বন্দুকটা টাঙানো ছিলো। সকালের নদীর হাওয়াতে বন্দুকটা আজও ঈষৎ দুলছিলো। বাউলে তা দেখে একবার শুধু বললো, —তুই বড়দলের মতো আজও দুলছিস, চল আজ তোরও পরীক্ষা, আমারও পরীক্ষা। বাউলে চারটা এল জি বুলেট নিতে ভোলেনি। বাঘের সঙ্গে লড়া-পেটা করতে এল জি-ই বাউলের পছন্দ।

গোসাবার খেলার মাঠে পড়তেই বাউলে বললো,—মরদ। দাঁড়া, আগে টাইগার প্রজেক্টে খবরটা দিয়ে আসি। তুই এখানে আড়ালে এসে বন্দুকটা ধর। —বলেই বাউলে একদমে সোজা তেতালায় দৌড়ে উঠেছে। হাঁপের ফাঁকে ফাঁকে বলতে চেষ্টা করে যেটুকু শুনেছে। প্রজেক্টবাবু বললেন,—তোমার বলতে হবে না, আগেই খবর পেয়েছি। তোমার আগেই হয়তো সজনেখালি অপিস থেকে বন্দুক ও বাঘের খাঁচা নিয়ে পৌঁছে যাবে। রেডিওফোনে আমাদের যোগাযোগ হয়ে গেছে। ডিরেক্টরও স্পীড্‌বোটে তোমার আগেই হাজির হবেন। তুমি যাও, ভ্যানে করেই যেও কিন্তু।

এই সাত-ভোরে ভ্যান কোথায় পাবে। পুকুরের ধারে একখানা ভ্যান মানে তে-চাকার সাইকেল পড়ে আছে। কিন্তু চালক নেই। নাই বা থাকলো, বাউলে নিজেই চালক হয়ে ভ্যান চালালো রেসের ঘোড়ার মতো। রাস্তায় বড়ো খানা-খন্দ। পেরে ওঠে না। চালাতে চালাতে বলে, —মরদ! নাম, নেমে পেছন থেকে ঠেলতে থাক। আমিও চালাই, তুই-ও ঠেল।

দয়াপুরে বেদে হাজির। তখনও টাইগার প্রজেক্টের লোকজন আসেনি।

—বাউলেদা! বাউলেদা! তুমি এসে গেছো! এসে দ্যাখো, কি কাণ্ড করে বসেছি। ঘরের দরজাটা খোলাই ছিলো। মেয়েটা খবর দিতেই দরজার সামনে গেঁছি। বাঘটা দেখে তো হতভম্ব। তোমরা যা বলো তা তো নয়। চুপচাপই ছিলো। আমি দেখেই শিকলি মেরে দিয়েছি। এখন তুমি এসে গেছো, যা করার করো। তবে আমার ইচ্ছা, বাঘটাকে মেরো না। না, মারবে না।

বাউলের কোনও কথা বা বাগাড়ম্বরের সময় এটা নয়। শুধু বললো, —নাও এই বন্দুকটা। ধরে রাখো। পাশে সরে যাও। ভয় নেই তোমার, ওতে গুলি ভরা নেই—বলেই একবার বন্দুকটা ভেঙে দেখে নিলো, গুলি ভরা আছে কি নেই।

মুহূর্তে সবাইকে ডেকে বললো,—বাঁশ আনো, খুঁটি আনো সবাই। একদল ঝাড় কেটে বাঁশ আনো। দ্যাখো কোথায় শক্ত দড়ি আছে।

একবার ঘরের পেছনটা দেখে এসে বললো,—যা বাঁশ আছে তা দিয়েই বারান্দাটা আগে ঘিরে শক্ত বেড়া বেঁধে ফেলো। কই কাজে লাগো। দেরি না। এমন বেড়া যাতে বাঁশ থেকে বাঁশ তিন আঙুলের বেশি ফাঁক না থাকে। যাট-সত্তোর মরদে কাজে মেতে উঠেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে শক্ত বেড়া বাঁধা হয়ে যায়। আশ্চর্য এতো হট্টগোলেও বাঘ কিন্তু চুপচাপ। একবার শুধু দরজায় ধাক্কা দেয়। তারপর আর কোনও সাড়াশব্দ নেই, হাঁকডাকও দেয়নি।

এমন সময়ে প্রজেক্টের লঞ্চ, খাঁচা, কাছি, দড়ি যাবতীয় লটবহর নিয়ে হাজির। সঙ্গে

মাঝি-মাল্লা, পাইক-বরকন্দাজ—প্রায় জনা বিশ। গ্রামের সব লোকই প্রায় তখন বাঘের খাঁচাখানা দেখতেই ব্যস্ত। বিশমন ভারি শাল কাঠ আর মোটা লোহার গরাদের খাঁচা। আর মাটিতে নামানো নয়। বাঁশে ঝুলিয়েই ঘুমন্ত বাঘকে লঞ্চে তুলতে হবে—তাই যে যার মতো অপরকে বোঝাতে লাগে।

প্রজেক্টের বাবু নেমেই বললেন, —বাউলে, তুমি এসে গেছো, আমাদের তাহলে আর ভাবনা নেই। তোমার পরেই সব ভার রইলো। এই নাও ঘুমপাড়ানি ছোটো বন্দুক ও তার গুলি, আর এই নাও ওষুধের গুলি মারবার পিস্তল।

বাউলের সব কিছু জানা আছে। বললো, —আপনাদের কারও কিছু করতে হবে না। যা করছি শুধু দেখে নেন। তবে লোকজন সব একপাশে সরিয়ে দেন, আর একটা গুলিভরা রাইফেল নিয়ে এইখানটায় বড়বাবু থাকুন। যদি তেমন বোঝেন বাঘটাকে চোট্ করে ঘায়েল করবেন ; আশা করি তেমন কিছু করতে হবে না। হ্যাঁ, তবে দড়িকাছি নিয়ে জনা দশেক তৈরি থাকে যেন। ঝমাৎ করে তারা যেন চারখানা পা বেঁধে ফেলে। লম্বা দুখানা কাঁচা বাঁশ অবশ্যই যেন থাকে। বেশ লম্বা বাঁশ। সবার আগে কিন্তু চট্ দিয়ে চোখমুখ বেঁধে ফেলতে হবে।

কথাগুলি সব দুবার করে করে বলে যাতে কোনও ভাবে অপরিষ্কার না থাকে। একবার ছুটে এসে মাধুরীকে বলে যায়, —দেখো যেন আমার বন্দুকটা আর কারও হাতে দিও না। বাঘটাকে আমি 'মনি ঘুমলো' করে দেবই। —কথাটা শুনে এতো শঙ্কা ও বিপদের মধ্যেও মাধুরী হেসে ফেললো।

বলেই ঘুমপাড়ানি বন্দুক হাতে নিয়ে আর ওষুধের পিস্তলটি গামছা-বাঁধা কোমরে গুঁজে কুটোর পালায় উঠলো। কুটোর পালাটা একেবারে বাঘের ঘরটা ঘেঁষে। পালার উপর থেকে এক লাফে ঘরটির চালে গিয়ে পড়লো বাউলে। তারপর মটকার চালের খড় টেনে অনেকখানি ফাঁক করে নেয়। সবাই ভাবছে অতো উপরে বাঘে নিশ্চয় বাউলেকে থাবার মাথায় পাবে না।

এবার ঘরের ভিতর টর্চ ফেলে গুলি মারার নিরীখ করছে বাউলে। সময় লাগে। কেননা ঘুমপাড়ানি গুলি পায়ে কিম্বা হাতে লাগলে কাজই হবে না, আবার মাথার ধারে কাছে লাগলে অক্কাও পেয়ে যেতে পারে। গুলি মারতে হবে ঠিক গলায়। আবার শরীরের অন্যত্র কোথাও লাগলে কোনও ফল হবে না। অবশ্যই গুলি করার তিন মিনিটের মধ্যে পিস্তল দিয়ে ওষুধের গুলিটা মারা চাই। ওষুধের গুলি ঠিকমত গায়ে না ফুঁড়লে বাঘটা কিছুক্ষণের মধ্যে মারা পড়তে পারে। কাজেই পিস্তলটা বাউলে ঠিকমতো দেখেশুনে এবার কোলের মধ্যে হাঁটুতে চেপে ধরে আছে।

পরপর বন্দুকে ও পিস্তলে চোট হবার পর বাউলে চুপচাপ মটকার মাথায় বসে পড়ে আর হাত উঁচু করে সবাইকে ইশারা করে, —কেউ নড়ো না, যার যার জায়গায় থাকো। —মিনিট তিনেক পরে মটকার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ভাল করে দেখে এবার নিশ্চিন্ত। ঘাড় কাৎ করে হাতের উপর চিবুক রেখে দূর থেকে সবাইকে জানিয়ে দেয়, বাঘ এতক্ষণে ঘুমিয়ে গেছে। বড়বাবুকে চিৎকার করে বলে, —দড়ি কাছি ও লোকজন নিয়ে এখন দরজা খুলতে পারেন। তবু খোলার মুখে যেন রাইফেল নিয়ে তৈরি থাকেন।

দায়িত্ব সমাধার উদগ্র আনন্দে ঘরের চালার ওপর পা ছড়িয়ে বসে দুহাতে বন্দুক ও পিস্তল উর্ধ্বে তুলে ধরে সড়্ সড়্ করে ধপ্ করে উঠোনে নেমে পড়ে। পড়েই উত্তেজনার শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চাপা স্বরে নিজেকে শুনিয়ে উচ্চারণ করে— শাবাশ।

মাথা তুলে দ্যাখে, সামনে মাধুরী দাঁড়িয়ে। তার হাতে ধরা আছে বাউলের বন্দুকটি। এতো উত্তেজনায়ও বাউলে রসিকতা করতে ভুলে যায় না। বলে, —'মনি ঘুমলো' এবার 'পাড়া জুড়ালো'।

মাধুরী হাসতে হাসতে বলে, —য্যাও! আমাকে ঠাট্টা করছো!! দিদিমণি কাছে থাকলে তোমাকে শুনিয়ে দিতো!

—ও সব কথা নয়, আমাকে আগে একটা বিড়ি খাওয়াও তো, লক্ষ্মী!

বিশ

এখানেই ইতিকথা টানা যেতো। কেননা পরের ঘটনা সবই প্রায় বাঘটির জীবন-কথা। কিন্তু তা প্রায় মাত্র। এই ঘটনার রেশ আমাদের গোসাবা ও সাতজেলিয়ার মানুষদের পরেও প্রতিফলিত হয়ে পড়ে নানা রঙে। সেই রেশের আভা বাউলে ও মাধুরীর ওপর পড়ে বৈকি!

বাঘটিকে যখন লঞ্চে আনে, তখন দয়াপুর অঞ্চলের গোটা মানুষ যেন লঞ্চের গায়ে। মানুষ এসে পড়েছে গোসাবা, রাঙাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া থেকে, এসেছে মরিচঝাঁপি, কোরানখালি, কুমিরমারি, মোল্লাখালি, মেলমেলে, বাণীপুর, কচুখালি, ঝিঙেখালি মায় সজনেখালি ও সুধন্যখালি থেকেও। মানুষে মানুষে ছয়লাপ—ছেলে, মেয়ে, মরদ ও বহু গিন্নিরাও। এতো মানুষ এসে এতো আলোচনা করেও নির্ণয় করতে পারে না—কেনই বা অমন জলজ্যান্ত ও যৌবন উন্মেষে উজ্জ্বল বাঘ-পুঙ্গব মানুষের আশ্রয়ে এলো আর সারা রাত কাটালো মানুষের ঘরেই, মানুষের পাশেই। না পারুক, মানুষেরা কিন্তু বাঘটিকে পরম ভালবেসে ফেলেছিলো। তাকে নিয়ে চলে যাবে কলকাতায়, আর চিরতরে আশ্রয় দেবে চিড়িয়াখানায়, তাতেও এরা কম বেদনা বিধুর হয়নি।

লঞ্চ যখন ছাড়ে, বাউলে তখন চরের পলিমাটি ধরে হরিণের মতো আলগোছে ছুটে এসে মাধুরীকে সতর্ক করে দিয়ে গেলো, সে যেন তার ঐ বে-পাশি বন্দুকটা সযত্নে ও সতর্কে রাখে। সে-ও বাঘের সঙ্গে সঙ্গে চিড়িয়াখানা যাবে। ফিরে আসতে তার দেরিও হতে পারে।

সুযোগ পেয়ে মাধুরী বললো, —বাউলেদা! আগামী মঙ্গলবার সাতজেলের হাট; তুমি বুধবার সকালে অতি অবশ্য আসবে আর আমার এখানে খাবে। নেমন্তন্ন রইলো, বুঝলে।

লঞ্চ ছেড়ে যায় দেখে বাউলে আবারও হরিণের বেগে চরের পলিমাটির প্রলেপ এবার ছিন্নভিন্ন করে চলে গেলো। যাবার সময় মাঝপথে চিৎকার করে বললো, —নিশ্চয় আসবো, নিশ্চয়।

এমন আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার লোক নয় বেদে বাউলে।

ক্যানিং-এ লঞ্চ যখন এলো, তখন পুরো ভাটি। জল থেকে ঢালু চর প্রায় একশো হাত, পাকা ভেড়ির ধারে তো খাড়াই বিশ হাত। কেমন করে ত্রিশ-চল্লিশ মন বাঘ সমেত খাঁচাকে পিচ্ছিল ও খাড়াই পথে উঁচু করে তুলবে? কোনো পথ নেই, অপেক্ষা করতে হলো ছয় ঘণ্টা, পুরো জোয়ার আসার আশায়। দুপুর রাতে লরিতে তুলে সবাই মিলে রাত-ভোর এসে পৌঁছলো চিড়িয়াখানায়। এতক্ষণে বাউলে ও পাইক-বরকন্দাজরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ঘুমপাড়ানি বুলেটের মেয়াদ সাত-আট ঘণ্টা। মাঝপথে লরিতে বাঘের ঘুম ভাঙে। ছোট্ট খাঁচা, উঠে উবু হয়েও বসতে পারে না দয়ারাম। দয়াপুরের লোকেরা বাঘটির নাম

দিয়েছিলো —দয়ারাম। চিড়িয়াখানা কর্তাদের মোটেই পছন্দ হয় না নামটা। তাঁরা এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেন। সবাই মিলে সানন্দে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করেন এক উৎসবে বাঘটির নাম-করণ করে দিয়ে যেতে।

বাঘটিকে যে-ই দ্যাখে, সে-ই ভালোবেসে বসে। ইতিহাসটা শুনলে তো আরও চমকিত হয়, গদোগদো হয়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী নাম দিলেন—সুন্দরলাল। উৎসবে সবাই এসে হাজির, জীবপ্রেমিকরা তো বটেই। বাউলেও এসেছে। দেখেশুনে সে দূরে, বেশ দূরে আরেকটি খাঁচা ঘরের অলিন্দে বসে। সুন্দরলালের দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষে। দুদিনে খাঁচার মধ্যেও সে যেন আরও সুন্দর ও সবল হয়ে উঠেছে। সুন্দরলালও বারবার দূরের দিকে তাকায়। ভিড়ের লোকেরা তো জানে না, বনে বাঘের চরিত্র। বাঘ কখনও নিকট সামনে তাকাতে অভ্যস্ত নয়। বনে ধারে কাছে সে কাকে দেখবে ? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে তার কাছে এগুতে সাহসী হবে। বনের বাঘের চরিত্রগত অভ্যাস দূরের দিকে তাকানো। বেশ দূরের দিকে গলা বাড়িয়ে তাকানো। বাউলেও চোখাচোখি হবার জন্যই অতো দূরে গিয়ে বসেছিলো। কলকাতার লোকে ভীড় করেছে গিয়ে সুন্দরলালের খাঁচা-ঘরের রেলিঙের ধারে। আর বনকর বাবুরা, প্রজেক্ট-কর্তারা। তারা তো তাদের মতলবে মুখ্যমন্ত্রীর আশপাশে সেজেগুজে ঘুরতেই ব্যস্ত— যেন তারাই বাঘটাকে ধরেছে, কলকাতাবাসীদের কাছে যেন এই উপহারটা আনার সর্ব গৌরবটা তাদেরই প্রাপ্য।

একা-একা দূরে বসে বাউলের নানা কথা মনে পড়ছে। মনে মনে কথাও বলছে সুন্দরলালের সঙ্গে : কেন তোদের মতো সুন্দর জীবকে গুলির আঘাতে আমরা মারি ! না, আমরা তো তোদের মারবো বলে একটা দিনের তরেও বনে বন্দুক হাতে উঠি না। তোরাই আমাদের ভুল বুঝিস। আমরা বনে যাই মাছ, মধু, কাঁঠ, পাতা কাটতে। তোরাই তো আমাদের ক্ষিপ্ত করে তুলিস্। দেখলি তো, তুই এসেছিলি আমাদের এক গ্রামে ; মেরেছি আমরা তোকে ? অমন সুন্দর বলদৃপ্ত চেহারার জীবকে কি মারতে কারও মন চায় ! মাধুরীরও আকুল আবেদন ছিলো তোকে যেন আমি মারি না। না, মারিনি। মারতে চাই না। তোরা সুন্দরবন থেকে উজাড় হয়ে গেলে এই বনকে কেউই আর সুন্দরবন বলবে না। বলবে কাঠ-খোট্টা কাঠের বন।

উৎসব শেষ হতেই বাউলে একা-একা বাড়ি ফিরে আসে। করবেই বা কী ? কেউই ওর খোঁজ করলো না। খোঁজ করবেই বা কে ? সবাই তো যে-যার তালে ঘুরে বেড়াচ্ছে ॥

একুশ

বাড়ি ফিরে বেদে বাউলে বাজারের মুখটায় ফলের দোকানের চৌকিতে বসে জিজ্ঞাসা করে,—কিরে বিশু। সাতজেলের হাট মঙ্গলবার, তাই না ?

বাউলে সবই জানে, তবু কেন জানি, বিশুকে জিজ্ঞাসা করলো। বিশু তার নতুন এক ভক্ত। বিধবাপল্লীর ধলা-মাসির ছেলে। নামটা ধলা হলে কি হবে, রঙটা পানের খয়েরের মতো কালো। বিধবা কিন্তু ফিরে বিয়ে-শাদি করেনি। ছেলেটিকে নিজেই মানুষ করেছে। ঘরে বসে কাঠি দিয়ে মাদুর বোনে। কাঠি-গাছের চাষ শিখে নেয় রাঙাবেলের সমবায় সমিতি থেকে। মোটামুটি তা থেকে সংসার চালায়। সম্প্রতি বাউলে এই ফলের দোকান দিয়েছে বিশুকে সঙ্গী বানিয়ে।

বিশু বলে, —মঙ্গলবারই তো হাট, তা নয় তো কবে ? কেন ? ফল নিয়ে যাবো নাকি

হাটে বিক্রী করতে ?

—না, তা বলছি না। এমনিই শুধোচ্ছি।

এমনি-এমনি তো বটেই। কিন্তু বাউলের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে মাধুরীর নেমন্তন্নের সঠিক দিনটা নিয়ে। বোধহয় দৃঢ়ভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে চায়।

পরদিন বাউলে সকালেই সাতজেলের পথ ধরেছে। ঐ পথেই যাবে দয়াপুর। ধীরে ধীরে হেঁটেই যাবে গোটা পথটা। কাঁচাপাকা মেশানো পথ। দুধারে নানা ধরনের গাছপালা। একটা নোনা-আতা গাছ ফলবতী হয়ে নুইয়ে পড়েছে প্রায় বাউলের চোখের সামনে। হঠাৎ থেমে গিয়ে বাউলে ফিরে এলো গোসাবায় ওর নিজের ফলের দোকানে— না, আজ খালি হাতে যাওয়া ঠিক নয়। ভেবেই এক থলি ভর্তি করে নিয়ে চললো নানা জাতের, নানা সোয়াদের দেশী-বিদেশী পাকা-পাকা ফল ; তার মধ্যে কাশ্মীরি আপেলই ছিল বেশি। এবার বাউলের মনটা শান্ত ও রসালোও হলো এই ভেবে—না, আমিও আজ মাধুরীকে খাওয়াবো। লেন-দেনটা এক পক্ষে হয় না। ভালবাসাটাও না।

এদিকে মাধুরীও তৈরি। ঝাল-ঝোলে-অম্লে বাউলেদাকে পরিতৃপ্ত করে দেবে আজ। কাজের অন্ত নেই। সবুর আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করেছিলো। ডেকে বললো,—যা না লক্ষ্মী, ভালো দেখে কলা-পাতা কেটে আন ; বড় দেখে কাটবি। দয়া-কলা গাছের পাতা আনবি, বড়ো ও মোটা।

চাষীবাড়ির রান্নাঘর হলেও বেশ বড়ো-সড়ো। দুটি ঝাঁপই খুলে দিলে গোটা ঘরটা আলোকিত হয়ে যায়, বেশ খোলামেলা মনে হবে। ঘরের এক কোণে হেঁশেল। বাকিটা বসে খাবার প্রশস্ত চত্বর মতো। গোবর-জলের প্রলেপ শুকিয়ে এখন তা ঝক্‌ঝক্ করছে। এখানে বসিয়ে মাধুরী খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছে। বাউলেদাকে আর সেই সঙ্গে ভাই সবুরকেও। দুখানা করে কলাপাতা ধুয়ে-মুছে এগিয়ে দিয়েছে সবুর।

মাধুরী হঠাৎ ছুটে গিয়ে ওঘরের কাঠের বড়ো পেটরা থেকে একখানা আসন নিয়ে আসে। আসনখানা ওরই নিজহাতে বোনা। পুরনো শাড়ির রঙ-বেরঙের পাড় দিয়ে বোনা। বুনেছিলো রাঙাবেলের মাদুর লায় দিদিমণির সঙ্গে বসে বসে। পাড়ের রঙ মিলিয়ে মিলিয়ে ভারি সুন্দর আঁকজোক করা। কারো নামে উৎসর্গ করে রাখেনি, সুন্দর বলেই এতদিন সযত্নে রেখেছিলো। সেখানেই আজ বাউলেদাকে খেতে বসতে দেবে।

গতকাল মাধুরী সাতজেলের হাটে যায় নিজেই। পছন্দমতো শাক-সবজি ও মাছ তো এনেছিলোই, সেই সঙ্গে এনেছিলো অনেকগুলি পোড়া মাটির লাল ছোটো ছোটো বাটি ; তাতেই এতক্ষণে ব্যঞ্জনগুলি ভর্তি করে আনমনে সাজাচ্ছিলো। খিড়কিতে একটা শব্দ হতেই সবুরকে বলে, —কিরে! বাউলেদা তো এখনো আসে না, ভারি ভাবনা হচ্ছে। ভাবছি আবার কোনও 'সুন্দরলাল' ওকে মাতিয়ে নিলো কিনা!...

বলতে বলতেই বাউলেদার ডাক,—মাধুরী! কই তুমি!

ভাই-বোন দুজনে ছুটে এসে বললো, —বাব্বা! কি ভাবনায় ফেলেছিলে বাউলেদা!

বাউলে ঝমাৎ করে সায় দেয়,—তাহলে তো আমার দেরি করেই আসা উচিত ছিলো, আরও কিছুক্ষণ অন্তত আমাকে নিয়ে ভাবতে।

—য্যাও, তোমার দুষ্টুমি করতে হবে না। দেরি করো না, একটুও না। হাত-পা ধুয়ে এসো। তোমার তো আবার পূজোআহ্নিক আছে।

—এবার যদি আমি বলি, য্যাও! না, না, কপালে ত্রিপুন্ড্র-লাঞ্ছন দিই বলে তোমরা ভেবেছো আমিও পূজা-আহ্নিক করি। মোটেই না! ও-বালাই আমার নেই, কপালে

ফোঁটা-তিলক দিই মনে জোর পেতে, মনে আত্মবিশ্বাস আনতে মাত্র।

—শুধু তাই !!

—তাই যদি বলো, তবে বলি রঙ-বেরঙ দেখে বাঘ যাতে ভাবে, আমি ওদেরই জাত-ভাই !! ...কি বলবো তোমাকে মাধুরী, সুন্দরলালকে তুমি তো অমনভাবে দ্যাখোনি। চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায় দেখে আমার ভারি মায়া লাগছিলো। শেষকালে আমিই হোলাম কিনা ওকে বন্দী করার কাল।

—বাউলেদা ! সত্যই কি তুমি বাঘকে অতো ভালবাসো ?

—জানিনা !...বলেই যেন অনমনস্ক হয়ে যায়।

মাধুরী অনুমান করে, বাঘের কথা তুললে বাউলেদাকে ঠেকানো মুশকিল। তাই এবার শাসিয়ে বললো, যাও আগে হাত-পা ধুয়ে এসো। আমার রান্না সব জুড়িয়ে গেলো যে !

—কই দেখি, কি সব রেঁধেছো আমার জন্য ?

—না, না, তোমার দেখতে হবে না। বলছি, আগে যাও, হাত-পা ধুয়ে চট্ করে চলে এসো।

বাউলে আসনখানার উপর ভদ্রাসনে বসে দাড়ি-গোঁফে হাত বোলাচ্ছে। মাধুরী হেঁশেলে বসে পোড়া-মাটির বাটিতে রকম-বেরকম রান্নাগুলি ভাগে ভাগে সাজাচ্ছিলো। এবার কলাপাতায় ভাতের রাশিটা আলগোছে সরু সরু আঙুলের ইলিবিলি কেটে আলতো চাপে গোটো করে আনছে। বাউলে মুগ্ধনয়নে সেদিকেই তাকিয়ে আছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছিলো মাধুরীকে। একখানা লালপেড়ে শাড়ি পরা। মাথার ঘোমটা আলতোভাবে পিঠের ওপর নত হয়ে যেন নুইয়ে পড়েছে। সদ্য স্নাত খোলা কুন্তলরাশি ছড়িয়ে পড়েছে সারা পিঠটা জুড়ে, তাতেও বাঁধ মানেনি। উপচে পড়া রাশিগুলি মুখমণ্ডলীর দুপাশে লতার মতো এঁকে বেঁকে মাটি স্পর্শ করতে চায়। পাছে আজ কোনও অবাধ্য আবেগ তাকে পেয়ে বসে, তারজন্যই বুঝি সিঁথির সিঁদুর অমন করে টেনে দিয়েছে মাথার মধ্যমণি অবধি।

সবুর দুষ্টুমিভরা সুরে বললো,—বাউলেদা, তা হবে না। তড়িঘড়ি তোমাকে খেতে বসতে দেবো না। তার আগে তোমাকে গান শোনাতে হবে। ছাড়ছি না আজ তোমাকে।

বাউলে নেহাৎ বুঝি একটা অপত্তি করতে চায়, তাই কয়েক লহমার জন্য চুপ। ভদ্রাসনে বসা ছিলো, আস্তে আস্তে হাঁটু ভাজ করে গোড়ালির ওপর বজ্রাসনে বসে নেয়। মুখে চাপা দরাজ গলায় গুনগুন করে উঠেছে। গোটা গানটা গুনগুন করে নিজের কাছে তুলে ধরলো ; যাতে সুরের আবেগের ঢেউ আনতে কোন বেগ না পেতে হয়।

চাপা সুরটা কানে যেতেই মাধুরী আনমনা। রক্তাভ গালখানি নিজের হাঁটুর উপর এলিয়ে দিয়ে যেন তির্যকভাবে মোলায়েম চাহনিতে ভাতের রাশির ওপর নিজেরই আঙুলের কোমল ইলিবিলি দেখছে।

বাউলে দরাজ গলায় ভাটিয়ালি টান দেয় :

তুই যদি গাঙ হোস বন্ধু
আমি তাইতে ডুবে মরি,
বন্ধু ভাসায়ে গাগরী
ও বিদেশী বন্ধু !

মাধুরী যেন আর নিজেকে সামলাতে পারে না। সর্বাঙ্গে ঝাঁকি মেরে উঠে মিনতির সুরে বলে,—না, বাউলেদা, না,...তুমি ও-গানটি গেয়ো না।

সমস্ত লাজ-সরম ভুলে সবুরের সামনেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে বাউলেদার গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা মুখখানাকে দুহাতে চেপে ধরে বারবার কাতর অনুনয়ে জানায়, —না, বাউলেদা, না ! ও-গানটা শুনলে আমার বুকের ভেতর যেন তোলপাড় এনে দেয় ! ....তুমি ও-গানটা গাইবে না ! বাউলেদা আমাকে তুমি ও-গানটা শোনাবে না ! না ! না !

বনবিবি

'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' ও 'সুন্দরবন' গ্রন্থ দুটি রচনার পর আবারও যে সুন্দরবন নিয়ে লিখতে বসতে হবে, তা আগে ভাবিনি। সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে নিসর্গ ও জীবনের কাব্য নিরবচ্ছিন্ন ও অপরিমেয়। সুন্দরবন ও তার মানুষের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। সুন্দরবনের এই মহাকাব্যের প্রতি একবার আকৃষ্ট হলে দুর্মর অনুরাগ কাউকে স্থির থাকতে দেয় না ; আমাকেও দেয়নি। তাই বুঝি আবারও লিখতে বসতে হয়েছে।

—গ্রন্থকার

এক

ভেড়ির ওপর এক পা, আরেক পা ভেড়ির ঢালু কোলে রেখে কলিম একমনে ডাল কাটছিল। হেঁতাল গাছের ডাল। বেশ মোটা দেখে কাল বাদা থেকে এনেছে। তার হাতে মানাবার মতই লাঠি হবে। বাওয়ালির বাঘ তাড়াবার নড়ি। কালই আবার যে বাদায় উঠতে হবে। তারই প্রস্তুতি।

মঠবাড়ির ভেড়ি। দশ হাজার বিঘার আবাদকে ঘিরে আছে এই ভেড়ি। খুলনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে এই আবাদ। উত্তর, পূব ও দক্ষিণ ঘিরে আছে কয়রা নদী। পশ্চিমে শাঁখবেড়ে খাল। এই আবাদের পত্তন মাত্র সত্তর বছর আগে। শুধু আবাদের পত্তন নয়, সমাজেরও পত্তন বটে। দক্ষিণ বাঙলার ইতিহাসে আবাদ ও সমাজের পত্তন এই সময়ই শেষ হয়। ইছামতি ও কালিন্দির অববাহিকায় এই ধরনের বড় আকারে পত্তন বোধহয় নতুন করে শুরু হয়েছিল রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত বসন্ত রায়ের প্রচেষ্টায়। তারপর থেকেই সেই ধারা অল্পবিস্তর অনুকরণ হতে থাকে এই সেদিন পর্যন্ত। খুলনার এই সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে মঠবাড়িই তার শেষ নিদর্শন। মঠবাড়ির পর আর কোনও আবাদের পত্তন হয়নি। দক্ষিণে কয়রা নদীর ওপারেই সুন্দরবন।

নতুন সমাজের পত্তন বটে, কিন্তু এ সমাজ আগের মত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অষ্টবজ্রে বাঁধা হিন্দু সমাজও নয়, মোল্লা ও মৌলবির পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তৃত মুসলমান সমাজও নয়। বৃটিশ প্রভুদের পক্ষপুষ্ট লোভাতুর জমিদার ও পত্তনদারের আধিপত্যে, আর বাঙলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সংগ্রামী মানুষের জীবিকার তাগিদে এই দুর্গম অরণ্যাঞ্চলে নতুন বসতি ও সমাজ দেখা দেয়। তাই এই অঞ্চলে সামাজিক বাঁধনের শিথিলতা আছে, আর আছে ইংরেজ দুলাল জমিদারদের অত্যাচারী মনের ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের বাসনা মেটাবার পরিসর ক্ষেত্র। কিন্তু তার উপরও আছে, জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে এখানকার মানুষের পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তা বোধ। একে অপরের পাশে না দাঁড়ালে যেমন দুর্গম বনের হিংস্র পশুর মুখোমুখি বাস করা দায়, তেমনি লোনা জলের প্রবল প্লাবনের বিরুদ্ধে যোজনব্যাপী দীর্ঘ ভেড়ি গাঁথা ও রক্ষা করাও দায়। সাধারণ মানুষের জীবনের জন্য ও জীবিকার জন্য এই আত্মীয়তা বোধই এখানকার সমাজের ভিত।

আধুনিকতম ও বিশাল শিল্পনগর কলকাতার পাশেই, বলতে গেলে দেড়শো মাইলের মধ্যে, এমন এক সমাজের কথা ভাবাই আশ্চর্য। পথের হাজার খাল, নদী, বিল ও বাঁওড়ে বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলে দুরধিগম শ্বাপদ-সঙ্কুল সুন্দরবনের মত অরণ্যের ছায়া যেন বাঁচিয়ে রেখেছে এমনি এক সমাজকে। সুন্দরবনের ছায়া যেন বহুদূর বিস্তৃত। ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূর থেকেই অচেনা গাছ-গাছড়া, লোনাপানির প্রবল জোয়ার-ভাটা, নতুন নতুন জীব ও জন্তু, অজানা ফুল ও পলিমাটির মিষ্টি গন্ধ, সর্বোপরি দিগন্তব্যাপী হুহু করা নির্জনতা—যে কোনও

আগন্তুককে জানিয়ে দেবে, তুমি এক অদ্ভুত ও অপূর্ব বনের নিকটবর্তী হতে চলেছ। সুন্দরবনের এমনি ধরনের ছায়ায় আবিষ্ট, বনের অতি সন্নিকটে মঠবাড়ির আবাদ।

দশ হাত উঁচু ভেড়ি টানা চলে গেছে চারপাশে নদী ও খালের তীর ধরে। সারা আবাদে কিন্তু কোনও বড় গাছের বিশেষ বালাই নেই। তবে পুব ভেড়ির দুপাশ দিয়ে হেঁদো গাছের ঝাড়। ঝাড়গুলি কোথাও মানুষের সমান উঁচু, কোথাও বা তাও নয়। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই সবুজ ঝাড় ও ভেড়ি ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

বেলা দশটা বাজে, তবুও মানুষের কোনও সোরগোল নেই। নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ। বনের স্তব্ধতা প্রান্ত অঞ্চলের মানুষের আত্মাসগুলিকেও যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এক আধটু শব্দ তরঙ্গ হয় না যে এমন নয়। কেউ হয়ত দূরের মানুষকে ডাকছে, কখনও বা ছোটছেলের বুক ফাটা চিৎকার, কখনও বা বনের পাখির বা হরিণের এক আধটা ডাক। জীবনের এই সাড়া কিন্তু কানে বেঁধে না। দূর থেকে ঢেউয়ের মত ভেসে ভেসে আসে, ভেসে ভেসে মিলিয়ে যায়।

কলিম হেঁতাল ডালের কাঁটা ও পাতা ছাঁটাই করে, আর কি যেন বিড়বিড় করে বলে। বলা যায় না, কলিম বাওয়ালি, সবাই বাউলে বলেই ডাকে। হয়ত বা মন্ত্র আওড়াচ্ছে। বাঘ তাড়াতে মন্তর-পড়া নড়িই বোধ হয় ওর সম্বল।

দূরে ভেড়ির ওপর দিয়ে হন্‌হন্ করে আসছে লায়লা বিবি। হেমন্তের সকাল। বেলা দশটার মধ্যেই বেশ কড়া রোদ। নোনাদেশে অল্পেতেই মাটি তেতে ওঠে। তাহলেও কনকনে উত্তরে বাতাস থাকাতে সকালের শীতের আমেজ তখনও কাটেনি। লায়লা বেশ করে গায়ে কাপড় জড়িয়ে হেঁটে আসছে। পরনে সাদা থান—এদেশে তবন নামেই পরিচিত। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে প্রায় দশ বছর। তার আগে থেকেই পাছাপেড়ে শাড়ি চালু হয় বাঙলাদেশে। অন্যত্র অচল হয়ে এলেও বাঙলার এ ভাটিদেশে পাছাপেড়ে শাড়ি তখনও পুরো চালু। বিশেষ করে, লায়লা বিবির বয়সের মেয়েদের তো কথাই নেই। কিন্তু কি জানি কেন, লায়লার এ শাড়ি পছন্দ নয়। সাদা তবনই তার মনের মত।

ভাটিদেশে চাষী মুসলমান মেয়েদের হাজার আবরুনশীন হলেও মাঠে ঘাটে এক আধটু বেরুতেই হয়। তা বেরুলেও কেউই লায়লার মত অমন করে দিনে দুপুরে রাস্তাঘাটে বেরোয় না। সর্বত্রই লায়লার যেন অবাধ গতি। প্রথম প্রথম লায়লার এমন চলাফেরা ছিল প্রায় সকলেরই নেকনজরে। আজকাল যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে। বলতে গেলে, এমন অবস্থা করে দিয়েছে মঠবাড়ির ছেলেমেয়ের দল। কেউ 'বুবু', কেউ 'ফুফু', কেউ 'খালি', কেউ 'ভাবি', কেউ বা 'নানি' সম্পর্ক পাতিয়ে লায়লার গতি অবাধ করে দিয়েছে সর্বমহলে। লায়লার এই বিদ্রোহের পেছনে এক ইতিহাস আছে। ইতিহাস আছে বলেই তার এই আচরণ মানানসই হয়ে গেছে। তাই বলে, কেউ যে তার উদ্বেলিত যৌবনে আকর্ষিত হয় না, তার চঞ্চলতার প্রতি কটাক্ষ হানে না, বা কেউ ঈর্ষান্বিত শ্যেন দৃষ্টি দেয় না, এমন নয়। তা দিলেও, লায়লা সামনে এলে আবাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে সহজ ভাবেই কথা বলতে হয় তার সঙ্গে।

লায়লা হন্ হন্ করে কাছে এলো বলে। কলিমের পাশ দিয়েই তার যেতে হবে। কলিম কিন্তু এ পর্যন্ত কিছুই লক্ষ্য করেনি। একমনে হেঁতাল নড়িকে মাপঝোঁক করে কাটবার চেষ্টা করছে। আচমকা লায়লাকে দেখতে পেয়েই বলে ওঠে,—আরে! এই ভোর গোনে অতো টুকটুক করে কোথায়?

কলিম রসিক। সুযোগ পেলে ফুক্কুড়ি কাটতে ছাড়ে না। বাগে পেয়েছে। সহজে ছাড়বে

না কলিম। ঠোঁটে ঈষৎ হাসি এনে ভ্রূ কুঁচকে একত্র করে চোখ পিট্‌পিট্ করছে। বাউলের এ চেহারা লায়লার অজানা নয়। লায়লাও কম কি! সে ফুরসত দেবে কেন! বলে,—তোমাদের আছে তো ঐ নড়ি, আর নয় বন্দুক!......তা আবার নতুন নড়ি কেন?

—কেন? তোমার পিঠেই পড়বে বলে তো এই নড়ি!

—ও-ব্বাবা! বাঘ ফেলে এবার মেয়েমানুষ! বাঘ ফেলে বড় জোর না হয় বাঘিনী হোক্! তা না, এবার মেয়েমানুষের পেছেন!

—তা, রায়বাঘিনীও তো সব আছে!

—তাহলে, বাদা ছেড়ে একেবারে আবাদে! রক্ষক এবার ভক্ষক!

—কেন? বাউলে হয়েছি বলে আহার-নিদ্রাও ছাড়তে বলো?—ফোঁড়ন কেটেই হাত নেড়ে দুই আঙুল দেখিয়ে ভাবগানের এক ছড়া গেয়ে দিল,—

"দুটো পাখি বাচ্চা পাড়ে
ঠোঁটে করে আহার আনে,
পয়ার হলি যাবে উড়ে, যার যেখানে মন!"

লায়লা মুচকি হেসে বলে,—যাও! রঙ্গ করতে হবে না। অতো জোড়া-পাখির খোয়াব দেখা শিখ্‌লে কোত্থেকে?

—আর যদি জোড়া-বাঘের স্বপন দেখি!

—রাখো! বাঘের গল্প জুড়তে হবে না। শুনি দেখি, কি ব্যাপার? সে নড়ি কি হলো? সেই আদ্দিকালের মন্তরপড়া নড়ি?

—আর বলো না! সে নড়ি তো কাছারি বাড়ি! ফেলে আসতে হলো। নায়েব দেখতে নিয়ে আর ফেরৎ দেবার নাম নেই। বললেই বলে কাল নিস্। রোজই বলি, রোজই এক কথা!

পুরানো লাঠিটার কথা উঠতেই কলিম যেন কেমন হয়ে যায়। বহু স্মৃতি বিজড়িত এই লাঠি। দুর্গম বনের অনেক জীবন মৃত্যুর কাহিনী জড়িয়ে ছিল তার সঙ্গে। লায়লাও অবাক। পর মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে যেতে চলতে বললো,—ও! তাহলে তো কাছারির নন্দার কথাই ঠিক। নন্দা দেখি সবই জানে!

মেয়েদের কথায় কলিমের বিশেষ আস্থা নেই। কাছারির মারপ্যাঁচের ইঙ্গিতেও কলিম কোনও ব্যগ্রতা দেখায় না। হাতের কাজে মন দিল। লায়লাও আগের মত হন্‌হন্ করে আঁকাবাঁকা ভেড়ির ওপর সর্পিল গতি নেয়।

দুই

লাঠিটার কথা কলিম ভুলেই থাকতে চেয়েছিল। কোত্থেকে লায়লা এসে আবার মনে করিয়ে দিল—মমতা জাগিয়ে দিল তার ফেলে আসা আদ্দিকালের হেঁতাল নড়ির ওপর। যাকে ফেলে আসতেই হয়েছে, তাকে পৌরুষ-মন ঝেড়ে ফেলতে চায় মন থেকে। চাইলে কি হবে! কলিমই কি পেরেছে সব সময়ে তার বিগত জীবনে।

সে সময়ে কলিমের প্রথম যৌবন। সেদিন কলিম হাঁটু ভেঙে ভেঙে চলেছে। ছোটবেলা থেকে হাঁটু ভেঙে চলাই তার অভ্যাস। টোটা-ভরা বন্দুকটি বাঁ-কাঁধেই চাপান আছে। আট-হাতি কাপড় টেনে শক্ত করে হাঁটুর উপর পরা। সেও এক হেমন্তের দুপুর। লালডোরা গামছাখানি বুক ও পিঠ ঢেকে চাদরের মত জড়ান ছিল। এবার খুলে নিয়ে মাথায় জোরে

ফেটা বেঁধেছে। পাগড়ি বলা চলে না, তবুও পাগড়ির মত গামছার পেখম ঝুলছে কানের পাশ দিয়ে। এমনি ধারা পেখম ঝুললে কলিমের কেমন যেন মনে হয়—দুনিয়ার কাউকে তোয়াক্কা করার নেই, কোনও বিপদ বিপদই নয়।

হরিণ শিকারের কথা মনে করেই কলিম সেদিন বনে উঠেছিল, মৈঁশেলির ট্যাঁক। মৈঁশেলি নদীর বাঁক এখানে ঘোড়ার খুরের মত। ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই নদীর ফাঁকা আলো দেখা যায়। এমনি ধারা সরুফালির মত বনে আশঙ্কা বা ভয়ের কোন কারণ নেই। তাছাড়া আবাদ ও বাদার সীমানায় বেনেখালি বন-কর অফিস খুব বেশি দূরও নয়। কলিম বেশ হাল্কা মনেই এড়িয়ে চলেছে।

তবে একটু সতর্ক হবার ছিল। বৃষ্টি অনেকদিন থেমে গেলেও বনের পলিমাটির পিচ্ছিল ভাব তখনও যায়নি। একটুতেই শূলোর মাঝে পা হড়কে যাবে। কলিম তাই হাঁটু ভেঙে ভেঙে চলবার সময় বুড়ো আঙুল টিপে টিপে চলেছে।

বন্দুকটির ওপর যেন অদ্ভুত মায়া ; এটি তার পৈত্রিক সম্পত্তি। বহু কষ্টে অর্জিত এই বন্দুকের কাহিনী তার বা'জানের আমল থেকে শুনে এসেছে। বা'জান শিকারি হলেও, বন্দুক তার জোটেনি বহুদিন। ১৩১৬ সনে দক্ষিণ বাঙালার এক প্রকাণ্ড ঝড় ও প্লাবনের পর মহামারি দেখা দেয়। তার প্রকোপে আবাদের লোক প্রায় উজাড় হবার জো হয়েছিল। পরের বছর লোকের অভাবে আবাদের অনেক জমিই অনাবাদী থাকে। সেই সুযোগে রাতদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বা'জান অনেক ধান পায়। এমন সুযোগে কোনও শিকার-পাগল সুন্দরবনের চাষী বন্দুক কিনবার লোভ সামলাতে পারে না। কলিমের বা'জানও পারেনি।

কলিম হরিণ শিকারে বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু সুন্দরবনে উঠে বাঘের কথা না ভেবে উপায় নেই। ভাবনা এলেও, কত বারই তো কলিম বনে উঠেছে কিন্তু একবারও এই রাজ্যের সেই রাজার সঙ্গে তার দেখা হয়নি তখনও।

সেদিন হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে শৈশবের এক মর্মান্তিক ঘটনা। রাত দুপুর, সবাই নিঘোর ঘোরে ঘুমিয়ে। হঠাৎ গোয়াল ঘরে গরুর দাপানি আর মৃত্যুভয়ের ডাক। ত্রাসে সবাই তো তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে। আগুন জ্বালিয়ে কতো হৈ-হল্লা, কিন্তু বাঘ থোড়াই কেয়ার করে। ধলিকে মুখে ধরে গলার দড়ি একটানে ছিড়ে গোঁ গোঁ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

তারপর শিশু কলিম বা'জানকে কতবার বলেছে,—দেবে বা'জান। দেবে আমাকে লোহার পাত দিয়ে মুড়ে ?

—কেন ? লোহার পাত মুড়ে কি হবে রে ?

—বাঘে আমাকে কিছুই করতে পারবে না। বন্দুক নিয়ে তখন একটা একটা করে বাদার সব বাঘ মেরে শেষ করব। স-ব বাঘ !

—সব বাঘ মেরে ফেলবি ! বলিস্ কি ! তাহলে তো সুন্দরবন আর বন থাকবে না, বাগান হয়ে যাবে ! বনের রক্ষক বাঘ, আর বাঘের রক্ষক বন। বুঝলি ?

ছেলেমানুষের মনে খট্‌কা লাগে। বাঘ না থাকলে বন থাকবে না, বাগান হয়ে যাবে ! মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যায়। বনের অভাবটা যেন ভাবতেই পারে না। মুখে অবশ্য কিছুই বলতে পারেনি।

এবার যৌবনে মাথায় ফেটা বেঁধে বন্দুক হাতে সুন্দরবনে দাঁড়িয়ে ছেলেবেলার কথাটা মনে পড়তেই কলিমের হাসি পেল। হাসির ঠোঁটেই বিড়বিড় করে বলে,—তুই তো

ছেলেবেলায় ভারি ভীতু ছিলি!

কথা বলতেই চিন্তার স্রোত থেমে যায়। বন্দুকের কাঁধে মোলায়েম করে কয়েকবার হাত বোলায়। যেমন করে পিতা তার কাঁধের সন্তানের পিঠে হাত বোলায়। হাত বোলাতে বোলাতে পাগড়ীর পেখমে আঙুল লাগতেই সজাগ হয়ে উঠল,—সে তো দাঁড়িয়ে পড়েছে! তার তো থামবার কথা নয়! আবার হাঁটু ভেঙে চলতে শুরু করে শূলোর ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে ফেলে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর এসে পড়েছে। বনের গভীরে। বাঁ দিকের নদীটি অনেক আগেই বাঁক নিয়ে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে। কলিম ডানদিকের নদী কাছ-ছাড়া করেনি।

অগুনতি কুমির কামোটে ভর্তি নদী অবশ্য বিশেষ ভরসার বস্তু হবার কথা নয়। তবুও সুন্দরবনের নদী শিকারির মনে যেন সাহস যোগায়। নদী মানেই আলো। নদীর কূলে গহন বনের মত আলো-আঁধারের রোমাঞ্চে অধীর হয়ে উঠতে হয় না। বনের গভীর যেন গম্‌গম্ করে। মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। কিন্তু সুন্দরবনের জীবন্ত নদী তার স্রোতের টানের শব্দে মনকে হালকা করে দেয়, বুকে বল আনে। বল আনবার আরও কারণ আছে। নদীর দুপারেই বন। তবু বনের গহনে নদী যেন একটা সীমানা। সীমানায় পিঠ দিয়ে লড়াই করতে যে-কোনও যোদ্ধার আপনা থেকে সাহস আসে। নিবিড় বনে আবার হামেশাই দিক হারা হয়ে পড়বার সম্ভাবনা ; সেদিক থেকেও আঁকাবাঁকা নদীও বুঝি দিশেহারার কাছে নিশানার স্বরূপ।

কাজেই কলিম নদীর চরে না হলেও, কাছাকাছি নদী বরাবর চলেছে। কাছাকাছি চলার পেছনে অন্য মতলবও ছিল। হরিণ শিকার করতে বেরিয়েছে। বাঘের দেখা পাবার কোনও আশা রাখেনি। তবুও বলা যায় না! কলিম সতর্ক থাকতে চায়। নদীর কূলে নরম মাটিতে বাঘের পায়ের খোঁচ স্পষ্ট ধরা পড়বেই পড়বে। হরিণের লোভে বাঘকে নদীর ধারে ধারে তো ঘুরতেই হয়।

কলিম সতর্ক ছিল বটে। কি : একই সঙ্গে আর কতদিকে খেয়াল থাকে। বনের আরও গভীরে এলে হঠাৎ এক সময়ে মনে হলো, বনটা যেন সহসা নিঃসাড় লাগছে। কেমন যেন থমথমে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শির্‌শির্ করে উঠলো। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। পাগড়ি বাঁধা গামছার পেখমে ঝাঁকি মেরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কলিম।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি। থামের মত দাঁড়ান গাছের গুড়ির ফাঁকে ফাঁকে তন্ন তন্ন করে দেখে। দূরে গোলপাতার ঝাড়। এমনি ধারা ঝাড় বাঘের বড় পছন্দ। এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে কলিম সেদিকে। না, কিছুরই সাড়া মেলে না। ঝাড় বাঁদিকে রেখে নদীর কূল ধরে আবার এগিয়ে চলল।

নদী এবার দক্ষিণ মুখে চলতে চলতে হঠাৎ সোজা পশ্চিমে একটু এগিয়েই আবার পুরো বাঁক নিয়েছে দক্ষিণে। এই বাঁকের মুখে পলিমাটির চর। বিস্তীর্ণ চর! বাঙলাদেশের অন্য নদীর মতই সুন্দরবনের নদী। যেদিকে বেঁকবে সেদিকেই চর ফেলবে, অন্য দিকে ভাঙন। ডান দিকে বাঁক নিলে, ডান পারেই চর ফেলবে। বাঁ-দিকেই বাঁক নিলে বাঁ পারেই চর ফেলবে।

নোনা পলিমাটির চরের ধারে ধারে ঝাকাল কেওড়া গাছ যেন ছেয়ে গেছে। এই কেওড়া গাছই কলিমের এবার লক্ষ্য। চরের কেওড়াগাছ হরিণকে পাগল করে দেয়। দলে দলে তারা কেওড়া পাতা খেতে আসে। এমন চরে একবার কেওড়া গাছে উঠে বসতে পারলে,

হরিণ পাওয়া যাবেই যাবে। কলিম আর দেরি করতে চায় না। সূর্য হেলে পড়বার আগেই গাছে ওঠা চাই। দ্রুত পা ফেলে চলেছে।

দ্রুত পা আর ফেলতে হয় না। বুনোগন্ধ ! যে গন্ধে বনে সমস্ত জীবই চমকে ওঠে। যে গন্ধে আত্মরক্ষার কথা সর্বাগ্রে মনে হয়। কলিমের বুক কেঁপে উঠল। দ্বিতীয় ঝলক বাতাসে বাঘের সে গন্ধ আরও তীব্র। দক্ষিণে বাতাস। ঝটিতি সেদিকে মুখ করে আরও খানিকটা হাঁটু ভেঙে কলিম দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেহের সর্ব শক্তি পায়ের পাতায় জড়ো। এতটুকু ইঙ্গিত পেলে, পা চালু করতে মুহূর্ত দেরি হবে না। দেহের শক্তি পায়ে জড়ো, কিন্তু মন নিবিষ্ট চোখে ও কানে। গন্ধ নাকে আসতেই ধীরে ধীরে বন্দুকটি কাঁধ থেকে নামিয়ে সামনে উঁচিয়ে ধরেছে। তারপরই নিশ্চল। মনে আশঙ্কা—ওকেই লক্ষ্য করে নিশ্চয় ওৎ পেতে লুকিয়ে আছে। একটু নড়লেই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে। খট্—পেছনে কি একটা শব্দ। চকিতে দেহ যেমন ছিল, তেমনি রেখেই কলিম মাথা ঘুরিয়ে দিল পেছনে। কেন এই শব্দ সেদিকে লক্ষ্য নেই। শুধু দেখে নিল, কিছু দেখা যায় কিনা। না, কিছুই না ! আস্তে আস্তে আবার মাথা ঘুরিয়ে নিল।

কয়েক লহমা কেটে যায়। কোনও কিছুরই সন্ধান মেলে না। কিন্তু গন্ধ যেমন ছিল, তেমনি তীব্র ভাবেই আসছে। মনে পড়ে যায় তার বা'জানের কথা। বা'জান বলতো—বনে বাঘের গন্ধ পেলে বুঝবি, বাঘ তোকে তাক্ করেনি, বাঘ তোর জন্য ওৎ পাতেনি। শিকার করতে বেরিয়ে সুন্দরবনের বাঘ কখনও বাতাসের পথে এগুবে না। বাতাসের মুখোমুখি হয়েই এগুবে। যাতে তার গন্ধ শিকারের নাকে ধরা না পড়ে। বজ্রপাতের সময় বিদ্যুতের ঝিলিক চোখে লাগলে যেমন বুঝতে হবে বজ্র অন্তত সেবারের মত তার মাথায় পড়ছে না। বজ্র যার মাথায় পড়ে তার ঝিলিকের আলোক দেখবার অবকাশ হয় না। তেমনি সুন্দরবনের বাঘ যার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাকে গন্ধ পাবার অবকাশ দেয় না।

বা'জানের কথা মনে পড়তেই কলিমের—মন খানিকটা শান্ত। তবে এবার পালাতে হবে। কিন্তু কোন পথে, কোন দিকে ? সহসা কিছু ঠিক করতে পারে না। দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক নয়। সামনের গাছটাই কেওড়া গাছ। গুঁড়িতে ডালপালা আছে। গরান বা সুন্দরী গাছের মত ছাল ফেটে ফেটে রুক্ষ হয়েও নেই। নিঃশব্দে ওঠা যাবে। কলিম উঠেও পড়লো।

বেশ উঁচুতেই উঠল। গোল-ঝাড়ের ওপাশটা এবার দৃষ্টিতে আসে। দেখে তো কলিম থ মেরে গেছে। এক শীর্ণ জলধারার কূলে কূলে গোল গাছের ঝাড়। তারই বেষ্টনে এক চত্বর। পাশেই একটা কেওড়া গাছ অনেকটা হেলে আবার মাথা উঁচু করে উঠেছে। আর কোনও গাছ ধারে কাছে নেই। বেশ দেখা যায়, ফাঁকা চত্বরে দুপুরের সূর্যের আলো মাটি পর্যন্ত এসে পড়েছে।

এমন আলোতে কিছুই অস্পষ্ট থাকবার কথা নয়। সামান্য একটু দেখতেই কলিম ডাল-পাতার আড়ালে ঝট্ করে মাথা নিচু করে দিল। সবটা দেখবার সাহসও যেন হয় না। একটু পরে বন্দুকটা ডান হাতে চেপে ধরে দ্বিতীয়বার মাথা উঁচু করল।

বিশালকায় বাঘ ও সমকক্ষ এক বাঘিনী পাশাপাশি একদিকে মুখ করে আছে। দুজনেই থাবা দুটিকে সামনে খানিকটা লম্বা করে দিয়ে উবু হয়ে বসে আছে। অলসভাবে এ-ওর মুখের কাছে মুখ নিচ্ছে।

সামনেই কি যেন একটা নড়ে ওঠে। সুন্দরবনের বাঘের সামনে আর কোন্ জীব নড়াচড়া করবার সাহস রাখে ! অর্ধমৃত লব্ধ শিকার। কলিম ভাল করে চেয়ে দেখে—না, আরেকটি

বাঘ !…ওপাশে আরেকটি !…এপাশে যে আরও ! বাঘ ও বাঘিনীর চারিপাশে প্রায় গোল হয়ে চারজন বসে আছে উবু হয়ে মাটির সঙ্গে চিবুক লাগিয়ে। বেশ বোঝা যায়, ওদের চারজনেরই দৃষ্টি জোড়া বাঘ-বাঘিনীর দিকে। মুখ যেন কাঁচুমাচু করে তাকিয়ে আছে। কোনও শব্দ নেই, কোনও গর্জন নেই। বাঘিনী একবার মস্ত এক হাঁ করে হাই তুললো। তাতেই যা একটু শব্দ।

কলিম হতভম্ব। বন্দুক হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরাই আছে। বেশ দূর। তবুও বন্দুকের আওতার মধ্যে হলেও হতে পারে। কিন্তু…কলিমের একবারও গুলি করার কথা মনে আসে না। এই দৃশ্য থেকে সে দূরে পালাতে চায়। দ্রুত পালাতে চায়।

বিন্দুমাত্র দেরি না করে, যেমন নিঃশব্দে উঠেছিল তেমনি নিঃশব্দেই গাছ থেকে নেমে এলো। এলো একেবারে নদীর কিনারায়। বিস্তৃত ফাঁকা চর ধরে নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দ্রুত পায়ে চলল। জলে শব্দ হতে থাকে। তা হোক। জলের শব্দে ডাঙার জীব বিশেষ সচকিত হয় না। তাছাড়া, বিপদ এলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বারও সুযোগ রইল।

তিন

বনের পথে ভয়াবহ দৃশ্যের কথা ভাবতেই কলিমের মন দুরদুর করছিল। কিন্তু বন ছেড়ে নদী পার হয়ে আবাদে পা দিতেই দুপুরের ঘটনা সবই যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। স্বপ্ন যেমন লোকে কাউকে সহসা বলতে চায় না, কলিমও তেমনি স্বচক্ষে দেখা এই স্বপ্ন কাউকে বলতে চায় না। বলেও না।

শুধু স্বপ্নের মত ঘটনা বলে নয়। সুন্দরবনের উপকূলবাসী মরদ মনের শিকার স্পর্ধাও যেন আহত। শিকারির বেটা হয়ে বন্দুক হাতে এমন সুযোগ ছেড়ে দিয়ে এলো ! এ আপশোষ সহসা ব্যক্ত করতে চায় না কারও কাছে।

তবে কতক্ষণ আর সে চেপে থাকবে। পরদিন ভোরে চলল নিধু শিকারির কাছে। মঠবাড়ির পশ্চিম ভেড়িতে কয়েক ঘর নিয়ে 'পোদ' পাড়া। এ পোদ পাড়ার অধিবাসী নিধু মোড়ল। নিধু শিকারি কলিমের বা'জানের শিকার বন্ধু। চাচা বলেই কলিম ডাকে। কাহিনী শুনতেই চাচা বলল,—কি বলছিস তুই ! কত শিকারির কথা জানি, তারা কেউ তো একটার জায়গায় দুটো বাঘ একত্রে দেখেনি ! আমাকে দেখাতে পারিস ? আর কেউ জানে এই ঘটনা ?

আনন্দ, বিস্ময় ও আপশোষের সাথী পেয়ে কলিম উল্লসিত। চাপা কাহিনী ব্যক্ত করতে যেন মুখর হয়ে উঠল। খুঁটিনাটি সব বর্ণনার পর ব্যগ্র হয়ে বলে,—যাবে চাচা ! চলো তাহলে এক্ষুনি। এক্ষুনি না গেলে যে অতো দূর থেকে ফেরাই দায় হবে।

—আজ গিয়ে কি হবে ? তুই যেমন ! আজও আছে নাকি ? অমন দলবেঁধে আজও থাকবে নাকি ?

—চলো না ! ঠিক থাকবে। অমন চত্বর ফেলে যাবে কোথায় ? বাদায় অমন রোদই বা মিলবে কোথায় ?

চলল দুজনে। বন্দুক হাতে কলিম, আর খালি হাতে চাচা। অঘ্রাণ মাস। মাঠে বিশেষ কাজ নেই। মঠবাড়ির জমি নাবাল। মাঠের ধান উঠতে এখনও একমাস বাকি। এ সময়ে কেউ কোথাও গেলে বিশেষ খোঁজ হয় না। বন-বাদাড়ের মানুষ অবসর পেলে বন-বাদাড়ে যে একটু ঘুরবে, তা ধরা কথা।

আজ ওরা বনের ভেতরে হেঁটে হেঁটে যেতে চায় না। ডিঙি নিয়ে চলল নদী বেয়ে। অনেক দূর এসে গেছে। দুই গলুইতে দুজনে,—কথাবার্তা বিশেষ নেই। ইসারা ইঙ্গিতে দু-একটা কথা যা চলেছে। হুকো আনলেও হুকোয় তামাক খায় না। হুকোতে যে বড় শব্দ হয়। শুধু কলকেই ভাল ; নিঃশব্দে তামাক টানা যায়।

কলিমের মুখে কলকে, কিন্তু নজর চরের দিকে। কাল ফিরতি পথে এক কুমির পড়ে সামনে। রোদে পড়েছিলো আরাম করে চরের ওপর। কলিমের সাড়া পেতেই সড়্সড়্ করে তখন জলে নেমে পড়ে। নজর দিয়ে সেই দাগই কলিম আজ খুঁজছে। দাগ থাকবার বিশেষ কথা নয়। রাতের জোয়ার নিশ্চয় একবার পলিমাটির প্রলেপ দিয়ে গেছে। তবু যদি থাকে।

নজর দিয়ে সে-দাগ এখনও পায়নি বটে, কিন্তু একটু এগিয়েই চরের মাথায় কয়েকটি খোঁচ দেখে মনে হয়, বুঝি বা তারই নিজের পদ চিহ্ন। চাচাকে ইসারা করে ডিঙি ভিড়িয়ে দিল। গামছার ফেটা মাথায় বেঁধে বন্দুক হাতে চরে নেমে পড়ে। নেমেই চাচার গলুই কাছে টেনে ফিসফিস করে বলে,—ডিঙিতে থেকো। আগে ভাগে উঠবে না। চিনে আসি, সেই ভিটে কিনা। সেই গাছটা পেলেই ডাকবো। খবরদার ! আগে উঠো না যেন।

চাচাও গলা বাড়িয়ে চুপিচুপি বলে,—ডাকবি কিন্তু। খবরদার, একা যাবি না।

—না, না, যাব না। কান খাড়া রেখো কিন্তু। ডিঙি তৈরি রেখো তুমি,—বলেই কলিম চাচার গলুই জলে ঠেলে দিল। ঘাড় বাঁকিয়ে বনের দিকে তাকিয়ে আছে। ডিঙি পাক খেয়ে অপর গলুই গায়ে এসে ঠেকে। তবু কলিমের দৃষ্টি বনের দিকে। তেমনি ভাবে বনের রন্ধ্রে চোখ রেখে রেখেই চর বেয়ে উঠে গেল।

এই বাঘের মেলা বা জমায়েত দেখতে আসার পেছনে ওদের কিন্তু একমাত্র শিকারি-মনের দুঃসাহসিকতার আকর্ষণ নয়। একমাত্র শিকার স্পৃহার অদম্য নেশাও নয়। বনকে ওরা আপনার করে দেখে, বনের প্রতি মমতা ওদের কাছে আপনার গৃহ আঙিনার মমতারই সমান। আবার বনকে ওরা ভিন্ন রূপেও দেখে। ভিন্ন সত্তা আরোপ করে। বন ওদের কাছে এক শক্তির প্রতীক। বন্য জীব ও বৃক্ষের অদ্ভুত আচরণ ওদের কাছে সেই শক্তির পরিচায়ক। ভাবে, হয়তো বা ওদের জীবনেরও মঙ্গলামঙ্গলের নিয়ামক। তাই বন আজও হয়ে আছে ওদের কাছে—বনদেবী। তীর্থ দর্শনের মত বনদেবীর এই শক্তি লীলা দেখলে অনাগত ভবিষ্যতে কোনও মঙ্গল সূচিত হবে,—এমন আশাও ওদের মনের তলে থাকা বিচিত্র নয়।

এক, দুই, তিন—প্রায় কদম গুণে গুণে কলিম নিঃশব্দে চরের উপরে এলো। সামনে খানিকটা শক্ত মাটিতে নিজের পদচিহ্ন পরিষ্কার। এই চিহ্ন দেখে দেখে এগিয়ে গেলে গাছটিও ঠিকই চিনবে। দেখে দেখে চলেছে।

একটা পায়ের ছাপের উপর চোখ পড়তেই কলিমের বুকটা শুকিয়ে গেল। তারই পায়ের ছাপের উপর বাঘের থাবার স্পষ্ট চিহ্ন। ...তবে ! ...চাচাকে ডাকি!...গাছেরগুড়ির আড়াল থেকে ইসারায় ডাকবার জন্য হাত উঁচু করেছে। মুহূর্ত সময় দিল না। বজ্রহুঙ্কারে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাঘের থাবা ঘাড়ে না পড়ে কানের পিঠে পড়েছে। কলিম ধরাশায়ী—

আর কোনও শব্দ নেই। বন্দুকের আওয়াজও নেই। চাচা হতভম্ব। বন্দুকের জন্য তার হাত ইশ্‌পিশ্ করে। কিছুই করার নেই। করবেই বা কি ! কলিম ডিঙি তৈরি রাখতে বলেছিল। তৈরিই ছিল। কিন্তু শিকারমত্ত বাঘের সামনে এমন ভাবে ডিঙি রাখাও বিপদ। কাল বিলম্ব না করে এক ধাক্কায় কিনারা থেকে দূরে সরিয়ে নিল চাচা। হাতে বোঠে নিয়ে দড়াম দড়াম করে ডালিতে বাড়ি মারে আর চিৎকার করে। একাই হল্লা করতে চায়। ভয়

দেখিয়ে সুন্দরবনের বাঘকে ভীত করবার চেষ্টা। যতই নিদারুণ চিৎকার করুক না কেন—নিঃশব্দ বিস্তীর্ণ ফাঁকা বনে সে আওয়াজ ঢেউয়ের মত দুলে দুলে ঢিমে তালে মিলিয়ে যায়। নিধু শিকারির নিজের কাছেই নিজের হুঙ্কারকে মনে হয় যেন,—এক ব্যর্থ করুণ আর্তনাদ। চিৎকার আপনা থেকে থেমে গেল। থামতেই বাঘের এক-আধটা চাপা গোঙানি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। নিধু শিকারি এবার বাড়ি ফিরে যেতে চায়। কিন্তু যাবে কি! বারবারই পিছন ফিরে চরের উপর কলিমের পদ চিহ্নের দিকে তাকিয়ে থাকে…।

কলিম ধরাশায়ী। থাবার আঘাতে কানের পিঠের খানিকটা মাংস উড়ে গেছে। রক্ত ঝরে পড়ছে। সুন্দরবনের বাঘ কখনও যেখানে শিকার করে সেখানে খেতে বসে না। কলিমের কোমরে গোটো করে কাপড় পরাই আছে। তারই উপর দিয়ে কামড়ে ধরে মুখে তুলল। মুখে নিয়ে গরগর করতে করতে এগিয়ে চলল বনের ভিতর।

কিছুটা এসেই পিছনের পা ভেঙে বসে পড়ল। সামনে কলিমকে রেখেছে। আধা-চিৎ হয়ে কলিমের দেহ নেতিয়ে আছে। তারই উপর দিয়ে ওপাশে দুই থাবা টানটান করে দেয়। যেন বীরদর্পে বসে আছে। হিংস্রতার প্রতিমূর্তি বটে। কিন্তু সে হিংস্রতা কাপুরুষের নয়, বন্য জীবনে বলদৃপ্ত পৌরুষের আচরণ মাত্র। কলিমকে যেন কোলের মধ্যে করে রেখেছে। এক একবার ঘাড় নিচু করে গন্ধ নেয়, আর গর্‌গর্‌ করে প্রতিবাদ ধ্বনি করে।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর কোলে কলিম এলিয়ে আছে। সহসা তার জ্ঞান ফিরে এলো। চোখ মেলেছে। মুহূর্তে আবার চোখ বন্ধ করল। হাত পা নড়াবার শক্তি তখনও পায়নি কিন্তু চেতনা এসেছে। দ্বিতীয়বার এই বিভীষিকার সামনে চোখের পাতা খুলতে সাহস পায় না। অনিবার্য মৃত্যুর সামনে চিন্তাশক্তি বোধহয় স্তব্ধ হয়ে আছে।

গাঁ গাঁ……গাঁ গাঁ—হিংস্র প্রতিবাদ ধ্বনি। রক্ত মাংসের লোভে কণ্ঠ গহ্বরের লোলুপ আওয়াজ তো এ নয়!……হঠাৎ ক্ষিপ্র বেগে ছুট দিল। সামনে তার সমকক্ষ হয়ত বা কাউকে দেখেছে। ছুটে যেতেই পেছনের পায়ের টানে কলিম দুহাত ছিট্‌কে গেল।

ধাক্কা খেয়েই কলিমের দেহ সজাগ। শক্তি বুঝি ফিরে এসেছে। আর কাল বিলম্ব নয়। টলতে টলতে সামনের গাছটাই টেনে হিঁচড়ে উঠল। উপরে উঠল। আরও উপরে উঠল। গাছের ডালের শেষ মাথায়। তবুও যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর নাগালের বাইরে মনে হয় না।

তে-ডালার ফাঁকে কোনমতে বসে বুক দিয়ে জাপটে ধরে আছে ডালপালা। এতক্ষণ পরে মনে পড়ে তার বন্দুকের কথা—বন্দুক নেই! গাছের তলায় ভাল করে চেয়ে দেখে কোথাও বন্দুক নেই। তবে তার বন্দুক গেল কোথায়! বন্দুক! না, কানের ধারে বড় যন্ত্রণা। দেখবার চেষ্টা করে হাত দিয়ে। হাতের তেলো রক্তে লাল হয়ে যায়। আশ্চর্য, মাথার ফেটা তখনও খুলে পড়ে যায়নি। তাড়াতাড়ি মাথার গামছা খুলে ক্ষতস্থানে বেঁধে দিল।

বাঁধতে না বাঁধতে দেখে, বাঘ ছুটে এসেছে। এসেই ঘাড় উঁচু করে এদিক ওদিক চাহনি দেয়, থপ্‌ থপ্‌ করে দেহ কাঁপিয়ে এদিক একবার যায়, ওদিক একবার যায়। থেমে যায়, আবার মাটি শুঁকতে শুঁকতে খানিকটা এগিয়ে যায়। এক একবার শিকারির মত গুটি মেরে নদীর দিকে উঁকি মারে। যেন শিকার দেখতে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একবার বনের মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসে না। কলিম নিঃশব্দে বসে আছে। মৃত্যুর সামনে সর্বযন্ত্রণা ভুলে নিঝুম হয়ে ডাল আঁকড়ে আছে। বেশি সময় নয়, আবার ছুটে আসে, হুড়মুড় করে ছুটে আসে। এ তো চুপিসারে শিকারের

নিকটবর্তী হওয়া নয়,—লব্ধ শিকার আহারের জন্য আসা। ঝোপ-ঝাড় ভেঙেই ছুটে আসে। বনে অন্ধকার নেমে এলো বলে। কয়েকবার ঘোরাফেরা করার পর কিছুক্ষণ নদীর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে একবার বিকট হাঁক দিয়ে উঠলো। তারপর শান্ত পদক্ষেপে এপাশ ওপাশ দুবার ঘুরে চলে গেল। আর ফিরে আসে না।

গভীর বনে রাত্রের অন্ধকার। কলিমের যেন নতুন করে আর কিছু ভয় করবার নেই। অন্ধকারের আবরণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। অন্ধকার তার আশ্রয়। পরদিন দিনের আলোর ভয়ে কীভাবে পালাবে এই তার চিন্তা। চাচা! চাচা কি পালাতে পেরেছে। হয়ত পেরেছে। আবাদের সকলকে রাত্রেই নিশ্চয় সবকথা বলবে।......হয়ত পালাতে পারেনি। যদি নাই পালাতে পারে, তবে কোথায় গেল? কোথায় তাকে খুঁজবে! আবাদে গিয়ে সে চাচার কথাই বা কি বলবে! ঘুরে ফিরে দিনের আলোর ভয় তাকে পেয়ে বসে। আবাদে অন্ধকারের ভয়, বাদায় আলোর ভয়।

রাত্র শেষে ভোরের আলো বনের পাতার ছাতার উপরে এসে পড়ে। তবু কলিম কিছু স্থির করতে পেরে ওঠে না। কিছু পাখির কাকলি ছাড়া জীবনের বিশেষ কোনও সাড়া নেই। ধীরে ধীরে বেলা হতে থাকে, ভাবে এইবার পালাবে। এক ডাল নামে, আবার উঠে পড়ে। নিচে নামতে আশঙ্কার অন্ত নেই।

হঠাৎ কলরব। অনেক লোকের সমবেত কলরব। কেউ ডাকে,—কলিম! কলিম! কেউ বলে,—ওদিকে না, এদিকে।

বন্দুক চোট্ করে ওঠে। চাচার গলা, হাঁ চাচার গলার ডাক,—ডিঙি ভেড়ো! ডিঙি ভেড়ো!

কলিম নিশ্বাস ফেলবারও বোধহয় অবকাশ দেয় না। পাগলের মত ছুটে এলো চরের দিকে। সাড়া না দিলে যে ওরাও শব্দ লক্ষ্য করে বন্দুকের চোট্ করে বসতে পারে, তা ভাববারও অবকাশ বা অবস্থাও ছিল না।

কলিমকে দেখতে পেয়েই সবাই একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলো। কাউকে ডিঙি থেকে নামবার অবকাশ দেয় না কলিম। একছুটে তর্‌তর্ করে চর বেয়ে নেমে ডিঙির কোলে হাজির। অজস্র প্রশ্ন। অতো প্রশ্নের জবাব কি দেবে কলিম! দুএকটা কথা বলেই গামছা খুলে দেখিয়ে দেয়। ক্ষতের সঙ্গে সেটে গেছে গামছা। একটানে খুলে দেখাল।

চাচা সবাইকে ঠেলে এসে বলল,—চল, ওঠ্ ডিঙিতে! তোর বন্দুক? বন্দুক কোথায় ফেললি?

—বন্দুক! জানি না কোথায়! ...বনেই আছে।

নিধুশিকারি বনের দিকে তাকিয়ে বলে,—চলো, চলো সবাই। বন্দুক আনতে হবে না বুঝি, চলো।

কলিম অস্বাভাবিক চিৎকার করে ওঠে,—না, না, বন্দুক দরকার নেই! হাজার খুঁজেও পাবে না তোমরা। না, না, আজ না। ডিঙি ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি।

শুধু সেদিনই নয়, কোনও দিনই কলিম কাউকে খুঁজতে দেয়নি সে-বন্দুক—নিজেও সে-মুখো আর হয়নি।

চার

আজ যেমন কলিম ফেলে আসা আদ্দিকালের লাঠিকে ভুলে থাকতে চায়, সেদিনও তেমনি ফেলে আসা বন্দুককে ভুলে থাকতে চেয়েছিল। চাইলে কি হবে ? হয়ত বন্দুকের মায়া কাটিয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে মায়া কাটাতে কলিমের জীবনেরও মোড় ঘুরে যায়।

দুর্গম বনের ক্রোড়ে যে শিশু লালিত, আশৈশব কাল থেকে যে মন অরণ্য ও জীবনকে অভিন্ন করে দেখতে অভ্যস্ত, বনের ভীতি, বিহ্বলতা, আনন্দ ও উচ্ছলতা যার সত্তাকে স্বাভাবিক ভাবেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে—এই ঘটনাকে সে সহজ ভাবেই ব্যাখ্যা করে নিল। দৃঢ় প্রত্যয় এলো, বন্দুকের বিনিময়ে বনবিবির অদৃশ্য স্নেহেই তার জীবন সেদিন ফিরে পেয়েছে, নইলে বাঘের কোল থেকে কে কবে ফিরতে পারে ! মনে হলো, বনবিবির উপাসক বাওয়ালির জীবনই তার জন্য নির্দিষ্ট।

বাওয়ালি জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও ডাক কলিমের মনের তলে অনেকদিন ধরে গুন্‌গুন্ করে। অবশেষে একদিন আক্রাম বাওয়ালির দ্বারস্থ !

যাবার আগে নিধু শিকারির কাছে গেলে সে বলল—কি হে ! তুমি নাকি ফকির বাউলে হতে চলেছ।

—রাজা-বাদশা হবার তো জো নেই, তাই ফকির হয়েই দেখি না একবার !

—তা বেশ ! কিন্তু কার কাছে বাউলে মন্ত্র নেবে ? শুনলাম, আক্রাম বাউলের কাছে যাওয়া ঠিক !

—তাই তো ইচ্ছে।

—জানোতো আক্রাম বাউলের কথা, বড় কড়া লোক কিন্তু। কাউকে মন্ত্র দিতে চায় না। আর যদি দিলো তো তাকে এমন পরখ করে নেবে, বলার না। নাজেহালের একশেষ করে তবে ছাড়বে। বুঝে-সুজে যেও কিন্তু।

—দেখি একবার বুড়োকে ঘায়েল করতে পারি কিনা। পারি না পারি, দেখতে দোষ কি ! বনেই তো পড়ে থাকতে হবে ! যন্তর যখন ছেড়েছি, একবার মন্তরের চেষ্টা করতে তো হয়। কি বলো ?

কলিমের পক্ষে পারা না পারা নিয়ে নিধু শিকারির মনে সন্দেহ থাকলেও মুখে সায় দিল। কলিম এবার গড়-কমলপুরের পথে। পথ বলা বোধহয় ঠিক নয়, ভেড়ি ধরল। ভেড়িই এ দেশে একমাত্র পথ।

মঠবাড়ি থেকে গড়-কমলপুর সোজা পশ্চিমে। অনেক দূর। যেতে যেতে বেলা প্রায় গড়িয়ে আসবে। গড়-কমলপুর খুবই পুরান আবাদ। রাজা প্রতাপাদিত্যের কমলপুর দুর্গ এখন গড়-কমলপুর নামেই পরিচিত। রাজধানী ধূমঘাটের পুব-দিকে কপোতাক্ষী নদীপথে শত্রু সৈন্যকে রুখবার জন্য এই দুর্গের সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু দুর্গ নয়, কামানের গোলাগুলি বানাবার জন্যও এই এলাকা নির্দিষ্ট ছিল।

গড়-কমলপুর যেতে কলিমকে দুটি নদী পার হতে হবে। প্রথম শাঁখবাড়িয়া, তারপর কপোতাক্ষী ; বেদকাশীর ধারে শাঁখবাড়িয়া পার হয়ে কিছুটা এই নদী বরাবর এগিয়ে সোজা পশ্চিম-মুখো চক্‌গড় আবাদের ভেড়ি ধরে গড়-কমলপুর পৌঁছান যায়। চক্‌গড়ে পৌঁছাবার আগে অবশ্য কপোতাক্ষী পার হতে হবে।

গড়-কমলপুরের মুখেই গড় গাঁ। এই গড় গাঁয়ে আক্রাম বাওয়ালির বাড়ি। নাম আক্রাম ঢালি। প্রতাপাদিত্যের কোনও ঢালি সৈন্যের বংশধর। যোদ্ধার বংশ।

ভাটি বাঙলার মানুষ মাত্রই কোন না কোন ভাবে যোদ্ধা। সংগ্রামী না হলে এখানে জীবিকার সংস্থান হয় না। খরস্রোতা নদীর জোয়ার ভাটার সঙ্গে এদের দিন রাতের লড়াই চলে। প্রতি বছরই ভরা লোনা-প্লাবনের জন্য এদের তৈরিই থাকতে হয়। আর বছরব্যাপী লোনা মাটিতে সোনা ফলাবার সংগ্রাম তো আছেই। এক কথায়, নদী ও লোনার বিরুদ্ধে এদের জীবন-মরন লড়াই। তা ছাড়া আর যে লড়াই আছে, সে তো এদের কাছে হাতের পাঁচ। এরা তা ভুলেই থাক। জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের সঙ্গে নিরলস লড়াই। তবুও, এত যোদ্ধার মধ্যেও প্রতাপাদিত্যের ঢালি সৈন্যের বংশধরেরা আজও বিশেষ সম্মানের অধিকারী। আক্রাম একে তো ঢালি, তার উপর বাওয়ালি। এক ডাকে এ গের্দে সবাই চেনে।

আক্রামের বাড়ি ঢুকতে প্রথমেই কলাগাছের ঝাড়। তারপরই ছোট আঙিনা নিয়ে দুখানি গোলপাতার দো-চালা। শীতের মরসুম, গোবর দেওয়া চত্বর তক্‌তক্ করছিল। তবুও যেন একটা গুরু গম্ভীর পরিবেশ। গৃহীর গৃহে যদি শিশুর কাকলি না থাকে, তাতে যা হয়। আক্রাম নিঃসন্তান।

কলিম দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে বেশ ক্লান্ত। তাহলেও খুশি মন নিয়েই এসে দাঁড়াল।

—কি চাস ? হবে না, ওসব হবে না !......তফাৎ যা,......তফাৎ যা !

ভারিক্কি দেহের ভারিক্কি আওয়াজে আক্রামের অভ্যর্থনা।

কলিম হক্‌চকিয়ে গেছে। কথা নেই, বার্তা নেই, কি মতলবে এসেছে তার খোঁজ নেই—বলে কিনা হবে না। কলিমের মুখে প্রায় প্রত্যুত্তর এসে গিয়েছিল—লেজ ধরে দেখলে না, এড়ে কি বক্‌না, আগেই খাল পার হতে বলছো ?—কিন্তু কলিম নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল।

অপরিচিত যুবক দেখেই আক্রাম বুঝে নিয়েছে। তার কাছে প্রায়ই এমনি ভাবে দূর দূরান্তের গাঁ থেকে অনেক জোয়ান ছেলে মন্ত্র নেবার আশায় আসে। আক্রাম গালি দিয়েই চলেছে। তবু কলিম স্থির চাহনি নিয়ে দাঁড়িয়ে। অমন চুপমেরে থাকতে দেখে আক্রাম আরও ক্ষিপ্ত। দাওয়ায় বসে ছিল। যেন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাঁচা পাকা দাড়ি আর বাব্‌রিচুলে ঝাঁকি মেরে মেরে গর্জন করতে থাকে,—যা, বেরিয়ে যা ! ভাগ্, এক্ষুনি ভাগ্...ভাগলি না।

কলিম তবুও স্থির। আক্রামের এবার অশ্লীল ভাষায় গালি। যেন টেনে ছিঁড়ে ফেলে খাবে। কলিম একবার ভাবে, চলে যাবে নাকি ? মাথা ঘুরিয়ে খিড়কির দরজার দিকে একবার নজরও দেয়। পর মুহূর্তে ভাবে,—না ! দেখি না, শেষ পর্যন্ত কি করে। যে গর্জায় সে বোধহয় বর্ষায় না !

এমন সময় আক্রামের বিবি হুকো নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এমন গালাগালিতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু আজ অন্যপক্ষের কোনই সাড়া না পাওয়াতে একটু অবাক। দো-বেড়া কাপড় পরা। ছোট আঁচলে কোন মতে মাথা ঢেকে কলকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে আসছিল। কলিমের শান্ত মুখে দুষ্টুমি চাহনির ওপর নজর পড়তেই ফুঁ থেমে গেছে। আরও অবাক। ......একটু বুঝি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সহসা দ্রুত পায়ে এগিয়ে বুড়োর হাতের তেলোতে থপ্ করে হুঁকোর থেলো বসিয়ে দিয়ে ছোট্ট করে বলল,—আর কেন !!

তারপর ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে রসুইখানার দাওয়ায় কলিমকে বসতে দিল। বসিয়েই একটানা প্রশ্ন করে বৃদ্ধা বিবি,—তুই কোন্ আবাদের ? আম্মা আছে ? মন্তর নিবি ? আম্মা সায় দিল ? কি করে দিল !

কলিম মুখ নিচু করে আস্তে বলে,—না, আমার আম্মা নেই।
—আম্মা নেই! তা বাউলে হতে এলি কোন্ সাহসে?
—বনবিবির দয়ায়। এখন বাউলের দয়া।
—বড্ড বেকাদা নোক রে, বড্ড বেকাদা নোক!
কলিম চুপ হয়ে আছে, বিবিও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাক।
হঠাৎ কলিম মাটির থেকে চোখ তুলে বলল,—আম্মা! একটু পানি দেবে? বড্ড তেষ্টা।
মাতৃসম্বোধনে এবার বুঝি সন্তানহীনা বৃদ্ধা বিবি বিমূঢ়া।—তাই তো!—বলেই প্রায় এক ছুটে সরায় করে একটু গুড় আর এক বদনা পানি নিয়ে আসে।
এদিকে বৃদ্ধ বাউলে নিস্তব্ধ ও নিস্তেজ। বিবির ছোট্ট আবেদনে, না হুঁকোর টানে—তা বলা দুঃসাধ্য। গালাগালি ও আক্রোশের আবেগ থেমে আসে। ঝড়ের উদ্দামের পর ধরিত্রী যেমন শান্ত হয়ে পড়ে। শান্ত হলেই যে তাকে আরেক আবেগে পেয়ে বসবে—যে আবেগে সে বাদায় বিপন্ন মানুষের জন্য নিজের জীবনকে তুচ্ছ করতে দ্বিধা করে না কোনদিন। দেবে না সে সেই আবেগকে প্রশ্রয়। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বারবার হুঁকো টানতে থাকে। কলিমকে হাতে ধরে বিবিকে ভিতর আঙিনা থেকে আসতে দেখামাত্র হুঁকার টানের লয় যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। কলকে বুঝি ফেটে যাবে। না, কলকে ফাটে না—ফাটলো আক্রাম বাউলে। ঝড়ের বেগে বলল,—যা, মঙ্গলবার আসিস্......সেদিন কথা হবে।

* * * * *

কলিম আর দ্বিতীয় কথাটি বলেনি সেদিন। বিবির হাতের মুঠো শিথিল হতেই গুরু ও গুরু-পত্নীকে সেলাম ঠুকে ফিরে এসেছিল। ফিরে এসে শুধু মঙ্গলবার গুনতে থাকে। মঙ্গলবার সে যাবে, কিন্তু খালি হাতে কি করে গুরুর কাছে যাবে! ভাল একটা সিধে নিয়ে যাবার বড় আশা। নতুন একটি ধ: , দাদখানি ধান, আর এক ভাঁড় খেজুর গুড়ও যোগাড় করেছে। খেজুরগাছ এদেশে দুর্লভ। নোনা মাটিতে মিষ্টি ধান হলে কি হবে, এ মাটির মিঠে রস খেজুরগাছ সঞ্চয় করতে অপারগ। ফলে খেজুর গুড় আবাদে দুর্মূল্য। এক ভাঁড় গুড় আর এক ভাঁড় দুধ দিয়ে নিধু শিকারী কলিমের এ-যাত্রা মান রক্ষা করে। কিন্তু সুফলা বাঙলা দেশে কোন সামাজিক পর্ব, পালন বা উৎসবে ফল ছাড়া সিধে হয় না। একে নোনা দেশে ফল পাওয়া দায়, তাতে আবার শীতকাল। ফলের তল্লাসে মঠবাড়ির পূব-পল্লীর সীমানায় কলিম হাজির।
পূব ভেড়ির মাঝামাঝি বড় আল্ বা ক্রস্-ছিলা। ক্ষেতের মাঝ দিয়ে টানা এসে পশ্চিম ভেড়িতে মিশেছে। এই ক্রস্-ছিলার পাশেই লায়লার ঘর। লায়লার বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ। একাই এ বাড়িতে থাকে। পুত্র-হারা মা সে। আঁতুড় ঘর থেকেই তাকে শূন্য কোলে বেরুতে হয়েছিল। এই শূন্যতা তখন লায়লাকে পেয়ে বসে। দেহের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে এক দ্বৈত জীবনের আগমন বার্তায় লায়লার মনে কত স্বপ্নসৌধই না জানি গড়ে উঠেছিল পলে পলে গত ন'মাস ধরে। সবই যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল। অন্য নারী হলে কি হতো কে জানে, কিন্তু লায়লাকে এই শূন্যতা কঠিন করে তোলে। স্পর্শকাতরতা নারীর এক মহাসম্পদ—যার অভিব্যক্তি তার চোখে, মুখে ও অঙ্গ সম্বরণে অহরহ প্রতিফলিত হয়। সন্তান-হারা লায়লার মাতৃহৃদয় যেন সেই স্পর্শকাতরতা হারিয়ে ফেলে। যার দিকেই

দৃষ্টিপাত করুক না কেন, সে পুরুষ হোক আর নারী হোক—লায়লা বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়েই থাকে। নিঃসঙ্কোচে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সে দৃষ্টিতে কোন উন্মনা ভাব থাকত না। সন্তানের জন্ম ও মৃত্যুতে বুঝি জীবনের আনাগোনা নিয়ে এক বৈরাগ্যের অনুভূতি দেখা দিয়েছে। লায়লার চোখের চাহনিতে ছিল তারই পরিচয়

এরই কিছুদিন পরে আর এক মৃত্যুতে লায়লার বাহ্যিক কাঠিন্যে পরিবর্তন আসে। সোয়ামী ছাদেক আলি একদিন বিনা আড়ম্বরে বনে কাঠ কাটতে ওঠে। সঙ্গীরা সাতদিন পরে বাঘের হাতে ছাদেকের মৃত্যু সংবাদ তেমনি বিনা আড়ম্বরেই পৌঁছে দেয় লায়লার কাছে।

এবার শুধু মনের শূন্যতাই নয়, বাইরের শূন্যতাও লায়লাকে চেপে ধরে। সংসারে তার কেউ রইল না—সে একা। তাই সে এর থেকে বাঁচবার জন্য যেন সকলের হয়ে উঠতে চায়। সকলকে জড়িয়ে যেন এই শূন্যতা পূর্ণ করে রাখতে চায়। সকলেও তাকে বুঝি আশ্রয়পুষ্ট করে রাখতে চাইল। আপদে ও বিপদে, আনন্দে ও উৎসবে লায়লাকে ডাক দেয় সকলে। কাজ না থাকলেও, কাজের অছিলায় মঠবাড়ির প্রতি ঘরে তার আমন্ত্রণ ও আগমন যেন লেগেই আছে। বলতে গেলে, লায়লা ইতিমধ্যে সকলের হয়ে উঠেছে।

ফলের খোঁজে পুব-ভেড়ির সীমানায় এসে সেদিন কলিমের বোধহয় লায়লার সঙ্গে প্রথম আলাপ। এর আগে অবশ্য কাজে-অকাজে লায়লার সঙ্গে দেখা হয়েছে, বা দু-একটা কথাও হয়েছে ; কিন্তু তাকে আলাপ বলা চলে না। ভেড়ির পাশ দিয়ে যেতেই দূর থেকে লায়লার উঠানে মাচায় পুষ্ট লাউগুলি ঝুলতে দেখে কলিম এগিয়ে আসে। কিন্তু লাউয়ের কথা পাড়বে কি করে তাই তার সমস্যা।

খিড়কি-দরজার হুড়্কো খুলতে খুলতে কলিম বলল,—ঠাগ্‌রোন, অমন ফলবতী কদুগাছে একটা কালো হাড়ির মুখও রাখোনি! নেক্ নজর পড়বে যে!

মুরগীর বাচ্চাগুলিকে লায়লা লঙ্কার বীচি খুলে খুলে খাওয়াচ্ছিল। চিলের ছোঁর ভয়ে দাওয়ায় বসেছে। কলিমের আওয়াজ পেতেই আলগা আঁচল জড়িয়ে নিয়ে উঠানে নেমে এলো। বলল—কালো হাড়ি ঝোলাতে হবে কেন! আমারই মুখ তো কালো হাড়ি!—বলেই সশব্দে হেসে উঠল।

কলিম এমন চোখা উত্তর আশা করেনি। তার ঠোঁটে ঠাট্টার হাসি মিলিয়ে যাবার মত। সামলে নিয়ে বলল,—না! তাতে কিন্তু মানাবে না।

লায়লা হাসি না থামিয়েই বলে,—কেন, নেক নজরে পড়েছে নাকি! দরকার নেই নেক নজরের, তুমি একটা কদু নিয়েই যাও না। কি হবে আমার এতো কদু!

কলিম এবার লজ্জা পেয়ে মনের কথা পাড়ে—জানো তো, ঘর বাঁধতে দড়ি, বিয়ে করতে কড়ি। আমার হয়েছে গিয়ে তাই। গুরুকে সিধে দেব, তাই ফল খুঁজে খুঁজে মরছি।

—অবশেষে কনের কাছে কড়ি।......আর না মেলে তা গলায় দড়ি! তাই তো?

—তা তুমি তো বেশ ফকির-মান্‌ষের বোল শিখেছো! রগড় না ঠাগ্‌রোন্, একটা চাই-ই আজ। তা না হলে গুরুর কাছে যাই কি করে বলো!

গুরুর কথা উঠতেই একের পর এক প্রশ্ন করে লায়লা কলিমের আদ্যোপান্ত কাহিনী জেনে নিল। যাবার বেলা কলিমের হাতে একটার বদলে দুটো কচি লাউ কেটে দিয়ে বলল,—আচ্ছা, বাউলে!......

—না, না, আমি এখনও বাউলে হইনি।

—বেশ না হয়েছ! আচ্ছা তোমার গুরু বিবিদের বাউলে মন্তর দেয়?

—বিবিদের !—কলিম হতভম্ব।

কেন, বিবিরা কি দোষ করল ? তোমার বনবিবি বুঝি বিবি না ?······কি, সায় দিচ্ছ না যে !

কলিম সায় দেবে কি ! থতমত খেয়ে গেছে। পরাজয়ের হাসি এনে বলল,—ঠাগ্‌রোন, তোমার সঙ্গে পারা যাবে না !······

লায়লা বোধহয় এতেই খুশি। খিড়কি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল,—যাও বাউলে,······যাও বাউলে, ভালোয় ভালোয় মন্তর নিয়ে এসো।

এবার বুঝি 'বাউলে' ডাকের প্রতিবাদ করতে কলিমের মন চায় না।

পাঁচ

পরদিন শুকতারা থাকতেই খুব ভোরে কলিম উঠেছে। এক কাছারি ছাড়া মঠবাড়িতে কোনও বড় পুকুর না থাকলেও অনেক বাড়িতে ডোবা আছে। সাধারণত ডোবার জলে সকলে গোছল সারলেও আজ কলিমের বদ্ধ জলে শুদ্ধ হতে ইচ্ছা হয় না। নদীর পলিমাটি সিক্ত স্রোতের জলে অবগাহন করে নিয়ে যাত্রা করল।

সিধে মাথায় করে কলিম আক্রাম বাওয়ালির বাড়ি হাজির। সিধে দেখতেই আক্রামের মনে হলো, তার অনুমান মিথ্যা না,—এ বান্দা ছাড়বার পাত্র নয়।

আজ কিন্তু আক্রামের সেদিনের রূপ নেই। প্রথম থেকেই কলিমকে সাগ্রহে বসিয়ে কথা পাড়ল,—তোর বাউলে ফকির হবার শখ্ কেন রে ?

কলিম একটু নড়ে বসে আট হাতি কাপড়ের কোণা টেনে হাটু ঢাকবার চেষ্টা করতে করতে বলল,—বড় গাছে কাছি বাঁধাই ঠিক বলে মনে হলো !

—বড় গাছ না হয় হলো, সে কথা বলছি না। কাছি বাঁধবার শখ্ কেন ?

—কি জানো গুরু ! পড়লো ফাগুন তো উঠলো আগুন ! আমার গিয়ে তাই হয়েছে। কি ফেরে যে সেদিন বনে গিয়েছি·..ম, তারপর থেকেই যেন মন মজে আছে। বারবার ঐ এক কথাই মনে আসে।

সুযোগ পেয়ে কলিম একে একে সেদিনের সব খুঁটিনাটি ঘটনাই বলল।

কাহিনী শুনে আক্রাম চুপ হয়ে গেছে। একে তো-মনে মনে প্রায় ঠিক করেই ফেলেছিল, তার ওপর এই অদ্ভুত ঘটনা তাকে আরও আকৃষ্ট করে। কলিমকে যেন তখনই তার মনের মত শিষ্য বলেই গ্রহণ করল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ইতিমধ্যে আক্রামের বিবি কাছে এসে বসেছে। কলিমের কাহিনী শুনতে শুনতে সংসারের সকাল বেলার অগুনতি কাজের ফর্দ ভুলেই গেছে। তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে ফকিরের মুখের দিকে—এইবার নিশ্চয়ই ফকির সায় দেবে।

সায় দিলো আক্রাম। হঠাৎ অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি ভাবে বলল,—পরীক্ষা দিতে পারবি ? এক পরীক্ষা তো তোর হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে পরীক্ষা দিতে হবে। বল্, পারবি ?

কলিমের কণ্ঠে দৃঢ় অথচ শান্ত সুর,—কিসের পরীক্ষা, গুরু ?

—কিসের পরীক্ষা ! বল্, কোথায় তোর সব থেকে ভয় লাগে ?

কি উত্তর দেবে সহসা ভেবে না পেয়ে, প্রথমেই যা মনে পড়ে কলিম তাই বলে ফেললো,—কাছারি বাড়ি।

—ধুত্, কাছারি বাড়ির কথা কে বলেছে ? বনে,···বনে তোর কোথায় তরাস্ লাগে ?
ধমক খেয়ে চোখ বুঁজে ত্রাসের কথা ভাবতে ভাবতে কলিম বলল,—বনের তরাসের কথা বলছ ? আমি ঠাহর পাইনি, কিন্তু বাঘ আমার ঠাহর পেয়েছে, এমন কথা মনে হলেই তরাসে বুক শুকিয়ে যায়।

ফকির-বিবি উৎকণ্ঠিত। এই ধরনের ধমক ও জেরার তোড়ে অনেক জোয়ান ছেলেকে বিমুখ হয়ে যেতে সে দেখেছে। ভাবে, ফকিরের ধমক্ এবার বুঝি বা চরমে উঠবে।

কলিমের উত্তর শুনে ফকির কিন্তু চুপ। কি জানি কি বুঝে ফেলে এক নজরে তাকিয়ে রইল কলিমের চোখে চোখে। কলিমও পরীক্ষার প্রতীক্ষায় তাকিয়ে আছে সমভাবে। চোখে চোখ রেখেই ফকির হঠাৎ হেসে ফেলল। দাড়ি গোঁফের আড়ালেও সে হাসি বড় মিষ্টি লাগে।

বিবির দিকে ফিরে ফকির ইঙ্গিত করে অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য। নিয়মমত বদ্ধ ঘরে ধূপ-ধুনোর মধ্যে জলচৌকিতে বসে ফকির কলিমকে দুটি ছড়া মুখস্থ করিয়ে বলল,—এ কিন্তু আসল মন্ত্র নয় ; আসল মন্ত্র এখানে আবাদে হয় না। বনবিবির মন্ত্র বাদায় দাঁড়িয়ে নিতে হবে। দেরি আছে তার। পাঁচ বছর। এই পাঁচ সন যখন যেখানেই থাকিস্ না কেন, ডাকলেই আমার সঙ্গে বাদায় যেতে হবে। হ্যাঁ, আরেকটা কিরে আছে—এখন থেকে দশ বছর বিয়ে-সাধি মানা কিন্তু। কোন কারণেই এর নড়চড় হবে না।

অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হতেই ফকির-বিবি যেন মুখরা। হাঁকডাক, ছুটাছুটি করে একাই যেন বাড়ি মাৎ করে তুলতে চায়। খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হতে বেশ দেরিই হলো। এটা-ওটা রান্না না করে বিবি থামতেই চায়নি। কলিমের মজাই লাগে, তাকেই সামনে রেখে এত আয়োজন ও ঘটা।

খাওয়া-দাওয়ার পর আক্রাম ও কলিম দাওয়ায় অলসভাবে বসে আছে। আক্রাম তামাক টানতে-টানতে প্রশ্ন করল,—আচ্ছা, তুই বলছিলি, কাছারি বাড়ি ; সেখানে ভয় পাবার তোর কি হলো ?

—ওঃ, ফকির, সেই কথাটা তুমি এখনও মনে রেখেছ ! কি জানো, মিত্তির জমিদারের কাছারি, আমাদের মঠবাড়ির কাছারি। তখন পোলাবান, বা'জানও বেঁচে। তার সঙ্গে একবার কাছারি যাই। গিয়ে দেখি কি, বুড়ো নুরুল গাজিকে তুরুং ঠুকেছে। গাজি এখন আর বেঁচে নেই। সেদিন ভাদ্র মাসের কাঠফাটা রোদ। দেবতা মাথার ওপর। দুটো এ-ই মোটা গরাণ খুঁটিতে চার-হাত-পা টান্‌টান্ করে বেঁধে খলেনে চিৎ করে ফেলে রেখেছে। চুপচাপ পড়ে আছে। বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে, আর বুকের পাঁজরা বেয়ে দর্‌দর্ ঘাম ঝরছে।

ফকির সশব্দে হেসে উঠে বলল,—আর তোর বুঝি সেই থেকে ভয় !

খানিকটা হুঁকো টেনে আবার প্রশ্ন করল,—গাজিকে তুরুং ঠুকতে কেন গেল রে ?

—আর বলো না ! যাকেই জিজ্ঞাসা করি, মালেকের ভয়ে কেউ কিছু বলে না। পরে সব জেনেছি। কি আর হবে ! জানই তো চাষার মুখ, না আখার মুখ। আশ্বিন মাস অবধি হিসেব করে নায়েব ধান কর্জ দিয়েছিল। গাজি তো ভাদ্দর না পড়তেই তা কাবার করেছে। পেটে না খেয়ে মাঠে খাটবে কি করে ! তাই গাজি কথার পিঠে কথা শুনিয়ে দেয়—পারব না বেগার খাটতে, খেতে না দিলে। কিন্তু নায়েব তা শুনবে কেন ! আমি কিন্তু তখন আর কোনদিনও কাছারি মুখো হইনি। ওর ধারে কাছে গেলেই যেন বুক দুরদুর করতো।

—আর বাঘ দেখলে ?

—তা যা বলেছ ! কি জানো গুরু, শুনেছি, বাঘেরও চক্ষুলজ্জা আছে ; কাছারির যে তাও

নেই !

কথায় কথায় সময় কেটে যায়। দেবতা পশ্চিমে ঢলে পড়ে। কলিম ধীরে ধীরে সেদিনের মত বিদায় নিল। বৃদ্ধা বিবি বুঝি বিদায় দিতে পেরে ওঠে না। কলিমের পিঠপিঠ খিড়কি ছাড়িয়ে আনমনে রাস্তায় এসে গেছে। কাণ্ড দেখে কলিম ফিরে আসে কয়েক কদম। এগিয়ে এসে বলে,—যাও আম্মা, মিছে মায়া বাড়িও না!—বলেই দ্রুতপায়ে গড় গাঁয়ের পুরানো ঝোপঝাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল। আড়ালে গেলে বুঝি নিজের আবেগ রুদ্ধ করতে সক্ষম হয়।

আজও অবধি কলিম সেদিনের কথা ভুলতে পারেনি। গড় গাঁ থেকে মঠবাড়ি পর্যন্ত সেদিন যেন নিমেষে চলে এসেছিলো। বাড়ি পৌঁছান অবধি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে। মুগ্ধ হয়ে থাকার মত এই কদিনের মধ্যে অনেক ঘটনাই তো ঘটেছে। ফকিরের পরীক্ষা ও সম্মতি, শিষ্য হবার আশীর্বাদ, নতুন এক জীবনে পদার্পণ, যার শুরু হলো সেদিন এক কঠিন শপথের মধ্য দিয়ে,—না, এ সব নয়। এ সব ছাড়িয়েও যেন এক অজ্ঞেয় অনুভূতিতে তার মন আপ্লুত। নিজে সে এতক্ষণ ধরতে পারেনি। গাঁয়ে ফিরে নিজের বাড়ির উঠানে আসতেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতে চোখ দিয়ে তার দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

শৈশবের মাতৃস্মৃতি বিজড়িত আঙিনায় আসতেই ফকির-বিবির ছবি যেন তার চোখের উপর স্পষ্ট ভেসে ওঠে!

ছয়

কলিম মাতৃহারা। শৈশবেই সে মাকে হারিয়েছিল। সংসার রক্ষা করতে বা'জান তখন নির্ঝঞ্ঝাট ফুফুকে নিয়ে আসে। ঠিক নির্ঝঞ্ঝাট ছিল না। সঙ্গে তার ছোট একটি ছ-সাত বছরের মেয়ে—আমিনা। ফুফুর নিজের মেয়ে নয়। নারী হৃদয়ের কোমলতাকে পুষ্ট রাখবার জন্য এক মাতৃহারা শিশুকন্যাকে ফুফু আশ্রয় করেছিল।

ফুফুর ইচ্ছা ছিল, কলিম বড় হতেই এ সংসারে মায়া ছেড়ে নিজের বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু তা আর যেতে হলো না। কলিমের বাজান কবর নিতেই ফুফু যেন এই আঙিনার মাটির সঙ্গে আরও জড়িয়ে পড়ল।

আবাদের অন্য সব বাড়ির মতই কলিমের বাড়ি নদীর কিনারায় ভেড়ির কোলে। তাছাড়া উপায়ও নেই। প্রতি আবাদে ভেড়ি থেকে একশ হাত গেলেই 'নামো'। ঢালু হয়ে চাষের ক্ষেতের সমতলে বিস্তৃত। এই ক্ষেত চলতে থাকে এক একটি আবাদের অরেক সীমানা পর্যন্ত। সেখানে আবার একশ বা দুশ হাত ক্রমে উঁচু হয়ে আর এক নদীর কিনারায় পৌঁছে। এই ভূমি গঠনে মানুষের কোনও হাত নেই। মঠবাড়ির অধিবাসীদেরও কোন হাত ছিল না। মানুষের হাতে গড়া ভেড়ির বাঁধনে আটক পড়ার আগে প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় গাঙ্গেয় পলিমাটি ভারাক্রান্ত নদীর জল উপছে পড়ত চারিদিকে। নদীর গতির বেগ থেকে সরে আসতেই রাশি রাশি পলিমাটি প্রথমেই ঝরে পড়ে নদীর কিনারায়। ধীরে ধীরে নদীর তীর গেথে ওঠে উঁচু হয়ে। পাশাপাশি নদ ও নদীর এই গাথুনির বহুবন্ধনে তখন নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ জলা ক্ষেত। গাঙ্গেয় অববাহিকায় এই প্রাকৃতিক নিয়ম চলে এসেছে আবহমান কাল। তারপর সংগ্রামী মানুষের বাহুবলে তৈরি নদীতীর বরাবর ভেড়ির বাঁধনে বন্দিনী হয় অনুর্বরা জলসিক্ত ভূমি। মানুষের তাগিদে তাকে যে ফলবতী হতেই

হবে।

মঠবাড়ির বসতিগুলি ভেড়ির কোল ধরে এই একশ হাতের মধ্যে এক সার বেঁধে চলে গেছে বরাবর। এরই মধ্যে সামান্য একটু আঙিনা আর তিনখানা দোচালা নিয়ে কলিমের ঘর। এ ছাড়া কলিমের সম্পত্তি বলতে আছে বিঘে পাঁচেক ধানীজমি আর একখানা পঁচিশ হাতি ডিঙি।

মঠবাড়ির ফলন ভালই। খুব ভাল ফসল হলে বিঘে প্রতি এক বিশ ধান হয়। অবশ্য তেমন ধান হওয়া কালে-ভদ্রের কথা। কলিমের খণ্ড জমিটুকু নাবাল। ফলে ভেড়ির ঘোঘা দিয়ে নোনা জল চুইয়ে এলে ফলন কমে আসে। ভেড়ি হাজার শক্ত-পোক্ত করলেও অমন নোনা জল চুইয়ে একটু আধটু আসেই।

এদের ধানের হিসাবের সঙ্গে জীবনের সোজা যোগ আছে। একশ ষাট পালিতে এক বিশ ধান হয়। ভাল এক বিঘা জমি ধান দেয় এক বিশ। আবার বছরে একজনের খোরাকিও এক বিশ। এই হিসাবে কলিমের আড়াই বা তিন বিশ ধান যা হতো, তাতে কোনমতে খোরাকির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু শুধু খোরাকিতে তো দিন্ কাটে না। বাড়তি খরচ আছেই। তারই ভরসা ডিঙিখানা। ভাটি দেশে ডিঙি থাকলে খুচ্‌খাচ্ আয়ের অভাব নেই। সুন্দরবনের সম্পদ অঢেল। কাঠ, মাছ, গোলপাতা, মধু, আরও যে কত কিছু তার ইয়ত্তা নেই। ডিঙি থাকলে সুন্দরবন চরে খাওয়া যায়। এখানে অধিকাংশই ভাগ-চাষী। জমি না থাকলেও এরা একখানা ডিঙি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

কলিমের কিন্তু বাড়তি আয়ের দিকে বিশেষ মন নেই। করে না যে তা নয়, তবে উদ্যোগ নেই। এখন তো আরও নেই। রাতদিন পাঁচ বছরের হিসাব করে। তিন বছর হয়ে গেল, আক্রামের কোনও ডাক বিশেষ আসে না। তবুও কলিম ঐ নিয়েই মশগুল। না হয়েই বা উপায় কি! বাওয়ালি পুরো না হলেও—পাড়াপড়শী ইতিমধ্যেই বাউলে নাম দিয়েছে। শুধু তাই নয়। তাদের অসুখে বিসুখে কলিমের ডাক। বাঘের যখন মন্তর জানে—ঝাড়-ফুঁকের মন্তর অজানা থাকবে কেন! লোকের বিশ্বাস দেখে কলিম মুচকি হাসলেও, অন্তরালে আত্মহারা হয়ে পড়ে ওদের ডাকে। ভাবে ওদের যখন অতই বিশ্বাস, হয়ত কাজ দিতে পারে।

ফুফু একদিন কলিমকে কাছে ডেকে বসিয়ে বলে,—তুই তো এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে বেড়াস, বাড়তি কিছু আয়-টায় কর না? না হলে তো চলে না।

—কই, বেশ তো চলে যাচ্ছে! তুমি থাকতে আমার লাও কখনও চড়ায় উঠবে না, ফুফু!

—না, না, ওরকম করিস্ না। পোষ মাস তো এলো। আর কিছু না করিস, দালালগিরিও তো করতে পারিস। ঠিক তুই কথা বেচে আয় করতে পারবি। দেখ না একবার?

—ছাগল দিয়ে মাড়াই হলে কি কেউ গরুর খোঁজ করবে? আমাকে নেবে কেন।

—নে, আর বকিস্ না। বোল-ই শিখেছিস্। বিয়ে-সাদি করলি না, বুঝবি কি?

কলিম পাশ কাটাল। কাটালে কি হবে, কথাটা ওর মনে লেগেছে। এমনিতে কাজ-কর্ম সহসা করতে না চাইলেও যখন মনে ধরে তখন গতর-খাটিয়ে প্রাণ-মন লাগিয়ে কাজ করবে। সে-কাজে সে সবার সেরা হবেই হবে। ওর কেমন যেন জিদ এসে যায়।

ধান পাকলে যেমন ঘুঘুর ঝাঁক আসতে থাকে। তেমনি ভাটি বাঙলায় ধান কাটতে শুরু হলে দেশ বিদেশের ব্যাপারীর নৌকা আসতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে। এক ফসলা দেশ। সারা

বছরের দেন্‌-দায়িক পরিশোধ করতে হবে এই এক মরশুমে। তাই এদেশের মানুষ ধান উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বেচবার জন্য আকুল। পৌষ মাস থেকেই যেন বিকি-কিনির ধুম পড়ে যায়।

বিদেশী ব্যাপারীর দল এখানে এসে পড়ে মুশকিলে। বিদেশ বিভূঁই, তাতে সুন্দরবনের নির্জন ও বিপদসঙ্কুল নদীপথ। স্থানীয় লোকের সাহায্য চাই—তাতে যেমন তারা খানিকটা আশ্রয় পায়, তেমনি খোঁজও পায় কোথায় কি ধান আছে। তাছাড়া, দেশী লোকের মারফৎ দাম দস্তুর করাও সোজা। তাই তারা কয়াল বা দালালের উপর নির্ভর করে। গাঁয়ের লোকেরাও, চেনাশুনা দালালের মারফৎ নিশ্চিন্তে ধান বিক্রী করতেও চায়। দালালের দস্তুরিতে কোন পক্ষই ক্ষুণ্ণ হয় না।

কলিম এক ব্যাপারীকে ধরল। বেশ বড় ব্যাপারী, আড়াই হাজারি নৌকা। ব্যাপারী এর মধ্যেই কলিমের প্রতিপত্তির কথা শুনেছে। বুঝে ফেলেছে, তাকে দিয়েই কাজ হবে। বড় ব্যাপারীদের সর্বদা লক্ষ্য কত তাড়াতাড়ি নৌকা বোঝাই করে ক্ষেপ দিতে পারে। ধান কিনতেই যদি মাস কেটে যায়—তাহলে খাই-খরচা ও নৌকা-ভাড়ায় পোষায় না, তা দালাল পালির মাপ যতই টেনে করুক।

ব্যাপারী কলিমকে নৌকায় এনে আদর যত্ন করে বসিয়ে বলল,—বসো, বসো ফকির, পান-তামুক খাও। তুমি তো আবার ফকির মানুষ, পান-তামুক খেতে আপত্তি নেই তো!

—নোনা দেশে পান-তামুকই তো পানি। ফকির হয়েছি বলে তো পানি খাওয়া বাদ দিইনি।

—তা বেশ বাউলে! দস্তুরি তো যা পাবার পাবে, কিন্তু তোমার……

—নেও, তা আর বলতে হবে না। শলায় কত চাও—দুই পালি, তিন পালি, চার পালি…

—না, না, তা বলছি না। আমরা তো তোমাদের পালি বুঝি না। আমরা কাটায় মেপে নেবো। গড়ে বিশ প্রতি বারো মণ ধান উঠলেই আমরা খুশি।

চল্লিশ পালিতে এক শলা, আর চার শলায় এক বিশ। দালালদের কেরামতি চলে—চল্লিশ পালি মাপবে সবার চোখের সামনে, কিন্তু ঠিকমত মাপলে হবে দুই বা তিন পালি বেশি। ধানের রাশিতে পালি কে কতটা ঘুরিয়ে বসাতে পারে, তারই কায়দায় এমন অঘটন ঘটে। কলিম ব্যাপারীর সামনেই পালি বসাবার কায়দা দেখিয়ে দেয়। দেখাতে দেখাতে বলে,—ব্যাপারী, তোমরা তো জানো হালের মোচড় দিতে, পালির মোচড় আমাদের হাতে। তোমরা তার কতটুকু বুঝবে! আর দালালি মানে তো ঘটকালি। ঘটকালি করতে গিয়ে নিজে নিশ্চয় বিয়ে করে বসবো না!

ব্যাপারী হো হো করে হেসে উঠে বলল,—সাবাস্‌ ফকির! না, না, তা বলছি না। আমি তো কাটায় মেপেই খোলজাত করব।

—তা তো নিশ্চয়। গোনা গরু বাঘে খায় না। কাটা গুণে তারপর আমার হিসেব দিও।

ব্যাপারী কথায় ভুলতে চায় না; কলিমকে বাজিয়ে নিতে চায়,—তা নয় হলো! কিন্তু তুমি তো নতুন ফকির-বাউলে মানুষ, গেরস্তকে মিথ্যা বলে ভোলাবে কি করে?

—বিস্‌মোল্লা! মিথ্যা বলতে যাব কেন? ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির কি মিথ্যা বলেছিলো কোনও দিন! তুমিই বলো, ধম্মের জয় হলো, না অধম্মের জয় হলো।

ব্যাপারীর মাথা এবার ঘুলিয়ে যায়। বলে,—তা বেশ, কাল থেকে কাজে লেগে যাও।

কলিম কাজে লেগে গেছে। এ-বাড়ি সে-বাড়ি থেকে ধান তুলছে তো তুলছে। ফকির দেখে সহজেই গেরস্তরা ধান ছেড়ে দেয়। নৌকা বোঝাই সহজেই হতে থাকে। কিন্তু

ব্যাপারীর মুখ কালো হয়ে আসে। ব্যাপারীর লাভের হিসাব। শুধু কথায় চিড়া ভিজবে কেন ? কলিমও ভাবগতিক দেখে চিন্তিত। শুধু বলে—দাঁড়াও বড়মেঞা, পুষিয়ে দেব। বলে অবশ্য, কিন্তু কীভাবে পোষাবে, নিজেই ভেবে পায় না। যে খলেনেই বসুক না কেন—বেচারাম, শিবে মোড়ল, আছির গাজী, মুকসুদ মেঞা বা গায়েন মোড়লের খলেন হোক না কেন, প্রথমেই কলিমের মনে থাকে ব্যাপারীকে এবার খুশি করবেই। আরে লাভে লাভ, লাভে দুই-ই, লাভে তি-ন, লাভে চা-র—গানের সুরে সে মাপ সুরু করে। ধান টানতেও থাকে অঢেল। এক শলা, দুই শলা মাপার পর ধানের কুড়ো ছড়িয়ে পড়ে নাকে মুখে। মাংসল চোখ দুটো পিট্‌পিট্ করে তির্যক রোদে। ধানের গন্ধে যেন তার মায়া জাগে। এক মনে নিচের দিকে তাকিয়ে মাপ শুরু করেছিলো। কতক্ষণ আর ও-ভাবে মুখ নিচু করে রাখা যায়। গেরস্তের চোখে চোখ পড়ে। পালি ভারি মনে হয় কলিমের। যেন আর ঘুরিয়ে বসাতে পারে না। বসায়ও না। ব্যাপারী গলা খাঁকার দেয়। কলিম আবার পালি ঘোরায়। কিন্তু বাঁ হাতে ধান টানবার আগেই ঘোরায়। তাতে ব্যাপারীর বস্তা ভারি হতে চায় না।

টাকা লেন-দেনের পর কলিম নৌকায় গেলে ব্যাপারী বলে,—কই ফকির ! বিশে মাত্র এগারো মণ উঠেছে !—ব্যাপারী ইচ্ছে করে বেশি কমিয়ে বলে।

কলিম ঝড়ে ছেঁড়া পালের মত মুখ নিয়ে বলে,—আরে, জোয়ার-ভাঁটা ! সব কাজেই জোয়ার-ভাঁটা আছে !

—দেখো যেন, শেষ পর্যন্ত ভাঁটোতে সমুদ্দুরে না পড়ি !

আশপাশের ছোট-খাট খলেনের ধান মোটামুটি উঠেছে। কিন্তু এতে পোষায় না। মঠবাড়ির কাছারির ধানের বড় বড় রাশ দেখলেই যে-কোন দালালের মাপতে ইচ্ছে করবে। কলিমেরও সেদিকে লক্ষ্য আছে। নিধু শিকারিকে দিয়ে ইতিমধ্যে কাছারিতে কথা পাড়িয়েছে। অবশ্য আকারে-ইঙ্গিতে। কাছারির ধানের সুলুক-সন্ধানও সে কলিমকে এনে দিয়েছে।

মঠবাড়িতে মিত্তিরদের এই কাছারির নায়েব প্রভাংশু হালদার। এখানকার লোকেরা অতো কড়া উচ্চারণের ধার ধারে না। এরা বলে, পেরভাস নায়েব। পেরভাস নায়েব নায়েবই। নিধু মোড়লের কথায় নয়, নায়েব ইতিমধ্যে ধান বেচবার খবরা-খবর নিয়েছেন, কলিম যে ব্যাপারীর কোলে ঝোল টানছে না, সে খবর তার অজানা নেই। তাছাড়া নায়েবরা বড় ব্যাপারীই খোঁজে। ঝটপট যা বিক্রি করবার করে নিতে চায়। ঢিমেতালে বিক্রি করা মানে টাকা নিয়ে এদেশে বসে থাকা। অতো টাকা নিয়ে বসে থাকতে ওদের প্রাণের ভয়, তা যতই পাইক বরকন্দাজ থাকুক। দেশটা সুন্দরবন।

কলিম ব্যপরীকে ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে,—খবরদার, কাছারিতে তুমি নিজে কোনও কথা পাড়বে না, যা বলব তাতেই সায় দেবে।

কলিম কাছারি এসেই এদেশের প্রথা মত হাত বাড়িয়ে নায়েবের আশীর্বাদ চাইল,—আ···শে, বাবু।

—কি সমাচার ? এসো কলিম।

ছোট একখানা চৌকি টেনে নিয়ে বসতে বসতে কলিম বলল,—আর বলেন কেন বাবু, গরু নেই তো বলদ দুয়ে দে !

—কেন, আমি বলদ হলাম নাকি ?

কলিম জিভে কামড় দেয়,—ছিঃ বাবু, তা বলতে যাব কেন ! ব্যাপারী বলে, তাকে বারো মণ, চোদ্দ মণ হিসেবে দিতে হবে। এ গের্দে এবার ধানই হলো দশ-মণি, তা আমি

কোত্থেকে বারো মণের বুঝ দিই ?

নায়েব ব্যাপারীকে লোভ দেখাতে চায়, দামের পড়তাও তুলতে চায়,—না ব্যাপারী, আমার ক্ষেতের ধান এগারো-মণি হবে। বারো-মণিও হতে পারে। দেখতে চাও দেখে নাও।

কথার চালাচালি হয়ে যাবার পর কলিম ধানের রাশ ভাল করে দেখে নিল। সন্ধ্যার দিকে চুপিচুপি এসে বলল,—নায়েব মশায়, দরাদরি তো আপনার পছন্দ হয়েছে, এবার আমি বলি, দেরি করবেন না। দেবতার অবস্থা ভাল দেখছি না। পূর্ণিমাও সামনে। বৃষ্টি হলে সব একাকার হয়ে যাবে। যা গোলাজাত করবার তা কালকের মধ্যে শেষ করুন ; আর যা বেচবার আমি কালই বেচে দিই। আরও বলি কি, যে-রাশ বেশি রোদ খেয়েছে সেগুলিই গোলাজাত করুন, নয়ত গুমে যেতে পারে।

কলিম মিথ্যা বলেনি। ধুরন্ধর পেরভাসবাবু কলিমের মতলবও বুঝলেন। রোদ খাওয়া ধানে বারো মণের বুঝ দেওয়া দুরূহ। বারান্দা থেকে নেমে এসে আকাশের তুলো পেঁজা মেঘ দেখে দেখে বললেন,—তুমি ঠিক বলেছ ফকির ! আমারও তো খেয়াল ছিল না পূর্ণিমা সামনেই। তোমাদের দেশে তো চল্লিশ মাইলের মধ্যে একখানা খবরের কাগজ নেই। আমার কি খেয়াল থাকে।...দেখো, জমিদার বাবু কিন্তু ঠিক খেয়াল করেছে। কলকাতায় থাকে তো, আবহাওয়া অফিস থেকে ঠিক বিষ্টির খবর নিয়েছে। তাই চিঠির পর চিঠি দিয়ে টাকার তাগিদ। তোমরা যা ভাব তা নয়—শুধু ফুর্তির নেশায় টাকার তাগিদ নয়। হাজার হলেও গায়ে জমিদারি রক্ত তো !

পরদিন কলিম পালি হাতে ঠিকমত হাজির। পছন্দ করা রাশগুলিই ধরেছে। মেপে গেলে বারো মণ হিসেব আসবেই।

তিন বিশ মাপা হয়ে গেছে। গায়ে ঘাম দেখা দেবার মত। ধানের কুড়োতে কলিমের কালো ভ্রূ সাদা হয়ে উঠেছে। ঘোড়া ঘামলে তবে তার পূর্ণ বেগ আসে। কলিমেরও যেন তাই। তামাক খেতে উঠেছিল পিঁড়ি ছেড়ে। হুঁকোয় বড় এক টান দিয়ে কোমর থেকে গামছা খুলে মাথায় ফেটা বাঁধল : ফেটায় পেখম ঝুলে পড়ে কানের পাশ দিয়ে। কলিম এ এক নতুনরূপে বেপরোয়া। এই কাছারিতে এই ধানের রাশগুলির কাছেই সে না একদিন নুরুল গাজির তুরুং ঢোকা দেখেছিলো ! কলিম প্রতিশোধ নিতে চায় যেন। বাঘের মত চোখ গোলগোল করে তার বেটে গর্দান জোরে বেঁকিয়ে তাকাল ধানের রাশিগুলির দিকে। ইচ্ছে করেই সে চোখ ফেরাল না অন্য কোনও চোখের দিকে। পাছে তার চোখকে কেউ চিনতে পারে। রাশির মধ্যে পালি বসিয়ে দাঁতে দাঁত কামড়িয়ে গুণতে লাগে— লাভে লাভ, লাভে লাভ ; লাভে দুই, লাভে দুই ; লাভে তিন, লাভে তিন......

তিন দিন ধরে ধান উঠল নৌকায়। নৌকা বোঝাই। ব্যাপারী মহাখুশি। চৌদ্দো মণ হিসেবে ধান উঠেছে এবার।

সাত

এবারের মত ব্যাপারী খুশি হলো বটে। কলিম ভাবে,—ধূত্, এ অপকম্ম আমার দ্বারা হবে না। পালি হাতে করলেই দুই ধান্দা। শ্যাম রাখি, না কুল রাখি। এ কাজ আমার দ্বারা হবে না।

গাছি যেমন করে তার খেজুর গুড়ের ভাঁড়ে 'মুখ-মারে' তেমনি করে কলিম তার

অপকর্মের মুখ-মারবার জন্য উস্‌খুস্‌ করতে থাকে।

ব্যাপারীকে কি একটা বলি বলি করে বলে না। ভাব দেখে ব্যাপারী হাসতে হাসতে বলে,—ফকির, সেদিনও তুমি বেচারামের খলেনে কি একটা বলতে গিয়ে বলোনি। আজও যেন কি একটা বলতে চাও। বলোই না, কি বলবে!

—বলছিলাম কি বড় মেঞা, ধান তো ক্ষেপের মত বোঝাই হয়েছে। আরও অল্প কিছু দিয়ে দিই, মুখটা মেরে নাও।

—তা আর এমন কথা কি?

—কিন্তু একটা আবদার আছে। এ ধান তুমি কাটায় তুলতে পারবে না। যা দেব তাই নিতে হবে।

—ওঃ, তোমার বুঝি নিজের কিছু ধান আছে? তা বেশ। নিবু কলকের আগুনে ফু দিতে কলিম ব্যস্ত। বারবারই ফু দেয়। কথার পিঠে আর কথা বলে না। ব্যাপারী ধরে নেয় কিছু লোকসান দিতে হবে। তা এক বিশের উপর দিয়ে কতটুকুই বা লোকসান হবে! তবে কলিমের বলার ভঙ্গিতে একটু ঔৎসুক্য বাড়লো, এইমাত্র।

কলিম ব্যাপারীকে নিয়ে সোজ লায়লার বাড়ি হাজির,—কই গো মঠবাড়ির মেয়ে! ধান বের করো, ঘুঘু পাখি এসেছে। মেপে দিই।

চেনা গলা পেয়ে লায়লা ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলো। এসেই উঠানে পালি হাতে কলিম আর হাতাকাটা ফতুয়া গায়ে নূর দাড়ি-ওয়ালা ব্যাপারীকে দেখে থমকে গেছে। ঢোক গিলে কলিমের দিকে বড় বড় করে তাকিয়ে বলে,—কই, আমি তোমাকে তো বেচার কথা বলিনি! কে তোমাকে বলল, আমি বেচতে চাই?—লায়লা প্রতিবাদ করে যায়। কলিমও নাছোড়বান্দা, লায়লার ধান বিক্রি করে দেওয়াটা তার যেন একটা মস্ত দায়। প্রতিবাদ করতে করতে একবার লায়লা বলে বসে,—আর তুমি পালি ধরলে তো রক্ষে নেই, আমাকে ফতুর করে তবে ছাড়বে!

কলিমের যেন এবার রোখ বেড়ে যায়। প্রায় জোর করেই ধান টেনে নিয়ে মাপতে লাগে। মাপা শেষ হতেই লায়লা অবশ্য খুশি মনে টাকাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কলিম যাবার সময় উঠানের মাচার দিকে তাকিয়ে বলল,—বাঃ, এবারও তো বেশ কদু হয়েছে!

বলেই দেখে, একটা কালো হাঁড়ি ঝুলছে মাচায়। আর কথা নেই মুখে। আড়ালে জিভ্ কেটে বড় বড় পায়ে বেরিয়ে গেল।

★ ★ ★

দালালগিরি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আক্রাম ফকিরের ডাক আসে। কলিম কত প্রতীক্ষাই না করেছে এর জন্য এতদিন!

আক্রাম একটু কড়া গোছের ফকির। বৃদ্ধও হয়েছে। সহসা ওকে কেউ আজকাল বাওয়ালি করে বাদায় ওঠে না। তাছাড়া ওর দস্তুরিও একটু বেশি। সাধারণ একজন বাওয়ালিকে খাইখোরাক ও জন-মজুরি দিলেই হয়। হাতে-নাতে তার কিছুই করতে হয় না। শুধু নৌকায় বসে থাকবে আর বাঘের বিপদ থেকে কাঠুরিয়াদের রক্ষা করবে। সর্তের বাইরে অবশ্য আরেকটা কাজ আছে, গল্প ও গান করা।

সুন্দরবনে দূর দূর জেলা থেকে শীতের মরশুমে গোলপাতা বা কাঠ কাটতে আসে সব। বড় নৌকা নিয়েই আসে তারা। এক এক নৌকায় ছয় থেকে দশজন লোক, আর মাস

দেড়েকের খোরাকি। খোরাকি বলতে চাল ও মিষ্টি জল, আর কিছু মশলাপাতি। খালে ও নদীতে অজস্র মাছ ; কাজেই আহারের অন্য কোন উপকরণই বাহুল্য। জাল ফেললে মাছের ওজনে টেনে তোলাই দায়।

নানা জায়গা থেকে নৌকাগুলি এককভাবে এলেও, পাশ নেবার জন্য বাদার মুখে বন-কর অফিসগুলিতে প্রথমে একে একে তারা জমা হয়। সেখান থেকে এরা দল বেঁধে,—বলতে গেলে নৌকার বহর বানিয়ে বনের গভীরে কাঠ কাটবার ঘেরগুলিতে এসে উপস্থিত হয়। ঘেরের এক এক জায়গায় দেখা যাবে—দশ বিশ খানা নৌকা পরপর নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে। রোদ উঠতেই সবাই দল বেঁধে বাদায় ওঠে, আবার বেলা থাকতেই নৌকায় ফিরে আসে। তখন আর কিছু কাজ নেই। কয়েকজন মাত্র রান্না বাড়িতে ব্যস্ত, বাকি সবাই মাতে গানে ও গল্প-গুজবে। এই সময় বাওয়ালি ফকিরদের কাছে গান ও গল্প শুনতে সবাই যেন আকুল হয়ে থাকে। মন্ত্রের বলে ফকিরের দল বাঘকে কতটা মোহগ্রস্ত করতে পারে তা পরের কথা, গল্প-গুজবে কাঠুরিয়াদের কতটা মোহগ্রস্ত করা যায় তারই ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে হয় ফকিরদের এ-সময়ে।

আক্রাম এবার বড় এক বহরের বাওয়ালি। তাদের সঙ্গে এক সর্তও করে নিয়েছে,—এক শিষ্যকে সঙ্গে নিতে দিতে হবে।

বাড়ি থেকে রওনা হবার সময় ফকির-বিবি আক্রামকে একবার স্মরণ করে দিতে ভোলেনি,—দেখো যেন, কলিমকে কোনও বড় বিপদে ফেলো না।

ইছামতী নদী দক্ষিণে এগিয়ে কদমতলী নাম নিয়েছে। আরও ভাঁটিতে আড়াইবাঁকীর দোনে পেরিয়ে আবার মালঞ্চ নাম নিয়েছে। এই মালঞ্চের পশ্চিম তীরে সুন্দরবনের ১৭৪ নম্বর লাট। একটু পশ্চিমে গেলেই যমুনা, তারপরই রায়মঙ্গল নদী। মালঞ্চ থেকে রায়মঙ্গল অবধি বাঘের মস্ত আড্ডা।

১৭৪ নম্বর লাটের একটি পাশ-খাল। বেশ খানিকটা চওড়া খালটা এখানে পূব-পশ্চিম। চাঁদনী রাত। শীতের মোলায়েম চাঁদের আলোয় গোটা খালটি আলোকিত। স্পষ্ট দেখা যায়, সার বেঁধে দশ-বারোখানি নৌকা চাপান দেওয়া রয়েছে। ঠিক চাপান দেওয়া নয়, মঝখানে নোঙর করা। কোন নৌকায় কুপির-আলো দেখা যায়, কোনটায় দেখা যায় না। কেউ গল্প করে, কেউ বা গান ধরেছে, কেউ বা কাউকে বিনা কাজে নাম ধরে ডাক্‌ছে। তবু ষাট-সত্তর জনের সোরগোল এই বনকে মুখরা করতে পারে না। হিংস্র নিঝুম নিস্তব্ধ সুন্দরবনকে অতো সহসা আলোড়িত করা যায় না।

বাওয়ালি আক্রামের নৌকায় ভীড় একটু বেশি। খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর ছোট ছোট ডিঙি করে অনেকেই অন্য নৌকা থেকে এখানে হাজির। বড় নৌকায় বেশ কিছু কাঠ ইতিমধ্যে বোঝাই সারা। উপর-খোপের সামনে সে বোঝাই কাঠ যেন ফরাসের মত। তারই উপর গোটো হয়ে সব বসেছে। আক্রাম ও কলিম একপাশে। নৌকার গায়ে বাঁধা ছোট ছোট ডিঙিগুলি স্রোতের টানে এক একবার মিলিত হতে চায়, আবার পরমুহূর্তে একে অন্যের ডালির আঘাতে থর থর করে কেঁপে উঠে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মিলন ও বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ ও মিলন। এমন নিঝুম বনে ওদের এই মিলন ও বিচ্ছেদের মর্মবাণী আত্মগোপন থাকে না। ডাইনে ও বাঁয়ে নিবিড় বন। চাঁদের আলোর পক্ষে এই বনকে আলোকিত করা বুঝি দুঃসাধ্য। নাতিদীর্ঘ ঘন অন্ধকার বন দুপাশে প্রাচীরের মত অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আক্রাম গল্প জমিয়েছে। 'বড় রাজার' গল্প। যতে রাজা। 'যশোহর নগর ধামের'

সন্নিকটে নূরনগরের যতীন রায় রাজা প্রতাপাদিত্যের বংশধর। ঠিক প্রতাপাদিত্যের নয়; বসন্ত রায়ের বংশধর। সুন্দরবনের সামান্য জমিদার, তবু বংশগৌরবের জন্যই এত নাম-ডাক। এক সময়ে তিনি জাপান গিয়ে যুদ্ধ বিদ্যা শিখে এসেছিলেন। কি জানি তাঁর কি মতলব ছিল! প্রতাপাদিত্যের দেশ, তিতু মেঞার দেশ—বাঙলার এ অঞ্চলের মাটির আঁশই আলাদা। প্রথম মহাযুদ্ধের আমল। বঙ্গের বিদ্রোহী দলের নেতা তখন যতীন মুখার্জি। জার্মানী থেকে অস্ত্র আসবে। বঙ্গোপসাগরে দুর্গম বনের পথেই এই অস্ত্র আসবে। যতীন মুখার্জি গেলেন বালেশ্বর। আরেকদল এলো রায়মঙ্গলের মোহানায়। এই সূত্রে যতীন রাজার সঙ্গে যোগাযোগ। দুর্গম সুন্দরবনের খাল-পাশখাল, দনে-শিষের নিখুঁত খবর কে দেবে! কে দেবে দুর্ভেদ্য গহন বনের অভ্যন্তরে কোথায় কোন ভাঙা-বাড়ির আস্তানা আছে তার সন্ধান! তাই যতে রাজা আক্রামকে ডেকে নিয়েছিলেন। তারই গল্প সত্য-মিথ্যায়, রাঙিয়ে-রসিয়ে আক্রাম্ আজ জমিয়েছে।

আক্রাম বলে চলে,—বড় রাজা তো একদিন ডেকে বলল, ফকির জন কয়েক ছেলে-ছোক্‌রা যাবে রায়মঙ্গলের মোহানায়। হাজার হোক বন বাদাড় তো, ফকির না হলে চলে কি করে! তুমি এদের সঙ্গে যাও। দেখো যেন এদের কোন বিপদ আপদ না হয়। আর যদি কোন সাহায্য এরা চায়, তা দেবে। আমার কয়েকজন বরকন্দাজও থাকবে এদের সঙ্গে। তোমার কোন ভয় বিপদ নেই। যদি কোনও বিপদ হয় তো আমিই আছি।

তা বড় রাজা তো! তার কথা ফেলি কি করে! গেলাম। ছেলে-পুলের দল, তারা কি কথা শুনতে চায়! সাথে তদের বন্দুকও দু-একটা ছিল। বললাম—বাদায় ওরকম করো না; বড়মেঞাকে নিয়ে ছেলেমানুষি করতে নেই।

সন্ধ্যে হলে ওরা সমুদ্দুরের চরে যেত, আর দুই লম্বা লগি পুঁতে, দড়ি টাঙিয়ে আলো ঝুলিয়ে দিত। আলোগুলি মালার মত ঝুলে থাকত। ওরা বলতো, ঐ আলো দেখে কোন্ জাহাজ নাকি আসবে আর ওদের হাজার হাজার বন্দুক দিয়ে যাবে।

আর সারা সকালে ওদের দল বন্দুক নিয়ে বড়-মেঞা খুঁজে বেড়াবে। যতই বলি ওরকম করো না, ততই যেন ওদের গোঁ চেপে যায়।

দিন ছ-সাত পর একদিন সারা সকাল ঘুরে এসে ডিঙিতে উঠেছে। তিনখানা পঞ্চাশ মণি ডিঙি ছিল। দু'খানা নোঙর করা আর একখানা তাদের সঙ্গে বাঁধা। বেশি সাবধানী হয়ে ওরা সেখানাকে ডাঙার এক গুড়িতে কাছি দিয়েছে।

পড়ন্ত বেলা। সবাই ছইয়ের মধ্যে ঘুমে অচৈতন্য। আমারও চোখ বুঁজে এসেছে। এমন সময় ডিঙিতে টান পড়তে চোখ মেলেছি। দেখি—বড়-মেঞা দুই থাবা দিয়ে কাছি ধরে টানছে। চিৎকার করে সামনে এগিয়ে তাড়াতাড়ি কাছি খুলে দিই। সামনে ছিল হিস্‌নে। সেটাই হাতে করে ডালিতে দাঁড়িয়ে রুখতে থাকি। ওরা তো সব উঠে পড়ে হৈ-হল্লা করতে থাকে। বন্দুক খোঁজে মারবার জন্য। আমার পাশে যে, সে তো বন্দুক তাক করেছে। বললাম, খবরদার! হাত দিয়ে বন্দুকের নল চেপে ধরে তবে থামাই। বলো,বন্দুক ঠেকাব, না বড়-মেঞাকে ঠেকাব? তাই কি শোনে পোলাপানের দল। হাঁকাহাঁকি করতে বড়-মেঞা একটু নরম-পানা। সরে ঝোপের আড়ালে গেছে। আর যাবে কোথায়! কোন বাধা মানে না। তিন বন্দুক থেকে দমাদম গুলি করল ঝোপ তাক্ করে। ভ্যাগ্যিস্, তখন বড়-মেঞার রোখ্ নামিয়েছি। বনবিবির দোয়ায় একবার শুধু হাঁক দিয়ে সরে পড়ল।

গল্প শেষ হতেই আক্রাম একটু থেমে কলিমকে বলল,—বুঝলি, রোখের মাথায় রোখ্ করতে নেই। তুই তো বিয়ে থা করিসনি, বুঝবি কি! এই যেমন রায়বাঘিনী। রায়বাঘিনীকে

কি করে পোষ মানাতে হয় জানিস্?

ফকিরের গল্পে সবাই সশঙ্ক হয়ে উঠেছিল। রায়বাঘিনীর কথা বলতেই সবাই হেসে উঠলো। খানিকটা বেশি করেই হাসলো, মনের ভয়কে দূর করবার জন্য।

কলিম কিন্তু জাহাজ ও বন্দুকের কথাই ভাবছিল। গল্প থেমে যায় দেখে বলে,—ফকির, তারপর কি হলো?

—কি আর হবে! ছেলে-ছোকরার দল তো বড়-মেঞার পেছনে লাগার জন্য ব্যস্ত। ডাঙ্গায় উঠে দল বেঁধে ওর পেছনে লাগবে। ঠেকাতেই পারি না দেখে বললাম, বেশ যেতে পারো কিন্তু যে-কাজে তোমরা এসেছ, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। যদি ভণ্ডুল না করতে চাও তো এ বাদা ছেড়ে পাশের বাদায় চলো। তবেই তো তারা এ বাদা ছাড়লো। কিন্তু ছাড়লে কি হবে, আরও ছ-সাত দিন কেটে গেল। সে জাহাজও এলো না, সে বন্দুকও এলো না। তারপর ভালোয় ভালোয় ওদের বড় রাজার কাছে পৌঁছে দিয়ে এলাম। ঘরের ছেলে ঘরে দিয়ে তবে আমার সোয়াস্তি।

আট

১৭৪ নম্বর এবার বুঝি বা নিরামিষ যাবে। এক পূর্ণিমা ছেড়ে আরেক পূর্ণিমা এলো বলে। জোয়ার-ভাটার দেশে পূর্ণিমা অমাবস্যার হিসাব রাখাই সহজ।

দিন আসে, যায়। নৌকাও বোঝাই হয়ে এসেছে। সবে বেলা গড়িয়েছে। গুরু-শিষ্য নৌকায়। সহসা কলিম দাঁড়িয়ে পড়ে বলে,—শুনছ ফকির, কি একটা যেন হুল্লোড়!

ফকিরও কান খাড়া করে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে আছে। হঠাৎ বলে,—কলিম, ওদের ডাক্।

—ওদের ডাকবার কি আছে!

—আছে বলেই তো বলছি।

দ্বিতীয় কথাটি না বলে কলিম সবাইকে ডেকে আনে। সকলে প্রায় ছুটেই এলো। ফকির বললো,—তোরা নিশ্চিন্তে কাজ করে যা। ভয় নেই, আমি আসছি। নিশ্চয় কেউ বিপদে পড়েছে। শুন্‌তে পাস্ নি!

কয়েকজনে প্রায় এক সঙ্গেই বলল:

—তা কি পালি হয়?

—তোমার যেতে হবে কেন?

—আমরা একলা পড়ে থাকবো নাকি?

আক্রাম গর্জে ওঠে,—না, তা হয় না, বাউলের ওপর বিবির কড়া আদেশ। বনে কেউ বিপদে পড়লে, রক্ষে করতে যেতেই হবে। যেতেই হবে।

ফকিরের দাড়ির দৃঢ় ঝাঁকানির সামনে ওজর করতে কারও সাহসে কুলোয় না। ফল এই হলো, সেদিন কেউ আর কাজে যায় না। সোজা যে যার নৌকায়।

ছোট ঘুঘু ডিঙি করে ফকির ও কলিম চলেছে। শব্দ লক্ষ্য করে চলেছে। একটু এগিয়ে ফকির নির্দেশ দেয়,—মরদ! ভাটো থেকে সাড়া আসছে, সামনের বাঁ-হাতি খাল ধর্।

—মনে লয়, বেশ দূরন্তর।

—তা হোক, যেতে হবে। ফকির হবার শখ, বিপদে আপদে কাজে আসবি না, তা হয় না।

—না, তা বলছি না। বিপদ তো নাও হতে পারে! নিজেরাই হয়ত খাবলা-খাবলি

করছে।

—ধুত্, তাই হয় নাকি ! বয়সে শুনিনি কোন দিন, নিজেরা কেউ ঝগড়াঝাটি করেছে বাদায় এসে। বাদায় যে যার সব ঝগড়া ভুলে যায়। ভুলতেই হবে।

কলিম চুপ করে যায়। দূরের শব্দ ক্রমেই কাছে আসছে। আক্রাম গলুইতে সামনে মুখ করে বোঠে টেনে চলেছে। একবার বোঠেখানা কোলের ওপর রেখে ঘাড় বাঁকিয়ে বলল,—কলিম, মন্ত্রটা মনে আছে তো ? পড়ে নে একবার।

—এতো আগে ?

—নে, পড়ে নে।

মন্ত্রের ব্যাপারে গুরুর আদেশ। কলিম কয়েকবার মন্ত্র আউড়ে নিল। নিল বটে, কিন্তু মনে খটকা লাগে। এ কেমন মন্তর ! যার নামে মন্তর, তার খোঁজ নেই—আগেই পড়া !

মুহূর্তের মধ্যে সোরগোল বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভীতি বিহ্বল মানুষের আর্তনাদ। আক্রাম বেশ উৎসাহিত,—দ্যাখ্ তাহলে তোর দীক্ষা বোধ হয় এ গোনে পুরো। এবার কিন্তু শোনার চেয়ে দেখা। দেখেই শিখতে হবে বেশি।

কাছেই এসে গেছে। সামনে খালের বাঁক কাছিমের পিঠের মত।

গলুই আরেকটু ঘুরতেই কলিম ভ্রূ কুঁচকে চোখ পিট্‌পিট্ করে হাসতে আরম্ভ করেছে।

—কি-রে ! হাসছিস্ কেন রে ?

—দ্যাখো, দ্যাখো, রগড় দেখছ না গুরু !

কলিমের হাসিতে আক্রামেরও হাসি এসে যায়। চেপে হাসি বন্ধ করে আক্রাম এক তাড়া লাগায়,—পাগলামি করবি না ! হাসবি না !!

কলিম এমনিতে শব্দ করে হাসে না। কিন্তু হাসবার সময় ফোড়ন কাটবে আর হাসবে। তাই কথার শব্দে হাসির সুর জড়িয়ে থাকে।

—দ্যাখো না ফকির ! দ্যা-খো, কেমন বাদুড়-ঝোলা ! তোদের বাদায় আসতে বলে কে রে !

একদল লোক, বিশ-ত্রিশ হবে। সবাই মিলে এক বানের 'ছিটে' উঠবার হুড়োহুড়ি। নিতান্ত চারা বান গাছ। ভারে ডালপালা মাটি পর্যন্ত নেমে আসছে, তবু তাতেই উঠবে সবাই। সবাই মিলে ত্রাসে কথা বলছে। দল-ছাড়া কেউই হতে চায় ন। একজন উপর থেকে পড়ে গেল। তাতে কি হবে, আবার সেই গাছেই উঠবার চেষ্টা।

কাছে এসেই কলিম যেন আর ফকিরের অপেক্ষা করতে চায় না। চিৎকার করে ওঠে,—হ-হ-হ-ই ! হ-হ-হ-ই !

চিৎকারেও কলিমের ব্যঙ্গ সুর। মতলব ছিল ওদের লজ্জা দেবে। কাজও হলো। সাড়া পেয়েই ওরা চুপ। কিন্তু ডিঙি মাটিতে লাগাতেই আর এক বিপদ। সবাই মিলে এক সাথে কথা বলতে চায়। ফকির ধমক দিয়ে উঠলো। ধমক দিতে দিতে চর পেরিয়ে গাছের গোড়ায় এলো। সামনের বুড়োকে প্রশ্ন করতেই সে তো ভেউ-ভেউ করে কেঁদে অস্থির। তারই ভাইকে নিয়ে গেছে সবার চোখের সামনে।

শান্ত করার ফাঁকে ফাঁকে আক্রাম ঘটনা জানবার চেষ্টা করে। কলিমের কিন্তু অসোয়াস্তি লাগে ওদের গাছে ওঠার কাণ্ড দেখে। প্রায় জোর করে গাছ থেকে সবাইকে টেনে নামাল। যেন সে-ই এবার বাউলে বনে গেছে ! বাউলের সুরেই কথা বলে,—মানুষ নিয়েছে তো কি হয়েছে ! একটার বেশি দুটো আজ নেবে না। না, তা নেয় না, কোনও দিনও নেয় না। নাম্ গাছ থেকে।

ধমকের মতই কথাগুলি। তবু কলিম হাসতে হাসতেই বলে। ভয়ঙ্কর বনে ও এমন বিপদের মধ্যেও অমন হাসি দেখে লজ্জা ওরা পাক আর না পাক, ওদের সম্বিৎ খানিকটা যেন ফিরে এলো।

এটা ওটা কথা হচ্ছে। সহসা আক্রাম প্রশ্ন করে, বেশ জোরেই করে,—কি চাস্ তোরা, বল্! বাড়ি ফিরে যাবি, না লাস আনতে চাস্, বল্?

কে উত্তর দেবে! উত্তর দেবার মত কারও অবস্থা নেই। একে আক্রামের চিৎকার, তার উপর 'লাসের' কথা!

আক্রাম নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়,—চল্ তবে, লাস নিয়ে আসি।

এই অবস্থায় বনের বিপদের কথা একটু বাড়িয়ে বললেই যেকোন দলকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা অতি সহজ। কিন্তু পরে এর জন্য আসে যেমন অনুশোচনা, তেমনি অপবাদও। পথ না পেয়ে তখন সকলেই দোষে বাওয়ালিকে। সুন্দরবনের বাওয়ালি এ দোষের ভাগী হতে চায় না। তাছাড়া, কলিম তার সঙ্গে। আক্রাম এ যাত্রা বাঘের মুখোমুখি হতেই ব্যগ্র। বলল,—জানি, তোরা সক্কলে সঙ্গে যেতে চা'বি। তা হয় না। জনা দশেক মাত্র! বাকি সব নৌকায় থাক্।

আক্রাম কলিমকে একটু কাছে টেনে আস্তে আস্তে বলে,—চাউনি দেখে দেখে জনা দশেক বেছে নে এবার।

ইঙ্গিতে বুঝে নিয়ে কলিম বাছাই করতে লেগে যায়। বাছাই করতে গিয়ে সে কিন্তু চোখের দিকে বিশেষ নজর দেয় না। ঠোঁটের হাসিই তার লক্ষ্য। তা ফুকুড়িতে কে কেমন হাসে, তাই দেখে দেখে বাছাই করে। কলিমের কাণ্ড দেখে ফকিরের কি জানি কেন, সেই সেদিনের বিবির শেষ কথাটা একবার মনে পড়লো।

অন্যেরা নৌকায় উঠলে জনা দশেক সঙ্গে নিয়ে ফকির ও কলিম বনের ভিতর এগিয়ে চলল। খোঁচ দেখে দেখে। আক্রাম একবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করল,—খবরদার! কেউ দৌড়ে ভাগ্‌বি না। ভেগেছিস্ কি মরেছিস্। আস্তে আস্তে ঠিক আমাদের পিঠ্ পিঠ্ আসবি। বললে তবে চিৎকার কর্বি। ভীষণ চিৎকার! কোন ভয় নেই। পালাবার চেষ্টা করলে বড় মেঞা তারই ঘাড় মাট্‌কাবে। খবরদার!

কলিমের দিকে চোখ পড়তেই ফকির অবাক,—করেছিস কি? বড় মেঞার সঙ্গে হাতাহাতি করতে যাচ্ছিস্, না মল্লযুদ্ধ করতে যাচ্ছিস্! ওরকম সাঁটো কাপড় পরেছিস্ কেন?

কলিম এমন গোটো ও জোরে কাপড় পরেছে যে গোটা উরু দেখা যায়। খালি গা। বুকে বিশেষ লোম নেই। কাঁধের পেশী অস্বাভাবিক উঁচু। এদেশের লোকের অবশ্য কাঁধের পেশী এমনিতেই সবল থাকে; রাতদিন বোঠের খোঁচ তো এদের মারতেই হয়। তার উপর কলিমের ঘাড়কে গর্দান বলাই ভাল। মাথায় আবার গামছার পেখম ধরা ফেটা। দেখলেই সত্যি মনে হবে, কুস্তিগির হাতাহাতি করতে চলেছে।

আক্রামের কথায় কলিম লজ্জা পেল। মুখে অবশ্য বলল,—একবার বাদার দোঁয়ায় বন্দুক হারাতে হয়েছে। এবার তো আর কিছু নেই। কাপড়টা না হারাই! তাই!

কলিমের কথায় কান না দিয়ে ফকির দৃঢ়ভাবে বলল,—চল্। বলল বটে, কিন্তু নিজে পা বাড়ায় না। কেমন যেন অন্যমনস্ক। বনের চারিদিকে তাকায়। সামনেই বাঘের পদচিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়, বরাবর চলে গেছে।

সবাই চুপ। ফকির যেন নিরীক্ষণ করে। বাঁ থেকে ডান দিক পর্যন্ত সামনের গোটা

বনটাই নিরীক্ষণ করল। যেমন করে স্টীমারের সার্চ লাইট নদীর এ-কূল থেকে ও-কূল পর্যন্ত একে একে ঘোরায়।

এই নিরীক্ষণ করতে গিয়ে ফকিরের গলা যেন ভারি হয়ে উঠেছে। চাপা ভারি গলায় ফিস্ ফিস্ করে বলল,—চুপ্! আমি যা করি, তাই করে যা শুধু।

কলিমকে এ-কথা বলা অনাবশ্যকই ছিল। ইতিমধ্যে সে ফকিরের সর্বভঙ্গি অনুসরণ যেমন করেছে, তেমনি অনুকরণও করতে শুরু করেছে।

বাঘের পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। বেশ অনেকখানি পথ এসেছে। সামনে ফকির, পাশেই কলিম। বাকি সবাই ঘন হয়ে পিছু পিছু চলেছে। কিছুদূর এগিয়েই একটা মরা 'শিষে', ক্ষীণ স্রোতধারার বাহক। শীতকালে আরও মরা, শুকিয়ে গেছে। তারই দুই তীরে কেঁচকী বনের ঝাড়। ওপারের বনতল চোখের আড়ালে। ফকিরের গতি ধীর। নিঃশব্দ।

দলের মাঝ থেকে শিকার নিয়েছে। তাতে দলের মধ্যে সোরগোল চলতে থাকবে এ তো জানা কথা। এতে বাঘ অভ্যস্ত। তাতে ওর আহারের ব্যাঘাত হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু আহারের সন্নিকটে পদাচরণের কোনও সাড়া পেলে সচকিত হয়ে উঠবেই। তাই শিকারে না বেরুলেও ফকিরকে শিকারীর মত এগুতে হচ্ছে।

শিষের এপারের কেঁচকী ঝাড় অতি সন্তর্পণে পেরুবে। এপার-ওপার দুই ঘন ঝাড়ের মাঝে শিষের খাদে নিভৃতে আহার সমাপন করবে, এমন আশাই আক্রাম করেছিল। একবার ঘাড় বাঁকিয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে পিছনের সকলকে সতর্ক করে নিল। সতর্ক করলে কি হবে, অতোগুলি অনভ্যস্ত—শুধু অনভ্যস্ত নয়, ভীতিগ্রস্ত পদ সঞ্চারণে একটু আধটু শব্দ হচ্ছেই। তবুও ফকির নিজে সাবধানীর মত শূলোর ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে উঁকি মেরে দেখে দেখে চলে।

বাঘ একবার টের পেলে লাস ফেলে রেখে পাশের কোন ঝাড় বা ঘন গুড়ির ফাঁকে এমন গা ঢাকা দেবে যে এতগুলি জোড়া চোখে তার ছায়াও ধরা পড়বে না। সারা সুন্দরবনে গাছের শিকড় থেকে ছোট বড় আধ-হাত বর্শার ফলকের মত শক্ত শক্ত শূলো বেরিয়ে আছে। এক গজের মধ্যেই দশ-বারোটি শূলো। কোথাও বা তারও বেশি। এই শূলোর ফাঁকেই বাঘ আড়াল নেবার ক্ষমতা রাখে। তা না হলে হয়ত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পক্ষে সুন্দরবনের মত ফাঁকা বনে জীবিকার সংগ্রামে বংশরক্ষা করা সম্ভব হতো না। জীবন-যুদ্ধের প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়ত বা সুন্দরবনের বাঘের পিঠের দুপাশে সোজা সোজা কালো রেখা দেখা দিয়েছে। শিকার প্রতীক্ষায় যখন গোটা শরীরটা শূলোর মাঝে দাবিয়ে দেয়, তখন এই ঋজু কালো রেখা ও শূলো একাকার হয়ে যায়। ভীতিবিহ্বল শিকার অথবা সন্ধানী শিকারীর পক্ষে তখন এই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সহসা নজরে আনা দুষ্কর।

কাছাকাছি এসে খাদের গভীরতা দেখে তো ফকির হতাশ। গাছগাছড়াশূন্য এমন নিভৃত আশ্রয় অলসভরে আহার সমাপন করার মত স্থান বটে। কিন্তু যেখানে বসে সম্ভাব্য শত্রুকে দূর থেকে লক্ষ্যে রাখা যায়, তেমন স্থানে বাঘ কখনও আশ্রয় নেয় না। তা যতই না কেন নিরাপদ হোক। আক্রামের নজরে আসে, বাঘের স্পষ্ট পদচিহ্ন সোজা খাদ পার হয়ে গেছে। ওপারেও ঘন কেঁচকী ঝাড়। সে আর অনুসরণ করতে চায় না। দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওপারে কেঁচকী ঝাড়ের ঠিক পাশেই যদি বসে থাকে! সন্দেহ হতেই আক্রাম আকার ইঙ্গিতে দলকে পিছু হটালো। ডাইনে অনেকখানি ঘুরে তবে খাদ পার হল। ওপারে কেঁচকী ঝাড়ও সবাই একে একে পেরিয়েছে। এবার সবাই বাঁ-দিকে এগিয়ে আবার খোঁচ ধরবে।

ধরতে হয় না। ফাঁকা বনে ফকির যেন হঠাৎ উন্মত্তের মত ক্ষেপে চিৎকার করে

ওঠে,—ঐ যে শালা ! খবরদার !!

দেখতে পাক, না পাক, কলিমও চিৎকার করে উঠলো,—খবরদার ! খবরদার !

নিঝুম বনে আচমকা আওয়াজে পেছনে ক'জনের চৈতন্য হারাবার অবস্থা। আক্রামের আড়ালে সবাই জড় হতে চায়। কেউ কেউ চিৎকার করতে চাইলে কি হবে—মুখ দিয়ে শুধু গোঙানির আওয়াজ বেরুলো। ঘুমের ঘোরে ভয়ার্ত গোঙানির মত।

আক্রাম অশ্লীল গালি দিয়ে ওঠে। মাথায় খুন চাপলে যেমন হয় তেমনি গালি ও রাগে সর্বদেহ তার কেঁপে কেঁপে ওঠে। গালির তোড়ে এক একবার দু'পা-ই যেন শূন্যে উঠছে।

কলিমও তার ফেটার পেখমে ঝাঁকা মেরে মেরে চিৎকার করে। আক্রামের মত সেও অ্যাক্রোশ বাইতে সংক্রামিত। আশেপাশে কে কি করছে, সে খেয়াল নেই। একবার খানিকটা এগিয়ে পড়েছিলো। গালি ও চিৎকারের মাঝেই ফকির তাকে হাতে ধরে টেনে নিজের পাশেই দাঁড় করিয়ে দিল। ফকির চিৎকার করে বটে, কিন্তু একটুও এগোয় না। পেছনের লোকের একমাত্র লক্ষ্য ও আশঙ্কা—আক্রাম যেন ওদের ফেলে এদিক ওদিক কোন দিকেও না চলে যায় !

সাড়া পেতেই বাঘ মাথা উঁচু করেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই আক্রামের চিৎকার ; তা না হলে যে রক্ষা নেই ! সে যে লক্ষ্যে এসেছে, সে কথা বুঝতে না দিলে এই হিংস্র জীব তখনই লুকিয়ে অনুসরণকারীকে অগ্রসর হবার জন্য প্রলুব্ধ করতে ছাড়ে না। আর একবার লুকোবার সুযোগ দিলে রক্ষা নেই।

বাঘ ঘাড় উঁচু করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এতদূর থেকেও সে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ধরা পড়ে। এই তীক্ষ্ণতা কোন এক বিন্দুতে নিবদ্ধ থাকলেও, সামনের অর্ধবৃত্তাকারের মধ্যে যা কিছু আছে তার গতিবিধি এই দুই চোখের দৃষ্টির মধ্যে। কোন একক বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকলেও একই সময়ে বাঘ সামনের সবটাই দেখে। পাশের অন্যকিছুকে লক্ষ্য করবার জন্য তাকে মাথা ঘোরাতে বা চোখের মণি ঘোরাতে হয় না। তাই বাঘের দৃষ্টি স্থির ও অপলক। দৃষ্টির প্রখরতা আর এই স্থিরতাই সম্মুখের যে-কোন জীবকে নিথর ও নিশ্চল করে দেবেই দেবে। ফকির এই অবশকারী চা নিকেই উপেক্ষা করতে চায়।

কলিমের প্রথমে উন্মাদনা আসে। ফকির এগিয়ে গেলে কলিমের পক্ষে এই উন্মাদনায় বেপরোয়া হয়ে এগিয়ে যাওয়া অসাধ্য ছিল না। এগিয়েও যেতে চাইছিল। ফকির কিন্তু পনেরো মিনিট ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এই দীর্ঘ অপেক্ষা কলিমের উন্মাদনা স্তিমিত করে আনে। মনে খটকা লাগার বুঝি অবকাশও আসে। বাঘের মতলব কি ? ফকিরেরই বা মতলব কি ? এমনি দাঁড়িয়ে থাকা কি ঠিক ? না, পিছিয়ে যাওয়াই রীতি ? ফকির চিৎকার থামাতে চায় না, বাকি সবাই সমভাবে ঠায় চিৎকার করে চলেছে। কলিমও থামতে চায়নি, থামবার উপায়ও ছিল না।

তবুও কলিমের দেহ ও মনে যেন ভীতির ও শিথিলতার আভাষ আসে। আক্রামের চোখ এড়ায় না। ব্যাঘ্রকে স্তব্ধ করতে অভ্যস্ত আক্রামের চক্ষুও বুঝি এই হিংস্র জন্তুর আচরণ অনুকরণে সিদ্ধ। দৃষ্টি ফেরাবার পথ নেই। তবুও সে চোখে বাঘের মত আশপাশের সব কিছুকেই লক্ষ্যে রাখতে হচ্ছে। আক্রাম বেপরোয়া ভাবে হুঙ্কার দিয়ে উঠল,—এইবার ! এইবার !!

বাঘ এবার সামনের দুই থাবার উপর ভর দিয়ে উঠেছে। গর্জে উঠল ভীষণ ভাবে। এতক্ষণ ছিল চাপা গোঙানি। গালি ও চিৎকারকে তা বিশেষ ছাপিয়ে ওঠেনি। এবার বন কম্পিত গুরু গর্জন। সবাই সন্ত্রস্ত। দেবে না ওদের ত্রস্ত হতে ফকির।

হুকুম দিল,—চল্, এগিয়ে চল্।

ফকির পাঁচ-ছয় কদম এগিয়ে গেল। ফকিরকে কাছ-ছাড়া করা এ সময়ে কারও পক্ষে সম্ভব না। ত্রাসে ও নেশায় সবাই সঙ্গে সঙ্গে ফকিরের কাছে এগিয়ে এল। গর্জন দুই তরফে সমানে চলেছে।

কয়েক লহমা কাটতে না কাটতে আবার একই ভাবে এগিয়ে যায় পাঁচ-ছয় কদম। তারপর আবার পাঁচ-ছয় কদম। কিন্তু আর না। ফকির আর এগুতে চায় না। যেন খুঁটি নিল। বাঘ গোঙাতে গোঙাতে লাসটার দিকে একবার তাকিয়ে এ-দিক ও-দিক ঘাড় ঘুরিয়ে বীরদর্পে চাহনি দেয়। গালাগালির মুখেই ফকিরের ভর্ৎসনা,—খবরদার! এগুবি না। খাড়া থাক্। —শুধু বলা না, হাত বাড়িয়ে যেন কলিমকে আগলে রাখলো।

বাঘ ধীরে ধীরে পাক খেলো ঐ ছোট্ট চত্বরের মাঝেই। ফকির ও বাঘের ব্যবহারে কলিম সচকিত। আচম্‌কা কিছু ঘটবার আশঙ্কায় চোখ ভ্রূ পর্যন্ত বিস্ফারিত। কি জানি, এবার কি হবে! আরেক পাক খাবার পর বাঘের ভীষণতম এক 'গাক্' করা আওয়াজ। বিলম্বিত হুঙ্কার নয়, ছোট অথচ তার তীব্রতার সীমা নেই। দলের সকলে যেন তাদের দেহে ও মনে এক তীব্র ঝাঁকানি খেল।......সঙ্গে সঙ্গে আক্রামের শাসানি,—খবরদার! এগুবি তো মরবি! খবরদার!

বাঘ পাশ ফিরে পাশের ঝোপের দিকে কদম নিয়েছে। হ্যাঁ, কদমই। ধীরে ধীরে অলসভাবে চলার কদম। ফকির নিজের ভয়ঙ্কর হুঙ্কার থামালো বটে, কিন্তু অপর সকলকে চিৎকার থামাতে বারণ করে। ওদের গালি ও চিৎকারের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। তাল-বেতালের চিৎকার, সব কিছু মিলে একটা হট্টগোলের আওয়াজ।

বাঘ ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেল। কলিম হাঁফ ছেড়ে নিঃশ্বাস নিল। যেন ধাতস্থ হয়েছে। অপরাধীর মত বলল,—গুরু! মন্ত্র পড়ব?

—ধূত্! চিৎকার থামাস্ না! গালি দিতে পারিস্ না! —দম নিয়ে ধমক দিয়ে আবার বলে উঠল,—চল্, এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে চল্।

লাসের কাছে সবাই চুপ। অমন সদ্য আধ-খাওয়া লাস দেখলে শত অভয় চিৎকারের মধ্যেও কার না বুক শুকিয়ে ওঠে। ওস্তাদ ফকির খামোকাই যেন একবার বাঘের গতি-পথের দিকে মুখ করে তড়পায়,—শালা, এগুবি তো শেষ করব!

তড়িৎ আঘাতে যেন সকলের শিরদাঁড়া আবার খাড়া হয়ে ওঠে। আত্মরক্ষার তাগিদে বুঝি চিৎকারে গালি দিয়ে উঠলো। কলিম কিন্তু এবার হল্লায় যোগ দেয়নি। ফকিরের কাণ্ড দেখতেই ব্যস্ত। মুখে ভ্রূ কোঁচকান মুচকি হাসি। বৃদ্ধ আক্রাম এদিকে ক্লান্ত। বিশেষ গালি দিতে পারে না। শুধু হুমকিই দিচ্ছে।

ফকির ইঙ্গিত করতেই কলিম লাসটি গামছায় ঝুলিয়ে কাঁধে নিল। লাসের বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না। কোনমতে নিয়ে চলে। ফকির অন্য সকলকে নিয়ে বাঘের গতি-পথের দিকে মুখ করে পেছনে পা ফেলে দক্ষিণ দিকে আরেক পাশ-খালে এলো। এখন আর অবিরাম নয়, মাঝে মাঝে হাঁক দেয় মাত্র।

নির্দেশমত সবাই মিলে গোলপাতার উপর লাস রেখে জলে ভাসিয়ে রাখল। পাশ-খাল খুব বেশি বড় নয়। কোমর জলে খুটি পুঁতে কোনমতে খালের মাঝামাঝি ভাসিয়ে রাখল। এত অল্প জলে কামোট এলেও কুমির আসার সম্ভাবনা কম।

কলিমের পিঠ ও নিম্নাঙ্গ সবই রক্তাক্ত হয়ে গেছে। জলে ধুতে ধুতে বলল,—এতো রক্তও ছিল চাষার গায়ে! আচ্ছা ফকির, তোমার কাণ্ড বুঝি না, কি হবে এই পর্‌সাদ নিয়ে!

—থাম্ ! আবাদের মানুষকে বাদায় মাটি দেব কেন ! জয় পরাজয় আছে তো ! বাদায় এসে কোনদিনও পরাজয় মানবি না কিন্তু। বুঝলি !

ঝট্‌পট কাজ শেষ করে ফকির ও কলিম বাকি সবাইকে নিয়ে নৌকায় চলল। ওরা এ যাবৎ কোনও কথা বলেনি। কথা বলার অবস্থাও ছিল না। শুধু ফকির ও কলিমের কথায় সায় দিয়েছে আর চিৎকার করেছে। ফকির এবার ওদের কথা বলাবার চেষ্টা করছে। চুপচাপ না হয়ে যায় ! একে সবাই ক্লান্ত, তার উপর বনের নিস্তব্ধতা। বন যেন মানুষকে আপনা থেকেই মূক করে দেয়। সুন্দরবনে প্রাণ-প্রাচুর্যের অভাব নেই। যেদিকে তাকাও অসংখ্য বৃক্ষরাজি। জীবনের প্রতীক সবুজ রঙের মেলা। বৃক্ষরাজির একে অন্যের সঙ্গে পাল্লাপাল্লি। লতা ও গুল্মের জড়াজড়ি। নদী ও খালে গতিশীল জলরাশি। সর্বত্রই জীবনের স্পন্দন। কিন্তু নিঃশব্দ স্পন্দন। নির্জীবের নীরবতা আমাদের বাঙ্ময় হয়ে উঠবার আবেগ আনে, আর সুন্দরবনের সজীবের নীরবতা করে তোলে মানুষকে নির্বাক।

নিঃশব্দে যাওয়া ঠিক নয় ভেবে কলিম বললো,—আচ্ছা, তোমরা তো সবাই মেঞা সাহেব ? না ? বলতো, আজ যে-মুখ দেখলে সে-মুখ সুন্দর, না বিবির মুখ সুন্দর ?

ঠাট্টা মস্করার সময় নয়, তবুও সবার মুখে হাসি দেখা দিল। কলিম অবশ্য তাদের বিবির মুখ ভাবতে বলে, নিজে কার মুখ ভাবলো তা কে জানে ! ভাবুক আর নাই ভাবুক, একটু থেমে নিজেই উত্তর দেয়,—সময় বিশেষে দুই-ই সমান ! তাই না ?

বড় খালে এসে তাড়াতাড়ি সবাই মাটি ছেড়ে নৌকায় উঠল। পায়ের কাদা ধোয়ারও অবকাশ নেয়নি। আশ্রয়ে এসে নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস নেবার জন্যই এতো ব্যগ্রতা।

ফকির বললো,—নে, আর কাদা ধুতে হবে না ! এক হাতেই কাজ সেরে আসা যাক্। চল্ ডিঙি নিয়ে সব।

বললে কি হবে, এবার অনেকেই পাশ কাটাতে চায়। তবে নতুনদের কেউ কেউ এই রোমাঞ্চকর ঘটনার শরিক হতে ইচ্ছুক। বড় বিপদ তো কেটে গেছে ! তাদেরই ক'জনকে নিয়ে গুরু-শিষ্য আবার চললো !

সামনের গলুইতে কলিম। মাঝ-গুড়োতে ফকির। ফকিরের আগে-পিছু জনা পাঁচ-ছয়। ডিঙি করে যাবে আর চট করে লাস নিয়ে আসবে। বিপদ যা ছিল তা তো কেটেই গেছে। কীভাবে যাবে, বা কি কি করতে হবে তা নিয়ে ফকির মাথা ঘামাবার আবশ্যক বিশেষ বোধ করেনি। একবার শুধু কলিমকে বলল,—মরদ ! সামনে বস্‌লি ! তা বোস্, সামনে বসেই কিন্তু ডিঙির হাল ঠিক রাখবি।

ছোট পাশ-খাল। সুন্দরবনে ছোট খালও দু'কদম এগুবে না বাঁক না নিয়ে। জায়গা মত বাঁক ঘুরতেই লাস চোখে পড়বে। লাসের যে করুণ ও বীভৎস বর্ণনা শুনেছে সেই ছবিই সঙ্গীদের চোখের সামনে। দেখতে চায়, কিন্তু দেখবার অপেক্ষায় তারা জড়সড়।

সে জড়সড়ভাবে কোথায় উবে গেল কলিমের বীভৎসতম হাঁকে। লাস আছে ঠিকই,—বাঘ এক থাবার ভরে বুক-জলে দাঁড়িয়ে আরেক থাবায় গোলপাতা টেনে আনবার চেষ্টা করছে। ডাঙায় পেছনের দু'পা। দীর্ঘ লেজটি অস্বাভাবিক ভাবে উঁচু হয়ে আছে। একই ভাবে থাবা ও পা রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল। চোর ধরা পড়লে যেমন ভাবে তাকায়। না, তা ঠিক নয়। বনের সে একচ্ছত্রপতি। সে-দৃষ্টি সর্বজীবকে থম্‌কে দেয়। সোজা কাছে আসবার সাহস করলে রক্ষা নেই।

কলিমও সাহস করেনি। ডিঙি থামিয়ে দিয়েছে। গলুইতে বোটের আঘাতে আর বীভৎস চিৎকারে এবার কলিম একাই রুখে দাঁড়িয়েছে। দেখাদেখি কেউ কেউ জলের উপর বোটের

বাড়ি মেরে সোরগোল তুলতে চায়। ফকির কিন্তু এ যাত্রা চুপচাপ। কলিমের উদ্দেশে একবার শুধু বলল,—সাবাস্ মরদ!

পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ এতো সহসা পাবে তা ফকিরও ভাবেনি।

কলিমের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। শুধু একটা অঘটন কলিম লক্ষ্যে আনতে পারেনি। সঙ্গীদের একজন সুন্দরবনের 'শ্রীমূর্তি' দেখেই বজ্রাহতের মত কাঠ হয়ে খালের জলে পড়বার মত হয়েছিল। ফকির তক্ষুনি বোটের গুঁতো মেরে তাকে ডিঙির খোলে ফেলে দেয়।

বেপরোয়া, কিন্তু বল্গাহীন বেপরোয়া নয়—এই মূল মন্ত্রেই ফকিরের অনুকরণে কলিম লাস ফিরিয়ে আনে।

★ ★ ★ ★

১৭৪ নম্বরে আর বেশি দিন ওদের থাকতে হয়নি। ব্যাঘ্রের মত শক্তিশালী জীবকে বশে আনার মাঝে এক মাদকতা আছে। যে মাদকতার পথে শক্তিমত্ততার সর্বনাশ আসতে পারে। ফকির তারই আশঙ্কায় চিন্তামগ্ন। উঠতে বসতে, কথাবার্তায়, ঠাট্টা-রসিকতায় ফকির যেন কলিমের কাছ থেকে তারই ইঙ্গিত পেয়েছিল। মুখে কিছু বলেনি। তবে সেদিন বাদা ছেড়ে আসবার পথে বনের শেষ সীমানায় কলিমকে হাতে ধরে নিয়ে সহসা ডাঙ্গায় উঠল। আঙুলে করে বনের পলিমাটি খানিকটা তুলে নিজের কপালে ও কলিমের কপালে লেপটে লাগিয়ে দিল। তারপর বনের দিকে মুখ করে মুদিত নয়নে মাথা নিচু করে রইল। কলিমও অনুগতের মত অনুকরণ করে।

মাথা উঁচু করে ফকির হঠাৎ বেশ জোরে প্রশ্ন করে,—কি ভাব্‌লি? কার কথা ভাব্‌লি?

—কেন! বনের কথা,......বনবিবির কথা!

—না, শুধু তা নয়! বনবিবির বাহনের নামেও মাথা নোয়া।

দুজনেই আবার চৈতের রৌদ্রস্নাত গাঢ় সবুজ স্নিগ্ধ বনের সামনে মাথা নোয়াল—যেমন করে ভক্তের দল পশ্চিমের নীল মহাকাশের সামনে নেমাজে মগ্ন হয়ে ওঠে।

নয়

কাঠুরিয়াদের নৌকার বহর মঠবাড়ির ঘাটে চাপান দিতেই কলিম প্রায় জোর করে আক্রামকে টেনে নামাল। একবারটি গুরুকে বাড়িতে না নিয়ে ছাড়বে না। ঘাটের চর ডিঙিয়ে ভেড়িতে উঠে ফকির প্রশ্ন করে,—কই তোদের কাছারি বাড়ি? মিত্তিরদের কাছারি?

—কেন গুরু! বাদায় উঠে পেরথমেই বাঘের খোঁজ!

—কেন হবে না, বিপদ আপদকে তো পেরথমেই আমল দিতে হবে! না, তা ঠিক না, কি জানিস্! মনে পড়লো তোর তুরুং ঠোকার কথা।

—ওঃ! তুমি সে কথা আজও ভুললে না!

কথা আর এগোয় না। কলিম ও ফকিরকে দেখে আশেপাশে যে যেখানে ছিল, সবাই ছুটে এসেছে। ওদের দুজনের কপালে সুন্দরবনের লোনা পলিমাটির দাগ তখন শুকিয়ে স্পষ্ট সাদা হয়ে উঠেছে। অনেকের মনে অনেক প্রশ্নই ছিল। কপালের সাঙ্কেতিক চিহ্ন যেন

সব প্রশ্নই স্তব্ধ করে দিল তখনকার মত।

এক একটা মানুষ থাকে যারা কোন এক বাড়িতে উঠলে মনে হয়, তারা গোটা গাঁয়েরই অতিথি। আক্রাম আজ তেমনি এক অভ্যাগত। সকলেই ত্রস্ত ব্যস্ত। সকলেই আদর যত্ন, থাকা-খাওয়ার তদারক করতে ব্যগ্র। আনাগোনার ফাঁকে ফাঁকে কত লোকে কতভাবে কলিমকে সজাগ করে দিচ্ছে :

—কই কলিম, মাছের তেষ্টা দেখো!

—দুধের তেষ্টা কি করেছ কলিম?

—না হয় তো, দে তোর ক্ষেপলা জালটা, এক্ষুনি মাছ এনে দিচ্ছি।

ইতিমধ্যেই নিধু মোড়ল, আনন্দ গাজী, জয়নুদ্দিন, করিম ঢালি ও আরও কয়েকজনকে কলিম সাবুদ জানিয়েছে।

আমিনা তো কল্‌কে ঢালতে আর সাজতেই হিম্‌সিম্‌ খেয়ে উঠেছে। নিরিবিলি মানুষ ফুফু।চোখে অন্ধকার দেখার মতো। কি দিয়ে কি করবে, তার হদিশ করে উঠতে পারে না। অথচ একটা সুরাহা করতেই তো হবে। পথ না পেয়ে পাশের ঘরের পোলাকে পাঠিয়েছে তখন-তখনুই লায়লাকে ডেকে আনতে। এমন ডাকে লায়লা সায় দেবে না, তা হতেই পারে না। তার ওপর কলিমের বাড়ি, আর আক্রাম বাউলে নিজেই হাজির। লায়লা প্রায় ছুটেই এলো কোমরে আঁচল জড়িয়ে।

কারও আদরঅভ্যর্থনা বা আদেশের অপেক্ষা না রেখে লায়লা কাজ নিয়ে মেতে গেছে। দেখা হলে কলিম একবার শুধু বলল,—যা-ক্‌, রক্ষে এসে গেছ!

—দায়ের ওপর দায়, না এসে উপায় আছে, বলো! কাজের চাপে লায়লার যেন আর কিছু কথা বলার উপায় নেই, বলেও না।

পুব ভেড়ি থেকে নেমে কয়েক পা এগুলে কলিমের আঙিনা। প্রথমে পুব-পোতার একখানি দো-চালা ঘর। ভিতরে বাইরে দুদিকে বারান্দা। গোল পাতার ছাউনি। গত সনে নতুন ছেয়েছে। পাতার মিষ্টি কাঁচা গন্ধ এখনও যেন নাকে আসে। যে মিষ্টি গন্ধে আবাদের মানুষের মনের তলে গৃহের মমতা, আশ্রয়ের আশ্বাস, নির্ভয়ের নিশ্চিন্ততা জেগে ওঠে।

এই বাইরের ঘরের পাশে হোগলা বেড়ার আব্রু পেরিয়ে ভিতর আঙিনায় আসতে হয়। বেশ খোলামেলা উঠান, বাঁ দিকে ছোট্ট পুকুর বা খানা—সবটাই প্রায় কলমি লতায় ঢাকা। এদেশে পুকুর বেশি গভীর করা সম্ভব নয়। পাঁচ ছয় হাত মাটি খুঁড়তেই জলে ভর্তি হয়ে উঠবে। জল যাতে শুকিয়ে না যায় তারই জন্য এমন করে কলমি লতায় ঢাকা। হঠাৎ কেউ এই আঙিনায় প্রবেশ করলে দেখবে, একদল কালো সাদা হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে জলে নেমে যায়, কলমিলতার ডগাগুলি কেঁপে কেঁপে ওঠে।

উঠানের ডানদিকে আরেকখানা দো-চালা। ডোয়া অস্বাভাবিক উঁচু, দাওয়াই প্রায় তিন হাত। খট্‌খটে শুকনো। এই উঁচু ভিতের দেওয়ালে গর্ত করে মুরগী ও হাঁসের বাসা। পশ্চিম পোতায় একখানা কুঁড়ে ঘর। রান্নাঘর। তার অর্ধাংশ ঢেকি জুড়ে আছে। রান্নার অংশ ঘেরা থাকলেও ঢেকির অংশ খোলামেলা। সাধারণ ঢেকিঘর, তবু গাঁয়ের সবার মনে এর ছাপ আছে। শীতের এক ভোরে দেখা যায় অসংখ্য বাঘের পায়ের ছাপ ঢেকির আশেপাশে। যে পদচিহ্নের কথা আজও সবার মনে পড়ে।

দক্ষিণ পোতায় খানা পেরিয়ে বেটে ও টানা গোয়াল ঘর। কলিমের ছেলেবেলায় এই গোয়াল ঘর থেকেই ধলিকে বাঘে নিয়ে যায়।

বাইরের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে গাঁয়ের অনেককে নিয়ে ফকির জমিয়ে তুলেছে। চৈতের

রোদে নতুন মাটি দেওয়া ভেড়ি নোনা ফেটে চিক চিক করছে। তাকালে চোখ ঝলসে যায়, তবুও তার দিকে তাকাতে ইচ্ছা করে। দক্ষিণ-পূব কোণে ভেড়ির ও-পারে নদী পর্যন্ত কোন গাছ-গাছড়া বিশেষ নেই। ওপারে বনের পাতার ছাতা স্পষ্ট চোখের ওপর ভাসে। গাঢ় সবুজ রেখা লোনায় ঝলসান দৃষ্টিকে যেন খানিকটা শান্ত করে।

করিম ঢালি এখন বুড়োর মধ্যে। চুলে বেশ পাক ধরেছে। বলল, ফকির, আমরা তো ভেবেছিলাম, বিয়ে থা দিয়ে কলিমকে এবার সংসারী বানাব। তুমি তো বানিয়ে বসলে বাওয়ালি।

—তাতে কি হয়েছে। বাউলে হলে তো সংসারী হতে মানা নেই। তবে কি জানো? বাউলে হতে তো একটু সময় লাগে, তাই যা। তা আর ক'দিন। চার সন তো কাবার, আর ছ' বছর মাত্তর! কি রে কলিম! তাই না?

কলিম নির্বিকারের মত বলে—অতো হিসেব নিকেশ কিসে? যা দরকার, তা তো করতে হবে।

আনন্দ গাজী কলিমের সমবয়সী। খানিকটা ঈর্ষা নিয়ে বলে,—'বাউলে হতে' কেন? কলিম তো বাউলে হয়েই আছে। তুমি ফকির কতটা মন্তর দিয়েছ জানি না, সে তো এমন অসুখ-বিসুখ নেই, এমন কাজ অকাজ নেই......সর্বঘটে বাউলেগিরি করে বেড়ায়। ভাটোর মানুষই এমন...সব তাতেই বিশ্বাস!

আনন্দ গাজী শ্লেষ ও ব্যঙ্গ করতে চাইলো, ফল হলো উল্টো। ফকির কলিমের দিকে তাকায়, কলিমও ফকিরের দিকে। চোখাচোখি। কলিমের ঠোঁটে আনন্দ গাজীর প্রতি অবজ্ঞার হাসি, ফকিরের চোখে মমতার ধারা। ফকির আস্তে আস্তে চোখ সরিয়ে নিয়ে আনন্দ গাজীর উদ্দেশে বলে,—শোনো গাজীর পো,...মন্তর! মন্তরের কথা বলছ? বলি আর না বলি, তোমাকেও এখন ইচ্ছা করলে মন্তর বলে দিতে পারি। তাতে কি তুমি বাউলে হতে পারবে?

ফকিরের গুরু-গম্ভীর আওয়াজে সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বাক্যহীন। একটু থেমে ফকির বলে যায়,—শোনো তবে একটা ঘটনা।...সত্যি ঘটনা, ইচ্ছা করলে খোঁজ নিয়ে দেখতে পার। ১৭৯ নং লাট তো সবাই জানো। মালঞ্চ গাঙের মোহানা। পূবদিকে হরিখালি। তোমরা বোধ হয় দেখেছ, এই গাঙের গায়ে এক পোড়োবাড়ি। জানি না, এখানে নাকি এককালে নেমকের খাদাড়ি ছিল।...পনরো যোলো বছর আগের ঘটনা। বৃদ্ধ এক সাধু। এক সময় নাম ছিল গুরুচরণ দাস, ডাকতো সবাই সাধুবাবা বলে। বনে বনে তপস্যা করে বেড়াতো। এর আগে নাকি আশ্রয় ছিল তেরকাটির বাদায়। কত বছর যে এই বাদায় কাটিয়েছে তার ঠিক্-ঠিকানা নেই। শেষবেশ হরিখালি বাদায় এই পোড়ো বাড়িতে আশ্রম পাতে। জানো তো, হরিখালির বাদাকে বাঘের সাঁই বলা যেতে পারে। এ বনেও তার অনেকদিন সাধন-ভজন চলে।......তার কি আর মন্তরের অভাব ছিল! না, তা ছিল না।......

—কিন্তু তার শেষ কীভাবে হলো, জানো?—প্রশ্ন করে বড় বড় চোখে এক নাগাড়ে তাকিয়ে রইল আনন্দ গাজীর চোখের ওপর। সবাই স্তব্ধ।

চোখ নামিয়ে এবার কলিমের দিকে তাকিয়ে নিজেই ধীরে ধীরে উত্তর দিল,—শেষ-বেশ তাকে বাঘের পেটেই যেতে হয়েছিল।

*   *   *

দুপুর গড়িয়ে গেছে। ভিতর-বাড়ির বারান্দায় পাত পড়েছে। সবাই একসাথে খেতে বসবে। ফকিরের ইচ্ছা তাই। তবুও তার মাঝে ফকিরের আসন একপাশে ভিন্ন করে করা হয়েছে। সবাই বসেছে। কলিমকেও বসতে দেখে ফকির একটু অবাক তা হলে পরিবেশন করবে কে ?

ফকিরের সন্দেহ ভঞ্জন করে পরিবেশক হাজির। সাদা তবন পরনে। ডবল বেড় দিয়ে পরতে গিয়ে আঁচল চুলের গোছা ছুঁয়েছে মাত্র। তাতে কিন্তু 'চলনে-ফেরনে' কোন জড়তা নেই। পরিস্ফুট যৌবনের আবরণেও এমন জড়তাহীনতা বৃদ্ধ ফকিরকেই যেন জড়সড় করে তুলল। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। বাকি কারও মুখে বা কথাবার্তায় কোন সঙ্কোচের প্রতিফলন না দেখে, ফকিরেরও স্বাভাবিক হতে সময় লাগে না। খেতে খেতে প্রশ্ন করল,—এমন রান্না তো অনেকদিন খাইনি ! কে এই কলিম ? এ বাড়ির গিন্নি বুঝি !

গিন্নি উবু হয়ে পরিশেন করছিল। কলিম তার দিকে তাকিয়ে বলল,—না ফকির। এ বাড়ির গিন্নি হতে যাবে কেন। ও হলো বাদার গিন্নি !

—কি রকম !!

মুখরা লায়লা অনেকক্ষণই চুপ করে আছে। যার কাছে প্রত্যাশা থাকে, তার সামনে মুখরাও বুঝি অবলা হয়ে পড়ে। কিন্তু আর কতক্ষণ ! লায়লা পরিবেশনের হাতা হাতেই রেখে নিটোল বাহুর কনুই হাঁটুর ওপর ভর করে ধীরে ধীরে বলল,—বাদার গিন্নি কি ছাই হতে পেরেছি ! তার চেয়ে না হয় বলো, আবাদের গিন্নি !

বাদা-আবাদের বিতর্কে ফকিরের মজাই লাগে। আলোচনা দীর্ঘায়িত করবার ইচ্ছায় ফকির আবারও বিস্ময় প্রকাশ করে,—কি রকম !

আনন্দ গাজী সহসা ব্যগ্র হয়ে বক্রোক্তি করল,—বুঝলে না ফকির, বাদায় যেতে চায়, আর তা তোমার সঙ্গে।

ফকির আরও অবাক। প্রশ্ন করে, কেন, আমার সঙ্গে কেন ?

—উনি যে আবার এ চকের দাই-ডাক্তার। কি জানি মন্তর পড়ে বেড়ায় কিনা ! ওকাজ একবার ওর হাতে এলে আর রক্ষে নেই কিন্তু। কোনও বুড়-বুড়ীর কথা মানবে না, শুধু গরম জল আর গরম জল, আগুন আর আগুন করে বাড়ি মাৎ করে তোলে।

খই ফোটার মত আনন্দ গাজীর কথাকে উপেক্ষা করে ফকিরের পাতে বড় একটা গলদা চিংড়ীর মাথা ঢেলে দিয়ে লায়লা ধীরে ধীরে বলল,—হজ্ না করলে কেউ কি হাজি হতে পারে ! বন-বাদাড়ে বনবিবির দয়া না পেলে কোনও কাজ হাসিল হয় ! না হওয়া সম্ভব !!

কথা শুনে ফকির গলদার মাথার দিকে তাকাবে, না লায়লার মুখের দিকে তাকাবে ! সামলে নিয়ে বলল,—তা বেশ ! তোমার আর অসুবিধে কি ? তোমার চকেই তো এই জোয়ান বাউলে রেখে যাচ্ছি। এমন বাউলে আর কোথাও পাবে না কিন্তু !

বেগতিক দেখে কলিম কথা না বলে পারে না,—ঠাগ্‌রোণ ! জানই তো, দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝ গাঙে ডুবে মরা !

ফকির রাগের ভাণে বলে,—রাখ্, ডোবা-না-ডোবা ঠাকরুণ বুঝবে ! বলেই গলদার লাল টকটকে ঘিলু বুড়ো আঙুলে তুলে ধরে বলল,—কয়রা গাঙের চিংড়ীর সোয়াদই আলাদা ! তাই না !

তখনকার মতো কথার মোড় ঘুরে যায়। আনন্দ ও অপরিসীম তৃপ্তিতে উৎসব শেষ হলো।

* * *

বেলা পড়ে এসেছে, ফকির এবার যাবে। ভাটিতে যেতে হবে, আর দেরি করা ঠিক নয়। কলিম ঘর-বার অনেকবারই করল, কিন্তু লায়লার সঙ্গে দেখা হয় না। কখন যে কলিমের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, তা কেউ জানে না। যাবার আগে লায়লার সঙ্গে দেখা হবার আশায় ফকিরও অনেক গড়িমশি করেছে। কিন্তু আর দেরি করলে যে মাঝ পথে বেগোনে পড়তে হবে। কলিমকে জিজ্ঞাসা করলে বললো,—ছেড়ে দাও ওর কথা, ফকির ! ওর কি কোনও তালের ঠিক আছে ! শিক্‌লি কাটা টিয়ে কারও পোষ মানে না। বুঝলে না, ফকির ! ওর আনাগোনার কোনও হিসেব নেই !

আশেপাশের সবাই ভেড়িতে হাজির। পুরো ভাটির টানে লগির মাথা তরতর করে কাঁপছে। যে যার লগি তুলতে উদ্যত। তুলতেই নৌকা চলবে সাঁ সাঁ করে।

এমন সময় লায়লা হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে হাজির। হাতে মাটির সানুক। তাতে ভর্তি পান আর সুপুরি। পান-সুপুরি আবাদে দুর্মূল্য বস্তু। তবু তার প্রতি বাদার মানুষের আসক্তির অন্ত নেই। হাটুকাদায় নেমে এসে সানুকখানা টিপ্‌ করে গলুইতে রেখে বলল,—ফকির, আম্মাকে দিও।

ম্লান হাসি হেসে ফকির বলল,—কেন ? আর কেউ বুঝি ভাগ বসাতে পারবে না !

বিদায় জানাতে অনেকে নেমে এসেছে চরের হাঁটু কাদায়। সবার আগে কলিম ও লায়লা। বাঁধন ছাড়া পেতেই নৌকা স্রোতের টানে পড়ল। চৈতে বাদার স্রোতের টান বড় দুরূহ, যেন সব কিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে। বৃদ্ধ ফকির তখনও গলুই-এর ওপর দাঁড়িয়ে। দাড়িগুলি হাওয়ায় দুলছে। প্রশান্ত দৃষ্টি চোখে মুখে। একবার শুধু বলল,—কলিম, এই চকের মানুষ কিন্তু তোমার জেম্মায় রইল !

দশ

এই জেম্মার পেছনে কিন্তু কোনও আনুষ্ঠানিক ভিত্তিও নেই, দায়-দায়িত্বও নেই। কে বাওয়ালি হবে, অন্যের প্রতি বাওয়ালিরই বা কি দায়িত্ব থাকবে—তা নিয়ে আবাদ অঞ্চলে কোনও সংহিতার নিধানও যেমন নেই, কোনও পীরের ফর্‌মানও তেমনি নেই। তবু বাদা আবাদের কঠিন বাস্তব যুদ্ধে যে একবার বনওয়ালি বা বাওয়ালি বলে প্রতিষ্ঠিত হলো, তার এ দায় থেকে রেহাই নেই। বাওয়ালিরাও এ দায় থেকে মুক্ত হতে চায় না। চায় না বলেই তো সে বাওয়ালি।

কিন্তু এই 'জেম্মা' কথাটা কানে যেতেই আনন্দ গাজীর মনে খটকা লাগে। অজানিতে মনের গভীর কোণে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অঙ্কুরিত হয়। আবাদের মানুষ বনের আওতায় বটে, কিন্তু বন্যজীবন তো নয়। জীবিকার সন্ধানে এদের লাঙল ও জমিকে তো ভর করতে হয়েছে। আর লাঙল ও জমির ওপর একবার ভর করলে, কালের গতিতে তাকে জমিদারের জেম্মায় গিয়ে পড়তে হবে। হয়েছেও তাই।

তবুও এ অঞ্চলে জমিও যেমন সত্য, বনও তেমনি সত্য। জমি ও বন—এই দ্বন্দ্ব সমগ্র মানুষের মনে ও সামাজিক আচরণে আজও প্রতিফলিত হয়ে আছে। জমিকে কেন্দ্র করে জমিদার হয়ে উঠেছে 'মা-বাপ' আর বনের স্বীকৃতিতে বনওয়ালি আজও হয়ে আছে আপদে-বিপদে ভরসা ও বিশ্বাসের উৎস। এ যেন আবাদের মানুষের জেম্মার অধিকার ও

দায়িত্ব নিয়ে জমির মলিক ও বনবিবির দ্বন্দ্ব। লোক-সাহিত্যও তার সাক্ষ্য দেয়। বনবিবি ও দক্ষিণা রায়ের যুদ্ধ ও বিবাদের পেছনেও এক সময় এই অলঙ্ঘনীয় প্রতিযোগিতাই প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা অঙ্কুরিত হলেও, আনন্দ গাজী কিন্তু জমিদার নয়! তবে জমিদারের অঙ্গ। সমৃদ্ধ চাষী। ক্ষেতকর্ষণকারী কৃষকের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস যেমন তার রক্তে আছে, তেমনি আছে বা দেখা দিয়েছে প্রবঞ্চনায় সমৃদ্ধ হবার প্রবৃত্তি। প্রায় দেড়শ' বিঘার মালিক সে। এর অর্ধেক জমি নিজের জোত, বাকি অর্ধেক বর্গাভাগে। নিজেও যেমন গতরে খাটে, তেমনি অপরের গতরে ভাগ বসাবারও ফিকিরে থাকে। কিন্তু তাতেও বিশষ এসে যেত না। আনন্দ গাজীর বাপ্‌জান 'বুধো লাঠেল' এ চকে নিঃস্ব অবস্থায় আসে। এসেছিল মিত্রদের হাতিয়ার হয়ে। মালিকের শঠবৃত্তির অনুকরণেই বুধো লাঠেলের সংসারে এসেছে এই দেড়শ' বিঘার মালিকানা। তাই জমিদার না হয়েও জমিদারি প্রবঞ্চনার প্রতীক হয়ে উঠেছে আনন্দ গাজী।

ত্রিশ বছর আগের কথা। ষোলো সনের ঝড়েরও কয়েক বছর আগে কলকাতার মিত্ররা মঠবাড়ির মালিকানা আয়ত্তে আনে। ১৮৭৯ সালের বন-আইন তখন খুলনার এ অঞ্চলে পুরো চালু। এই আইনে বন থেকে আবাদই শ্রেয় বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। যে কোনো ভাবে বনাঞ্চল থেকে রাজস্ব বাড়াতে হবে। কাজেই সুন্দরবনের উত্তরাঞ্চল উজাড় হতে থাকে। যে কেউ এসে বনের ৫০০০ হাজার বিঘার লাট চল্লিশ বছরের ইজারা নিয়ে আবাদ করতে পারতো। ছোটদের তো কথাই নই। ২০০ বিঘা পর্যন্ত ইজারা নিলে তো দু'বছর বিনা খাজনায় ভোগ করতে পারতো এবং পরে ত্রিশ বছর মেয়াদে ইজারা নেবার অধিকারী হতো মোকররি স্বত্বে।

মিত্ররা এই সময় জ্বালানি কাঠের ব্যবসা সূত্রে সুন্দরবনে আনাগোনা করে। টাকা হাতে আসতেই এমন সুযোগ ছাড়ার মানেই কিছু ছিল না। মিত্ররাও সুযোগ ছাড়েনি। মঠবাড়ির এই দশ হাজার বিঘার লাট ইজারা নিয়ে মাটি গেড়ে বসলো। পাঁচ ছয় হাত মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে অমানুষিক মেহনত করে গাছের ঁড়ি উজাড় করতে লোকের অভাব বিশেষ হয়নি। কৃষকের নিঃশ্বাসে মাটির গন্ধ একবার পেলে অসম্ভবকে সম্ভব করা কিছুই না। তারা ভেবেছিল তাদের রক্ত ঝরে যে জমিতে সোনার ফসল ফলবে, তার অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করতে কেউ এগিয়ে আসবে না।

কিন্তু জন ও জমি হলেই জমিদার হওয়া যায় না। ব্যবস্থাপনাও চাই। কে করবে এই ব্যবস্থাপনা। ইংরেজ? লোনা দেশে বন-বাদাড়ে তার আয়োজন করতে তাদের খরচে পোষাবে না। আবশ্যকই বা কি ছিল তার। ফলে দেখা দিয়েছিলো ইজারাদারদের অবাধ আধিপত্য। এই আধিপত্যের সূত্রে অন্য ইজারাদারদের মত মিত্ররা সূত্রপাত করলো সাকরেদ ও লাঠিয়ালের দল।

এলো বুধো লাঠেল। লাঠিই ছিল তার সম্পদ। এক পুরুষের মধ্যে লাঠির সম্পদ রূপ নিল জমির সম্পদে। লাঠেল হিসেবেই এসেছিল, কিন্তু লাঠির কেরামতি বিশেষ দেখাতে হয়নি। বাদাকে আবাদ বানাতে এসে অপরের পেছনে লাগা অপেক্ষা সকলের সমবেত প্রচেষ্টার আবশ্যকই বেশি। লোনা দেশের শতমূলী গুড়িকে উচ্ছেদ করতে হলে, আর বারো তেরো মাইল ব্যাপী মাটির প্রাচীর তুলতে হলে চকের সমস্ত মানুষের সামগ্রিক চেষ্টা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কাজেই প্রথম প্রথম এক পরিবারের মত বাস করতে হয়েছিল সবাইকে।

কাজ থাকলে কাজী, কাজ ফুরুলে পাজি,—যে সমাজে শোষণের স্বীকৃতি আছে সেখানে

হাজারো নীতিবাক্যের আড়াল দিলেও এই ঘটনা তো অবধারিত। কাজ হাসিল হয়েছে,—জমি উঠেছে, বাঁধও উঠেছে। অমানুষিক পরিশ্রম ও যত্নে লোনা মাটিও হেসে উঠেছে। কয়েক বছর গড়াতে না গড়াতে জেঁকে উঠল মিত্তিরদের কাছারিও। নায়েব, গোমস্তা, পাইক ও বরকন্দাজের আনাগোনায় কাছারি বাড়ি সরগরম। প্রবঞ্চনার পাট শুরু হলো। এলো বিভেদ নীতি, একে অন্যের বিরুদ্ধে লাগিয়ে জমি বেহাতের কারসাজি। বুধো লাঠেল তো তৈরিই ছিল এর জন্য।

একপুরুষ পরে আনন্দ গাজীও কম কৃতিত্ব দেখায়নি এ কাজে।

কাছারি-বাড়ির বারান্দায় বসে গড়গড়া টানতে টানতে পেরভাস নায়েব হুকুমের সুরে বললেন,—আনন্দ ! পারবে না এ কাজ ?

—এমন কি কাজ আছে নায়েব মশায়, যাতে বুধো লাঠেলের বেটা লেজ গোটাবে ! হাজার হলেও তো তারই রক্ত আমার গায়ে ! কিন্তু কি কাজ বলুন তো ?

—তুমি কিচ্ছু না ! কোনও খবর রাখো না।

চতুর আনন্দ গাজী আন্দাজেই ঢিল মারল,—নিশ্চয় মঙ্গলা পাটনির কথা বলছেন !

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! শালার বড় বাড় হয়েছে। বলে কিনা, ছাড়বে না ভিটে মাটি,—বলে কিনা, হয়ে যাক ফাটাফাটি। ছিলি তো বেশ, খাচ্ছিলি দাচ্ছিলি। লোভ হলো কিনা বড়লোক হবার। খোরাকির ধান বেচে এক বাতিল বাছারী ডোঙা কিনে দিলি তো শিব্‌সার গর্ভে !

নায়েবের সুরে সুর মিলিয়ে গাজীও বলতে শুরু করে,—যাবে কোথায় যাদু ! দেনার দায়ে এবার জেরবার ! দেড়াবাড়ির দেনায় পড়লে সরষে ফুল দেখিয়ে ছাড়বো না !

—শুধু কি তাই ? শালার ফন্দি দেখো। নিজের চাষের ধান রাতারাতি নিজে সরিয়ে বলে কিনা, চোর চুরি করেছে !

—যা বলেছেন ! আমি বলে দিতে পারি, কোন্ চকে ও ধান সরিয়েছে। দেনা শোধ দিতে গিয়ে ধান না হয় ঘরে না তুলতে পারতিস্, চক্রবৃদ্ধি সুদে আবার কি তোকে মিত্তিরদের কাছারি ধার দিতো না ! কি বলে তুই অন্য চকে চোরাই ধান চালান দিলি !

নায়েব এবার রাগের বা রাগ দেখাবার ভাণের চরমে। বললেন,—কিছুতেই এ সহ্য করব না ! ওনার চোরাই ধানের জন্য আমরা যাই কিনা অন্য মালিকের সঙ্গে বিবাদ করতে। হবে না, কিছুতেই হবে না।...লাঠেলের পো !—বলেই নায়েব অন্য দিকে তাকালেন।

—যে-আজ্ঞে !

—যে-আজ্ঞে নয়, আজিই ওকে ভিটে ছাড়া করতে হবে !!

—বেশ......দেখবেন, কেমন করে ঘুঘু চরাই !

* * *

মঠবাড়ির পশ্চিম ধারে মঙ্গলা পাটনির নীড়। নিতান্ত অগোছাল ও অপরিচ্ছন্ন মাথা গুঁজবার ঠাঁই। তবুও দূর থেকে দেখলে নীড়ই মনে হবে। শীর্ণ খরস্রোতা শাঁখবেড়ে পশ্চিমের সীমানা। শাঁখবেড়ের সীমানা ধরে এক সার কেওড়া গাছ সমরেখায় দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ ও ঝাঁকাল গাছগুলি। চকের আর কোন অঞ্চলে এমন দীর্ঘ গাছে সমন্বয় নেই বললেই হয়। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়লে, সবুজ প্রাচীরের কোলে এই আঙিনাগুলিতে আলো ও ছায়া এক মায়াজাল সৃষ্টি করে। বনের মমতা যেন ঝরে পড়ে।

বেলা না গড়াতেই আনন্দ দলবল ও লাঠিসোটা নিয়ে মঙ্গলা পাটনির ভিটেয় হাজির।

আশেপাশের চাষীদের মন তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে। ও চোর! নিজের ধান নিজে চুরি করেছে। পড়াপড়শিরা কেমন করেই বা চোরের পক্ষে দাঁড়ায়! যতটা সম্ভব দূরে দাঁড়িয়ে নীরব দর্শক হয়ে রইল ওরা।

দণ্ডধারী আনন্দ আদেশ দিল,—বেরো শালা, সম্বল যা আছে, নিয়ে বেরো! শীগ্‌গির বেরো!

সম্বল বা সম্পদ আছেই বা কি পাটনির! ছেড়া কাঁথা ও মাদুর, সুন্দরী কাঠের লাল টকটকে একটা পেট্‌রা, আর কিছু মাটির হাড়িকুড়ি। পাটনি তাই গুছিয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে পড়ে। আর তো কিছু তার সম্পদ নেই। তার সততার সম্পদ সে হারিয়েছে। নিজের ধান নিজে চুরি করেছে। চোর সে!

না, তার মস্ত বড় এক সম্পদ আছে। পাটনি বৌ-এর কোলেই সে সম্পদ। মাত্র অল্প ক'দিন হলো এই সম্পদ তার ভাগ্যে এসেছে। পাটনি বউ-এর কোলে কচি শিশু কেঁদে ওঠে। ঘরছাড়া হয়ে তপ্ত রৌদ্রের ঝলক গায়ে লাগতেই মায়ের বুকের উপর মুঠো করা হাতখানা কাঁপাতে কাঁপাতে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে। প্রতিবাদ জানায় বুঝি!

না, প্রতিবাদ জানাবার আরেকজনও ছিল। লায়লা। এই সেদিন সে এই শান্ত ঘরে সারারাত কাটিয়েছে নবজাতককে মায়ের হাতের স্পর্শে এই পৃথিবীতে প্রথম আহ্বান জানাতে, তার আনন্দ ও বেদনার প্রথম অংশীদার হতে। লায়লা প্রতিবাদ জানাল। বলল,—তোমরা বুঝি এর জন্ম ভিটেটাও কসুর করবে না!!

এর পর আর কেউ কিছু বলেনি। কিছু বললেও তা স্বগতমাত্র। লাঠি ও কুড়ুলের আঘাতে মঙ্গলা পাটনির শূন্য নীড় লুটিয়ে পড়ল। সবাই তাকিয়ে ছিল সেদিকে। হাড়িকুড়ি গুছিয়ে নিতে নিতে লায়লা বলে,—পাটনি, আজকের মতো আমার ঘরেই থাকবে চলো।

এগার

পাটনিকে ভিটে ছাড়া করার প- অনেক দিন কেটে গেছে। পাটনি বা পাটনি বউ-এর খবর কেউ বিশেষ রাখে না। এ চকের সবই প্রায় উড়ে আসা লোক। পাটনিও উড়ে এসেছিল, উড়ে চলে গেছে। এ দেশে ডানা মেলতে সময় লাগে না। ছোট্ট একখানা ডিঙি হলেই হলো। অগণিত নদী নালা-পথে যে কোনও দিকে উবে যাওয়া যায়।

এই উবে যাবার প্রাক্কালে পটানি-সংসারের আনন্দ ও বেদনার কিছুটা ভাগী হয়েছিল লায়লা। এমন ভাগীদার সে অবশ্য এই চকের অনেক সংসারের সঙ্গে। তবুও এই বেদনাসিক্ত বিদায়ের ছাপ লায়লা সহসা মুছে ফেলতে পারেনি।

কাছারি বাড়ি যাবার পথে লায়লা একদিন আনন্দ গাজীর বার-বাড়ির দাওয়ায় এসে লেপ্‌টে বসে পড়ে। মেয়েরা অমন করে লেপ্‌টে বসলে বুঝতে হবে—একটা কিছু কাজ হাসিল করে নিয়ে যাবে বলেই অমন করে বসেছে।

যেখানে বসেছে সেখান থেকে ভিতর-বাড়ির খানিকটা নজরে পড়ে। দেখা যায়, আনন্দের বিবি কুড়ুল নিয়ে একটা গাছের মুড়ো খণ্ড করার চেষ্টা করছে; পেরে উঠছে না। দেখতেই লায়লার কলিমের কথা মনে পড়ে। বিবিদের কাঠ চালা করতে দেখলেই কলিম যেন রেগে ওঠে! ফুফুকেও দেয়নি সে এ কাজে কোন দিনও হাত দিতে।

আনন্দ গাজীর সঙ্গে সলাপরামর্শ করা নিয়ে লায়লার কোন আড়ষ্টতা থাকার কথা নয়। আতুর ঘরের কাজে লায়লার আনাগোনা তো আছেই, তার ওপর মৃত্যুর আগে অবধি

সোয়ামী ছাদেক কাজে-অকাজে আনন্দের বন্ধুও ছিল। ইদানীং আবার ফাঁকেফুঁকে লায়লার সঙ্গে গল্প করার ব্যগ্রতাও আনন্দের দেখা দিয়েছে।

আজ অমন করে জাপটে বসতে দেখে বিশেষ ঔৎসুক্য নিয়েই আনন্দ বলে,—কি গো! কি খবর বলো।

—কি আর বলবো বলো! সেদিন অমন করে পাটনিদের তাড়ালে কেন বলতো?

কথার ধরনেই আনন্দ যেন আন্দাজ করে, এ কথা বলার জন্য লায়লা আজ এমন করে আসেনি। তবুও সংলাপের আগ্রহে বলে,—পুরনো কাসন্দি ঘাটছো কেন? সে তো অনেক দিন হয়ে গেল! তড়ালাম কি বলছো? ও তো নিজেই তাড়াবার পথ করে দিল।

—কেন, থাকলে কি হতো তোমাদের। তোমাদের তো কোনও লোকসানই হচ্ছিল না। হচ্ছিল? ধান কেটে তো ক্ষেতের সব ধানই তুলছিলো কাছারিতে। ভাগের ভাগ তো কিছুই নিতে চায়নি সে। সবই তো রাজ-ভাগে দিয়ে দিতো।

—দিতো কি বলো! নিতাম আমরা। কিন্তু তারপর?

—তারপর আর কি ! কর্জ ধান দাও তো! তার তো চক্করবিদ্ধি সুদ। তাতে আবার বছর ঘুরলে দেড়া-বাড়ি। এক বিশ দিলে, ঘরে আসে দেড় বিশ। লোকসান কি ছিল তোমাদের?

—মেয়েলি বুদ্ধি তো! ওর বেশি আর কি বুঝবে!

লায়লাও মেয়েলি প্রতিবাদ করে ওঠে,—যাক্, আর বুঝতে চাই না!

—না চাইলে শুনবো কেন? আরে, রাশিতে তাকে পালি না দিতে দিয়ে গোটা ধানই না হয় নিলাম, তাই বলে তো জমি ফেলে রাখতে পারি না! শাবন মাস এলেই তো জমি পাট করতে হবে। খাইয়ে জিন্দা রাখতেই তো হবে। দফে দফে খোরাকি-ধান দিতে হয় না? না কি?

—তা না হয় দেড়া-বাড়ির সুদে একটু খয়রাতি করলে! মেরে তাড়াতে যাবার দরকার কি ছিল?

—আপত্তি ছিল না। কিন্তু কি জানো? অমন হতে থাকলে চাষ বাস হয়ে আসে বেগার। আর বেগার-চাষে ফলন কি হতে পারে বুঝতেই তো পারো! হবে কেন! মন তখন থাকে বাদার চোরাই কাঠ আর চোরাই মাছের দিকে। তাতে চাষ-আবাদে লাভের লাভ কি হয়, তা ধরেই নিতে পারো। ঐ বনই হয়েছে বিষ!

—মালেকের কাছে বিষ তো বটেই!! তাই অমন লোককে ভিটে-ছাড়া করাই লাভ!!

—লাভ নয় তো কি? জমির মাথায় তো ঐ এক টুক্‌রো ভিটে। ভিটে-ছাড়া না করলে সেখানে নতুন ভাগী আসবে কেন? এলেই বা তারা ঘর বাঁধবে কোথায়?

লাভ-বেলাভের বাকি কথাটা লায়লাও জানে, আনন্দও জানে। নতুন ভাগীদার পত্তন মানে নগদা সেলামী। এই নগদাসেলামীর ভাগীদার যে আনন্দ গাজীও, সে খবর লায়লার কানে নানা পথ ঘুরে এসেছে। আনন্দ তারাই আশঙ্কায় অন্য কথায় যেতে চায়,—বলি, মঠবাড়ির মেয়ে! তোমার বাউলের খবর কি?

কলিমের অনুকরণে এমন মিষ্টি ডাকে রোমাঞ্চিত হলেও 'তোমার বাউলে' কথায় লায়লা চমকে উঠল।

চমক্ ঢাকা দিতে লায়লা তাড়াতাড়ি বলল,—সেই কথাই তো বলতে এসেছিলাম। বলছিলাম কি, আমিও তো এখন দেড়া-বাড়ি সুদের ধকলে। পরপর দু'সন তো আল্লায় ধান দেয়নি। এমন করে তো হয় না। একটা কিছু হদিশ দেখতে তো হয়! নায়েবকে বলবো

কিনা, তাই ভাবছিলাম। বাউলে তো বাদ সাধে! বলে কিনা, ও মুখো হয়ো না।

—ও তো বলবেই। থাকে তো বাদায় পড়ে। আবাদের পেটের জ্বালা ও কি বুঝবে! না, তার ধার ধারে! কি কষ্টে নাই আমরা বাঁচিয়ে রাখছি চকের মানুষগুলোকে! মরলেও এদের সক্কলকে নিয়ে মরতে হবে, বাঁচলেও এদের সক্কলকে নিয়ে বাঁচতে হবে।

কথাগুলি আনন্দ এমন আবেগ নিয়ে বলে যে লায়লার মনেও তার ঝঙ্কার লাগে। পৌরুষোচিত আবেগে সব মেয়েই তো একটা আশ্রয়ের আশ্বাস অনুভব করে। লায়লাও বাদ যায় না। তবু লায়লা নিজেকে সংযত রেখে কোনও কিছু আর বিশেষ বলে না। দাওয়া থেকে উঠে তখন ঝাড়তে ঝাড়তে বলল,—যতো জ্বালা হয়েছে আমারই। আর যাই পারি, মাঠের লোনা কাদা-জলে গিয়ে তো লাঙল জুড়তে পারি না। পারলেও কি হবে, ... অমন কিল-বিলে জোঁকের কামড় কি করে তোমরা সও, তা তোমরাই জানো!......আছে তো মাত্র কয়েক রশি জমি। কিষেণ খরচ দিতেই ডোল কাবার। কোন্ পথে যাই বলো......

কথা বলতে বলতে লায়লা হুড়কো ঠেলে ভেড়িতে উঠবার উপক্রম দেখে আনন্দ দাওয়া থেকে উঠানে নেমে এসে বলল,—তা বেশ, এসো একদিন, কথা হবে।

★ ★ ★

যে কথা লায়লা আনন্দের কাছে পাড়তে এসেছিল, তা না বললেও, আকারে ইঙ্গিতে আভাষ দিয়ে গেল। এরপর আনন্দের কাছে আর সহসা ভিড়তে চায়নি। অভাবের তড়না দিন দিন বাড়লেও, দাঁত কামড়ে যেন পড়ে থাকতে চাইল লায়লা। অন্য কোন কারণে নয়; আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্রের সবগুলি লক্ষণই ছিল—ফসল এবার ঢেলে দেবে ধরিত্রী। অম্বুবাচীর বর্ষণ ধারাই এবার এই আশা প্রথম অঙ্কুরিত করে তোলে। চাষীর আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। অগ্রহায়ণের হিমে পুষ্ট ফসলে ভারাবনত হয়ে নুয়ে পড়ল ধানের শিষ।

কিন্তু বিপদ এলো এবার এই চকের জীবনে অন্য পথে।

মঠবাড়ির উত্তরে চৌকুনির আন্দে হাহাকার উঠেছে। যেন উজাড় হয়ে যাবে আবাদী মানুষ ঝাড়ে বংশে। বন ও আবাদের বিপদকে এরা জানে। তখন এরা লড়াই করে, এবং লড়াই করে এরা বাঁচে। আসুক প্লাবন, ধুয়ে মুছে নিয়ে যাক্। তবু লোনা পানিতে হাবুডুবু খেয়ে কেমন করে এরা যেন সে-সব বিপদ কাটিয়ে ওঠে।

কিন্তু এ যে করাল বিষ! ওলাওঠা। এ যাত্রা যেন নিস্তার নেই। কোথায়, কখন বা কীভাবে এর আগমন, তার অনুসরণ এদের অসাধ্য। আবাদী বেপরোয়া আচরণও এর কাছে নিস্তেজ। চৌকুনি আর কতদূর! গাঙ পার হলেই চৌকুনি। এদেশে সব কিছুই যেন হু হু করে ছোটে। বাতাস হু হু করে ছোটে; নদীও জো-ভাটার টানে সাঁ সাঁ করে ছোটে। ওলাওঠার বিষও যেন মঠবাড়িতে বাতাসের সঙ্গে ছুটে এসে জেঁকে ধরল। এ-পাড়ায় কবর খুঁড়বার, ও-পাড়ায় শ্মশান চিতা নিবুবার যেন অবকাশ নেই।

সন্ধ্যার এক প্রহর কেটে গেছে। এমনিতেই আবাদের মানুষ বলতে গেলে সাঁঝের আগেই শয্যা নেয়। মিছিমিছি টেমি জ্বালিয়ে বে-হিসেবী হতে চায় না। সন্ধ্যা হতে না হতে আবাদ যেন ঝিমিয়ে পড়ে। আবাদী অন্ধকারের রূপই আলাদা। অজস্র খরস্রোতার শুভ্র জলরাশি থেকে বিক্ষিপ্ত আলো আবাদের তমসাচ্ছন্ন অমাবস্যার অন্ধকারকেও রহস্যময়ী করে তোলে। ঝিমিয়ে পড়া সেই আবাদী সন্ধ্যা আজ যেন হয়ে উঠেছে মৃত্যুর করাল ছায়ায়

আরও থম্‌থমে। এমন অন্ধকারে চকের ঘেরে মানুষের ছায়া দেখলে, যে কেউ আঁতকে উঠবেই।

দাওয়ায় অর্ধশায়িত কলিম তেমনি এক ছায়া দেখে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে হাঁক দিল—কে ?…কে ?

কোন জবাব নেই। ছায়া এগিয়ে আসে। কলিম গলা খাঁকার দিয়ে আবার হাঁক দেয়,—কে ?

তবু কোন জবাব নেই। তবে কি সেই নিশাচরী জেন ! যার তপ্ত নিঃশ্বাসে আবাদ আজ এমন ভাবে উজাড় হতে বসেছে।

বাঘের বাউলে অতো সহজে হার মানবে কেন ! কলিম উঠে এসে রুখে দাঁড়াল,—কে ?

—বাউলে ! অমন করো না, আমার ভয় লাগে। চলে এসো, তোমার আসতেই হবে !

কলিম থ' মেরে গেছে,—লায়লাবিবি ! ঠাগরোণ ! তুমি এই রাত্রে ?

আর কেউ হলে তার সামনে লায়লা কখনই কাঁদত না। অনেক আঘাত ও বেদনা তার চোখের জল শুকিয়ে দিয়েছিল। অবশেষে ঘর ঘর কাজে-অকাজে নেমে পড়ে অনেকের চোখের জল মোছাতে গিয়ে, নিজের চোখের জলের কথা ভুলেই বসেছে। তবু কি জানি, এমন পরিবেশে কলিমের মুখোমুখি হতে সশব্দে কেঁদেই ফেলল।

কলিম অপ্রস্তুত। অন্য সময় হলে তামাশা করে আবহাওয়াকে হাল্‌কা করতে কলিমের সময় লাগতো না। এ যেন ভিন্ন এক কলিম। কয়েক কদম এগিয়ে লায়লার বাহু স্পর্শ করে বেদনাসিক্ত ভারি গলায় বলল,—কেন ? কি হয়েছে বলো।

লায়লা নির্বাক। অন্ধকারে কলিমের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ ও ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ততক্ষণে চোখের ধারা রুদ্ধ হয়ে এসেছে। কিছু সময় চুপ করে থেকে বলে,—জানো বাউলে, সর্বানুবিবি যায় যায় ! ভেদবমি ! আমি কি করে ঠেকাই বলো ! চলো তুমি।

মেয়েদের নামের হিসেব কলিম অতো রাখে না,—কার কথা তুমি বলছ ?

—সর্বানুবিবি, ও-পাড়ার ফট্‌কের মা। অমন ফুটফুটে কোলের বাচ্চাকে আমি কার কোলে তুলে দেব ! হবার সময় ছেলেটা কি কষ্টটাই দিয়েছিল আম্মাকে। আমি কার কাছে বাচ্চা ফেলে রাখব। চলো, সর্বানুবিবিকে বাঁচাতেই হবে তোমার !…চলো।

—তা, আমি কি করে বাঁচাব ?

—না, তুমি না মন্তর-পড়া বাউলে। পারবে না ?

—সে মন্তর তো……

—না, না, তুমি চলো। তুমি গেলেই হবে। তুমি গেলে ওদের ত্রাস কেটে যাবে, ভর্‌সা পাবে। চলো।

এমন আহ্বানে বাউলেদের পেছন-মুখো হবার অধিকার নেই। এ চকের জেম্মা যে কলিমের !

কিন্তু কলিম গিয়ে কি করবে ? জ্বর এলে বা ডরাই হলে ফু' দিয়ে ঝাড়বার কথা না হয় ভাবতে পারতো। এ যে ওলাওঠা ! 'ফু' দিয়ে কিছু করার নেই। লায়লা মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে।

আবাদের আলো-অন্ধকার। অমাবস্যার হাজার গাঢ় অন্ধকারেও চারিপাশে শুভ্রা পলিমাটি-সিক্ত নদীর আলো ভেড়ির এপাশেও প্রতিফলিত হয়ে আসে। সাদা তবনের সঙ্কুচিত ছোট অঞ্চল লায়লার মাথা থেকে ঝরে পড়তে সদ্য অশ্রুস্নাত চোখ দুটি চক্‌চক্ করে উঠল কলিমের চোখে চোখে।

একটু চুপ করে থেকে কলিম হঠাৎ লায়লার পিঠে হাত দিয়ে প্রায় জোর করে তার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে বলল,—আচ্ছা চলো।

ভেড়ির পথে দু'চার কদম এগিয়ে আসার পর লায়লা বলল,—কিন্তু ফুফুকে কিছু বলে গেলে, না ? খুঁজে মরবে যে !

—বাউলেদের আবার বলাবলি, বাউলেদের কেউই খোঁজ করে না,…এক বিপদ আপদ ছাড়া !

কলিমের কথায় মনের গভীরে এক অভিমানের সুর যে ঝঙ্কৃত হয়নি, তা বলা যায় না। যে অভিমানের সুরে ও আবেগে নারীর স্পর্শকাতর হৃদয় আবিষ্ট হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু লায়লা আজ এক ভিন্ন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে আছে। সর্বানুবিবির জীবন-মরণ-সংগ্রামে মগ্ন সে। তাহলেও তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ জলরাশিতে পাথর ফেললে, বিক্ষিপ্ত পাথরের ঢেউ দেখা দেয় না বটে, কিন্তু পাথরের ওজন ঠিকই নদীবক্ষ ধারণ করে। একটু চুপ করে থেকে সামলে নিয়ে লায়লা বলল,—চলো বাউলে, জোরে হেঁটে চলো।

জোরে হেঁটে যাবার বিশেষ কিছু ছিল ন। একটু এগুতেই সার্বানুবিবির কাতর ধ্বনি শোনা যায়। লায়লা শিশুটিকে ঘরের এক কোণে ফেলে রেখে গিয়েছিল ফকিরকে ডাকতে। কচি শিশুর অবহেলিত হবার অভিমান-ক্রন্দন মায়ের সে কাতর ধ্বনিকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

বাউলে ফকির, বাউলে ফকির এসে গেছে !—চিৎকার করে লায়লা যেন ভরসার আশা জাগিয়ে তোলে। কলিম ইতিমধ্যে মাথায় গামছার ফেটা বেঁধে ফেলেছে। লড়াইয়ের মুখোমুখি। কিছুতেই সে দমবার পাত্র নয়।

সর্বানুবিবির কাতর ধ্বনি যেন চাবিয়ে চাবিয়ে উচ্চারিত হয়,—জ-ল ! জ-ল ! জ-ল !

এলাহি বক্সকে দাব্ড়ি দিয়ে উঠল কলিম,—দে না বিবির মুখে জল। দে জল। বদনা করে জল রাখতে পারিস্‌নি !

সঙ্গে সঙ্গে লায়লাকেও ধমক,—দেখছিস্ কি দাঁড়িয়ে। ধর ছেলেটাকে, যা আগুন নিয়ে আয়। যা শীগ্‌গীর !

অচমকা তুই-তুকারির দাব্ড়িতে সবাই যেন কাঠের পুতুল বনে গেল। মৃতপ্রায় রোগিণীও বুঝি উঠে বসে।

উঠানে দাউ দাউ আগুন। কলিম তারই পাশে ঘুরতে থাকে। শ্লীল অশ্লীল গালাগালি। হঠাৎ বিকট চিৎকার—খবরদার !! খবরদার !!—চিৎকার করতে করতে ভেড়ি মুখো চললো। বিকট চিৎকারের প্রতিধ্বনি ঝঙ্কৃত হয় সারা মঠবাড়ির চকের উপর দিয়ে। একবার চিৎকার করে পূব দিকে মুখ করে। একবার পশ্চিম দিকে। পরমুহূর্তে দক্ষিণ ও উত্তর দিকে।

ফিরে আসে উঠানে। গুরুগম্ভীর আওয়াজ,—ভয় নেই ! ভয় নেই !—ক্রমশ চড়িয়ে দেয় আওয়াজ,—ভয় নেই ! ভয় নেই ! খবরদার !

হাঁফিয়ে উঠেছে কলিম। তবুও মাথার ফেটায় ঝাঁকি মেরে এপাশ ওপাশ করছে।

আবার সেই চিৎকার। এমন চিৎকার যে আশেপাশের ওড়া গাছের ঝাড়ে শিয়ালও আর ডাক দিতে সাহস পায় না। কত প্রহর কেটে গেল তাও বুঝবার উপায় নেই। চিৎকারে উত্তর ও দক্ষিণ ঘেরের কেউ কেউ এসেও পড়েছে।

প্রহর দুই কেটে যেতে কলিম একবার লায়লাকে লক্ষ্য করে বলল—কেমন দেখছিস্ ?

লায়লা আর দেখবে কি ! সহসা বলে বসে,—একটু নরমপানা।

—এমন পরিবেশে অন্য কিছু বলার বোধহয় উপায়ও থাকে না।

রোগিণী মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে, হাত-পা ভেঙে আনছে। কলিম এবার যেন ক্ষেপে উঠে লায়লাকে বলল—মজা দেখছিস্! মজা দেখছিস্! দে শীগ্‌গীর, শুকনো কাপড়ে আগুনের সেক্ দে। এই আগুনের সেক্ দে।

তারপর আবার কলিমের চিৎকার। একবার আওয়াজ নামিয়ে বলল—দে হারামজাদী, সেক্ দিয়ে যা। ভয় নেই! আমি এক্ষুণি আসছি। দেরি হলেও ভাবিস্ না। বাগে পেয়েছি···আর কোনও ভয় নেই!

খবরদার! খবরদার! বলতে বলতে কলিম প্রায় ছুটে এলো নদীর খোল ভেড়িতে। ডিঙির বাঁধন খুলে নদীর জোয়ারের টানে পড়ল। মাঝ গাঙে বোটে ধরে ভাঙা গলায় আপনমনে বিড়বিড় করে,—শালা···এ কি বাঘ তাড়ানো!! ডর দেখালেই হয়ে গেলো! হয় না।······বাঁচাও সর্বানুবিবিকে!······কি করে আমি বাঁচাই? বাঘের মন্তর নিয়েছি তো আমি ওলাওঠারও হাকিম!!

সাঁ সাঁ করে ডিঙি চলে। হাঁফ নিতে গিয়ে বাঁকের মুখে বোটের খোঁচ আবার থামিয়েছে। মুচকি হেসে উঠলো কলিম,—সর্বানুবিবি!······সাবি!·····ঢঙ্ করে নাম রাখা হয়েছে সর্বানুবিবি। মনে পড়ে, সাবির সঙ্গে ওর সাদির কথা হয়েছিল বা'জান থাকতেই। পড়লো বাধা তো আর সাদি হলো না।······না! সাদির কথা ভাববে না, সে যে মন্তর-পড়া কিরে-কবা বাউলে!······যেমন করে হোক সাবিকে—থুড়ি—সর্বানুবিবিকে বাঁচাতে হবে।······বাঁচাও, চলো,—বলেই ক্ষিপ্র বেগে বোটের খোঁচ মারল।

কয়রা গাঙের ডাল-ভাঙা বাঁক পেরিয়ে কুশোডাঙায় আবাদ। এই চকে এক ঘর বেধেছে ফ্যাঁসফ্যাঁসে ঠাকুর। কুঁড়ে ঘর। তাই বলে অবজ্ঞা করলে চলবে না। এই কুঁড়ে ঘরে আস্তানা করে বছর বছর খলেনে ধান ওঠে দেড় হাজার মণ। একশো পঁচিশ বিঘার প্রজা।

নোনামাটির মিঠে ধানের টান। যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশালের ভদ্দরলোকেরা সেই টানে পড়ে উড়ে এসে কেউ রাজা হয়, কেউ বা উজাড় হয়। মধুমতীর পুব পারে ফরিদপুর জেলার অধিবাসী—ফণিভূষণ বাড়ুজ্যে। 'ফণিভূষণ' বাদায় এসে ফ্যাঁসফ্যাঁসে, হয়নি। গলার স্বর নেই, ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কথা বলে, তাই। শুধু ঠাকুর নয়, বদ্যি ঠাকুর। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করে—তাতেও আয় কম নয়। এদেশে কুঁড়ে ঘরে অঘ্রাণ থেকে মাঘ অবধি কাটাতে হয়। সে সময় ডাক্তারিতে যেমন দিন-খরচ উঠে আসে, তেমনি প্রতিপত্তি প্রসারের ফিকিরও মেলে।

—ঠাকুর মশায়! ঠাকুর মশায়!—কলিম ডিঙি ছেড়ে ভেড়ির উপর এসে গেছে। অতো জোরে ডাকবার প্রয়োজন ছিল না। কুশোডাঙ্গা ডাঙ্গো-জমি। ইতিমধ্যে খলেনে আঁটি উঠতে শুরু করেছে। ঠাকুর মশায় সারা রাত প্রায় সজাগ হয়েই থাকেন।

চাদর জড়িয়ে খড়ম পায়ে ঝাপ্‌না সরিয়ে ফ্যাঁসফ্যাঁসে ঠাকুর উঠানে হাজির। বৃত্তান্ত শুনে মাথা নিচু করলেন। খলেন ফেলে রাত্রে তার পক্ষে কি যাওয়া সম্ভব! ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললেন,—তা কলিম তুমিই ডাক্তারি করো না, ওষুধ তো আমার কাছেই আছে, নিয়ে যাও। নিয়মমত খাইয়ে দেবে, ব্যস্। আরে, তুমিও তো ফকির! মন্ত্র পড়ে তুমিও তো জল দাও, দাও না? সে জলে এই ওষুধ না হয় দু'এক ফোঁটা ফেলে দিলে, ব্যস্।

ফ্যাঁসফ্যাঁসে ঠাকুর যেন কলিমের মনের কথা টেনে এনে ব্যক্ত করলেন এক উদার অনুকম্পার সুরে। অনুকম্পার পেছনে আশঙ্কাও তার কম নয়। ওলাবিবি ঘর ঘর এমনভাবে

বেশি দিন আসর জমালে ঠাকুরকে ধান-টান ফেলে পাত্তা গোটাতে হবে এ বছরের মত।
কলিমের তো হঠাৎ ভেবে হঠাৎ আসা। কিসের টানে এলো—সাবি, না সর্বানু, না লায়লা—হয়ত বা সবারই মিলিত টানে। তবু তার মনের খুঁতখুঁতানি যেতে সময় লাগছিল।
নিয়ম-কানুন বাৎলাতে বাৎলাতে বাড়তি ওষুধের টোপলা থেকে দু' শিশি জলো দাওয়াই হাতে দিয়ে ফ্যাসফ্যাঁসে ঠাকুর বারবার সাবধান করলেন,—যাই করো তাই করো ফকির, চক্ সমেত সবাইকে কিন্তু জল ফুটিয়ে খেতে বলবে। তোমরা কোথাকার জল খাও ? কাছারির পুকুরের জল খাও তো ? সাবধান, না ফুটিয়ে খাবে না কিন্তু!
কাছারি-বাড়ির পানি ছাড়া মিঠে পানি পাবে কোথায় চকের লোকেরা ? কোথাও নেই। তবু কাছারি-বাড়ির পুকুরের কথা শুনতেই কলিমের যেন রোখ্ বেড়ে ওঠে। বলে,—কি বললে ঠাকুর, কাছারির পুকুরে বিষ!
—না, না……যে কোন জল খাও ফুটিয়ে খাবে। যে কোনও জল!
অন্যমনস্ক কলিমের কানে শেষ কথাগুলি গেল না, বা শুনেও সে শুনলো না। রোখের মাথায় বা' হাতের মুঠোয় শিশি দুটি চেপে ধরে ডান হাত বাড়িয়ে 'আ-শে' সম্ভাষণের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বলল,—ভাটোর টান আসতে দেরি। ডিঙি সড়ায় থাকলো, ঠাকুর। আমি ভেড়ি-পথ ধরলাম। বলতে গেলে ছুটে এলো সারা পথ কলিম! এক একবার ছোটে, আবার হাঁটু ভেঙে চলে। মাথার ফেঁটা চলার ও ছোটার ছন্দে দোলে। শক্ত হাতের মুঠোয় ওষুধের শিশিগুলি যেন ঘেমে ওঠে। ঘাম ছোটে তার মনেও,—মন্তর! ফকির সে! হরিখালির সাধুবাবাও তো মন্তরের জোরে টিক্‌তে পারেনি। গুরু ঠিকই বলেছিল।……চকের জেম্মা যে তার, এ চককে তার বাঁচাতেই হবে!

বার

কলিম এ যাত্রা চককে বাঁচিয়ে ছিল ঠিকই। সবাইকে রক্ষা করতে না পারলেও, অনেককে তো বাঁচিয়েছে—সর্বানুবিবি, মতিবিবি, ঠাণ্ডাই গাজী, দ্বিজবর কাগের ছেলে, এমনি আরও অনেককে। তা হলেও ওলাবিবির দয়ায় অনেককে প্রাণ দিতে হলো। প্রাণ দিতে হয়েছে অনেক জোয়ান মরদকেও।
ঝিমিয়ে গেছে মঠবাড়ির আবাদ। এমন সময় তো ফি বছর এ গের্দের মানুষ আশা ও আহ্লাদে মেতে ওঠে। সারা বছর নোনা-ফাটা রোদ, বর্ষার নোনা-পচা গন্ধ, মাছি ও মশা, শরতের জোঁকের কামড় ও প্লাবনের দাপট—সব কিছু পেছনে রেখে হেমন্ত এদের জীবনে আনে জয়ের উল্লাস। মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের উচ্ছ্বাস। এবার কিন্তু সেই মৃত্যুই এনে দিতে চায় অসাড়তা।
মাঠের ধান মাঠেই পড়ে থাকবে বুঝি! জন কই! ঘরে ঘরে যে মানুষের অভাব। মঠবাড়ির ধান কোনবারই চকের মরদেরা কেটে ঘরে তুলতে পেরে ওঠে না। পরবাসীরা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে এ কাজে মদত্ দিতে। মধুমতীর তাগড়া নমো জোয়ানদের বরাদ্দ এ চক্। ওলাওঠা সর্বনাশ ডেকে এনেছে। কেউই এবার এ-মুখো হতে চায় না। মাঘের ধান মাঠেই নষ্ট হবার উপক্রম। হলও তাই। মেয়ে, মরদ, বুড়ো, ছোকরা যে যা পারে বাঁচাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে হাসি ফোটে না এদের জীবনে।
চকের জেম্মা যার হাতে সে তো মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে কসুর করেনি। কিন্তু এবার অভাব ও বুভুক্ষা। বাউলে অল্প কিছু দিনের মধ্যে বনে বনে ঘুরতে লাগলো। বনের ডাকও যে তার

অবহেলা করার উপায় নেই। কাঠের ও গোলপাতার নৌকার এবার ছড়াছড়ি। বড়বড় বেতনাই ও করপাই নৌকার বহর আসতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে। বাউলেরও বিশ্রাম নেই।

এদিকে ওলাওঠার করাল ছায়া কাটতেই আনন্দ গাজী ঘর ঘর ঘোরাফেরায় নেমে পড়েছে। তার এই ঘোরাফেরাকে কেবল জমি দখল বা হাত বদলের ফিকিরের দরুন ভাবলে ভুলই হবে। নিজের গোলাজাত ধান আনন্দ গাজী এবার বিলুচ্ছে প্রায় বেহিসেবীর মত।

ওলাওঠার জের হিসেবে লায়লার মনে উত্তজনা চলেছে সমানে। সর্বক্ষেত্রে লায়লা অভাবীদের মুখপাত্র হয়ে আনন্দের কাছে বলতে আসে। লায়লার মুখ চেয়েই বুঝি আনন্দ গাজী প্রথম প্রথম হাতের মুঠো আলগা করেছিল।

লায়লা ভেড়ির পথে। সঙ্গে ভোলা বিশ্বেস। ভোলার মাথায় ছালা। ছালায় কোন মোট নেই। খালি ছালা, ভাজ করে মাথার ওপর ফেলে রেখেছে। রোদটা বেশ কড়াই। ভোলা পোদ-পাড়ার লোক। চকের সারা দক্ষিণ ঘেরি বেড় দিয়ে লায়লার কাছে এসেছে। রোদে ঘেমে উঠেছে।

টিনের চালায় যাবে, মানে আনন্দ গাজীর কাছে। কাছারি ছাড়া এক আনন্দ গাজীরই এ আবাদে টিনের চালা আছে। ভেড়ির কোলে নেমে হুড়কো ঠেলতেই আনন্দ বলে উঠল,—এসেছ! বলি, এইবার নিয়ে কত গোন্ হলো?

—অতো গোন–বেগোনের হিসেব তুমিই রেখো; এসেছি এই ভাগ্যি!

—তাই নাকি! তবে হবে না, যাও।

লায়লা চুপ। থেমে দাঁড়িয়ে গেছে। আনন্দের দিকে একবার তাকিয়েই ঝমাৎ করে পেছন ফিরেছে। মনে হয় যেন হুড়কো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গর্গর্ করে ভেড়িতে গিয়ে উঠবে।

ভোলা বিশ্বেস তো হক্চকিয়ে গেছে। ভেবে পায় না কি করবে সে। ভাবছে, ছুটে গিয়ে আনন্দের হাত ধরে কেঁদে পড়বে কিনা। খালি হাতে ফিরে গেলে তার যে আর চলে না। পোলাগুলো যে কাল থেকে কিছু মুখে দিতে পায়নি!

আনন্দ তাড়াতাড়ি ছুটে এসে লায়লার সামনে গিয়ে বললো,—আরে অতো গোঁসা কেন, চলো···চলো। খালি হাতে ফিরতে দিতে পারি! হাজার হলেও বুধো লাঠেলের ভিটে তো! এ ভিটেয় বিপদে আশ্রয় পাবে না তাই কি হয়! চলো, কত দিতে হবে, চলো।

—না দিতে চাও, দেবে না। আমার কি আসে যায়!

—কার কি এসে যায়! আমারই বা কি এসে যায়!

—যায় না?···যায় না? চকে মানুষ থাকলে তবে তো তাদের ওপর দাপটি করবে!

—দাপটি করি না করি, চলো দাওয়ায় বসে হবে!

লায়লা দাওয়ায় বসতে না বসতে আনন্দের হাঁক্ ডাক্ শুরু হয়। ছালা ভর্তি করে ভোলা বিশ্বেস খুশি মনে ঘরে ফিরল।

শুধু বিশ্বেসই নয়, অনেক ঢালি, মোড়ল, গাজী, সানা ও বক্সই খুশি মন নিয়ে ফিরেছে বুধো লাঠেলের পো আনন্দের বাড়ি থেকে। প্রতিবারই লায়লাকে সামনে রেখে নারাজ ও দরাজের মহড়া চলে। নারাজের মহড়া লায়লাকে লক্ষ্য করে। লায়লাকে যেন আনন্দ বারবার বলতে চায়, তুমি না হলে দিতাম না ধান, তুমি বললে তবে দিতে পারি। আর দরাজের মহড়া বুধো লাঠেলের বংশগত। জন-বল যে মহা বল এবং জন-বলই যে অর্থ-বল আনে—আনন্দ তার বা'জানের আমল থেকে তা বহুভাবে পরখ করেছে।

লায়লা প্রথম প্রথম আনন্দের এই দরাজ ভাবে ধান বিলিকে অজানা আশঙ্কায় দেখতো। কি জানি, এর শোধ কি তুলবে না ! সুদে আসলে এর মাশুল কি দিতে হবে না এদের ! পাটনি সংসারকে কেমন করেই না আনন্দ ভিটে ছাড়া করেছিল।

কিন্তু তারপর কয়েক মাস ধরে বিনা হিসেবেই সে যে-ভাবে ধান ছাড়ল, ততে লায়লা মুগ্ধ।

এমনি মুগ্ধ মনে একদিন যখন লায়লা আনন্দের দাওয়ায় বসে, একলা পেয়ে আনন্দ বলল,—লায়লা ! তুমি একলা একলা অমন ভিটে আগলাচ্ছ কেন ?......এসো না ? আমার কাছেই এসো না ?......জানই তো, আমার বিবি তো আসা অবধি যেমন পোলাবান ছিল তেমনই আছে। তুমি এলে তো তুমিই আমার বড়বিবি হয়ে থাকবে। বড়বিবি ! ইচ্ছে হয় না ?

আনন্দ ভাবতো,—এই কি কখনও হয়, এত ধান লায়লার হাত দিয়ে পার হল, তার ছিটেফোঁটাও লায়লার খলেনে ঝরে পড়েনি ! সে কি কোনও সূত্রে তার বাঁধনে বাঁধা পড়েনি ? তা হতেই পারে না। এমন হওয়া কি সম্ভব !

অনেকের পক্ষে হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু লায়লা এদিকে কৃচ্ছ্রতার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। সেবার পীর বুড়া খাঁর মসজিদকুড়ে গিয়েছিল। নেমাজের দিনে। আসবার পথে আমাদি হয়ে আসে। গোলোক-চাঁপা ফুল গাছের তলায় বুড়া খাঁর কবর। সে ফুল গাছে মানত করে ইঁট বেঁধে আসতে দেরি হয়ে যায় দেখে এক সম্পন্ন হিন্দু-বাড়িতে রাতের মত আশ্রয় নেয়। তখন দেখে আসে ওদের ঘরের বিধবারা কেমন করে একাহারী থাকে। তখন অবশ্য লায়লার মনে ছায়াপাত করেনি। আজ অভাবের তাড়নায় তারই অনুকরণে লায়লা একাহারী হয়ে উঠেছে।

লায়লা জোর করে ভাবে, বেশ তো দিন কেটে যাচ্ছে ! ভাবলে কি হবে, জোর তো সব সময় খাটে না। আনন্দের মিনতির সামনে লায়লার মুখরা হয়ে উঠবার মত মনের অবস্থা ছিল না। তারই সুযোগে আনন্দ থেমে থেমে অনেক সময় নিয়ে কথাগুলি বললো।

লায়লার মুখে কোনও সাড়া নেই। ধানের বিরাট মরাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। কত ধানই না ধরে ! সত্যই আনন্দের ম-ী দরাজ। গোলার জানালা খুলে দিয়েছে দরাজ হাতে। লায়লার মাথায় কিসের যেন ঘুরপাক খায়।

দুজনেই চুপ হয়ে আছে। একে অপরের নিঃশ্বাস শুনতে পায়। আনন্দ অস্বাভাবিকভাবে কাছে এসে নিতান্ত ব্যগ্রভরে উন্মুখ হয়ে আছে, লায়লার মুখের কথা শুনবার জন্য।

হঠাৎ লায়লা অনুভব করে, কথা তো তার বলতেই হয় ; কথা না বললে আনন্দ কি জানি কি করে বসে। প্রথমেই যা মনে এলো তাই বলতে লাগে,—জানো, সেদিন সর্বানুবিবি কি কষ্টটাই পাচ্ছিল ! ছট্‌ফট্‌ করেছে। কচি পোলা তো কেঁদে পাড়া মাৎ করেছে। রক্ষে সেদিন বাউলে...বা-উ-লে......

লায়লা স্তব্ধ। শেষ কথাটা ঠোঁট থেকে কানে যেতেই স্তব্ধ। সামনে দুরন্ত ফাঁকা মাঠ, আনন্দের মুখের দিকে চাহনি সরিয়ে নিয়ে সেদিকে তাকাল। গোটা মঠবাড়ির সারা মানষালয়ের নীড়গুলি দেখা যায়। কোনও একক নীড়ের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। গাছ-আগাছায় ঢাকা সমস্ত নীড়গুলিই যেন একত্রে প্রতিবিম্বিত তার চোখে।

—আনন্দ ! আনন্দ !—নায়েবের গলার স্বর। পের্‌ভাস নায়েব উপস্থিত। আনন্দ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে। লায়লা জড়সড় হয়ে নড়ে বসলো। নায়েব হুড়কো ঠেলে খলেনে এসে পড়েন।

গুলাওঠার দাপট হতেই নায়েব এটা-ওটা ছুতো করে সরে পড়েছিলেন। তখন নায়েবের কথা উঠলে কলিম বলত,—ওঃ, চাচা-আপন-বাচা!

সেই চাচা-আপন-বাচাকে দেখতে লায়লা একবার আয়ত নয়নে তাকাল। সেই চোখ দেখে নায়েব যেন চোখ সরাতেই পারেন ন।

মাথার উপর তবনের ছোট আঁচল শক্ত করে টেনে ধরে শান্ত স্বরে লায়লা আনন্দকে বলল,—আমি এখন যাই। —বলেই কোণাকুণি খলেন পার হয়ে পাশের বাড়ি চলে যায়।

নায়েব এবার আবাদে ফিরে এসে খবরাখবর নিতে বেরিয়েছিলেন। আনন্দ কতটা কাছারির ধান বাঁচাতে পেরেছে, তারই হিসেব। মুখে সেই সব প্রশ্ন করতে থাকলেও চোখ তার লায়লার গতিপথে। লায়লা অদৃশ্য হতে না হতে হঠাৎ বে-খাপ্পা প্রশ্ন করলেন,—মাগীটা কে? এই বুঝি তোমাদের লায়লা ঠাকরুণ!

হুঁ,—বলেই চট্ করে আনন্দ ধানের হিসেবের এটা-সেটা অঙ্ক বলতে লাগে অতি হিসেবীর মত।

তের

লায়লাকে সেদিন আনন্দের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়নি। তা না দিতে হলে কি হবে: এ প্রশ্নের জবাব প্রতি নারীকে তার নিজের কাছে অন্তত দিতেই হয়! তবুও আজ ক'দিন ধরে লায়লা তা না দেবার চেষ্টা করেছে। হাতে কাজ নেই, কিন্তু অকাজে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখার বিরাম নেই। বাড়িতে এক দণ্ড থাকে না। এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে সময় কাটায়, ক্লান্তও হয়ে পড়ে। ক্লান্ত হয়ে অবশেষে অঘোরে ঘুমোতে চায়।

ঘুমোতে চাইলে কি ছাই ঘুম আসে। রাত পহর খানেক পার হয়ে এলো। চাঁদের আবছায়া আলো মানষালয়, সারা চক্ ও বনের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন গোলপাতার ছাউনিগুলি চাঁদের ঢিমে আলোতেও চিক্‌চিক্ করে। আবাদের মানুষ সন্ তারিখ বলতে না পারলে কি হবে. তিথির হিসেব এদের উঠতে বসতে। বেশ বলে দিতে পারে, আজ কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী। আর কিছুক্ষণ পরেই জোয়ারের টান ধরবে, তারপর আসবে দুকূল ভাসিয়ে প্লাবন।

প্লাবনের কথাই লায়লা শুয়ে শুয়ে ভাবছিল। দাওয়ায় মর্জানপাড়ের বারো বছরের ছেলে জেরাবদি এসেও শুয়ে পড়েছে। লায়লা অধুনা ওকে রাতের গার্জেন বানিয়েছে। তা না হলে শূন্য আঙিনা যে বড় খাঁ খাঁ করে।

চোখে ঘুম নেই। লায়লা মাদুরের ওপর এপাশ ওপাশ করে। জেরাবদির যেন একবার মনে হলো, ভাবি কান্নার শ্বাস নিচ্ছে। ইচ্ছে করেই লায়লা ওর সঙ্গে ভাবির সম্পর্ক পাতিয়েছে। ভাবিকে সে বরাবরই দেখেছে, গাঁয়ের গিন্নি হিসেবে—কাউকে সে ছেড়ে কথা কয় না. কাউকে সে না ভালবেসেও পারে না। ছোট ছেলে-পিলে হলে তো কথাটি নেই। কান্নার শ্বাসে অবাক ও আশঙ্কায় জেরাবদি প্রশ্ন করলো,—ভাবি! ভাবি, কি হলো তোমার! তুমি কাঁদছ?

লায়লা চোখের জল গড়িয়ে পড়তে বাধা দেয় না। তবু হেসে ওঠে, সশব্দেই হেসে উঠে বলে,—দূর্ পাগলা! কাঁদতে যাব কেন রে!

দুজনেই চুপ। লায়লা ঘরে, জেরাবদি দাওয়ায়। সময় কেটে যায়। পাশের আধা শুকনো ডোবায় পাতাড়ি মাছ সশব্দে আফালি দিল।

এবার লায়লা ধীরে ধীরে বলে,—আচ্ছা জেরাবদি সোনা, বলতে পারিস্ মিঠেপানির দেশ ভাল, না নোনাপানির দেশ ?

জেরাবদি সটান্ জবাব দেয়,—মিঠেপানি।

—কেন ?

—কেন, আবার কি ? তেষ্টায় পানি যখন খুশি, যেথায় খুশি মিলবে।

—বা-রে ! মিঠেপানিতে কি নোনাপানির মত ধান পাবি ?

—আর তেষ্টার পানি !!

—তেষ্টার পানি না হয় পেলি, কিন্তু পেটের জ্বালা ?

জেরাবদি সমস্যায় পড়ে। বলে,—অতো জানি না, তেষ্টা তো মিটবে।

—নাঃ, তুই কিচ্ছু বুঝিস্ না—বলে লায়লা পাশ ফিরে বালিশের ভাজে কান চেপে শুলো। মিঠেপানি-নোনাপানির হিসেব অতো পোলাবান কি করে বুঝবে ! হয়ত ঠিক বলেছে, হয়ত ঠিক বলেনি। লায়লা কূল পায় না। মিঠেপানির তল গভীর, নোনাপানিরও তল গভীর।

ক'দিন কেটে গেছে। লায়লা একদিন রাঁধতে গিয়ে দেখে, চাল যা ঘরে কোটা ছিল ফুরিয়ে গেছে। ধান ভান্‌তে হবে। খুশিই হল মনে মনে। এবার একটা কাজের মত কাজ হাতে এসেছে।

উৎসাহে ধানের আউরিতে হাত দিতে গিয়েও তল পায় না ! এবার......এবার তাহলে ! জীবনে কোন দিকেই সে তল পায় না।

কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা ছিল ধামায় তুলে বেপরোয়ার মত বাকিটার জন্য বীজধানে হাত দিল। কিছুটা নিয়ে আবার কাদামাটি দিয়ে বীজধানের মৌড়ির মুখ জোরে জোরে অনেকক্ষণ ধরে লেপটে দিতে থাকে। যেন আর তার শ্রাবণের আগে খুলতে হবে না ! মনে মনে বিড়বিড় করে বলল,—কি আর করব ! আসুক বাউলে। দু'একদিনের মধ্যে আসবে নিশ্চয় !

★ ৮ ★ ★

সত্যি সত্যি বাউলেও এসে পড়ল বলে। আসবার কথা ছিল না ; তবুও আসতে হলো, এক ঘটনার দরুন। তা না হলে, আরও ক'দিন হয়ত কাটিয়ে আসতো আড়পাঙাশিয়ার বনে।

এই খেপে চৈত্র মাসে বাউলে বনে যায়। তারপর দু'বার পূর্ণিমার কাটাল কেটে গেছে। অমাবস্যার কাটাল সামনে। কাঠও বোঝাই প্রায় হয়ে এসেছে।

এবার দলে ভারি। নৌকাও গুণতিতে বারো। জনের হিসেবে প্রায় পঞ্চাশ জন। মহামারীর দাপটে বাউলে খুঁজে পাওয়া দায় ছিল। ফলে কলিমের দলও এবার ক্রমশ ভারি হয়ে ওঠে !

দূর দূরন্তর থেকে যারা কাঠুরিয়ার দলে জোটে, তারা সবাই যে বনের নেশায় বা পয়সা দাও মারার তালে, তা নয়। অনেকেই আসে দাদনের বাঁধনে। অভাবের সময় দাদনের টাকায় এইসব চাষীদের মহাজনেরা বেঁধে ফেলে বনে যাবার সর্তে। কোনমতে বনের খেপ তুলতে পারলেই দাদনের ধার থেকে এদের মুক্তি। তাই বনের নোঙর তুলবার জন্য দলের লোকজন উশখুশ্ করতে থাকে।

তা'ছাড়া, আজ দেড় মাসের বেশি বনে এসেছে। কতদিন বাড়া-ভাত খায় না। মন সবারই আন্‌চান্‌। এখন তো কথা উঠলেই বউ-বিবিদের ছাড়া কথা নেই। বাউলেকেও সেই তালে তাল দিতে হয়।

—তুমি বাউলে কি বুঝবে! বিয়ে সাদির তো ধার ধারোনি!

—না ধার ধারতে পারি, কিন্তু তোদের দেখ্‌ছি বড্ড নরমপানা। আরে! অতো নরম হোস্‌ না। জানিস্‌ তো, মেয়েমানুষ নরমের বাঘ, গরমের শেয়াল।

—আর তুমি বাউলে বুঝি, নরমের নরম আর গরমের গরম!

—দেখছি তোদের উপোসী মনে মেয়েমানুষের বড্ড বাহার লেগেছে!

—লাগবে না! ঝোলপানা মাছ আর ভাতে গালে যে নোনাশেওলা। না আছে ঝাল, না আছে চাট্‌নি।

—দাঁড়া, কাল তোদের বিবির সোহাগ এনে খাওয়াব। তখন বিবিকে ভুলবি তো?

সবাই ভাবে, বনের মাঝে বিবির সোহাগ, সেটা আবার কি! হবেও বা কিছু! ফকির তো, অসাধ্যি কিছুই নেই!

★ ★ ★ ★

দেবতা গড়াতে গড়াতে আকাশ মেঘলা। বোশেখের দমকা হাওয়াতেও মেঘ কাটে না। টিপ্‌ টিপ্‌ করে ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। ততক্ষণে সবাই যে যার নৌকায় জড়ো।

বিস্তীর্ণ বাঁশপাতা খাল। বাঁশ গাছের পাতার মতনই। নদীর মুখ বেশ চওড়া হলেও, অনতিদূরে অস্বাভাবিক সরু হয়ে বনের গহনে প্রবেশ করেছে। নদীর মুখ অবধি খালের ভেতর বরাবর সার দিয়ে নৌকাগুলি চাপানো। মাঝ-গাঙে নোঙর কবা। কাছি বেঁধে বনের 'মালো'র সঙ্গে যোগ রাখতে চায় না। রাতের অন্ধকারে তেমন যোগ রাখাও বারণ আছে। মেঘলা আকাশে ইলশেগুঁড়ি পড়লেও বনের আলো তখনও নিস্তেজ হয়নি। নদীর ও খালের এপার-ওপার, চারিদিকে গাঢ় সবুজ বনের পাঁচিল।

বিষ্টি পড়তে যে যার খুপরিতে জমাটি হয়ে বসেছে। খুপরির পাশ থেকে প্রায় সব ক'টি নৌকা থেকেই ধোঁয়া উঠছে। রান্না চাপিয়েছে সবাই।

কলিম খালি বস্তার একটা কোণ আরেকটা কোণের মধ্যে ঢুকিয়ে টোপ বানিয়ে মাথায় দিল। ইল্‌শেগুঁড়িতে এমন ছাতাই যথেষ্ট, কাজেরও সুবিধা। হোগলার টোপের মত ঢকর-ঢকর করে না, কান ও পিঠের ওপর লেপ্‌টে থাকে। বিয়ের টোপরের মত ছালার এক কোণ মাথার পেছনে উঁচু হয়ে আছে। বেশ দেখায়। আদলই যেন বদলে যায়—আঁধো-আলোয় দূর থেকে মানুষই বলে মনে হয় না।

ঘুঘু-ডিঙি খুলে নিয়ে বাউলে মালোর পানে মুখ করতেই খুপরি থেকে একজন মুখ বাড়িয়ে বলল,—কি গো ফকির! বিষ্টি মুড়ি চল্‌লে কোথায়?

—আর বলিস্‌নে, বাউলে হয়েছি তো, বাঘের দুধও এনে দিতে হবে! দেখি মেলে কিনা? কাল বলিনি! বিবির সোহাগ খাওয়াব তোদের। দেখি, জোটে কিনা।

—মেঞা ভাইরা! দেখো সবাই, দেখো সবাই, বাউলের পাগলামি!—চিৎকার করে চাউর করে দিল খবরটা।

—পাগল না হলে কি কেউ বিবি ছেড়ে বনবিবির রাজ্যে আসে! কেন আসিস্‌ তোরা মরতে!—বলতে বলতে বাউলে এক ধাক্কায় ঘুঘু চাপিয়ে দিল ডঙ্গায় ওড়া-ঝাড়ের ওপর

দিয়ে।

গামছার ফেটা বাঁধা কোমরে। খুলে নিয়ে অভ্যাস মত পেখম ঝুলিয়ে ছালার উপর দিয়েই মাথায় বাঁধল। এবার নিজের চেহারাটা কেমন তা ভাবতে কলিমের হাসি পায়। হাসতে হাসতে আঙুল টিপে হাটু ভেঙে এগিয়ে চলল। মাথার উপর বনের পাতার-ছাতা ঝরে পড়া জলে পলিমাটির প্রলেপ পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে।

লক্ষ্য একটি কেওড়া গাছ। কাল বনে উঠবার সময় সন্ধান পায় এই গাছের। তারই মগ-ডালে কয়েক থোক্ কেওড়া ফল। বছরে এমন সময়ে কেওড়া ফল পাওয়া যাবে, তা আগে ভাবেনি। নৌকার বহর থেকে খুব বেশি দূরেও নয়! তা'হলেও বনের ও ঝোপের আড়ালে।

সুন্দরবনে একমাত্র কেওড়া ফলই মুখে তোলার মত। খেতে টক্। তেতুলের কাজ করে। সেদ্ধ করে নুন জারিয়ে নিলে ভাতের ডেলা এতে গো-গ্রাসে গেলা যায়। চাট্‌নি তো, বিবির সোহাগের মত বৈ কি!

কেওড়া গাছ খুঁজেপেতে নিতে কলিমের দেরি না হলেও, গাছের মগ-ডালে উঠতে দেরি হয়। ভিজে গেছে, ওঠাও হাঙ্গামা। নিঃসাড়ে উঠবার কথা নয়, তবুও বনে উঠলে বাউলে মানুষের সতর্ক হয়েই চলা দস্তুর। ধীরে ধীরে চুপিসারে উঠছে। থেমে থেমে উঠছে। এবার মগ-ডলের কাছে হাজির। একে একে কেওড়া ফল কোঁচড়ে পুরে ফেলতে লাগে।

কি জানি কেন বাউলে একবার নীচে তাকিয়েছে। তাকাতে হয় না! দূরে চার-পাঁচ হাত কালো লম্বা রেখা। চিনবার জন্য চমক ভাঙার পলক ফেলতে হয় না বাউলের। চার পায়ের মধ্যে দেহ বসিয়ে দিয়ে গলা লম্বা করে ঘাপটি মেরে সুড়সুড় করে নৌকোর বহর মুখো এগিয়ে চলেছে।

মগ-ডালে বাউলে নিমেষে খাঁকার দিয়ে ওঠে,—শালা! ফেরেববাজ! মতলববাজ! —ডালে ঝাঁকি মেরে মোটা ভাষায় অশ্লীল গালি দিয়ে ওঠে।

শূন্যে আওয়াজ শূন্য মনে হয় বন্যজীবের কাছে। আকাশের মেঘ-গর্জন মাটির হিংস্রতম জীব অবহেলা করতে অভ্যস্ত। যে গাছে উঠেছে, সে তো পলাতক! তাকে সমীহ করবার কিই বা আছে! তেমনি ঘাপটি মেরেই মাথা ঘুরিয়ে বনের এপাশ ওপাশ একবার দেখে নিল মাত্র। তারপর আবার এগুতে থাকে আগের মত সুড়সুড় করে।

বাউলেও বোঝে, নিরাপদ স্থান থেকে হাজার চিল্লিয়েও সুন্দরবনের বড়-মেঞাকে আপদের ভয় দেখান বৃথা। ওর মতলব ও হাসিল করবেই করবে। কয়েক হাতের পানির ব্যবধান ওর আক্রমণকে ব্যাহত করবে না। বহর থেকে একজনকে নেবেই নেবে।

তড়াক্ করে মড়্‌মড়্ শব্দে দু'হাতে দু'খানা শিষ-ডাল ভেঙে নিল। নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল মগডাল থেকে মাটিতে। পায়ের চাপে কেওড়া গাছের কয়েকটা নরম শূলো সশব্দে দুমড়ে ভেঙে গেল।

এবার মাটিতে। এবার সমানে সমানে। চোর ধরা পড়লে যে-অবস্থা হয়, বাঘের সেই অবস্থা। তবে চুরি করাটা তার কপটতা মাত্র, আসলে সে দুর্জয়ের প্রতিমূর্তি। চার পায়ে খাড়া হয়ে উঠল। মুখোমুখি। ছালায় আবৃত কিম্ভূতকিমাকার জীবকে চিনতে বোধ হয় খট্‌কা লাগে।

বাউলে মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করে। দু'হাতে ডালের বীভৎস ঝাঁকানি আর বিকৃত মুখে হিংস্র গালাগালি। চলাকি দিয়ে ভয় দেখান যায় না, অন্তত সুন্দরবনের নরখাদককে তো নয়ই। এমন মুহূর্তে সত্যি সত্যি রক্ত টগ্‌বগ্ করে ওঠে বাউলেদেরও।

টগ্‌বগে রক্তে দেহে এমন শক্তি জড়ো হয়।—মনে হবে হাতাহাতির আবর্তে পড়লে তারা বুঝি টেনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলবে নরখাদককে।

নরখাদক প্রথমে বিদ্যুৎ ঝলকানো দৃষ্টিতে, বিস্ফারিত দন্তে, গিরি-গহ্বরসম কণ্ঠের ঝংকৃত আওয়াজে আর গোলাকৃত ভ্রূ-যুগলের তীব্র ঝাঁকানিতে বিমূঢ় ও সম্মোহিত করতে চায় আস্ফালনকারীকে।

তাতে ব্যর্থ হয়ে চার হাত-পা নেড়ে কোন্ পথে বা কীভাবে সে আক্রান্ত হতে পারে সেই অনুমানে তৈরি হতে থাকে বুঝি। মুখে এবার গোঙানি, দেহে রাগ তুলবার গর্‌গর্ আওয়াজ।

দু-এক পা সামনে এগিয়ে বাউলে আগের মতই আস্ফালন করতে থাকে।

নরখাদক বুঝে নেয় এতক্ষণে,—আস্ফালনকারী পলাতক না হবার স্পর্ধা রাখে, তেড়ে এসেও আক্রমণ করতে চায় না ! সমীহ করেছে ওকে। ...এইবার দেহের পেশী শিথিল করে বিকট দু'একটা হুঙ্কার তোলে নরখাদক। যেন জানান দিল,—খবরদার ! আর এগুতে এসো না !!

বিকট হুঙ্কার শুনতে না শুনতে, দলের লোকেরা যে যার নৌকোর উপর লাঠি সোটা নিয়ে 'ম্যর শালা, মার শালা' বলে চিল্লিয়ে উঠেছে। পঞ্চাশ জনের একত্রে চিৎকার।

নরখাদক পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। মাটির কাছে মুখ নিয়ে শেষ হুঙ্কার দিতে দিতে চলে গেল, হয়ত বা দূরে আড়াল নিল।

তেমনি দু'হাতে দুই ডাল, কোঁচড়ে কেওড়া ফল, মাথায় ফেটা বাঁধা টোপ্—মুচকি হাসতে হাসতে কলিম হঠাৎ বহরের সামনে হাজির। বাউলেকে দেখেই ওদের চিৎকার থেমে গেছে। বাউলে হাঁক দেয়,—চিল্লা, থামিস্ না !

পায়ের এক ধাক্কায় বাউলের ঘুঘু-ডিঙি বড় নৌকার গায়ে এসে লাগে। সবাই একত্রে জড়ো। বাউলের মুচকি হাসিতেও ওদের বুকের কাঁপুনি থামতে চায় না যেন।

—তোরা ঠিকই করেছিস ! সাবাস ! তোদের চিল্লানিতেই তো সহজে মিটলো। তোদের সাড় না পেলে ভোগান্তি ছিল ! সাবাস্ !—বাউলের কথা তখনকার মত যেন মন্ত্রের কাজ করল। আত্মবিশ্বাস ধাতস্থ হতে সাহায্য করে ওদের।

সুযোগ পেয়ে কলিম কোচড় থেকে একমুঠো কেওড়া ফল তুলে ধরে বলে,—দেখছিস্ তো ! বিবির সোহাগ পাওয়া কি কষ্ট !!

ওরা না হেসে পারে না। কলিমের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মুখে ও চিবুকে গালাগালির ফেনা তখনও লেগে আছে বীভৎসভাবে। হাসি থামতেই বলে,—যা, এক বদনা মিঠে পানি আন্ শিগগীর ! তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেছে......মিঠেপানি !

চৌদ্দ

রাতের জো'তে কাঠুরিয়ারদল সরে পড়তে চায় বন থেকে। কলিম কিছুতেই আসতে দেবে না। এরা আর কবে কখন বনে উঠবে কে জানে ; কলিমকে যে বারবার আসতে হবে বনে। পলাতকও সে হতে চায় না। পলাতকের পক্ষে বনবিবির আশীর্বাদ মেলা ভার।

কাঠুরিয়ারা বলে, আর কাঠ তারা কাটবে না ; নৌকা প্রায় সব ক'খানাই তো বোঝাই, আর দরকার নেই এ-যাত্রা। তবুও কলিম ওদের আসতে দেয় না অন্তত রাতের মত। বলল,—কোনও ভয় নেই, নিশ্চিন্তে ঘুমো সব। আমি রাত ভোর পাহারা দেব এই বোঝাই

কাঠের ওপর বসে। হলো তো!

দিলও পাহারা একা একা বসে। কিছুক্ষণ হাসি-মস্‌করা করে খুপরির লোকগুলির সঙ্গে। সপ্তমীর চাঁদ মাথায় উঠতে না উঠতে খুপরির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ফকির এবার একা। আকাশে মেঘ কেটে গেছে। বৃষ্টিস্নাত নিস্তব্ধ গহন অরণ্য। সবুজ বনে ও শ্বেত জলধারায় যদি বা কোনও রুক্ষতা থেকে থাকে, সে রুক্ষতাও মোলায়েম করে দিয়েছে সপ্তমী চাঁদের স্তিমিত শুভ্র আলো। ফকির প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে—

ও গুরুর ভাব দাঁড়াবে কিসেরে
  মনের মানুষ না হলে।
অগ্নি ম'লো জল পিয়াসে
  গঙ্গা ম'লো জাড়ে।
ওরে পানির তলে ঘুঘুর বাসা
  হারে ডিম রহিল ডালে,
হারে আসমান জোড়া গাছের গোড়া
  জমি জোড়া ডালরে,
ওরে ফুল ছাড়া তোর ফল ধরেছে,
  সাঁইজীর হাতে কলরে।
  মনের মানুষ না হলে।
ওরে উত্তরে মাথাখানি
  পূবে তার হস্ত।
ওরে দক্ষিণে পদ দু'খানি
  পশ্চিমে কয় কথারে।
  মনের মানুষ না হলে ॥

পরপর ক'খানা ভাবগান গাইল। গান গাইতে গাইতে মনে পড়ে লায়লার কথা। কেমন করে সে না জানি দিন কাটাচ্ছে। অমন মেয়ে হয় না আর! ·····আবাদকে যেন দুহাতে আগল দিয়ে রেখেছে। আনন্দ গাজী অমন করে ওর দিকে তাকায় কেন? ভাল লাগে না তার তাকানি। লায়লা কেন তবু আনন্দের বাড়ি আনাগোনা করে। ·····করুক, মন যা চায়! মনে পড়ে সেই যে গভীর রাতের অন্ধকারে লায়লার সজল চোখ। ······এবার চকে গিয়ে দেখা হলেই কত মজা করে গল্প করবে 'বিবির সোহাগ আনার' কথা। ······কলিমের ক্লান্ত চোখে ঘুম এসে যেতে থাকে। গোটো হয়ে বসে বসে বুঝি ঘুমিয়েও পড়ে।

পরদিন ওদের বহর আড়পাঙাসিয়ার পৈঁখালি বন-কর অপিসে হাজিরা দিতে চলল। বনে প্রবেশ করার সময় যেমন, তেমনি বন ছেড়ে আসার সময়ও বনকর অপিসে সেলাম জানাতে হয়। সেলাম মানে সেলামীও বটে। পাশ নেওয়া ও ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপার। সেলামীর দৌড়টা ঘটে, নৌকার মাপজোখে আর গুড়ির ঘেরের মাপে। নৌকোর মাপ হয় থোকে—পঁচিশ, একশ' বা হাজার মণী হিসেবে। থোকের মাপে ফাঁক ও ফাঁকিও আছে। এই কাজে বাউলেদেরই সাহায্য করতে হয়। বন-বাদাড়ে বাউলেদের খাতির সর্বত্র, মায় বনকর আপিসেও।

পৈঁখালি অপিস হয়ে মঠবাড়ির চকে পৌঁছতে কলিমের দু'একদিন দেরি হল। এসেছে রাতের গোনে। ফুফুকে কাঁচা ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল,—কৈ গা ফুফু! বলি, মাণিক

এসেছে, এবার শানুক পাতো।

বুড়ী ফুফুও রসান দেয়,—শানুক পাতলেই কি মাণিক বসে!

—কেন, কি হলো আবার?

এই তো, দুপুর গোনেই তো। লায়লা এসেছিল। কত করে বললাম, দুটো মুখে দিয়ে যা। তাই কি দেয়! দিলো না কিছুতেই।

—লায়লা ঠাগরোণ! কেন? কিছু বলল?

—না। ও কি সহজে কিছু বলতে চায়!

—তা মরুক গে! আমি তো তোমার পোষমানা মাণিক! এক শানুক কড়কড়ে ভাত সাপটে নেব ঠিক।

ফুফু একটু চুপ হয়ে আছে। হাত পা ধুতে ধুতে কলিম বলল,—কি গো চুপ মারলে যে! কার কথা ভাবছ? লায়লার কথা! ছেড়ে দাও ওর কথা। জানই তো শিকলি-ছেঁড়া টিয়ে পোষ মানে না। ওর দশা হলো গে তাই।

—নে, তুই আর খুন্টুমি করিস্ না। গিলতে বস্ এখন।

সকালে উঠেই কলিম চলেছে ইরু ঢালির বাড়ি। ইরু ঢালি সম্পন্ন গৃহস্থ। সম্পন্ন মানে দু'দশ টাকা ধার কর্জ দিতে পারে। বনে উঠবার আগে ঢালির কাছ থেকে কলিম কিছু টাকা ধার নেয় সংসারের খরচ বাবদ। এবার বউলেগিরি কাজে যা পেয়েছিল তার প্রায় সবটাই নিয়ে চলল ধার শোধ দিতে। ইরু ঢালির বাড়ির পথে পড়বে লায়লার ঘর। ভেড়িতে উঠতেই সর্বানুবিবির মিন্‌সে ইলাহি বক্সের সঙ্গে দেখা। দেখা হতেই বক্স যেন হাপ্ ছেড়ে বলে,—যাক্, বাউলে তুমি এসে গেছ!

—কেন, তাক্ মারলে যে! সর্বানুবিবি ভাল আছে তো?

—না, তেমন কিছু না। তুমি তো ছিলে না; একটা 'সৎ' দেবারও লোক নেই তল্লাটে।

—ওঃ, আমি সৎ দেব, আর তোমরা বুঝি অসৎ কম্ম করে বেড়াবে।

—রগড় না বাউলে, কি কষ্টটাই আজ দু'মাস ধরে! ভাগ্যি লায়লা ছিল। আনন্দ গাজী যেন মড়াই খুলে দিয়েছে, তাই রক্ষে। কি জানি কি ওর মতলব! লায়লা সঙ্গে নিয়ে গেলেই হলো, খালি হাতে তার আর ফিরতে হয় না। তাই বলছিলাম, লায়লা ছিল তাই রক্ষে।

কলিমের খট্‌কা লাগে। চেপে গেল। মুখে বলল,—ঠাগরোণ না হলে কে বাঁচাবে বলো। সেবার তো তোমার বিবিকে ঠাগরোণই বাঁচাল, তাই না!

কথা বলতে বলতে লায়লার ভেড়িতে পৌঁছে গেছে। খপ্ করে ফকিরের হাত ধরে ইলাহি বলল,—চলো ফকির, তোমার ঠাগরোণের সঙ্গে মোলাকাত করে আসি।

লায়লা ঝাঁটা হাতে করে আঙিনায় গোবর জলের আস্তরণ দিচ্ছিল। ওদের দু'জনকে দেখে একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। ক'দিন ধরে ভাবছে, বাউলের সঙ্গে দেখা হলে কি কি বলবে। কত কথাই তো ওর ছিল। কিন্তু সে সব তো একান্তের কথা। তার জন্য সে যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। আজ দু'জনকে দেখে যেন একটু বিরক্তও হলো। এর আগে কিন্তু এমন ঘটনায় কোনওদিনই বিরক্ত হয়নি। মনে মনে বোধ হয় ভেঙ্‌চি দিল, একলা আসতে পারা গেল না, সঙ্গী নিয়ে আসা হয়েছে!

কলিমের কিন্তু মনের খট্‌কা-টট্‌কা চাপা পড়ে গেছে। খাসা দেখাচ্ছিল লায়লাকে। এ চেহারা আগে তো কোনদিন দেখেনি। গোবরমাখা ঝাঁটা হাতে, মাথার আঁচলে কোমর জড়ান গিন্নি। বাঙলাদেশের গাঁয়ের ভোরে যত কিছু মাধুর্য, যত কিছু প্রাণবন্ততা তা সবই যেন বাঙলার মানুষের শিশু-মন থেকে গোবর-জলের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

কলিম ঝমাৎ করে বলে ফেলল,—কি গো ঠাগরোণ ! ঝাঁটা হাতেই অভ্যর্থনা !

লায়লা লজ্জা পায় । দেহে ঝাঁকা মেরে ঝাঁটাখানা দাওয়ার কোলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বলল,—ঝাঁটার মরণ !—বলেই নিজের কথায় নিজে হেসে ফেলে । গোবর জলের ঢিলে যেমন ছিল তেমনই হাঁ করে পড়ে রইল ! ছুটে দু'খানা পিড়ে নিয়ে আসে । কোমর থেকে আঁচল খুলে পিড়ে দু'খানা মুছে দিতে দিতে দ্রুত বলল,—এসো, দাওয়ায় এসে বসো । কাঁচা গোবরজল মাড়াতে হবে না। এ পাশ দিয়ে ঘুরে এসে বসো,...কই !

কলিম ফুক্কুড়ি কাটবে কি, ইলাহি তো লায়লার প্রশংসায় পঞ্চমুখ । লায়লা সবুর না করে ইলাহির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে,—জানো ফকির, আনন্দ গাজী কি সহজে দিতে চায় ধান ! দেবে তো কর্জ, তাও তার হাত সরে না । বললাম, জনই যদি কাবার হয়ে যায় তুমি চকের নোনামাটি ধুয়ে খাবে ! শেষ-বেস্ মড়াই খুলল । খুললো তো খুললো! এমন খুললো যে ভয় লাগে,—কি জানি ওর মতলব কি ? যাহোক দিলো তো ! মানুষ বাঁচলো তো ! বলিহারি দিতে হয় বৈ কি । তুমি ছিলে না, কোন দিশে পাইনি ।

এক নিঃশ্বাসে যেন বলে গেল লায়লা । মুখে খই ফোটার মত । কিন্তু যে-কথা মন খুলে ফকিরকে বলতে চায়, এড়িয়ে গেল । এড়িয়ে গেলেও—প্রায় সব কথাই বুঝি বলে ফেলেছে । কলিম কি মনে করল, কলিমই জানে । মুখে শুধু বলল,—জবর ঘোলায় পড়েছিলে তো !

ইলাহি বলে,—হ্যাঁ গো এখনও পড়ে আছি । গেরহের ফের, কিসে কি হবে খোদায় জানে ! অম্বুবাচি এসে গেল বলে । মাঠে গিয়ে পড়তে হবে, এদিকে ঘরে হাড়ি ঠন্-ঠন্ ।

ফকির লায়লার দিকে তাকিয়ে বলে,—মড়াই যখন খোলাতে পেরেছ, বন্ধ করতে দিও না । তুমি ঠিক পারবে । বলতো আমিও খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে পারি ।

এরপর আরও দু'চারটে এটা-সেটা কথা হয় । উঠে যাবার সময় বাউলে মিষ্টি হেসে বলল,—ঠাগরোণ, দেখো যেন ! অভাবীর শতেক যন্ত্রণা । মরা গাঙে বড়্ডো কুমির আসে ।

সিক্ত অধরে হাসি টেনে আড় চোখে লায়লা বলল,—কিন্তু যদি জোঁ' আসে ?

—লায়লার কথায় কলিমের যেন হার মানতে ইচ্ছা হলো । হার মেনেই লায়লার মুখের পর হাসতে হাসতে মনের আনন্দে ভেড়ি-পথ ধরলো ।

পনের

সেদিন লায়লার কীভাবে কাটে, বলাই দুঃসাধ্য । ঠিক করে ফেলেছে, রাত-ভোর হতেই বাউলের দাওয়ায় যেতে হবে । ভোরে যাবে, আর যত বাধাই আসুক জোর করে বলে ফেলবে তার অনটনের কথা ।

যতই আপদে পড়ুক না কেন, কারও কাছে লায়লা এ যাবৎ হাত পাতেনি । এই হাত না-পাতার মাঝে কোনও আত্মম্ভরিতা ছিল না । যেমন করে হোক, দিন কেটে গেছে । মঠবাড়ির চকে এমন হাহাকার তার জীবনে আগে দেখেনি । কাজে অকাজে তার ডাক ছিল, নেমন্তন্ন সাবুদ ছিল । চলে যেত দিন । পিরথিমে নতুন মানুষ আসা চাষীর জীবনে এক মহা আহ্লাদ । এই আহ্লাদের ক্ষণে লায়লার আদর ছিল অবধারিত । মহামারি যেন চকের জীবনে কয়েক মাস অবধি সে আহ্লাদও সংকুচিত করে এনেছে । লায়লার দিন আর কাটে না ।

ভোরে কলিম কেওড়া গাছের একটা ডাল ভাঙছিল । দাঁতন বানাবে । এই দাঁতন মুখে করে একটু এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে আসা ওর চিরদিনের অভ্যাস । সহসা লায়লাকে দেখতে

পেয়ে সটান্ নিজের ছড়কোতে ফিরে এলো। কাঁধের ওপর গামছা ফেলা আছে, লজ্জা পাবার কিছু ছিল না। বিশাল বুকখানাতে এক গাছিও চুল নেই। তবুও তাড়াতাড়ি গামছা খুলে চাদরের মত বুকখানা ঢেকে ফেলল।

—কি গো বাউলে! গামছা জড়িয়ে বাবু সেজে ফেললে যে!

চোর ধরা পড়েছে। হক্‌চকিয়ে উত্তর দিল,—এমনি! শীত করছিল তাই গায়ে……

—ভিজে গামছায় শীত মানাল!

—রাখো, কি সমাচার বলো—এই ভোর সকালে যে, ঠাগরোণ?

লায়লাকে সুমুখ দাওয়ায় নিয়ে বসিয়ে কলিম আবার বলল,—বলো, কি মতলব?

লায়লা মাটির দিকে মুখ নিচু করে যেন দম্ আটকে বলে ফেলল,—জানো, আমার বীজ ধানেও হাত পড়ে গেছে।

—সে কি!

—বীজধানও তো প্রায় কাবার হয়ে এলো!

—এমন কথা তো আগে বলোনি!

—কখন বলব বলো, তুমি কি ছিলে ছাই আবাদে?

—কেন, কাল যখন তোমার দাওয়ায়. তখনও তো কিছু বললে না।

—বাঃ, তখন কি বলার কথা। গেলে তো এক সঙ্ সাথে করে।

—কেন, তাতে কি হয়েছে! ধানের কথা বলবে তাতে আবার…

—নাঃ, আমার বুঝি কোনও সরম-টরম্ নেই।

—দেখো তো. কাল যদি বলতে! তখনও আমার হাত খালি না। এবার বাদায় যা জুটলো, তা তো তখন কাল সকালেই ইরু ঢালির কর্জ মিটিয়ে এলাম। তখন যদি বলতে; তখনই তো যাচ্ছিলাম ইরু ঢালির বাড়ি।

লায়লা চুপ। চলতি ডিঙির গলুই চরে আটকালে যেমন খচ্ করে থেমে যায়, তেমনি ভাবেই লায়লা থেমে গেছে। এমন ভাবে থেমে গেছে যে বাউলের মুখেও কথা নেই। চরে আটক ডিঙিকে চালু করতে, সামনে ঠেললে হবে না, পিছু মুখো ঠেলতে হবে। সেই পিছু ধাক্কা দিতেই যেন লায়লা একবার হঠাৎ বলে উঠল,—কি রকম মরদ তুমি বাউলে! দুটো টাকাও কর্জ দিতে পার না?

যে অবস্থায় পড়ে লায়লা হাত পাততে এসেছে, তাতে ঠাট্টার কোনও অবকাশ ছিল না। ছিলও না লায়লার সুরে বিন্দুমাত্র তার কোনও আভাস। ধীর স্থির ভাবে যেন কলিমের পৌরুষে আঘাত করতে চাইলো।

আগে থাকতে এর জন্য বিন্দু বিসর্গও কিন্তু প্রস্তুত হয়ে ছিল না লায়লা। তাই নিজের কথাগুলি যেন নিজেই সহ্য করতে পেরে ওঠে না। কয়েক লহমা দাঁড়িয়ে রইল। বাউলেও রইল। বাউলেও নিস্তব্ধ। কোনদিনও তো লায়লা এমন সুরে তার সঙ্গে কথা বলেনি! আঘাত ও অভিমানে আহত বাউলে শুধু একবার গলায় চাপা খাঁকার দিল।

লায়লা আর একবারটিও বাউলের মুখের দিকে না তাকিয়ে আঙিনা পেরিয়ে ভেড়ি পথ ধরল। কলিম একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে লায়লার গতি পথে। পুরু তবনে পায়ের আঘাতে পত্‌পত্ শব্দ ওঠে। দেহের গতি যেন তবনের বেড় মানতে চায় না। একবার তবনের বেড়ে হোচট্ খেয়ে পড়ে যায় যায় বুঝি। অমনি কলিম দাওয়া থেকে তড়াক্ করে উঠে পড়েছে। না, লায়লা সামলে নিল। সামলে নিয়েই আবার চলল, একবারটিও পিছন ফিরে তাকাল না।

কলিম বসেই আছে বার-বাড়িতে ; ফুফু একটু পরে এসে বলল—কিরে, লায়লার গলা শুনলাম যেন ?—চমকে ওঠে কলিম। ও বুঝি বাঘের সামনেও এমন চমকে ওঠে না। বলে,—হ্যাঁগো, এই তো এসেছিল !

—এলো, তা একবার বসতেও বললি না ? ভেতরেও একবার নিয়ে এলি না ? তুই যেমন !

—না, ও বসবার নয় ! বসতে কি আর চায় ! ছেড়ে দাও ওর কথা, ফুফু।

ছেড়ে দাও বললে কি ছাড়া যায় ; কলিম ভেবে মরে, কি দিয়ে কি করবে। অনেক ভেবে ঠিক করেছে, নিধু শিকারির শরণাপন্ন হবে ! কিন্তু তার পাত্তা পাওয়াই যে দায় ! দোকানদারি এখন তার সম্বল। আবাদে দোকানদারির কিন্তু কোনও স্থিতি নেই। বাজার বলে কোনও কিছুই নেই ভাটো দেশে। শুধু হাট। কিছুদূর অন্তর অন্তর এক একটি হাট নদী বা খালের ত্রিমোহানাতে, যাতে নানাদিক থেকে লোক এসে জড়ো হতে পারে। নদীপথে জড়ো হতেও বেগ পেতে হয় না। সপ্তাহে এক-এক দিনে এক-এক জায়গায় হাট। দোকানদারদের নৌকোতেই থাকতে হয়। বাসা বা মালখানা ওদের নৌকোতেই। জোয়ার ভাটা গুনে গুনে এ-হাট সে-হাটে বিকি-কিনি করে বেড়ায়।

রবিবার বড়দলের হাট, সোমবার বগার ও হোগলার হাট, মঙ্গলবার বেনেখালির হাট, বুধবার সূতীর হাট, বিষ্যুৎবার খড়েলকাঠির হাট, শুক্রবার আমাদির হাট, শনিবার ঘুঘ্‌রোঘাটির হাট—রবিবারে ফিরে আসে আবার বড়দলের হাট। এ তো গেল যে-সব হাটে জো'তে গিয়ে সেই ভাটায়, বা ভাটায় গিয়ে সেই জো'তে ফেরা যায়। এ ছাড়া আছে অগুনতি হাট এই গের্দে ছাড়িয়ে।

হাটের দিনে এই সব ত্রিমোহনাতে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। পরদিন আবার যেমন তেমনি, যেন খাঁখাঁ করতে থাকে। লোক নেই, জন নেই, চার খুঁটির মাথায় কয়েকটি ছাউনি হয়ত দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। আর চারিদিকের অপরিসর চত্বর বনের হরিণের চটের মত অজস্র পদচিহ্নে জর্জরিত হয়ে পড়ে আছে।

এমনি কোন এক হাটের দিনে বেলা থাকতে ধরতে হবে নিধুশিকারিকে। চকের লোকেরা সব হাট ধরে না, ধরার আবশ্যকও নেই। পরপর হাটগুলির জন্য হাটুরে ডিঙ্গি পাওয়াও যায় না। তাই কলিমের হাটে হাটে নিধু শিকারির খোঁজ নিতে বেশ দেরি হয়ে গেল।

নিধু শিকারি কলিমের অতীত জীবনের যেন এক সাক্ষ্য। ওকে দেখলেই অতীতের অনেক কথাই মনে পড়ে কলিমের। 'কেমন তুমি মরদ, বাউলে !'—এই কথাটা আজ কলিমকে অতীতে নিয়ে ফেলেছে। অতীতের জাবর কেটে রসসিঞ্চিত হয়ে যেন সে বাঁচতে চায়। তাই নিধু শিকারির শরণাপন্ন হবার কথা প্রথমেই মনে হয়েছিল।

নিধু শিকারিও হতাশ করেনি ; বলে,—তা আর এমন কথা কি ! ওলাওঠার দিনে তুই যে কি করে আমাকে বাঁচিয়েছিলি ! তাই তো আজ পোলাদের যে করে হোক মুখে দুটো অন্ন জুটছে।

কলিম কথা ঘুবিয়ে নিয়ে বলে,—প্রাণ বাঁচে তো, মান বাঁচে না ! প্রাণ বাঁচান বোধ হয় সোজা, মান বাঁচানই দায় দেখছি, চাচা !

শিকারিকে কলিম সব কথা খুলে বলেনি। সে নিজের মত করে বুঝে নিল ; বলল,—তুই আমার কাছে কর্জ মাঙলি, তাতে মানের কথা তুলিস্ কেন ?

—না চাচা, ও এক কবি-গানের ধূয়ো কপ্চালাম। কি ঝকমারি বলো তো, বাদায় উঠে

ধানের মড়াই দেখার আশা ! আর না দেখলেই বনবিবির ওপর গোঁসা ! এই আশা ও গোঁসার মুড়োই ঠাহর পাই না।

চাচাও কলিমের আলাপ-সালাপের মুড়ো পায় না। তবে এটুকুন ঠাহর পেলো, একটা কিছু বা হয়েছে। হলেও, বাউলে-মানুষকে বুদ্ধি দিতে যাওয়া খামোকা।

চাচার থেকে কিছু টাকা হাতে পেতেই বাউলে ছট্‌ফট্ করতে থাকে। যেন ডানা মেলে উড়ে যেতে চায় চকে। আঙুলের কর গুণে-গুণে মনে করতে চেষ্টা করে, কতদিন আগে লায়লা সেই ভোর সকালে এসেছিল। গুণে দেখে, সে তো আজ প্রায় চৌদ্দো দিনের কথা।

হাটুরে ডিঙিতে যাবে। অনেক ডিঙিই মঠবাড়ির চকের গা ঘেঁষে যাবে। কিন্তু কোনটা আগে যাবে, নানাভাবে বিচার করতে থাকে। হয়েদখালির মোল্লাদের নৌকো পেয়ে তাতেই আগে থাক্‌তেই জাঁক হয়ে বসল। ছিটো নৌকো—হাত চল্লিশেক লম্বা, আলগোছে ভেসে থাকে যেন পানির ওপর। খান পনেরো বোটের খোঁচ পড়লে ছুটবে যেন সাহেবী ভট্‌ভটি লঞ্চের মত।

রওনা হয়েছে সাঁঝের গোনে। হাট তো ভেঙে গেছে বেলা গড়াতেই। বাদাবুনে হাট, সাঁঝের আগেই সব ফাঁকা।

বাউলের ঘরমুখো হবার কোন ঠিকঠিকানা ছিল না। এলে তবে তার জন্য হাড়ি চড়াবার কথা ছিল। কিন্তু ফুফু জ্বরে মাদুর নেবে, তা তো কলিমের জানা ছিল না। গতিকে পড়ে নিজেকেই হাড়ি চাপাতে হলো রাত দুপুরে।

এতদিন আমিনা যা হোক ছিল। কম দিন হলো না তো ! আমিনা এখন তো বেশ ডাগর। ডাগর হতেই এবার ডানা মেলবে। তাই তার বা'জান এবার তাকে ঘরে নিয়ে গেছে ফুফুকে কাঁদিয়ে। বিয়ে-সাধি দিতেও হবে তো। ফুফু এখন একা একাই থকে। মাদুরে শুয়ে আছে। সেখান থেকে মাথা কাত করে দেখছে। বেশ দেখাচ্ছে কলিমকে। উনুনের পলকা আগুনে কলিমের রঙ্ যেন বাঘের মত ঝলক দিচ্ছে। মেয়েদের মত হাটু ভেঙে বসতে পারে না। পায়ের তাগড়া গোছা নিয়ে এমন উঁচু হয়ে আছে, যেন উনুনের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। মায়া হলো ফুফুর ; বলল,—আর কতদিন এমন করে চালাবি ? বুড়ো হয়ে গেলি।......রত্তি মেয়ে তো আর চলবে না। নিকেই করা তো ভাল। সমুত্ত বিবি আসবে ঘরে, তা না তোর এ কষ্ট দেখতে পারি না !

আমিনা যাওয়া অবধি ফুফু তো উঠতে বসতে এমুন ধারা কথা শোনায়। কলিম সায় দিল,—মরদের বড় সাধ, উঠতে বাঘের কাঁধ !

ফুফু তিতিয়ে ওঠে,—তোর শোলোক মারার ঠেলায় গেলাম। ও-সব বাউলেগিরি বনে করিস্। সাধ কিসের রে ! মরদ হয়ে একটা মাগিকেও খাওয়াতে পারবি না ?

অজানিতেই ফুফু অভিমানঘন ব্যথাতুর মনে আঘাত হেনে বসে। চুপ হয়ে গেছে কলিম। চুপ হয়ে গেলেও, মনে মনে যেন ব্যঙ্গ করে ওঠে,—সব মেয়ে মানুষের হাতেই এই এক অস্তর ! নির্বিকার ভাবে ব্যঙ্গ করতে চাইলেও বিকার থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। সেও যে রক্ত-মাংসে গড়া মরদ।

ভোর না হতেই ছুটেছে। ভাবনার অন্ত নেই। কেমন হালে না জানি পাবে লায়লাকে। কি যে বলবে দেখা হতেই ! লায়লা নিশ্চয় অবাক বিস্ময়ে তাকাবে তার দিকে। খুব একটা জব্দ করে দেবে। ট্যাঁক হাত দিয়ে দেখে নেয়, টাকাটা আছে কিনা ঠিক। টাকা অবশ্য বেশি নয়। তাহলেও লায়লাকে অবাক করে দেবার মত। কেন সে এত ব্যগ্র। ব্যগ্র হবে না কেন ? সে তো বাউলে ফকির ! কেউ বিপদে পড়লে, তার তো এগিয়ে যেতে হয়। এগিয়ে

যাবারই কথা। তাই কি ? বাদায় বাঘের হাত থেকে মানুষকে ত্রাণ করে সে। অবলাকে বলীর হাত থেকে বাঁচায়।......তাই কি শুধু! ছুটেছে কলিম। উর্ধ্বশ্বাসে।

শান্ত নীড়। সদ্য গোবর দেওয়া তক্‌তকে উঠান। কিন্তু কারও সাড়া নেই। দরজার আগল টানা। হুড়কো ডিঙিয়ে আর এগুতে চায় না কলিম। বাঘ-বাঘিনীর পদচিহ্ন অনুসরণে অভ্যস্ত বাউলে নিচের দিকে তাকায়। তক্‌তকে গোবর জলে সিক্ত উঠানে পদচিহ্ন রেখে কে যেন এইমাত্র বেরিয়ে গেছে। ফিরতি পদক্ষেপের কোন চিহ্ন নেই।

একবার এগোয়, আবার পেছোয়। কয়েকবার এগোয়, আবার পেছোয়। কয়েকবার এমনি করে অবশেষে ভেড়ির ওপর এসে উঠেছে। দূর থেকে দেখতে পায় জেরান্দিকে। কাছে এলেই প্রশ্ন করলো,—কি-রে! ঠাগরোণ কোথায় রে ?

—বাঃ-রে! যেখানে যাবার কথা সেখানে গেছে।

শঙ্কান্বিত হয়ে কলিম বলে,—বল্ না কোথায় ?

—কোথায় আবার, গেছে কাছারি-বাড়ি। তুমি জানো না বুঝি, ভাবিকে ওরা কাজ দিয়েছে। সক্কালে যাবে, আর ফিরবে সে—ই সাঁঝে।

—কোথায় বল্‌লি ? আনন্দ গাজীর বাড়ি!

—বাঃ-রে! বললাম না, কাছারি-বাড়ি, কাছারি!

—ওঃ!

ষোল

লায়লা সেদিন ভোর সকালে বাউলের বাড়ি থেকে এসেছিল যেন এক ছুটে। ভাববার তার অনেক কিছুই ছিল। ভাবতে দেবে না তার মনকে কোনমতে। পদক্ষেপের দ্রুত গতিতে মনকে অবকাশ দিতে চায়নি।

ঘরে এসেও থিথিয়ে বসে না। নিজের মনকে যেন নিজে চিনে ফেলেছে। অবসর দিলে ভাবের আবেগ ওকে যে আপ্লুত করে দেবে।

না, আর দেরি নয়, এখনই। [illegible] ধানের মৌড়িটার দিকে তাকাল একবার। কেন, কিসের ভয় ? সেও তো চাষী! চাষীর ধানের লেন-দেন থাকবে না তো কি থাকবে ? চাষী আর মাটি তো এক কথা। মাটির কাল-আকাল আছে, চাষীরও কাল-আকাল আছে। আকাল......আকাল তো কাটাতে হবে!

চললো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে। ছুট ঠিক নয়। ধীর স্থির ভাবেই চলেছে। পায়ের গতি মন্থর, কিন্তু মন ছুটে গেছে উর্ধ্বশ্বাসে অনন্দের কাছে। কি বলবে, কি চাইবে,—কোন চিন্তাই যেন আজ তার অধীনে নয়। পুরুষকারকেও তো সে দেখেছে আনন্দের মাঝে আরেক রূপে। তারই আসক্তিতে আজ সে সিক্ত হতে চায় ভ্রমরার মত। তার মধ্যে যদি কোন জোর থাকে, কোনও কশাঘাত থাকে, তাতেও যেন তার আপত্তি নেই।

আনন্দের খলেনের বেড়ায় ধারে কিছু বেগুনের চারা। বড্ড পোকা ধরেছে। জড়ো করা হুঁকোগুলি খোয়ালি করা ক্ষেতের কোণে পড়ে আছে। হুঁকোর জল কচি কচি পাতাগুলির উপর আনন্দ ছিটিয়ে দিচ্ছে। দা-কাটা তামাকের কড়া পানি পড়তে ছোট ছোট লাল পোকা ডানার লাল-কাজল দু'খানা উঁচু করে অভ্রসম পাখা মেলে বসছে গিয়ে এক গাছ থেকে আরেক গাছে। আনন্দও এগিয়ে যায় এক গাছ থেকে আরেক গাছে। মজাই লাগে আনন্দের।

বেগুন ক্ষেতের পূবের কোণায় একসারি কুটোর পালা ; পূব দিকের ভেড়ি-পথকে আড়ালে ফেলেছে বহুদূর অবধি। লায়লা যেন হঠাৎ এসে আবির্ভূত হলো পালার আড়াল থেকে। সামনেই আনন্দ। ভেড়ি এখানে ছ'হাত মত উঁচু, কিন্তু আনন্দের কুটোর পালা তাকেও ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে আছে। সম্পন্ন গেরস্তের ঘোষণা।

হঠাৎ দেখা যায়, হঠাৎ-ই লায়লা সম্বোধন করে বসল,—কি গো লাঠেল ! ভোর সকালে বেগুন ক্ষেতে !

—লায়লা বিবি যে ! এসো, এসো, অনেক দিন পরে যে।

লায়লা আর আসবে কি, এসেই বসে পড়ল বেগুন ক্ষেতের পাশেই। কিসে ওকে যেন ক্লান্ত করে ফেলেছে। কোনও ভণিতা করতে চায় না। সটান বলে ফেলতে চায়, পাছে কোন বাধা পড়ে আবার।

—একটা বিহিত যা হয় করো, লাঠেল !

—কিসের বিহিত ?

—কিসের আবার ! আমার।

আনন্দ তাক্ মেরে গেছে। তাক্ মারলেও মুখে মৃদু হাসি নিয়ে আস্তে আস্তে বলে,—সে তো তোমায় আগেই বলা···

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লায়লা বলল,—না, না, সে কথা বলছি না। বলছি······কি যে বলবে ভেবেই পায় না। ঢোক গিলে হঠাৎ বলে ফেলল,—দাও না, যে কোনও একটা কাজ জুটিয়ে। বেশি না, দিনে একপালি ধান জুটলেই আশা মেটে।

লায়লা তো পরের দুয়ারে কাজ করে বেড়ায়। সারা বছরই বলতে গেলে অমন কাজ লায়লার লেগেই আছে। তবুও পালির হিসেব-দরে কাজে হাত দিলে লায়লার মনঃপূত হবে কি না—সে কথা তলিয়ে দেখবার ফুরসৎ যেন পায় না গাজী। তাহলেও নায়েব-জমিদারের সঙ্গে থেকে থেকে নায়েবী বুদ্ধি খাটাতে দেরি হয় না—জাল ছড়িয়ে ফেললে, গোটা করতে তর সইবে ! কাছে এসে বলল,—তা আর এমন কি কথা ! নায়েব তো রাতদিন কেচর্ কেচর্ করছে একজন কাজের লোকের জন্য। ভালই হবে, সকালে এসে কাছারির ঘর-দোর দেখবে, গোছ-গোছালি করবে। নায়েব মালিকের কাছারি খলেন তো ঝক্‌ঝকে রাখা দরকার ! আর তোমরা তো গিন্নি-লোক, রান্না-বান্নার তদারকি না হয় একটু করলে। ব্যস্, তারপর সন্ধ্যের গোনে পাখির মত বাড়ি ফিরবে।

লায়লা থির হয়ে গেছে। কোন কথা বলে না—হ্যাঁ বা না, ভাল বা মন্দ, কিছুই বলে না।

—কি গো, ঠোঁটে কুলুপ দিলে যে ! বলো, মন্দটা কিসেব ? এদ্দিন মাগুনাই তো খেটে বেড়াতে। এবার না হয় পালি, শলা বা আড়ির একটু হিসেব রাখলে। কোনও দায় ঝক্কি নেই। দেবতার সাথে সাথে আসবে, আবার দেবতা ঢলে পড়বার সাথে সাথে চলে যাবে।

গাজী এই কাজের কথা পাড়লো বটে, কিন্তু এ নিয়ে নায়েবের সাথে কোন কথাবার্তা হয়নি, বা নায়েবও তাকে কিছু বলেনি। ভরসা, সে একটা কিছু বললে নায়েব ঝেড়ে ফেলতে পারবে না। তা ছাড়া আয়েসী পেরভাস নায়েবের মনের ধাঁচ-ধরন তো অজানা নয় ! যদি বা গাজী অপারগ হয়, তাহলে কি আর কোন ঘোঘা-পথ তখন বের করা যাবে না ! যদি তাই না পারে, তবে লাঠেলের দুপুরুষ ধরে কাছারি আনাগোনার কোন মানেই হয় না।

বেশ জোর দিয়েই লাঠেল বলল,—বলে ফেলো, রাজি কি না ?

—বেশ ! রাজি না হবার কারণ থাকলে কি আমি এসেছি !

—তুমি দেখি নিম-রাজির মত 'বেশ' বলছ ! কেন, ভাল ব্যবস্থা হলো না বুঝি ?
—না, না,...খুব ভাল হলো। কবে থেকে যাব বলো।
আনন্দ গাজী দম্‌বার পাত্র নয়। সব ব্যবস্থাই করেছে। পেরভাস নায়েব তো গদগদ। বারবার মনে মনে কাজের ফিরিস্তি করেন—কোনটুকু লায়লাকে দিয়ে করাবেন, আর কোনটুকু করাবেন না। রসুই-ঘর গোবর দেওয়া, কাছারি-ঘর ঝাড় দেওয়া, মাছ-তরি-তরকারি কোটা, হুঁকো ও গড়গড়ার জল বদলান, চানের জল আনা,—এ সব কাজ তো করাতেই হবে। এ ছাড়া আছে তো অনেক কাজ......না, না, সে-সব হবে আস্তে আস্তে। বলতে হবে ওকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে......না, তা বোধ হয় বলতে হবে না......পেরভাস নায়েব যেন মস্ত একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন—যাক্ বাঁচা গেল।

লায়লা আজ অনেকদিন হয় কাজে যোগ দিয়েছে। কাছারির কাজে প্রথমে কিছুটা আড়ষ্টতা ছিল। থাকাই স্বাভাবিক। ঘরে ঘরে দশজনের কাছে দশজনের মত হয়ে মেলামেশাতে ও কম নয়। কোন জড়তাই ছিল না। কিন্তু সে ছিল নিজেদের মধ্যে। এবার যে ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কারবার। তবু তড়িতে জড়তা কাটাতে লায়লার মত মেয়ের বেশি বেগ পেতে হয় না। অপরপক্ষও যে এই জড়তা কাটাতে সবিশেষ আগ্রহান্বিত। অগ্রহান্বিত বলে ! হলে কি হবে। আপদ জুটেছে নন্দা।
নন্দার বয়স বছর ষোলো। নায়েব এনেছেন দেশ থেকে। রান্নাবান্না করে, যত্ন-আত্তি করে তাঁকে সুখে রাখবে নোনা দেশে। নন্দা এখন লায়লাকে একই কাজের সঙ্গী পেয়ে তার পেছন পেছন সারাদিনটা ঘুরু-ঘুর করে। এদের কাজের যেমন কামাই নেই, তেমনি কথা বলারও বিরাম নেই। মাঝে পড়ে নায়েবের এখন জ্বালা হয়েছে—ফুর্‌সুতই জোটে না। মেয়েদের সঙ্গে এটা-সেটা গল্প করেও তো একটা আরাম আছে।
নায়েব মশায় ভোরে উঠে হয়ত হাঁক দিলেন,—লায়লা এসেছ ? কল্‌কেটা দাও না !
লায়লা কল্‌কেতে ফুঁ দিতে দিতে বার-বাড়ির উঠানে হাজির। কোত্থেকে ছুটে এসে নন্দা বলল,—দাও, কল্‌কে আমি দিচ্ছি, তুমি মাসি না হয় যাও গাড়ুতে জল এনে দাও।
গাড়ু নায়েবের কাছে এনে দিতে না দিতে ডাক পড়ে—মাসি, কই 'আখা' ধরাবে না ? চায়ের জল হবে না ?
নায়েবের চায়ের বড় অভ্যাস। এই নোনা আবাদেও চায়ের সব ব্যবস্থা তার রাখতেই হয়।
চায়ের পর্ব শেষ হতে না হতে, নন্দা গোবরজল গুলে ফেলেছে। লায়লার এখনই কাছারির বারান্দা নিকুতে হবে। প্রজারা সব এসে পড়ল বলে !
মাসি সম্পর্ক পাতিয়ে নন্দা তার দাপটিকে যেন সহজ করে নিয়েছে।
পৌষ মাস। কাছারির খলেন ভোর না হতেই গম্‌গম্ করে। আঁটি রোদে দেওয়া আছে, মাড়াই আছে, গোলাজাত করা আছে, ধানের মাপজোখ ও বিকিকিনি আছে, একে অন্যের সারা বছরের দেন-দায়িক মেটান আছে, সবার উপর আছে ঝগড়াঝাটির নায়েবী সালিশী।
আজও এসেছে অনেকে। কলিমকেও আসতে হয়েছে বেঘোরে পড়ে। কলিমের কাছারির প্রতি রাগ তো সবাই জানে। কোনদিনও সে নিজের জন্য কাছারিতে ধন্না দেয়নি। তাই কলিমকে আসতে দেখে সবাই সন্ত্রস্ত। কি একটা আবার বাধিয়ে বসে কে জানে.!
আনন্দ দূর থেকেই কলিমকে আসতে দেখেছে। দেখেই কথা পাড়ে,—আর যাই হোক্ নায়েবমশায়, কলিমের মাজা ভেঙেছি এবার। ঐ ছড়া কেটে কেটে আমাদের পেছনে আর

লাগতে হবে না।

নায়েব উৎফুল্ল, যেন এ বিষয়ে কিছুই জানেন না ; তাই ব্যাপারটা শুনতে চান। বললেন,—কেন ? কি হলো আবার ?

—হবে আর কি ? যাক্ না এবার কারও কাছে। কোন্ ঘর না লাঠেল বাড়ি থেকে এবার ধার নেয়নি। শুধু ধার না, আমি তো বলেছিই, যে পারবে সে শোধ দেবে, যে পারবে না তার এ-সন্ কিছু দিতে হবে না। বলো, তোমরা সবাই বলো।

সবাই সায় দিয়ে যেন একবাক্যে বলল,—তা বড় মেঞা, যা বলেছেন।

—আরও মাজা ভাঙিনি নায়েব মশায় ? সেই যে গল্প বলেছিলাম······বলেই নায়েবের মুখের ওপর বড়বড় চোখ করে ফোঁড়ন কাটল,—সে-ই সুয়োরানি আর তার পরাণ পাখির গল্প !

বলতেই পেরভাস নায়েব তো গড়গড়ার ধোঁয়ায় বিষম খেয়ে হাসি ও কাশিতে খোঁক্ খোঁক্ করে উঠলেন। আর কিছু বুঝুক না বুঝুক সবাই বুঝে নিল—এই হাসি ও কাশিতে কাছারির শক্তি, বুদ্ধি ও ধূর্তামি যেন ফেটে পড়ল।

কলিম ইতিমধ্যে এসে পড়েছে। 'আ-শে' বলেই নিজেই পিড়ে টেনে বসে পড়ল।

নায়েব বললেন,—কি সমাচার বাউলে ?

পিঠ-পিঠ আনন্দ বলল,—কি বাউলে, বাঘ-টাগ্ কি রকম তাড়াচ্ছ ?

কলিম পাশ কাটবার পাত্তর নয়। বলে,—কই ! বাঘ যে এবার বাদা ছেড়ে আবাদেই হাজির। বুঝলি আনন্দ ! তোদের ভালবাসা আর মোল্লার মুরগী পোষা।

আনন্দ ঘড়েল। বাউলেকে মিষ্টি কথায় ঠাণ্ডা রাখতে চায়,—তা বাউলে তোমার কথার বাহার আছে।

—আমার কথা তো কথা নয়। এর দরকারটা ছিল কি ?

নায়েব ব্যগ্র হয়ে ওঠেন,—খোলসা করে বলো বাউলে, কি বলতে চাও ?

—বলি কি, এমনভাবে সক্কলের ধান আটক করার কি দরকার ছিল। না হয় দয়া-দক্ষিণ্য করেছিলি, তাই বলে ক্ষেতের ধান আটক করে কাছারির খলেনে তুললি ?

—কেন, আমি তো বলেছি, যে পারবে সে দেবে, যে পারবে না সে দেবে না।—বলেই সবার কাছে সায় পাবার আশায় যাকেই সামনে পেল তার বাহুতে সজোরে নাড়া দিয়ে আনন্দ বলল,—কই, তোমরাই বলো, সত্যি কি না ?

—তাহলে ক্ষেতের ধান আটক করতে গেলি কেন ?

আনন্দ এবার মুখ ঘুরিয়ে বলে,—আমার তো বুঝ্ নিতে হবে, কার কি ধান হয়েছে। বুঝ্ নিতে হবে, সত্যিই সে দিতে পারবে কি না !

কলিম বুঝি একটু কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সামলে নিয়ে বলল,—বেশ তো, তা না হয় হল। আমি বাপু ন্যায্য কথার লোক। তুললি তো তুললি, কাছারি-বাড়ি কেন ? কাছারি-বাড়ি আনা কেন ?

লায়লা আসছিল নায়েবের কল্‌কে হাতে নিয়ে ফুঁ দিতে দিতে। এ সময়ে তামাক সেবন করাতে না এলেও চলতো। লায়লা রান্নাঘর থেকেই কলিমের সাড়া পেয়েছে। তার নিজের বেপরোয়া বিদ্রোহী মনকে যেন একবার পরখ করে নিতে চায়। ইচ্ছা করেই তাই কল্‌কে নিয়ে সামনে এসেছে।

লায়লা কলিমের শেষ কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে,—'কাছারি-বাড়ি কেন ? কাছারি-বাড়ি আনা কেন ?'—কথাগুলি লায়লা নিজের মত করে বুঝে নিয়ে যেন আরও

দৃঢ়পদে এগিয়ে এসে কল্‌কেটা গড়গড়ার নলে খট্ করে বসিয়ে দিল।

নায়েব গলায় খাঁকার দিলেন। কলিম নিজের কথাগুলি একটু মোলায়েম করতে চায়,—তা, আনন্দ, তোর নিজের ঘরেই তো তুলতে পারতিস্! কাছারি আনা কেন? কাছারি হলো গে আবাদে জজের এজলাস্। সোজা এখানে আনলে যে গরীব দুঃখীর আর আপীলের দুয়োর থাকে না।

লায়লা কথাগুলো যেন গিলে খেল। একবারও কলিমের দিকে তাকায় না। কলিমও ওর আগমন ও নির্গমনকে উপেক্ষা করে কথাগুলি বলে গেল। আড়ালে পড়বার আগে লায়লা একবার পেছনে মুখ রেখেই থমকে দাঁড়ায়। পরক্ষণেই দৃঢ় পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নায়েবের খাঁকারে যে বিচলিতভাব তা কলিমের শেষ কথায় কেটে গেছে। আস্তে আস্তে গড়গড়া টেনেই চলেছেন। নায়েবমশায়কে চুপ থাকতে দেখে আনন্দ কিন্তু এদিকে রেগে উঠেছে,—তা বেশ করেছি! তুমি তো আমার ধান ধারোনি। তোমার মাথা ব্যথা কেন?

কলিমেরও রোখ্ চাপে,—আমি না হয় ধান না ধারলাম। গেরামের লোকেরা তো আছে, তাদের কথা ভাবতে হবে না!

—রাখো তোমার ভাবনা। নিজের কাজে মন দাওগে!

—দেখ, আনন্দ! পিরথিমে এতো অন্যায় সহ্য হবে না। একটা জিনিষের ন্যায়-অন্যায় তো আছে!

—ন্যায়-অন্যায় তোমার বাদায় মারাওগে! আবাদে বাউলেগিরি করতে এসো না!

—দেখ্ এমন বেয়াদপীর মত কথা বলবি না!

নায়েব সব কিছু সামলে নিতে চান। গলা মোটা করে বললেন,—থামো বাউলে! কেন রোখারুখি করছ? আমি তো আছি, ন্যায়-অন্যায় দেখার জন্য আমি তো রইলাম। দেখি তোমার হাতের আংটিটা। অতো মোটা তামার আংটি কোথায় পেলে? বাউলে-আংটি নাকি?

কলিম অন্যমনস্কভাবেই আংটি খু[illegible] দেয়। নায়েব একটু এ-পাশ ও-পাশ ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে রেখে দিলেন তাকিয়ার নিচে।

অমনভাবে আংটি রাখতে দেখে কলিমের মনে পড়ে হেঁতাল নড়ির কথা। সেবার নড়ি দেখতে নিয়ে আজও দেননি। বলে,—আমার হেঁতাল নড়িটা আর দিলেন না, নায়েব মশাই!

—এই মরেচে! আমাকে এত অবিশ্বাস! ঐ তো, দেখতে চাও ঐ তো তোমার নড়ি। বলেই বিছানার পাশ থেকে টেনে এনে দেখিয়ে দেন।

কলিম আর কি করে! হাত পেতে বলে,—তা আংটিটা দেন।

—আমি কি এতো বোকা! তোমার ও যে মন্ত্র-পড়া আংটি, আমি জানি না বলছ? অমন মোটা তামার আংটিতে পাথর বসালে ভারি ভাল দেখাবে। নীল পাথর। আমার জানা এক ভাল সেক্‌রা আছে, বুঝলে!

মন্ত্রের কথা শুনতেই কলিমের গুরুর কথা মনে পড়ে। ইচ্ছে হয় একবার শুনিয়ে দেয়—অতো মন্তর মন্তর করছ! শুনতে চাও, মন্তরটা বলে দিতে পারি।

ইচ্ছে হলেও বলে না। নীল কাঁচের লোভও যে একটু হয়নি, তা বলা যায় না।

বাউলে আর কি করে! আরও দু'একটা এটা-ওটা কথার পর উঠে দাঁড়ায়। মাথা

চুলকাতে চুলকাতে যাবার আগে বলে গেল,—তা নায়েব মশায়, ন্যায় বিচারের সালিশী নিলেন তো, দেখেন যেন বানরের পিঠে-ভাগ না হয়ে যায় !

সতের

সেদিনই সন্ধ্যা বেলা। কাছারির খলেনে বিশেষ লোকজন নেই। বিস্তীর্ণ খলেন। সারা খলেনটাই লায়লার দৌলতে গোবরের প্রলেপে চক্চক্ করছে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। খলেনের এখানে ওখানে মানুষ সমান উঁচু ধানের রাশ, আঁটির গোলা ও খড়ের স্তূপ আলো ছায়া সৃষ্টি করেছে। খলেনের চেয়ার ও চৌকি নিয়ে একমাত্র নায়েব ও আনন্দ বসে। খলেনের দক্ষিণ প্রান্তে জিওল গাছের আড়লে পরবাসীরা খুপরির মত খড়ের বাসা বেঁধেছে। দিনের ধান-কাটা শেষ করে এখন রান্নাবাড়িতে ব্যস্ত। তারই ঊর্ধ্বমুখী ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে চাঁদের আলো পড়ে যেন হঠাৎ হঠাৎ ঝিলিক্ দেয়।

লায়লা চায়ের কাপ হাতে করে এসেছে। শেষবারের চা খাইয়ে লায়লা নিজের ঘরে ফিরবে। মুখপোড়া নন্দাও পিঠ্পিঠ্ এসেছে। পূর্ণিমার চাঁদ ছিল, তাই লায়লার আজ একটু ঢিলেমি ছিল। কিন্তু আর দেরি করতে চায় না।

লায়লা এসে দাঁড়াতেই নায়েব বললেন,—তুমি আর কি জানো, আনন্দ ! বাউলের বিষদাঁত আজ ভেঙেছি।

—কি রকম !

—রকম আর কি ! এই দেখো—বলেই নায়ের হাতের মুঠো খুলে আংটিটা দেখালেন। বাউলের অতো তেল তো এই মন্তর পড়া আংটিতে। তাও জান না তুমি ! এই আংটি আর দিচ্ছি না। করুক দেখি ও বাউলেগিরি ! আবাদের পেরজা ক্ষেপানো ! আর হবে না।

—নায়েব মশায় ! আপনার সঙ্গে পেরে উঠবে কে ? লায়লা, তুমিই বলো না ?

লায়লা যেন আজ সারাদিন অনেক সহ্য করেছে। হঠাৎ বলে বসে,—বনবিবির সঙ্গে কি পারা-পারি করতে আছে ! অমন কাজ করতে না যাওয়াই ভাল।

নায়েব বলেন,—তা আমরা কি সাধে লাগতে যাই। আমাদের সঙ্গে লাগতে না এলেই হয় !

লায়লা কথাগুলি হঠাৎ বলেছিল নিজের জন্য, না ওদের জন্য, তা বলা দুঃসাধ্য। তবে আর কোনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয় না।

চায়ের পর্ব কোনমতে সেরে লায়লা চলে আসে। রোজের মত আজও নন্দা এগিয়ে দিতে এসেছিল। মাঝপথে সহসা লায়লা নন্দাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল,—যা তুই আজ। আমার তাড়া আছে ! আর দেখছিস না, আজ কেমন সুন্দর চাঁদের আলো।

জেরাবদি ইতিমধ্যে লায়লার বাড়ি এসে গেছে। জেরাবদির এ বড়িতে কোন কাজ করার কথা নয় ! তবু সে গায়ে পড়ে এটা ওটা কাজ করে। কলসে জল আনে, বাছুরটাকে ঘরে তোলে, গোয়ালে একটু ধোঁয়া দেয়,—এমনি টুক্টাক্ কাজ। লায়লা কাজের খুঁত ধরে প্রথমেই এক চোট জেরাবদিকে বকাঝকা করল। তারপর খাওয়া দাওয়া না করেই শুয়ে পড়ল। বকাঝকার দরুন জেরাবদি মুখ বুঁজে পড়ে আছে। ভাবিকে একবার খানাপিনার কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, তাও বলে না।

লায়লাও আর কথা বলে না। এ-পাশ ও-পাশ করে প্রহর গোনে। জেরাবদিও দাওয়ায় শুয়েই আছে। তীর্যক চাঁদের আলোয় দাওয়ার আধখানা আলোকিত। ঝাঁপের ফাঁকে সেই

শুভ্র আলোকের দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছে লায়লা।

নিযুতি রাতে বাদার কোল নিরালা নিঝুম আবাদ। হঠাৎ যেন ভূমিকম্প। বনতল কেঁপে ওঠে। ভীষণ ব্যাঘ্র গর্জন। কোন শিকার মত্ততার আওয়াজ নয়। বাঘিনীর জন্য বাঘের সাড়া। বনকম্পিত আওয়াজ দমকে দমকে নেমে এসে স্তিমিত হয়ে যায়। ঘন ঘন বিকট হাঁক ক্রমশ খাদে নেমে মিশে যায়। হিংস্র ও বিকট গর্জনকারী জীবের পক্ষে হয়ত বেদনা বিগলিত হবার, আসক্তিতে সিক্ত হবার, তার হৃদয় আকুলি ঘোষণার আর কোন পথ থাকা সম্ভব নয়।

দমকের শেষ স্তিমিত আওয়াজের প্রতিধ্বনি বিস্তীর্ণ বনে বিস্তারিত হয়ে মিশে গেলে লায়লা তার চাপা মিষ্টি গলায় ডাক দিল,—জেরাবদি সোনা!

—কি বলো, ভাবি!

—শুনেছিস্?

—কি?

—বাঘের কান্না!

—বাঘের কান্না কি বলো! হাঁক বলো!

—না, কান্না। তোর ভয় করছে না? ভয় করে তো আয় ঘরে শুবি।

—ভয় কিসের?

—তোকে এসে যদি নিয়ে যায়।

—দূর ভাবি! কি করে আসবে? ওর আসতে হলে তো বাউলের বাড়ি পার হয়ে আসতে হবে।

—কি বললি?

—বলছি, বাঘ কি কখনও বাউলের বাড়ি ডিঙিয়ে আসতে পারে! না, বনবিবি তা করতে দেবে? বল!

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ করে থাকে। বাঘের আবার সেই বনকম্পিত আকুলিত ক্রন্দনধ্বনি। থেমে যেতেই লায়লা প্রশ্ন করে,—আচ্ছা, বল্‌তো, তোর বাউলের ওপর অতো ভরসা কেন?

জেরাবদি অবাক হয়ে বলে,—আমার কেন, আবাদের সব্বাই যে বাউলেকে ভরসা করে! তুমি বলতে চাও, করে না!

—না, তা বলতে চাই না।

অতো সহসা কথায় হার মানতে দেখে জেরাবদি আর কথা বাড়ায় না।

লায়লা সহসা কথার মোড় ঘোরাল,—জানিস?

—কি জানব?

—আমি কাছারির কাজ আর করবো না।

—সে কি!

—হ্যাঁ, তাই।

জেরাবদি কোনদিনই ভাবির কাছারি যাওয়া পছন্দ করেনি। তবুও তার কিশোর মনও উল্লাস না জানিয়ে উল্টো সুরে বাজিয়ে নিতে চায়; বলে,—কেন, বেশ তো ছিলে! নায়েব তোমার কেমন বড়দল থেকে এক জোড়া তবন এনে দিয়েছে! এ মাসের পাওনা হিসেব করে আনলে তো ডোল তোমার ভর্তি হয়ে উঠবে। এমন কাজ কেউ হেলায় ফেলে দেয়!

—না, আমার ভাল লাগছে না। শুধু কাজ, কাজ। এতটুকু ফুরসুৎ নেই। কাজ না

থাকলেও কাজ বানাতে নায়েবের সময় লাগে না। সেই ভোরে যাব, আর সাজে আসব।

একটু থেমে আবার বলে,—এরা সব কেমন আছে ?

—কারা ?

—এই ধর্...সর্বানুবিবি, সাকিনা,রাবেয়া;..নুরি;..আলেয়া...সোনাভান...কদবান। আরে, কদবান-বিবির কি হলো ? কাল আমাকে ডাক দিয়েছিল...পোলা হবে। কিছুতেই যেতে পারিনি। কাছারির কাজ যেন ঘাড়ে এসে জেঁকে বসে। কদবানের খবর জানিস্ ?...মানুষের বিপদে-আপদে না গেলে কি চলে ! বল্তো ! এরা কি কোনদিন আর ভালবাসবে আমাকে !

একটানা বকেই চলেছে লায়লা।

—যা মন চায় করো গে—বলেই জেরাবদি পাশ ফিরে ঘুমুবার চেষ্টা করল। সেদিনকার মত ঘুমিয়েও পড়ল।

* * * *

ক'দিনের মধ্যে লায়লা আনন্দের অসাক্ষাতেই নায়েবের কাছে কথা পাড়ল। লায়লা মেয়ে মানুষ, পুরুষের মনকে চিনতে সময় লাগে না। পুরুষের মন যে একটানা স্রোতের নদী। সূর্য-মাসের হিসাবে তাতে প্লাবন আসে, শীর্ণতাও আসে। তা এলেও তার সর্বসময়ের গতি একমুখী, একটানা। কিন্তু মেয়েমানুষের মন ! এ যেন লোনা দেশের দ্বিমুখী স্রোতোবহা। চন্দ্র-মাসের হিসাবেই যেন তার দেহে ও মনে কখনও জোয়ার আসে, কখনও ভাটা আসে। জোয়ার-ভাটায় সে হয়ে থাকে পুরুষের কাছে রহস্যময়ী। তাই লায়লা রহস্যময়ী হলেও নায়েব তার কাছে রহস্যময় নয়। নায়েবকে নিয়ে লায়লার বিশেষ আড়ষ্টতা ছিল না। কিন্তু আনন্দের কথা ভিন্ন। সে যে তার সমগোত্রী। সেই সেদিন যে তার নিজের মন বল্গাহীন ভাবেই মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তাই আনন্দের সূত্র ধরে কাছারি এলেও, আনন্দকে এড়িয়ে নায়েবের সঙ্গে লায়লা কথা পাড়ল। জানালো, সে আর কাছারিতে কাজ করতে চায় না।

মেয়ে মানুষ অমন অস্থির-মনা হয়—মনে করে নায়েব বললেন,—তা অত ব্যস্ত হয়েছ কেন ? এই তো দিন পনেরোর মধ্যে খলেনের কাজ সেরে চলে যাবে। তখন তুমি শুধু রোজ একবারটি এসে ঘুরে দেখে চলে যাবে, ব্যস্। তারপর আবার যখন আমি আসব, তখন যা হয় করো।

নায়েবের মতলব নায়েবের মনেই রইল ! লায়লা কিন্তু কি যেন একটা মুক্তির আস্বাদ পেলো। তবু তার ভয় আনন্দকে নিয়ে। মানুষের যেখানে দুর্বলতা, সেখানেই তার ভয়। আনন্দের শক্তিতে যেমন সহজেই আকর্ষিত হতে হয়, তার মতলববাজিতে তেমনি ভীত হবার কথা। এই দুইয়ের মিলন যেখানে ঘটে সেখানে কোনও নারীর পক্ষেও দুর্বলতা দেখা দেওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। হয়ত লায়লার পক্ষেও নয়।

এদিকে আনন্দ নিজে দিন গুণতে থাকে। তার শিকড় যে এই আবাদের লোনা মাটিতেই। তার ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

আঠার

কাছারি থেকে ফিরে আসার পর কলিম কিছুদিন ঘর ঘর ঘুরেছে। মতলববাজ আনন্দকে সবাই চেনে। তবু ঋণ, বিপদের ঋণ। ঋণকে কৃষক সহসা বেইমানী করতে চায় না।

আখেরে বিপদ আছে তা জানলেও। কৃষকের ঘর মাটির ঘর। পোড়ামাটির ঘরের মত অত সহসা তেতে ওঠে না।

তাছাড়া সময়টা ছিল ফসল তোলার মাস, নবান্নের উৎসবমাস। এর পরই আসবে আবাদের বিয়ে-সাধির মাস। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন—হাজার দুঃখ-দৈন্যের মাঝেও বসন্ত দেখা দেয় এদের জীবনে এই সময়। দায়িকের দায়-মুক্তির আনন্দ, সরিকের অংশ পাবার আনন্দ, তারপর বিয়ে সাধির উৎসব তো আছেই। তাছাড়া আছে—এখানে ওখানে ঢপ্, ঠুংরি, যাত্রা, ভাসান, গাজী ও জারীর গান ; পাগলা কানাই-এর জারী গীত হলে তো কথাই নেই। এই সব উৎসব ও আনন্দ জমিদার বা জ্ঞাতিদারদের অর্থের অপেক্ষা রাখে না। সামান্য অর্থে ও সামান্য উপকরণেই অসামান্য লোক সমাগমে উৎসব উল্লাসে পরিণত হয়। অর্থের প্রয়োজন হয় না সত্য, কিন্তু অবসর আবশ্যক। এই অবসরই মেলে এদের এই সময়। তারপরই আসে এদের জীবন-সংগ্রামের নয় মাস। বাঙলার মানুষের কঠিনতম সংগ্রাম।

কলিমেরও অবসর এই সময়। গত কলেরা মহামারিতে কলিমের হৃদ্যতা বাড়ে ফ্যাঁসেফোঁসে ঠাকুরের সঙ্গে। তারই আমন্ত্রণে কলিম গিয়েছিল ফরিদপুর জেলায় ঠাকুরের গ্রামে। চাষীর মন চাষের দিকে। সেই সূত্রে ওকে সবাই বলে,—এবার কী হবে জানি না! ফসলের মার তো মিঠেপানিতে নেই। তবে এবার কি হবে কে জানে!

কলিম ব্যগ্র,—কেন ?

—ভাটোর লোক তোমরা বুঝি জানো না, এবার দেবীর আগমন ছিল নৌকোয়। মানে দুগ্‌গা ঠাক্‌রণের। জানই তো, নৌকায় এলে সেবার দেশে প্লাবন হবেই হবে। প্লাবনকে বড় ভয়!

এই ভয় নিয়েই কলিম লোনা দেশে ফিরে আসে। আসবার সময় কলিম ওদের অবশ্য বলে আসে,—তা তোমরা তো ভেড়ির ধার ধারো না। দেখেছ আমাদের ভেড়ি ? মাথায় পাঁচ হাত, তলে দশ হাত, খাড়াই দশ হাত। প্লাবনে আমরা ডরাই না।

ভেড়ির বহর শুনিয়ে ওদের ভয়কে উপেক্ষা করে এলেও কলিম সত্যি সত্যি ভীতগ্রস্ত হয়ে ফিরেছে। আসা অবধি ভেড়ির কোলে কোলে ঘুরে বেড়ায়। আশ্বস্ত হতে চায় মাটির দেয়ালের ক্ষমতা নিয়ে। আজ ক'দিন ধরে কলিম চিন্তিত হয়ে পড়েছে। পাড়ার সবাইকে ডেকে ডেকে আলোচনা করে। আগে থাকতে একটা বিহিত করতেই তো হয়।

ভেড়িই হলো এদেশের প্রাণ। এদেশের অর্থ ও অনর্থের মূল। এই ভেড়িকে লক্ষ্য করে এদেশের দলিল দস্তাবেজে সর্তাবলী নির্দিষ্ট হয়। রাজবন্ধী হলে, ভেড়ি বাঁধা, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকী জমিদার বা জ্ঞাতিদারের দায়িত্বে থাকে ; তখন বিঘা প্রতি নিরীখ আড়াই টাকা পর্যন্ত উঠবে। আর যদি প্রজাবন্ধী হয়, ছোট ছোট প্রজাদেরই আপন অংশ মাফিক ভেড়ির দায়িত্ব নিতে হয় ; তখন বিঘা প্রতি নিরীখ বড় জোর পাঁচ-সিকা, না হয় দেড় টাকা।

মঠবাড়ি রাজবন্ধী। ভেড়ির ব্যাপারে কাছারির ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল। তাতে অসুবিধার কারণ থাকার কথা নয়। কিন্তু মুশকিল অন্যপথে। মালিক পক্ষ বড় চতুর। তারা এক এক ঘেরের সব জমিই বিলি করে না। নিজের খাস দখলে রাখে ডাঙ্গা জমির অংশ। নাবো বা ধাপা অংশে দায়-ঝক্কি আছে। তাই সে অংশ তারা প্রজাবিলি করে নানা লোভ দেখিয়ে।

দক্ষিণ বাঙলার নদীপথ সবই উত্তর থেকে দক্ষিণে। এই নদীর অববাহিকায় পলিমাটির আস্তরণে যুগ যুগ ধরে যে ভূমি গঠন চলেছে, তারও ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণে। তাই প্রতি

ঘেরে কোন জমি খণ্ড যখন ভেড়ির বেষ্টনে বাঁধা পড়ে তার ঢালও থাকে উত্তর থেকে দক্ষিণে। মালিক পক্ষ সাধারণত ঘেরের উত্তরাংশ খাস দখলে রাখে। সামান্য বিপদ আপদ হলেও এই ডাঙ্গো-অংশ বছর বছর সোনা ঢেলে দেয়।

এই অবস্থা ও ব্যবস্থা লক্ষ্যে রেখে ভেড়ির বাঁধনে চলে কারসাজি। মালিক ভেড়ি শক্ত ও পোক্ত করে নিজের স্বার্থ বুঝে, নিজের অংশ বুঝে। ঝক্কি যা প্রজার ওপরই ঠেলে দিতে চায়। শক্ত ও পোক্ত করা তো ব্যয়বাহুল্য।

তাছাড়া আর এক কারসাজি আছে। 'কলের' ব্যাপার নিয়ে। নদীর নোনা বিষ রোধ করতেই ভেড়ি। কাজেই নদীর জলের অনুপ্রবেশের কোনও তাগিদ নেই। কিন্তু বর্ষার পানি !

বঙ্গোপসাগরের বাঙলার প্রতি অনেক দৌরাত্ম্য আছে, অনেক কার্পণ্য আছে। কিন্তু কার্পণ্য তার নেই চুল-বরণ মেঘের গোছা ছড়িয়ে দক্ষিণ বাঙলাকে আনমনা করতে। হালকা মৌসুমীপ্রবাহ সে মেঘরাশিকে ছড়িয়ে দিতে চাইলেও, সুন্দরবন যেন চুম্বক আকর্ষণে তাকে জড়িয়ে রাখে তারই আশেপাশে। ঝরে পড়ে ঝর-ঝর ধারায় প্লাবনের বর্ষণ।

ধানের গোছা বাঙলার মাটিতে অনাদরে জেঁকে উঠলেও, জলের ব্যাপারে সে বড় স্পর্শকাতর। জলের সামান্য কম-বেশিতে হয় সে শুকিয়ে মরবে, না হয় সে পচে মরবে, আর নয় তো ফলবতী না হয়ে চাষীর অনাদরের প্রতিশোধ তুলবে।

ঘেরের মধ্যে ইঞ্চির মাপে এই বৃষ্টির জলকেই কম বেশি করতে 'কলের' আবশ্যক। ভাটির টানে নদীর জল যখন নেমে আসে, সেই ফাঁকে এই কলের পথে ঘেরের পানিকে ইচ্ছামত কমান যায়। অতিশয় লম্বা কাঠের বাক্সের মত এই কলগুলি। মুখে কাঠের ঢাকনা এমন তীর্যকভাবে থাকে যে, জলরাশি সে পথে বেরুতে পারবে কিন্তু প্রবেশ করতে পারে না। ভেড়ির তলদেশে কল বসাতে হয়। কল-বসান ব্যয় সাপেক্ষ। তাছাড়া যত খুশি কল বসানও বিপদ। কল বসালেই সেখানে ভেড়ি হয়ে পড়ে দুর্বল।

এই কল-বসান ব্যাপারে মালিক পক্ষের কারসাজি লেগেই আছে ভাটো দেশে।

মঠবাড়ির বাঁধ মালেকের দায়-দায়িত্ব। বছর বছর মাত্র মাথা চাপান দিয়ে দক্ষিণ ঘেরের বাঁধকে দেখ্‌নাই করে রেখেছে। বছরে মাত্র দু'কোদাল মাটি মাথায় ফেলে ভেড়িকে কি পোক্ত রাখা যায়! যায় না বলেই আজ কলিমের অমন চিন্তা। প্রতি ঘরে গিয়ে সে বলে,—দেখ্, আমি বলে দিচ্ছি, এবার প্লাবন আসবেই। লক্ষণ সব ভালো না!

আবাদের লোক বাউলে মানুষের কথা বা ভবিষ্যৎ বাণী অতো সহজে উড়িয়ে দিতে পারে না। তারাও চিন্তিত। সায় দিয়ে বলে,—বাউলে, যা হয় একটা পথ তো দেখতেই হয়।

বাউলে জনা দশেক মাতব্বর বেছে নিয়ে চলল কাছারি-বাড়ি। পেরভাস নায়েব দিন পনেরোর মধ্যে চলে যাবেন বললেও, আজ দেড় মাস হয়ে যায়, তবুও যাননি। না যাবার বোধহয় কারণ ছিল অনেক।

দাওয়ায় উঠে বসতে বসতে কলিম বলে,—কই গো, নায়েব মশায়, আমার আংটি ?

—আঃ, আংটির জন্য এত ব্যস্ত কেন ? এতো অবিশ্বাস কিসের ? তোমার ঐ পোড়া তামার আংটি নিয়ে নিশ্চয়ই আমি পালাব না !......অ, ঐ আংটির জন্য এতো লোক ?

হাসতে হাসতে কলিম বলে,—না গো না, আমাদের একটা নালিশ আছে, তাই।

নায়েব উৎকণ্ঠিত,—বলো, বলো, কি বলতে চাও !

কলিম নিধু শিকারির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে,—বলো না, চাচা।

—বেশ তো বলছিস, তুই বলে যা।

কলিম গলায় খাঁকার দিয়ে বলতে শুরু করে—বলছিলাম কি, আমাদের একটা নালিশ আছে। এ ঘের তো রাজবন্ধী, আমাদের প্রজাবন্ধী করে দিন না ?

নিজের আওতার বিষয় পেলে লোকের যে আত্ম-প্রত্যয় আসে, নায়েবমশায়ের সেই আত্মপ্রত্যয় এসে গেছে। নড়ে বসে বললেন,—কেন, আবার প্রজাবন্ধী কেন ?

—এই, নিজেরা এবার গতরে খেটে বাঁধটা ভাল করে বেঁধে ফেলতে চাই।

—তা ভালই তো ! নিজের জিনিস নিজেরা তদারক করবে, তাতে বাধাটা কি ?

—আমরা বলছি কি, এ বাবদ কাছারির তো কিছু না কিছু খরচ হতো……

—বেশ তো, সে যা খরচ হতো, তা না হয় তোমাদের দিয়ে দেবো। ভালই হলো তো, আমাদের আর দোষী করার কিছু থাকবে না !

নিধু শিকারি কথার পিঠেই বলে,—না, না, নায়েবমশায়, আমরা দোষীর কথা-টথা তুলছি না !

কলিম বলে যায়,—বলছি কি, ভাল করে মেরামতির কাজে তো একটু আধটু বেশি খরচ-খরচা পড়ে যাবেই। তাই এবার থেকে না হয় প্রজাবন্ধী করে দিন, এই আমাদের আর্জি।

নায়েবমশায় আর বেশিদূর গড়াতে দিতে চান না,—ঐ তো হলো, প্রজারা মিলে বন্ধী করলে, প্রজাবন্ধী হয়ে গেল। বেশি খরচের কথা বলছ তো ? তা তোমাদের সকলের জন্যই, তোমাদের সকলের স্বার্থেই তো এই কাছারি ! কাছারির একটু খরচ-টরচ্ আছে তো ! না কি নেই !

আনন্দ গাজী ইতিমধ্যে এসে গেছে। ঝমাৎ করে বলে ফেলল,—তা তো আছেই নায়েবমশায়।

নায়েব বলে চলেন,—কাছারির জন্য তোমাদের তো কিছু বেগার খাটার দস্তুর আছে। তা না হয় সেই বেগারটা ভেড়ির পেছনেই খাটলে !

কলিম এবার ক্রুদ্ধ। বিশেষ করে আনন্দের ফোড়ন কাটতে আসাতে। সোজাসুজি জোর গলায় বলে,—অতো হিসেব-নিকেশ বুঝি না আমরা। ভেড়ির দায় আমরা নিলাম। প্রজাবন্ধী হিসেবে নিরীখ বেঁধে দিন . আশেপাশে তো অনেক প্রজাবন্ধী বিলি ব্যবস্থা আছে।

কলিমের কথা শেষ হতে না হতে সবাই প্রায় সমস্বরে বলল,—ঠিক্ আমাদেরও এই কথা।

ধাক্কা খেয়ে নায়েব পাটোয়ারী বুদ্ধি খাটান,—এই তো তোমরা পাকা লোক হয়ে, একটা কাঁচা কথা বলে ফেললে। নিরীখ তো দলিল-দস্তাবেজে পাকা লেখা হয়ে আছে। তার বদল করতে হলে তো আবার কোর্ট-কাছারি। জমিদারবাবুর মত না হলে আবার কোর্টেও যাওয়া যাবে না। সে কি আমার হাত ?……বেশ, কাছারির তো কিছু না কিছু খরচ হতোই, সেটা নয় দাখলে দেবার সময় একটু পুষিয়ে দেব……কিন্তু তাই বলে দাখলেতে টাকার অঙ্ক কমিয়ে দেখাতে পারব না। সেটি হবে না কিন্তু কিছুতেই।

সবাই চুপ। এতো চুপ যে লায়লার তবনের শব্দ শোনা গেল। লায়লা আজ সামনা-সামনি আসেনি। দল ভারি করে কলিম এসেছে টের পেয়েই আড়ালে নিঃসাড়ে কান পেতে ছিল।

কোর্টের কথা উঠতেই সবাই বিশেষ করে চুপ হয়ে গিয়েছিল। কলিমও। আর এগুনো সমীচীন না মনে করে কলিম উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—বেশ, সেই কথাই রইল, নায়েবমশায় ! তবে দেখেন যেন নায়েব-মশায়, খাল পার হয়ে শেষটা কুমিরকে কলা দেখাবেন না !

উনিশ

কাছারি থেকে ফিরতি পথে ওরা সবাই বলাবলি করে, নায়েব যে কুমিরকে কলা দেখাবেই, তা ওরা নিশ্চয় করে বলে দিতে পারে।

কলিমের মাথায় প্লাবনের ভয় : বলল,—তা হোক, আগে তো প্লাবন ঠেকিয়ে নিই, তারপর যা হয় হবে। তখন যা হয় বোঝাপড়া করা যাবে। নেবু বেশি চট্‌কাতে নেই রে, বেশি চট্‌কাতে নেই!

এরপর তোড়জোড় ও সলাপরামর্শ চলে। কলিম ওদের সবাইকে নিজের বাড়িতে ডেকে এনেছে। সবাই বাইরের দাওয়ায়। কলিম বাড়ির ভিতর ঢুকেছে, আগুনের মালসা আর তামাকের চোঙা আনতে।

ফুফু কলিমকে সামনে পেয়েই বলল,—কি রে কলিম, তুই কাছারি গিয়েছিলি?

—হ্যাঁ, এই তো আসছি সেখান থেকে।

—তোকে আগে-ভাগে বলে দিলে ভাল হতো। হ্যাঁরে, ওখানে লায়লাকে দেখলি?

—কাছারি আছে বলেই তো সাড় পেলাম যেন।

—তা একবার তাকে খবর দিবি? মোল্লা বাড়ির মমেনা বিবি বড় কষ্টে আছে, পোলা হবে তো।

—না গো, ওসব আমার দ্বারা হবে না। দরকার হয়, তারাই লোক পাঠায় যেন।

মালসা ও চোঙা এনে কলিম পরামর্শে যোগ দিয়ে বলল,—আমি বলি কি, তোমরা মঙ্গলবার কাজে লাগো। আজ রববার কাল সোমবার, বগার হাট আছে। এই হাটে হপ্তার মত সওদা সেরে নাও। এ হপ্তার মধ্যে আর কেউ যেন কোনও হাটে না যায়।

মঙ্গলবার কলিমের ভাল লাগে। এই মঙ্গলবারেই কলিম বাউলে মন্ত্র নিয়েছিল। অনেকেই যেন একটু কেমন কেমন করে। বাউলে বলে,—তা বুঝেছি, তোমাদের একটু বাড়তি আয়ের ব্যাপার তো। দু'মাস মাত্র। এই দু'মাস হাত-খরচে একটু টান রাখো। চৈতের আগেই নিশ্চিত শেষ করে দেব। দেখো না, কি হয়, তারপর যার যেখানে মন লয়।

সত্যই বাউলে উদ্যমের বন্যা আনতে চায় বর্ষার বন্যাকে রুদ্ধ করতে। ছোট ছোট ছেলেদের ডেকে এনে উৎসাহের জোয়ার আনে,—হে-ই, তোরা সব আসবি। খুব মজা হবে। সব্বাই একখানা লাঠি আর দা নিয়ে আসবি। খু—ব মজা।

ছেলেরা বলে,—কেন বাউলে, বাঘ তাড়াবে নাকি?

—হ্যাঁ গো, আসিস্, আসবি তো? নাস্তা খেয়েই চলে আসবি।

এদিকে এ-পাড়া সে-পাড়া ঘুরে কলিম তল্লাস্ নেয় কে কোথায় কত মানসিক করেছে। নানা কাজে, পাতো দেওয়া, পাতো তোলা, নতুন ডিঙি ভাসানো—এমনি সব কাজে এ দেশের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানৎ বা মানসিক করে। সওয়া পাঁচআনা বা পাঁচ-সিকা বা কিছু বেশি, যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী। নবান্নের পর এই মানৎ পূরণের পালা আসে। উপকরণ নতুন চাল ও নতুন গুড়। ছোট ছেলেরাই এই আমন্ত্রণের প্রথম ভাগীদার। কলিম আগে-ভাগে জানালো,—যার যা মানসিক আছে, এবার সব ভেড়ির কোলে দিতে হবে। সেইখানেই পোলাপানেরা থাকবে।

মঙ্গলবার নাস্তা শেষ হতে না হতে সকলে আসতে শুরু করেছে। পোলাপানেরাও হাজির লাঠি ও দা নিয়ে। কলিম লুঙ্গি গোটো করেছে। উৎসাহে এমন গোটো যে, পাছার আঠিও দেখা যায়। মাথায় গামছা। পেখম ঝুলিয়েছে। একখানা দা নিয়ে নেমে পড়ল

ভেড়ির কোলে। আবাদের পূব ভেড়ি। এখানেই উত্তর ও দক্ষিণ ঘেরের ক্রস্ ছিলা, বা কেরেচ্ ছিলা। যেন মিঠে মাটির দেশের আল্। আল্ ঠিক নয়, আলের থেকে অনেক চওড়া ও উঁচু। তবে ভেড়ির থেকে ছোট। কেরেচ্ ছিলা ক্ষেত পেরিয়ে সোজা পশ্চিম ভেড়িতে গিয়ে মিশেছে। কেরেচ ছিলাই ওদের সীমানা। তার উত্তরে ডাঙ্গো ভুঁই—কাছারি, আনন্দ ও তার ক'জন আত্মীয়-ব্রাদারের ক্ষেত ও খামার। ছিলার দক্ষিণে নাবো, ও তার সবটাই প্রজাবিলি। দু'মাসে এই ছিলার দক্ষিণের গোলাকৃতি গোটা ভেড়ি মেরামত করার দায়িত্ব ওদের ঘাড়ে।

ভেড়ির ওপর ও গায়ে আগাছার দাপটে গাঁথুনি আলগা হয়ে যায়। দেদার আগাছা হয়েছে। এই আগাছা কাটার ভার দিল কলিম ছেলেদের ওপর। ওদের এক হাতে দা থাকবে, অন্য হাতে লাঠি। ভেড়ির শুক্‌নো মাটির গর্তে ও আগাছার আড়ালে বিষধর সাপের সব আড্ডা। কলিম ভাল করে দেখিয়ে শিখিয়ে দেয়,—আগে ঝোপের মধ্যে ঝমাঝম্ কিছু ঢিল মারবি, তারপর লাঠির দমাদম বাড়ি, তারপর যেন কাটতে শুরু করবি। খঁবরদার, হাত দিয়ে গাছ-গাছাড়ি সরাতে যাবি না। লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে ফেলে দিবি। খবরদার সাপের কথা ভুলিস্ না!

ঝমাঝম্ কাজ এগিয়ে যায়। প্রথম দিনের কাজের দৌড় দেখে সবাই যেন বুকে বল পায়—না, দু'মাসের আগেই ওরা পৌঁছে যাবে পশ্চিম ভেড়িতে।

লায়লা এদিকে সব খবরাখবর পেয়ে গেছে। কাছারির পেয়াদারা ঘুরে ফিরে সব খবর নিয়ে কত ব্যঙ্গই না করছে! নায়েব অবশ্য ব্যঙ্গ করেন না, বলেন,—তা মুফৎ যদি বাঁধটা হয়ে যায়, মন্দ কি?

লায়লা প্রথমদিন যেন কোনমতে দম আটকে ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ছট্‌ফট্ করতে থাকে। তারও জমি যে দক্ষিণ ঘেরে। কই, ওরা তো আমার জমির দরুন লোক চায় না!

বিকেলের দিকে কাছারিতে লোকজন কমই আসে। নায়েব সবে দিবানিদ্রা থেকে উঠে তামাকের অপেক্ষায় ব্যগ্র। সুর যতটা সম্ভব মিষ্টি করে ডাকলেন,—লায়লা!

লায়লা আজ সকাল সকাল যাবে; বিকেলের কাজগুলি একমনে সেরে নিচ্ছিল। শুধু অন্যমনা বলে নয়, এমন মিষ্টি ডাকে সাড়া দিতে বোধহয় লায়লার আগ্রহ ছিল না আজ। নন্দা দাওয়ায় মাদুরে গড়াচ্ছিল; যেন ততোধিক কর্কশ করে বলল,—কই মাসি, শুনতে পাও না? কালা হলে কবে থেকে! নায়েবমশায় ডাকছেন, শুনতে পাও না?

লায়লা এসে দাঁড়ালে নায়েব বললেন,—বসো, খুব ভাবনায় পড়েছ বুঝি!......তোমার আবার ভাবনা কিসের?

—দাঁড়ান, নায়েবমশায়, কলকে নিয়ে আসি।

কলকে নিয়ে এলে নায়েব আগের কথার জের টানেন,—বলছিলাম কি, তোমার ভাবনা কিসের? বাঁধ যদি ওরা করেই ফেলে, তোমারই লাভ। ওদের ধান হলেও, তোমারও ধান হবে।

—শুধু বাঁধ নয় তো, চাষবাসের ব্যাপার আছে তো!

ও! তাই বুঝি। ওরা তোমার লপ্ত চাষ করবে না বুঝি। বেশ, উত্তর-ঘেরিতে তোমার জমি পাল্টা-পাল্টি করে দেব। হলো তো! আরে, তোমার অতো ভাবনা কিসের! আর কিছু না হোক, কাছারিতে তো আছ। কাছারি তোমাকে কি সম্-বছরের আয় পুযিয়ে দেবে না!

—চাষবাস করবে না কেন? তবে তার দায়-দায়িক!

না বোঝার ভান করে নায়েব বলেন,—বেশ, বেশ, আমি তো রইলাম। তোমার ভাবনার

কিচ্ছু নেই। চাষবাসের মুখে ফিরে আসবই তো!

এমন সময় আনন্দ কাছারি হাজির।

সময় নয়, অসময় বলতে হবে। তার মনও চঞ্চল। বাড়িতেই ছিল। পুব ভেড়ির হট্টগোলের শব্দ কানে আসতেই আর থাকতে পারে না, সটান চলে এসেছে। দাওয়ায় এসে খাঁকার দিল।

নায়েবের অতিরিক্ত ব্যগ্রতা,—এসো! এসো, আনন্দ। বলছিলাম কি······লায়লাকে বুঝ দিচ্ছিলাম। আমি তো ফিরে আসছিই।

—আপনি এলে তো হলই ; আর না এলেই বা ভাবনা কি ? আমি তো আছি। কি গো লায়লা ? ভরসা বুঝি পাও না ?

মুখ তুলে আনন্দ দেখে, লায়লা ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় জেরাবদি শুতে আসতেই লায়লা যেন রেগে উঠলো,—তুই যাস্‌নি ভেড়িতে কাজ করতে ?

—কেন, আমাদের ঘর থেকে জনের হিসেবে তিনজন গেছে—বা'জান, চাচা,······

—রাখ তোর চাচা, তুই যেতে পারলি না ?

—তুমি ভাবি যেতে বলো তো কালই যাব।

—হ্যাঁ, কালই যাবি।

—যাব·········কি মজা······কাল যাব!

লায়লার সুর পাল্টে গেছে। বলে,—মজা, কিসের মজা রে ? বল্‌ তো, কার কাছে গিয়ে বলবি ?

—কেন, বাউলের কাছে গিয়ে বলব।

লায়লা চুপ। কি যেন তার মনের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে। সামলাতে সময় কেটে যায়। ঢোক গিলে হাতের কাজে মন দেয়। তারপর এটা-সেটা কথা পাড়ে—কতদূর ভেড়ির কাজ এগিয়েছে, কত লোক আজ হয়েছিল, কখন আসে কখন যায়, ওর বাড়ির ধারে আসতে ক'দিন লাগবে—এমনি অনেক প্রশ্ন।

এবার শুয়ে পড়বে। জেরাবদি বিছানা নিয়েছে। ঘর থেকেই লায়লা প্রশ্ন করে—জেরাবদি, তুই যাবি তো বললি। গিয়ে কি বলবি ?

—কেন, বলব আমি ঠাগ্‌রোণের লপ্ত বাবদ জন্‌ দিতে এসেছি।

—না, না, ওসব আদিখ্যেতা করবি না। বলবি, লায়লা ভাবি পাঠিয়েছে,······বুঝলি ?

—বেশ, তাই বলবো।

পরদিন ওরা কাজে লেগে গেছে। কলিম আজ চরে। কোদালি। এক কোপ বাঁয়ে, এক কোপ ডাইনে, তৃতীয় কোপ সামনে দিয়ে কোদালের টানে বিরাট এক এক চাপ্‌ তুলছে। সেই টানের ঝুলেই কোদাল থেকে চাঙ্‌ গিয়ে পড়ে আরেকজনের হাতে, তারপর আরেকজন, তারপর আরেকজন। এমনি করে হাতে হাতে চাঙ্‌ ভেড়ির মাথা অবধি উঠে যায়।

বাউলের মাথায় পেখমের ওপর কাদা ছিট্‌কে পড়ে কেমন যেন বাঘের মত চেহারা হয়েছে। জেরাবদি গিয়ে সামনে দাঁড়ালে, পেখমের পাশ দিয়ে বড় বড় চোখে তাকাল। জেরাবদি দাঁড়িয়েই আছে। কলিমের অবসর নেই কথা বলার। তার হাত থেমে গেলে যে

লাইনের পাঁচজনে বেকার হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে ! একসাথে কাজ করলে কাজ হবে না, না হলে হবে না—ভাটোদেশের কাজের ধারাই এই।

এবার কোদালের কোপের ফাঁকে ফাঁকে কলিম কথা পাড়লো—কিরে তুই আবার……কোন ঘরের……লোক হয়ে এলি ?

—লায়লা ভাবির।

—ওঃ……সে তো এখন……কাছারির গিন্নি !

জেরাবদি চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

—বল্ গিয়ে……তাকে এখন……কাছারি ঠেকাতে।……এখানে কেন ?……

সামনেই সর্বানুবিবির মিন্‌সে এলাহি বক্স মাটির চাঙ্ ধরছিল। একটা চাঙ্ লুফে নিয়েই বলে,—তা বাউলে, কেন ঠেস্ দিচ্ছ ? কাজ বলে দাও ! কাজ করুকগে।

মাটির দিকে তাকিয়ে থেকেই বাউলে বলে,—যা, যা,…… পোলাদের সঙ্গে ……কাজে লেগে যা……দেখিস্, সাবধানে…সাপকোপ আছে।

পলিমাটির চরের উপর দিয়ে ভক্ ভক্ শব্দে জেরাবদি দৌড়ে গেল পোলাদের দলে। চলে যেতেই বাউলে তেমনি কোপের ফাঁকে ফাঁকে বলে,—এলাহি,……বললে বটে……এটা কি ভাল হলো ! ও ঠিক……ভেড়ির খবর……পৌঁছে দেবে কাছারি।

এলাহি বলে, কেন, ও কি রোজ কাছারি যায় ?

—তা নাই বা গেল……ঐ যে বললাম……কাছারির গিন্নী……কাছারি যার পরাণ হয়েছে !

—কি আর বলবে ! আমাদের কি ঢাক্-ঢাক্ কিছু আছে ! খোলা মনে খোলা কাজ করব, তাতে কে কি শুনল বয়ে গেল !

—চুপ দাও। কাজে মন দাও। যা হবার, তা হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার আগেই লায়লা ঘরে এসেছে। জেরাবদিও হাজির, এসেই এটা-ওটা কাজে মন দিল। লায়লা ভেবেছিল, জেরাবদি এসে কতোশতো খবর সব বলবে। জেরাবদির কাণ্ড দেখে লায়লাও ভেড়ির কথা পাড়তে যেন সঙ্কুচিত। কিন্তু কতক্ষণ আর থাকতে পারে। অবশেষে বলেই বসে,—কিরে ভেড়ির খবর কিছুই তো দিলি না ?

—কি খবর দেব ! খুব ভাল খবর, এ ক'দিনেই ওরা রশি দুই এগিয়ে গেছে। আমরা কিন্তু চার রশি।

—ওরা-আমরা কিরে ?

—ও-মা, তাও জনো না বুঝি ?

—জানতে চাই না ! যা !

—ওরা মানে ওরা, আর আমরা মানে আমরা—বলেই নিজের বুকে কয়েকবার থাবড়া মারল।

লায়লা মুখ ফুলিয়ে বলে—যা, যা তুই, জানতে চাই না ! বলতে হবে না !

—শোনো তবে, আগাছা কাটা আর মাটি কাটা। ……সে কি মজা !

—যা ভাগ্, শুনতে চাই না। আগাছা-মাটি শোনাচ্ছেন !

—শোনো তবে, গোড়া পেড়ে বলি। পেবথমেই গিয়ে দাঁড়ালে তো মুখ তোলার ফুরসৎই নেই। বলে কি না—কোন্ ঘর ?

—কার কাছে গেলি ?

—বা-রে ! তুমিই তো বলে দিলে, বাউলের কাছে যেতে !

—তা বল্, কি বললো ? আর তুই কি বল্লি ?

—বাঃ আমি বুঝি বললাম না, লায়লা ভাবির ঘর থেকে জন্ এসেছি !

—তারপর ?

—তারপর আর কি ! বলে কিনা……

—কি চুপ করে রইলি যে, বল্ ।

—বলে কিনা, সে তো কাছারি-গিন্নী ! এখন গিয়ে, কাছারি ঠেকাতে বল্ গিয়ে ।……তা কি জানো, এলাহি চাচা ছিল, তাই রক্ষে ! এলাহি চাচা বললো, করুগগে না কাজ । তাইতে তো বাউলে……

—যা আর বলতে হবে না, বুঝেছি । —বলেই লায়লা ঘর-দোরের কাজে লেগে গেল ।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে লায়লা বিড়বিড় করে,—কাছারি-গিন্নী ! কাছারি-গিন্নী !

শোবার সময়ও সেই কথা,—কাছারি-গিন্নী, বেশ ! কাছারি-গিন্নী হবো না তো কি হবো ! যার নুন খেয়েছি, তার গুণ গাইব না তো কি করব !

কথাগুলি খুবই স্পষ্ট । জেরাবদি এর মাঝে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই সাহসভরে বোধ হয় অমন জোরে জোরে কথাগুলি বলতে পারে লায়লা ।

কুড়ি

ভেড়ির কাজ যে-ভাবে চলেছে, মনে হয়েছিল, দু'মাসের আগেই পুরো কাজটাই উঠে আসবে । বাদ সাধলো দক্ষিণ ভেড়ির কলটা । কলের গোড়ায় যেতেই দেখে, নোনা খেয়ে বন্ধ হবার জো । পাল্টাতে হবে কল । বড় রকম খরচের ধাক্কা । গায়ে-গতরে খেটে দিতে এরা বিশেষ কার্পণ্য করে না, কিন্তু নগদা পয়সা এদের পক্ষে যোগাড় করা দায় । দায় বলেই তো কাছারি অমন করে এদের অতো সহজে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে ।

এদের সব উৎসাহ ও জেদে ভাটো পড়বার উপক্রম । বাউলে বলে,—তোরা দেখি মেয়ে মান্‌ষের চাইতে অল্পে হাসিস্, অল্পে কাঁদিস ! চল্ আমার সঙ্গে বাদায়, যাবি ? সেবার দেখে এসেছি এক বানের খোড়ল । ছোট, কিন্তু কাজ চলার মত । যাবি ?

বাউলে কাজ কামাই দিতে চায় না । কাজ চালিয়ে যাবার মত ক'জন রেখে, বাকি জনা দশেক সঙ্গে নিয়ে চলল বাদায়, বান গাছের গুড়ি আনতে । কোন কোন বান গাছে খোড়ল দেখা যায় । গাছ ঠিক দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু গুড়ির মধ্যের অংশ ফাঁপা । গোটা গুড়ি কেটে আনলে ঠিক যেন মস্ত বড় এক কাঠের পাইপের কাজ করে । দু'মুখো খিলবসিয়ে তক্তা দিলেই ভেড়ির কল ।

এ-কাজে বিশেষ তোড়জোড় বা উপকরণের আবশ্যক নেই । মাত্র কিছু লম্বা মোটা বাঁশ, কাছি ও লোকজন কিছু বেশি । বানের ফাঁপা গুড়িও বেশ ভারি, এমন ভারি যে, ধীরে ধীরে পাটাতনে তুলতে না পারলে ডিঙ্গি তলিয়ে দেবে ।

সন্ধান তো বাউলের জানাই আছে । হৈ-হৈ করতে করতে সবাই বাদায় ঠিকমত এলাকায় হাজির । বাউলে আগেই লক্ষণ বেলক্ষণ দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত, ধারেকাছে 'বড় মেঞা' নেই । তবে দৈব ঘটনার কথা তো বলা যায় না ! সাবধানের মার নেই । মন্ত্র-টন্ত্র যা পড়বার পড়ে নিল । মাথায় সেই ফেটা বাঁধাই আছে । আগে আগে চলেছে বাউলে । পেছনে সবাই জড়ো হয়ে জোরে জোরে কথা বলতে বলতে আসছে । সবার হাতে কিছু না কিছু আছে—লাঠি-সোটা, বাঁশ, কাছি, কুড়ুল, না হয় দা । বাউলের শুধু হাত । নড়িখানা তো

নায়েব ওকে ভুলিয়ে নিয়েছে। কি আর হবে! পথে একখানা ডাল ভেঙে নিল।

যথাস্থানে পৌঁছে গেছে সবাই। দলে নিধু শিকারিও ছিল, এলাহি বক্সও ছিল। খোড়ল দেখে সবাই মতামত দেয়। নিধু চাচা বলে—হবে, চল্, এতেই হবে।

বান গাছের পশ্চিমে কিছুটা ফাঁকা চত্বর। ঠিক চত্বর নয়। একটা সরু খাল এসে বনের তলে মিশে গেছে। খানিকটা নাবো জমি। ওরা এখন এসেছে ভাটিতে। চত্বরে এখন জল নেই বললেই হয়। তবে পলিমাটির জলাকাদা উঁচু-নিচু হয়ে আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। জোয়ারে নিশ্চয় জল আসবে, মাছও আসবে প্রচুর।

দলের ওদিকে বিশেষ নজর নেই। তবে সবাই বান গাছের তলায় ছড়িয়ে জটলা পাকায়। বাউলে আনমনা। বান গাছের দিকে তাকিয়েই আছে। এই বান-খোড়ল কেটে ভেড়ির নিচে বসাতে পারলে তবেই তো প্রজাবন্ধী হলো! কাছারির সাবেকী শাল কাঠের কল না তুললে তো মালেকবন্ধীর শিকড় তোলা হবে না। কিছুতেই হবে না!......চিন্তা থামিয়ে বাউলে তাড়া লাগালো,—লাগ্, তোরা কাজে লাগ্।

গাছ কাটতে গিয়েই কলিম যেন বাঘের বাউলে বনে গেছে। সবাইকে তুই-তুকারি,—লাগ্ কাজে লাগ্।—এখন যেন কেউই চাচা নয়, কেউই মামু নয়।

যারা কলিমের সঙ্গে বনে আসতে অভ্যস্ত নয়, তারা কেউ কেউ থতমত খেয়ে ছুটে এসে বানের গোড়ায় কোপ বসালো।

কোপ বসাবে কি! পশ্চিমের দিকে যে ক'জন ছিল তারা তো 'বাপরে—বাপরে' বলে ভীত আর্তকণ্ঠে বাউলের আশ্রয়ে ছুটে এলো। হাতের কাছে যারা, তাদের এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে বাউলে এগিয়ে খুঁটি নিয়ে দাঁড়ায়। মুহূর্তের তীক্ষ্ণ নজর। তারপরই......একখানা দীর্ঘ বাঁশ দু'হাতে খোঁচা মারার মত করে তুলে ধরে ক্ষিপ্র বেগে এগিয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল, আয়! শীগ্গীর আয় তোরা!

তখন বোধহয় আর কিছুই নজরে নেই। সামনে বত্রিশ পাটি দাঁতের এক বিরাট মুখব্যাদান। হাঁ করে তেড়ে এসেছে। যেন সব কটি লোককে একত্রে কামড়ে ধরবে! কুমির, সুন্দরবনের মানুষখেকো নোনাপানির কুমির।

দুই চোয়ালের ফাঁকে দেখা যায় টক্‌টকে বীভৎস লাল গহ্বর। সবল বাহুতে দেহের ওজনে বাউলে তার হাতের বাঁশের গোড়া ঘপ্ করে বসিয়ে দিল সেই গহ্বরে। বেগবতী কুম্ভীর নিমেষের জন্য ঘঘ্ করে উঠল। গতিও শ্লথ হলো! কিন্তু পরমুহূর্তে বাঁশ ও বাউলকে ঠেলে নিয়ে চলল দ্বিগুণ বেগে।

বাউলে চীৎকার করে ওঠে—ধর্ ধর্ শীগ্গীর ধর্।

বাঁশের এ মাথায় চার পাঁচ জনে জাপটে ধরে খুঁটি নিল। গলার গহ্বরে প্রাণপণে চেপে দিতে লাগে বাঁশের গোড়া। কুমির আর এগুতে পারে না বটে, কিন্তু চার পায়ের আকড়ানি আর করাতের মত লেজের ভীতিপ্রদ আছড়ানিতে বনের কাদা ও আগাছা ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়তে লাগে এদিক-ওদিক।

—পেটা সবাই, মার! মার কুড়ুলের কোপ মার। ওখানে না,...ওখানে না,...নাকে মুখে মার! মার!

প্রায় অর্ধ-ঘণ্টা কেটে যায় হিংস্র জল-জীবের আস্ফালনকে স্তব্ধ করতে। মরেছে কিনা দেখবার জন্য সবই মিলে চিৎ করে দিল। সাদা ধবধবে বুক রক্তাক্ত হয়ে গেছে। চার হাত পা ঊর্ধ্বমুখে ক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে যেন নোনাপানির হিংস্র প্রতীক।

এক শুয়োরের গোঁ-র সঙ্গে কুমিরের একগুয়েমির তুলনা চলে বোধ হয়। কুমির পিছু

হটতে বা চলতে জানে না। যতই ওকে চেপে ধরো না—ও সামনে এগুতে চাইবে, পাশ কাটাতে বা পিছু হটতে জানে না। জল-জীব মাত্রই পেছন সাঁতার জানে না। পিছুতে হলে মুখ ঘুরিয়ে তবে চলতে হবে। জলে হয়ত মুখ ঘুরান দ্রুত সম্ভব। কিন্তু জলজীব ডাঙায় এসে মুশকিলে পড়ে। তারই সুযোগে আবাদের মানুষ অমন সহসা এই হিংস্র জীবকে ঘায়েল করতে পারে।

প্রতীক সামনে রেখেই বানের খোড়ল সবাই মিলে কেটে ও ছাঁটাই করে ছ'ঘণ্টার মধ্যে ডিঙিতে তুলল। তুলল বটে কিন্তু ডিঙি ডুবু-ডুবু। মাথাভারি হয়ে টলমল করছে।

এবার খানিকটা কথা কাটাকাটি, কুমিরটাকে সঙ্গে নেবে কিনা। কলিমের ইচ্ছা, ওটা না নিলে মজা হবে কেন। অন্য অনেকে আপত্তি করে,—কেন ঐ আপদ নিয়ে আবার বিপদ বাধাস্। চামড়ার কথা তো, তা অতো লোভ ভাল না!

ডিঙিতে তুলতে কেউই রাজি হয় না। অবশেষে কলিমের বুদ্ধিমত কাছি বেঁধে জলে ভাসিয়ে আনে। ভাসিয়ে ঠিক নয়, আপনভারে মরা কুমির তলিয়েই থাকে।

খাল ছেড়ে এইবার কয়রার বড় গাঙে পড়বে। ভাটির স্রোতও খরতর। ত্রিমোহনার ঘোলাও এখানে ওখানে। সবাই সতর্ক ও সামাল দিতে ব্যস্ত। এমন সময় কাছিতে টান ধরল। কাছির চাপে ও ঘর্ষণে ডিঙির "বা'লে" কর্‌কর্ করে উঠেছে। ধীরে ধীরে ডিঙি কাৎ হতে থাকে। ডিঙি ডুবিয়ে দেয়-দেয়!

নিধু শিকারি কোত্থেকে পাগলের মত সবাইকে ডিঙিয়ে লাফিয়ে এসে এক কোপে কাছিটা কেটে দিল। এমন জোরে যে লোহার ফলক বসে গেল এক ইঞ্চি ডিঙির গুরোতে। ডিঙি টাল খেয়ে ভীষণ দুলে ওঠে। পরমুহূর্তে ছমাৎ করে জলে এক বাড়ি দিয়ে তীরবেগে বড় গাঙের স্রোতের টানে ডিঙি ছুটে চলল।

তর্ক, মিছেই তর্ক! কেউ বলে ভাঙনের মুখে কোন গাছের গুড়িতে আটকে অমন হয়েছে; কেউ বলে, জলের জীব জল পেয়ে বেঁচে উঠেছে!

বাউলে ও-সব নিয়ে মাথা ঘামায় না। বলে,—অতো রোখ্ কেন করছিল কুমিরটা. জানিস্! আমার মন বলছে, ও ঠিক ঐখানে মাছ খেতে আসে আর ওখানেই কোথাও ও ডিম পেড়েছিল। তাই অতো তেড়ে এসেছে নিশ্চয়। মেয়ে-মানুষ তো, বুঝলি!

—ডিম ছিল? তা, বাউলে, তুমি এ-কথা আগে বলোনি কেন?

—হ্যাঁ, তাই বলি আর তোমরা আর এক বিপদ বাধাও।

সত্যিই কলিম কিছুতেই অন্য কাউকে অন্য কোনও বিপদে পড়তে দিতে চায় না। প্রজাবন্ধী আগে তাকে শেষ করতে হবে। কাছি বেঁধে জলে ফেলে বোকার মত কেন কুমিরকে আনতে গিয়েছিল, তারজন্য আপশোষের ওর অন্ত নেই। আর কখনও সে অমন করবে না। বিপদ কেটে গেছে, এই ভাগ্যি!

কলপাতাও হলো, পশ্চিমের ভেড়িও শেষ হয়ে এলো। কালই বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আনন্দ তো একদিনও এদিক পানে এলো না। ওর মতলব কি! আনন্দের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কলিমের মনে হয়, আচ্ছা কেরেচ্ ছিলেটা পোক্ত ও উঁচু করে দিলে কি হয়!……ঠিকই হয়। ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। উত্তরের ঘেরি যদি পানিতে ভেসেও যায়, ছিলে উঁচু থাকলে আমাদের কোন ভয় নেই। ওদের যা কিছু ষড়যন্ত্র ঐ মাটির দেয়ালের আড়ালে হোক। না, এপারে ওদের জেদাজেদির নোনাপানি আসতে দেওয়া নেই।

কাজের এক নেশা আছে, বিশেষত সমবেত কাজের। সেই কাজ এখন শেষ হয়ে এসেছে। কাজেই উদ্দামতার অন্ত নেই দক্ষিণ-ঘেরের মানুষের। একবার ঝোঁক চাপিয়ে দিতে পারলেই হয়; আর কলিমের পক্ষে তা এমন কিছু শক্ত নয়।

সবাইকে বলল,—দেখো, লক্ষ্মীন্দরের কথা মনে আছে তো? লোহার বাসর ঘরে এই এতটুকু সুতোর মত ছেঁদা ছিল, সেই পথেই বিষ ঢোকে। আর তোমরা এতবড় ফাঁক রেখে যাবে! ছিলেয় হাত দেবে না!

কথাটা মনে লেগেছে সবার। তবুও সবাই বলে,—তা বাউলে, ও পথে বিষ আসবে কেন?

—আচ্ছা, তোমাদের এই 'কেন'র উত্তর দিই কি পালি? যে অবুঝ, তাকে কি বোঝানো যায়? আচ্ছা, হিন্দু ভাই যারা আছো, তারাই বলো! মন্দির দেখেছ? তা দেখবে কেন? আমাদি তো যাও না,—গেলে, দেখে এসো। মন্দিরের উত্তরে ঠাসা দেওয়াল। বুঝলে, উত্তরে বড় বিষ! দেওয়াল দেওয়াই ভাল।

এলাহির ছেলেটা বড় ফক্কড়। বলে,—তা মসজিদের পশ্চিম দেয়ালটার ব্যাখ্যান্ দাও।

—যাঃ, বড় বেয়াদব হয়ে গেছিস্। দেখছিস্ না! পশ্চিমের ভেড়ি দেওয়া হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে কেরেচ্ ছিলা যেন পলিমাটির টোপর পরলো। বেশি না, মাত্র দু' কোদাল করে চাঙ্ ছিলার মাথায় চেপে দিল! ছিলেকে বেশি উঁচু করার দরকারও নেই।

বেশি না হলে কি হবে! ঘেরের সীমানা-ভেড়ি গাছ-আগাছার আড়ালে ও ছায়ায়। দূর থেকে তার মেরামতি নজরে কম আসে। কিন্তু কেরেচ্ ছিলা পূব-পশ্চিম সোজা গেছে খাঁ খাঁ মাঠের ভেতর দিয়ে। রোদ উঠলে এখন চক্‌চক্ করে ওঠে তার পলিমাটির মাথা। উত্তর প্রান্তের কাছারি বাড়ি থেকে এবং আনন্দের দাওয়া থেকেও দেখা যায় এই কাঁচা মাটির ঝক্‌ঝকে রূপ। লায়লার আঙিনা এই ছিলার বেষ্টনের আশ্রয়ে পড়েছে। লাঠিয়ালের মন বুঝি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এই পলিমাটি আবৃত প্রাচীর বন্ধনে প্রতিফলিত উগ্র আলোকে।

একুশ

মনে উগ্রতা দেখা দিলে কি হবে! আনন্দ লাঠিয়ালের বংশ। অন্য ব্যাপারে যাই হোক, মেয়েদের ব্যাপারে এরা বড় সংযত। হঠাৎ কিছু করে না। তাই বলে নারীর প্রতি এদের মোহ ও আকর্ষণের তীব্রতা নেই, তা নয়। পেলে, উৎফুল্ল হয়ে টেনে নেয় তাদের। কিন্তু লাঠির আঘাতে তাদের বশীভূত করতে চায় না। হাতের লাঠির শক্তিতে মন্ত্রমুগ্ধ করে পেতে চায় নারীদের। এ ধারা এদের বংশগত। এক সময়ে রাজা প্রতাপাদিত্য যে এদের জড়ো করে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুর হাত থেকে দক্ষিণ বাঙলার নারীকুলের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন! সে রক্ত এখনও এদের ধমনীতে বাহিত। তাই আনন্দের মনের উগ্রতা মনেই চাপা থাকে এখনকার মত।

নায়েব গেছেন আজ অনেকদিন। সেই যে জেরাবদি যেদিন প্রথম ভেড়িতে কাজে লাগে, তার দু'দিন পর নায়েব মিত্তির জমিদারের চিঠি পান। কলকাতা থেকে চিঠি আসে। জরুরি চিঠি। আগের দিন বগার হাটে পিয়নে চিঠি দিয়ে যায়। বারো দিন আগের লেখা। জরুরী নির্দেশ ছিল, যে-দিন যে-মুহূর্তে চিঠি হাতে পাবে, তার পরের জোয়ারে রওনা হয়ে আসবে অতি অবশ্য। জমিদারের বড়ই হাত-টান। নায়েব প্রভাস বড় দেরি করছে। এমন করলে ওকে নায়েবের কাজে রাখবেন না—এমনি সুর চিঠিতে। ধান-টান সব বিক্রী হয়ে

গেছে। অনেক টাকা। যক্ষের ধন। নোনামাটির লুণ্ঠিত টাকা নোনা-মাটিতে পুঁতে রেখে এতদিন আগল দিচ্ছিল লাঠিয়াল আনন্দ রাতে ও দিনে। আনন্দের দাপটি এমনি এমনি নয়। এত টাকা নিয়ে রাতের জোয়ারে যাত্রা করা সমীচীন নয় বলে, পরদিন সকালের জোয়ারে যাত্রা করলেন নায়েব দলবল নিয়ে, যক্ষের ধনের রক্ষী নিয়ে।

দিনে দিনে পৌঁছবেন বড়দলে। এক জো'র পথ বড়দল। বড়দলে মিত্তির জমিদারদের এক মদের দোকান আছে। কাজেই আশ্রয় পেতে অসুবিধা নেই। তারপর সেখান থেকে ধীরে সুস্থে জো-ভাটি বুঝে আসবেন হাসনাবাদে। বেশ কিছু পথ ভাটি লাগে, বাকি পুরো জো। আশাশুনির পথে গুঁতোখালি ধরে হিঙ্গলগঞ্জ হয়ে কালিন্দী ও ইচ্ছামতীর জো'র টানে পড়তে হবে। এমন জো' ধরতে হবে যাতে হাসনাবাদের শেষ ছোট-গাড়ি ধরাও যায়।

এই জটিল পথ-বেপথের চিন্তাই নায়েবের মাথায়। তাই তড়িঘড়ি করে যাবার সময় অন্য চিন্তা মাথায় বিশেষ থাকে না। শুধু বলে গেলেন,—লায়লা, তুমি কাছারি আগল দিও। অম্বুবাচির সময় আবার নিশ্চয় আসব, তখন পুরো কাজে লেগো।......কোন কিছু লাগে তো, আনন্দই রইল।

মুক্তির আস্বাদ নিয়ে সেই যে সে-দিন লায়লা ঘরে ফিরেছিল, আর কাছারি-মুখো হয়নি। ভাবে, নায়েব আসুক তারপর যা হয় হবে।

এ-দিকে ভেড়ি বাঁধা ধকলের পর সবাই গা এলিয়ে দেয়। ক'দিন আর! এখন থেকেই বাড়তি আয়ের পথ না দেখলে চাষের সময় না খেয়ে মরতে হবে, না হয় ঋণের জালে জড়িয়ে মরতে হবে। যে যার বেরিয়ে পড়বার তালে।

কলিম বুদ্ধি খটিয়ে তড়িতে ভেড়ির কাজে হাত দিয়ে, তড়িতে শেষ করেছে। চোত্-বোশেখের খরা ও পানি খাইয়ে না নিলে ভেড়ি পোক্ত হয় না যে।

কিন্তু এদিকে যে কলিমের সময় কাটে না এখন। একদিন তো আনমনে লায়লার আঙিনার পথে এসে পড়ে। দূর থেকে লায়লার ঘরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। পূব ভেড়ি থেকে বাঁদিকে লায়লার আঙিনা যাবার পথ বেরিয়েছে। কাছে এসে কলিম আর ও-দিকে তাকায় না। ডান দিকে তাকিয়ে আছে। নদীতে পুরো জোয়ার। কয়েকটি লাল লাল কাঁকড়া ভেড়ির ধারে যেন খেলায় মত্ত। কলিম নেমে পড়ে ভেড়ির নিচে। ছোট ছোট ঢিল মেরে তাড়াতে চায় চকের শত্রুকে, একটাকে ধরেও ফেলে। এমন সময় মার্জানি ভেড়ি পথে এসে হাজির,—বাউলে, তুমি এখানে? নিচে কেন?

—বিষ! বিষ! দেখ্‌ছ না?

—কি গো? সাপ নাকি?

—না! না! সাপ হতো তো ভালই ছিল।

—কেন?

—সাপ যে সামনে ছোবল মারে। এ শালা যে আড়ালে আবডালে মারে, না খাইয়ে মারে। এ যে পেটের জ্বালার বিষ।

বলতে বলতে কলিম লায়লার আঙিনার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে থাকে। তখন তার হাতে একটা ঠোঁট-ভাঙা কাঁক্‌ড়া ঝুলছে। কাঁকড়া এমনিতে নিরীহ হলে কি হবে! কুরিয়ে কুরিয়ে ভেড়ির নিচে নোনা পানির ঘোঘা পথ করে দেয়। সেই পথে নোনা বিষ আনে চকে অজস্রা।

কলিম বলে,—তা পাড়ে! তুমি যে এখানে ভোর গোনে?

—তা তুমি কেন?

—ঐ তো বললাম !

—চলো, ফকির, লায়লার ঘর একবার ঘুরে আসি। জেরাবদির খোঁজে এসেছিলাম। পোলাটা এমন হয়েছে ! এইখানেই রাতদিন পড়ে থাকে।

কলিম তড়িতে বলে,—চলো আমার দাওয়ায়। ওখানে গিয়ে কি হবে ! ওখানে তো চাষার প্রাণ তামুকের পাট মিলবে না ! চলো।—বলেই মার্জানকে টেনে নিয়ে চললো নিজের দাওয়ায়।

এসে দেখে, পোলাপানের একদল। ওদের দেখেই বাউলে বলে—পাড়ে, তুমি তামুক ধরাও। আয় তোরা, এক হাত হয়ে যাক। কিছুতেই বন্দী করতে পারবি না !

অধুনা বাউলে এক খেলায় মাতে। ভেড়ির কাজের সময় পোলাপানদের সঙ্গে যেন কলিম নতুন করে খাতির জমিয়েছিল। তারই জেরে বাঘ-বন্দী খেলা। বাঘের বাউলের সঙ্গে বাঘ-বন্দী খেলতে ছেলেদের মজাই লাগে। কথা নেই বার্তা নেই, হাত্‌নে, চলাপথে বা ভেড়ির মাথায় দল নিয়ে বসে যায়। দাগ কেটে, যা পায় তাই দিয়ে গুটি বানিয়ে খেলা চলে। ছেলেদের কাছে বন্দী হয়ে পড়তেই বুঝি মজা পায় বাউলে। ইচ্ছে করেই ভুল চাল দিয়ে বন্দী হয়ে পড়ে যেন।

কিন্তু কতদিন আর এমন কাটে ! কাটাতে হয় না। বাউলের ডাক আসে। বনের ডাক। এক দলের এক ক্ষেপ সেরে বনকর আপিসে ফিরতে না ফিরতে, নতুন একদল যেন বাউলেকে ঘিরে ধরে ; না গিয়েও পারে না। এর ফলে কলিম বাড়ি না থাকলেও ফুফু কিন্তু খুশী। বাড়তি আয়ের ইঙ্গিতে ফুফুর খুশির শেষ নেই।

কলিমের নিজেরও কম কি ? হাতে কিছু টাকা থাকলে কত জোর থাকে......বিপদ আপদে অন্যের কত কাজে লাগে......কারও মুখের দাপটি শুনতে হয় না...মেয়ে মানুষের মনই বোঝা দায়......কিসে কি করে !......যাক্‌গে......কলিম আর ভাবতে চায় না। দলে ভিড়ে পড়ে। হুঁকো-কলকে হাতে করে বাদার গল্পে জমে ওঠে।

ওদিকে, উত্তর-ঘেরির বাঁধের কাজে আজও হাত পড়েনি। অনন্দ গাজী ভাবে, হাত দিতেই হবে বোশেখ এলো বলে। যোগাড়যন্তর করতে থাকে। আয়োজনের প্রথম কথা জন্। ফুরণের কাজে আনন্দের মন নেই। জন্ দিয়েই বাঁধতে চায়। উত্তর-ঘেরিতে লোকজন কম। অন্য আবাদ থেকে লোক এনে স্বচ্ছন্দে কাজ চালাতে পারে। কিন্তু তাতে নিজের আবাদে পসার জমে না। উপরন্তু দক্ষিণ-ঘেরির লোক আনলে ওদের হাড়ির খবরও জানা যায়, দাপটিও করার সুযোগ আসে।

দক্ষিণ-ঘেরির বুড়ো করিম ঢালিকে ডেকে এনে লাঠেল বলে,—তা, তোমরা কাছারিকে একঘরে করলে, নাকি ?

ঢালি জিব্ কেটে বলে,—বলো কি ! লাঠেল, আমরা হলাম গিয়ে কাছারির পেরজা। হুকুম হলেই তামিল করতে পা বাড়িয়েই আছি। বলো, কি করতে হবে ?

—বলি, তেমাদের বাউলের খবর কি ?

—বাউলের দৌড় তো বাদায়, সে কি বাদা ছাড়া থাকতে পারে ! বাদায় বাদায় ঘুরে মরছে, আর কি !

—তা তাতেই ধান-চাল হবে ? অতো জেদাজেদি কিসের ?

—লাঠেল ! তোমায় আর কি বলি ! জেদাজেদির মধ্যে কি আমরা যেতে পারি। বাঁধবন্ধী করেছি, তাতে জেদাজেদির তো কিছু নেই ! কাছারির ইচ্ছে হয়, তাতে নিরীখে কিছু

সুবিধে হয় দেবে, না হয় না দেবে।
—তা বেশ,......ঢালি, এবার তা'হলে উত্তর-ঘেরিতে মন দাও না একটু ?
—দেব বলেই তো আমরা হাঁ করে আছি!
—আমি বাপু মুফৎ কারবার করি না। জন্ দাও। জনের হিসাবে দাম পাবে।
—সে যা হয় দিও। সে পরে যা হয় করো।
—বেশ, সেই কথা রইলো। কাল থেকেই। দশ, বিশ, যে ক'জন পার নিয়ে এসো। ......আচ্ছা,......কি ওই নামটা...কাছারিতে কাজ করতো...হ্যাঁ, হ্যাঁ, লায়লা...ঐ বাড়িতে কে একটা হুটকো ছোঁড়া থাকে, তাকে একবার পাঠিয়ে দিও তো!
—ওঃ, ও হলো গে মার্জান পাড়ের ছেলে, জেরাবদি। আচ্ছা, আচ্ছা... বলতে বলতে ঢালি কেটে পড়ে।
পরদিনই লায়লা জেরাবদিকে পাঠিয়েছিল আনন্দের কাছে। আনন্দ তাকে বিশেষ কিছুই বলেনি। যাওয়া মাত্র বলল,—কে তুই জেরাবদি, মার্জানের পো! বোস্, তামাক সাজ্।
লক্ষ্মী ছেলের মত তামাক সেজে কোণে বসে রইল। সেদিন উত্তর-ভেড়ির কাজ শুরু হবে, একে একে অনেকেই আসছে। জেরাবদি বসে বসে দেখছে, কথাবার্তা শুনছে।
দাওয়া একবার খালি হলে আনন্দ বলল,—জেরাবদি, যা তো ঘরে ঢোলের কাছে বন্দুকটা আছে, নিয়ে আয়।
দোনলা বন্দুকটা হাতে করতে পেয়ে জেরাবদির মজার শেষ নেই। ভারি মজা লাগে। বন্দুকটা এনে দিল। নলের মুখের তেনাটা টেনে নিয়ে আনন্দ আস্তে আস্তে তেল ঘষে দেয় বন্দুকের ঘাটে ঘাটে। জেরাবদি এক মনে হাটু টান করে হাতের ওপর ভর করে দেখছে।
তেল মাখানো হলে আনন্দ একবার বন্দুকটা কানের কাছে ধরে নল ঘুরিয়ে জেরাবদিকে নিরীখ করতেই সে চমকে আঁতকে ওঠে।
আনন্দ হো হো করে হেসে উঠল। হাসির ঝুলেই বলল,—চল্, বন্দুক রেখে আসি।
ঘরে ঢুকে আনন্দ বলে,—দেখছিস্, ওগুলো কি ?
জেরাবদি তাকিয়ে তো তাক্ মেরে গেছে। পরপর সাজান বর্শাগুলি। চক্চক্ করে তার ফলকগুলি। শেষ প্রান্তে লম্বা এক সড়কি, সড়কির ফলকে কিন্তু মরচে ধরে গেছে। মরচে ধরা ফলক বালকের বে-খাপ্পা লাগে ; বলে,—এটা কি ?
—এটা কি ? তাও শুনিস্নি ? বুধো লাঠেলের নাম শুনেছিস্ ? বা'জান। এমন সড়কি চালাতে জানতো ; কেউ ধারে ঘেষতে পারেনি কোনও দিন। ঐ দ্যাখ্, দেখেছিস্ ? এটা বা'জানের ঢাল। ঘুঘরোঘাটির কা'জের কথা জানিস্। কত লোক যে মারা যায় তার হিসেব নেই।......দ্যাখ্, দ্যাখ্, বা'জানকে এক সড়কি মারে......দ্যাখ্, এই ঢালের জন্য সেবার বা'জান প্রাণে বাঁচে! দ্যাখ্, ঢালের বেত এখনও কেটে আছে। দ্যাখ্......
দেখছিলো জেরাবদি। কিন্তু আনন্দ তখন জেরাবদিকে দেখাচ্ছিল কিনা কে জানে! তাই বোধহয় অতো 'দ্যাখ্ দ্যাখ্'।
লায়লা পথ চেয়ে ছিলো। জেরাবদি ফিরতেই লায়লা জানতে চায়,—কি রে, আনন্দ গাজী কি বলল ?
—বলবে কি! কত কি দেখলাম। বাব্বা! সব ঝক্ঝক্ করছে।
—কি ঝক্ঝক্ করছে ?
—হ্যাঁ, ঝক্ঝক্, ঝিলিক্।
লায়লা আরও অবাক হয়ে বলে,—কি, গয়না ? চাঁদির গয়না বুঝি!

—ধুৎ, গয়না হবে কেন ? বর্শা, বন্দুক......সড়কি।
—রাখ তোর সড়কি ! এই জন্য বুঝি মরতে গিয়েছিলি ও-বাড়ি !

অবশেষে একদিন লায়লার ডাক পড়ে। আনন্দ ডাকে। জানিয়েছে, জরুরিভাবে আসতে। আনন্দের মনের তলে লায়লাকে ডেকে খবর নেবার ইচ্ছা এমনিতেই উশ্‌খুশ করছিল। নায়েবও তো যাবার বেলা ওর ওপরই ভার দিয়ে যান। দরকার হলে লায়লাকেও ওর কাছে আসতে বলে যান। সেই দরকার আজ হোক কাল হোক ঘটবেই—এমন ভরসাই করেছিল আনন্দ। কিন্তু কই, তেমন তো কিছু আজও ঘটে না। তবুও আনন্দের মনে কিন্তু-কিন্তু ছিল। অবশেষে আনন্দের বিবি নিজেই যখন জানায়, আজই লায়লাকে আনতে—তখন অন্যভাবে দুশ্চিন্তা থাকলেও আনন্দের মনের রুদ্ধ আগল যেন খুলে যায়।

আনন্দের বিবি আম্মা হতে চলেছে। আজই তার প্রস্তুতি চাই। লায়লার ডাক সেই সূত্রে। এ ডাক অন্য সব কথা তাকে ভুলিয়ে দেয়। তা দিলেও লায়লা আজ কেন জানি, কিছুটা সাজগোজ করে। আবাদে আবার সাজগোজ কিসের ! বন শুধু বন্য নয়। তারও সাজ আছে। সুন্দরবন লবণাক্ত কর্দমময় ! তবুও কোন হরিণ বা বাঘের গায়েও সে কর্দমের এক ফোঁটা চিহ্নও কখনও মিলবে না ; আপন সৌন্দর্যকে তারা যেন ঝক্‌ঝক্ করে রাখে। লায়লাও আজ একটু ঝক্‌ঝকে হতে চাইল। হয়ত বা, সেদিন নায়েবের দাওয়ায় যে-বিদ্রোহীমন নিয়ে লায়লা কলিমের সামনে নির্বাক হয়ে খট্ করে কল্‌কে বসিয়ে দিয়েছিল—এই সাজগোজও হয়ত আজ সে করতে চায় সেই বিদ্রোহীমনকে প্রকাশ করতে আরেক রূপে। সৌন্দর্যময়ী নারীর আগুন নিয়ে খেলা—এ নেশা বনের আশ্রয়ে মান্‌ষালয়েও দেখা দেয় বই কি !

সাজগোজ কি আর করবে ! চুল আঁচড়ে নোটন খোঁপা বানাল, ক্ষারে ধোওয়া একখানা তবন দোবেড়ে করে পরে নিল। আর থাকবার মধ্যে ছিল একগাছা চাঁদির পৈছা। ঘষেমেজে পরে নিল। নেতিয়ে পড়ল সেটি নারী দেহের রেখা-অঙ্কনকে তবনের আড়ালে আড়ালে সজাগ করে।

চট্‌পট্ দ্রুতপায়ে লায়লা এসে গেছে আনন্দের বাড়ি। কখন এসেছে আনন্দ জানতে পারেনি। কিন্তু যখন জানতে পেল, দেখতে পেল লায়লাকে এক ভিন্ন রূপে।

লায়লা এসেই দেখে, গোয়াল ঘরের পাশেই আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থা। বেশ জোরেই বলে,—কে আছ কোথায়, এদিকে !...ওটি হবে না...আঁতুড় ঘর এই পশ্চিমের ঘরের দাওয়ায় চাই।

আনন্দও এসে পড়েছে। কি যেন একটা বলতে গিয়েছিল মুখ খুলে,...

অমনি লায়লা মুখে ঝাঁকা মেরে বলে,—হয়েছে, যাও এখন দড়ি-চঠা আনো। হোগলার ঝাপ না থাকে, মাদুর নিয়ে এসো। যাও ! সব্বাই মিলে লেগে যাও। দেরি করলে হবে না।...আগুন বানিয়েছ ? হয়েছে, যাও বড় মালসায় আগুন চাই। গরম জল কই ?—এমনি বাড়ি মাৎ করা সব আদেশ।

সে-দিন, সে-রাতও যায় ! পরদিন দুপুর। এতক্ষণ আনন্দের সমস্ত বাড়িটা যেন তটস্থ হয়ে ছিল, লায়লার দাপটে। কখন যে কি কাজের আদেশ আসে ! লাঠেল-বংশের আনন্দও যেন সে আদেশের মুখে ভিজে বিড়েল।

নবজাতক অবশেষে নিজে কেঁদে অপর সবার মুখে হাসি ফোটাল। পৃথিবীতে বোধ হয় এই একটি ক্ষণই আছে, যখন নিজের বুকফাটা ক্রন্দনে অপরের মুখে হাসি ফোটান যায়।

তখন বেলা শেষ। পশ্চিমের ক্লান্ত রোদের ফলক পূবের গোটা ভেড়িটাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। লায়লা এবার ঘরে ফিরে আসবে। আনন্দও পেছন পেছন এসেছে। ভেড়িতে এগুতেই দেখা যায় ঝক্‌ঝকে পূব ভেড়ি। সমগ্র দক্ষিণ ও উত্তর ঘেরের।

আনন্দ উল্লসিত মনে বলে,—দেখেছ লায়লা, কেমন ভেড়ির বাঁধ দিয়েছি। অন্য সনে পাঁচশ' টাকা, আর এবার কত জানো ? হাজার টাকা ঢেলেছি উত্তর-ঘেরিতে। তবে না এমন বাঁধ।

লায়লা মুখ তুলে একবার উত্তর-ঘেরির ভেড়ি দেখে নিয়ে, দক্ষিণ-ঘেরির ভেড়ির দিকে তাকাল।

আনন্দ তা লক্ষ্য করে বলল,—বল তো, কোনটি ভাল ? দেখলেই বুঝবে। বলো তো ?

লায়লা দুই ভেড়ির ওপর আরেকবার তাকিয়ে বলল,—দুটোই তো ঝক্‌ঝক্ করছে।

বলেই তবনে ঘেরা পায়ে দ্রুত সঞ্চালন এনে বলল,—জেরাবদি কোথায় কি জানি! আমি এখন চললাম।

বর্শার ফলকের ঝক্‌ঝকানিকে নারী-সৌন্দর্যের চমকে ম্লান করবার বাসনা লায়লা পুষেছিল কিনা কে বলবে, তবে সে আজ তার এক নবরূপে আনন্দকে পুলকিত করে দিয়ে গেল। সেখানে আনন্দকে যেন পরাজিত করে নবতর আকর্ষণের বীজ বপন করে গেল তার মনে!

বাইশ

বোশেখ মাস তার খরতর খরায় জানিয়ে গেছে, সজাগ করে দিয়েছে ভাটোদেশের মানুষকে—ভুলো যেও না, তুমি নোনাদেশের মানুষ। নোনা, চারিদিকে নোনা—মাটির বুক চিরে চিরে নোনা উপ্‌ছে ওঠে, নদীর নোনাপানি সাগরের জোয়ার জলে আরও হয়ে ওঠে নোনা, বৃষ্টির মিঠেপানি যেটুকু বা মিশেল ছিল খাল-খানা-ডোবায়, তাও টেনে নিয়েছে খরায়, শাক-সব্জী যাও মেলে তাও যেন নোনা, মানুষের গায়ের রক্তেও নোনা ফুটে ওঠে, কারও আদরচুম্বনেও নোনা স্বাদ বুঝি!

নোনার গন্ধে সচকিত হয়ে ওঠে ভাটোর মানুষ। সংগ্রামের মাসগুলি আগতপ্রায়। এই সংগ্রাম দিন গুণে আরম্ভ হয়, আর দিন গুণেই শেষ হয় যেন। পনেরই জ্যৈষ্ঠ এর শুরু, আর পনেরই কার্তিক এর শেষ বুঝি—যখন মেঘবরণ ধানের গোছায় থিয়ে শিষ দুলে ওঠে।

সংগ্রাম তো বটেই, কিন্তু এ সংগ্রামে কৃষকের যে আনন্দ তার তুলনা নেই। জীবিকা আহরণের পেশা এ যে শুধু নয়, এ যে সৃষ্টির এক মহা আনন্দ। তা না হলে নোনা-মশার কামড়ে জর্জরিত হয়ে, হাতে ও পায়ে হাজা-জলকামড়ায় দগ্ধ হয়ে, নুন ও পানি-ভাতের নাস্তা খেয়ে, নোনা-পচা জল ও কাদায় ডুবে থেকে কেমন করে এই মানুষ পারে সোনার ফসল ফলাতে!

পনেরই জ্যৈষ্ঠের মাথায়, কে কোথায় কোন্ ধান্দায় ছিল,—সব সুড় সুড় করে চকে এসে পড়েছে। আর কোন দিকে কারও মন নেই, না বিয়ে-সাদি-উৎসব, না আত্মীয়-কুটুম্বিতা, না নিন্দাস্তুতি, না সোহাগ-ভালবাসা—না, কিছুই না,—শুধু চাষের তোড়-জোড় ও যোগাড়-যন্তর। এ যেন যুদ্ধের আয়োজন—অস্ত্র ও রসদ। আগামী পাঁচ মাসের অস্ত্র ও রসদ। অস্ত্র সামান্যই,—দা, কুড়ুল, কাস্তে আর লাঙল ও গরু। তাড়াতাড়ি পাঁচ মাসের মত হাটের কেনাকাটি সবই সেরে নিতে চায়। হাটে এ সময়ে তিনটি জিনিসের পসার—কামার,

কুমড়ো, তামাক-চিটে। কামারের কাজ অস্ত্রের আয়োজনে, আর বাকি ক'টি হলো রসদ। এ ক'মাস বলতে গেলে শাক-সজ্জী কিছুই পাওয়া যায় না! পেলেও ওদের কিনবার কড়ি নেই, তার চেয়েও বড় কথা অবসর নেই। তাই ঘরে জমায়েত করে পাকা কুমড়ো। মাছ দুর্লভ হয়ে ওঠে, ঠিক দুর্লভ নয়—মেরে আনবার মত সময় কই! সহজলভ্য চিংড়ি মাছেই দায় সারে। কুমড়ো-চিংড়ি নোনাজলে রসনা তৃপ্তি করতে কম কি!

সর্বোপরি যেটি চাই, তা হল তামুক। তাই তামাক ও চিটে গুড়। দা-কাটা তামাক—একটানে যে ওদের সর্ব-শিরাকে চাঙ্গা করে তোলে নোনা বিষের আক্রমণের বিরুদ্ধে।

সবাই যে যার ঘরে এসে পড়েছে—নিধু শিকারি, ঢালি, বাউলে, মার্জান, এলাহি, দ্বিজবর কাগ, নিধু মোড়ল, ঠাণ্ডাইগাজী—আরও অনেকে, সব্বাই এসে পড়েছে।

পনেরই জ্যৈষ্ঠ অনেকে মাঠে নামলো। বাকি যারা, দু'একদিনের মধ্যেই নেমে পড়বে। নেমে পড়ছেও বর্ষার ধারা। সবাই উৎফুল্ল। এমন সুলক্ষণ কেনই বা আনন্দ আনবে না ওদের মনে। কলিমের কিন্তু উৎকণ্ঠা। প্লাবনের ভয় তার মন যে পেয়ে বসে আছে।

পেরথম ভাঙন। প্রথম চাষ। তিনবার চাষ দিতে হবে। এরপর আসবে দোয়ার ও তেয়ার। তেয়ার ভাঙন পনেরই শ্রাবণের মধ্যে শেষ করতেই হবে। ঘড়ির কাঁটার মত তারপর যে দিন-বাঁধা কাজ আছে। মাঝে ওদের মাত্র তিনদিন বিশ্রাম—অম্বুবাচি বা অমাবতী। এই তিনদিন ধরিত্রীর বুকে কিছুতে কোন আঁচড় দেবে না। ধরিত্রী মা এই তিনদিন যে ঋতুমতী। জমি ও জীবনের সঙ্গে কি রোমাঞ্চকর তুলনা ও অনুভূতি কৃষকের আচরণে!

বর্ষার প্রথম পানিতে চক্‌কে দু'-একবার ধুয়ে নিতে হয়। নোনা ধোয়া। নতুন কলে দক্ষিণ ঘেরের কোন অসুবিধা এবার হয়নি। পেরথম ভাঙনের সময় দু-আঙুল থেকে চার-আঙুল জল চাই ক্ষেতে। নেমে পড়েছে যে যার ভূঁইতে। পৃথক পৃথক ভাবেই চাষ। ভেড়ির কাজের মত চাষের কাজ কিন্তু একত্রিত নয়। তা না হলেও, এক সূত্রে গাঁথা। প্রতিক্ষণে তালে তালে একত্রে কাজ চলে। দোয়ার চাষে জল রাখতে হবে কম করে আট আঙুল। কলের মুখ সেই ভাবেই বাঁধতে হবে। সবাইকে সময় মত একতালে পেরথম ভাঙন শেষ করতেই হবে। সমভাবে দোয়ার ও তেয়ারের কাজও।

প্রতি চাষে আগে লাঙল। তারপর বাসই। ঘাস জঙ্গল 'মেশান' দেবার কাজে বাসই। এখন পেরথম ভাঙনের বাসই চলেছে। বেশ দেখা যায় যে যার বাসই চড়ে গরুকে কখনও গালি, কখনও বা আদর করে বক্‌বক্ করে চলেছে। বৃষ্টি নেমেছে। কারও মাথায় টোপ, কারও সে সব বালাই নেই।

লায়লাও মাঠে এসেছিল টোপ মাথায় দিয়ে! কিসের আনন্দে যেন হঠাৎ মেতে ওঠে। রেখে দেয় টোপ আলের ওপর! ঝম্‌ঝম্ ধারায় স্নাত হয়ে গেছে। জল, মিষ্টিজল গড়িয়ে পড়ে চুলের গোছায়, কপোল ও চিবুক বেয়ে। বহু আকাঙ্ক্ষিত মিষ্টি জলের ধারায় চাষীর মেয়ের সিঞ্চিত বর্ণালী বুঝি ঢাকা দায়। শত কুন্তলফণা তার উদ্ধতিকে ম্লান করে লায়লার মুখের মিষ্টি রেখার ওপর নেতিয়ে পড়েছে নদীর বাঁকের মত এঁকে বেঁকে। হাত দিয়ে চোখের জল ও চুলের গোছা সরাবে কি, হাঁটুর তবন সামলাতেই ব্যতিব্যস্ত। পাঁচ-ছ' আঙুল পানি হলেও, নোনা পচা কাদায় লায়লার পা দেবে যেতে থাকে হাঁটু অবধি।

জেরাবদি বাসই দিচ্ছিল লায়লার জমি-খণ্ডে। এতদিন মার্জান নিজে এ-কাজের ভাগীদার ছিল। চাষীর ছেলেকে সমত্ত হতে আর সময় দিলে চলবে কেন? পুরো জোয়ান

ছেলের মত জেরাবদি চাষের কাজে লেগে গেছে এ-বছর। তাই, থাকতে না পেরে দেখতে এসেছে লায়লা, জেরাবদি পেরে ওঠে কিনা। দেখতে এসে মাথায় রোখ্ চেপেছে। ভূঁইয়ের কোলে এগিয়ে বলে,—জেরাবদি, এই বুঝি তোর পারা ?

জেরাবদি বাসই-এর ওপর দাঁড়িয়ে দুই গরুর পিঠে দু'হাতে চেপে যেন ঠেলে দিচ্ছে। এবার ভূঁইয়ের কোণে বাঁয়ে ঘুল্লি দিতে হবে। ডাইনের গরুটার লেজে মোচড় দিয়ে উদ্ভট শব্দ করে উঠল। ভাবির কথার প্রত্যুত্তরে যেন অমন উৎসাহ। ভন্ করে ঘুরে যায় বাসই। পড়ে গিয়েছিল বুঝি, কোনমতে টাল সামলে নিল।

লায়লা এবার তবন হাটু অবধি গুঁজে নিয়ে শক্ত করে ভিজে আঁচল কোমরে জড়িয়ে নিয়েছে। জেরাবদি আবার এ মাথায় ঘুরে এলেই বলে,—দাঁড়া জেরাবদি, আমিও বাসইতে উঠি। ভাল হবে, দুজনের ভারে মেশন ভাল হবে।

—রাখো ভাবি, সবাইকে দিয়ে কি সব কাজ হয়!

—হয় না তো কি !!

জেরাবদি আবার আরেক ঘুল্লি দিয়ে আসতেই লায়লা বলে,—তোর দু'টো কি গরু রে ?

—কেন, গাই গরু।

—তবে ?

—তবে কি ?

জেরাবদি বাসই আবার এ-মাথায় আসতেই লায়লা বলে,—তবে ? বলদের বদলে যদি গাই গরু, তবে মিন্‌সের বদলে আমি কেন পারব না ?...

নোনাদেশের কর্দমাক্ত মাটিকে উর্বরা করতে বলদের মত শক্তির একান্ত আবশ্যক না হলেও, গরু ভাটো অঞ্চলে এক মহা সমস্যা। নোনার দাপট গরু সহ্য করতে পেরে ওঠে না। অল্প ক'বছরেই যেন ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে মারা পড়ে। বলদ হলে তো কথাই নেই। তবু গাই গরু হলে রক্ষে। চাষের কাজও ওদের দিয়ে চলে যায়। গাই গরু মায়ের জাত, সহ্য শক্তি ও জীবনী শক্তি অপরিসীম। মায়ের জাতই আলাদা বোধহয়!

জেরাবদির কথার উত্তর দিতে দিতে লায়লা নেমে পড়েছে ক্ষেতে। বাসই ধীরগতি হতেই ঝপ্ করে উঠে পড়ল তার উপর। জেরাবদি হাত ধরে টাল সামলে দিল। সে কি উল্লাস মনে ও দেহে লায়লার!

লম্বালম্বি দীর্ঘ পথ বাসই চলল দেহের ওজনে নোনাকাদা ও আগাছা পিষ্ট করে। এবার ঘুল্লি। জেরাবদি লেজে মোচড় দিতেই ঘুরে গেল বাসই। টাল সামলাতে পারে না লায়লা। ধপাৎ করে পড়ল কালো নোনা কাদায়। জেরাবদি হাসে, লায়লাও হাসে। ছাড়বার পাত্র নয় লায়লা। রোখ চাপবার কারণও ছিল।

এ-দিক ও-দিক, সবদিকেই যে যার কাজে মাঠে আছে। লায়লা আগেই দেখে নিয়েছে, বাউলেও তার জমিতে বাসই চেপেছে। তবে এতদূরে যে, কথা বলা সম্ভব নয়; কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায়, চেনাও যায়!

কাদায় পড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। বাসই ঘুরে আসতে গাই গরুর প্রায় সামনে দাঁড়িয়ে থামিয়ে দিল। জেরাবদিকে কথা বলার অবকাশ দেয়নি; তখনও সে হাস্‌ছে। উঠে পড়ল লায়লা আবার। বাসই চলল আরেক লম্বা টানা। লায়লা এবার যেন দ্বিগুণ উৎসাহে প্রাণপণে চিৎকারে গরু তাড়াতে থাকে।

ঘুল্লি সামনে। জেরাব্‌দি আর কোন পথ না পেয়ে বলে,—ভাবি, এত ভার! দু'জনের ভার গাই-গরু টানতে পারবে কেন!......চুমু খাবার মত জোর শব্দ করে বাসই থামিয়ে দিলে

লায়লা লক্ষ্মীমেয়ের মত নেমে পড়ল।

এদিকে কলিম একমনে বাসই দিচ্ছে। এলাহির জমি পাশেই। এলাহি ডেকে বলে,—দেখলে বাউলে, দেখলে রগড় ?

রগড় বলতেই বাউলে ঘাড় ফিরে তাকাল লায়লার জমির দিকে। তাকিয়ে বলে,—কি রগড় বক্স ?

—দেখলে না, লায়লাবিবির কাণ্ড !

—কার ? পাগলাবিবির ?

—না গো, লায়লাবিবি !

—ঐ তো হলো ! দেখেছি। বলো হাসবো না কাঁদবো ! বলে কি না, মনে বড় সাধ চড়বো বাঘের কাঁধ।......যাক্‌গে, ছেড়ে দাও, নিজের ভুঁইতে যত খুশি হাবুডুবু খাক—তোমার আমার কি !

—বলি তোমার ডানের গরুর কি হলো গো ? অতো বেগড়া দিচ্ছে কেন ?

—বেগড়া বলতে বেগড়া ! গাই-গরু। বেগড়া দেবার জাত তো ! লাজ দেখো না ! ল্যাজটা তুলে ধরতেই দেবে না। মোচড় দেব কি ?

—ভাল করে ঘাই কতক দাও, ঠিক হয়ে যাবে।

—গাই-গরু, কত ঘাই দিই বলো ?

দিনের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে কলিম ও আরও ক'জন মিলে এবার ঘর মুখো। গরুগুলি ছেড়ে দিয়েছে, আপন মনে তারা যে যার ঘরের পথ ধরেছে। কলিম বলে,—শোনো বক্স, চলো ঐ পথে। জেরাবদিকে দেখে যাই।

জেরাবদি তখনও বাসই গোটায়নি। কাছে এসে বাউলে বলে,—কিরে জেরাবদি, এত হাবুডুবু কেন ?

হাবুডুবু কথা মনে করিয়ে দিতেই জেরাবদি আবার হাসতেই থাকে। বলে,—ভাবি বলে কিনা, গাই-গরু দিয়ে চাষ হলে, আওরত্‌ মানুষ দিয়ে চাষ হবে না কেন ?

—তা দিলি পারতিস্‌ জোয়ালটা ওর ঘাড়ে তুলে ! গাইগরুটাও একটু বিশ্রাম পেতো !

হো হো করে সবাই মিলে হেসে ওঠে।

আলের ওপর টোপ পড়ে আছে দেখে, বাউলে তুলে নিয়ে নিজের মাথায় দিল। লায়লা বৃষ্টি ভেজার আনন্দে ভুলে ফেলে গেছে টোপটা। কাণ্ড দেখে জেরাবদি চেঁচিয়ে ওঠে,—কর কি বাউলে ! কর কি বাউলে ? আরে ভাবির টোপ, ওটা ভাবির।

বাউলে আরও কয়েক পা এগিয়ে জেরাবদির দিকে তাকাল ! টোপটা খুলে নিয়ে একবার টোপের ভেতরটা নাকের কাছে নিয়ে বলে—ধুত্তুর, মেয়ে মান্‌ষের গন্ধ !!—বলেই ছুঁড়ে ফেলে দিল আলের নামোতে। জেরাবদি ছুটে এসে তুলে নিয়ে নিজের মাথায় বসিয়ে দিল।

এদিকে লায়লা জেরাবদির প্রতীক্ষায় চঞ্চল। এখনও আসে না কেন ! ফাঁকা জায়গায় এসে ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে ছিল। জেরাবদি এসে আঙিনায় দাঁড়াতে না দাঁড়াতে লায়লা প্রশ্ন করে,—কিরে অমন করে বাউলে টোপটা ফেলে দিল কেন রে ?

জেরাবদি তো আবার হেসেই খুন, উত্তর দেবে কি ! হাসির দমকে বলে,—আওরত্‌ মান্‌ষের গন্ধ ! টোপে আওরত্‌ মান্‌ষের গন্ধ ! আবার শুঁকে দেখে !!......

—যা, আহ্লাদি করিস না, ডোবায় ডুব দিয়ে আয়। খাবি-টাবি তো, না খাবি না ?

তেইশ

অমাবতীর পর গোটা চক যেন কাজের নামে পাগল হয়ে উঠেছে। পনেরই শ্রাবণের মধ্যে তেয়ার চাষ শেষ হলে চলবে, কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কাজ।

পোলাপানেরা তো যোগার্ন দিয়েই হয়রাণ। তামুক আনো, তামুক সাজো, তেষ্টার পানি আনো, নাস্তা আনো,—আরও কত ফাই-ফরমাস। মেয়েদেরও এই যোগানের পেছনে থাকতে হয়। তাছাড়া আরও যে ওদের মরিবাঁচি কাজ আছে তাও সুরু হবে শীঘ্রই।

এদিকে পাতোর চাতার পাগলা করে তুলেছে জোয়ানদের। আষাঢ়ের মধ্যেই চাতারে ধান ছড়াতে হবে। শ্রাবণের প্রথমে ধান ছড়ালেও হয়, কিন্তু সে ধানের গোছায় শিষ অতি লম্বা হয়ে দেখা দেবে। লম্বা শিষে ধানের ফলন কম।

তাই বলে আষাঢ়ের শেষে চাতারের চাষ শেষ করে গোটা চাতারে বীজ ছড়ালে হবে না। বীজ ছড়াতে হবে গোটা চাতারে ভাগে ভাগে। ছ'সাতদিন অন্তর অন্তর, এবং পয়লা শ্রাবণের মধ্যেই। পাতোর হওয়া চাই মেঘবরণ এবং দীর্ঘ মুঠোম-হাত। তেমন হতে দিন কুড়ি মতো সময় লাগে। আবার বেশি লম্বা হলে পাতো হেলে পড়তে পারে। তখন পাতোর মাজায় 'গেরো' বা শিকড় গজায়। তেমন গেরো-পড়া পাতো দক্ষ আবাদী চাষীর কাছে বরবাদ।

ধান বুনবার সময় চাতারে একবার হাত দিলেই পাতো ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে ওঠে। ওরা যেন উপ্‌ড়ে তুলবার প্রতিবাদে সাবালকত্ব জানাতে চায়। তখন তিন দিনের মধ্যে লম্বা হয়ে পড়বে এক হাত। ভাগে ভাগে কিছুদিন অন্তর অন্তর বীজ ছড়াবার নিয়ম। বপনের কাজে তো সময় লাগে ; ভাটোর পঞ্জিকা অনুযায়ী পনেরই শ্রাবণ থেকে পনেরই ভাদ্র। কাজেই এই সময়ের মধ্যে পাতো যাতে অযথা প্রলম্বিত না হয়, তারই জন্য এমন নিয়ম বা বিধি।

এ তো গেলো মোটা হাতের মোটা কাজের মোটামুটি হিসাব। কিন্তু সূক্ষ্ম হাতের কাজ ? তার জন্য তো মেয়েরাই আছে। বীজের যত্ন-আত্তি, কোমল হাতের স্পর্শে জীবনের স্পন্দন আনা ধানের দানায় !

প্রথমে হবে মানসিক। মানসিক এরা করে নানা সময়ে—পেরথম ভাঙন, চাতারে পেরথম হাত, চাতারে বীজ পেরথম ছড়ানো, ধানের গোছের পেরথম বপন, এমনি অনেক সময়ে। কিন্তু মেয়েদের এই বীজে হাত দেবার সময় মানসিক প্রায় একরকম বাঁধা। তেমন বড় কিছু মানসিক নয়, মাত্র হয়ত সওয়া পাঁচ আনা। কিন্তু সওয়া পাঁচ আনার মানসিকে ওরা কেমন যেন একটা গাম্ভীর্য ও সরবতা আনে 'আল্লা-আল্লা' বা 'হরিবোল' উচ্চারণে আর উলুধ্বনিতে।

ইতিমধ্যে ঘরে ঘরে উলুধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে। আজ এ-বাড়ি, কাল ও-বাড়ি, পরশু হয়তো আরও দু'তিন বাড়ি—এমনি করে সব বাড়িতেই। যার যত ভাগে চাতার, তত ভাগে তাদের বীজধান ভাগ করে নিয়েছে। ঢোলে করে বীজধান গজাতে হয়। ঢোলে রেখেই থানার বা ডোবার আধা-মিঠে পানিতে 'চুব' দেবে। দুপুর বেশ গড়িয়ে গেলে তবে এই 'চুব' দিয়ে পানির মধ্যেই রাখতে হবে সন্ধ্যা অবধি। তারপর আলগোছে ঘরে এনে যেন ঘুম পাড়িয়ে রাখবে সারা রাত, এবং পরের দিনও সারা দিন ও সারা রাত। কোন কারণে এই সময় ঢোলকে স্পর্শ করা মানা। বীজের সুপ্ত জীবনকে জাগাবার জন্য অবসাদে পড়ে থাকবার সুযোগ বোধহয় আবশ্যক। তৃতীয় দিনে 'ওস্‌মেশ্‌' । মাটিতে ঢেলে ওলট্‌-পালট্‌ করে আবার ঢোলে নিয়ে পানিতে 'চুব্‌' । এবার কিন্তু 'চুব' দিয়েই তুলে নিতে হবে। আবার

ঘরে নিয়ে ঘুম পাড়ানি অবসাদ। চতুর্থ ও পঞ্চম দিনেও জীবনের ঘুম ভাঙাবার একই প্রচেষ্টা। ছ'দিনের দিন সাড়া মেলে, দেখা দেয় সাদা কলাই।

কৃষক রমণীর দায়িত্ব এখানেই শেষ। জীবনকে সে জাগ্রত করেছে। ধামায় করে নিয়ে যায় কৃষকেরা এবার চাতারে।

ভাদ্রের মাঝামাঝি। বপন সবারই প্রায় শেষ হয়ে এলো। চাষীদের এখন যেন চেনাই যায় না, এক একজনের এমন চেহারা হয়েছে। রঙ্ তো সবার একাকার। রোদ-বৃষ্টি, নোনাজল, নোনাকাদা—সব কিছু মিলে কালসিটে করে দিয়েছে। পায়ের দিকে যেন তাকানো যায় না। প্রতিদিন দশ-বারো ঘণ্টা—তিন বেলা নোনা কাদায় তো পড়েই ছিল। এতদিন হাত দু'খানা যা হোক নোনা কাদা থেকে দূরে ছিল। কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্রে তারও রেহাই নেই। নোনা পচা কাদায় হাত চুবিয়ে সারা চক্ পাতোর গোছা বুনতে হয়েছে। তার ওপর আছে খোয়ালি, নিঙ্ড়ানোর কাজ। ক্ষেতের একটু কোথাও ডাঙ্গোপানা হলে তো রক্ষে নেই। নোনা মাটির তেজ কেমন তা দেখিয়ে দেবে। কত রকম আগাছা—চিচো, কেউটে-ফেনা, নেবু-চালানি, নাল, আরও কত কি। পচা কাদায় প্রায় গড়াগড়ি দিয়ে নিঙ্ড়াতে হবে।

দেখা দেয় চাষীর দু'পা ও দু'হাতে, হাজা-মাজা, জল-কামড়া। শুধু জলের কামড় হলে তো হতো—মশার কামড়ের যে অন্ত নেই। নোনা পচা কাদায় দাঁড়ালে এমন মশা যে, দু-চারটা থাবায় মেরে কুল পাবে তা নয়। হাত ও পায়ে চেপে টেনে কেঁকে কেঁকে মশা ও রক্তের দলা ফেলে দিতে হয়।

তবুও মঠবাড়ির মানুষ দমে না। দমবার পাত্রও নয়। মস্ত আশা ও আনন্দে ভাদ্র কাটাতে চলেছে। এবার যে নিজেদের হাতে গাঁথা মাটির প্রাচীর ওদের ধন ও সম্পদকে আগল দেবেই দেবে।

পনেরই ভাদ্রের আগেই বোনট শেষ করেছে। এই সময়েই শেষ করার কথা। পরে হলেও হয়, তবে তাতে ধানের গোছায় নতুন পান আর বেরুবে না। চারিদিক মুঠোম-হাত ফাঁক রেখে রেখে পাঁচ-ছ'টি পাতো নিয়ে গোছ পুঁতে যেতে হয়। গোছের দু'তিনটি মরে যাবারই কথা। যা থাকে, তা থেকেই আবার নতুন তিন-চারটি পানা গজিয়ে ঝাঁকাল হয়ে ওঠে। জীবনের রূপ দিতে গিয়ে জীবনের অপচয় তো প্রকৃতির সর্বত্র।

সেই ঝাঁক বেঁধে গেছে গোটা মঠবাড়ির ঘেরিতে। চাষীরাও নিঃশ্বাস নিয়েছে। ঝলমল করে উঠেছে চক্।

চব্বিশ

—কই লো, ফট্‌কের মা, ঘরে আছ?—সর্বানুবিবির উঠানে এসেই লায়লা যেন হাঁক দেয়।

—কেন, ঘরে থাকব না তো কি! তোমার মত বাইরে বাইরে থাকবো নাকি? —সর্বানুবিবি সাড়া দেয়।

—ষাট্, তোমাকে ঘরের বাইরে কেন করতে যাব?

হাসতে হাসতে সর্বানুবিবি সামনে আসে। সে হাসিতে অসীম মমতা ও কৃতজ্ঞতা। বলে,—তুমি নাকি এবার মাঠে চাষ আবাদ করলে, লাঙল দিলে? আচ্ছা ডাকাত হয়েছ

তুমি গো ! তা তুমি পারবে !

—যার কেউ নেই, তার আবার মাঠ বে-মাঠ ! যেখানে ইচ্ছে থাকব, যেদিকে ইচ্ছে চলে যাব।

সর্বানুবিবি এবার পিঁড়ি এগিয়ে দিতে দিতে লায়লার অনুকরণেই উত্তর দেয়,—ষাট্, সে-সব কথা আমি বলতে যাব কেন ?

দুজনেই একটু চুপ। সর্বানুবিবি পিছনে ফিরে কি যেন দেখছিল, হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলে,—দেখো, ফট্‌কের মা......

লায়লা অবাক্,—ফট্‌কের মা কি গো, আমি আবার 'ফট্‌কের মা' হলাম কবে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,......বলো, তুমি না হলে কি ফট্‌কে আমার বাঁচতো.........না আমি বাঁচতাম ?......তা যাই বলো, তোমার ঐ যে কাছারি-বাড়ি যাওয়া......মোটেই ভাল লাগে না। কেমন যেন লাগে !

এমন সময় জেরাবদি কোত্থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে। দম ফেলতে পারছে না, হাঁফ নিতে নিতে বলে,—জানো ভাবি, নায়েবমশায় আজ এসে গেছে। জানো ?

জেরাবদি এ ক'মাস ভাবির কাছ থেকে অনেকবার শুনেছে কাছারির সমস্যা। কোন সময়ে ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে, কখনও বা লায়লার নিজের মনের বিড়বিড়ানিতে। তাই ছুটে সবার আগে খবরটা ভাবিকে দিতে এসেছে।

লায়লা শুনেই বলল,—যাঃ, বাজে বকিস্ না !

—না গো, চলো তুমি দেখবে, সত্যি কিনা ?

লায়লা পিঁড়ি থেকে উঠতে উঠতে বলে,—এই দ্যাখো, ফটকের মা, এখন না গিয়ে উপায় আছে ? আমার হয়েছে যত জ্বালা !

জ্বালা, সত্যই জ্বালা। ভেবেছিল, এবার পার পেয়ে যাবো। নায়েব বলেছিল, অমাবতীর সময় আসবে। তা যখন এলো না, এবারের মত ঝঞ্ঝাট থেকে বেঁচে যাবো। তারপর তো অঘ্রাণ এসে যাবে দেখতে দেখতে। তখন যা হয়, সোজা কথা বলে দেবো। হয়ত বলবার জোরও থাকবে। তা না, 'নায়েব এসে গেছে'। এসে গেছে তো বেশ হয়েছে !

বেশ হয়েছে কিনা, সে তো পরের কথা। এখনকার মত লায়লা তো হাজির। নায়েবের অনুপস্থিতিতে লায়লার যাবার কথা ছিল কাছারি। গিয়ে পরিষ্কার-টরিষ্কার করবে, চালু রাখবে কাছারির আঙিনা ও ঘর। ঘর খুলে ঢুকবার বিশেষ অসুবিধা ছিল না। মধ্যে একটা লোহার সিন্দুক আছে বটে, কিন্তু শূন্যই থাকে। আর কোনও জিনিস-পত্র বিশেষ নেই। ঘরের চাবি তো আনন্দের কাছে। কিন্তু এ ক'মাস লায়লা এ-মুখো হয়নি। হয়নি দেখে আনন্দগাজী নিজে লোকজন এনে, ঝাড়-পোঁছ করে রাখত। মনের তলে আশঙ্কা ছিল, এই সূত্রে নায়েব লায়লার কাছারি আসা বাতিল করে না দেন।

আনন্দের আশঙ্কা যাই থাক্, লায়লাকে দেখে নায়েবের বুঝি খুশির অন্ত নেই। একবারও খোঁজ নেননি, এ ক'মাসের কাজকর্ম সে কেমন করেছে বা না করেছে !

প্রথম দিন নায়েব দুপুরের ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই লায়লা এসে বলল,—এখন আমায় যেতে হবে।

—কেন, এত সকাল সকাল !

—এবার তো নন্দাকে সঙ্গে আনেননি। গল্পে সময় নষ্ট হয়নি। সব কাজই সেরে ফেলেছি। এখন যাব। নন্দাটা কি গল্পই করতো !

—ঠিক বলেছ, অতো গল্প করতো বলেই তো এবার আনিনি।

একটু থেমে থেমে বলেন, —তা যাও। আমার আর কি। রাতের রান্না-বান্না একা-একাই করব। কি আর রাঁধব, ভাতে-ভাত করে নেব। যাও!

লায়লা আর কোনও আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে ঘরে ফিরে আসে।

পরদিনও একই সময়ে লায়লা এসে যখন যাবার কথা পাড়ে, নায়েব কথা চাবিয়ে চাবিয়ে বলেই ফেললেন,—দেখো লায়লা, আমার দ্বারা কি এ সব হয়! অত-শত আমি পারি না। তুমি থেকে একটু রান্নার সাহায্য না করলে……

—সে কি বলেন! আমাদের রান্না খাবেন?

—না, না, রান্নার কথা বলছি না। এই যোগাড়-যন্ত্রের কথা বলছি।

—তা ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে যে!

—তাতে কি! আর কেউ তো না, তুমি তো আপন জন। আপন জনের মধ্যেই। আর তখন তো কাছাড়ি-বাড়ি কেউ থাকে না। যা মশা আজকাল, সন্ধ্যা হলে কেউই দাওয়ায় বসে না।

এতো হিসেব তো লায়লা করেনি। চট্ করে কোনও উত্তর খুঁজে পায় না; বলে,—আজকে আমার বিশেষ কাজ আছে, আজ চললাম।

ভরা ভাদ্র। নদীর লোনা জল থৈ থৈ করে। ভরা জোয়ারে এক এক সময় মনে হয়, মিছে এই মাটির বাঁধন, ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে এখনই। ভাদরের আকাশ থমথমে, তাই বুঝি রেহাই মেলে। এমন ভরা গাঙে তুফান এলে ঢেউয়ের তোড়ে তলিয়ে যেত কোথায় কৃষকের এই মাটির কেল্লা!

এদিকে কেল্লার ভেতর পাল্লা চলে ধানের গোছায় আর বর্ষার পানিতে। বর্ষার পানি বুঝি আপন গর্ভে গ্রাস করতে চায় ধানের মাথাকে। ধানের গোছাও কিছুতেই মুছে নিতে দেবে না চকের সবুজ দোলানিকে। যেন পহরে পহরে ইঞ্চি ইঞ্চি করে বেড়ে ওঠে। মাথা উঁচু রেখে ঘোষণা করতে চায়—কৃষকের জয়। কৃষকের ঋণকে যেন সুদে আসলে পরিশোধে করতে চায়, ফলবতী হবার সম্ভাবনাকে ·· গগ রেখে, বাঁচিয়ে রেখে।

মঠবাড়ির চাষীরাও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখে তাদের আশা ও আশঙ্কার দোলায়। প্রতিক্ষণের নজর তাদের ধানের গোছার মাথা উঁচু রাখার প্রচেষ্টার ওপর। অলস নজর নয়, নিরলসভাবে তারা আগল দিয়ে বেড়ায় নদীর নোনা বিষ। প্রাচীর তো পাথরের-নয়, থরে থরে পলিমাটি সাজানো। এখানে ওখানে চোরা ছিদ্রপথ থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। নোনা বিষ চুইয়ে চুইয়ে আসে ঘোঘা পথে। সেই ঘোঘা ও চোয়ানি ওরা মেরামতি করে বেড়ায় সারাদিন। কাটালের জোয়ার হলে তো কথাই নেই, সারাদিন ও সারারাত ওরা পড়ে থাকে ভেড়ির কোলে কোলে।

বাঘের বাউলে কলিম দক্ষিণ-ঘেরির সবাইকে সন্ত্রস্ত ও সজাগ করে রাখবে যেন বাঘের ভয়ে। সবাইকে বলে বেড়ায়,—প্লাবনের বছর, তোরা সাম্‌লে থাকবি কিন্তু। গেরহ যায়নি। ঘোর কাটেনি।

শুক্লপক্ষ ছেড়ে এবার ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষ। কলিম আরও ঘোরাফেরা করে; বলে,—জানিস্ তো, এবার কৃষ্ণপক্ষের বছর। কৃষ্ণপক্ষ পার হতে দে। তারপর দম নেওয়া-নিওয়ি। খেয়াল করে থাকবি। সাবধান, চক্ ছাড়লে বোঝাপড়া আছে কিন্তু।

সত্যমিথ্যা ওরাই জানে। ভাটোর অভিজ্ঞ কৃষকেরা দেখেছে, কোন বছর শুক্লপক্ষে বেশি

বৃষ্টি, কোন বছর আবার কৃষ্ণপক্ষে বেশি। আষাঢ়-শ্রাবণের গতিকেই ওরা দেখে নিয়েছে, এ বছর কৃষ্ণপক্ষের পালা। তাই কৃষ্ণপক্ষ নিয়ে আশঙ্কার অন্ত নেই।

কলিমের মাথায় প্লাবন। সীমানা-ভেড়ির দিকেই ওর লক্ষ্য। কেরেচ্ ছিলার দিকে বেশি নজর দেয় না। নিধু শিকারি, ঢালি, কাগ, পাড়ে, সবাই এদিকে পহরে পহরে শুধু চকের পানে তাকায়—ক্ষেত সাদা দেখায়, না সবুজ দেখায়। কেউ কেউ আবার ঘুরে ফিরে যায় নতুন কলের কাছে। ওদেরই হাতে বসানো কল। না, কল ঠিকই জল টানছে হড়্হড়্ করে। লম্বায় ছোট হলে কি হবে, 'ওসারে' বেশ।

ভাটিতে নদীর জলের সমতল কলের নিচে নামলে গল্‌গল্ জল বেরুতে থাকে! আবার নদীতে জল জোয়ারে কলের সমতলে উঠলে জল বেরুনো বন্ধ। ছ'ঘণ্টা অন্তর জো-ভাটির টানা পোড়েন হলেও, কলে সাধারণত জল টানে দিনে মাত্র ছ'ঘণ্টা। দক্ষিণ-ঘেরিতে এবার ওরা একটু উপরেই কল বসিয়েছিল। কলে জল বেরুবার একটু বেশিই সময় পায়, প্রায় আট ঘণ্টা।

ঘুরতে ঘুরতে সেদিন সকালে বৃষ্টি মাথায় পাঁচ-ছ'জন এসে কলের মুখে জমেছে। ইলাহি বলে,—দেখেছো শিকারি, কেমন পানি সরছে। যেন একেবারে কলের জাহাজের চোঙায় গল্‌গল্ ধোঁয়া।

নিধু শিকারি বলে,—ধোঁয়া কিরে, জালগাছটা আনতে পারিস্? কেমন চিংড়ি লেগেছে—দেখছিস, কলের মুখে!

বাউলে বলে,—তোদের মিঠে-পানির বড় তেষ্টা! রাখ্ না কিছু মিঠে-পানি ধরে!

মার্জান বলে,—মিঠে-পানি, মিঠে-পানি, করছিস্ তোরা! ঐ ওদিকে দ্যাখ্, দ্যাখ্!

মার্জান আঙুল দিয়ে দেখাতেই, সবাই উত্তরে তাকায়। বিশেষ কিছুই দেখে না, শুধু সবুজের আস্তরণ, আর সেই আস্তরণের প্রান্তে ভিজে মাটির রঙে দাঁড়িয়ে আছে কেরেচ্ ছিলা। বৃষ্টি ধারার আবছাতেও বেশ দেখা যায় টানা রেখাটা।

সবাই যেন এক বাক্যে জানতে চায়,—কি দেখতে বলছো, মার্জান মেঞা?

মার্জান বলে,—না, কেরেচ্ ছিলা না, ঐ কেরেচেরও উত্তরে। খবর রাখিস্?

বাউলে উত্তরের খবরে বিশেষ ব্যগ্র নয়। এলাহি কিন্তু উৎসুক হয়ে জানতে চায়,—কেন, কি হল আবার?

মার্জান ঘোলাটে করে বলে,—তা বুঝি জান না?···পেরভাস। এসে গেছে। এমন অসময়ে তো কোনো সনে দেখি না। কি জানি, কি মতলবে! কি জানি, কি প্যাঁচের তালে আছে!

নায়েবের নামে কলিমের কান খাড়া। পরক্ষণেই যেন টাল সামলে বলল,—রেখে দাও তোমাদের নায়েব-ফায়েব। প্লাবনের কথায় মন দাও।······অভদ্রা বরষা-কাল, হরিণী চাটে বাঘের গাল। কি জানি কার গাল চাটতে এসেছে!

* * * *

কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। কলিমের আশঙ্কা মত রুদ্রমূর্তি প্লাবন এলো না বটে, এলো প্রবল মুষল ধারা। আজ তিনদিন ধরে একটানা। নদীর বুক স্ফীত হয় না বেশি। স্ফীত হয় ক্ষেতের পানি। সবাই চিন্তিত। উত্তর-ঘেরির লোকের যেন মাথায় হাত। কাছারির দাওয়ায় অনেকে জড়। নায়েব গজরান,—কি হে আনন্দ, শোনাচ্ছিলে হাজার টাকার কথা! এমন

পাকা বাঁধ যে জল সরে না। মাটিচাপান দিলেই বাঁধ? না কল-টল লাগে?

কথার ঢঙে আনন্দ তিরিক্ষিপানা,—কল তো কাছারি বানাবে, না আমি বানাবো! যেমন কল, তেমনি ফল! রদ্দি কলে কত পানি টানবে!

—সময় মত দেখলেই হতো?

—তা সময় মত এলেই হতো? তা না ভাদ্দরে আসা। তাও শেষ ভাদ্দরে।

—আমি থাকি সাত-সমুদ্র পারে। তুমি বাপু কলের গোড়ায়। তা ক্ষতি হলো কার? কাছারির! আর তোমার? এখন ঠ্যালা বোঝো!

আনন্দের খালাতো ভাই উত্তর-ঘেরির ভাগচাষী। চুলে পাক ধরেছে, ধীর স্থির। বিপদকালে অমন ঠ্যাসা-ঠ্যাসি এড়াতে চায়। আনন্দকে লক্ষ্য করে বলে,—বলি, দিক্‌বিদিক্ হারালি যে? পাত্যের ডগা দেখেছিস্? এখনও ডোবেনি, ভাসো-ভাসো। আকাশও হাল্‌কাপানা। রাতের মধ্যে টান ধরলেও ধরতে পরে। দেখ্‌না ভাল করে?

কেউই দেখবার চেষ্টা না করলেও, আশার বাণীতে সকলেই নরমপানা। আরও কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর, কাল যা হয় করা যাবে ভেবে সবাই কেটে পড়ে। পথ যে একটা আছে, সবারই মনে যে তা ধরা দেয়নি, তা নয়। কিন্তু কেউই সাহসভরে সে-কথা অমন খোলাখুলি বলতে পারে না। সে যে সর্বনাশার পথ!!

সে রাতও কাটে। কাটে বটে, কিন্তু উত্তর-ঘেরির মানুষকে হন্নে করে দেয়। হন্নের বদলে কান্না পেত যদি না দক্ষিণ-ঘেরি অমন সবুজ ঢেউয়ে দুলতো। কেরেচের উত্তরে গোটা ভুঁই যেন সাগর বনে গেছে। ক্ষোভে এক একবার বুঝি উত্তর-ঘেরির লোকদের মনে হয়—দাও, সীমানা-ভেড়ি কেটে দাও, নোনা জলে থৈ থৈ করে উঠুক। প্লাবনই আসুক! ভেড়িই যে মিঠেপানি আটকিয়েছে!

নায়েব ও আনন্দ মিলে সলা-পরামর্শ চলে। কাছারি-ঘরের ভেতরই দু'জনে কাছাকাছি বসে। কি কথাবার্তা হয় কেউই তখনকার মত জানে না। লায়লা একবার চৌকাঠের ধারে কি একটা জিনিস হাত্‌ড়ে নিতে এসেছিল,—হঠাৎ নায়েবমশায় বলেন,—পারবে না! লাঠেলের-পো, আছে পথ।

চোখ বড়-বড় করে আনন্দ বলে,—কি?

লায়লাকে দেখতে পেয়ে চুপ। দু'জনেই চুপ!

লায়লা সরে গেল। 'আছে পথ'—দুটি কথা লায়লাকে সচকিত ও চঞ্চল করে দিয়ে গেল।

রান্না ঘরের কপাট সজোরে বন্ধ করে কলস ও বালতিতে অহেতুক শব্দ করে চললো পুকুর ঘাটে। যায় না, যাবার ভান করে। ঘুরে এলো টিপিটিপি পায়ে। চুলে তেল মাখানর ভান করে কাছারি ঘরের দাওয়ার আড়ালে বসে রইল চেপটা হয়ে।

নায়েব ও আনন্দ কথা বলে। সব কথা শুনতে পায় না। তবে যেটুকু শুনলো, সে যে সর্বনাশার কথা! পাগল করে দিয়ে যায় লায়লাকে। সে কি করতে পারে? তার কি করার আছে? ভেবে ভেবে যেন লায়লার কান্না পায়। তার ভাবার যেটুকু দৌড়—সেখানে এসেই বারবার তার চিন্তা স্তব্ধ হয়ে পড়ে—বাউলে! বাউলে!

দুপুর গড়াতেই আনন্দ কাছারি এসে লায়লার কাছে বলে,—শিলটা আছে না? শিলটা দাও তো।

—কেন, শিল দিয়ে কি হবে?

—শিল দিয়ে আর কি হয়?

—গোস্ পাকাবার মশলা হবে বুঝি ?

—হ্যাঁগো ! কুটুম্বু এসেছে কিনা, তাই।

—তা নাও না, ঐ যে রসুইখানার দাওয়ায়। কথা শেষ হতে না হতে নায়েবের ডাক পড়ে। ঘরে ঢুকতেই নায়েব বলেন,—কি ব্যাপার ? কি চায় ?

—শিল-নোড়া।

—তা দিয়ে দাও।

—বলেছিই তো !

—তা ফেরত এলে ভাল করে ধুয়ে-টুয়ে রেখো কিন্তু।

—রাখবই তো।

লায়লা ফিরে এসে দেখে, আনন্দ চলে গেছে। চমকে উঠল—শিল নিয়ে গেছে, কিন্তু নোড়া পড়ে আছে ! কেন ? তাড়াতাড়িতে, না আর কিছু !

সকালে পাতি দিয়ে শোনাকথা এতদূর গড়িয়েছে। পাগলা হয়ে ওঠে লায়লা। কাছারি থেকেই যেন পাগলা-মনে শুনতে পায় ঘস্ ঘস্ শব্দে পাথরে ঘর্ষণে তীক্ষ্ণতা আনছে বর্শা-ফলকে।

লায়লা আর থাকতে পারে না। তবু দাঁত কামড়ে পড়ে আছে। আগে গেলে নায়েব যে বুঝে ফেলবে !

ছুটেছে লায়লা, সন্ধ্যা হতে না হতেই। হাঁফ ধরে গেছে বুঝি লায়লার। সেদিন যেমন জেরাবদি হাঁফাতে হাঁফাতে নায়েবের খবর দিয়েছিল, আজও তেমনি লায়লা হাঁফাতে হাঁফাতে জেরাবদির দু-বাহু দু-হাতে ধরে বলে,—যা সোনা, যতো শিগ্‌গীর পারিস যা, বলে আয়।

—কার কাছে যাব ?

—বাউলে, বাউলের কাছে।

জেরাবদি অবাক্,—কি বলব ?

—বলবি, সর্বনাশ হয়ে গেল। সর্বনাশ, সর্বনাশ হয়ে গেল !!

—কিসের সর্বনাশ, ভাবি ?

ভাবি এতক্ষণে একটু শান্ত বুঝি। বুকের হাঁফানি, বুকের যন্ত্রণা বুঝি খানিকটা উজাড় হয়েছে। একটু শান্ত হয়ে দম নিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে,—বল্‌বি, নায়েব আর আনন্দ। আজই কেরেচ ছিলা কাটবে। আজই কাটবে। যা, শিগ্‌গীর নোড়া, শিগ্‌গীর !

জেরাবদি ছুট্ দেয়। লায়লা আবার চিৎকারে ডাকে। হাতের ইশারায় ফিরিয়ে আনে। বলে,—শোন্, বল্‌বি ওরা নিশ্চয় লাঠি-সোটা, অস্ত্রপাতি নিয়ে আসবে। বল্‌বি, লায়লা বলেছে। ওরা নিশ্চয় কাটবে। যা,…নোড়া ! নোড়া !

জেরাবদি তো নোড়াবেই। সে তো দক্ষিণ-ঘেরির এখন সোমত্ত চাষী ! আজও দৌড়, কালও দৌড়। ভেড়ির ওপর শক্ত আঠালো কাদা। জোরে হাটতে গেলেই পা যেন টেনে ধরে। তাই ভেড়ির কোলে কোলে দৌড়ে গেল যেন হরিণের মত।

কিন্তু অমন দৌড়ে গেল, এখনও তো ফেরে না। লায়লা ঘরের আঙিনায় যেন ছট্‌ফট্ করে। কত কাজ পড়ে আছে। কাজে হাত দেয়, কিন্তু যে কাজেই হাত দেয়, তার আর শেষ হয় না। ওঠে, বসে, এ-ঘর ও-ঘর করে। আঙিনার কাদায় পায়ে পায়ে ঘর কুটে গেল। নাঃ, এ তো সহ্য হয় না ! পহর কেটে যায় যেন। তবে কি জেরাবদি বাউলেকে পায়নি !

লায়লাও এবার হন্‌-হন্‌ করে ছোটে বাউলের ঘর লক্ষ্য করে। সেই যে সে-দিন এসেছিল ভোর সকালে বীজ-ধানে হাত দেবার খবর নিয়ে,—তারপর আর লায়লা এ-মুখো হয়নি। কই সে-দিন তো এমন ছুটতে হয়নি। আজ যে তার দমে যেন কুলোয় না। ছুটে এসেছে ; কাকে ডাক্‌বে ? থমকে দাঁড়িয়ে প্রথমে আস্তে ডাকবার চেষ্ট করে,—ফুফু ! ফুফু !

সাড়া পেতেই জোরে জোরে ডাকে।

—কে, কে-রে ?

—আমি লায়লা।

—আয়, আয়, কি বৃত্তান্ত ?

—জেরাবদি এসেছিল ?

—এসেছিল, এই তো এসেছিল। কলিমই তো তাকে কোথায় ব্যস্ত-সেস্ত হয়ে পাঠাল।

—ওঃ !

—পাঠিয়েই কলিমও তো কোথায় উধাও। কি যে ছুটোছুটি লাগিয়েছে ! ওদের কাণ্ড !

—ওঃ !

দু'জনে একটু চুপ। লায়লা মুখ ঘুরিয়েছে,—আসি তাহলে।

—বস্‌লি না ? তোরা যে কি !

—না, আজ না ফুফু।

পঁচিশ

বাউলে ? বাঘের বাউলে এখন বাঘ তাড়াতে ব্যস্ত। বাঘ রুখে দাঁড়াবার মতই আয়োজন।

আকাশ দম মেরেছে। হয়ত নিদারুণ ধারার পূর্বাভাষ। মেঘেরও তো তোড়জোড়ের অবকাশ চাই। বাউলের তোড়জোড় আর কি ! শুধু হাতেই বাঘ তাড়াতে অভ্যস্ত। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, তাতে মেঘলা আকাশ। মিশমিশে কালো চারিদিকে। বিদ্যুৎও ভাল করে চমকায় না যে কলিম দেখে নেবে, কারা কারা এসেছে। জটলা বেশ বড় হয়েছে।

বাউলে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে জোরেই বলে,—মরদের বেটা না তোরা ! তোদের চোখের সামনেই এত বড় কাণ্ড। কেটে দেবে কেরেচ ছিলা ! চল্‌, ভিটে ছাড়া করব শালাদের !

কলিম সেই ফেটা বেঁধে ফেলেছে মাথায়। পাশ দিয়ে পেখম ঝুলছে। পেখমের ঝাঁকা মেরে মেরে লুঙ্গি গোটো করে। উরু ছাড়িয়ে মালকোছা ওঠে। মুখে তুই-তুকারি।

কে একজন জটলা থেকে বলে,—তা বাউলে, অস্তর-সস্তর ?

—হ্যাঁ নিবি তো। যা পারিস্‌ নিবি। দাঁ, কুড়ুল, লাঠি সোটা। হ্যাঁ কোঁচ্‌ থাকে তো তাও নিবি......

হঠাৎ কিসের একটা অভাব মনে হতে থাকে। চুপ মেরে যায় বাউলে। রাতের অন্ধকারে সে তো কোনদিন বাঘ তাড়ায়নি। অন্ধকারে দলে ভারির কথা তো বাঘকে সমঝানো চাই !......ঝটিতে মতলব খেলে গেল। জটলাতে একে অন্যের অস্তরের হিসাবে সোরগোল। চাপা গলায় বাউলে যেন গর্জন করে,—শোন্‌, মশাল, অনেক মশাল বানা আগে। যে যা পারিস্‌। পাতকাটি আছে তো, কুটো আছে তো ? যা, যা সব ছোট্‌, নোড়া। মশাল, অনেক মশাল চাই !

বাউলের রক্তে রক্তে শিহরণ। বনের স্তব্ধতার সামনে এই শিহরণ তার শিরায়

অনেকবারই অনুরণিত হয়েছে। বাউলে একদল নিয়ে পূবের ভেড়িতে। সর্বাগ্রে। সর্ব আপদে সর্ব সময়েই সে সবার আগে। তা না হলে বনওয়ালি কিসের ? কলিমের অনুমান, শালারা আসবে পূব-ভেড়ির পথেই।

পশ্চিম-ভেড়ির কোল ধরে আরেক দল। নিধু শিকারি সে দলের নেতা। বন্দুক ছাড়া তার অবশ্য কেমন কেমন লাগছে।

বাউলের তিনটি কড়া নির্দেশ। সে নিজে মশাল জ্বালালে তবে অন্য সকলে তখনই একই সঙ্গে মশাল ধরাবে। পূব ও পশ্চিম ভেড়ির সকলে। তবে মশাল মজুত চাই অনেক ; সারারাত জ্বালাতে হবে আগুন, মশালের আগুন।

দ্বিতীয় কড়া আদেশ, কেউ কখনও মশাল হাতে করে পেছনে যাবে না। কারও পেছনে বা কোথাও যেতে হলে, খালি হাতে যেতে হবে। মশাল থেকে পিছু হটার যেন কোনও ইঙ্গিত না পায় শালারা। হটা-হটির কারবার নেই আজ।

তৃতীয় আরও কড়া আদেশ,—মশাল ধরবার পর এগুতে হবে, চিৎকার করে গালি দিতে দিতে। কিন্তু খবরদার দৌড়ে এগুবে না। থেমে থেমে এগুতে হবে, ঠিক কলিম যতটুকু এগুবে। শেষ-বেশ কেরেচের মাঝ পথে দু'দলে একত্রিত হবে।

বাদার নিরস্ত্র মানুষের হিংস্র জীবকে হটাবার কি অভিনব কৌশল !

* * *

এদিকে লাঠেলের এক ভিন্নতর পরীক্ষা। সে লাঠিয়াল। লাঠির আঘাত তো চোরা-গোপ্তা পথে চলে না। সামনা-সামনি কাজিয়ার হুঙ্কারে এগুতে হয়। এ যে চোরা-গোপ্তা আঘাত হানতে হবে। শুধু তাই নয়, ভয়ঙ্কর অবিচারে দক্ষিণ-ঘেরির গোটা মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিতে হবে। তা হোক্, তা না হলে যে তার নিজের গোলা শূন্য হয়ে পড়বে আগামী সনে। তাছাড়া, তাদের হাতে আছে নতুন করে ঝলসানো বর্শা-ফলক। তার ওপরও আছে বন্দুক। পারবে সে, বুধো লাঠেলের পো।

কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয় প্রহরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নায়েব পেরভাস আনন্দের হাতে একটা চমক্-বাতি দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করলেন,—এই নাও, ক্ষেতের কিনারায় জল ভেঙে ভেঙে যায় যেন। খবরদার ! ডাঙ্গা পথে না। পায়ের যেন কোন চিহ্ন না থাকে।

চোরার ধরা পড়ার ভয় অনেক। লাঠেল বলে,—আমাকে শিখোতে হবে না !

নায়েব আবার ফিস্‌ফিস্ করেন,—জানতো, ছিলের কোথায় কোথায় কাটতে হবে ?

—তা আর জানি না ! এতকাল এই কম্ম করলাম !

আনন্দ জানলেও নায়েব তবুও সাবধান করলেন,—খবরদার !

কেরেচের যেখানে গরু নামে ! বুঝলে ?

বোঝাবুঝির তেমন কিছু নেই। কালই হয়ত নায়েবকে দক্ষিণঘেরির মানুষের মুখোমুখি হতে হবে। তখন তো বুঝ দিতে হবে, এমন অঘটন ঘটার—গরুর হাঁটাহাটিতে তোমরাই কেরেচ্ নড়বড়ে করেছ। তারই ফল। উত্তর-ঘেরির এত জলের চাপ কেরেচ্ ছিলা সইবে কি করে !! জলের তোড়েই ভেঙেচে, অপরে এ সর্বনাশ করতে যাবে কেন !

করাল অন্ধকারে করাল বিষধর সাপের মত উত্তর-ঘেরি থেকে একদল মানুষ লাইন দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে। যেন নিঃশব্দেই চলেছে। ওর জানে, হাঁটুজলে কেমন করে নিঃসাড়ে

যেতে হয়। তা হলেও শব্দ একটু-আধটু যে হয় না, তেমন নয়। হলেও, তা দক্ষিণ-ঘেরিতে পৌঁছে না। তেমন শব্দ না হলেও, আলো ?......টর্চের হঠাৎ এক ঝলকানি বাউলের চোখে ধরা দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে যেন এক প্রলয় কাণ্ড। দক্ষিণ-ঘেরির ভেড়ি মশাল আর মশালে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। এত লোক তো দক্ষিণ-ঘেরিতে নেই! না, শুধু মরদেরা নয়, ছেলে-ছোক্‌রার দলও বুঝি এসে জুটেছে।

আনন্দের দল থ মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে। অনেক দূর ওরা এসে পড়েছে। বিফল হয়ে ফিরে যাবে ? না, তা হয় না। দাঁড়িয়ে আছে। রোখের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে আনন্দ। এত বড় সাহস! আমাদের সঙ্গে লড়তে এসেছে!......আমাদের কি চিনে ফেলেছে, জানতে পেয়ে গেছে ? রুখে এসে লড়তে চায় ওরা...না, তাতো নয়, ঐ তো ওরা থেমে গেছে। এইবার, এইবার ওরা ভয়ে পালাবে। ছুটে আক্রমণ করব ? কেরেচ ভেঙে সব একাকার করে দেব ? তাই দিই।......না, ওরা চিৎকার তো থামায়নি। ঐ তো মশাল আবার এগুচ্ছে। তাহলে এবার লাঠালাঠি করতে চায়। বুধো লাঠেলের পো'র সঙ্গে লাঠালাঠি। সাহস বলিহারি! মশাল আর কতক্ষণ জ্বলবে ?......বন্দুক চালিয়ে দেব ?......না, ওরা আবার থেমেছে। ওরা জানতে পারেনি আমরা কোথায়, আমরা কারা।......তেড়ে আসছে না তো ওরা।...গড়াম্ করে বন্দুকের আওয়াজ!......নায়েব, নিশ্চয় নায়েব, পেছন থেকে গুলি করেছে। আনন্দ চুপে-চুপে আদেশ দেয়,—পাশ নে, ভেড়ির কোল ঘেষে। দেখছিস্ না পেছন থেকে নায়েব বন্দুক চালাচ্ছে! গুলি খেয়ে মরতে চাস্ ?

......গুলির আওয়াজ! যেন বাঘের হুঙ্কারে বাউলের রক্ত এদিকে নেচে ওঠে! ভীষণ চিৎকারে এগিয়ে যায়। আবার থেমে যায়। মশাল থেমেছে কিন্তু ওদের তড়পানি তীব্র, আরও তীব্র। বাঘের হুঙ্কারের প্রতিবাদে পাল্টা হুঙ্কার যেন।

...আনন্দের দো-মনা ভাব বুঝি কেটে যায়। তাকিয়ে আছে মশালের দিকে বড় বড় চোখে। না, মশাল তো এদিকে এগিয়ে আসে না। দু-পাশ থেকে কেরেচ্ ছিলার ওপর চলে গেল যে......না, ওরা আমাদের সঙ্গে লড়ালড়ি করতে চায় না। আমাদের দেখতেও পায়নি, চিনতেও পারেনি......গায়ে পড়ে লাঠালাঠিতে লাভ নেই। আনন্দ মুখ খোলে,—দেখছিস্ কাণ্ড ? নায়েব আমাদের পেছন থেকে বন্দুকের চোট্ করছে! চল্, ফিরে চল্।

কেরেচ্ ছিলায় মশাল পুঁতবার পর বাউলে এগিয়ে গেছে অন্ধকারের আড়ালে। দেখবার জন্য, ব্যাপারখানা কি। দেখেও স্পষ্ট, সুড়সুড় করে উত্তর-ঘেরির দল চলে গেল ভেড়ির ওপর দিয়ে।

ফিরে এসেই বাউলের এক জয়ের উল্লাস। বাঘ তাড়াবার উল্লাসই বটে! অবশেষে উন্মত্ততা স্তিমিত হলে বেশ গম্ভীর গলায় বলে,—খুব তোরা! অস্তর-টস্তর আনতে বললাম। খুব এনেছিস্ অস্তর!

সবাই অবাক। ভাবে, বাউলের এমন রাগ কেন ? কি আনতে জানি ভুল করেছে! কেরেচে এসে গেছি, এখন আবার অস্তরের কথা বলে কেন ? সচকিত সবাই।

বাউলে ফকির দাব্‌ড়ি লাগায়,—এনেছিস্ ?......এনেছিস্ হুঁকো-কলকে ? জেরাবদিকে এক ধাক্কা মেরে বলে,—যা ছুট্রে যা : যে-কটা পারিস্!

ছাব্বিশ

ভোরে যে যার ঘরে ফিরেছে। কেউ ভাবেনি, রাত এমন ভাবে ভোর হবে। মেঘ কেটে গিয়ে ভোরের সূয্যি সোনালি রঙ ঢেলে দিয়েছে দক্ষিণ-ঘেরির ধানের সবুজ পাতায়।

নাস্তার বেলা হতেই নায়েবমশায় ডেকে পাঠিয়েছেন নিধু শিকারিকে। আজ একলা যেতে ওর ভয় ভয়। বাউলের বাড়ির পথে পরামর্শের জন্য এসেছিল। কলিমের কথামত ইলাহিকে সঙ্গে নিয়েই গেল।

দু'জনে মিলে কাছারিতে পা দিতেই নায়েব অতি ব্যগ্র হয়ে বলেন,—কি গো, কাল তোমাদের ঘরে কি হয়েছিল ? ডাকাত পড়েছিল নাকি ?

নিধু হেসে বলে,—না, নায়েবমশায়, কারা যেন আমাদের কেরেচ্ ছিলা কাটতে এসেছিল।

—সে কি ! তোমাদের কেরেচ্ কাটতে ? অমন সুন্দর গোছা হয়েছে ! এতো হিংসে-হিংসি ?

ইলাহি বলে,—শত্তুরের কি অভাব, নায়েবমশায়। কত লোকের কত শত্তুর থাকে !

—তা, কিছু করতে পারেনি তো ?

—না, নায়েব মশায়, আমাদের জান কবুল। অতো সহজ না !

—এই তো আমরা চাই। তোমরা আছ বলেই তো ধান-টান কিছু হয়। ......এদিকে কি হলো জানো ? আমি ভাবি, ডাকাত-ফাকাত হবে। তাই, ভয় দেখাতে বন্দুকের চোট্ করলাম।

—ও, তাই নাকি ! আমরা ভেবে মরি, শত্তুররাই বুঝি গুলি চালিয়েছে !

নায়েবী কায়দায় বাইরের ঠাট ঠিকই থাকে। তা না হলে নায়েব কেন ?

কিন্তু ঠাট যে অন্যত্র না থাকার উপক্রম। সন্ধ্যার কাছারি-দাওয়া। একে একে সবাই চলে গেছে। লায়লাও। লায়লা আজও ঠিকমত এসেছিল। মনে আজ যেন তার কোন গ্লানি নেই। গত এক বছর ধরে যেন তার মনে পানি-ছাড়া মাছের মত অনুভূতি খোঁচা মেরেছে অনবরত। চকের মানুষের সঙ্গে তার যোগ যে ছিল না, এমন নয়। অন্য সংসারের নানা আপদে বিপদে হাজির সে হত, তবু কি জানি, এক মানসিক জড়তা পেয়ে বসেছিল কাছারিতে কাজ নেওয়া অবধি। কিন্তু কেরেচ্-হাঙ্গামার অংশীদার হয়ে আজ সে-জড়তা থেকে লায়লা মুক্ত। মুক্তির আনন্দ তার দেহ ও মনে। আজ এই মুহূর্তে কারণে ও অকারণে অতি স্বচ্ছন্দেই তার নারীদেহের ঝল্সানিতে ও কথার বাহারে যে-কোন পুরুষকে খেলাতে পারে, আসক্তিতে সিক্ত করে দিতে পারে যেন। এমন ভাবে পারে যে, তার নিজের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগবে না। এমন ভাব বোধহয় সকল নারীর জীবনে একবার না একবার আসে। লায়লার দেহ ও মনে আজ যেন তারই জোয়ার।

এই তো আজ সকালেই যখন সবে জটলা জমে উঠেছে কাছারিতে, লায়লা সবার মাঝে অবাধ গতিতে এসে বলে,—ভাগ্যি, নায়েব মশায় চোট্ করেন। তাই তে তো সব ভাগলো। কি ভাগ্যি আমাদের, নায়েব মশায় এমন সময় বাদায় এসেছিলেন। নইলে কি হতো বলো তো !

কোন ঠাট্টার সুর নেই কিন্তু। নায়েব নড়েচড়ে বসলেন। উত্তর ও দক্ষিণ ঘেরিরও লোকজন আছে। অনেকেই আছে। আনন্দও ছিল। আনন্দ বলে,—তা, বলতে পারো,

কারা ? কারা এসেছিল ?

—তা, আমি মেয়েমানুষ। অতো-শতো কি বুঝি ! তা, এসেছিল নিশ্চিত। তা না হলে অতো হাঙ্গামা হুজ্জুত !

—তোমার দোর গোড়ায় বলতে গেলে। অত কাছে থেকেও কিছুই বুঝতে পারনি ?

—বলিহরি তোমার বুদ্ধি ! আমি তখন তো কাঁথামুড়ি, বালিশ জড়িয়ে ধরে। কি ভয় বাপ্‌রে ! ভয়ে মরি, ডাকাত পড়েছে বুঝি !

নায়েবের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে,—বলুন তো নায়েব মশায়, আপনারা হলেন মিন্‌সে লোক। বন্দুক হাতে ডাকাত তাড়াতে পারেন। আমরা মেয়েমানুষ, তাও একলা। ভয়ে বালিশ জড়িয়ে ধরব না তো কাকে জড়িয়ে ধরবো !

আনন্দের দিকে আবার ঘুরে বলে,—হ্যাঁ, বলো মোরগ-মশল্লা করতে। এমন পাকাবো, তাক্ লেগে যাবে। পারবে ? পারবে মেয়েমান্‌ষের সঙ্গে ! বুঝলে, যার যা কাজ ! —বলেই মিষ্টি হেসে মুখ ঘুরিয়ে মুখরা লায়লা চলে যায়। আনন্দের চোখ ছানাবড়া হয়ে থাকে তখনকার মত।

সারাদিনের নানা ভাবনা চিন্তার পর আনন্দ এখন কাছারি এসেছে। নায়েব একাই আছেন ! আনন্দ বেশ কড়া মেজাজে গুরুগম্ভীর হয়ে বলল,—নায়েব মশায়, আপনি যাই বলুন, ওরা আগে ভাগে সুলুক-সন্ধান পেয়েছে। ঠিক পেয়েছে।

—কিসে বুঝলে ?

—এতে বোঝাবুঝি লাগে নাকি ? তা না হলে অতো তোড়জোড় করে কি করে ? তোড়জোড় বলে তোড়জোড় !

—তুমি বলছ বটে, আনন্দ, কিন্তু কে আছে আমাদের হাঁড়ির খবর ওদের কানে দেবার ? আমি আর তুমি ছাড়া কেউই তো জানতো না !

—নিশ্চিত আছে। না থাকলে জানলো কি করে ?

—কে, কে হতে পারে ?

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ বলে,—আমার কি সন্দেহ জানেন,……বলেই হাত তুলে রান্নাঘর দেখিয়ে দেয়।

—বলো কি !!……না,……লায়লা লক্ষ্মী মেয়ে। কেমন আমার ঘরদোর গুছিয়ে রাখে।……আর ও-সব খবর জানবে কোত্থেকে ? না, লায়লা হতে পারে না। তুমি ভুল করছ !

—না, আমার সন্দেহ ঠিকই !

—কাল তো তুমি জেরা করলে, দেখলাম। অবিশ্বাস করবার মত কোন কথা পেয়েছিলে ? আমার তো মনে হয় না।

—না, নায়েব মশায়, আমার ঠিক মন বলছে, ওই ! তা এক কাজ করুন। মেয়েমানুষকে নজরে রাখা যাই তাই কথা নয়। ও না হয় আমার ঘরেই দিন কতক কাজ করুক। মেয়েমানুষই মেয়েমানুষকে ঠিক নজরে রাখতে পারবে। কি বলেন ?

—কথাটা অবশ্য ঠিক। তবে কি জান ? হঠাৎ কিছু করা !……না, হঠাৎ কিছু না করাই ভাল। বিগড়ে গেলে, একুল ওকুল দুকুল যাবে। দেখি ভেবে !

ভাবতে দায় পড়ে গেছে নায়েবের। পরদিন সকালে লায়লা এলে যেন নায়েবের উৎসাহ

দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। আনন্দের কথায় সন্দেহ না জাগলেও, শঙ্কা এসেছে—যদি আনন্দ লায়লাকে ওর বাড়িতে নেবার জন্য উঠে পড়ে লাগে।

—তা লায়লা, রান্নাঘর গোবর দিলে না?

—দেব না কেন। সময় হয়নি। সময়মত ঠিক দেব। হাতের কাজ সারি আগে।

সময় হওয়ার অপেক্ষায় নায়েব বসেই থাকেন রান্নাঘরের ভেতর। কে এসে যে বাইরে হাঁক দিল,—নায়েব মশায় আছেন নাকি?

—আমি রান্না ঘরে যে।

রান্নার কাজে একবার বসলে বাইরের কেউই কাছে আসে না। তেমন আসা এদেশে রীত-ব্যবহার নেই। যে এসেছিল আঙিনা থেকে চাপা গলায় উষ্মা জানিয়ে গেল,—এই ভোর সক্কালে রান্নাঘরে!

নায়েব বসে আছেন, এটা-ওটা নাড়ানাড়ি করেন। লায়লা বোঝে। তাড়াতাড়ি এসে যায়। তা অমন দু'একটা মিষ্টি কথা তো। কি আর এসে যায়। লায়লা সুগোল বাহুখানা আরও লম্বা করে নিকোতে লাগে। অমন করে নিকোলে তবনের ছোট আঁচল কতখানি বা আগল দিতে পারে। নায়েবের মন ধরে। বলেন,—লায়লা তোমার নিকোনো কি সুন্দর! যেন মাটিতেই ভাত বেড়ে খাওয়া যায়!

লায়লা বাহুর আড়ালে মুখ নিয়ে হাসে। স্তব্ধ বাহুর আড়ালে মুখ রেখেই বলে,—এতো পেশংসা ভালো না কাজে মন থাকবে না যে!

—যাও, তা হবে কেন? যে ভাল তার সব ভাল।

—যান্, ভাল হলেও কত খুঁত থাকে!

—খুঁত! তোমার খুঁতও তো ভাল!

নায়েবের কথা অসংলগ্ন যেন। তা হলেও তার মধ্যে সুর আছে। লায়লার কানে সে সুর ধরা যে পড়ে না—তা নয়। তবু লায়লা আজ অজানিতে যেন বর্মাবৃত হয়ে আছে। কোন সুর তাকে স্পর্শ করবে না—মনের অজানিতে এমনই এক আত্মবিশ্বাস।

স্পর্শ করবে না ভাবলে কি হবে। স্পর্শ করাবার অপরের আকাঙ্ক্ষা বেপরওয়া হয়ে উঠতে কতক্ষণ! বলতে গেলে এ পাড়ার সবাই আজ বগার-হাটে গেছে, বগার-হাট খুবই নিকটে। স্রোতের টানে মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের পথ। ভাটো লাগবে সন্ধ্যায়। তখন হাট থেকে রওনা হয়ে ফিরবার পথে কেউ কেউ কাছারি আসবে হয়ত এক ছিলুম খেতে। তার তো অনেক দেরি। যেদিন মিন্সেরা এমন করে হাটে যায়, ঘরের বিবিরা এদিক-ওদিক একটু-আধটু ঘোরাফেরা করে। তারাও সন্ধ্যা হতে না হতে কাছে-পিঠে কোথাও নেই।

লায়লা ঘরে ফিরবে ফিরবে করছে। সারাদিনই নায়েব তার পাশে পাশে গুন্‌গুন্ করেছেন। শেষবারের মত কাছারি ঘরে লায়লা তামাক দিতে এলে নায়েব এবার স্মিত হাস্যে বলেন,—আজ তুমি এক্ষুণি যেতে পারবে না, লায়লা। আমি খাওয়া দাওয়া সারি। তারপর যাবে। কেমন?

—না, তা হয় না। আমার ঘরের কাজ-কম্ম নেই বুঝি! জেরাবদি হাটে গেছে। হাট থেকে এসে পড়লো বলে।

—বেশ, তাহলে একটু বসো এখানে। —বলেই গড়গড়াটা সরিয়ে জায়গা করে দেন।

লায়লাও আজ সারাদিন নায়েবকে অনেক খেলিয়েছে। হাসিরও বুঝি একটা রেশ থাকে। সে রেশকে মুখে ফেলতেও বোধহয় সময় লাগে। সেই রেশের ঝুলে লায়লা গোটো হয়ে বসে পড়ল।

বসতেই জালের মধ্যে মাছ পড়লে যে-ভাবে ধরে তেমনি ভাবে নায়েব খপ্ করে লায়লার বাহু ধরে ফেললেন।

মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটতে চলেছে বুঝি। লায়লা ঝট্ করে উঠে পড়েছে। যেন শান্ত ভাবেই বলতে চেষ্টা করল,—না, তা হয় না।

প্রভাংশু হালদারের অনুনয় সুর,—অমন করো না লায়লা! কি চাও তুমি, বলো? বলো.?

লায়লা এক ঝাঁকানি মারে বাহুতে। কৃষক রমণীর বাহুতে এতো শক্তি থাকে! আরও সজোরে চেপে ধরে মিত্তির কাছারির নায়েব হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন,—ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! জানো না আমি কে? মঠবাড়ির নায়েব!!

লায়লা এবার ক্ষিপ্ত প্রায়,--দেখেছি নায়েবের মুরদ! —বলেই এক হেঁচকা টানে বাহু ছিনিয়ে নিল নায়েবের আসক্তি ক্ষিপ্ত হাতের মুঠো থেকে। উর্ধবশ্বাসে অর্ধউন্মুক্ত কপাটে সজোরে শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল হন্ হন্ করে।

—দেখে নেব! দেখে নেব!—পেছন থেকে মৃতপ্রায় শ্রেণীর প্রতিভূ এক মানুষের শাসানি লায়লার কানে গেল কিনা লায়লাই জানে। ছুটেই চলেছে সে। পায়ে পায়ে তবনের সেই ছপ্ ছপ্ শব্দ। বাহুতে জ্বালা করে। বড্ড জোরে ধরেছিল বুঝি! হাত দিয়ে দেখে লায়লা। অন্ধকারেও দেখা যায়, হাত রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। সোনার আংটির আংটোতে এত ধার!

নায়েব বোধহয় এতক্ষণে তার হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করছেন। সে ধুয়ে ফেলবার মধ্যেও বোধহয় নায়েবী কায়দা আছে। সারা রাত ধরে নায়েব ভেবেছেন,—জব্দ! জব্দ করতেই হবে। শেষ রাতে আরেক ভাবনা পেয়ে বসে,—বে-হিসেবী কাজের হিসেব তো আগে মেলাতে হবে। তারপর জব্দ-ফব্দের কথা ভাবা যাবে। দক্ষিণ-ঘেরির লোক যদি আগেই হিসেব মিলিয়ে নিতে চায়, তা'হলে সব গড়বড় হয়ে যাবে যে!

ভোর না হতেই নায়েব আনন্দকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আনন্দ আসতেই নিজের কপালে হাত দিয়ে বললেন,—আনন্দ তুমিই ঠিক্।

এক কথায় আনন্দ অনুমান রে নিয়েছে। তবু ঝুল টেনে বলে,—কিসের ঠিক্-বেঠিক্?

—না, তুমি যা বলেছ ঠিক্। ঐ শালীই ঠিক্! কেন বলছি জানো?

—কেন কিছু হয়েছে নাকি?

—ডাকাত। জানো কাল আমি দু'শ টাকা রেখেছিলাম বিছানার নিচে। শোবার আগে ঘুমের ঘোরে আর দেখিনি। মাঝরাতে উঠে দেখি, সে টাকা নেই। কই, কাল আর কেউ তো কাছারি আসনি। এক ঐ শালীই ছিল। ঠিক্ ও নিয়েছে।

আনন্দ গর্জে ওঠে,—চলুন, এখনই চড়াও করি। গলা টিপে টাকা বের করব না!

ওদের এত বোকা ভেবেছ? কোথাকার টাকা কোথায় পাচার হয়ে যাবে না! হাতে-নাতে টাকা ধরতে হবে। তা না হলে আমাদেরই নাজেহাল। মেয়েমান্‌ষের ব্যাপার তো!

আনন্দ হোঁচট খেয়ে যায়। মাথা নিচু করে বলে,—তাহলে তো একটা পথই খোলা।......থানা।

—অভিজ্ঞ লোক হয়ে তুমি এই কথা বললে! থানা কি এখানে? দু'জো'র পথ। তারপর দু'শ টাকা উদ্ধার করতে পাঁচ-শ টাকা খরচ করব?

—তা হলে ?

—এক কৌশল কর। টাকা যা গেছে, গেছে। ওকে জব্দ করা চাই, আর যাতে জীবনে এ-কাজ না করতে পারে। মাগীর মাগ্‌গিরি ভাঙতে হবে। পারবে না ?

আনন্দ উৎসাহিত। বলে,—ঠিকই, কিন্তু পথটা কি ?

—পথ পাচ্ছ না ? চাউর করে দাও ঘটনাটা ! চোর ! ছ্যাচ্‌ড়া চোর ! এই সকাল বেলাতেই। এ-পাড়া, ও-পাড়া, সব পাড়া। যাও, এই কাজটা করো দেখি ?

মঠবাড়ির মত ছোট্ট জায়গায় এমন মুখরোচক খবর চাউর করতে সময় লাগবার কথা নয়।

সাতাশ

ওটা কথার কথা। মুখরোচক খবরও চাউর হতে একটু সময় লাগে মঠবাড়িতে।

দক্ষিণ-ঘেরির মানুষ কেমন করে সহসা বিশ্বাস করবে লায়লার এই অপবাদ। সময় লাগে।

সময়ও লাগে কলিমের মনের হিসাব মেলাতে। নায়েব ঠিকই তার বে-হিসাবী কাজের হিসাব মিলিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু কলিম ?

কেরেচ্‌-হাঙ্গামার দিন কলিমের অন্য কোন কথাই মনে ছিল না। সেদিন যেমন হাঙ্গামা মিটবার পরক্ষণেই কলিমের মনে পড়েছিল হুকোর কথা, তেমনি হাঙ্গামার রাত কাটবার পর থেকেই বাউলের মন ঘুরেফিরে লায়লা ঠাগ্‌রোণের কথা পেয়ে বসে। হিসাব মেলাতে চায় মন। সেদিন যে-লায়লা সর্বানুবিবির বিপদের বার্তা এনে দিয়েছিল,—এও, এও তো সেই লায়লা কেরেচ্‌-কাটার বিপদ মুহূর্তে ছুটে এসেছিল ! প্রথম অবশ্য জেরাবদি আসে। কিন্তু ফুফু যে কতবার শোনাচ্ছে—লায়লা এসেছিল, লায়লা এসেছিল।......মন বাগ মানে না......মনে পড়ে সেই বাউলে-মন্ত্র নেবার দিনের কথা...চোখ বুজে ফেলে কলিম,...স্পষ্ট দেখতে পায় কতগুলি লাউ ঝুল্‌ছে মাচায়...হ্যাঁ এ তো সেই লায়লার আঙিনা !

না, আর দেরি করা ঠিক নয়। মন ছুটে যেতে চায়। ঐ, ঐ কে ছুটে যায় ভেড়ির ওপর দিয়ে ? জেরাবদি না ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, জেরাবদিই তো !...কলিম চিৎকার করে ডাকে,—জেরাবদি, ও...জেরাবদি। —জেরাবদি অনেক দূরে। শুনতে পায় না বুঝি। কলিম আরও, আরও জোরে ডাক পাড়ে। জোরে ডাকতে গিয়েই কেমন যেন কলিমের বুকের আকুলতা ঝরে পড়ে সে ডাকে। ভোরবেলাকার শুভ্র আকাশের প্রান্তে 'আজানের' মাঝে যে-আকুলতা ধরা দেয় ভক্ত মনের কাছে।

আহ্বান শুনে জেরাবদি ছুটে আসে। সেও বুঝি আসবার জন্য ব্যগ্র হয়েই ছিল।

—কিরে ! লায়লা ঠাগ্‌রোণের খবর কি ?

—খবর আর কি দেব ?

—কেন, ও-কথা বলছিস্‌ কেন ? এখন কোথায় ? কাছারি থেকে ফিরবে কখন ?

—না, বাউলে ! ভাবি আর কাছারি যায় না। কাছারি যাওয়া বন্ধ।

—কেন, কি হলো আবার ?

—কি হবে ? কাছারি আর যাবে না বলেছে। বাউলে, তুমি একদিন যেও। —জেরাবদি এ-কথা সে-কথা শুনেছে। নিজে সে-কথা ভাঙতে চায় না। কোথায় তার যেন বাধে।

—বলিস্, ঠাগরোণকে বলিস্, কাল ভোর গোনে যাব। বুঝলি ? যা এখন।

ভোর বেলার কথা বলল কেন, তা কলিমও জানে না। মুখে এসে যায় তাই পিঠপিঠ বলে ফেলে। এত দিন, এত মাস কি করে অপেক্ষা করেছিল কে জানে। এখন যে ভোর অবধি অপেক্ষা করা দায় হয়ে পড়েছে। দায়টা হয়ত বেশি হতো না, হয়েছে ফুফুর কাতরানিতে।

ফুফু তখন শুনেছে, জেরাবদিকে কলিমের ডাকাডাকি। সেই অবধি ফুফুর বকবকানির বিরাম নেই। প্রতিবারই অনুরোধ-উপরোধেরও শেষ নেই,—তুই কি রে !···তোর বুঝি দয়া-মায়া নেই পরাণে !···তোর ইচ্ছে নাই বা হলো, তারও তো একটা আশ্-টাশ্ আছে ! না কি ?······চোখের দেখা আর মুখের কথা তো !······যাবি, আসবি। বিপদ-আপদে তো ওকেই ডাকতে হয়।—এমনি কত অনুযোগ অভিযোগ তার ঠিক নেই। তবু কলিম ভাঙে না। মনে মনে অবশ্য ভোরেই যাওয়া মনস্থ করেছে। বাউলের আশঙ্কা,—অনেকবারই তো যাবে যাবে ভেবেছে, তবু যাওয়া হয়নি। এবারও যদি না যাওয়া হয় !

না, যাওয়া হবে না কেন ? অন্যবার আর এবারের ফারাক যে অনেক। বাউলে দাঁতন ভেঙে এগিয়ে চলেছে উত্তর মুখো পূব ভেড়ির ওপর দিয়ে। এই পথেই সর্বানুবিবির বাড়ি ডিঙিয়ে লায়লার ঘর।

বাউলেকে ইলাহি দেখতে পেয়ে ডেকে এনে বলে,—শুনেছ ? চৌকিদার এসেছিল নাকি ?

—কে, অর্জুনপুরের অভয়চরণ ?

—অতো নাম-টাম জানি না, ঠিক দেখেছি, নীল রঙের কামিজ আর লাঠি হাতে। বাব্‌রি চুল।

—কিসের তলব ? দেখেছিস, আমি ঠিক ধরে নিয়েছি, অতো ফসলের ক্ষতি কাছারি সহজে ছাড়বে !

—সে কি ! তুমি কিচ্ছু শোননি ?

—শুনতে হবে কিসের। এ তো ধরা কথা, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

—ছোঁয়ছুঁয়ির ব্যাপার না। লায়লার ব্যাপার। তোমার কানে কিছু যায়নি ? কেন, জেরাবদির সঙ্গেও দেখা হয়নি এ যাবৎ ?

—হয়েছিলো তো। কই সে তো কিছু বলেনি।

—তা বলবে কেন ? শোনো, লায়লা, তোমার লায়লা ঠাগ্‌রোণ। সেই যে যে-দিন কেরেচ্ নিয়ে হেস্ত-নেস্ত, তার তিনদিন পরেই। নায়েবের দুশো টাকা ছিল বালিশের তলে। লায়লা লোভে পড়ে যায়। চুরি করেছে। আমার কেমন কেমন লাগে। কিন্তু দেখি কি, লায়লাও আর কাছারি যায় না। চৌকিদারও হাজির।

—যাঃ, বাজে বকিস্ না !

—আমারও তো বাজে মনে হয়, পেরথম যখন নিধু শিকারি আমাকে বলে।

—কে বলে, বললি ?

—নিধু শিকারি ! তারপর যা ঘটনা পরপর দেখেছি, বিশ্বেস না করে উপায়টা কি ?

নিধু শিকারির নাম শুনে কলিম স্তব্ধ। মাথা নিচু করে রইল।

—ভাল করে খোঁজ নিতে হয়।—বলেই বাউলে ভেড়িতে ওঠে। ওঠে বটে, কিন্তু লায়লার ঘর মুখো আর নয়, আপন ঘরেই।

এ কি অসোয়াস্তি ! এও কি কখনও সম্ভব ! এতই যদি টাকার দরকার, আমার কাছে

এলি পাত্তিস্‌···না, একবার তো এসেছিলি···তখন তো দিতে পারিনি। একবার পারিনি বলে কোনবারই পারব না ?···না, হয়ত আর কিছু। ······তা ছুটে এসে পেরথমেই বলবি তো, কি হয়েছে!······যেমন বলেছিলি কেরেচের কথা। ······না, এতো ঝামেলা পারি না······ মেয়েমান্‌ষের এতো ঝামেলা······

আঙিনায় এসে যেন হাতে স্বপ্ন পেল বাউলে। কারা পরবাসী সব এসেছে, বাউলেকে বাদায় নিতে। তখন তখনই। পোয়া ভাটি আছে কি না আছে। এখনই ডিঙিতে রওনা না হলে বড় নৌকো ধরা যাবে না। তক্ষুনি রওনা হল। গামছা আর লাঠি নিতেও তর সয় না বুঝি! বাদার মানুষ বাদার আশ্রয় খোঁজে। ডিঙিতে উঠে মনকে বারবার সান্ত্বনা দেয়, ফিরে এসে বুঝ নেওয়া যাবে।

আটাশ

এ কি যাতনা! একা একা জ্বলে পুড়ে মরবার যাতনা। সেই যে লায়লা সেদিন কাছারির গ্রাস থেকে ছুটে এসে আপন আঙিনায় আশ্রয় নিয়েছিল, তারপর সে-আশ্রয় ছেড়ে দু-দিন আর কোনও মুখো হয়নি।

তিন দিনের দিন দ্বিজবর কাগের ছেলের সঙ্গে দেখা। ভেড়ির ওপর আপন মনে কি কারণে বুঝি এসেছিল। সেখানেই দেখা হয়। দেখা হলে বলে,—কি বৃত্তান্ত ?······কি সব শুনছি তোমার নামে ?

লায়লা স্তম্ভিত। সেদিন সন্ধ্যার কথা তাহলে জানাজানি হয়ে গেছে! লায়লার মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে। দম নিয়ে রইল, বাকি কথাগুলো শুনবার জন্য দুর্‌দুর্‌ বুকে।

দ্বিজবরের ছেলে বলে যায়,—কি না কি, তুমি টাকা-ফাকা চুরি করেছ ?

মুখের কথা লুফে নিল লায়লা,—চুরি করেছি!······চোর!!

মুখের রক্ত তখন কোথায় চলে গেছে। এমন এক ব্যঙ্গের হাসি দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল লায়লা, কাগের পো তো থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ।

সেদিনই সন্ধ্যায় জেরাবদি দাওয়ার দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে মুখ ফুলিয়ে বলল,—ভাবি! কি সব বলছে লোকে, জানো ? তুমি নাকি কি টাকা চুরি করেছ ?

লায়লা যেন ফেটে পড়ে। দু'চোখে জলের ধারা নিয়ে বলে,—জেরাবদি! জেরাবদি, তুইও বল্‌লি!!

জেরাবদি অভিভূত,—না, ভাবি! আমি বলতে যাব কেন ? আমি কি ছাই অমন কথা গায়ে মাখি! আমি জানি ঠিক, ও-সব বাজে কথা। বাজে কথা!

বাজে কথা। কিন্তু অন্য কোন কথা আছে কিনা, জেরাবদি কিছুই জানতে চায় না। ভাবির চোখের জলধারাই তার্‌ পক্ষে যথেষ্ট।

তার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু লায়লা ? ইচ্ছে হলো তার, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে সব কথা খুলে বলে! বাহুর আঁচল সরিয়ে দেখিয়ে দেয় রক্তে লেখা সত্য কথা। পারে না—পারবেই বা কেমন করে অমন কচি কিশোর মনের কাছে অমন কথা ব্যক্ত করতে।

আর কার কাছেই বা পারে ? যার কাছে পারে, তার জন্য তো প্রতিক্ষণ অপেক্ষা করছে। উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে আছে। বলবে, বলবে সব কথা তার কাছে উজাড় করে—তার কাছেই সর্বপ্রথম বলবে। আর সেই বলাই যেন শেষ বলা হয়, এই তার কামনা।

এই কামনা নিয়ে যখন জেরাবদির কাছে শুনল, বাউলে তাকে ডেকে নিয়ে বলেছে ভোরেই সে আসবে, তখন লায়লার সে কি উন্মাদনা ! সারারাত ঠায় বসে কাটিয়েছে। বলে দিতে পারে, সে-রাতের তারাগুলি পলে পলে কেমন করে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁচেছে। বলে দিতে পারে, অন্ধকারের আবরণ পরতে পরতে কেমন করে উন্মোচিত হয়েছে ভোরের আকাশে।

বাউলে সে ভোরে আসেনি। এসেও আসেনি ! প্রতিক্ষণের প্রতিপলের প্রতীক্ষা চলেছে তারপর আজ দু'দিন ধরে। সহ্য হতে চায় না। সহ্যের সীমা লায়লা হারায় বুঝি ! নায়েব আর কি করেছে ! বাউলে যে তাকে দগ্ধ করে ফেলল।...না, ও আর আসবে না। না আসাই ভাল, না আসাই ঠিক। দাঁতে দাঁত চেপে কি যেন এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আবাদের গিন্নির বনবিবির নামে কি যেন এক শপথ !!

* * *

সেদিন সন্ধ্যায় বিছানায় শুয়ে আছে। যেমনটি রোজ। লায়লা ঘরে, জেরাবদি দাওয়ায়।

মনে পড়ে, বেশি দিনের কথা নয়—বাঘের কান্নায় আপ্লুত হয়ে পড়েছিল এমনি এক সন্ধ্যায়। আজ নিজের কান্নায় আপ্লুত। চুপি চুপি অনেকক্ষণ চোখের জল ফেলে নিল। তারপর মিষ্টি করে ডাক দিল,—জেরাবদি সোনা !

জেরাবদির ঘুমের ঘোর এসে গিয়েছিল। চম্‌কে সজাগ হয়ে বলে,—ভাবি ! ডাক্‌ছ নাকি ?

—শোন্, তোদের ছোট ডিঙিখানা কাল আমার ঘাটে নিয়ে আসবি। খুব ভোরে,...বুঝলি ?

—কোথাও যাবে নাকি, ভাবি ?

—হ্যাঁ, কাল যাব। খালার বাড়ি। আমার খালার বাড়ি জানিস্ তো ? সে-ই হড্ডায়।

—জানি, কিন্তু সেখানে যাবে কেন ?

—'শোন্ যাব, কাজ আছে। তুই কিন্তু ঘরদোর দেখে রাখ্‌বি। তোর জেম্মায় থাকলো। শোন্, শুন্‌ছিস্—আমি যদি ক'দিনের মধ্যে না ফিরি, তুই যাবি একবার। ডাঙ্গা পথেই যাস্।

অনুগতের মত জেরাবদি বলে,—আচ্ছা, তুমি ভেবো না ভাবি। ডিঙি ঠিক এনে দেব। ঠিক এনে দেব। তুমি খুব ভোরে ডেকে দেবে।

চাপা কান্নার শব্দ বুঝি শুনতে পেল জেরাবদি। আস্তে আস্তে বলল,—ভাবি, এবার একটু ঘুমোও।

উনত্রিশ

জেরাবদি বোর্টে হাতে আঙিনায় দেখা দিতেই লায়লা বলে,—এসে গেছিস্ ? যা বোর্টেখানা ডিঙিতে রেখে আয়।

বোর্টে রেখে ফিরে এলে ভাবি অনুনয়ের সুরে বলে,—সোনা, যা এবার নাস্তা খেয়ে নে। তুই বেরুলে তবে আমি বেরুব। ভাটোয় টান ধরেছে তো ?

—ধরলো বলে।

—তুই কিন্তু দেখে শুনে রাখবি! ক'দিন পর তুই একবার হড্ডায় যাবি, ঠিক যাবি।

জেরাবদি আর যেন কথা বলতে পারে না। বলেও না। খেতে বসে শুধু একবার আস্তে আস্তে বলে,—তুমি ভেবো না, ভাবি!—এরপর যা কিছু বলে লায়লা, তার উত্তরে জেরাবদি ঐ এক কথাই জানায়,—তুমি ভেবো না, ভাবি!

শান্ত আবাদ। দুর্যোগ কেটে গেছে। কৃষ্ণপক্ষও কেটে গেছে। চাপা আনন্দে দক্ষিণ-ঘেরির চাষী এবার ধানের গোছের থিয়ে শিষের দোলা দেখবার জন্য অপেক্ষমান। আর ক'দিন পরেই এই চাষীরা ফেটে পড়বে—আনন্দে, উল্লাসে, কাজ-কর্মে ও আনা-গোনায়!

অভিমান নয়, ঘর ও মঠবাড়ি ছেড়ে চলে যাবার অভিমান নয়। চলতে চায়, গতি চায় লায়লা, তার দেহ ও মনকে শান্ত করবার জন্য—যে-গতির জন্য বন্দীশালায় বন্দীরা ব্যাকুলিত হয়ে ওঠে।

শান্ত ভাটির টানে ডিঙি ভাসিয়েছে লায়লা। একাই। ও কতবারই তো এমন একা-একা ডিঙি নিয়ে ঘোরে ফেরে। কই তখন তো এমন নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আসেনি। সামনে বাউলের ঘাট—যেখানে দাঁড়িয়ে একদিন বৃদ্ধ বাউলে বলেছিল,—কলিম, এ চক্ তোমার জেম্মায় রইল।......না, ও আজ তার ধার দিয়ে যাবে না। যদি দেখা হয়ে যায়! ডিঙি ঘুরিয়ে দিল ও-পারে। সামনেই বাঁক। এই বাঁক থেকেই শেষবারের মত মঠবাড়িকে দেখা যাবে। দেখলও লায়লা,—কেমন শান্ত ওড়া-গাছের ঝাড় মঠবাড়িকে আড়ালে রেখে দিয়েছে!

এই ভাল। মঠবাড়িকে দূর থেকে দেখাই ভাল। না দেখে সে যখন পারবে না, দূর থেকেই দেখবার বাসনা পেয়ে বসে লায়লাকে। দূর থেকে দেখলে কি মিষ্টিই না লাগে এই চক্কে। পচা নোনা-কাদার ভেপ্‌সা গন্ধকে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে যায় ভোরের ও সাঁঝের ঝিরঝিরে হাওয়া ; দূর থেকে দেখলেই সবুজ ধানের গোছা ঢেকে দেয় যেন সেই কর্দমের বীভৎসতা ; দূর থেকে দেখলেই মনে হয়,—চকের এক একটা মানুষ যেন বাকি সকলের মলিনতাকে ঢেকে নিয়ে বলে,—দেখতে পাও না তুমি আমাকে?

দেখতে পায় লায়লা। কি অপরিসীম ভালবাসা নিয়ে, কি মমতার আবেগ নিয়ে ডিঙির দোলায় দুলে চোখ বুজে দেখতে পায় লায়লা—সেই ধানের গোছা, সেই এক একটা মানুষ!

* * *

যে শ্বাসরোধী আবেষ্টনে পড়ে লায়লা গতি চেয়েছিল তার দিনগুলিতে, সেই গতির টানে এসে পড়েছে আজ ফুলতলার বনকর অফিসে। এই বনকে সে কতভাবেই না কামনা করেছে তার জীবনে! বনকে তার কি ভালই না লাগে!

সেই বনই আজ ঘিরে আছে তার চারিদিকে। দু'হাতে তুলে যেন আশীর্বাদ করে লায়লা বেনেখালির বন-অপিসের বাবুকে। খালার বাড়ি বেড়াতে আসার পথে হড্ডার মুখে এই অপিসের বাবুর সঙ্গে মোলাকাত। সেই সুযোগে এই চাকরি মিলে যায়। ফুলতলার অপিস খাস বনের মধ্যে জানতে পেয়েই, লায়লা যেন ছুটে চলে এসেছে এখানে। আর কোন সুবিধা অসুবিধার খোঁজ নেয়নি। সঙ্গে আছে জেরাবদির ডিঙিখানি। ভয় কিসের! যখনই খুশি বোটে হাতে ডিঙি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। তরতর করে বেয়ে যাবে যেখানে খুশি। এমন

বন আর হয় না। এর দুর্গমতা ও নিবিড়তা নিয়ে, এর যত কিছু সম্ভার নিয়ে মানুষকে ডাকে যেন তার সহজ সুগম নদ ও নদী পথের আহ্বানে।

ফুলতলা নদীর গায়ে বনের গভীরে এই অপিস। অপিসের বাবু কিছুদিন হল বিয়ে সাধি করেছেন। এখন অবশ্য বাবু, কিন্তু কিছুদিন আগেও বাবু ছিলেন না। গরীব ঘরের ছেলে। বোটম্যান হিসাবে বনে চাকরি পান। তারপর পিটেল বা পেট্রোল ; ক্রমে পিটেল-বোটের ভার পান বা পিটেলবাবু হন। তখন থেকেই বাবু। সে ধাপও ছাড়িয়ে উঠে এবার বনকর-অপিসবাবু। লোকবল, অস্ত্রবল, নৌবল—সবই আছে অপিসে। বিয়ে-সাধি করেছেন এক গরীব ঘরের মেয়েকে। তারও যেমন থাকবার জায়গা নেই, তেমনি বনের বাবুর ছুটি পাওয়াও ভার। পথ না পেয়ে বউকে নিয়ে এসেছেন এই বাদায়। সেই বউয়ের কাজে কর্মে সঙ্গী হিসাবে লায়লার এই নতুন চাকরি।

এমন সংসারকে বনের আওতায় স্নেহ মমতা দিয়ে মাতিয়ে তুলতে ক'দিনই মাত্র লেগেছে লায়লার। অন্য কোথাও হলে হয়ত বা সময় লাগতো। কিন্তু বন মানুষকে মানুষের বড় কাছাকাছি এনে দেয়। বন সুন্দর বটে, কিন্তু বিপদের প্রতিমূর্তিও বটে। বিপদের মাঝে কোন্ মানুষই বা না কাছাকাছি দাঁড়াতে চায়।

লায়লা প্রথম-প্রথম বাবুর বউকে 'নতুন-বউ' বলে ডাকতো। কিছুদিনের মধ্যে একে অন্যে মাসি সম্পর্ক পাতিয়েছে। দু'জনে দু'জনকেই মাসি বলে ডাকে।

খুব উঁচু কাঠের টঙে এই সংসারে তিনখানা কাঠের ঘর। এত উঁচু টঙ্ যাতে বাঘে সহসা এখানে না উঠতে পারে। প্রায় বারো হাত উঁচু। অপিস ঘরে বারান্দার সঙ্গে পুল দিয়ে যোগাযোগ। মাটিতে নামতে হলে অপিসের বারান্দা পথে সিঁড়ি আছে।

সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে দুই মাসিতে বক্‌বকানি। কাজ আর কতটুকু, বক্‌বকানিই বেশি। যত বক্‌বকানি বুঝি ভয়ের কথা নিয়েই।

নতুন-বউ বলে,—মাসি, আজ তুমি ঐ মাটিতে কি সাহসে নামলে ? ভয়-টয় বলে কিছু নেই নাকি ?

লায়লা অবলীলাক্রমে বলে,—তুমি মাসি, এতো ভয় পাও কেন জান ? তুমি তো বাউলে দেখোনি ?

—বাউলে ! বাউলে আবার কি ?

—দেখতে আমাদের চকে গেলে।—বলেই লায়লা এমন এক বর্ণনা দেয় যে মনে হয় বুঝি বাউলে এক দৈত্য !

—তা বাউলেকে একদিন আনতে পার ?

—উঁহু, কেউ বিপদে না পড়লে সে আসেই না !...তন্ময় হয়ে গেছে লায়লা—বলে চলে,—তাই বলে সব বিপদে নয়। মানুষের কত বিপদই তো আছে।...উঁহু, সব বিপদে আসে না।

—কোন্ বিপদে আসে না গো ?

—আসে বাঘের বিপদে, আসে সাপ-কুমিরের বিপদে, আসে লাঠালাঠির বিপদে, আসে......

নতুন-বউয়ের বাঘের বিপদটাই সব সময়েই বড় হয়ে আছে মনে। বলে,—সব বিপদই তো বললে ! তাহলে কোন্ বিপদে আসে না আবার ?......কি মাসি, অমন করে আছ কেন ? বলো ?

—না মাসি, আজ থাক্। তুমি না বলছিলে আজ গল্‌দা চিংড়ি খাবে। দেখি, পিঠেলরা

এসেছে কিনা ?—বলেই চলে যায় লায়লা অপিস ঘরের দিকে।

যায় বটে, কিন্তু সে যাওয়ার মাঝেও এক তন্ময়তা আছে। অন্যের চোখ এড়ালেও, মেয়েমানুষের চোখ তা এড়ায় না। তবুও বাদার মেয়ের রহস্যের কূল কিনারা করা, নতুন-বউয়ের পক্ষে সম্ভব নয় বোধহয়।

* * *

তিনখানা ঘরের পেছনটায় লায়লা থাকে। একদম বনের লাগো। পাশের গাছটার দু-একটা ডালও বুঝি ঘরের কাঠের দেয়াল ছুঁয়েছে। একটু বাতাস হলেই খস্‌খস্ শব্দ হয় দেয়ালে। রাতে এখানে শুয়ে থাকতে লায়লার মজাই লাগে। সারাদিন কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকে। ইতিমধ্যে লায়লা তো এই ছোট্ট সংসারের গার্জেন। কাজ এবং কাজের তদারকির অন্ত থাকে না দিনের বেলা। কিন্তু রাতে ? কেউ নয়, লায়লা আর বন। বাতাস আসে, গাছের মাথায় পাতাগুলি যেন হঠাৎ কথা বলে ওঠে। কানের কাছে দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে নম্র ডালগুলি রাতের অন্ধকারে যেন আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে কত কথাই বলতে চায় ফিস্ ফিস্ করে। পাখি ডাকে, নাম-না-জানা পাখি। হয়ত কোন রাতের পাখি, তা না হলে ডাকতে যাবে কেন ? 'টিউ' করে হরিণ ডেকে ওঠে দূরে। হয়ত কোন পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া হরিণ। দৈবাৎ কোথাও কখনও বাঘ ডেকে ওঠে। বড় মিষ্টি লাগে লায়লার। কি জমাটি ডাক ! এই ডাক না থাকলে বুঝি বনটাকে বড় ফাঁকা লাগতো। বনই মনে হতো না।

প্রথম প্রথম বনের এই আচরণ রোমাঞ্চ আনতো, ভারি ভাল লাগতো,—আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়তো কখন লায়লা।

কিন্তু এখন যেন এক জ্বালা হয়েছে। বন যেন রাতে চুপিচুপি শুধু মঠবাড়ির কথাই বলে। পাতার মর্মর ধ্বনি ধানের গোছার দোলানির খস্ খস্ শব্দ মনে করিয়ে দেয়। ফুলতলা গাঙে স্রোতের টানের শব্দে কয়রা গাঙের স্বপ্ন জাগে। কিন্তু সবচেয়ে জ্বালা, এই বাঘের ডাক। সে ডাকে শূন্য বনে যে ঝঙ্কার ওঠে, সে তো বনের ঝঙ্কার নয়, সে যেন তার শূন্য বুকের ঝঙ্কার। বাঘ ও বাউলে আজ তার কাছে বড় একাকার হয়ে উঠেছে। ডাক শুনলেই তার ছোট্ট অন্ধকার ঘরের জানলাটুকু খুলে দেয়। খুলে দিয়ে এমনভাবে তাকায়, মনে হয় বুঝি অমন গাঢ় অন্ধকারেও বনের সব কিছু সে দেখতে পাবে।

এ তো গেল রাতের জ্বালা। দিনের জ্বালা ? দক্ষিণ-ঘেরির ছোট্ট আঙিনা ও জেরাবদি। কাজে হাত দিতে গেলেই মনে পড়ে তার নিজের আঙিনার কাজের কথা, মনে পড়ে জেরাবদির কথা। মাঝে মাঝে ছুটে যায় নদীর তীরে, দেখে আসে জেরাবদির ডিঙিখানা। তারপর আবার শান্ত হয়ে কাজে মন দেয়।

কোনও নতুন দলের নৌকো কাঠ কাটার পাশ নিতে এলেই, লায়লা তখনকার মত চঞ্চল হয়ে ওঠে। ফাঁকে-ফুঁকে দেখে নিতে চায় উঁকি মেরে—মঠবাড়ির কেউ এলো কিনা ? সুযোগ পেলে মাঝির কাছ থেকে প্রকারান্তরে জানতে চায়—তারা কোনও বাউলে সঙ্গে এনেছে কিনা ?

রাত ও দিনের এই জ্বালা মিলে লায়লাকে উতলা করে তুলেছে। ঘুম এসেও আসতে চায় না, এমন এক এক রাতে স্বপ্ন জাগে লায়লার—যাবে, যাবে সে ছুটে বনের গভীরে একদিন, খুঁজে খুঁজে বের করবে এর প্রতি রহস্যকে—যে-রহস্য বাউলের মনে ধরা আছে

পরতে পরতে।

স্বপ্ন! কিন্তু এই স্বপ্নই যে একদিন রূঢ় বাস্তব হয়ে দেখা দেবে লায়লার জীবনে, তা কে জানত!

ত্রিশ

অঘ্রানের শেষ পার হয়ে পোষ এসে গেছে। পোষের আগমন বুঝতে সময় লাগে না আবাদে। রাত-ভোর চলে মাড়াই। গরুর পদ সঞ্চালনে ভারে ভারে ঝরে পড়ে ধানের দানা চাষীর খলেনে। সকালে উঠতেই দেখা যাবে—ধানের চিটে ও কুড়ো উড়ে উড়ে উঠছে প্রতি খলেনে। এবার তো দক্ষিণ-ঘেরির কথাই নেই। যেদিকে তাকাও দেখা যাবে এই ওড়ানি ভোরের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

কলিমের আজ শেষ মাড়াই। কাল গরু দুটোকে বড্ড হয়রাণ করেছে। থাক্, আজ সকালে একটু আরাম করুক। গরু দুটোকে বেঁধে দিল খড়ের বোঝার ধারে। কি কৃতজ্ঞতাই গরু দুটোর ঐ বড় বড় চোখে! লোকে বলে হরিণীর চোখ! আছে বটে হরিণীর দীর্ঘায়িত চোখে ও আঁখি প্রান্তের বক্রসীমিত রেখায় নিরীহতা ও অবলার আকুতি। কিন্তু গরুর চোখে যে কৃতজ্ঞতা, তার তুলনা নেই। অথচ ওর কৃতজ্ঞ হবার তো কিছুই নেই। নিজের পরিশ্রমেই নিজের আহার সে যোগাড় করে। তবু তার কৃতজ্ঞতার যেন শেষ নেই।

বাউলে তাই দেখছিল বসে বসে। ভাবল—যাক্, আজ যাই একটু টহল দিয়ে আসি। বান গাছের ছিট্ থেকে একটা কচি ডাল ভেঙে নিল দাঁতন বানাতে। আঁশ-শেওড়া এদেশে বিরল। নিমও তাই। একটা নিম গাছ হলে রক্ষে নেই। কেউ তাতে হাত দিতে দেবে না। বন্যগাছই ভাল লাগে বাউলের, বনেই তো থাকতে হয় তার বছরে ছ'মাস।

কোন চিন্তার ভার নেই মনে। দক্ষিণ-ঘেরি যে সোনা ঢেলে দিয়েছে, তাতে ভাবনা কিসের! দানাগুলো যা হয়েছে, এক এক বিশে চোদ্দ মন না হয়ে যায় না। যত দেনা-দায়িক সবার শোধ হয়ে যাবে বুঝি এবার।

কলিমের আর দেনা-দায়িক কি! লায়লার নাম করে সেই যে টাকা ধার করেছিল—সেইটুকুই যা। তাও সে নিজের কাজে খরচ করেনি। অভাবীর সংসার, পাছে খরচ করে বসে—এই ভয়ে তখন তখনই সে-টাকায় একটা গরু কিনেছিল। লায়লা অনেকদিন উধাও। তার খোঁজ কেউ জানে না। মায়, জেরাবদিও নয়। এই সুযোগে লায়লার ঘরে গিয়ে জেরাবদির জেম্মায় সে গরুটা কলিম রেখে আসে। জেরাবদি তখন কেমন কেমন করতেই কলিম দাবড়ি দিয়ে বলে,—রাখ্ না! নেকামো করছিস্ কেন?

পুব-ভেড়ি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কলিম লায়লার আঙিনার পাশ কাটাল। কেরেচের ওপর হেঁটে হেঁটে এবার পশ্চিম ভেড়িতে। এই পশ্চিম ভেড়ি ও কেরেচ্ ছিলার কোণায় মঙ্গলা পাটনির ঘর। কিছুই নেই এখন—পড়ে আছে শুধু দুটো ভিটে। তাও ভিটে ভেঙে ভেঙে, গলে গলে পড়েছে বৃষ্টির ধারায়। দু'একটা ঘাসও জন্মেছে ভিটের মাথায়। মনটা খাঁ খাঁ করে বাউলের।

পশ্চিম ভেড়ির ওপর দিয়ে এবার দক্ষিণে এগিয়ে যায়। ঘরে ঘরে গোবর দেওয়া খলেনে আঁটির বোঝা, খড়ের পালা আর ধানের রাশ। ছেলেদের হুটোপাটির অন্ত নেই, আর তাদের

সাথে চড়ুই পাখির দলও ছোট্ট ডানায় ঝাঁপি দিয়ে এই ওঠে, এই বসে। দেখো না! কেমন কবর-পানা হয়ে উঠেছে ধান ওড়াতে গিয়ে। নাঃ, কবরের কথা সে ভাববে না আজ। চারিদিকে ধান ওড়াচ্ছে। মেয়েরা কুলো ভর্তি করে মাড়াইয়ের রাশ থেকে ধান নিয়ে আসছে। যতদূর সম্ভব হাত দু'খানা মাথার ওপর উঁচু করে কুলোখানা সুঠাম ভঙ্গিতে ধরে। তারপর বাহু ও ভরাট বুকে ছোট ছোট দোলানির ঢেউ তুলে ধানগুলো ছড়িয়ে দেয় চার-পাঁচ হাত লম্বা করে। আস্তে আস্তে যেন কবরের মাটির মত উঁচু হয়ে ওঠে ঝরে পড়া ধান। কুলো থেকে অমন করে ফেলতেই ধানের দানা আপন ভারে নিচে পড়ে। চিটেগুলি কতক উড়ে যায়, কতক ঢেকে দেয় ধানের রাশ। মরদেরা তৈরিই আছে কুলো হাতে। সজোরে কুলোর বাতাস দেয়। অলক্ষ্মীকে কুলোর বাতাসে তাড়িয়ে দেয় যেন। ধানের চিটে উড়ে যায় এপাশ ওপাশ—হেসে ওঠে ধানের দানা রোদের ঝলকে খল্ খল্ করে। হাসছেও বুঝি মঠবাড়ির সর্বমানুষ আজ!

সামনেই মার্জান পাড়ের ঘর। ভেড়ি থেকে নেমে কলিম খলেনে এসে পড়ে। ধানের রাশে মুঠোমো হাত দাবিয়ে দিতে দিতে হাসে। এক কোশ ধান হাতের ওপর নাচিয়ে ওজন দেখতে দেখতে বলে,—জানিস্, এবার তোর ঘাটে ব্যাপারীরা ঝেঁকে আসবে।

মার্জান সঙ্গে সঙ্গে বলে,—যাও, আমার কেন, সব ঘাটেই। এবার দক্ষিণ-ঘেরির ধানের ডাক পড়ে গেছে পনরো-মনী।

বাউলে একটু থেমে বলে,—জানো, এতো আহ্লাদ কার দৌলতে?

হঠাৎ কি বলবে ভেবে পায় না মার্জান।

বাউলে নিজেই বলে ফেলে,—জানো! জেরাবদি! জেরাবদির দৌলতে। সে যদি সেদিন সন্ধ্যায় খবর না আনতো!

নিজের ছেলের তোয়াজে খুশি হলেও পাল্টা প্রশ্ন করে,—আচ্ছা, জেরাবদি কোত্থেকে জানতে পায়? সে জানলো কি করে?

তা মার্জানও যেমন জানে, বাউলেও জানে। তবু কথাটা আজ ওরা তুলতে চায়। কলিমও যেন নিজেকে নিজে সশব্দে বলতে চায়। স্পষ্ট করেই বলল,—লায়লাই তো বলেছিল। নোড়াতে নোড়াতে এসে বলেছিল! তাইতে তো ঠেকান্ দেয়া গেছে। নইলে......মাড়াই করো! ধাওয়া দেও! গরুগুলো ঠায় মেরেছে, দেখছো না? —বলেই বাউলে ভেড়িতে উঠে আরও দক্ষিণে এগিয়ে চলে।

এবার নিধু শিকারির ভিটে। নিধু শিকারি ভেড়িতে দাঁড়িয়েই রোদ পোহাচ্ছিল। এগিয়ে এসে বলে,—বল্ কলিম, কি বলবি?

—বলবো আর কি! ভাবছিলাম, কাছারি এবার কি পালি পেছনে লাগবে না জানি!

—কাছারির নাম আর নিস্ না!

—কেন, কি হলো?

—হবে আর কি! দেখলি না! কেমন করে একটা মেয়েমান্ষের পেছনে লাগলো। ভিটে ছাড়া করে তবে ছাড়লো!

কলিম অবাক। বলে,—চাচা তুমি কার কথা বলছো? লায়লার কথা?

—লায়লার কথা বলবো না তো, কার কথা বলবো! অমন বেটি আর হয় না। বিশ্বাস আছে!......বিশ্বাস আছে ঐ শালা কাছারিদের। কি দিয়ে কি যে করে, আল্লাই জানে!

কলিমের মনে হয় কে যেন বুকের পাঁজরে কোঁচের খোঁচা মারল।......সহ্য করতে না পেরে দ্রুত কথার মোড় ঘোরায়। বলে,—বলো চাচা, ভাবছি এবার ধানের দালালগিরির

ভেট্টা দেখব নাকি? না বন-বাদাড় দেখব?

—তুই আবার বন-বাদাড় ছাড়া থাকতে পারলি কবে!

* * *

থাকতে হয় না। বনবিবির ডাক। সে ডাককে অবহেলা করতে পারে এমন সাহস আছে কোন্ বাউলের এ-দেশে?

ডাক এসেছে। ক'দিনের মধ্যেই। কলিম বিড়বিড় করে,—তর সইলো না বিবির! মাড়াই হয়ে গেছে, ঠিক যেন খবর পেয়েছে বেটি!

তিন মেঞাজান এক ছোট্ট ডিঙি নিয়ে ছুটে এসেছে। এসেই যেন হাঁফাতে হাঁফাতে বলে,—চলো, বাউলে শিগ্‌গীর চলো। একেবারে নোড়ায় যেতে হবে।

—আরে! বসো, পান-তামুক খাও। শুনি ব্যাপার-ট্যাপার কি? তা না আগেই নোড়ানো! —বাউলে ভাবে, বুঝি বা কোন কাঠুরে নৌকায় বাউলেগিরির ডাক।

ঢিমেতালা ভাব দেখে ওরা কলিমের মনের কথা বুঝতে পারে। ব্যস্ত হয়ে বলে,—না, বসার-টসার ব্যাপার না। শিগ্‌গীর চলো, বাঘে মানুষ নিয়েছে।

বাউলে নড়ে-চড়ে বসে—কোখেকে নিল? কখন এল? কীভাবে নিল? আর কোনও বাউলে ছিল সঙ্গে?

এত প্রশ্নের জবাব ওরা দেবে কি করে! বলে,—অতোশতো জানি না। মানুষ নিয়েছে, বিবিকে নিয়েছে।

—কি বললে?

—বিবি!

—কোখেকে? আবাদ থেকে?—কলিম উৎকণ্ঠিত।

—না গো, ফুলতলা অপিস্ থেকে।

ফুলতলা! বিবির থান থেকেই বিবি নিয়েছে!......তা ওখানে বিবি এলো কোত্থেকে? খাস বনে?

মেঞাজানরা এবার খুলেই বলে যায়,—দেখো, আমরা সবে তখন পাশ নিতে যাই বনে। সাঝের গোনে। নৌকো চাপান দিয়ে আছি। ভোরে অপিস খুললে পাশ নিয়ে বেরুবো!......সে তোমাকে বলব কি! রাত দুপুরে সে কি হল্লাহল্লি, বন্দুক চালাচালি! আমরা ভাবি, হয়েছে! শেষটায় এই ঘেরিতেই কাঠ কাটতে এলাম। মনটা সবার খারাপই হয়ে গেল।

—তারপর কি হলো? বিবি কি করে নিল?

—বলি শোনো—কলিম যত ব্যস্ত হয়ে উঠছে, ওরা যেন এবার তত ঢিমে তালে বলে।

—বলি শোনো-টোনো না। আগে বলো কি হলো?

—হ্যাঁ, আমরা তো ভয়ে জড়সড়। খুপরির দরজা এঁটে থাকবার জো। অপিসের বাবু তো নৌকো চড়াও করে চিল্লিয়ে বললেন, কে আছো, মঠবাড়ির আবাদ চেনো? আমরা চিনি টের পেয়েই বাবু তো প্রায় জোর জবরদস্তি ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন। ঘাটে একখানা ছোট্ট ডিঙি ছিল, তাতে তুলে দিয়ে বললেন, যাও, এই ভাটোতেই মঠবাড়ির বাউলেকে নিয়ে আসা চাই-ই। তার হাতে তখন বন্দুক ধরাই আছে। ডিঙি ভাসান দিলে জোরে জোরে বললেন, বাউলেকে বলবি, বিবিকে নিয়েছে। বলেই কেঁদে যেন ফেটে পড়লেন।

বলতে বলতে যেন ওদেরই চোখে জল এসে গেছে। সামলে নিয়ে বলল,—চলো বাউলে, এক্ষুনি, পান তামুক খেতে হবে না। এক্ষুনি রওনা হই। ভাটা লেগে গেছে।

বাউলে বে-মনা। কথাই নেই মুখে। সামনে গামছা দুলছিল। একটানে কাঁধের ওপর ফেলে বলে,—চলো।

—তা বাউলে, লাঠি? লাঠি নেবে না?

—লাঠি কি হবে রে, দরকার নেই। বিড়বিড় করে মনে মনে বলে, লাঠি। মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিয়েছে বনবিবি, তা আবার লাঠি!

আঙিনা পেরিয়ে আসতেই ফুফু এসে মুখ বাড়িয়ে কি যেন বলতে চাইছিল। কলিমের কানে কিছুই যায় না। ফুফু বনবিবির নামে মাথায় হাত ঠেকিয়ে নিজে নিজেই বলল,—যা, বিবির দোয়ায় ভালোয় ভালোয় ফিরে আসিস্।

* * *

মেঞাজানেরা ভেড়ি পার হয়ে ঘাটের চরে নেমেছে। ঘাটের কাদা অতো নরম থাকে না। তবুও পা বসে বসে যায়। বাউলেও ভেড়ি ডিঙিয়ে এবার চরে নেমেছে।

ডিঙি! ডিঙির ওপর নজর পড়তেই বাউলে আর বাউলে নেই!! দাঁড়িয়ে পড়েছে। এক নজরে তাকিয়ে আছে ডিঙির দিকে। সমস্ত দেহ নিশ্চল। চোখ বিস্ফারিত। মুখ থম্‌থমে।

—কই, বাউলে নেমে এসো?

বাউলে নামবে কি! এ ডিঙি যে তার চেনা ডিঙি। এ যে সেই ভাঙা গলুই। কার্য-কারণ সব গুলিয়ে মাথা ঘুরে যায়। না, সে যে বাউলে! মাথা ঘুরলে চলবে না! বাদার বাউলে সে, বাঘের বাউলে সে!

অলঙ্ঘনীয় আদেশে ওদের ডেকে কাছে আনলো। বাউলের দাপটি নিয়ে গুরুগম্ভীর আওয়াজে বলে,—বল্, তোদের বল্‌তে হবে। তোরা সব জানিস্। বল্ বলছি। কে সেই বিবি? বল্, কে সেই বিবি?

মেঞাজানেরা থতমত। কাতর হয়ে বলে,—না, বাউলে! বনবিবির কিরে, যা জানি সব বলেছি। আর কিচ্ছু জানি না।

কয়েক লহমা নিস্তব্ধতা। কলিমের দৃষ্টি নিবদ্ধ ডিঙির ভগ্ন অগ্রভাগে। চরের পলিমাটি লেপটে আছে সেখানে কিছু। টিপ পরেছে বুঝি তার ভগ্ন ললাটে। স্রোতের টানের দোলায় থরথর কেঁপে ওঠে গলুই। ঝরে পড়ে কিছু পলিমাটি। সে কাঁপানি বুঝি শিহরণ জাগায় কলিমের মনে······তারও গুরু তো একদিন এমনি করেই বনের পলিমাটি লেপটে দিয়েছিল তার ললাটে······হ্যাঁ······না······সহসা দৃঢ় হয়ে ওঠে বাউলে।

—শোন্ তবে, একজন সঙ্গে যাবে। খবরদার, তাকে কিচ্ছু বলবি না। বলবি, মানুষ নিয়েছে। খবরদার! কোনও বিবির কথা মুখেও আনবি না। বল্, ঠিক!

ঠিক্—সবাই যেন একত্রে বলে।

এক লাফে ভেড়িতে উঠে পড়ে বাউলে। উঠেই চিৎকার,—জেরাবদি! জেরাবদি! জেরাবদি!

তার কান্না-হাসির ভাগীদারকে সঙ্গে না নিয়ে কেমন করে সে আজ বনবিবির মুখোমুখি হবে!

—জেরাবদি! জেরাবদি! ও জেরাবদি!

জেরাবদি ছুটে এসেছে। বাউলের অমন ডাকে তার পাগলা হয়ে উঠবার কথা। আজও দৌড়, কালও দৌড়।

কোলের কাছে টেনে বাউলে আঙুল দিয়ে ডিঙি দেখাল। জেরাবদি যেন চমক্ খেয়ে বলে,—ভাবি !! ভাবি কই ?

—না, ভাবি না। ডিঙি এসেছে। চল্, যেতে হবে।

—তা, গামছাখানা ?

—না, আনতে হবে না। আগে চল্ ডিঙিতে। পরে সব শুনবি।

বেলা তেতে উঠেছে। ফুলতলা অপিস্-ঘরের ঘাটে সবাই মাটির ওপর বসে আছে। যে যেখানে ছিল সবাই। দুটো বন্দুকের নল সবার মাথা ছাড়িয়ে উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। বন্দুক হাতে নিয়ে ওরা ওদের মত খোঁজাখুঁজি করেনি যে তা নয়। কোনও হদিশ পায়নি। হতাশার মুখে ওদের কেউ কেউ বলেছিল,—বাবু বনে বনবিবির দেখা পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাহনকে খুঁজেই পাবেন না।

দূরে বাউলের ডিঙি দেখা দিতেই সবাই উন্মুখ। দাঁড়িয়ে পড়েছে। সবাই চুপ। বনও বুঝি এখনকার মত চুপ। খচ্ করে ডিঙি ঘাটে লাগে।

অন্য সময় বা অন্য ঘটনা হলে বাউলে প্রথমেই একবার ফুক্কুড়ি কেটে হাসিয়ে নিত সবাইকে। আজ যে তার নিজের মুখেই হাসি নিবে গেছে ! থম্থমে মুখ ও চাহনি। মাথায় সেই ফেটা বেঁধেছে। পেখম ঠিকই ঝুলছে। বা'হাতে জেরাবদির হাত ধরে টেনে মচ্মচ্ শব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে এলো !

বাবু যেন বাউলের বুকের ওপর আছড়ে পড়লেন। বাউলে তাকে আস্তে সরিয়ে দিয়ে বলে, বেশ বাজখাঁই গলায় বলে,—অমন কান্নাকাটি করতে নেই। কান্নাকাটির সময় নয় ! বলেন আগে, কি ঘটনা ?

অমন কথার আওয়াজে বাবুর কান্না স্তব্ধ হয়ে গেছে। বলতে চেষ্টা করেন,—নতুন-বউকে নিয়ে গেছে বাউলে ! নতুন-বউকে !

কলিম ঠিকই বাউলের মত রোখ্ নিয়ে তাকিয়ে আছে। নতুন-বউ ! কেমন যেন মাথা গুলিয়ে যায়। বাউলেকে চুপ থাকতে দেখেই জেরাবদির ঠোঁট ফুলে ওঠে। ফোলা ঠোঁটে চাপা স্বরে বলে,—কি বললে বাবু ? ভাবি !

বাউলে জেরাবদির হাতে সজোরে রুক্ষ ঝাঁকানি দিয়ে এক ধমক্ লাগায়,—রাখ্ !

—কি বললেন বাবু ?

—নতুন-বউ, আমার বউকে রাত দুপুরে। বড্ড সাহস বেড়েছিল। কত করে বলেছি, অতো সাহস ভাল না।......ভাল না !......ভাল না ! রাত দুপুরে তোর ঘরের বার হবার দরকার কি ! বড্ড সাহস ! বড্ড সাহস হয়েছিল। বাউলে, বড্ড সাহস !!

বাউলের বোধহয় আর কিছু জানবার দরকার নেই। পদক্ষেপ দিতে গেছে। দিতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল,—তোমার এখানে আর কোন মেয়েমানুষ আছে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,...আছে...আছে......

বাউলে যেন আর মুখ থেকে কথা বেরুতে দেবে না। যেন কড়া ধমক দিয়েই বলে,—কি নাম তার ?...... লায়লা ? লায়লা ?

বাউলে এক একটা কথা বলে, আর টঙের ঘরগুলি সেই ঝাঁকানিতে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

—হ্যাঁ, ঐ নামই তো তার।

—সে কই ? কই সে ?

জেরাবদি আর থাকতে পারে না। উর্ধ্বশ্বাসে ছট্‌ফট করে।

—সেও যে কোথায় গেল ! সারারাত ধরে তোমার কথা জপেছে। ছুটে ছুটে যেতে চায় বনে। বলে, যাবে সে বনবিবির কাছে। সারারাত ঠেকিয়ে রেখেছি কোনমতে।

—কোথায় সে, ডাকো……ডাকো !

জেরাবদি ডাক পেড়েই বসে,—ভা—বি !

আবার বাউলের হাতের ঝাঁকানি,—রাখ্ তুই !

—বাউলে ! তোমার ডিঙি আসে না দেখে কোন ফাঁকে যে সে চলে গেল ! বনের কোথায় গেলো, তার দিশে নেই।

—দিশে নেই ! দিশে নেই !……চল্ জেরাবদি, চল্ শীগ্‌গীর ! নোড়া ! নোড়া !

তর তর করে নেমে গেল দু'জনে। টঙে সাজান কাঠের ঘর সবগুলিই থর্‌থর্ করে কেঁপে ওঠে। মাটিতে পায়ের ছাপ দেখতেই বুঝে ফেলে বাউলে, কোথায় কি ঘটেছে। থাবার চিহ্ন দেখিয়ে দেখিয়ে জেরাবদিকে কোলের কাছে টেনে বলে,—দেখেছিস্ জেরাবদি !……দেখেছিস্ জেরাবদি !—জেরাবদি দেখবে কি ! ঝাপ্‌সা চোখে সে কিছুই বুঝি দেখতে পায় না।

বাঘিনীর পদচিহ্ন দেখে দেখে বাউলে চলেছে। কোথাও দেখা যায়, কোথাও দেখা যায় না। জেরাবদিকে যেন বুকের মধ্যে করে নিয়ে চলেছে। বাউলের বুকের দোলানি কিশোর অনুভব করতে পারে কিনা কে জানে ! এখনও দেখা যায়, গুড়ির ফাঁকে ফাঁকে ওদের এখনও দেখা যায়। এর পর বুঝি আর দেখা যাবে না। বনানী বুঝি ওদের গ্রাস করে নেবে এখনই !

বাউলে দেখেছে। দেখেছে বাউলে আরেক কোমল পদচিহ্ন বাঘের থাবার পাশে পাশে। সে তো এখন বাউলে। বাঘের মুখোমুখি হতে চায় ! সিক্ত মাটির কোমল পদচিহ্ন কিশোরের ঝাপ্‌সা চোখের আড়ালে আড়ালে রেখে চলেছে বাউলে। থাক্, এখন ওর দেখবার আবশ্যক নেই। কিন্তু এখন আবশ্যক না হলে, আর কখনই বা আবশ্যক হবে !

তবু কলিম কোমল পদচিহ্ন আড়ালে রেখে এগিয়ে চলে। মিলিয়ে গেছে, বনের সাথে মিলিয়ে গেছে দু'জনে। এখন আর কিছুই নেই যেন। বন, শুধু বন। সে বনের কোলে যা কিছু আছে সবই বন্য।

হঠাৎ বাউলের ভীষণ চিৎকার,—ভয় নেই ! ভয় নেই জেরাবদি !……কিশোর কেঁপে উঠেছে। তাকে বুঝি কেউ বাউলের বুক থেকে ছিনিয়ে নেবে !

না,…বাউলে দেখায়,—দ্যাখ্, দ্যাখ জেরাবদি ! বাঘিনী গেছে দক্ষিণে, ঐ দ্যাখ্ থাবার খোঁচ চলে গেছে। আর এই দ্যাখ্, এদিকে আয়। আরেক বাঘিনী গেছে উত্তরে—আয়, আয়, এই দ্যাখ্, দ্যাখ্ ! —কলিমের উন্মত্ত উল্লাস !

কোমল পলিমাটির ওপর কোমল পায়ের স্পর্শ দেখে কিশোর হাসবে না কাঁদবে জানে না ! কলিম ধরা গলায় বলে,—দেখেছিস, যেন বনবিবি হেঁটে গেছে ! —কলিমের উল্লাস ফেটে পড়ে ! এ বন যেন এখন আর কারও দখলে নয়—এক শক্তিধর বনওয়ালি আর এক আবেগ কম্পিত কিশোর।

—ডাক্, ডাক্, চিৎকার করে ডাক্ জেরাবদি।

—ভা—বি !

বনওয়ালি কি বলে ডাকবে ! ডাক পাড়ে—ব-ন-বি-বি !—না, না,……ডেকে

ওঠে,—লা—য়-লা !

—ভা—বি !

—লা—য়—লা !

বনও বুঝি আজ তার কন্যাকে তুলে দিতে চায় বাউলের হাতে, তার কম্পিত প্রতিধ্বনির প্রলম্বিত ঝঙ্কারে—

.........য়—লা !

Biswa Ranjan Banik

20-1373

সুন্দরবনে আর্জান সর্দার

নিবিড় সবুজঘন বনানী, তার শ্বাপদকুল, তার রঙ-বেরঙের উড়ন্ত পাখির ঝাঁক, আর সেই সঙ্গে অগণিত গভীর ও অগভীর আঁকাবাঁকা নদী-উপনদীর তর্‌তর্‌ শ্বেত স্রোতোধারা নিয়ে সমগ্র সুন্দরবনের রূপও যেমন অপরূপ, তেমনি সে-বনের উপকূলবাসী নরনারীর হাসি-কান্নাও বুঝি—বুঝি কেন, নিশ্চয়ই—সে-রূপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অনির্বচনীয়। তাই সুন্দরবনের খণ্ড জীবনের বিচিত্র স্বাদের হাসি-কান্নাগুলি ভিন্নতর নামে গণ্ডীভূত করা অহেতুক ও অবান্তর বলে মনে হয়েছে।

—গ্রন্থকার

সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ কৃষক-শিকারী আর্জান সর্দার

সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের খরস্রোতা নদীর ভাঙনের পাড়

এক

ভৈরব। নাম শুনলে এক সময় হয়ত আতঙ্ক জাগত। সে ভৈরব এখন আর নেই। ভৈরব নদ এখন শীর্ণকায়। খুলনা শহরের ঘাট থেকে ভৈরবে নৌকা ছেড়ে দিয়ে রোমাঞ্চ লাগছিল। এই রোমাঞ্চ নদীর জন্য নয়। নদীবহুল দেশের মানুষ আমরা। এই ভৈরবের কূলেই মানুষ হয়েছি। কাজেই এই নদীযাত্রায় কোনও ভয়, বিহ্বলতা বা রোমাঞ্চই ছিল না।

রোমাঞ্চের কারণ ছিল ভিন্ন। ইতিমধ্যে দেশের উপর দিয়ে বিদ্রোহের বন্যা বয়ে গেছে। বিদেশী ইংরেজদের মেরে তাড়াতে হবে এদেশ থেকে। তারই আগুন জ্বলে ওঠে ১৯৩০ সালে বাংলা দেশে। সেই আগুনে জড়িয়ে পড়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হই। তখন বয়স মাত্র বিশ বছর। সংসারের কোনও দায়-দায়িত্ব ছিল না, বললেই হয়। আট বছর পরে দেশে ফিরে দেখি, সংসারের সকল দায়িত্ব আমারই ঘাড়ে। সেই সূত্রে খুলনা জেলার দক্ষিণে আবাদ অঞ্চলে আমাদের যে একখণ্ড পতিত জমি পড়ে ছিল, তারই আবিষ্কার ও উদ্ধারের কাজ এসে পড়ে।

এই জমিটুকু কোথায় তার ঠিকানা জানা ছিল, তার চৌহদ্দিও জানা ছিল। কিন্তু কোন্ পথে যেতে হবে, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। আত্মীয়-স্বজন যাঁকেই প্রশ্ন করি, তাঁরা বলেন, —সে জমি তো সুন্দরবনে। তুমি পারবে না কূলকিনারা করতে।

পথের অনিশ্চয়তা, আর গন্তব্য স্থান সুন্দরবন, —এই দুইয়ে মিলে মনের মাঝে রোমাঞ্চ জেগে ওঠে। আমাদের ছোট্ট নৌকাখানি ভাটির টানে দক্ষিণমুখে এগিয়ে চলল। সঙ্গে আমার বৃদ্ধ খুল্লতাত, আর মাঝি ও তার বারো বছরের ছেলে। সঙ্গে সাত-আট দিনের চাল-ডাল নেওয়া আছে। কদিনে সেখানে পৌঁছব তার ঠিক নেই, কেউ বলল তিন দিন, কেউ বলল চার দিন; আবার কেউ বা বলল, সাত দিন।

কদিন লাগবে তার কথা ভাবতে মন চাইছে না। আপাতত মনের মধ্যে শুধু চাল্‌না। চাল্‌না খুলনা শহরের সোজা দক্ষিণে। নামকরা বাজার। হাটের দিন এখানে নাকি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। চালনা পরিচিত স্থান। ষ্টীমার ষ্টেশনও এখানে আছে। দূর দূরাঞ্চল থেকে এখানে লোক জমা হয়। মনে ভরসা—এখানে পৌঁছলে পথের সন্ধান নিশ্চয় মিলবে।

খুলনা আধুনিক শহর। তারই দশ মাইলের মধ্যে এমন অবস্থা কল্পনা করা যায় না। নদীর দুপারে মাঠ আর মাঠ। সাত আট মাইল অন্তর ছোট ছোট এক একটা গ্রাম দেখা যায় কি যায় না। বহু কষ্টে হয়ত এক আধটা মানুষ চোখে পড়ে।

ভাটির টানে নৌকা ভৈরবের পর রূপসা নদী বেয়ে সাঁ সাঁ করে চলেছে। মাইলের পর মাইল চলেছি। সকাল থেকে নৌকা চলেছে। মাঝে জোয়ার এলে নৌকা এক ঘাটে থেমে থাকে। ভাটি আসতেই আবার যাত্রা শুরু হলো। সন্ধ্যা পার হলে আমরা চাল্‌নায় এসে

যাই। পশর নদীর কূলে চাল্‌নায় আসতেই মনে নূতন করে ভরসা এলো।

আগে থাকতেই সতর্ক হয়ে আছি। এমন দেশে দু-একজনকে মাত্র জিজ্ঞাসা করলে হবে না। ছেলেবেলা থেকে এদেশের ডাকাতির গল্প অনেক শুনেছি। এ পর্যন্ত যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে, —এই অঞ্চলে ডাকাতি করা অতি সহজ। চারদিকে নদী ও খাল, —মাঠ ধূ ধূ করছে। জনমানব নেই।

সেই জন্যই প্রায় দশজনকে জিজ্ঞাসা করলাম পথের কথা। যাতে কোনও ভুল পথে চালিত না হই। মোট কথা যা বুঝে নিলাম তাতে আমাদের চুনকুড়ি দিয়ে ভদ্রা নদীতে পড়তে হবে, তারপর ঢাকি খাল দিয়ে শিবসা নদীতে পড়তে হবে। তারপর হড্ডা নদী।

ঢাকির কথা শুনতেই খুল্লতাত বললেন, —হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, শুনেছি ঢাকির মুখে শিবসা 'নলছ্যাও' দিতে হয়।

কিন্তু তারপর। তারপর আর কেউ বিশেষ কিছু বলতে পারে না। তবে 'ডাক্তারের আবাদে'র নাম বলতে বলল। এই আবাদের কাছে আমাদের গন্তব্য স্থান হবে বলে তাদের বিশ্বাস। সকলেই উপদেশ দিল, ভাটির স্রোতের যেটুকু বাকি আছে তাতে এখনই যাত্রা করে দাকোপে পৌঁছে থাকতে। দাকোপ পরবর্তী হাট। সেখান থেকে পরদিন জোয়ার ধরে এগিয়ে শিবসা নদী ভাটির টানে পার হতে হবে।

সকলের উপদেশ মেনে নিয়ে রাত্রে চুনকুড়ি ধরে এগিয়ে চললাম। সবাই ভরসা দিয়েছিল, কোন ভয় নেই। এই নদীতে প্রায়ই ষ্টীমার ও নৌকার দেখা পাবে। সুন্দরবন পথে যে-সব মালবাহী ষ্টীমার যাতায়াত করে, তারা এই ছোট নদী দিয়ে সোজা পথ ধরে।

ওরা ঠিকই বলেছিল। একের পর এক মালবাহী ষ্টীমার আসতে থাকে। তাদের প্রত্যেকের দুই পাশে দুই গাধাবোট বাঁধা। তাদের গতি মন্থর—তাই জল কেটে যাবার ঢেউ কম। কিন্তু আপাদ-মস্তক বোঝাই জাহাজকে ঠেলে নিতে ষ্টীমারের চাকা মাঝ-নদীর জল তোলপাড় করে চলেছে। ঘোড়ার খুরে ধুলো বেশি ওড়ে বটে, কিন্তু গজেন্দ্র গমনে পথ কেঁপে ওঠে। এও যেন তেমনি। তবুও কূল দিয়ে গেলে বিশেষ ভয় ছিল না।

তাহলে কি হবে! চুনকুড়ি যে বড়ই ছোট। কূলে কূলে সামাল দিয়ে চলেছি। ঘোর অন্ধকার। অন্য নৌকা আশেপাশে একখানাও নেই। ভাটির সময়। নদীর জল বেশ নিচে নেমে পড়েছে। তীরে মাঠ কি গ্রাম, তা নৌকা থেকে কিছুই অনুমান করা যায় না। মাঝে মাঝে এক একখানা মাল বোঝাই জাহাজ তীব্র সার্চ লাইট ফেলে চলেছে। এদের ঢেউয়ে নৌকা দুলছিল। বেশ জোরেই দুলছিল। তবুও নিশ্চিন্ত ছিলাম —মাঝি বৃদ্ধ হলেও ঢাকাই মাঝি। এরা এদেশে পদ্মানদী পাড়ি দিয়ে এসেছে। ঢাকাই মাঝির হাতে হাল দিয়ে নির্ভয়ে থাকা যায়।

এমন সময়ে এক সঙ্গে দুদিক থেকে নৌকার উপর সার্চ লাইটের ঝিলিক দিল। সবাই প্রমাদ গণলাম। এতটুকু নদী, গাধাবোট বাঁধা দুই জাহাজ কি করে পাশ কাটিয়ে যাবে। মাঝি নৌকা বেশ কূলেই রেখেছিল। তবুও সাবধানীর মত আরও কূলে নেবার জন্য বললাম।

মাঝি বলল,—না বাবু, আর না। বেশি ধারে গেলে জাহাজের ঢেউ কূলে আছড়ে নৌকা ভেঙে গুঁড়ো করে দেবে।

সোঁ সোঁ করে জাহাজ দুটি আমাদের কোনমতে পাশ কাটাল। প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল। বিনা সংঘর্ষে যখন পাশ কাটিয়ে গেল, নিশ্চিন্ত মনে নিঃশ্বাস ফেললাম—যাক্‌, বাঁচা গেল। কিন্তু...

কিন্তু বলার অবকাশ রইল না। স্টীমার পাশ কেটে যেতে না যেতে তোলপাড় করা ঢেউ এসে নৌকার এক মাথা স্বর্গে তুলে ঝপাং করে আবার নিচে ফেলে দিল। তবু নৌকা ডোবে না। পদ্মানদীর মাঝি ঠিকভাবেই নৌকার মুখ রেখেছিল।

খুল্লতাত চিৎকার করে উঠলেন,—মাঝি নেই! মাঝি নেই!

সত্যই মাঝি নেই। চিন্তার অবকাশ না দিয়ে দ্বিতীয় ঢেউ এসে নৌকার উপর জলের ঝাপটা মারল। মাঝির ছেলে মরণ চিৎকার করে নৌকার দুই জাপটে ধরেছে। খুল্লতাত হতভম্ব। ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। আর বোধহয় রক্ষা নেই। নৌকা জলে ভর্তি। কোন রকমে ভাসছে। আর এক ঢেউয়ে নৌকা তলিয়ে যাবে।

ভরসা ছিল, নৌকা কূলের ধারে। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকা সাঁতরে টেনে নিয়ে কোমর জলে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পদ্মানদীর মাঝির কথাটাই মনে ছিল—নৌকাকে কূলে আছড়ে ভাঙতে দেব না।

পদ্মানদীর মাঝিই বটে। ঢেউয়ের তোলপাড় কমতে না কমতেই সাঁতরাতে সাঁতরাতে এসে হাজির।

কি হয়েছিলো, প্রশ্ন করলে মাঝি হাঁপ নিয়ে বলল,—আর বলেন কেন,—যেন কুলোতে টোকা দিয়ে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল!

ধীরে ধীরে নদীর ঢেউ মিলিয়ে গেল। সবই ভিজে গেছে,—বিছানাপত্র, চাল ডাল সবই। নৌকার জল ছেঁচে সব ঠিকঠাক করে আবার আমরা যাত্রা করলাম দাকোপের উদ্দেশে।

দাকোপে কিছু লোকজন ও নৌকা ছিল। দুপুর রাত্রেই দাকোপে আসি। পরদিন সকালে রোদে বিছানাপত্র কাপড় চোপড় শুকিয়ে নিয়ে আবার রওনা হলাম শিবসা নদী পার হতে।

ভদ্রা ও শিবসাকে সংযোগ করেছে ঢাকি নদী। ভদ্রা নদী কুমিরের জন্য বিখ্যাত। সুনামটা যে মিথ্যা নয়, তা বুঝতে বাকি রইল না। দাকোপের লোকালয় ছাড়াতেই দেখি, চরের ওপর মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুমির রোদ পোয়াচ্ছে। নৌকা কাছে গেলেই তারা জলে নেমে পড়ে। বেশ বুঝলাম, সুন্দরবনের কাছে এসে পড়েছি।

ভদ্রার চার বাঁক এগুলে ঢাকি নদী। খালের মত ছোট নদী। খুবই শান্ত। দুপাশে মাঝে মাঝে সুন্দরবনের চাষীর ঘর। ঢাকি নদী শেষ হতে বেলা গড়িয়ে এলো।

সামনে শিবসা। বিরাট এই নদী। এপার ওপার পাঁচ মাইলের বেশি। জলের গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনেই পদ্মানদীর মাঝি বলল, —বাবু! ভারি নদী! গহীন গাঙ!

এপার ওপার প্রায় কিছুই দেখা যায় না। সূক্ষ্ম একটি মাত্র সবুজ রেখা দেখা যায়। কোনাকুনি 'নলছ্যাও' দিয়ে পার হতে হবে। ছোট্ট নৌকায় এই জলরাশিকে পার হতে আঁত্‌কে উঠতে হয়।

পদ্মানদীর মাঝি শিবসা নদীর জল জোড় হাতে তুলে গলুইতে ছিটিয়ে 'বদর বদর' বলতে বলতে নৌকা স্রোতের টানে ভাসিয়ে দিল।

ওপারে যেখানে সুন্দরবন শুরু হয়েছে সেখানেই হড্ডা নদী। হড্ডা বরাবর সুন্দরবনের উত্তর সীমানা ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। শিবসা নদীর প্রায় মাঝখানে এলে সুন্দরবনের রেখা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। গাঢ় সবুজ রেখা।

এপারে দূরে 'নলেন' ফরেষ্ট আপিস দেখা যায়। ঘাটে তাদের সাদা সাদা বোট আর ছোট্ট একখানা লঞ্চ। দেখলেই চেনা যায়, এটি বন-আপিসের লঞ্চ। লাল্‌চে রঙ। এদের হুইসেল বাঘের মত ডেকে ওঠে। ছেলে বেলায় এদের ডাক শুনে কত মনে করেছি—এরা

ঘাষের রাজ্যে থাকে কিনা তাই বাঘের মত ডাকে।

দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল বন। নৌকার উপর দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। ছেলেবেলার কত স্বপ্ন, কত রোমাঞ্চ জড়িয়ে আছে এই বনের নামে। বাঘের গর্জন, হিংস্র সাপের উদ্যত ফণা, কুমিরের তীক্ষ্ণ দাঁতের বিরাট মুখ-ব্যাদান, হরিণের আর্তনাদ, মানুষের অসহায়তা—সবই যেন চোখের উপর ভেসে উঠল। এই কি সেই বন!

বিকেলের দিকে নৌকা বনের ধারে এলো। একেবারে কাছে। ব্যগ্র হয়ে দেখতে চাইলাম প্রতিটি গাছ। কি পরিষ্কার আর কি শান্ত এই বন। একটি পাতার শব্দ হলেও চম্‌কে উঠতে হয় হিংস্র বাঘের আশঙ্কায়।

হুড্ডা নদী বেয়ে পশ্চিমে চলেছি। বাঁ দিকে সুন্দরবন আর ডানদিকে ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে দু-একখানা ঘরবাড়ি দেখা যায় কিন্তু কোনও মানুষের সঙ্গে দেখা নেই। হুড্ডাকে নদী না বলে, বড় খালই বলা উচিত ছিল। খুবই ছোট নদী।

সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে বেয়ে চলেছি। কিসের ভয় করব, যেন জানি না। বাঘ, না কুমির, না সাপ, না ডাকাত, না খুনীর। তাই আমরা বেপরোয়া। বেপরোয়া না হয়েই বা উপায় কি!

কিছুক্ষণ পরে জলে ছপ্‌ ছপ্‌ করে কি যেন আসছে। সামনে নদীর একটি বাঁক। তারই ওপার থেকে শব্দ আসছে। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। সবাই প্রতীক্ষায় রইলাম।

বাঁক ঘুরতেই দেখি, একখানা ছোট ডিঙি করে কয়েকজন আসছে। খুল্লতাত চুপি চুপি বললেন, —আগুন চাইলে বলবি, নেই।

—বাড়ি কোথায়?

উত্তর দিলে আবার ওরা প্রশ্ন করে, —কোথায় যাওয়া হবে?

কথায় কৃষকের মমতা। উত্তর পেয়েই ওরা সোজা চলে গেল।

'ডাক্তার-আবাদ' কতদূর জিজ্ঞাসা করলে দূর থেকে চিৎকার করে জানায়, —বেনেখালি আপিস সামনেই।

এবার নির্ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, —কই ওরা তো আগুন চায়নি?

খুল্লতাত অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া ডিঙির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সেই দিকেই মুখ রেখে বললেন, —ওরা ডাকাত না, তাই আগুন চায়নি।

কয়েক ঘণ্টা পরে বেনেখালি আপিসে আসতেই বুঝলাম, ডিঙির লোকেরা কেন বেনেখালির কথা বলেছে। এইখানেই আজ রাত কাটাতে হবে। কাল ভাটির টানে আবার মৈঁশেলী নদী ধরে এগুতে হবে। বেনেখালি খনিকটা জমাটি। বেশ কিছু লোকজন ও নৌকাও আছে।

রাতটা বেশ কেটে গেল। ওপারেই বন; এপারেও কিছু গাছগাছড়া আছে, তবে ফাঁকা গাছের আড়াল থেকে খোলা মাঠের আকাশ দেখা যায়। রাত্রে শুয়ে শুয়ে বাঘের ডাক শুনব আশা করেছিলাম। কিন্তু একবারও শুনতে পাইনি। তবে হরিণের ডাক অনেক শুনলাম।

পরদিন মৈঁশেলী নদী বেয়ে চলেছি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এবার আমরা দক্ষিণমুখী। সুন্দরবন বাঁ-দিকেই আছে। বেনেখালির লোকের উপদেশ ছিল, —বরাবর বাঁ-দিকে সুন্দরবন রেখে এগিয়ে যাবে। মাঝপথে অনেক নদী-খাল এসে মিশেছে দেখবে। কিন্তু সে-সব দিকে লক্ষ্য দিও না, বাঁ-দিকে বন রেখে এগিয়ে গেলে ঠিক কয়রা নদীতে পড়বে। এই কয়রা নদীতেই ডাক্তারের আবাদ।

উপদেশমত বাঁ-হাতে বন রেখে এগিয়ে চলেছি। সন্ধ্যারাত্রের অন্ধকারে বনকে চিনে চিনে চলেছি। সব কিছু ভুলে গিয়ে একমাত্র চিন্তা—বাঁ-হাতে যেন বন থাকে। এত পথ এলাম, কোথাও কোনও ঘাট বা বাজার পাইনি। নিশ্চিন্ত মনে রাত কাটাবার স্থান পাইনি। কাজেই রাত্রেই ডাক্তারের আবাদে পৌঁছতে হবে, এই আমাদের পণ।

চারদিকে অন্ধকার। নৌকাতেও ঢাকাই মাঝি আলো জ্বালাতে দেয়নি। নৌকায় আলো জ্বালালে দূরের কিছুই দেখা যায় না।

এমন সময় ব্যাঘ্র-গর্জন! মনে হল, আওয়াজ যেন পাহাড়ের গহ্বর থেকে বেরুচ্ছে। আওয়াজে দেহ কেঁপে উঠল। খুবই কাছে; মনে হল, আমাদের লক্ষ্য করেই যেন এই গর্জন।

—বা'জান্! —মাঝির ছেলে ডেকে ওঠে।

—ভয় নেই···নৌকা ওপারে দিচ্ছি! —বুড়ো মাঝি সাহস দিয়ে বলে।

আমরাও নৌকার বাইরে এসেছি। এপারে নৌকা আসতেই আমিও ভয়ার্ত হয়ে বেশ জোরেই বললাম, —মাঝি! কি করেছ, ঐ যে এপারেও বন! দুপারে বন! কি করেছ! কোথায় চলেছ?

বলতে না বলতেই এই পারে একপাল জন্তু বনের মধ্যে ছুটে পালাল।

চিৎকার করেই বললাম, —শিগগির্ মাঝ-নদীতে চলো! দুপাশেই যে বন!

—কিন্তু,···মাঝি যেন কি বলতে চাইছিল। আমার ভয়ার্ত চিৎকারে পদ্মানদীর শান্ত মাঝি সে-কথা না বলেই নৌকা মাঝ-নদীতে নিয়ে এলো।

এবার তার কথা সে ধীরে ধীরে বলে,—কিন্তু বাবু! মাঝ-নদীতে স্রোতের টান বড় বেশি। স্রোতে আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে ঠিক নেই!

মানচিত্রের কথা মনে করে আরও আতঙ্কিত হলাম। সত্যিই তো বঙ্গোপসাগর এখান থেকে তো বেশি দূর নয়! লোকালয় ছাড়ালে বন; বনের পরেই সাগর!

মাঝি ততক্ষণে স্রোতের বিপরীতে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে ধরেছে। বলল, —বাবু! আপনাকে দাঁড় ধরতে হবে।

মনে সংশয় নিয়ে বললাম, —কিন্তু এভাবে তুমি বে-গোনে কি করে এগুবে?

—নাই বা এগুলাম! আমাদের নৌকা অন্তত সাগরের দিকে বেশি দূর ঠেলে নিতে পারবে না।

তারপর চললো আমার ও খুল্লতাতের পালা করে দাঁড় টানা। আমাদের সর্বশক্তি অগ্রাহ্য করে স্রোতের টান আমাদের দক্ষিণে নিয়েই চললো। ক্রমেই গভীর অরণ্যে চলেছি। তবে নৌকার গতি মন্থর হয়ে পড়েছে।

ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে চলেছি, বেশ অনুভব করলাম। বাঘের গর্জন এবার দুপাশেই শুরু হয়েছে। অন্য জীবজন্তুর বিশেষ সাড়া নেই। শুধু একবার বন্য শূকরের বিকট চিৎকার কানে এলো।

শীতের রাত্রি। তবুও পরিশ্রমে ও আশঙ্কায় সারা দেহে ঘাম ঝরছে। রাত্রি তখন দুটো। ভাটির টান পড়ে এসেছে। ভরসা এলো মনে। নদী ক্রমশ চওড়া হলেও দুপারে বনের স্পষ্ট রেখা বেশ আঁচ করা যায়। সাগরের মুখে এখনও আসিনি। ধীরে ধীরে জোয়ারের টান এলো। দাঁড় ছেড়ে নিশ্চিন্ত মনে যেন আরামে বসলাম। নৌকা এবার উত্তরদিকে আপনা থেকে এগিয়ে চলেছে। কয়রা নদীর মুখে কখন আসব, উৎসুক হয়ে তাই ভাবছি।

—বাবু! বাবু! —এবার পদ্মানদীর মাঝির মুখেও যেন ভয়বিহ্বল সুর।

—এখনই আমাদের তীরে যেতে হবে। জোয়ার এসেছে। সোনা পানির জোয়ার। —আশঙ্কা-বিহ্বল-কণ্ঠে বলে ওঠে।

যে-মাঝি কোন দিন ভয়কে ভয় মনে করে না, তাকে ভীত হতে দেখে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। প্রতিবাদও না। এবার তীরে। বাঘের রাজ্যেই উঠতে হবে।

তীরে এসে নৌকা ভিড়তে না ভিড়তেই দেখি, দশ হাত পরিমাণ উঁচু হয়ে সাঁ সাঁ করে জোয়ারের জল ছুটে আসছে। লগি পুঁতে মাঝি নৌকা বাঁচাবার নানা কায়দা করল। বাঘ কাছে আছে কি না আছে, আক্রমণ করবে কি করবে না—সে-প্রশ্ন পরে। আপাতত জোয়ারের বান থেকে বাঁচতে হবে।

পরপর কয়েকটা বান এলো। আমরা বেঁচেই রইলাম। নৌকাও রক্ষা পেলো। তবে দেহের শক্তি একেবারে নিঃশেষে নিংড়ে নিয়েছে।

শান্ত নদীতে এবার জোয়ারের টান। মাঝিও শান্ত হয়ে যেন বলে, —সবাই এবার আরামে বসতে পারেন। —ছেলেকে তামাক সাজতে বললো। তীরের বেগে নৌকা ছুটলো বাঘের রাজ্য ছেড়ে মানুষের রাজ্যে—বাদা ছেড়ে আবাদ অঞ্চলে।

ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। কি অপরূপ দৃশ্য বনানীর। যেন নদীর দুধারে সাজান বাগান। পশ্চিম পারে চরের উপর হরিণের পাল দেখা যায়। শীতের ভোরে তারা এসেছে রোদ পোয়াতে। গাছে গাছে বানরের দলও লাফালাফি শুরু করেছে।

'মা—ঝি !··· মা—ঝি !' —গভীর অরণ্যে মানুষের গলা! তবে কি সুন্দরবনে বন্য-মানুষ আছে? আবার ডেকে ওঠে,—মা—ঝি···মা—ঝি!

দেখি, ছোট একটি মানুষ বনের ভিতর থেকে এগিয়ে এসে হাত ইশারা করে ডাকছে। কপালকুণ্ডলার কাপালিকের কথা মনে পড়ল। তবে কি সেই কাপালিক আজও বেঁচে আছে! আজও সে ঘুরে বেড়ায় সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে নরবলির সন্ধানে! নৌকা বেশ জোরেই চলছিল। ওর ডাকের কোনও সাড়া না দিয়ে সবাই মিলে তাকিয়ে দেখছিলাম।

কারও মুখে কোনও কথা নেই। মাঝি একবার আমার দিকে তাকাল, আমার মত জানবার জন্য। মনে মনে আমার ইচ্ছা ছিল, এড়িয়ে যাওয়া—কি জানি কি বিপদে পড়ি!

নৌকা ওকে ছাড়িয়ে চলে যায় দেখে বনের মানুষ নিচু হয়ে কি একটা জিনিস তুলে নদীর চর ধরে নৌকার সঙ্গে এগুতে লাগে।

এবার তার গলায় আদেশের সুর। চিৎকার করে বললো, —নাও ভেড়াও! ···ভেড়াবে না? ···শীগ্‌গির ভেড়াও।

ভাল করে চেয়ে দেখি, ওর হাতে বন্দুক! মাঝি নৌকা ভিড়িয়ে দিলো। কাছে আসতেই দেখি, কাপালিকের চেহারার কোনই সাদৃশ্য নেই। রক্ত তিলক চিহ্নিত, দীর্ঘ কপাল সমন্বিত, প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ বাহু, তেজদৃপ্ত চেহারা, —কিছুই না। অবাক হয়ে চেয়ে দেখি, সুন্দর শান্ত চেহারার মানুষ। মুখে বিরাট একজোড়া তামাটে গোঁফ। থুতনিতে ছোট করে কাটা পাতলা পাকা দাড়ি। মাথায় বড় বড় আধপাকা চুল। দীর্ঘ কপাল। অভিজ্ঞ জীবনের তিনটি স্পষ্ট বাঁকা রেখা যেন কপালে খোদাই করা। ছোট্ট দেহ। সুঠাম কিন্তু সবল নয়। চোখে কোনও চঞ্চলতা নেই, কোনও কপটতা, কোনও হিংস্রতা নেই। শান্ত স্থির দুটি বড় বড় চোখ। অপলক দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে না আছে শঙ্কা, না আছে বিস্ময়। গায়ে গামছা। পরনে লুঙি, আঁট করে পরা।

কথা নেই বার্তা নেই, নৌকার উপর বন্দুকটি রেখে এক ধাক্কা মেরে নৌকা ভাসিয়ে গলুইতে বসে পড়ল।

জিজ্ঞাসা করল আমাদের, —কোথায় যাবেন ?

বললাম, —ডাক্তারের আবাদে।

শুনেই বলল, —ও! আমিও তো সেখানকার লোক! চলুন! কিন্তু আপনারা এই বাদায় এলেন কি করে ?

আমাদের বিপদের কাহিনী সব বলে জিজ্ঞাসা করলাম, —তোমার নাম কি ?

—আর্জান সর্দার।

—বনে তুমি একা একা ছিলে ? তোমার দলে আর কেউ আছে ?

—না বাবু, আমি একাই।

—রাত্রে এমন ভাবে বনে কেন ?

—হবে বাবু, সে কথা পরে হবে।

এই ছোট শান্ত দুর্জয় মানুষটি চিনবার চেষ্টা করেছি এর পর দশ বছর ধরে। আর্জান আমার জীবনের এক আবিষ্কার। ধারণা ছিল, শিকারীর কাছে ভাল গল্প শোনা যায়। তাতে আবার বৃদ্ধ শিকারী, —গল্প বলতেই হয়ত ভালবাসবে। কিন্তু আর্জান গল্প করতেই জানে না। গল্প করার মত ঘটনাও সে মনে রাখে না। তবুও আর্জানের সঙ্গে ঘুরেছি দশ বছর, তার জীবনের কাহিনী শুনবার জন্য। ঘুরেছি তার সঙ্গে হাটে, মাঠে, ঘাটে, —ঘুরেছি বনে বনে—সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে। ঘুরে বেড়িয়েছি আর্জানের সঙ্গে হরিণ-শিকারে, বাঘের সন্ধানে। হয়ত বা, গভীর বনে ঘুরতে ঘুরতে তার কোন পরিচিত স্থানে হাজির হলে সেই বনের একটা পুরনো ঘটনা তার মনে পড়ে যায়। সরলভাবে বিনা আড়ম্বরে ঘটনাটি বলে।

হয়ত বা একটা হরিণ বা বাঘ নতুন করে শিকার করলে পুরনো একটা শিকারের অবাক্ করা ঘটনা তার মনে পড়ে যায়। আগ্রহ দেখালে ঘটনাটি তখন অল্প কথায় বলে যায়।

তারই বলা সেই সব বিক্ষিপ্ত কাহিনী একত্রিত করে আর্জানের এই জীবন-উপন্যাস। এই জীবন-উপন্যাসের কোনও ইতি টানতে পারিনি। আজও আর্জান জীবিত। আজও হয়ত সত্তর বছরের আর্জান নিঃশব্দ পদচারণে সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে ঘুরে বেড়ায় রাতে ও দিনে। হয়ত সুঠাম দেহে লোল চর্ম দেখা দিয়েছে, হয়ত তার নিশ্চিন্ত পদক্ষেপ স্খলিত হয়ে এসেছে, হয়ত তার অব্যর্থ তর্জনি আজ কেঁপে ওঠে বন্দুকের ঘোড়ার সামনে, তবুও এই ছোট্ট দুর্জয় মানুষটি আজও হয়ত ঘুরে বেড়ায় মাথায় গামছা জড়িয়ে, হাতে বে-পাশী বন্দুক ঝুলিয়ে, স্থির সন্ধানী ও অপলক দৃষ্টিতে—সুন্দরবনের রন্ধ্রে, ব্যঘ্রের 'আঁটি' ও ঘাটির সন্ধানে।

দুই

সুন্দরবনের চাষীর বাড়ি। গরীব চাষীর বাড়ি। গরীব হলেও অন্নের অভাব তখনও দেখা দেয়নি এই চাষীর বাড়িতে। শীতের সন্ধ্যায় গোবর দেওয়া ঘর ও উঠান তক্‌তক্ করছে।

এই উঠানের পাশে একটি বেশ পুরনো হেঁতাল গাছ। সন্ধ্যা হতেই মা এসে একটা প্রদীপ জ্বেলে দিলেন এই গাছের তলায়।

আর্জান পাশেই ঘরের দাওয়ায় বসে ছিল। ছেলেবেলা থেকে আর্জান মাকে এমনি আলো দিতে বহুবার দেখেছে। নামাজ পড়াও যেমন রীতি ছিল তাদের সংসারে, তেমনি এই আলো দেওয়াও এই সংসারের রীতি। কিন্তু আর্জানের এখন প্রশ্ন করবার বয়স হয়েছে। মাকে সে শুধায়,—

—আম্মা, হেঁতাল গাছে রোজ বাতি দাও কেন?
—তুই জানিস নে। না দিলে গুনা হয়।
—কিসের গুনা?
—গুনা আবার কিসের? গুনা হয়, তাই বাতি দিতে হয়।
—না আম্মা, তোমায় বলতে হবে। কই আর কোন বাড়িতে তো হেঁতাল গাছে বাতি দেয় না।
মা আর কিছু না বলেই চলে গেলেন। কিন্তু আর্জান নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত তার মাকে রাত্রে শোবার সময় এই হেঁতাল গাছের কথা বলতেই হলো।
শীতের রাত্রি। ঘোর অন্ধকার। পাশের ঘরে চাচির মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। দূরে খামার ঘরে টেমি জ্বালিয়ে ধান মাড়াই হচ্ছে। সেখান থেকে গরু তাড়াবার আওয়াজ মাঝে মাঝে আসছে। এ ছাড়া এই কয়েক ঘর লোকের গ্রামে কোনও সাড়াশব্দ নেই। মাটিতে মাদুরপাতা বিছানায় আর্জান কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে আছে। কাছেই মা কেরোসিনের কুপির পাশে বসে। মার ছায়া পড়ে বাকি ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর মা আস্তে আস্তে আর্জানের মাথায় হাত দিয়ে বললেন:
—শুনতে চাস্? সে অনেকদিন আগের কথা, ...দশ বছর আগের কথা। তোর বয়স তখন দুই বছর। তখন শীত শেষ হয়ে গেছে। ফাল্গুন মাস। মাঠে কোনও কাজ ছিল না। তোর বা'জান বলল: বসে বসে কি হবে। বন থেকে কিছু মধু কেটে আনা যাক। —তোর মতই ঠিক একগুঁয়ে লোক ছিল। 'না' বলবার উপায় নেই। পরদিন বড়মেঞার বাড়ির রসিদ আর মোহন মোল্লাকে সঙ্গে নিয়ে বনে চলে গেল।
আর্জান চকিত হয়ে বলল, —তারপর।
—তারপর! বলেই মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন:
—তারপর! রসিদ বললো, তোর বা'জান দূরে এক মধুর চাক দেখে খুশি হয়ে সেদিকে একাই ছুটে যায়। আমার মরণ! মধুর চাকের কাছে যেতে না যেতেই বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কোমরে কামড়ে ধরে। কি আর করবে তখন। হাতেও কিছু ছিল না। চিৎকার করতে থাকে আর হাত পা ছুঁড়তে থাকে।
আর্জান ততক্ষণে উঠে বসেছে। মায়ের কাঁধ চেপে ধরে বলে, —মোহন চাচা তখন কি করল?
—কি আর করবে বাঘের সামনে!
—রসিদমামু কি করল?
মা বলে চলেন, —বাঘে যখন মুখে করে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে লাগল, তখন তোর বা'জান চিৎকার করতে থাকে আর দুই হাত দিয়ে এমনি করে গাছপালা ধরবার চেষ্টা করতে থাকে—বলেই মা তাঁর সবল মুঠো দিয়ে মাদুরের কোণটা চেপে ধরলেন, —কিন্তু তাতে কি হবে। হাতের মুঠো না খুললে কি হবে। বাঘের মুখের টানে গাছের চারাগুলি উপ্‌ড়ে যেতে লাগল। মুঠোর গাছ তখন ফেলে দিয়ে তোর বা'জান আবার নতুন গাছ ধরতে লাগে। হাতের জোরও বোধহয় ততক্ষণে কমে এসেছে। হিঁচড়ে টেনে নিয়ে বাঘ বনের মাঝে চলে গেল।
আর্জান অন্ধকারে বড় বড় চোখে এক নজরে মায়ের চোখের কোণে তাকিয়ে বলল, —তারপর?
মা বললেন, —তারপর! তারপর সব শেষ। ...হ্যাঁ, তারপর মোহন ও রসিদ মোল্লা

বাউলে ডেকে নিয়ে বাঘের খোঁজে গিয়েছিল। সেইদিনই বিকেল বেলা। বাঘের পায়ের দাগ আর রক্ত দেখে দেখে ওরা নাকি অনেক দূর গিয়েছিল। বাঘের পায়ের খোঁচ দেখে বাউলে বলল, —আঁধার হয়ে আসবে এখুনি ; খোঁচ দেখে মনে হয়, বাঘটা খুব পুরনো ও বড় ; সাঁঝের বেলা এই পুরনো বাঘের পেছনে যাওয়া ঠিক না। ওরা তখন ফিরে আসে।

আর্জান চঞ্চল হয়ে ওঠে, —ফিরে এলো !!

মা চুপ করেই আছেন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললেন, —মোহন আসবার সময় একটা ছোট গাছের চারা নিয়ে আসে। এনে বলল, —এমনি ধারা অনেক ছোট চারা গাছ উপড়ে গিয়েছিল তোর বা'জানের হাতের টানে। সেই চারা গাছটার পাতায় তখনও এক ফোঁটা রক্ত লেগে ছিল।

আর্জান এবার চুপ হয়ে গেছে। কাহিনীর বাকিটুকু আর তার শুনতে হয়নি। ছেলেবেলা থেকে সে শুনে এসেছে—তার বা'জানকে বাঘে খেয়েছিল। কিন্তু এই দশ বছরের পুরনো হেঁতাল গাছটা তারই বা'জানের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে দাঁড়িয়ে আছে—এ-কথা তার আগে জানা ছিল না। তার ইচ্ছা হলো, সে একবার তখনই দেখে আসে,—সন্ধ্যায় হেঁতাল গাছটির তলায় আম্মার দেওয়া প্রদীপটি তখনও জ্বলছে কিনা। কিন্তু এই নিশুতি রাতের গভীর অন্ধকারে মাকে একা ফেলে সে যেতে পারল না।

পরদিন। সংসারের অনেক কাজ আর্জানের করতে হয়। গরু দেখা আছে ; মাছ মারতে হয় ; মাঠ থেকে ধানের আঁটি বয়ে আনতে হয়, কাছারি বাড়ি যেতে হয়, —এমনি অনেক কাজ। সারাদিন অবসর মেলে না। তখন বেলা সবে পড়ে এসেছে। সন্ধ্যা তখনও হয়নি। কাছারির খামারে আঁটি গুণবার কাজে খুব ব্যস্ত। আঁটি গুণে নায়েবকে হিসেব দিতে হবে। বিশ আঁটি ধান কেটে দিলে এক আঁটি ধান মজুরি পাওয়া যায়। গুণতে গুণতে হঠাৎ সে থেমে গিয়ে বলল :

—নায়েব মশায়, আজ থাক্, কাল গুণে দেব।

নায়েব হুঙ্কার দিয়ে উঠল, —কাল কেন রে !!

—হ্যাঁ, কাল দেব, সকালে এসেই গুণে দেব···ঠিক দেব··· —বলেই আর্জান ছুটে বাড়ির দিকে গেল।

বাড়ির উঠানে এসেই অতি সন্তর্পণে এগিয়ে হেঁতাল গাছটির দিকে এক নজর দেখে নিয়ে চিৎকার করে মাকে ডেকে বলল :

—আম্মা, আম্মা, কই প্রদীপ দিলে না।

মা তখন গোয়াল ঘরে বাছুরটাকে খোঁয়াড়ে পুরছিলেন। সেখান থেকেই বললেন, —দাঁড়া, সন্ধ্যা এখনও হয়নি।

হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে মার আসতে দেরি হল। শীতের সন্ধ্যা, বাতাসের লেশমাত্র নেই। গোয়ালের ধোঁয়াগুলিও থম্ মেরে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। মা প্রদীপ হাতে এগিয়ে এসেছেন। আর্জান ছুটে গিয়ে প্রদীপ শিখার দুপাশে হাত দিয়ে আড়াল করে মায়ের সঙ্গে চলল।

মা বললেন, —ওরকম করছিস্ কেন ? কই, বাতাস তো নেই।

আর্জান শিখার দিকে একান্তভাবে দৃষ্টি রেখে বলল :

—যদি নিবে যায় !

তিন

আর্জানের গ্রামের নাম কালিকাপুর। খুলনা জেলার সুদূর বন ও লোকালয়ের সীমান্তে এই গ্রাম। গ্রাম বললে হয়ত ভুল হবে। চারদিকে নদী নালা। তারই মাঝে মাঝে ধু ধু করছে মাঠ। নদীর লোনা জল থেকে শস্য বাঁচাবার জন্য মাঠগুলির চারদিকে দশহাত উঁচু মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা। এই বাঁধের ধারে ধারে মাটি উঁচু করে চাষীরা ঘর বাঁধে। কিছু গাছপালাও জন্মায়। কয়েক মাইল দূরে দূরে এই চাষীর পাড়া আছে। একেই এদেশের লোকে গ্রাম বলে।

মাত্র ষাট বছর আগে ভাটি অঞ্চলের মানুষ বাদা কেটে কালিকাপুরের আবাদ পত্তন করেছিল। কয়রা নদী সাপের মত বেঁকে কালিকাপুরকে তিন দিকে ঘিরে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে বয়ে গেছে। কয়রা নদী বরাবর এক পাশে বন। অন্যপারে লোকালয়। বাদা ও আবাদের সীমানা।

কয়রা অতি ছোট নদী। এপার থেকে ওপারের বনকে স্পষ্ট দেখা যায়। বাঘের রাজ্য আর মানুষের রাজ্যের এই সীমানা খুবই নগণ্য। মানুষের কাছেও এই সীমানা যেমন কোন বাধাই নয়, বাঘ ও হরিণের কাছেও এই সীমানা তেমনি কিছুই নয়। সুন্দরবন অসংখ্য নদীনালায় পূর্ণ। সুন্দরবনের জীবজন্তুকে অনবরতই এই নদীনালা পার হতে হয়। কয়রার এপার থেকে চাষীরা বাঘের আর হরিণের ডাক শুনে জল্পনা করে ; বাঘ ও হরিণও ওপার থেকে মানুষের কোলাহলে চমকিত হয় না।

আর্জানের বাড়ি কালিকাপুরের দক্ষিণ প্রান্তে। খুলনা জেলার শেষ বসতি বলা যেতে পারে। বাঙলার লোকালয়ের শেষ সীমানা। বাঙলারই ভিটেমাটি—তবুও এই লোনাজল আর লোনামাটির দেশ, বাঙলার মিষ্টিজল আর মিষ্টিমাটির মানুষ থেকে যেন অনেক দূরে।

এদেশে পথ নেই বললেই হয়। তবে ঘাট আছে অজস্র, গ্রামে গ্রামে সর্বত্র। অফুরন্ত নদ ও নদীর দেশ। কালিন্দী, রায়মঙ্গল, কপোতাক্ষী, মৈশালি, শিবসা, ভদ্রা, পশর, কয়রা, মার্জার—কি সুন্দর নামই না এই নদ ও নদীর।

এই সব নদীপথে দূর দূরান্ত থেকে বাঙলার মানুষ আসে লোনা দেশে। তারা আসে লাল, নীল, হলদে রঙের পাল টাঙিয়ে, জোয়ার আর ভাটির টানে নৌকা ভাসিয়ে, —লোনামাটির সোনার ফসল ও বন সম্পদ বয়ে নিতে।

সংসারের অনেক কাজ ; তবুও তার মাঝে আর্জান গ্রামের ছেলেদের নিয়ে হুটোপাটি করে। ছেলেদের মাঝে কলিমের বড় ছেলে মাদার তার সব চেয়ে প্রিয়। আর্জান ও মাদার গ্রামের ছেলেদের নেতা বললেই হয়।

ওরা দল বেঁধে খেলা করে বেড়ায় নদীর ধারে ধারে বাঁধের উপর। খেলার জিনিসের ওদের অভাব নেই। টিয়া প্যাখির ঝাঁক ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করে। বাঁদর দেখলে ওরা দল বেঁধে তাড়া করে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ওপারের বনের সঙ্গে কত কথাই না ওরা বলে। প্রতিধ্বনির আওয়াজ ওপার থেকে ভেসে আসে। শিষ দিলেও বনও শিষ দেয়। হেসে ওঠে ছেলের দল। বনও হেসে ওঠে। ভাবে কি মজা, বন কি মজার।

কিন্তু ওদের সব চেয়ে মজার খেলা 'বিদেশী' না'য়েদের সঙ্গে। কতদূর থেকে কত রকমের বড় বড় নৌকাগুলি আসে। বালাম, পান্‌সী, বাছাড়ী, ঢাকাই পলওয়ার—কত রকমারি না তাদের গড়ন। কয়রা নদীর স্রোতের টানে টানে তারা কালিকাপুরকে বেড় দিয়ে আবার চলে যায় কত দূর।

আজ সকালেই জোয়ার। একের পর এক রঙবেরঙের পাল টানিয়ে নৌকাগুলি চলেছে।

পূব দিকে দূরে গাছের মাথার উপর লাল রঙের পাল দেখে আর্জান বলল:

—এবার কিন্তু আমি! দেখছিস্ কত বড় পাল? খুব বড় নৌকা। এবার কিন্তু আমি!

সত্যই বড় নৌকা। মোড় ঘুরতেই আর্জান চিৎকার করে বলে:

—ও! নাইয়ে! তোমরা কোথায় যাবে?

নাইয়ে কোন উত্তর দেয় না। আর্জান আবার চিৎকার করে, —ও নাইয়ে! তোমরা কোথায় যাবে?

ছেলেদের অতো উৎসাহ দেখে হালের বুড়ো মাঝি বলল, —ক—ল—কা—তা—য়!

মাদার যেন আর থাকতে পারে না। চিৎকার করে ওঠে:

—কলকাতা কতদূর!

—সে অ—নে—ক দূর। যেতে পাঁচ দিন। দশ জো'র পথ।

আর্জান অবাক হয়ে বলল, —পাঁ—চ দিন!

মাদার আবার মাঝিকে প্রশ্ন করল, —এত বোঝাই মরা গরুর হাড় কেন?

—বিক্রি করব।

—কলকাতার মানুষ কি হাড় খায়?

ততক্ষণে হাড়ের নৌকা সাঁ সাঁ করে ওদের ঘাট ছেড়ে চলে গেছে। বুড়ো মাঝি হেসে কি বলল তা শোনা যায় না।

আবার একখানি নৌকা আসছে। সাদা রঙের পাল। ছেঁড়া পাল। সাদা রঙ। আর্জানের ভাল লাগে না। মাদারের পালা এবার। পালখানা যেন ছুটে আসছে।

মাদার বলে, —দেখছিস্ কি জোরে আসছে? বল্‌তো কিসের নৌকো?

কে আগে বলতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। বাঁধের উপর দিয়ে ওরা ছুটে গেল সামনের ঘাটে। মাদার আগেই গিয়েছিল। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েই বলল, —হাঁড়ি! হাঁড়ি!

লম্বা পান্‌সী একটু কাছে আসতেই মাদার বলল, —ও কুমোর না—ই—য়ে! তোমরা কোথায় যাবে?

নিস্তব্ধ গহন অরণ্যের পাশে ছেলেদের আওয়াজ শুনে মাঝি-মাল্লার মজাই লাগে। দাঁড় থামিয়ে বলল, —কুমির যাবে বাঘের হাটে।

—তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—খুলনায়।

—কত দূর?

—চার ভাটি পাঁচ জো।

—কদিন লাগে যেতে।

—হিসাব করে নাও।

মাদার ও আর্জান হিসাব করতে করতে হাঁড়ি-কলসীর পান্‌সী ওদের ঘাট পিছনে ফেলে কল্‌-কল্‌ করে কয়রা নদীর বাঁক ঘুরে চলে যায়।

শীতের শেষ। নদীর ধারে গ্রামের সবাই বাঁধ বাঁধছে। ছেলে বুড়ো সবাই আছে। আর্জান আর মাদারও আছে। বর্ষার আগেই বাঁধ রিপু করার কাজ সেরে নিতে হয়। নইলে বর্ষা এলে সব জলে জলাকার হয়ে যায়; কোথায় পাওয়া যাবে মাটি তখন? তাছাড়া চৈত্রের রোদ খাইয়ে রিপু করা বাঁধও নতুন বর্ষার আগে শক্ত করে নিতে হবে।

বাঁধকে এদেশে ভেড়ি বলে। এরা দল বেঁধে ভেড়ির কাজ করে। তাছাড়া উপায়ও নেই। দশ বারো হাত নিচু থেকে মাটি তুলতে হবে ভেড়ির মাথায়। লাইন দিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যায় অনেকে—কোদালির কাছ থেকে ভেড়ির মাথা পর্যন্ত। তারপর হাতে হাতে চালান দিয়ে, প্রতি সেকেণ্ডে ঝপ্ ঝপ্ করে মাটির চাঁক ভেড়ির উপর ফেলে।

একটু দূরে কলিমের দশ বছরের মেয়ে ফতিমা একখানা গামছা পরে দাঁড়িয়ে। মুখে আঙুল দিয়ে অবাক হয়ে দেখছিল এদের কাণ্ড-কারখানা।

—কিসের যেন হল্লা শোনা যায়!! —বলেই আর্জান নদীর ধারে ছুটে যায়। ভেড়ি থেকে নদীর কিনারা চল্লিশ হাত হবে। নদী বরাবর এই চরা প্রায় বনের মত জঙ্গলা।

নদীর ধারে গিয়েই আর্জান চিৎকার করে ওঠে, —বাঘ! বাঘ!

সবাই চকিত হয়ে কাজ ফেলে রেখে এক জায়গায় জড়ো হয়ে পড়ে। ফতিমা এক ছুটে বাড়ি গিয়ে খিড়কির বাঁশ টেনে মাকে ডাকতে থাকে।

গ্রামের একচ্ছত্র নেতা ধনাই মামু ছুটে এগিয়ে যায়। নাম ধনাই মোড়ল, কিন্তু গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই তাকে 'ধনাই মামু' বলে ডাকে।

ধনাই মামু দেখে বলে, —দূর বোকা। এই বুঝি বাঘ? হরিণ সাঁতরে আসছে। বনে বাঘ তাড়া করেছে; পরাণের দায়ে এপারে আসছে।

চকিতে ধনাই মামুর মতলব খেলে যায়। সবাইকে আদেশ করল, —জল্‌দি সবাই লাইন দিয়ে ভেড়ি বরাবর জঙ্গলটা ঘিরে ফেল্। হরিণ ধরতে হবে।

মামু আদেশ দিতে না দিতেই সবাই মিলে পাঁচ-ছয় হাত দূরে দূরে দাঁড়িয়ে জঙ্গলটা ঘিরে ফেললো।

আর্জানও একটা কোণে দাঁড়িয়েছে। ভেড়ির কিনারায় নরম মাটিতে এক পা ভাল করে বসিয়ে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছে, —ভয়! কিসের ভয়? এত লোক আছে! মামু বললো বটে, কিন্তু যদি এটা বাঘ হয়! আমি জলের উপর হলদে কান দুটো স্পষ্ট দেখলাম।

'ফস্-ফস্-ফস্' আওয়াজে আর্জানের কান খাড়া হয়ে যায়। 'ফস্-ফস্-ফস্'। আর্জান বিড়্ বিড়্ করে বলে—না, ধনাই মামু বুঝতেই পারেনি। কিছুতেই হরিণ নয়।

সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জঙ্গলের ভিতর হরিণ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। জঙ্গলের ভিতর গিয়ে দুজনে ঝোপে ঝাড়ে লাঠিপেটা করছে; তবুও কোনও সাড়া নেই।

হঠাৎ একজন 'ধর্ ধর্' করে চিৎকার করে উঠল। আর চারদিক থেকে আওয়াজ ওঠে—ধর্ ধর্!

আর্জান ভেড়ি থেকে বেশ নিচে দাঁড়িয়ে; ভেড়ির মাথা আর্জানের মাথা থেকেও তিন-চার হাত উপরে।

চিৎকারে চমকে উঠে আর্জান চেয়ে দেখে, তীরবেগে ছুটে এসে হরিণ চটাং করে তারই মাথার উপর দিয়ে ভেড়ি লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে। দিশেহারা হয়ে আর্জান শূন্যে হরিণের

পেছনের একখানা পা ধরে ফেলে। পা ধরতেই হরিণ কাদায় পড়ে যায়। আর্জানও প্রাণপণে জোরে তাকে কাদায় চেপে ধরে। কাৎ হয়ে পড়ে গিয়ে হরিণ ক্ষিপ্রবেগে বাকি পাগুলি ছুঁড়তে থাকে। ধারাল খুরের আঘাতে আর্জানের কপাল কেটে রক্ত ঝরে পড়ে।

ততক্ষণ হৈ চৈ করে সবাই ছুটে এসে হরিণকে চেপে ধরেছে। মাদার ছিল দূরে,ছুটে এসে আর্জানকে জোর করে টেনে নিল ; ঘাস চিবিয়ে গামছা দিয়ে তার ক্ষতস্থান জোরে বেঁধে দিল।

আর্জান ধনাই মামুর কাছে এসে বলল, —মামু, হরিণ কি 'ফস্ ফস্' করে ?

—কেন ?

—এই এদিকে এসো মামু! ঐ শোনো, শুনতে পাওনি ?

ধনাই কান পেতে একটু চুপ করে থাকে। তারপরেই চঞ্চল হয়ে উঠে বলে, —হে! ভেড়ির উপরে উঠে আয়! সব উঠে আয়! শীগ্গির আয়!

সবাই ইতিমধ্যে হরিণকে বেঁধে ফেলেছে। মামুর কথায় সবাই হরিণকে টেনে নিয়ে ভেড়ির মাথায় উঠল।

মামু পাগলের মত একাই ছুটেছে পাশের বাড়িটাতে। কি ব্যাপার সবাই বুঝতে না বুঝতেই দেখে, মামু পাশের বাড়ি থেকে দুখানা বাঁশ ক্রস্ করে গরুর দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে ছুটে আসছে। এই ভাবে বাঁধা বাঁশকে ওরা তেকাঠা বলে। তেকাঠা দেখে সবাই আবার চঞ্চল হয়ে উঠল।

আর্জান যাকেই সামনে পায় তাকেই প্রশ্ন করে, —কি হলো ?

—চুপ্‌চুপ্! —সবাই চুপ করতে বলে।

মাদারও কোন উত্তর দিতে পারে না। সবচেয়ে বলিষ্ঠ কলিমের ডাক পড়ল ; তাকে তেকাঠার একটা বাঁশের মাথা ধরতে বলে মামু নিজেই আর একটা বাঁশের মাথা ধরল।

মামু চুপি চুপি বলল, —আয়, তোরা সব পিছু পিছু আয়।

ঝোপের মাঝে ঢুকে মামু ও কলিম পা টিপে টিপে চলেছে, আর পিছনে অন্য সবাই কেউ লাঠি নিয়ে, কেউ খালি হাতে। কারুও মুখে টুঁ শব্দ নেই।

আর্জানও দলের মধ্যে আছে। মাদার তার সামনে।

ওদিকে গলায় ফাঁস-গিঁট দিয়ে হরিণকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে সবাই চলে এসেছিল। বনের হরিণ বাঁধা পড়ে একবার শূন্যে লাফ দিচ্ছে, আর দড়াম্ করে মাটিতে পড়ছে। সেই ধুপ্-ধাপ্ শব্দ ছাড়া আর কোথাও শব্দ নেই। আর্জানও সবার কাছে তাড়া খেয়ে আর প্রশ্ন করতেও সাহস পায় না। দলের সঙ্গে চলেছে কিন্তু আর্জানের বুক মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। হরিণ ধরা পড়েছে বটে, কিন্তু বাঘের কথা সে ভুলতে পারেনি।

হুড়মুড় করে ঝোপের মাঝে শব্দ হয়ে ওঠে। আর্জান ভীত হয়ে মোহন মোল্লার হাত জড়িয়ে ধরল। মামু ও কলিম ঝোপ ঝাড় ভেঙে হঠাৎ দৌড় দিয়েছে।

—ধর্ ধর্, তাড়াতাড়ি লেজ ধর্—ধনাইমামুর বেপরোয়া চিৎকার।

বিরাট এক ময়াল সাপ। মামু ও কলিম ময়ালের গলাটা তেকাঠা দিয়ে চেপে ধরবার সঙ্গে সঙ্গে তার লেজটা প্রায় সে বাঁকিয়েছিল। একবার বাঁকাতে পারলে, যাকে সামনে পেত তাকে লেজে জড়িয়ে হাড়গোড় ভেঙে চুরমার করে মেরে ফেলত। কিন্তু সবাই মিলে ততক্ষণে প্রাণপণে লেজটা চেপে ধরেছে।

ধনাই মামু বলল, —মার্ মার্, এইবার পিটিয়ে মার্!

আর্জানের এতক্ষণে বুকে সাহস এসেছে। সেও লাঠি নিয়ে দুম্‌দাম্ মারতে থাকে।

মরা ময়ালকে সবাই মিলে এবার টেনে নিয়ে এল। তাদের আনন্দ আর ধরে না। এত বড় সাপের চামড়া বেচে তারা অনেক টাকা পাবে।

আর্জানের কিন্তু সাপের থেকে হরিণের কথাই বেশি মনে পড়ছে। হরিণটা সে-ই প্রথম ধরে মাটিতে ফেলেছিল। হরিণের রঙও হলদে। বাঘও হলদে। আচ্ছা, ওটা যদি হরিণ না হয়ে বাঘ হত। তাহলে কি অমন ভাবে পা ধরে কাদায় চেপে ধরতে পারত! পারত ও, নিশ্চয় পারত, —আর্জান ভাবতে থাকে। মাদারকে ফেলে ছুটে যায় হরিণের কাছে।

হরিণ কিন্তু এদিকে লাফের পর লাফের টানে গলার দড়িতে ফাঁস এঁটে দম আটকে মরেই গেছে।

সকলেই ময়াল সাপের চামড়া আর হরিণের মাংস নিয়েই ব্যস্ত। আর্জানের ওসব ভাল লাগে না। সব কিছু ফেলে হরিণের চামড়াটাই সে চেয়ে নিয়ে এলো। কেমন সুন্দর চামড়া! কত মোলায়েম! ডোরা রঙ। গাল দিয়ে স্পর্শ করল। কাঁচা মাংসের গন্ধ। লোমে বুনো গন্ধ। শুকিয়ে গেলে এ গন্ধ থাকবে না। মাকে গিয়ে সে দেখাবে, তার জীবনের প্রথম হরিণ শিকার! ...শিকার! বন্দুক তো তার নেই। বন্দুক ছাড়া এ কেমন শিকার! মাকে সে এই চামড়া উপহার দেবে। আর কাউকে দেবে না। বিক্রিও করবে না।

পাঁচ

ফসল ঘরে আসবার পর চাষীর মন এমনিতেই আনন্দে মেতে থাকে। হয়ত অনেকের ঘরে বছরের খোরাক ওঠেনি, —তবুও নতুন ফসল সে নাড়াচাড়া করেছে, তার গন্ধ নাকে এসেছে। পৌষের পর নতুন 'সানুকে' নবান্নের আস্বাদ গ্রহণ করেছে। এতেই তার আনন্দ! যৌবনও মেতে ওঠে এই সময়। ফাল্গুনের ঝির্‌ঝিরে লোনা হাওয়ায় যেন মাদকতা আনে।

কিন্তু সব চেয়ে আনন্দ ছোট ছেলেমেয়েদের। জল শুকিয়ে যায় চারদিকে। নদীর ভয়ঙ্কর ভয়াবহ মূর্তিও আর থাকে না। ওরা যেন ছুটোছুটি করবার শুকনো জায়গা অনেক পায়। যে মাঠে এতদিন জল থৈ থৈ করত, সেখানে ওরা এখন ছুটোছুটি করে, ক্ষেতের পাশে আলে আলে ঘুরে ইঁদুরের গর্ত খুঁজে বেড়ায়। গর্ত দেখলেই খুঁড়ে খুঁড়ে তার থেকে ধান বের করে মুঠো মুঠো। বিলের মাঝে নালা ও খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছ ধরে আনে চুপড়ি ভর্তি করে।

শুকনো মাঠে এসে বসে মানিক-জোড়। কাল, সাদা ও হলদে মিশিয়ে এই পাখির রঙ। জোড়া ছাড়া ওরা চলেই না। এমনই ওদের ভালবাসা। ছেলে বুড়ো যুবক সবার মনে ওরা ভালবাসার কথা জাগিয়ে তোলে। এরা বেশ বড় পাখি। কিন্তু সবচেয়ে বড় মদ্‌না। শকুনের চেয়েও বড়। ঠোঁট দুটি প্রায় এক হাত লম্বা। দেখে মনে হবে, ছোট শিশুকে স্বচ্ছন্দে মুখে করে যেন নিয়ে যেতে পারে। তাই ছোটদের ওদের উপর রাগ। দেখলেই ঢিল ছুঁড়বে।

ভোরবেলা। আর্জান ঢিল ছুঁড়ে মদ্‌নাকে মারছিল। কয়েকটা কলা গাছের আড়াল থেকে ফতিমা বলে উঠল, —ওদিকে ঢিল ছুঁড়ো না। মানিক-জোড়টাও যে উড়ে যাবে।

আর্জান বলল, —যাক্‌ না, তা না হলে তোকে যে মদ্‌না ঠোঁটে করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে!

ফতিমা মুখ ঘুরিয়ে ব্যঙ্গ করে বলল, —বে—শ।

একটু পরেই চুপি চুপি বলল, —যাবে না? যাবে না বনে?

তাইতো। —বলেই আর্জান ফতিমাকে উপেক্ষা করেই ছুটল মাদারের কাছে।

এত ভোরে লোক আসতে শুরু করেনি। কালিকাপুরের ঘাট থেকে দেখা যায়—বনবিবির পূজার থান্। ওপারেই বনের মধ্যে নদীর ধারেই পূজা হবে। মাত্র আশেপাশের গ্রামের দুচারজন এসে ঘরখানা বানিয়েছে। ইতিমধ্যে বাউলে কলিম এসে ধুলো পড়ে মন্ত্র দিয়ে 'ঘের' দিয়ে গেছে। সবাই নিশ্চিন্ত, কোনও বাঘ আজ আর এই 'ঘেরে'র মধ্যে আসবে না।

মাদার আর আর্জান চুপি চুপি ভেড়ির আড়াল থেকে সবচেয়ে ছোট্ট ডিঙিখানা টেনে বের করল। নদীর কিনারা থেকে দশ বার হাত ছেড়ে মাটি কেটে ভেড়ি বাঁধা হয়েছিল। এই কাটা নালাকে নদীর সাথে যোগ করে দেওয়া আছে। জোয়ারের জল এলে এই নালাতেও জল আসে। ডিঙি রাখবার এমন নিরাপদ জায়গা আর নেই। নদীর কিনারা অবধি যে দশ বার হাত জায়গা পড়ে আছে, সেখানে ঝোপঝাড় আর বড় বড় গাছ দেখা দিয়েছে। নদীর খরস্রোত আর ঝড়-ঝাপটা থেকে বাঁধকে রক্ষা করে এই গাছ ও ঝোপের সারি।

জোয়ার থাকলে কোনও অসুবিধা নেই। ডিঙি সহজেই নালা থেকে বের করে নদীতে পড়া যায়। কিন্তু ভাটি হলেই মুশকিল। ডিঙি মাটির উপর দিয়ে টেনে টেনে নদীর কিনারা পর্যন্ত আনতে হবে। কিন্তু তারপরেই মজা। ছেলেদের ভারি মজা লাগে। ভাটির সময় চর বেরিয়ে পড়ে। পলিমাটির চর। চল্লিশ পঞ্চাশ হাত পলিমাটির নরম ও পিচ্ছিল চর, ঢালু হয়ে নেমে গেছে জল পর্যন্ত। এর মুখে ডিঙি ছেড়ে দিলে সাঁ সাঁ করে তীর বেগে ছুটে জলের মধ্যে ঝপাৎ করে পড়ে। ভারি মজা লাগে ছেলেদের এই সময় ডিঙিতে চড়তে।

ফতিমা লুকিয়ে মাদার ও আর্জানের পিছু পিছু এসেছে। চরের মুখে এসে ওরা ডিঙি ছেড়ে দেবে এমন সময় ফতিমা ব্যগ্র হয়ে বলল, —ভাই! আমি যাব! আমি যাব!

মাদার থেমে গেল। বেশি কথা কাটাকাটি করলে জানাজানি হয়ে যাবে। আর্জান মাদারের ভাব দেখে বলল:

—নে, ওকে নিয়ে আর ঝামেলা বাড়াতে হবে না!

—যাক, চলুক না, কি আর হবে! —বলেই মাদার ফতিমাকে ডেকে নিয়ে ডিঙিতে বসাল।

ধাক্কা মেরে দুজনেই ডিঙিতে উঠে বসল। হেলেদুলে সোঁ সোঁ করে ডিঙি নিচে নেমে যায়। জলের উপর পড়তে না পড়তেই ফতিমা টাল সামলাতে না পেরে চরের কাদায় লেপটে পড়ে গেল। কিন্তু ডিঙি থামবার নয়। তীর বেগে জলে ঝপাং করে পড়ে কূল থেকে মাঝ-নদী পর্যন্ত এক ধাক্কায় চলে গেল।

—হলতো! যা, এবার বাড়ি যা, আর আসতে হবে না —বলেই আর্জান হাল ধরে বনের দিকে ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে দিল।

বনে উঠেই আর্জান ও মাদার দেখে, ধনাই মামু হাজির। ধনাই মামু এক ধমক্ দিল, —যা, যা, বাচ্চারা এখন এসেছিস কেন? বেলা হলে আসবি। যখন সব লোকজন আসবে। যা, এখন যা!

ধমক্ খেয়ে বনের এদিক ওদিক উঁকিঝুকি মেরে ওদের সুবোধ বালকের মত ফিরে আসতে হল।

বন বিবির পূজা। পূজা বলে কেন জানি না। এ পূজায় না আছে ফুল, না আছে মন্ত্র, না আছে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত। তবু এরা পূজা বলে। পূজা ও উৎসব এরা একাকার করে দেখে। বনবিবির উৎসব। হিন্দু ও মুসলমান সবাই এতে যোগ দেয়। সবাই এসে নতুন মানৎ

করে। পুরনো মানৎ পরিশোধ করে। ছেলে বুড়ো, মেয়ে মরদ, সবাই এসে যোগ দেয় এই আনন্দ উৎসবে।

পাঠান আমলের কথা। সুন্দরবনের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ও যোদ্ধা দক্ষিণা রায়। সুন্দরবনে আধিপত্য করে ব্যাঘ্রের দেবতা বলে পরিচিত হয়েছিলেন। আজও তিনি পূজিত হন সুন্দরবনের পশ্চিম অঞ্চলে ও আশপাশ জেলায়। কিন্তু খাস্ সুন্দরবনে বনবিবির একাধিপত্য। বনবিবিকে স্মরণ করে, বনবিবিকে সেলাম দিয়ে আজও সুন্দরবনের প্রতিটি মানুষ বনে প্রবেশ করে। কে এই মানস সুন্দরী নারী বনের দেবী—তার হদিশ ইতিহাসে মেলে না। বনকে এদেশের মানুষ যেমন ভালবাসে, তেমুনি ভয়ও করে। জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে এদেশে মানুষ বনের সঙ্গে একান্ত ভাবে জড়িত। এই ভয়ঙ্কর অথচ রোমাঞ্চময়ী বনের অধিপতিকে নারী রূপেই দেখে এদেশের মানুষ হয়ত মনের সাধ মিটিয়েছে।

ইতিহাসে না মিললে কি হবে, বনবিবির নামে প্রবাদ ও গল্প অজস্র ছড়িয়ে আছে। 'বনবিবির জহুরা' নামে মুসলমানী কিতাবে যে গল্প আছে, তাই এদেশের লোকে বিশ্বাস করে। মক্কাবাসী বেরাহিমের স্ত্রী গুলালবিবি। সতীনের কৌশলে তাঁকে সুন্দরবনে নির্বাসিন করা হয়। নির্বাসনের সময় তিনি সন্তান-সম্ভবা ছিলেন। বনেই সা জঙ্গুলী ও বনবিবি নামে তাঁর যমজ পুত্র ও কন্যা হয়। ভাটি দেশের রাজা দক্ষিণা রায়ের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য আল্লার আদেশে বনবিবি ও তার ভাই এই আবাদ অঞ্চলেই থেকে যান। অল্পদিনের মধ্যে আশেপাশে অনেক পরগনাই বনবিবির দখলে এল। দক্ষিণা রায় এই আধিপত্য সহ্য করতে রাজি নয়। তিনি যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু যুদ্ধ কি করে করবেন। পুরুষ হয়ে নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁর সম্মানে বাধে। অবশেষে তিনি তাঁর মা নারায়ণীকে বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। যুদ্ধে নারায়ণী পরাজিত হয়ে বনবিবির সঙ্গে সন্ধি করলেন।

কিন্তু সন্ধি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এই সময় বরিজহাটিতে ধোনাই, মোনাই নামে দুই ভাই ছিল। এরা একদিন সাত ডিঙি সাজিয়ে বনে মধু কাটতে আসে। এদের সঙ্গে এক দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র 'দুঃখে' ছিল। সপ্তডিঙি গড়খালি নদীতে এলে দক্ষিণা রায় এদের কাছে নরবলি দাবি করেন। মহাপূজায় দক্ষিণা রায় নরবলি দেবেন। তিনি বেছে 'দুঃখে'কে নেবার আদেশ দিলেন। বেগতিক দেখে ধোনাই মোনাই 'দুঃখে'কে দিয়ে দিল। খবর পাওয়া মাত্র বনবিবি 'দুঃখে'কে রক্ষা করার জন্য দক্ষিণা রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দক্ষিণা রায় বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করলেন। 'দুঃখে' রক্ষা পেল ; শুধু রক্ষা পেল না—বনবিবির কৃপায় 'দুঃখে'র বিধবা মার অন্ধত্ব ও বধিরত্ব ঘুচে গেল। 'দুঃখে'র বহু সম্পদ মিলল এবং ধোনাইয়ের মেয়ে চম্পার সঙ্গে বিয়ে হল।

সেই অবধি বনবিবি বনের দেবী। বসন্তের আগমনে তারই পূজা বা তারই উৎসব।

বেলা বেশ হয়েছে। পঞ্চাশ-ষাট্ খানা ডিঙি এসে বনের কূলে চেপেছে। তিন চার শ' লোক জমে নিস্তব্ধ বনকে মেলায় পরিণত করেছে। যে যার গল্প আমোদ ও উৎসবে ব্যস্ত। এরই ফাঁকে আর্জান ও মাদার ধীরে ধীরে বনের মধ্যে এক-পা দু-পা করে এগিয়ে গেছে। বনে এই তারা প্রথম। একটা কিছু নতুন তারা দেখতে চায়।

আর্জান বলল,—আরও যাবি ?

মাদার বিরক্ত হল, —যাব না তো কি। চল্ আরও এগিয়ে চল্। শুনেছি সামনেই একটা জলা আছে। সেখানে অনেক কিছু দেখা যায়।

আর্জান শঙ্কিত হয়ে বলল, —কিন্তু যদি আসে ?

—আসবে কি ? আসুক, আসলে এক দৌড়ে খানে চলে যাব। আজকে আবার ভয় কি !

—মাদার ! মাদার ! —ধনাই মামুর গলা।

দুজনেই ভেবাচেকা খেয়ে যায়। ফতিমা বনে আসা অবধি লোকজনের মধ্যে ছিল বটে, কিন্তু নজর ছিল এই দুজনের প্রতি। সকাল বেলার ডিঙির ব্যাপার সে কিছুতেই ভুলতে পারেনি। আর্জান ও মাদারের বুঝতে বাকি রইল না, —ফতিমার কাণ্ড না হয়ে যায় না ! সে-ই নালিশ করে দিয়েছে।

ধনাই মামু কানে ধরে দুজনকে নিয়ে এলো। এনেই দুচার ঘা লাগিয়ে বলল, —জানিস্ কতদূর ধুলো-পড়া দেওয়া আছে ? কেন তোরা তার ওপারে গেলি ?

ফতিমা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। আর মুখ বাঁকিয়ে আঙুল দিয়ে শাসিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে নিজের মনে মনেই বলছিল, —কেমন ! কেমন হয়েছে !

দূরে কলিম বসে বসে হুঁকা টানছিল। ফতিমার কাণ্ড দেখে হুঁকার টান ছেড়ে দিয়ে মুচকি হাসি হাসছে।

হঠাৎ কলিমের চোখোচোখি হওয়ায় ফতিমা লজ্জায় ছুটে গিয়ে কলিমের কাপড়ের মধ্যে মুখ গুঁজে দিল।

ছয়

আবাদে ও বনে আর্জান ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে ওঠে। সুন্দরবন অতি গভীর, অতি ভয়ঙ্কর। তবু বনে না গেলে এদেশের মানুষের জীবন চলে না। রান্নার কাঠ চাই, বনে গিয়ে এরা কাঠ নিয়ে আসে ; মাছ খেতে হবে—গভীর অন্ধকার রাতে একটা কুপি হাতে করে বনে চলে যায় মাছ ধরতে ; হাটের খরচ নেই হাতে,—বনের ভিতর অনেক দূরে গিয়ে গোলপাতা কেটে নিয়ে দূরের এক গ্রামে বিক্রি করে আসে।

বনে এরা খালি হাতে ঘোরে। কিন্তু সব সময় খালি হাতে ঘোরা যায় না। বাঘের উপদ্রব মাঝে মাঝে বাড়ে ; হরিণের মাংস খাবার লোভও এদের আছে ; নদীতে কুমির এসে মানুষও নিয়ে যায়—তাই এদের বন্দুক চাই। কিন্তু পাবে কোথায় ?

তখনও ইংরেজ রাজত্ব পুরাদমে চলেছে। বন্দুকের নামেই ইংরেজরা ভয় পায়। গরীব চাষীর হাতে কি আব তারা বন্দুক দেবে। তবু সুন্দরবনের চাষীরা বন্দুক যোগাড় করে। অজস্র বন্দুক আছে এদের কাছে। দেশী বন্দুক, —গাদা বন্দুক, নিজের হাতে তৈরি করা। মুঘল আমলে রাজা প্রতাপাদিত্য সুন্দরবনে স্বাধীন রাজা ছিলেন। আকবরের সৈন্যের সঙ্গে তিনি অনেক লড়াই করেছিলেন। সেই সময় দেশের কামার দিয়ে তিনি বন্দুক তৈরি করাতেন। সেই সব কামারদের বংশধর আজও বন্দুক তৈরি করে। অবশ্য পুলিশের অজানিতে।

মা অনেক আপত্তি করেছেন। কিন্তু আর্জান কিছুতেই তা শোনে না। সে একটা গাদা বন্দুক যোগাড় করেছে। বে-পাশী বন্দুক। পুলিশ দেখলেই জেলে নিয়ে যাবে। বিড়ালের ছানার মত আর্জান তার এই সম্পদকে এখানে একবার, ওখানে একবার লুকিয়ে রাখে।

পুলিশের ভয় এদের খুব। কিন্তু জানে, পুলিশ কিছুতেই এদের বন্দুক ধরতে পারবে না।

আবাদের গ্রামগুলি খোলা মাঠের মাঝে। ধূ ধূ করে। পুলিশ এলেই দূর থেকে দেখা

যাবে। আর পুলিশ দেখা দিতেই এরা বন্দুক নিয়ে ছোট নদী পার হয়ে গভীর বনে চলে যায়। সেই দুর্গম বনে খুঁজতে গেলে পুলিশের হয়ত বাঘের হাতে প্রাণ দিতে হবে। কাজেই পুলিশ সে-মুখো হয় না।

বন্দুক চালিয়ে পাখি মেরে আর্জান হাতের নিরিখ করে নিল অনেক দিন ধরে। একটা পাখি মারতে পারলে আর্জান ভাবে এইবার তার হরিণ ও বাঘ মারার নিরিখ নিশ্চয় হয়েছে।

একটা বাঘের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাশের গ্রামের একদল সেই বাঘ মারতে যাবে। আর্জানের বয়স তখন পনেরো বছর। মা কিন্তু আর্জানকে বনে যেতে দিতে চান না। হেঁতাল গাছটার দিকে তাকাল বনের কথায় তাঁর বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে।

আর্জান মাকে বলল, —ওপাড়ার সবাই হরিণ শিকার করতে যাচ্ছে, আমিও যাব।

হরিণ শিকার সে একবার করেছে। কাজেই মায়ের অনুমতি কোনমতে আদায় করে নিল।

মাদার গ্রামে তখন নেই ; তাই তাকে আর সঙ্গী বানাতে পারে না। বন্দুক নিয়ে যাবার সময় আর্জানের বেশ ভয় লাগছিল। বাঘ আজও সে দেখেনি। বাঘ সামনে পড়লে দড়াম্ করে গুলি করবে—ভাবতে ভাবতে সে দলে ভিড়ে পড়লো।

সুন্দরবনের বাঘ শিকারে কোনও তোড়জোড় নেই—করারও কোনও উপায় নেই।

এমনিতে পরিষ্কার বন। বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। শুধু দেখা যাবে, গাছের গুঁড়িগুলি সার বেঁধে থামের মত দাঁড়িয়ে আছে। তবু হাতি এখানে চলতেই পারবে না। চারদিকে খাল ও নদীতে ভরা। প্রতি মাইলে দু-তিনটি নদী ও দশ-বারোটি খাল। তাছাড়া সুন্দরবনের প্রতিটি গাছের শিকড় থেকে মাটির উপর শূলো বেরোয়। আধ হাত বা এক হাত অন্তর বারো-তেরো ইঞ্চি দীর্ঘ শূলো সারা বন ছড়িয়ে আছে। শূলোগুলি দেখতে বন্দুকের সঙ্গিনের মত। গোল নয়, চেপটা কঠিন শিকড়। ভারি শক্ত। মাথাগুলি আবার বর্শার ফলকের মত সরু। একবার এর উপর পড়লে হাড়গোড় ভেঙে যাবে। সারা বন ছড়িয়ে আছে। দূর থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হবে, যেন ভীষ্মের শরশয্যা। প্রতিটি পদক্ষেপ দেখে দেখে এই শূলোর ফাঁকে-ফাঁকে ফেলতে হয়। কাজেই হাতির সাহায্যে শিকারের স্থান নেই।

ছাগল-গরু বেঁধে মাচায় বসে এখানে শিকার চলে না। সুন্দরবনের বাঘের ছাগল-ভেড়ার প্রতি লোভ নেই। বনে অজস্র হরিণ। দশ, পঞ্চাশ বা পাঁচশো হরিণ দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। তাই ছাগল-ভেড়ার লোভ বাঘের নেই। লোভ যদি থাকে, তা আছে মানুষের ওপর। মানুষের রক্তে ও মাংসে তার ভয়ানক লোভ। তাছাড়া, সুন্দরবনে মাচা করে খুব উঁচুতে বসার মত বড় গাছ যত্রতত্র নেই। কাজেই মাচায় শিকার সুন্দরবনে অচল।

বাঘের সন্ধান পেলে পায়ে হেঁটে হেঁটে খুঁজে বের করে মারতে হবে। বাবুয়ানি শিকার বা নিরাপদ শিকারের সুযোগ সুন্দরবনে নেই।

সুন্দরবন যেমন ভয়ঙ্কর, সুন্দরবনের মানুষেরাও তেমনি ভয়ঙ্কর। ওরা পাঁচ জনে মিলে বনে প্রবেশ করল। গভীর অরণ্যে কোথায় গোলপাতার ঝোপে বাঘ থাকবার সন্ধান পেয়েছে, তারই খোঁজে।

জায়গা মতন গিয়ে বুড়ো ওসমান আর্জানকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, —তুই আর যাস্‌নে। এখানেই একটা গাছে উঠে বন্দুক নিয়ে বসে থাক। নিকটেই বড়মেঞা আছে। ঐ দেখ্ না পায়ের কাঁচা খোঁচ দেখা যাচ্ছে।

আর্জান একটা গাছে উঠে পড়ে। যে-ডালে সে বসতে চায়, সেটা খুব নিচু ; সাহস দেখাতে নিচু ডালেই বসলো, কিন্তু বুক তার দুরদুর করছে। বাকি চারজনে একত্র হয়ে

এগিয়ে যায়। একটু পরেই বনের আড়ালে ওরা মিলিয়ে গেল। আর্জান একা।

বাঘ কেমনভাবে এদিকে আসবে। ছুটে আসবে, না লাফিয়ে আসবে। শুনেছে হাঁড়ির মত মুখ। চোখ দুটো টর্চলাইটের মত জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে থাকে। এক-এক থাবায় আঠারো মানুষের বল। গুলি খেলে সে সেখানেই পড়ে যাবে, না ছুটে পালাবে?

দড়াম্‌...দড়াম্‌—দুটি গুলির আওয়াজ। কিন্তু আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। গুলি করার মত তাক্‌ করে আর্জান ডালে বসেছিল। দেরি হচ্ছে দেখে সে উঠেই পড়েছে। এমন সময় হঠাৎ দেখে,—একি! ভেবেছিল, হাঁ হাঁ করে গর্জন করতে করতে বাঘ তেড়ে আসবে। তার চোখে মুখে থাকবে হিংস্র মূর্তি। না, সুন্দরবনের বাঘ আসছে কিনা মাথা ও পিঠ নিচু করে চুপিসারে। বাঘটা দ্রুত আসছিল। সোজা এসে আর্জানের ডালের নিচে দিয়ে গুর্‌গুর্‌ করে চলে গেল।

আর্জানকে বাঘ দেখতেই পায়নি। আর্জান এক হাতে ডাল ধরে আছে, অন্য হাতে বন্দুক। গুলি করতে হলে বসতে হবে। বসতে গেলে শব্দ হবে। বাঘের নজরে আসবে। বাঘ হয়ত গুলি করবার অবকাশও দেবে না। কি করা উচিত হবে, ঠিক করতে না করতে বাঘ চলে গেল। ঝোপের আড়ালে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরে বাকি চারজনে ফিরে এসে আর্জানকে ডেকে নামায়। বাঘটা শুয়ে ছিল। ঝোপের আড়াল থেকে দুজনেরই গুলি ফসকে গিয়েছে। তারপর ওরা আর কিছু জানে না। আর্জান তার নিজের কাহিনী বলে বুড়ো ওসমানকে প্রশ্ন করে, —বাঘ কেন এমন চুপি-চুপি পালাল?

ওসমান চারিদিকে একবার তাকিয়ে চুপি-চুপি বলল,—বড়মেঞা পালায় না।

—আমি স্পষ্ট দেখলাম চোরের মত পালাচ্ছে।

—তাই না কি! তাহলে শীগ্‌গির চলো এখান থেকে।

আর্জান আরও অবাক হয়ে প্রশ্ন করে,—বাঘ পালালে আমরা পালাব কেন?

আর্জানের কথায় কান না দিয়ে ওসমান বলল—চলো, শীগ্‌গির চলো। বাঘটা কোন দিকে গেছে আর্জান?

আর্জান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তখন ওসমানের ইঙ্গিতে ওরা উল্টো দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়।

অবশেষে নদীর ধারে এসে ওসমান আর্জানকে বলল, —শিকারীর সামনা-সামনি হলে বড়মেঞা তাড়া করবেই, কখনও সে পালায় না। শিকারীর সঙ্গে দেখা-দেখি না হলে লুকোচুরি খেলবে। লুকিয়ে লুকিয়ে এমন স্থানে চুপি-চুপি আসবে, যেখান থেকে সে এক দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে শিকারীর ওপর।

আর্জান ব্যগ্র হয়ে বলল,—তা হলে তো বড়মেঞা এখানেই আছে।

বৃদ্ধ ওসমান বলল, —না, খবরদার। গুলি করার পর ওদের পিছনে যেতে নেই। কিন্তু বাঘের সামনে গেলে, বাঘ হয়ত মারা যাবে, কিন্তু সে-বাঘ গুলি খেয়েও একজনকে সাবাড় করবেই করবে। চলো, শীগ্‌গির চলো। দরকার নেই আমাদের এই শিকারে।

সবাই ফিরে এল। দুপুর গড়িয়ে গেছে।

আর্জান উঠানে এসেই বলল, —আম্মা, শীগ্‌গির ভাত দাও। জানো, আমি আজ বাঘ দেখে এসেছি। হলদে রঙ। বিড়ালের মত চুপি-চুপি পালিয়ে যায়।

মা বলল, —তুই না বললি হরিণ শিকার করতে গিয়েছিলি?

—হ্যাঁ, আমি তো গাছেই বসে ছিলাম। জানো, বাঘটা আমার ঠিক নিচে দিয়ে চলে

গেলো।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মা বললেন, —যাক্ বুঝেছি, বন,...বন,... বনেই আমার আবার মরণ আছে!

আর্জান মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। মা তাতে কান না দিয়ে, মনে মনে বনবিবিকে মানত্ করে নিজের কাজে চলে গেলেন।

সাত

মা চিন্তায় পড়লেন। আর্জানের মন এখন বন, বাঘ ও শিকারে পেয়ে বসেছে। কাজেই ঠিক করলেন, আর্জানের বিয়ে দিয়ে দেবেন ; তাতে যদি আর্জানের মন সংসারের দিকে ফিরে আসে।

আর্জানও বিশেষ আপত্তি করে না। চাষীর ছেলেরা অল্প বয়সেই বিয়ে করে। আপত্তি না করার আরও কারণ হল, মা কলিমের মেয়ে ফতিমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া ঠিক করেছেন।

আর্জানের অসীম শ্রদ্ধা ছিল কলিমের উপর। শুনেছে, কলিমের সাহস ভয়ানক। সে বাউল ;-মন্ত্র দিয়ে বাঘ তাড়ায়। মন্ত্র আউড়ে বাঘের সামনে এগিয়ে যায়। বাঘের মুখ থেকে হরিণের মাংস কেড়ে এনে মাংস খাওয়ার সখ মেটায়। মন্ত্রে আর্জান বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু সবাই মিলে যখন কলিমের বাঘের মুখ থেকে মাংস আনার গল্প করে, তখন আর্জানের মনে সন্দেহ জাগে, —হয়ত বা হবে!

কাজেই কলিমের মেয়ের সঙ্গে যখন বিয়ে ঠিক হল, তখন আর্জান মুখ ফুটে না করতে পারেনি। মনে মনে ভাবল—হোক্ না কালো, বড় হলে ভারি কাজের মেয়ে হবে। কতদিন সে তাকে দেখেছে, বউ সেজে ঘোমটা দিয়ে রান্নাবাড়ি খেলতে। বনবিবির উৎসবের দিনে ফতিমার দুষ্টুমির কথা মনে পড়ে যায়। কেমন যেন মায়া জাগে—ফতিমাকে সে ঘরের বউ করে আনবে।

বিয়ে হয়ে গেল। এর পর আর্জান কলিমের খুব প্রিয় হয়ে উঠল। সুযোগ পেলেই সেও কলিমের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চায়।

একদিন কলিম বলে, —চল্ আর্জান, আজ বনে মাছ মেরে আসি। আজ অমাবস্যার যোগ আছে। রাত্রে ভাল মাছ পড়বে।

আর্জান খুব খুশি হয়েই ছোট ডিঙি ও জাল নিয়ে কলিমের সঙ্গে চলল। বনে অজস্র ছোট ছোট খাল ক্রমেই সরু হয়ে এঁকে-বেঁকে কিছু দূর গিয়ে বনের চত্বরে মিশে গেছে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে এই সব খাল জোয়ারের জলে ভরে যায়। তখন মাছও ঢুকে পড়ে প্রচুর।

পুরো জোয়ারে মাছ ঢুকে পড়লে খালের মুখ জাল দিয়ে ঘিরে বসে থাকতে হয়। ছয় ঘণ্টা পরে ভাটির সময় সব জল বেরিয়ে যায় নদীতে। তখন এই জালে মাছ ধরা পড়ে। বড় বড় মাছ। এক একদিন মাছে ডিঙি বোঝাই হয়ে যায়। কোন কোন সময় এক মন, দুই মন ওজনের কই-ভোল মাছও ধরা পড়ে।

কাজেই অমাবস্যার জোয়ারে বনের মাছ ধরতে এদের উৎসাহের সীমা নেই।

দুজনে মিলে গভীর বনে প্রবেশ করল। ছোট্ট একখানা ডিঙি ; একটা জাল ও একটা কেরোসিনের কুপি। চারিদিকে ঘন অন্ধকার!

আর্জান একবার বলল, —বন্দুকটা আনলে হতো!

কলিম বলল, —দুর বোকা! এই অন্ধকারে বাঘ দেখতে গেলে তবে তো বন্দুক চালাবি! ভয় নেই তোর, বড়মেঞা আমাদের কাছে আসতেই পারবে না!

বনে পা দিতেই সুন্দরবনের লোকেরা বাঘ নামটা মুখে আনে না। তখন ওরা বাঘকে 'বড়মেঞা', 'বড় শেয়াল', 'বড় হরিণ', 'ভোঁতড়' 'কাবলিওয়ালা' প্রভৃতি বলে পরিচয় দেয়।

খালের মুখে এসে কলিম ও আর্জান জালের খুঁটি পুঁততে থাকে।

আর্জান হঠাৎ ভীত হয়ে বলল, —দেখ তো! ঐ যে সাদা কি একটা দেখা যায়!

কলিমের সবাইকে ভরসা দেবার অভ্যাস ; তাই, না দেখেই বলল, —ভয় নেই তোর! দেখছি!

কলিম এসে দেখে, সত্যিই কি একটা সাদা যেন! ঘোর অন্ধকার কুপির আলোতে আর কিছু বোঝার উপায় নেই।

কলিম একাই এগিয়ে যায়। দেখে, একখানা সাদা গায়ের চাদর পড়ে আছে। কলিমের ব্যাপার বুঝতে বাকি রইল না। চাদরটা কুপির আলোতে আনতেই দেখা গেল, সদ্য কাঁচা রক্তের দাগে ভরে আছে।

কলিম একবার আর্জানের মুখের দিকে তাকিয়ে কাজে লেগে গেল। কাজে লাগল বটে, কিন্তু আর্জানকে দু-একবার আড় নজরে দেখে নিল।

বলল, —কিরে আর্জান, অমন করে দেখছিস কি?

আর্জান ভাঙা গলায় বলে, —না! কিছু না!

কলিমের এই নাবালকের প্রতি মমতা জাগে। একটা খুঁটি তুলে বলল, —চল্ তবে,...আজ এখানে মাছ মারব না! ঐ মানুষটাকে একটু আগেই নিয়ে গেছে। তারাও এসেছিল এখানে মাছ ধরতে।

কলিম জাল গুটিয়ে ওখান থেকে চলে এলো বটে, কিন্তু বেশি দূর নয়। পাশেই আরেকটা খালে ঢুকে আবার জাল পাততে লাগল।

খুঁটি ও গাছের গুঁড়িতে জালের মাথা বাঁধা হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। এইবার কলিম কাপড় ছেড়ে জলে নেমে পড়ল। ডুব দিয়ে জালের গোড়া খুঁটি দিয়ে মাটির সঙ্গে গেঁথে দিতে হবে।

বলল, —আয় আর্জান, জলদি আয়! এখন ভয় নেই, জোয়ার পুরে গেছে ; কুমীর আর খালের মধ্যে ঢুকতে আসবে না। আরে! বাদার লোকের কুমীর আর বড়মেঞাকে কেয়ার করলে কি চলে! হ্যাঁ, ভয় একটা জিনিসের আছে। সেটা হল দৈত্য। তবে কি জানিস! দৈত্য এখন আসে না—তারা আসে বোশেখ মাসে। তার এখন অনেক দেরি। তারা কিন্তু মন্ত্র-টন্ত্র মানতে চায় না!

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিয়ে ওরা ডিঙিতে আসে। বাড়ি থেকে আসবার পথে দুটো তালপাতা কেটে এনেছিল। কাঁথা মুড়ি দিয়ে তার উপর তালপাতা চাপা দিয়ে কুপিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল। ভাটি শেষ হলে জাল থেকে মাছ তুলতে হবে। ছয় ঘণ্টা রাত কাটাতে হবে। নিঃশব্দে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। পৌষ মাসের শীতের হিম—ঝর্‌ঝর্ করে সারা বনে গাছের পাতা বেয়ে পড়ছে।...অল্পক্ষণের মধ্যে টপ টপ টপ করে ওদের তালপাতার ওপরও পড়তে থাকে।

বাদার ছেলের বনের হাতেখড়ি চলে!

আট

আর্জান এতদিনে সাবালক হয়ে উঠেছে। বন্দুকও সে জুটিয়েছে। কিন্তু আবাদে শুধু পাখি মেরে সাবালক হওয়া যায় না। মাদারের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ চলল। হরিণ মারতে তারা যাবে। সুন্দরবনে হরিণ মারা সহজও বটে, আবার দুরূহও বটে। অগুনতি হরিণ বনে চরে বেড়ায়। কিন্তু হরিণ এত সজাগ যে, একটু শব্দ হলেই এমন ছুট দেবে যে গুলি করার অবকাশ দেয় না। ঘ্রাণ শক্তিও ওদের প্রখর। বাতাস শিকারীর কাছ থেকে হরিণের দিকে বয়ে গেলে আধ মাইল দূর থেকেও ওরা মানুষের গন্ধ পাবে। তখন ওরা আর সে-মুখো হবে না।

কিন্তু মানুষেরও বুদ্ধির অভাব নেই। হরিণের মত এমন ক্ষিপ্র, সজাগ, চঞ্চল এবং হুঁশিয়ার প্রাণীকে বুদ্ধিভ্রম ঘটাবার পন্থাও সে বের করেছে।

সুন্দরবনে বানরও আছে অজস্র। এই বানর ও হরিণে অত্যন্ত প্রীতি। বানর যখন ঝাঁকে ঝাঁকে কেওড়া গাছে ফল খেয়ে বেড়ায়, তখন ডাল ভেঙে ভেঙে হরিণকে পাতা খেতে দেয়। গাছের উপর থেকে দূরে কোনও বাঘ বা শিকারীকে দেখলেই বানরগুলি এক সঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে ; আর তখন হরিণগুলিও সচকিত হয়ে পালিয়ে যায়। হরিণকে অবশ্য এই সাহায্যের ঋণ পরিশোধ করতে হয়। বানরগুলি মাঝে মাঝে হরিণের পিঠে চড়ে বেড়ায়। 'বানরের বাঁদরামি সর্বত্রই সমান।'

সুন্দরবনের মানুষ এই ব্যাপার লক্ষ্য করে হরিণ শিকারের সহজ পথ বের করেছে। এই পদ্ধতিকে 'গাছাল শিকার' বলে। কেওড়া গাছ সাধারণত নদীর তীর ধরে হয়। খুব ভোরে, না হয় বেলা তিনটের সময় এমনি একটা গাছে চুপেচুপে উঠে বসবে। সুন্দরবনের প্রায় সব নদীই উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে গেছে। কাজেই সূর্য পুব আকাশে বা পশ্চিম আকাশে থাকলে নদীর কূলে এই সব কেওড়া গাছের তলায় রোদ বেশ ভাল ভাবেই পড়ে। হরিণের পাল তখন গাছের তলায় আসে সেই রোদ আর কেওড়া পাতার লোভে। সুযোগ বুঝে শিকারীরা গাছে বসে বানরের মত ডাকে বা বানরের মত কিচিরমিচির শব্দে ঝগড়ার নকল করে ; আর সেই সঙ্গে ডাল ভেঙে ভেঙে মাটিতে ফেলতে থাকে। হরিণের তখন মতিভ্রম ঘটে। হরিণ উপর দিকে দৃষ্টি দিতে অক্ষম। তারা দল বেঁধে অতি নিশ্চিন্ত মনে এই গাছের তলায় পাতা খেতে আসে। শিকারীরা সেই সুযোগে দেখে ও বেছে দল থেকে পুরুষ-হরিণ মারে। 'মায়া-হরিণ' মারা সুন্দরবনের মানুষেরা অগৌরবের মনে করে।

মাদার ও আর্জানের পরামর্শ চলে। মাদার তার বাজানের কাছ থেকে বানর ডাকা আগেই শিখে নিয়েছে। আজ সারা সকাল ধরে আর্জান সেই ডাক নকল করতে ব্যস্ত।

মাদার বলল, —নে, আর করতে হবে না, এখন তাড়াতাড়ি চল্। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। দেবতা মাথা ছাড়ালেই গাছে উঠতে হবে।

আর্জান ব্যস্ত হয়ে বলল, —বন্দুকও যে এখনও গাদা হয়নি। জালের কাঠিগুলো কই ? দে শীগ্‌গির দে।

সব গুছিয়ে নিয়ে চুপি চুপি ছোট্ট ডিঙিখানা নিয়ে দুজনে গভীর অরণ্যে চলল। ত্রিমোহানা ছাড়িয়ে এক ছোট নদীতে পড়েছে। দুজনের গায়েই গেঞ্জি ও সঙ্গে একখানা গামছা।

কোমরে জড়ান গামছা থেকে একটা বিড়ি বের করে মাদার আর্জানকে বলল, —নে, একটু ধোঁয়া টেনে নে।

—এখন কেন ?

—কেন আবার কি। গাছে উঠলে কি বিড়ি খেতে পাবি। সর্বনাশ। তাহলে ধারে-কাছেও হরিণ বিড়ির গন্ধে আসবে না। বিয়ের পরও তোর বুদ্ধি হলো না। দেয় তোকে বিড়ি খেতে এক বিছানায়।

আর্জান চুপচাপ যুক্তি মেনে নিল। মাদারকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। মাদারের মুখ বড় খোলা।

বনের তিন মাইল ভিতরে চলে এসেছে। কাছেই একটা পাশখাল। খুবই সরু। জায়গাটার নাম মানিকচক। মাদারের চেনা জায়গা। পাশ-খালে ঢুকেই মাদার ডিঙি ভেড়াল।

মাদার বলল, —ঐ দ্যাখ, ঐ গাছটা। এই পথ দিয়ে চল। গাছপালার শব্দ হয় না যেন। দেখছিস্ কি ? এখন হরিণ আসেনি।

বন্দুকটা আর্জানের। মাদারের বড় ইচ্ছা, সে বন্দুকটা 'চোট্' করে। কিন্তু আর্জান যে-ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে, তাতে সহসা বন্দুকটা চাইতেও তার সঙ্কোচ আসছে। মাদার সঙ্কোচ কাটাতে চায়। বেশ দৃঢ়ভাবে বলল, —তুই দেখি কিছুই জানিস্ নে। নে, চল্ এগিয়ে চল্।

আর্জান গাছের তলায় এসে বলল, —দেখছিস, কত হরিণের পায়ের দাগ। আজ সকালেও ওরা একপাল নিশ্চয়ই এসেছিল।

মাদার মাতব্বরের সুরে বলে, —আসুক। ওরা ওম্নি রোজই আসে। নে, এখন গাছে উঠে পড়। খবরদার। গাছে উঠে কিন্তু কথা নেই, ইশারায় কথা সারবি। কথা বলেছিস্ কি হরিণ আসবে না।

এত হম্বিতম্বি করেও মাদার বন্দুক চাইবার সঙ্কোচ কাটাতে পারে না। আর্জানের ওপর মাদারের অপরিসীম মমতা। ওরা গাছে উঠে বসল। নতুন শিকারীদের মত সব চেয়ে উঁচু ডালেই উঠে বসল। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মাদার ইঙ্গিত করল এবার বানর ডাকতে। দুজনে একের পর একে বানর ডাকতে আরম্ভ করে। নিঝুম বনে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে ওদের এতক্ষণ গা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। বানর ডাকা আরম্ভ করতেই যেন বুকে বল এল।

এক একবার বানর ডাকা শেষ হলেই আর্জান ব্যগ্র হয়ে এদিক ওদিক হরিণ খুঁজতে থাকে।

মাদার ইঙ্গিতে বলে, দেরি আছে, দেরি আছে।

কিছুক্ষণ পরে আবার বানর ডাকা চলে। এবার ওরা বানরে বানরে ঝগড়ার নকল করল, আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু ডাল ভেঙে ফেলে দিল।

কিন্তু হরিণের দেখা নেই। এইভাবে দু-ঘণ্টা কেটে যায়। বেলা গড়িয়ে এসেছে। ইঙ্গিতে মাদার বলে, —চল্, আর বোধহয় আসবে না।

আর্জানও ইঙ্গিত করে, —দাঁড়া, আরেকটু দেখে যাই।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়। বনে অন্ধকার বেশ আগে থাকতেই নেমে আসে। সূর্য তখনও আকাশে। তবুও বনের আলো নিস্তেজ হয়ে এসেছে।

হঠাৎ দূরে একটু শুকনো পাতার শব্দ। যেন পায়ে চলার শব্দ।

আর্জান ও মাদার কান খাড়া করে। দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ করে শব্দের দিকে। আর্জান চুপেচুপে ডান হাতখানা দিয়ে বন্দুকের ঘোড়া অনুভব করে নেয়। ঘোড়াটা তুলেই দেয়।

হলুদ রঙের কি একটা আসছে! হরিণই বোধহয়। কিন্তু এতো ছোট কেন? হয়ত বাচ্চা।

ধীর পদক্ষেপে আসছে না। হঠাৎ এক-একবার ছুটে ছুটে আসছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওরা প্রতীক্ষা করে। মাদার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ডাল ধরে রাখে। আর্জান বন্দুক উঁচিয়ে ধরে।

মাদার ইশারায় দেরি করতে বলল।

খস্‌খস্‌ শব্দে শুকনো পাতার উপর লাফিয়ে লাফিয়ে প্রায় ওদের গাছের নিচে এলো।

এ কি! বাঘের বাচ্চা! কি একটা যেন সে লক্ষ্য করেছে। শিকারী বিড়ালের মত চার পা ভেঙে বসে লেজ নাড়ছে। এবার বুঝি সে লাফ দেবে তার শিকারের উপর।

আর্জান কানের কাছে বন্দুক নিয়ে টিপে আঙুল দিয়েছে। মাদার নিশ্চল।

আওয়াজের সঙ্গে বাঘের বাচ্চা পড়ে গিয়ে আবার উঠে কয়েক কদম ছুটে গেল। চিৎকার করতে করতে ঢলে পড়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বারুদের গন্ধ আর লব্ধ ব্যাঘ্র শিকারে আর্জানের মুখে শক্তিমত্তার হাসি ফুটে উঠল।

মাদারের মন ফাঁকা। ব্যাপারখানা কি, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। থতোমতো খেয়ে গেছে। আর্জানকে নামবার জন্য তৈরি হতে দেখে শুধু একবার হাতের ইশারায় দেরি করতে বলল।

মুহূর্ত মধ্যে হুড়মুড় করে কি যেন আসছে! ঝোপঝাড় ভেঙে সারা বন কাঁপিয়ে দিয়ে তীরবেগে আসছে।

বাঘিনী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছে। এদিক-ওদিক একবার দেখে নিজের মৃত বাচ্চার নিকটে গেল। সস্নেহে কয়েকবার জিহ্বা দিয়ে লেহন করল।

তারপর মাথা উঁচু করে হিংস্র দৃষ্টি দিয়ে তাকাল নদীর দিকে। তখনও সে হাঁপাচ্ছে। দীর্ঘ জিহ্বা লক্‌ লক্‌ করছে। চোখ দুটো দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে, বলিষ্ঠ বাহুর মাংসপেশীগুলি যেন দুলছে। গায়ের লোমগুলো ফুলে উঠেছে। চোখের উপর বিক্ষিপ্ত ভ্রূসম কালো রেখাগুলি রাগে ওঠা-নামা করছে। চাপা গর্জনের সঙ্গে লালা ছিটকে পড়ছে।

এই ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর মূর্তির সামনে আর্জান ও মাদার যেন পাথর হয়ে গেছে। বাঘিনী ওদের আক্রমণ করবে কিনা, বা, আক্রমণ করলে ওরাই বা কি করবে—কিছুই ওদের চিন্তা করবার শক্তি নেই। যেখানে হাত পা ছিল, যে-ভাবে বসে ছিল, সে-ভাবেই আছে। নিঃসাড়ে নিঃশ্বাস নিতে গেলেও যেন বাঘিনী বুঝে ফেলবে। দুজনেই নিস্তব্ধ। বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছে। কোন শক্তি নেই, চোখের পলকেরও যেন শক্তি নেই। তাকিয়ে আছে, না চোখ বুজে আছে—সে চেতনাও যেন ওদের নেই!

চাপা গর্জন করতে করতে বাঘিনী গাছের দিকে ছুটে এল।

কিন্তু বাঘিনী গাছের তলায় না থেমে, সোজা নদীর ধারে দৌড়ে গেল। মুহূর্ত মধ্যে আবার ছুটে গিয়ে তার বাচ্চাকে চাটতে লাগল।

এমনিভাবে একবার, দুবার, তিনবার—বার-বার নদীর তীর পর্যন্ত ছুটে যায়, আবার ছুটে আসে বাচ্চার কাছে।

নিঝুম বন আরও নিঝুম হয়ে গেছে। বনে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। কোথাও একটা পাখিও ডাকে না। কিন্তু বনের এই অংশ তোলপাড় করে তুলেছে ক্ষিপ্ত বাঘিনী। ওর সন্তানের হত্যাকারী নিশ্চয়ই নিকটে কোথাও আছে এবং ঐ নদীর ধারেই আছে—এই ওর ভীষণ সন্দেহ।

ব্যাঘ্র হিংস্র। বোধ হয় সবচেয়ে হিংসুটে জানোয়ার। তাহলেও বাঘ ও বাঘিনীতে ভালবাসাও আছে, আদরও আছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সন্তানের প্রতি বাঘের এতটুকুও মমতা নেই। বাচ্চাকে দেখলেই তেড়ে মেরে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু বাঘের মমতা না থাকলে কি হবে, বাঘিনী মা। সন্তানের প্রতি তার মমতা—মায়ের মমতা।

বাচ্চা একটু বড় হলেই বাঘিনী তাকে নিয়ে চরতে বেরোয়। বাঘিনী তখন কিন্তু বাচ্চার কাছে থাকে না। বাচ্চা যেখানে খেলে ও চরে, তার থেকে সিকি মাইল দূরে বাঘিনী চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়,—কোথায় কখন বাঘ এসে পড়ে তার বাচ্চাকে খেয়ে নেবে। বাঘ এলে, বাঘিনী তার সঙ্গে ঝগড়া করে না, মল্লযুদ্ধও না। তার সঙ্গে সে পিরীত করে। তাকে ভুলিয়ে অন্য দিকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে তাকে পথ ভুল করিয়ে দিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ পালিয়ে বাচ্চার কাছে চলে আসে। আবার পাহারা দিতে থাকে।

বাচ্চাওয়ালা বাঘিনী এইভাবে ভালবাসার খেলা খেলে বাঘের হাত থেকে তার সন্তানকে বাঁচায় বটে, কিন্তু অন্য কোনও জীবের বেলায় তার হিংস্রতার তুলনা নেই। তাই বাচ্চাওয়ালা বাঘিনীর পেছনে শিকারীরাও সহসা যেতে চায় না।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। আর্জান ও মাদার পরস্পরকে মাত্র ছায়ার মত দেখতে পাচ্ছে। দূরে শুধু বাঘিনীর চোখ দুটো ঘোর অন্ধকারে চক্‌চক্ করে যেন টর্চের মত জ্বলছে।

আর্জানের কাছে বন্দুক আছে। কিন্তু গাদা বন্দুক। একটা গুলিতে যে বাঘিনীকে ঘায়েল করতে পারবে, সে ভরসাও নেই ; তা ছাড়া, থলে থেকে বারুদ নিয়ে, জালকাঠি নিয়ে বন্দুকে গেদে যে দ্বিতীয়বার গুলি করার সুযোগ পাবে, সে অবস্থাও নেই। আর্জান ও মাদার এতক্ষণে একটু আত্মস্থ হয়েছে বটে, কিন্তু কোন শব্দ করবার সাহস নেই।

বাঘিনীর লক্ষ্য ডিঙিখানি। গোঁ গোঁ করে ছুটে যায় তার কাছে, আবার ফিরে আসে। হঠাৎ তার মনে হয়, এই বুঝি ডিঙির মালিক পালাল। উন্মত্ত হিংস্রতা নিয়ে সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নিতে ছুটে যায় তীর বেগে। আবার ফিরে আসে।

অনেক রাত হয়ে গেছে। একভাবে বসে থাকতে না পেরে আর্জান একটু নড়ে বসতে গেছে—আর অমনি তার কোল থেকে বন্দুকটি ধপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল। অতো উঁচু থেকে পড়ে বেশ শব্দ হয়ে উঠল। মুহূর্ত মধ্যে শব্দ লক্ষ্য করে বাঘিনী গাঁ গাঁ করতে করতে ছুটে এল।

আর্জান মাদার দুজনেই এবার প্রমাদ গোনে। এবার বুঝি রক্ষা নেই। বাঘিনীর আর বুঝতে বাকি থাকবে না। আর্জানের মনে স্পষ্ট ফুটে উঠল, বাঘিনী কেমন করে এই গাছে উঠবার চেষ্টা করবে। সে কি আরও উঁচুতে উঠবে ? গর্জন করতে করতে কেমন করে বিড়ালের মত সামনের হাতা বাড়িয়ে গাছে উঠে ওদের তেড়ে আসবে। এলে আগেই ওকে ধরবে। মাদার পাশের ডালে আছে। সে কি এখন মাদারের কাছে এগিয়ে যাবে ? যেতে গেলে যদি শব্দ হয়!

আর্জান ভুলেই গেছে,—কলিম ওকে বলেছিল যে বাঘ হেলান গাছে ছাড়া উঠতে পারে না। বাঘিনীর গর্জনে সব গুলিয়ে গেছে।

কালো রঙের বন্দুক বনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। শব্দ লক্ষ্য করে বাঘিনী ছুটে এলো ঠিক ওদের নিচে। দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। রাগে যেন দাঁড়াতে পারেছে না ; ছট্‌ফট্ করছে। সাঁ করে মাথা নিচু করে ছুটলো ঐ ডিঙিখানার দিকে। আগের মতই মুহূর্ত মধ্যে

ফিরে এল বটে, কিন্তু ফিরে এল ঐ গাছতলাতেই। গাছের চার পাশে কয়েকবার ঘুরে আবার ফিরে গেল তার বাচ্চার কাছে।

বনের শীত যেন কনকনে। রাতও হয়ে গেছে। হাত পা অসাড় হয়ে এসেছে। ওরা ডাল ধরে বসে আছে ; কিন্তু আঙুল অবশ, ডাল জোর করে ধরেছে, না আস্তে ধরে আছে, —তা বুঝতেই পারছে না। ওদের গায়ে একটা গেঞ্জি মাত্র।

ওকি ! মাদার দুলছে কেন ? ঘাড়টা ঝুলে পড়েছে ! পড়ে যায় যায় যেন ! আর্জানের ইচ্ছা হল, ওকে একবার জোর করে ডাক দেয়। কিন্তু আতঙ্কে তার স্বর গলায় আটকে গেল। শব্দ না করে ফিস্‌ফিস্ করে একবার ডাকল, —মাদার ! মাদার !

কোন সাড়া নেই। মাদারের দেহখানা এক ডাল থেকে নিচে আরেক ডালে শব্দ করেই পড়ল। বাঘিনী গর্জন করে উঠল দূর থেকেই। আর্জান দিশেহারা হয়ে জোরে চিৎকার করে উঠল,— মাদার ! মাদার ! মাদারের চেতনা নেই। সেই ডাল থেকেও গড়িয়ে তার দেহখানা ঝপ্ করে মাটিতে পড়ল। বাঘিনী তীরের মত ছুটে আসছে। আর্জান বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরল সামনের ডালখানা। আর্জানের চোখ বুঝি একবারের জন্য বন্ধ হল। মুহূর্ত মধ্যে বাঘিনী তার সমস্ত রাগ ও হিংসা নিয়ে গক্ করে মাদারকে কামড়ে শূন্যে উঁচু করে ধরে কয়েক পা ছুটে গেল। ফেলে দিল মাদারকে। দু-পা পিছিয়ে গাঁ গাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার কামড়াল। বন থর্-থর্ করে কাঁপছে হিংস্র গর্জনে। ছিঁড়ে টুক্‌রো করে ফেলল মাদারের দেহখানা। অন্ধকারে তার রক্তপানের লোলুপতা কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু তার এক-এক গর্জনে, আর এক-এক লম্ফে বোঝা গেল—বাঘিনীর হিংস্রতার, সন্তান হত্যার প্রতিশোধ। শুকনো গাছের পাতা বাতাসে উড়ে যেতে লাগল। খণ্ডিত দেহের টুকরো, এদিক ওদিক ঝপঝপ্ করে ছিট্‌কে পড়ল।

আর্জানের হতভম্ব মনের সামনে কলিমের ছবি একবার দেখা দিল, পরের মুহূর্তেই মনে পড়ল, সে একা। গভীর অরণ্যে, গাঢ় অন্ধকারে হিংস্রতম গর্জনের সামনে সে একা। তারও মাথা যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছে। সেও কি পড়ে যাবে !

বাঘিনীর হিংস্রতা এতক্ষণে যেন কমে এসেছে। রক্তের আস্বাদে তার বোধ হয় ক্ষুধার বৃত্তি জেগে উঠেছে। অন্ধকারে তাতেই সে ব্যস্ত বলে মনে হল।

আর্জান শিরদাঁড়া সোজা করল। মাথায় এক ঝাঁকা মেরে মনের বেদনা ও ভীতি দূর করতে চাইল। নিজেকে সে পড়তে দেবে না। কিছুতেই না। কোমর থেকে তাড়াতাড়ি গামছা খুলে নিজেকে গাছের ডালের সঙ্গে জোরে বেঁধে নিল।

বাঘিনী তারপর আর গাছের তলায় আসেনি। কিন্তু সে যে নিকটেই আছে তা ঝোপঝাড়ের শব্দে বেশ স্পষ্ট। শীতের বাতাসের সঙ্গে বাঘিনীর গন্ধও আর্জান অনুভব করছে।

আর্জানের মন স্থির হয়ে এসেছে। মাদার ! —মাদার তো আর নেই। কেন তাকে ডাকলো না ? সেও তো ইচ্ছা করলে গামছা দিয়ে নিজেকে বেঁধে নিতে পারত।

দূরে পাখি ডেকে ওঠে। ভোর হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে প্রভাতের আলো বনের শীতের শিশিরসিক্ত গাছের পাতায় এসে পড়ল।

অস্পষ্ট আলোয় আর্জান দেখে, বাঘিনী তার মৃত বাচ্চার কাছেই শুয়ে আছে। বাঘিনী উঠে দাঁড়াল। চারদিক কয়েকবার তাকিয়ে বাচ্চাকে মুখে নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেল কিন্তু বাচ্চাকে সেখানে রেখে আবার অনেকখানি পেছনে এল। গতি তার মন্থর। দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাকে মুখে নিয়ে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

কালবিলম্ব না করে আর্জান গাছ থেকে নেমে বন্দুকটা নিয়েই এক নিঃশ্বাসে তার ডিঙির বাঁধন খুলে দিল। জোরে এক ধাক্কা মেরে ডিঙিখানা ছোট খাল থেকে নদীতে ঠেলে দিল।

নদীতে তখন খরস্রোত। ভাটার টান সাঁ সাঁ করে ডিঙি ভাসিয়ে নিয়ে চলল। বোঠেখানা হাতে করে আর্জান ডিঙির মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে। গলুইতে বসে হাল ধরতে হবে, তা ভুলেই গেছে। তাকিয়ে আছে গভীর অরণ্যের দিকে। কল্ কল্ করে নদী বয়ে চলেছে। দুদিকে বন। ঘন সেই বন। গাছের গাঢ় সবুজ পাতায় ঢাকা। সে-পাতা ভেদ করে কোন দৃষ্টি বনের ভিতর যায় না। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন সাজান বাগান। কোথাও একটা গাছের মাথা যেন উঁচু-নিচু নেই। মনে হয় প্রকৃতিদেবী ছেঁটে-কেটে সমান ভাবে বন সাজিয়ে রেখেছেন। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সামান্য শিষ দিলেও প্রতিধ্বনি ওঠে বনে। সবুজ এই বন, শান্ত এই বন, শূন্য এই বন।

আর্জান ধীরে ধীরে ডিঙির গলুইতে এসে বসেছে। হাল ধরেছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবার জন্য। বসেই দেখে সামনের মাদারের বোঠেখানা পড়ে আছে। তুলে ধরে সেখানা। দুই বাহু ঊর্ধ্ব করে শূন্যে তুলে ধরে। চোখ দিয়ে তার ঝর্ ঝর্ ধারে জল গড়িয়ে পড়ে। তারপর···বর্শার মত করে নদীর বক্ষে বোঠেখানা ছুঁড়ে মারল দেহের সর্বশক্তি দিয়ে। গোটা বোঠেখানা সবেগে বিদ্ধ হয়ে গেল নদীর বক্ষে। ছুঁড়ে ফেলেই আর্জান ক্ষিপ্র বেগে পাগলের মত ডিঙি চালাতে লাগলো মানিকচককে পিছনে ফেলে—অনেক পিছনে ফেলে।

নয়

আর্জান বাড়ি এসে প্রথম প্রথম কাউকে কিছু বলতে চায়নি। তার জন্য তাকে নানা মিথ্যার জাল বুনতে হয়েছিল। বলেছিল, —মাদারের কথা সে জানে না ; হয়ত সে কোনও আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে গেছে। —কিন্তু মাদারও ফিরে আসে না, কোথাও কেউ তার খোঁজও বলতে পারে না।

মাদার আর্জানের শুধু নিকট আত্মীয় নয়। তার অন্তরঙ্গ বন্ধুও হয়ে উঠেছিল। তার মর্মান্তিক মৃত্যু ও তার বেদনা আর্জান একা একা আর বহন করতে পেরে ওঠে না। গুমরে গুমরে মরে যায়। তাই সে আস্তে আস্তে তার সব ঘটনাই বলে ফেলল।

তার মা তাকে এর জন্য ক্ষমা করেননি। কেননা—এ-বিষয়ে একবার ক্ষমা করলে আর্জান আবার শিকারে যাবার উৎসাহ পেয়ে বসবে।

তার অন্যান্য আত্মীয় এবং তার বউও তাকে ক্ষমা করেনি। উঠতে বসতে তাকে আঘাত করেছে, গালাগালি দিয়েই চলেছে। তার বউ তাকে বলেছিল—মরলে মরলে, নিজে মরলে না কেন ? আমার বড়মেঞাকে মেরে এলে কেন ?

সুন্দরবনের মানুষেরা হামেসাই কাজে অকাজে বনে যায়, আর মাঝে মাঝে বাঘের মুখে মানুষও দিয়ে আসে। এখানে খুন-খারাপি যে হয় না, তা নয়। বনের ভিতরে নিয়ে গিয়ে খুন করে নদীর জলে লাস ফেলে দিলে কেউ জানবে না, কেউ কোন হদিশও পাবে না। এমন ঘটনাও বহু ঘটে। তাই এখানকার রীতি—বনে দল থেকে কাউকে বাঘে নিয়ে গেলে, বাকি সবাই চেষ্টা করে কিছু সাক্ষীপ্রমাণ নিয়ে আসতে, না হয় বাউলের সাহায্যে আধ-খাওয়া লাসকে গ্রামে নিয়ে আসতে। তা না হলে, সহসা লোকে বিশ্বাস করতে চায় না—বাঘে খেয়েছে, না ওকে খুন করা হয়েছে।

তাই আর্জান অনেকের কাছে সন্দেহভাজন ছিল। আর্জান মাদারের বাঘের হাতে মৃত্যুর

কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি গাঁয়ের লোকের কাছে। কেউ তাকে ক্ষমা করেনি। কিন্তু ক্ষমা তাকেএকজনে করেছিল। কলিমের ক্ষমা সে পেয়েছিল। হাসি, ঠাট্টায়, গানে, আমোদে, কলিমের বাড়া কেউ ছিল না। কিন্তু মাদারের মৃত্যুতে সে প্রায় চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। শুধু বলেছিল, —সাপুড়ের মরণ থাকে সাপের হাতে, আর বোধহয় 'বাঘুড়ের' ছেলের মরণ থাকে বাঘের হাতে।

আর্জানের সঙ্গে দেখা হলেই কলিম বার-বার নানা ভাবে বুঝিয়ে বলতো, —খবরদার! বাঘের বাচ্চা দেখে কেউ কখনও লোভ করবি না। কখনও না। জানিস্ বাউলের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা কি? বড় পরীক্ষা হল, সে বাঘিনীর কাছ থেকে বাচ্চাকে নিয়ে আসতে পারে কিনা? কোন বাউলে আজও পারেনি। তাই সে পরীক্ষা এ যাবৎ হয়নি। খবরদার! বাচ্চাওয়ালা বাঘিনীর কাছেও ঘেঁষবি না।

কলিমের চোখে ক্ষমার আমেজ দেখে আর্জান তার কাছে এসে মাথা নিচু করে বসে। কলিম তার গায়ে হাত দিয়ে বলে চলে:

—জানিস, আমি একদিন কি করেছিলাম? বনের ভিতর দিয়ে বড় 'লাও' নিয়ে কয়েকজনে আসছি। তখন পুরো জো। বন আর নদীর জল প্রায় মিশে গেছে। 'লাও'তে দাঁড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বনটাকে দেখা যায়। 'লাও'টা প্রায় কিনারা দিয়ে চলেছে। এমন সময় হঠাৎ দেখি, নদীর ধারেই বাঘের একটা ছোট্ট বাচ্চা। কি জানি আমার মনে হল, বাঘিনী খুব কাছে নেই। 'লাও' লাগিয়ে বাচ্চা ধরে নিয়েই একদম মাঝ-দরিয়া পেরিয়ে এলাম। 'লাও' তখন প্রায় অপর পারে এসে পড়েছে। বাচ্চাটাকে লুকোবার জন্য একটা থলের মধ্যে পুরেছি। এমন সময় দেখি, ওপারে বাঘিনী মুখ বাড়িয়ে 'লাও'য়ের দিকে একনাগাড়ে তাকিয়ে আছে। সবাইকে বললাম—'ব্যাপার ভাল না।' ভাগ্যি, বাচ্চাটা কোন শব্দ করেনি। শুধু নখের আঁচড়ে খরখর করে থলেটা ছিড়বার চেষ্টা করছিল। আমি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে থলে থেকে বাচ্চাটিকে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম নদীর এই পারে।

আর্জান বলল, —ফেলে দিলে! জানো, কত টাকায় বেচতে পারতে?

কলিম স্নেহের হাসি হেসে উঠল। বলল:

—কেন ফেলে দিলাম? জানিস্ তারপর কি হলো! বাচ্চা দেখেই বাঘিনী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তীর বেগে সাঁতরে এল এপারে। নদীতে তখনও বেশ স্রোত। স্রোত ঠেলে ঠিক সোজা পার হয়ে এল এক নিমেষে।

গল্প শেষ হলে কলিমের মাদারের কথা মনে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ থেকে একবার শুধু বলল:

—কেন আমি তোদের এই গল্পটা আগে বলিনি।

মাদারের মর্মান্তিক ঘটনাও ওরা একে একে ভুলে গেল। যেমন করে শহরের মানুষ ভুলে যায় কলেরার মৃত্যুকে। বনে কিছু মানুষের জীবন যে দিতে হবে, ওরা এটা ধরেই নেয়। এমন সংসার আবাদে একটিও মিলবে না, যাদের একজন না একজন বনে প্রাণ দেয়নি। এ যেন বনের সঙ্গে আবাদের মানুষের নিয়ত সংগ্রাম চলেছে। বনের উপর কে আধিপত্য করবে তারই যেন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কখনও বা বনচারী মারা যায়, কখনও বা আবাদের মানুষ। দুজনই করে জীবিকার সংগ্রাম।

এক শীত ঘুরে আরেক শীত শেষ হয়ে এল। চাষীদের ধান তোলা, ধান মাড়াই করা ও গোলা-জাত করা শেষ হয়ে গেছে। গোলা-জাত করবেই বা কি আর! জমিদারের নায়েবরা

দূর থেকে এসে তাড়াতাড়ি সব বিক্রি করে দিল। আগামী চাষের সময় চাষীদের কিছু ধান দিতে হবে বলেই কাছারির গোলায় কিছু রাখা হয়েছে অবশ্য।

এবার বেশ ভাল ধান হয়েছে। হলে কি হবে। চাষীদের গত বছরের দেনা শোধ দিতে হল। আর্জানও গত বছরে কিছু ধান কর্জ নিয়েছিল। এবার দেড়া-বাড়ি সুদ দিতে হল। না দিলে আগামী বছর চক্রবৃদ্ধি সুদে ডবল ধান দিতে হবে। আর্জান চোখকান বুজে ধান শোধ দিয়েছে।

ধনাই আর্জানের বাড়ির উঠানে বসে ছিল। সকালের সুন্দর রোদ তার আধপাকা চুলে পড়ে চক্‌চক্‌ করছে।

ধনাই বলল, —আর্জান, কেন তুই শোধ দিলি। নায়েব তো বলছিলো সামনের সনে দিলে হবে।

আর্জান বলল, —হ্যাঁ। আমি চক্রবৃদ্ধির কলে পড়ে যাই আর কি। প্রতি সনেই খালি হাতে ঘরে ফিরি।

—তাতে আর কি হয়েছে। এই তো আমি যা ধান পেয়েছিলাম, সব দিয়ে এসেছি। তাই বলে কি নায়েব আমাকে খেতে দেবে না। না খেতে দিলে জমি চাষ করবে কে?

—না মামু। তুমি বোঝ না, অমন হলে শেষে একদিন জমি থেকে তোমাকে তুলে দেবে।

—কী!! আমাকে তুলবে। তুলুক দেখি আমাকে, কি করি আমি ওর। —ধনাই গর্জে ওঠে।

ধনাই-এর সাহস অপরিসীম। এক সময়ে সে ডাকাতের সর্দার ছিল। সত্যসত্যই ডাকাতি করত। এখন সে ডাকাতি করে না বটে, কিন্তু দাপটি করে। কারণ ওকে সবাই ভয় করে, সবাই ওর কথা শোনে। ওর কথায় কালিকাপুরের লোক উঠবে বসবে। তাই নায়েবও ওকে ভয় করে।

ধনাই বলল, —তা তো হলো। এখন চল্‌ যাই কিছু আয়-টায় করা যাক্‌। চল্‌ যাই, মধু কেটে আনি।

বনের কথা শুনেই আর্জান দরজার ফাঁকে আম্মার দিকে তাকাল। মাও তাকিয়েছিলেন আর্জানের দিকে। কিন্তু মা কোন ইঙ্গিত করলেন না। ধনাই কিছু বললে, গ্রামের আর কেউ কিছু বলে না। তাছাড়া এই সেদিনও ধনাই আর্জানকে গোলপাতা কাটতে বনে নিয়ে গিয়েছিল।

বনে যাওয়ার কথায় আর্জান এক পা। পেটপুরে নাস্তা খেয়ে বনে মধু কাটার জন্য তৈরি হল। ধনাই, আর্জান ও কফিল। কফিল ধনাই-এর আশ্রিত। নিজে খেতে বিশেষ না পেলেও ধনাই অনেককে আশ্রয় দেয়। ডাকাতের সর্দারের অনেক গুণ তার আছে। লোকে বলে, এই সব লোক দিয়ে সে নাকি এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে ডাকাতি করে।

মধু কাটতে তিনজন লোক চাই। একজন চট মুড়ি দিয়ে গাছে উঠে কাস্তে দিয়ে চাক কাটে। আর একজন লম্বা কাঁচা বাঁশের মাথায় মশাল জ্বেলে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়ায়। আর তৃতীয় জন একটা বড় ধামা হাতে চাকের নিচে দাঁড়ায়, —যাতে চাক কাটা শুরু হলে সেগুলি মাটিতে না পড়ে ধামার মধ্যেই পড়ে। যে-সে কিন্তু মৌচাক কাটতে পারে না। লোকে বলে, মন্ত্র জানা চাই। মন্ত্র দিয়ে মৌমাছিকে ভুল পথে চালিত করতে হয়। তা না হলে, একবার শত্রুর খোঁজ পেলে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি ছেঁকে ধরে তাকে কামড়ে শেষ করে দেবে। ধনাই মন্ত্র জানে। ধনাই নিজে তাই বলে, কিন্তু লোকে তা বিশ্বাস করে না। তারা

ভাবে ধনাই মামু গোঁয়ার, তাই গোঁয়ারতুমি করেই মধু কাটে। দলের সঙ্গে একটা কলসও থাকে। এক একটা চাক কাটা হলে, মধু ঝেড়ে ঝেড়ে তাতে বোঝাই করা হয়।

মধুর চাক খুঁজতে খুঁজতে গভীর বনে কোথায় গিয়ে হাজির হতে হবে, তার কোন ঠিকানা নেই।

শীতের শেষে সুন্দরবনে নানা গাছে ফুল ধরেছে। গরান গাছের ছোট ছোট ফুল। হলদে রং। সকাল থেকে ফুলের গন্ধে, হলুদ রঙে আর মৌমাছির গুঞ্জনে বন মেতে উঠেছে। ঝিরঝিরে বসন্তের হাওয়ায় ওদের তিনজনের মনে স্ফূর্তি আর ধরে না।

ডিঙি করে অনেক দূর বনের ভিতর গিয়ে তিনজনে ডাঙায় উঠেছে। মনের আনন্দে একটার পর একটা মধুর চাক কেটে চলেছে। মধুতে কলস প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। মধুর চাক পেলে অবশ্য তিন জনের কাজ ভাগ করাই আছে। কিন্তু তার আগে সবাইকে চাক খুঁজে বেড়াতে হয়। চাক খুঁজবার পন্থা হল, মৌমাছি ফুল থেকে মধু নিয়ে কোনদিকে ছুটে চলেছে তা লক্ষ্য করা এবং তার পিছু পিছু সেদিকে যাওয়া। এই ভাবে খুঁজতে গিয়ে তিনজনের প্রায়ই একত্রে থাকা সম্ভব হয় না। এদিক ওদিক ছিটকে পড়তেই হয়।

তখন তিনজনে এগিয়ে চলেছে প্রায় এক লাইনে। ধনাই সবার আগে। বাঁ হাতে কাস্তে আর চট। মাথায় মধুর কলসটা। আর ডান হতে একটা মোটা লাঠি। সারা বনে শূলো। শূলো ডিঙিয়ে তার ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলতে গিয়ে হোঁচট খাবার সম্ভাবনা। হয়ত তাতে কলসটা পড়ে যেতে পারে। তাই হোঁচট সামলাবার জন্য ধনাই একখানা লাঠি নিয়েছে।

সামনে একটা 'ট্যাক্'। দুটো ছোট নদী মিশবার ফলে একটা ত্রিভুজ খণ্ড তৈরি হয়েছে। এই ধরনের ত্রিভুজ আকারের জমির মাথা 'ট্যাক্' বলেই পরিচিত।

ট্যাকের দিকে সামনেই একটা গরান গাছ ; তার ওপাশে হেঁদো বনের ঝোপ। গরাণ গাছে মধুর চাক দেখে ধনাই ওদের দিকে চিৎকার করে বলল, —আরে! আরেকটা চাক পেয়েছি। বলেই একবার সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পরমুহূর্তে বলল, —না-রে! এতে মধু নেই।

ট্যাকের মাথার দিকে আর না এগিয়ে ধনাই বাঁ হাতে সোজা পথ ধরল। এর মাঝে কফিল ও আর্জান এসে পড়েছে। আর্জান বিশ্বাস করতে চায় না। বলল,—ধনাই মামু বললে কি হবে। মধু হলেও হতে পারে।

কফিল ভক্তের মত বলল, —না-রে! ধনাই মামু সব জানে। ওর কথা মিথ্যে হয় না। চাক দেখেই ও ঠিক ধরতে পারে।

—দেখবি! —বলেই আর্জান এক থাবা কাদা তুলে গোল করে পাকিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল চাক লক্ষ্য করে।

মাটির তাল চাকের কোণে একটু লেগে ঝপ্ করে পড়ল হেঁদো বনের ঝোপে।

কফিল ব্যঙ্গ সুরে বলল,—তুই না শিকারী! একটা ঢিলও চাকে ভাল করে লাগাতে পারিস না। না, চল্। ওতে মধু নেই।

আর্জান আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, —দাঁড়া না একটু। মধু পড়ে কিনা তাকিয়ে দ্যাখ্।

মধু পড়ল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা মৌমাছি ওদের দিকে তাড়া করল। ওরা পিছনে ছুটে একটা ঝোপের আড়ালে পালাল।

এদিকে ধনাই খানিকটা এগিয়ে এসেছে। তার সামনে তিন-চার হাত চওড়া একটা 'শিষে'—ছোট সরু খাদ। কলস মাথায় নিয়ে কি করে লাফ দিয়ে এই শিষে পার হবে, তাই তার সমস্যা। তার দীর্ঘ লাঠিখানা সাঁকোর মত করে এপার-ওপার ফেলে দিল। এবার

সামনের বাঁশের মত সরু তব্‌লা গাছটা ধরে শিষে পার হবার জন্য ঝুঁকি দিয়েছে। পার হয়েই সে কফিল ও আর্জানকে ডেকে বলবে, এমনি করেই পার হবার জন্য। কিন্তু ওদের সাড়া পাচ্ছে না কেন? ভেবেই সে একবার পিছনে তাকাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু তাকাবার অবকাশ ধনাই পেল না। বিকট হুঙ্কারে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর। সে হুঙ্কারে বাঘের সর্ব হিংস্রতা, তেজ ও মত্ততা যেন ফেটে পড়ল। বন কেঁপে উঠল থর্‌ থর্‌ করে। আর্জান ও কফিল ঝোপের আড়ালে হতভম্ব। তাদের কথা বলবার শক্তি নেই। নড়বারও কোন শক্তি রইল না—পালাবারও না এগুবারও না।

বাঘের এই আক্রমণ খানিকটা বেপরোয়া ছিল যেন। সাধারণত বনের বাঘ এমন বেপরোয়া হয় না। সে ধীরে সুস্থে, লুকিয়ে, ওৎ পেতে, দেখে শুনে, ঠিক সময়মত আক্রমণ করে। বেপরোয়া হবার কারণও ছিল এখানে। বাঘটি গরাণ গাছের পাশের ঝোপেই ছিল শুয়ে। ধনাই-এর চিৎকারে ও আর্জানের ঢিলে সজাগ ও সচকিত হয়ে দেখে, সে ঘেরাও হয়ে পড়েছে। ট্যাকের দুদিকে নদী, আর অন্যদিকে ওরা তিনজনে যেন বেড় দিয়েছে। অন্য যে-কোনও বন্য জীবের মত বাঘও ঘেরে পড়লে, লাইন ভেঙে বেরুবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তাই সে লাইন ভেঙে বেরুতে চেয়েছিল ধনাই-এর উপর দিয়েই।

বাঘ ধনাইকে লক্ষ্য করেছে। ঝাঁপিয়েও পড়েছে তার উপর। কিন্তু যে তব্‌লা গাছটা ধরে ধনাই শিষে পার হতে চেয়েছিল, তারই উপর বাঘের মাথা ঠোক্কর খেল দুর্দান্ত বেগে। মাথায় আঘাত খেয়ে বাঘ উল্টে গিয়ে ধপাস্‌ করে পড়ল 'শিষের' ভিতর।

তবলা গাছটা বাঘের থাবা থেকে ধনাইকে বাঁচাল বটে, কিন্তু তাকে বাঘের লেজের বাড়ি খেতে হল সপাং করে। লেজের বাড়িতে তার মাথার মধুর কলস পড়ে গেল। বাঘও পড়ল 'শিষের' গর্তের ভেতর, কলসও পড়ল ভেঙে তার মাথার উপর। বাঘের সারামুখে নাকে চোখে ছিট্‌কে পড়ল মধু।

দুঃসাহসী ধনাই নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে দুর্জয় হয়ে ওঠে। প্রবল শত্রুকে সামনে ধরাশায়ী দেখে সেও উল্লসিত ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। —তবে রে শালা! —বলেই সে লাঠিখানা এক টানে টেনে তোলে।

আর্জান ও কফিল এদিকে থ মেরে গেছে। সেই যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল, আর সাড়া নেই। ওরা যেন অর্ধচৈতন্য অবস্থায় উবু হয়ে বসে আছে। পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। বাঘের হুঙ্কার ও ধনাইয়ের 'তবে রে শালা' চিৎকার ওদের কানে হয়ত গেছে, কিন্তু চেতনা ওদের ছিল না। তারপর কি হল তার কোনও বোধ নেই।

বাঘের তর্জন গর্জন থেমে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পরে ওদের হুঁশ এল। চেতনা আসবার সঙ্গে সঙ্গে আর্জানের মনে পড়ল বনের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। কফিলকে এক ধাক্কা মেরে বলল,—চল্‌ বনবিবির আদেশ, এগিয়ে যেতেই হবে।

বনের ভিতরে নিকটে কেউ বিপদে পড়েছে জানালেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। আবাদের মানুষ সৈনিকের মত এই নিয়ম মেনে চলে। না মানলে গ্রামের সবাই তাকে ঘৃণা করবে। এটা ওদের বনবিবির আদেশ। বনের দেবী বনবিবি। তাঁর আদেশ ওরা কেউ অমান্য করতে চায় না। সাহসও নেই।

এক পা দুই পা করে আর্জান ঝোপের আড়াল থেকে এগিয়ে আসে। কফিল নিতান্ত বেগতিকে পড়ে আর্জানের পিছু পিছু আসতে থাকে।

আর্জান অবাক হয়ে বলে, —কই। কিছুই তো দেখা যায় না।

কফিলের উত্তর দেবার সাহসও নেই। আর্জান বলে চলে, —নিয়ে গেছে···মামু নেই।

মামু নেই ! —আর্জানের এ কথা ভাবতে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঢোক গিলে সে এগিয়ে চলে তবু।

কফিল এবার বলল, —আর্জান। ওদিকে গিয়ে কি হবে। চল্ ফিরে যাই!

আর্জানের মনে পড়ে মাদারের কথা। তাকে বাঘে নিয়ে যাবার কোনও চিহ্নই সেবার নিয়ে যেতে পারেনি। তার জন্য সবাই তাকে কি অবিশ্বাসই না করেছিল। এবার সে একটা কোন চিহ্ন নিয়ে যাবেই।

এত কথা ভাবলেও সে মুখে কিছু বলে না। শুধু আদেশের সুরে কফিলকে বলল, —চল্, দেখি আসি।

দুজনে শিবের ধারে এসেই বুঝতে পারে কোথায় বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাঘের থাবার ও মামুর পায়ের অজস্র চিহ্ন পড়ে আছে। এসে দেখে মধুর কলস শিবের ভিতর ভেঙে পড়ে আছে।

হঠাৎ আর্জান বেশ জোরেই প্রশ্ন করে, —লাঠি? মামুর হাতে যে লাঠি ছিল।

কফিলের ওসব চিন্তা মাথায় নেই। সে কেবল এদিক ওদিক তাকায়। বুঝবার চেষ্টা করে—বাঘটা কোনদিকে গেছে। নিকটে কোথাও হয়ত বাঘ বসে আছে, এই তার চিন্তা।

আর্জান সুর নিচু করে মাটির উপর নজর রেখে বলে, —লাঠি। লাঠি। কই কোথাও তো রক্তের চিহ্ন দেখছি না, কফিল? —রক্ত কই।

হঠাৎ আর্জান চিৎকার করে ওঠে, —মামু। মামু!!

কফিল থ মেরে যায়। আর্জানের ডাক বনে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। প্রতিধ্বনির শব্দও মিলিয়ে যায়। কোনও সাড়া নেই।

—মা—মু!...আর্জান দীর্ঘ করে আবার ডাকে। কোনও সাড়া নেই।

খর্—খর্—খর্...একটু দূরেই ঝোপে শব্দ হয়ে ওঠে।

কফিল এগিয়ে আর্জানকে জড়িয়ে ধরে, মুখে তার কোনও শব্দ নেই। ভীত কফিলের বিরুদ্ধে রেগে আরও বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আর্জান আবার চিৎকার করে ওঠে,—মা—মু।

নিজের চিৎকারে সে যেন নিজে আরও সাহস পায়, বল পায়। ভাবে, —না, ওরকম করে বাঘ আসে না। সে এলে ঝাঁপিয়ে আসবে।

—মা—মু!...

শুকনো পাতায় আবার 'খর্ খর্' শব্দ। দুটো হরিণ এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে ওদের কাছেই এল। একদম গায়ের কাছেই এসে দাঁড়াল। বাঘের ভয়ে ভীত হরিণ এমনি করেই বনে মানুষের আশ্রয় ভিক্ষা করে।

আর্জান বুঝল, বাঘ এখন খুব কাছে নেই। খুব কাছে থাকলে হরিণ এখান থেকে ছুটে পালাত।

—রক্ত তো দেখছি না! দেখি!—বলেই আর্জান কফিলের হাত ঠেলে দিয়ে শিবের ওপারে লাফ দিল। ওপারে গিয়ে মামুর পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখতে পায়।

স্পষ্ট পায়ের দাগ!·বাঘে মুখে করে নেয়নি—হেঁটে গেছে, স্পষ্ট হেঁটে গেছে মামু! —ভেবেই আর্জান কফিলকে ডেকে নিয়ে পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে এগুতে লাগল। মাঝে মাঝে থামে, আর ধনাইমামুকে ডাকে; আবার এগুতে থাকে। একশ গজ মত এগিয়ে আসে। মামুর পায়ের দাগ তবুও স্পষ্ট আছে। দূরে তাকিয়ে দেখে, সাদা কি যেন পড়ে আছে!

আর্জান দ্রুতপদে এগিয়ে যায়। ছুটে যায়। কাছে গিয়েই দেখে, মামু পড়ে আছে। উপুড়

হয়ে। হাতের মুঠোতে সেই দীর্ঘ লাঠি ধরাই আছে।

আর্জান জোরে জোরে মামুকে ডাক দেয়। কোনও সাড়া নেই। দেহখানা উল্টে দেখে, কোথায় বাঘে খেয়েছে?

না। কোথাও তো রক্তের চিহ্ন নেই। দৃঢ় বিশ্বাসে কফিলের দিকে তাকিয়ে আর্জান বলে, —নিশ্চয়ই মামু বেঁচে আছে। ধর্ জলদি। চল্ নিয়ে যাই, —চল্।

ধনাইকে কাঁধে করে ওরা ডিঙিতে নিয়ে এল। মাথায় জল দিতে দিতে অবশেষে তার চেতনা ফিরে এল।

ধনাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। চুপ করে শুয়ে আছে। ওরা ডিঙি ছেড়ে দিল।

অনেক সময় কেটে গেছে। ডিঙি এখন বাড়ির ধারে কয়রা নদীতে এসেছে। আর্জান হঠাৎ প্রশ্ন করল, —আচ্ছা মামু, মধুর কলস কি হল?

কলসের কথা শুনেই ধনাই এতক্ষণে হেসে ওঠে। হাসতে দেখে আর্জান আবার প্রশ্ন করল, —আচ্ছা, তোমার কি হয়েছিল?

ধনাই চোখ বুঁজে বলে, —হ্যাঁ মনে পড়েছে। মধুর কলসটা ভেঙে বাঘের মুখে পড়তেই...বাঘ ফ্যোঁৎ ফ্যোঁৎ করতে থাকে। ...ফ্যোঁৎ!,..ফ্যোঁৎ!

আর্জান ব্যগ্র হয়ে বলল, —কিন্তু তারপর।

তারপরের কথা ধনাই কিছুতেই যেন মনে করতে পারে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ওঠে, —জানি না!...বলেই পাশ ফিরে গা এলিয়ে দিল।

কফিল মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, —জানো মামু! হরিণ দুটো কেমন ভয় পেয়েছিল!

দশ

বাঘের মুখে মধু ঢেলে লাঠি-তাড়া করা—এ গল্প গ্রামের লোকে বিশেষ আমল দেয়নি। ধনাই বা আর্জানও বিশেষ গল্প করতেও যায়নি। ওরা গল্প করতে জানে না—ভালও বাসে না। কফিল কিন্তু রসাল গল্প করতে ছাড়েনি। বাড়িয়ে ও রাঙিয়ে ঘরে ঘরে সে গল্প করে বেড়িয়েছে।

ফতিমা এখন বড় হয়ে উঠেছে। সে গল্প শুনে কফিলকে বলে উঠল, —নাও—নাও, তোমাদের সাহস বোঝা গেছে!

কফিল বলল, —শুনবে আর্জানের কথা?

ফতিমা উত্তর দেয়, —থাক্ থাক্, আর ওর কথা বলতে হবে না!

এমন সময়, আর্জান ঘরে ঢুকতেই গল্পের কথা চাপা পড়ে। ওঠে অভাবের কথা, অনটনের কথা।

ফতিমা তার বাবার অনেক সাহসের কথা জানে। সাহসে কেউ তার বাবার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তা মোটেই চায় না। সে আর্জান হলেও না। বীরত্ব দিয়ে কি হবে! সংসারের অভাবের কথাই তার কাছে বড়।

তাই অভাবের কথার মাঝে সে একবার খোঁটা না দিয়ে ছাড়ে না, —থাক্ বোঝা গেছে! গল্প শোনাচ্ছেন সব! কই মধু তো বন থেকে এল না! যাও, এখন গুড় কিনে নিয়ে এস!

ফতিমার খোঁটা আর্জানের মনে লাগে। কারও খোঁটার বদলে খোঁটা দেওয়া আর্জানের অভ্যাস নয়। সে হেসেই হালকা করতে চায় আঘাতকে। কিন্তু হাসলে কি হবে, উঠতে

বসতে ফতিমার খোঁটা তার মনের মাঝে জমে ওঠে। মুখে সে অবশ্য বেশ শান্ত ভাবেই বলল, —আরে! বন থেকেও তো সংসারের পয়সা আসে। আসে না?

পয়সা আসে বটে। কিন্তু আর্জানের মনে এ যেন এক জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। বন ও সংসার। বন তাকে ডাকে—তার নিবিড় ঘন সবুজ রঙে, তার নিদারুণ গভীর স্তব্ধতায়, তার ভীত পলাতক হরিণের পদশব্দে, তার হিংস্র ব্যাঘ্রের লোলুপ গর্জনে, তার নিঃসঙ্গ শিকারীর জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি বারুদের গন্ধের নেশায়। আর সংসার তাকে ডাকে—তার মায়ের স্নেহের স্পর্শের গড়া শান্ত আশ্রয়, তার ছোট কুঁড়ে ঘরের গোবর দেওয়া মেঝের মিষ্টি গন্ধ, তার ক্ষুধার অন্নের নিশ্চিত স্থান, তার সাঁঝের বাতি—ঘন অন্ধকার তমসার একান্ত ভরসার নিশানা। বন ও ঘর—এই দ্বন্দ্ব তাকে ক্লান্ত করে দেয়। অন্নের কথা ভাবলে বন ভুলতে হয়, বনের কথা ভাবলে অন্ন ভুলতে হয়। কিন্তু কোনটাই সে ভুলতে চায় না।

তাই সে অন্নের সংস্থানে বনে গিয়ে সমস্যা মেটায়। হরিণ মারতে বনে যায়। হরিণ মেরে মাংস বিক্রি করে সে অন্ন ঘরে আনে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে যেতে থাকে।

* * *

কয়েক বছর পরের কথা। আর্জানের মা অসুখে পড়েছেন। অনেক বৈদ্য আনা হয়েছে। তাদের কেউ ফুঁ দিল, কেউ মন্ত্র-পড়া জল খেতে দিল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। অবশেষে কলিম একদিন কেঁওড়া ফল পুড়িয়ে সরবৎ বানিয়ে খেতে দিল। কলিম বাউলে। বাউলেরা শুধু মন্ত্র দিয়ে বাঘ তাড়ায় না, কবিরাজিও করে। কলিমের দাওয়াইতে অসুখ 'নরম' পড়েছে। কিন্তু দুর্বলতা যায়নি।

সেদিন মঙ্গলবার, বেদকাশীর হাট। বেলা বারোটা থেকে বসে। পাঁচ-দশ মাইল দূর থেকে চাষীরা ডিঙি করে হাট করতে আসে। নদীর জোয়ার ও ভাটা বুঝে দুপুরে বা বিকালে হাট করে সন্ধ্যায় আবার বাড়ি ফিরে যায়। কালিকাপুর থেকেও দল বেঁধে সবাই হাটে যাবে।

সকালে কলিম হুঁকো হাতে নিয়ে তামাক খেতে খেতে ভেড়ির পথে আর্জানের বাড়ির দিকে চলেছে। গ্রামের বাড়িগুলি সব প্রায় একটা সারিতে ভেড়ির পাশে পাশে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাবার ভেড়িই একমাত্র পথ।

আর্জানও ভেড়ির দিকে আসছিল। তাকে দেখেই হাতের কর গুণে গুণে কলিম বলল, —আর্জান, আজ দ্বিতীয়া তিথি ; নাস্তার পরই জো আসবে। প্রথম জোতে রওনা হলে হাট ধরতে পারব।

আর্জান ভেড়িতে উঠে গাছের ফাঁক দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে বলল, —পানি দেখে তো মনে হচ্ছে ভাটি শেষ হয়ে এল।

কলিম হুঁকোর উপর মুখ রেখেই বলল, —সবাইকে খবর দিস, নে সব গুছিয়ে নে।

—নেব তো গুছিয়ে! হাটের পয়সা যে নেই!

কলিম হেসে বলল, —আরে চল্ ; আমি তো আছি! চার আনা পয়সার কি ব্যবস্থা আর হবে না! চল্।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সবাই নদীর ঘাটে এসে পড়ল। আর্জানের হাতে ছোট একটা তেলের শিশি। সরষের তেল আজ তার কিনতেই হবে। তা ছাড়া আম্মার জন্য একটা ডাব কিনতেও হবে। মায়ের শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না।

ঘাটে আরও ডিঙি ছিল, কিন্তু সবাই কলিমের ডিঙিতেই উঠল। কলিমের কাছে সবাই

জড় হতে চায়। সব সময় তো অভাব-অনটনের চিন্তা সবাইকে জর্জরিত করে। তবু কলিমের কাছে বসলে কিছু হেসে সময় কাটান যায়। কলিম গানে ও গল্পে ওস্তাদ, হাসির গল্পে আরও ওস্তাদ। গল্প ছাড়াও কে কেমন করে কথা বলে, তাই শুনিয়ে ও অভিনয় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসাতে পারে সবাইকে।

ডিঙিতে উঠেই কলিম জমিয়ে তুলেছে। নায়েব কেমন করে ঘাড় বেঁকিয়ে ধান মাপা দেখে, তারই নকল করে। গল্পে ও আমোদে ডিঙি সাঁই সাঁই করে চলে বেদকাশীর হাটের দিকে।

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, —এবার একটা গান! —ভবগান!

কলিমের মনে মনে গান গাইবার ইচ্ছা থাকলেও পাশ কাটাবার চেষ্টা করে। বলে, —হাটুরে 'লাও'তে কি গান জমে?

ধনাই মাতব্বরের সুরে বলল, —জমবে, জমবে। ধরো-না একটা ওড়াকান্দির ভাবগান!

কিছুক্ষণ গুন্‌গুন্ করে কলিম গান ধরে—

> "গুরু আমার মগ্ন তরি
> ও তরি পাওড়ি দিতে পেরলাম না।
> যে চিনে জলের শিরা
> তার তরি কি যায়গো মারা,
> মাঝি বেটার এমনি হারা
> ধার চিনে হাল ধরে না।
> অমাবস্যা প্রতিপদে
> দ্বিতে চাঁদ চন্দ্র ওঠে,
> সেই নদীর জল উজান ছোটে
> ঢেউ দেখে প্রাণ বাঁচে না।"

'ধার চিনে হাল ধরে না' কলিটাই সবার মনে ধরেছে। কেউ মনে মনে, কেউ বা গলা ছেড়েই কলিটা আওড়াতে থাকে।

বেলা গড়িয়ে যাবার একটু পরেই ডিঙি এসে হাটের ঘাটে ভিড়ল। হাটের পাশেই ফরেষ্ট আপিসের ষ্টীমার লাগাবার ঘাট। সামনেই ফরেষ্ট আপিসের ঘর। খুব বড় ঘর। সবটাই কাঠের তৈরি। বড় বড় গরাণ গাছের খুঁটির উপর ছয় হাত উঁচুতে মাচার মত ঘরখানা। মাটি থেকে বড় কাঠের সিঁড়ি আছে ঘরে উঠবার জন্য। ঘরটা এত উঁচু করে তৈরি করা কিন্তু বাঘের ভয়ে নয়, জলের ভয়ে।

কোন কোনবার বর্ষায় ভেড়ি ভেঙে জল ছাপিয়ে নদী, গ্রাম ও মাঠ একাকার হয়ে যায়। ছোটখাট বন্যায় ছয় হাত উঁচুই অবশ্য নিরাপদ।

ঘরের মেঝে, দেয়াল ও ছাদ—সবই কাঠের তৈরি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমে চারিদিকে চওড়া বারান্দা। মাঝখানে দুটি কামরা। প্রথমটি আপিস ঘর। দ্বিতীয়টি ফরেষ্টবাবুর ঘরকন্না। আপিস ঘরে সিন্দুকের সামনে পর পর সাত-আটটি বন্দুক সাজান। কোনটা একনলা, কোনটা দোনলা, কোনটা বা রাইফেল। নানা কাজে আপিসে লোকের ভিড় হয়। কেউ মাছের 'পাশ', কেউ কাঠের 'পাশ' কেউ বা মধুর 'পাশে'র জন্য এসে জমা হয়। 'পাশ' না নিয়ে বনে ঢোকাই বে-আইনী। যে কোন কাজে আসুক, বন্দুকগুলির দিকে তারা সবাই একবার না তাকিয়ে পারে না। ফরেষ্টবাবুর ক্ষমতা ও শক্তির পরিচয় ঐগুলিই। বেদকাশীর

বাবুর ক্ষমতা অসীম ; তার আপিসে দশটা বন্দুক আছে।

হাটের দিন ভিড়ের অন্ত থাকে না, কিন্তু আজ যেন আরও বেশি— হৈচৈ লেগে গেছে। ফরেষ্টবাবু রসিদ আলি সাহেব তার লম্বা কাঁচাপাকা দাড়ি নাড়িয়ে চিৎকার করে বলেন, —দাঁড়াও, বিহিত একটা হবেই। দেখছি কি করা যায়। আরে অতো ব্যস্ত হলে কি কিছু হয়। যাদুকে আমার 'ঘেরে' এসে বাঁচতে হবে না।

আর্জান ও কলিম এগিয়ে যায় ভিড়ের দিকে। ওদের দেখতে পেয়েই কয়েকজন উৎসাহে চিৎকার করে ওঠে, —আরে! বাউলে এসে গেছে! বড় বাউলে!

অভ্যর্থনায় খুশি হয়ে কলিম শান্তভাবেই বলে, —কেন, কি হয়েছে ? আরে থাম্ থাম্—কি হয়েছে শুনি দেখি।

সুন্দরবনের আবাদে বাওয়ালির সম্মান সর্বত্র। ফরেষ্টবাবু কলিমকে টেনে নিয়ে বেঞ্চিতে বসিয়ে বললেন,—দেখো বাউলে। তুমি না হলে তো চলে না। আমার 'ঘেরে' বাঘ এসেছে। বড্ড জ্বালাতন করছে। বাঘের জন্য বেদকাশীর 'ঘেরে' মানুষ কাঠ কাটতে পারবে না, তা আমিই হতে দেব না। আমি কি ভয় পাই! তবে তুমি কাছে থাকলে সাহস থাকে। চলো যাই। হাটের সওদার কথা বলবে তো! হবে, —হবে, তা হবেখন। আমিই তোমার সওদা করে দেব।

কলিমকে কথা বলতে না দিয়েই এক নাগাড়ে রসিদ আলি সাহেব বলেই গেলেন।

বনের সর্বত্র কাঠ কাটতে দেওয়া হয় না। তাই যদি দেওয়া হত তাহলে এতদিনে বন উজাড় হয়ে যেত। এক-এক বছর এক-এক জায়গায় কাঠ কাটার হুকুম দেওয়া হয়। একেই বলে 'ঘের'। 'ঘেরে' আবার সব গাছ কাটা যায় না। বড় বড় গাছে মার্কা মেরে দেওয়া হয়। কেবল মাত্র এই মার্কা মারা গাছ কাটা যায়। এবার ঘের পড়েছে বেদকাশীর বনে। নানা জেলা থেকে লোক এসেছে বেদকাশীতে।

কলিম বলে, —সাহেব, আমি তো বাউলে। বাঘ তাড়ানই আমার কাজ, বাঘ মারা আমার কাজ নয়। তবে···

—তবে কি বাউলে! চলো, চলো। সদ্য মানুষ নিয়ে গেছে। এখনও খাচ্ছে নিশ্চয়—চলো, শীগ্‌গির চলো। শুনে নাও ওদের কাছ থেকে সব ঘটনা।

কালিম শুনে নেয় ঘটনাটি। দলটি এসেছে বরিশাল থেকে। বড় নৌকা নদীতে নোঙর করে দলের তিনজনে ছোট্ট ডিঙি চেপে ছোট খালের ভিতর অনেক দূর এগিয়ে যায়। ছোট খাল দিয়ে যাবার সময় একবার মট্ করে শব্দ হয়। সন্দেহ হওয়াতে ওরা ডিঙি থেকে উঁচু হয়ে বনটা একবার দেখে নিল। কিন্তু পরিষ্কার বনে কোথাও কিছু দেখে না। তারপর ডিঙি করে আরও এগিয়ে গিয়ে ডাঙ্গায় ওঠে। তিনজনে এক সঙ্গেই উঠেছিল। উঠে দেখে দূরে বড় একটা দল কাঠ কাটতে এসেছে। তাদের কাছে গিয়েই কাঠ কাটবে মনে করে তিনজনে আবার ডিঙিতে উঠতে যায়। দুজনে ডিঙিতে উঠেছে, একজন বাকি। ঝড়ের মত বেগে আক্রমণ করে বাঘ তাকেই যেন ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। তখন ধারে কাছে যারাই ছিল তারা সব চলে এসেছে ফরেষ্ট আপিসে খবর দিতে।

কলিম একমনে শুনছিল। কাহিনী শেষ হলে ঠোঁটের কোণে হেসে বলল, —বুঝলাম। তোমরা বুঝি বাউলে নেওনি ? তা নেবে কেন ? দুটো পয়সা খরচ করতে বাধে। যেমন কর্ম তেমনি ফল। চলো দেখি।

আর্জানের দিকে মুখ ফিরিয়ে কলিম বলল, —কিরে, যাবি নাকি ?

আর্জানের মুখে কথা নেই। হাতে তেলের খালি শিশিটার দিকে একবার তাকাল।

কলিম আর্জানের পিঠে হাত দিয়ে বলে, —বুঝেছি, বুঝেছি। চল্। তোর আম্মাকে আমি বলবো। আমি থাকলে কেউ কিছু বলবে না। চল্।

ফরেষ্ট আপিসের বোটে সবাই চলল। সাদা ধবধবে বোট। কাঠের খুপরি করা। রসিদ আলি সাহেব খুপরির ছাদেই বসে। একটি রাইফেল তার হাতে। রাইফেল এমন ভাবে ধরা যেন বাঘ সামনেই আছে। তা ছাড়া আরেকটি বন্দুক কলিম নিয়েছিল। দোনলা বন্দুক। এখন সেটি আর্জানের হাতেই। দুজনে গলুইতে পাশাপাশি বসে আছে। কলিম হুঁকো টানছে। তামাক তার বড় প্রিয়। তামাক টানতে টানতে মিটি-মিটি বাবুর দিকে তাকাচ্ছে আর মুচকি হাসছে।

আর্জান বলল, —হাসছ কেন ?

—দাঁড়া, রগড় দেখবি ?

বলেই কলিম দাঁড়িয়ে পড়ল। বনের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে ভাঙা গলায় বলল, —চুপ ! চুপ ! আর অমনি রসিদ আলি সাহেব হাঁটু গেড়ে রাইফেল কানের কাছে নিয়ে বনের দিকে নিরিখ করতে লাগলেন।

—আঃ, ভারি সুযোগ ছিল, ফস্কে গেল। —বলেই কলিম হাসতে হাসতে বসে পড়ল।

বিপদে ও চিন্তায় সকলে মন-মরা থাকলেও মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হাসি না হেসে পারে না।

বাবু রেগে উঠে বললেন, —যাও বাউলে ! অমন ফাজলামো করো না।

কলিম চুপচাপ আরও জোরে হুঁকো টানতে থাকে।

যে-বনে ঘটনাটি ঘটেছিল তাকে আড়পাঙাসের বাদা বলে। বড় নদীটির নাম আড়পাঙাসে। নদীর নামেই এই বাদার নাম। বোট খালে ঢুকেছে। যাদের লোক বাঘে নিয়েছে তারাও বোটে ছিল ; তাদের কলিম জিজ্ঞাসা করল—কোথায় মট্ শব্দ শুনেছিলে ?

—এই তো এখানে।

কলিম তক্ষুনি মাঝিকে বলল, —বোট ভেড়াও এখানে।

—এখানে কেন ? লোকটাকে তো আরো আগে থেকে নিয়ে গেছে। এখান থেকে তো নেয়নি !

—না, না, এইখানেই ভেড়াও।

বোট ভিড়ল। বোটে কিন্তু অনেক লোক। মাঝি-মাল্লা নিয়ে দশজন।

কলিম আর্জানকে নিয়ে ডাঙ্গায় নেমে বলল, —বাবু, আপনি মালে উঠুন। —সুন্দরবনের চত্বরকে এরা সহজ ভাষায় 'মাল' বলে।

রসিদ আলি সাহেব মালে নেমেই বললেন, —কিন্তু ওরা কেউ আসবে না ? আর কেউ যাবে না ?

কলিম দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, —না বাবু, সেটি হবে না, তা হলে শিকার হবে না। তারপর মাঝি মাল্লার দিকে তাকিয়ে বলল, —তোমরা এখানেই বোট ভিড়িয়ে থাকো। কোন ভয় নেই। 'বড়-মেঞা'র খাওয়া হয়ে গেছে আজকের মত ; তোমাদের পেছনে আর লাগছে না। কোনও ভয় নেই। ভরা পেটে বনবিবির বাহন কাউকে কিছু বলে না। —বাঘের প্রতি কলিমের কেমন যেন একটা মমতা আছে।

খালের ধার থেকে কিছুদূরে তিনজনে বাঘের থাবার 'খোঁচ' সন্ধান করতে থাকে। পেতেও খুব দেরি হয় না। কলিম খোঁচ অনুসরণ করে চলেছে আগে আগে ; আর্জান

তারপরে, আর বাবু সবার শেষে।

বাবু বললেন,—কলিম, রাইফেলের ক্যাচ্ তুলে রাখব ?

কলিম বাঘের 'খোঁচের' দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বলল,—না বাবু, এত আগে না। কিন্তু খোঁচ দেখে মনে হচ্ছে বাবু, মদ্দা আর খুব বড়। অমন জোরে কথা বলবেন না।

একটু এগিয়েই কতকগুলি শুকনো ডাল পড়ে আছে ; বাঘটি তার উপর দিয়ে না গিয়ে, পাশ কাটিয়ে ঘুরে এগিয়ে গেছে। কলিম তা লক্ষ্য করে আস্তে আস্তে আর্জানকে বলল, —দেখেছিস আর্জান, কি হুঁশিয়ার জানোয়ার ! ডালগুলিকে ঠিক এড়িয়ে গেছে। অত বড় জানোয়ার, কিন্তু চলবার সময় এতটুকু শব্দ করবে না ! থাবার নিচে কাঠি বা শুকনো পাতা পড়ে যদি একটু শব্দ হয়, তাহলে নিজের থাবা নিজে কামড়ায়। এত বড় হুঁশিয়ার জানোয়ার !

শূলোর ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে আর্জান ও কলিম দ্রুত এগিয়ে যায়। বাবু পিছনে পড়ে গেছেন। ভয়ে কলিমের কাছে জোরে আসতে গিয়েই বাবু রাইফেল নিয়ে শূলোয় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। এবার কলিমের আর ঠাট্টা নয়। চোখ রাঙিয়ে উঠল। জোরে কথা বলার উপায় নেই। শুধু ফিস্ফিস্ করে একবার বলল, —উনি আবার রাইফেলের ঘোড়া তুলতে চান !

বাবুর অবস্থা দেখে ওরা এবার আস্তে আস্তে চলল। শিকারের স্থানটি চিনতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। সেখানে পৌঁছেই বুঝতে পারল। মানুষের পায়ের দাগ আর বড়মেঞার পায়ের দাগ পরস্পরে মিশে গেছে।

কিছুক্ষণ ঘুরে-ফিরে দেখে আর্জান বলল, —কিন্তু রক্তের তো কোন চিহ্ন দেখছি না !

—চল্ এগিয়ে দেখি। —কলিম নির্ভয় নির্দেশ দেয়।

আবার ওরা 'খোঁচ' অনুসরণ করে এগিয়ে চলে। এবার খালের কিনারা বরাবর নয়। সোজা বনের ভিতর দিকে 'খোঁচ' চলে গেছে।

কিছুদূর গিয়েই কলিম ফিস্ফিস্ করে বলল, —পুরনো ! খুব বড় ! এক কামড়ে মুখে করে উঁচু করে নিয়ে গেছে। দেখিস না ? কোথাও এক ফোঁটা রক্ত নেই। কামড় একটুও না ছাড়লে রক্ত বেরুবে কি করে ? আর তা নয় তো, কোনও মানুষই নেয়নি। ওরা মিথ্যা কথা বলেছে !

মুহূর্তমধ্যে বাবুর মনের মাঝে কলিমের কথা তোলপাড় করল,—তা হলে তো বাঘের ভরা পেট নয়। সামলে নিয়ে ঢোক গিলে বললেন, —নিশ্চয় মিথ্যা। তাহলে কি হবে বাঘের পিছনে পিছনে গিয়ে ? ওকে তো পাওয়া যাবে না।

কলিম দৃঢ়ভাবে বলল, —সেটি হবে না। যখন এসেছি, শেষ দেখতেই হবে।

একটু এগুলেই চার পাঁচ হাত লম্বা একটা গোখুরা সাঁ করে ওদের সামনে দিয়েই চলে গেল।

দেখেই কলিম চুপিচুপি বলল, —যা, যা, চলে যা, যাত্রা শুভ। বাবু ! যাত্রা শুভ।

সাপ সম্পর্কে আবাদের লোক উদাসীন। সাপের কামড়ে এদেশের লোক অনেক মরে। কিন্তু সাপে কামড়ালে কেউ মনসাকে দোষ দেয় না। দোষ দেয় যাকে কামড়াল তাকেই। বেহুলা মনসার গান এদেশে হিন্দু ও মুসলমানের মুখে মুখে।

কিন্তু ওদের আর বেশি দূর যেতে হয় না সামনেই ভিজে মাটির উপর অনেকটা জায়গা জুড়ে তাজা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। নিঃসন্দেহে হিংস্র দাঁতের কামড় এখানে প্রথমবার আলগা করেছিল।

রসিদ আলির অতো রক্ত দেখে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। কলিমের মুখে আর বিশেষ কথা নেই। ইশারায় সারতে লাগল সব কথা।

ইশারা করে কলিম দৃঢ় ভাবেই বাবুকে জানাল, —শীগ্‌গির সামনের গাছটাতে উঠতে।

গাছটা গরান গাছ। মোটা ছাল শুকিয়ে ফেটে উঁচু উঁচু হয়ে আছে। সেই ধারাল শুকনো ছাল বুকে ঘষে ঘষে কোন মতো বাবু গাছে উঠলেন। গরান গাছের ডাল অনেক উপরে হয়। এক কেওড়া গাছ ছাড়া সুন্দরবনে কোন গাছের ডাল নিচুতে মিলবে না। রাইফেলটা পিঠে ঝুলিয়ে নিতে বাবু ভোলেননি।

কলিমের দোনলা বন্দুকে দুটি গুলি ছিল। বাড়তি টোটা বাবুর পকেটেই।

কলিমের ইঙ্গিতে টোটাগুলি বাবু মাটিতে ফেলে দিলে আর্জান কুড়িয়ে নিল।

কলিম ও আর্জান এগিয়ে চলে। এবার আর্জান একেবারে কলিমের কাছে-কাছে চলেছে। রক্তের দাগ দেখে দেখে ওরা এগুচ্ছে। গতি খুব ধীর, যেন এক-পা এক-পা করে চলে।

সামনেই হেঁতালের একটা ঝাড়। হেঁতাল গাছের পাতা বেত গাছের পাতার মত দেখতে। কোনও সাড়া শব্দ নেই। বনের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়। সুন্দরবনে সব গাছগুলিই সোজাভাবে উপর দিকে ওঠে। তখন তাদের ডালপালা বিশেষ থাকে না। বিশ পঁচিশ হাত উপরে ওঠার পর ডালপালা ছড়িয়ে দেয় ছাতার মত। সূর্যের আলো পাবার জন্য এ এক সমারোহ। পরস্পরে পাল্লা চলে। কে আগে উঠে সূর্যের আলো গ্রহণের জন্য পাতা বিস্তার করতে পারে। নিঃশব্দ বনে আলোর জন্য এই অবিরাম প্রতিযোগিতা চলেছে প্রতিক্ষণে। ফলে সুন্দরবনে এই পাতার ছাতা বিস্তৃত। বাতাস হু হু করে বয়ে চলেছে এ ছাতার উপর দিয়ে। মাঝে মাঝে হালকা হাওয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করে। তারই দোলায় হেঁতাল গাছের পাতা একটু একটু দুলছে।

রক্তের দাগ সোজা এই হেঁতাল-ঝোপের দিকে চলে গেছে। কলিম অনেকক্ষণ এই ঝোপের দিকে চেয়ে রইল। অনুমান করল, এরই আড়ালে বাঘ নিশ্চয় আছে। ঝোপটি ওদের থেকে দক্ষিণ দিকে ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে। বাতাসের গতি পুব থেকে পশ্চিমে। কলিম তাই পশ্চিম দিকে বেড় দিয়ে ঝোপের পেছনে যাবার মতলব করল। যাতে মানুষের গন্ধ বাঘের নাকে না যায়। বনের জীব মাত্রেরই ঘ্রাণ-শক্তি অত্যন্ত প্রখর।

ওরা এক-পা দু-পা করে এগিয়ে যায়, আর থেমে থেমে দেখে, কোন কিছু ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় কিনা। এইটুকু পথই যেতে ওদের আধঘণ্টা লাগল। ওপাশে গিয়ে দেখে, কিছুই নেই। কলিম যেদিকে তাকায় আর্জান সেদিকেই আরও বেশি করে নজর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। এমনি ধারা ভীতিজনক মুহূর্তের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা আর্জানকে ক্লান্ত করে ফেলেছে।

ওরা দাঁড়িয়েই আছে। কলিম অনুমান করবার চেষ্টা করে, কোথায় যেতে পারে ? এমন সময় একটি বন্য মুরগী ত্রাসে হঠাৎ কক্ কক্ করতে করতে পশ্চিম দিকে চলে গেল। তার ডানার ঝাপটও স্পষ্ট শোনা গেল। নিঃসন্দেহে কোনও আতঙ্কের বস্তু দেখে বুনো মুরগী আঁতকে উঠেছে।

কিন্তু কোথায় হতে পারে ? ঠিক করতে না পেরে ওরা হেঁতাল গাছের ঝোপের ধারেই গেল। চারিদিকে রক্তের দাগ ছড়িয়ে আছে। খুঁজে দেখল, বাঘ সেখান থেকে 'সরে' গেছে আরও দক্ষিণ দিকে।

আবার ওরা চলল রক্তের দাগ ও থাবার চিহ্ন দেখে দেখে। হঠাৎ কলিমের মনে পড়ে,

এখানে কোথায় যেন একটা ভিটে আছে। সুন্দরবনের ভিটে এক রহস্যময় বস্তু। বনে চলতে চলতে কোথাও হঠাৎ দেখা যাবে পোড়ো-ভিটের চিহ্ন। দেখেই বোঝা যায়, সেখানে এক সময় মানুষের ঘর-বাড়ি ছিল। হয়ত দুটি বা তিনটি ঘরের ভিতের চিহ্ন রয়েছে। হয়ত একটা তেঁতুল, না হয় গাব, না হয় বেল, না হয় ডুমুর গাছ আশে-পাশে আছে। এই সব গাছ কিন্তু সুন্দরবনে আপনা থেকে হয় না। আর হয়ত পড়ে আছে অসংখ্য মাটির খোলামকুচি। এইসব ভিটেগুলি বেশ উঁচু। শুকনো খটখটে। খানিকটা ফাঁকা। বর্ষার প্লাবনে জীবজন্তুর আশ্রয়ের স্থল, শীতে তাদের নিশ্চিন্তে রোদ পোহাবার জায়গা। এইগুলি হয়ত বা এককালে জলদস্যুর আড্ডা ছিল, না হয় লবণ তৈরির কারখানা ছিল। কিন্তু সে সব অনেক অতীতের কথা।

ধীরে ধীরে চলে ওরা। আধ ঘণ্টা লেগে যায় একশ হাত অতিক্রম করতে। দূর থেকে ভিটের উঁচু মাটি কিছুটা দেখা যায়। ভিটেকে ঘিরে চারদিকে হেঁদো বনের ঝোপ। চার-পাঁচ হাত উঁচু নিবিড় ঝাড়। তার গা দিয়েই আবার চারপাশে স্বাভাবিক বন শুরু হয়েছে।

কলিম ও আর্জান আর সোজা না এগিয়ে বাতাসের জন্য আবার পশ্চিম দিক ঘুরে এগুতে লাগল—অতি সন্তর্পণে। কিছুটা এগুতেই একটা ফাঁক দিয়ে গোটা ভিটে ওদের দৃষ্টিতে এল। ওরা এখন মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরে। ভিটের উপর পড়ে আছে লাসটা। পেটের দিকটা খাওয়া হয়ে গেছে। হাত দুখানা ছড়িয়ে পড়ে আছে। আরও দু-এক পা ওরা এগুলো। কোথাও শব্দ নেই। কলিম হাত দিয়ে আর্জানকে থামতে ইশারা করে দাঁড়াল। কিন্তু আর কোথাও কিছু দেখা যায় না। নিঝুম বন। কোনও জীবের চিহ্ন নেই।

কিন্তু কোথায় ? কোন কিছুই লক্ষ্যে আসে না ; চার চোখ দিয়ে ওরা তন্ন তন্ন করে দেখছে। পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। এদিক ওদিক দেখবার সময় মাথাটাও ঘোরাচ্ছে অতি ধীরে—পাছে বাঘের নজরে পড়ে যায়। বনের আইন ওদের জানা আছে। একপাশ থেকে আরেক পাশে মাথা ঘোরাতেও ওরা দুই মিনিট সময় লাগায়। চোখের মণিটাও যেন চট করে নাড়াতে চায় না। পাছে চলন্ত কিছু শত্রুর নজরে আসে। সহসা কলিমের নজরে পড়ল,—হেঁদো গাছের একটা পাতা মাটির সঙ্গে লেগেছিল, তা হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠল। দুজনেরই নিষ্পলক দৃষ্টি ঐ পাতাটির দিকে ; কিন্তু কিছুই না—কিছুই ওরা দেখতে পায় না।

কলিম যেন কি বুঝে নিয়েছে ; চলতে শুরু করল ছোট-ছোট পা ফেলে, অতি সন্তর্পণে। ভিটের দিকে নয়, ভিটের পিছন দিকে। আর্জানকে কিছু বলতে হয়নি ; সেও কলিমের সঙ্গে অমনিভাবে অতি সাবধানে চলতে লাগল। যত ওরা এগুচ্ছে ততই ওরা গলা বাড়িয়ে ভিটের হেঁদো-ঝোপের পেছনটা দেখবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ কলিম ভীষণ চিৎকার করে উঠল, —ঐ যে শালা। শিকারীর কোন নিয়মকানুন না মেনেই চিৎকার করে উঠল, —ঐ যে শালা !!

বাঘ ঝোপের ফাঁক দিয়ে লাসের দিকে মুখ করে বসেছিল ; গোটা পেছনটা ঝোপের বাইরেই ছিল। লেজটা গুটিয়ে গুটি মেরে বসেছিল। আড়ালে বসে লাসকে পাহারা দিচ্ছে।

পেছনটা দেখতে পেয়েই কলিম চিৎকার করে উঠেছে। সে ভুলেই গেছে যে, সে এখন বাওয়ালি নয়, —সে এখন বন্দুক হাতে বাঘ শিকারী।

বাঘও সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে উঠে বসে সামনের দুই বাহু ভর করে গোঁ গোঁ করে উঠেছে। হিংস্র দাঁত বের করে, হিংস্র চাহনি দিয়ে গোঁঙাতে আরম্ভ করেছে।

থাক্ না তার হাতে বন্দুক। সে তো এই হিংস্রতম জানোয়ারকে খালি হাতে চ্যালেঞ্জ করতেই অভ্যস্ত। সে দেখাবেই—ঐ মূর্তিতে সে ভীত নয়। ঐ মুখ-বিকৃতিকে সে

তোয়াক্কাই করে না। হিংস্র জানোয়ারের বিরুদ্ধে তারও হিংস্র চেহারা ফুটে উঠেছে। তারও দেহ যেন ফুলে ফুলে উঠছে। মুখে শ্লীল-অশ্লীল গালাগালি। চির অভ্যাসমত হাঁটু গেড়ে বসে গেছে।

পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এইভাবে কলিমের চ্যালেঞ্জ আর্জান কখনও দেখেনি। কি করতে হবে, সে চিন্তাশক্তি তার নেই। বাঘও যেমন গোঁ গোঁ করছে, আর্জানও তেমনি গোঁ গোঁ করতে লাগল, আর্জানও তার চেয়েও যেন জোরে জোরে গোঁ গোঁ করবার চেষ্টা করছে। বাঘ গোঁ গোঁ করতে করতে এক-একবার বীভৎসভাবে 'গাঁক্' করে ওঠে। আর্জানও সঙ্গে সঙ্গে 'গাঁক্' করে উঠছে।

কলিমের হঠাৎ জ্ঞান এসে যায়, —সে বাঘ তাড়াতে আসেনি, বাঘ মারতে এসেছে। হাঁটু গেড়ে ছিল, উঠে দাঁড়াল। বাঘের চোখে চোখে সে হিংস্রভাবে তাকিয়ে আছে, আর মুখে অনর্গল গালাগালি। গালাগালি দিতে দিতে তারও মুখে গেঁজা উঠে গেছে। বাঘের মুখ থেকেও লালা ঝরছে। কলিম বন্দুক উঁচু করেছে, বাঘও একবার লেজের বাড়ি মেরেছে। কলিম জানে, বাঘ তিনবার মাটিতে লেজের বাড়ি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে বন্দুক কানের কাছে নিয়েই দুটো টিপ একসঙ্গে টিপে দিল।

বাঘ একটুও হেলে না। কিন্তু সে লাফও দেয় না। রাগে গর্‌গর্‌ করছে, মুখ দিয়ে লালা ছিটকে পড়ছে, আর সামনের দুই থাবা দিয়ে এগিয়ে আসছে। কলিম যেন জ্ঞানহারা। সেও এক পা, দুই পা এগুছে —আয়···দেখে নেবো তোকে। ···শালা! —গালির যেন শেষ নেই!

তপ্ত গুলি পেট বিদ্ধ করে বাঘের কোমরের হাড় ভেঙে দিয়েছে। মাজা খাড়া করতে পারছে না। সামনের দুই বাহু দিয়ে এগিয়ে আসছে, মাজা মাটিতে টানতে টানতে, হেঁচ্‌ড়ে হেঁচ্‌ড়ে।

সেই বিস্ফারিত জিহ্বা, দাঁত, আর লালার সামনে আর্জানের মনে হল, এবার বুঝি নিস্তার নেই। কালবিলম্ব না করে কলিমের হাত থেকে একটানে বন্দুকটা কেড়ে নিল। হাতের টোটা বন্দুকে পুরেই সে অব্যর্থ গুলি ছাড়ে মাথা নিরিখ করে।

বাঘ পড়ে গেল কাৎ হয়ে। কলিম তবুও এগিয়ে চলেছিল। আর্জান বাঁ হাত দিয়ে তাকে টেনে ধরে। কলিম দাঁড়াতেই আবার আর্জানের গুলি। শায়িত বাঘের কানের পাশ দিয়ে এবার রক্ত ঝরে পড়তে থাকে। বাঘ তখন মাত্র পনেরো হাত দূরে।

আর্জান বসে পড়ল। কলিমকেও সেখানে টেনে বসাল। বন্দুকে আবার গুলি পুরে নেয়। তারপর দম নিয়ে কোমর থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাতে বলল।

বাঘ পনেরো হাত দূরে পড়ে আছে। বিড়িতে টান দেবার পর কলিম হেসে বলে উঠল, —দেখেছিস শালার তেজ!

আর্জানের মুখে কোনও কথা নেই; ঝরঝর করে ঘামছে।

কলিম অনেক কথাই বলছে, কিন্তু কোনটা আর্জানের কানে যায়—কোনটা যায় না। বেশ কিছুক্ষণ পরে আর্জানের দেহ ও মন শান্ত হয়ে এল। আর্জানের মনে পড়ে, তার বাবার মৃত্যু কাহিনী। লুণ্ঠিত ব্যাঘ্রের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

বিজয়গর্বে কলিম বলল, —চল্‌, শালাকে একবার দেখি।

ওরা উঠে এসে ভাল করে দেখল। মেপে দেখল, পুরো আট হাত দীর্ঘ। অর্ধভুক্ত লাসের দিকে না গিয়েই ওরা ফিরে চলল। জোরেই চলল।

মাঝপথে কলিম একবার থেমে বলল, —দাঁড়া, একবার 'কু' দিয়ে নিই। বাবু তো

গাছে। বন্দুক তার হাতে আছে। যদি জ্ঞান থাকে তো, আমাদের শব্দ লক্ষ্য করে আন্দাজে গুলি করেও বসতে পারে।

কলিম কয়েকবার 'কু' দিল। দূরে বাবুর কাছ থেকে এবং বোট থেকেও 'কু'র উত্তরে 'কু' আসতে লাগল। বোটের লোকে সবাই মিলে উৎসাহে 'কু' দিতে লেগেছে।

সুন্দরবনে 'কু' দেওয়া এক অভিনব ব্যাপার। বনে নাম ধরে কেউ কাউকে ডাকাডাকি করে না। পাখির ডাকের মত জোরে 'কু' দেয়। হিংস্র জন্তু থেকে লুকোবার কত পন্থাই না মানুষ জানে।

কলিম ও আর্জানের মুখে সহজ হাসি দেখতেই রসিদ আলি সাহেবের বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। গাছ থেকে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসে ওদের সঙ্গে বোটের দিকে চললেন।

মাঝপথে পিছন দিকে তাকিয়ে কলিম ভর্ৎসনা করে উঠল—কি করেন বাবু। ও কি করেন।

রসিদ আলি সাহেব কোন কথা না শুনে বললেন, —দাঁড়াও, শিকারে এসে গুলি করব না—এ কেমন কথা। —বলেই তিনি রাইফেল তুলে ঘন বনের দিকে একটা চোট্ করে দিলেন।

আর্জান ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, —রাইফেলের আওয়াজ তো ভীষণ, বাবু।

সবাই মিলে বাঘকে বোটে নিয়ে হৈ-হল্লা করে আপিসের দিকে যাত্রা করল। বোট যখন ঘাটে এল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। হাট ভেঙে গেছে। তবু লোকজন কিছু ছিল। উৎসুক জনতা ভিড় জমিয়ে তোলে।

সবার ঔৎসুক্য কিছুটা কমে এলে কলিম ও আর্জান একত্রে রসিদ আলি সাহেবকে বলল, —বাবু, একটা আর্জি আছে। বাঘটাকে আজ একবার আমাদের গ্রামে নিতে চাই। কাল তো খুলনা সদরে যাবেন। ঐ পথেই না হয় নিয়ে যাবেন।

—তোরা তাহলে সদরে যাবি না?

—নিশ্চয় যাব, নিশ্চয় যাব।

তারপর কিছুক্ষণ মাথা চুলকিয়ে রসিদ আলি বললেন,—আচ্ছা, নিয়ে যা। কিন্তু আমার বোটেই আমার লোকজন নিয়ে যাবে।

মনের আনন্দে ওরা সবাই রওনা হবে, এমন সময় আর্জানের হাতে তেলের খালি শিশি দেখে রসিদ আলি তাকে ডেকে নিলেন। তারপর নিজের ঘর থেকে শিশি-ভর্তি তেল ও দুটো ডাব দিয়ে বললেন, —যা, এইবার যা।

কলিম দেখে বলল, —যথা লাভ। কিন্তু বাবু, এতেই শেষ?

—না, না, হবেখন।

কালিকাপুরের ঘাটে বোট ভিড়তেই হৈ-হল্লা লেগে গেছে। সবাই হৈচৈ করে বাঘকে আর্জানের উঠানে নামিয়েছে।

আর্জানের মা অসুস্থ। শুয়েই ছিলেন। আর্জান ও বাঘের কথা শুনে তিনি একটা কুপি নিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে উঠানে এসেছেন।

আর্জান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, —আম্মা। দেখ, এইখানে আমার গুলি লেগে দরদর্ করে রক্ত বেরিয়েছিল।

মায়ের কিন্তু সেদিকে কান নেই। বাঘের কালো পিঠে হাত দিয়ে বললেন, —নারে আর্জান। বাঘটা খুব পুরনো। খুব বুড়ো হয়ে গেছে, না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এই বাঘ।

তারপর আর্জানের পিঠে শীর্ণ ও দুর্বল হাত বোলাতে বোলাতে তাকালেন সেই সামনের হেঁতাল গাছটার দিকে। হেঁতাল গাছটার তলায় তখনও সন্ধ্যার দীপটি জ্বলছিল।

এগার

পরদিন রসিদ আলি সাহেব এসে সকলকে সঙ্গে করে বাঘ নিয়ে খুলনা যাত্রা করলেন। খুলনা দীর্ঘ পথ। এ দীর্ঘপথে বাঘ দেখার লোকের অভাব নেই। যেখানেই হাট ও বাজার, সেখানেই লোক জমে যায়।

লোক জমা হলেই কলিম বলে, —বাঘ তো তোমরা দেখলে, বাঘের শিকারীকে কি তোমরা দেখেছ? —বলেই কলিম আর্জানকে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

খুলনায় পৌঁছে বনকর সাহেবের কাছে রসিদ আলি বাঘ নিয়ে গেলেন। সঙ্গে তার সেই রাইফেলটাও নিয়ে যেতে ভোলেননি। বনকর সাহেবের ঘোষণা আছে, বাঘ মারতে পারলেই দুশো টাকা পুরস্কার মিলবে। তারই জন্য এত আয়োজন।

সবাই আশা করেছিল, আর্জানের ডাক পড়বে। কিন্তু তা তো হলোই না। বরং রসিদ আলি সাহেবের ইচ্ছায় বনকর আপিসের বড় সাহেবকে বাঘের চামড়াটাও উপঢৌকন দিতে হল। আপিস থেকে ফিরে এসে রসিদ আলি সাহেব পুরস্কার সম্পর্কে সবাইকে বললেন, —সে সব নাকি পরে মিলবে।

অবশ্য রসিদ আলি সাহেব ওদের সবাইকে একদিন প্রচুর খাইয়েছেন। আজও খাওয়ালেন।

খুলনা থেকে চলে আসার অনেক দিন পরে রসিদ আলি সাহেব একদিন কলিম ও আর্জানকে ডেকে দশ টাকা করে হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, —এই নাও পুরস্কার। খুলনা থেকে টাকা এসে গেছে। আমি কি নেমকহারামি করি।

বাকি টাকার কথা কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। বনে বাস করে বনের ফরেস্টবাবুকে কেউ চটাতে চায় না।

আর্জানের মা সেই যে শয্যা নিয়েছিলেন, তার থেকে আর ওঠেননি। মৃত্যুর সময় মা কদিন ধরে অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, তাই কোন কথা আর্জানকে বলে যেতে পারেননি।

এবার সংসারে আর্জান ও ফতিমা মাত্র। মা মৃত্যুর আগে কিছুদিন যেন ফতিমার উপর বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। আর্জানের তা নজর এড়ায়নি। আর্জান ফতিমাকে চায় না এমন নয়, কিন্তু সে যেন মাঝে মাঝে বরদাস্ত করতে পেরে ওঠে না। এবার সংসারে ওদের দুজনের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ ও বিরোধ বাধে।

আর্জান বারবার বনে যেতে চায়; কিন্তু নানা ছুতায় ফতিমা তাকে যেতেই দেবে না।

আর্জানকে বাধা দেওয়া দুরূহ। সে বনে যাবেই। তাই ফতিমাও ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠতে থাকে আর্জানের উপর।

এইভাবে দু-বছর ওদের কেটে যায়। একদিন কাছারির নায়েব আর্জানকে ডেকে বলল, —দেখ্ আর্জান, কতদিন আর এমন করে দেনা শোধ করবি না। ও-সব চলবে না। জমিদারের ছেলের বিয়ে। টাকা এবার দিতেই হবে।

ধনাই মামুর সঙ্গে দেখা হতে আর্জান কাছারির কথা বলল। ধনাই মামুর অনেক সাকরেদ আছে; সে কাছারি বাড়ির খবর সব জানে।

সে বলল, —আরে, ওসব বাজে কথা। কি জানিস ? নায়েব এখান থেকে চলে যাবার মতলবে আছে। যাবার আগে জমি হাত বদল করিয়ে কিছু সেলামি আদায় করতে চায়।

—কিন্তু আমি কি করি!

—করবিই বা কি! তোর তো অনেক টাকা দেনা হয়ে গেছে। দেনা না করেই বা তোর উপায় কি ? তোর যে জমি আছে তা তো আবার ভেড়ির কোলে। অত ধারে তো লোনা জল চুইয়ে আসবেই। তাই ফসলও পাচ্ছিস না।

—কেন! নায়েব ভেড়ি ভাল ভাবে মেরামত করলেই তো পারে!

—নায়েবের চালাকি জানিস না। ভাল ধান না হলে নায়েবের একদিক দিয়ে লাভ! দেনার দায়ে ফেলে জমি হাত বদল করাবে। নতুন পত্তনের সেলামিটা ওর পকেটেই আসবে। এমন সহজে টাকা আর আসে কিসে ?

—কিন্তু তাতে যে বছর বছর জমিদারের গোলায় ধান কম উঠছে ?

—হ্যাঁ! খুলনা সদর থেকে তিন ভাটি ঠেলে জমিদার আসছে এই আবাদের লোনা জল খেতে! তুমি বা আমি মরি, তাতে তার কি! খুলনায় বসে সন সন লাভের কিছু টাকা তার পকেটে উঠলেই হল।

আর্জান বুঝল, ব্যাপার গড়িয়েছে অনেক দূর। ভাল করে বুঝতেও তার বেশি দেরি হয় না। বৈশাখ মাসেই জানতে পেল, জমি আর তার নেই। এই জমি আর্জানের নিজের ছিল না। জমিদারের জমি। আর্জান বর্গা পেয়েছিল। আধি বর্গা। ফসলের অর্ধেক তার পাওয়ার কথা। পেত সে সিকি। তাও হাতছাড়া হল।

জমি হাতছাড়া হলে কি হবে, বন্দুক তার হাতছাড়া হয়নি। এবার জীবিকার সন্ধান পুরো ভাবে তারই সাহায্যে চলল। ফতিমা যাই বলুক, আর যা ইচ্ছা করুক, রোজ সে বনে যাবে। হরিণ পেলেই মারবে। আর তার মাংস বেদকাশীর হাটে, নারানপুরের হাটে, বড়দলের হাটে, হোগলার হাটে—যেদিন যে-হাট পাবে সে-হাটেই বিক্রি করবে।

চলল আর্জানের বন্য-জীবন। বনে বনে ঘোরে। রাত নেই, দিন নেই। কোন কোন দিন রাত্রেও বনে গাছের ডালে শুয়ে কাটিয়ে দেয়। বনে বসেই মাংস কাটে ; হাটে গিয়ে বিক্রি করে। তারপর বাড়িতে আসে বিশ্রামের জন্য।

এই বন্য জীবনে সে তিনটি বাঘ মেরেছে। কিন্তু বাঘ মারার কোন পুরস্কার সে পায়নি। বাঘ মেরেছে তারই বে-পাশী গাদা বন্দুকে জালের কাঠি পুরে। এই বাঘ নিয়ে সদরে গেলে তার বন্দুকই যাবে মারা। তাই সে-মুখো হয়নি। বাঘের চামড়া খুলে বিক্রি করে প্রতিবারে সে কিছু টাকা পেয়েছে বটে।

এমনি একদিনে কলিম আর্জানকে ডেকে বলল, —চল্, আর্জান, একদিন কাঠ কেটে আসি। কাঠের পাশ আমার কাছে আছে। চল্ যাই।

—এক ডিঙি কাঠ কেটে কি আর লাভ হবে ?

—না রে!এবার তবলা কাঠের পাশ আছে। চল যাই।

তবলা গাছের কাঠ দিয়েই দেশলাই তৈরি হয়। তাই দামও যথেষ্ট।

আর্জানের কিন্তু লোভ হয়েছিল জায়গাটার নাম শুনে। তিনজনে ডিঙি করে যাত্রা করল—কলিম, আর্জান ও বিশে চালি। শিব্‌সা নদী দিয়ে ওরা 'সেখের টেক' পৌঁছল। তিন গোয়া ভাটির পথ।

সেখানে পৌঁছে কলিম বলে— জানিস, এখানে বাঘের বড় আড্ডা। এখানে গভীর বনের মধ্যে একটা পুরনো মন্দির আছে। বাঘের মস্ত ঘাঁটি।

সুন্দরবনে ঐ আর-এক অদ্ভুত ঘটনা। কোথাও পাকা বাড়ি, কোথাও মন্দির, কোথাও কেল্লা, কোথাও বা পরিষ্কার মিষ্টি জলের পুকুর। এখন অবশ্য সবই জঙ্গলাকীর্ণ। ঐতিহাসিকরা বলেন, এসব তৈরি হয়েছিল রাজা প্রতাপাদিত্যের আমলে। প্রতাপাদিত্যের প্রতাপের নিদর্শন এই সব। ওলন্দাজ, ফিরিঙ্গি আর মগদের দমনের জন্য গভীর বনে তাঁর অনেক ঘাঁটিই করতে হয়েছিল।

আর্জান অবাক হয়ে বলল, —বাঘের আড্ডায় কাঠ কাটবে নাকি!

কলিম যেন আশ্বাস দেয় —না, না। এর থেকেও ভাল জায়গায় নিয়ে যাব। আমরা যাব আরও দক্ষিণে, মার্জাল নদীর বনে। সেখানে বন আর বালুর চর, দুটোই আছে! সেখানে কিন্তু এক রকম বাঘ আছে, তাকে 'কান'-ভাঙা বাঘ বলে। দেখতে কালশিটে। খুব বড়। —বলেই কলিম হাতের হাল ছেড়ে দিয়ে হাত দুটো কানের কাছে নিয়ে বেঁকিয়ে দোলাতে লাগে।

বিশে ঢালি ও আর্জান তো হেসেই খুন। হাল-ছাড়া ডিঙি নদীর মাঝে এক পাক খেলো।

কলিমের রসিকতা সর্বত্র। এখন এমন হয়েছে, কলিমকে দেখলেই সবাই ভাবে—কিছুটা হাসিঠাট্টা করতেই হবে। ওরা হাসি ও আমোদে ভাটার টানে চলেছে। কলিম এক সময় এক হিন্দুর বাড়ির বিয়েতে কি ভাবে চেখে দেখার নামে মুখের এঁটো করে দিয়ে চারখানা বড় দইয়ের ভাঁড় বাগিয়েছিল—তারই গল্প জমিয়েছে। সামনে মার্জাল নদী।

এমন সময়ে দূরে একখানা পিটেলের ডিঙি আসছে দেখা যায়। পেট্রোল বোটকে ওরা পিটেলের ডিঙি বলে। ফরেষ্ট আপিসের লোকেরা বন্দুক-ধারী সিপাই নিয়ে সারা বনে এই ধরনের ছোট বোটে পাহারা দিয়ে বেড়ায়।

ওদের দেখেই কলিম ডিঙি ঘুরিয়ে কূলে ভিড়িয়ে দিল। ফিস্‌ফিস করে বলল, —আর্জান! বন্দুকটা গামছায় ঢেকে নিয়ে নেমে পড়। শীগ্‌গির!

বে-পাশী বন্দুক ধরা পড়লে আজই ওদের ধরে নিয়ে সদরের গারদে চালান দেবে। আর্জান উঠে গেলে কলিম বলল, —খুব ভাগ্যি! আগে থাকতেই দেখতে পেয়েছি ওদের। তা না হলে আজ রাত্রে 'পাকা বাড়ি'তে বাস করতে হতো!!

পিটেল বোট এসেই ওদের সোজা চ্যালেঞ্জ করল। অমনি কলিম একটা বাঁশের চোঙা দেখিয়ে বলল, —আছে, আছে, আছে!

—আছে বললেই হল। দেখা কি আছে? ও লোকটা কোথায় গেল?

—বাবু, ওকে পাঠিয়েছি একটা তবলার ঝাড় এখানে আছে, তাই দেখতে। ঝাড়টা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

—বললেই হলো! আচ্ছা, দেখা তোর কি আছে!

পিটেলের পুলিশ ডিঙির খোলটা তখন দেখতে লাগল। কলিম বাঁশের চোঙা থেকে কাঠ কাটার পাশটা বের করে ওদের সামনে ধরে। পাশ দেখে পিটেল বোট ওদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

যাবার সময় কলিম ওদের শুনিয়ে শুনিয়েই বলল, —বে-পাশ বা বে-ফাঁস, যাই বলো, তেমন কোন কারধারই আমরা করি না!

সুন্দরবনের চাষীর এসব ঘটনার কৌশল জানাই আছে। আর্জানকে নদী বরাবর সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ডিঙিও এগিয়ে চলবে। পিটেল বোট একদম দূরে মিলিয়ে গেলে ডিঙি থেকে 'কু' দিয়ে সাড়া দিলে আর্জানকে নদীর কিনারায় এসে ডিঙিতে উঠতে হবে।

নিয়ম মত আর্জান এগিয়ে চলেছে। বন্দুকের মায়ায় সে বেশ খানিকটা বনের মধ্যে ঢুকে

তারপর নদী বরাবর চলেছে। বেশ কিছুদূর গেছে। ডিঙি থেকে কোনও 'কু' এখনও আসছে না কেন, তাই ভাবছিল।

এখন সময় দূরে 'ট্টিউ, ট্টিউ' হরিণের ডাক। আর্জানের লোভ হল। লোভ হলে কি হবে। পিটেলের বোট বন্দুকের 'চোট' শুনলে রক্ষা নেই। ভাবল, —নাঃ, ও কাজ করতে নেই। ভাবল বটে, কিন্তু যেদিকে হরিণ ডেকেছে সেই দিক দিয়েই তার যেতে হবে। তাই গাদা বন্দুকে ঘোড়া তুলে ক্যাপটা বসিয়েই নিল।

এগিয়ে চলেছে শিকার করবে না ঠিক করেও শিকারীর মত এগিয়ে চলেছে—অতি সন্তর্পণে।

এদিকে কলিম হরিণের ডাক শুনেই বলল, —ঢালি, এই্ খেয়েছে। দ্যাখ, আর্জান এবার কি করে বসে। ডিঙি ঢিমে চালা ঢালি।

পিটেল বোট তখনও মিলিয়ে যায়নি। উজান ঠেলে পাল খাটিয়ে যাচ্ছে। যেতে সময় লাগছে। পালটা এখনও দেখা যায়।

এক-পা, এক-পা করে আর্জান এগুচ্ছে। ওর কুঁজো হতে হয় না। এমনিতেই আর্জান বেটে, খুবই বেটে।

সামনে খানিকটা নিচু জায়গা। সেখানে ঘন গোলপাতার ঝাড়। নারকোল গাছের মোটেই গুঁড়ি না থাকলে, আর মাটি থেকেই পাতার ডগা গজালে যেমন দেখতে হতো—ঠিক তেমনি গোল গাছ দেখতে। ঘন ঝাড়ের মত গায়ে গা লাগিয়ে গাছগুলি হয়। খুবই ঘন। এপাশ ওপাশ কিছুই দেখা যায় না।

হরিণ থাকলে এরই ওপাশে আছে। আর্জান পাশ কাটিয়ে দেখতে দেখতে এগুচ্ছে। বন্দুকের ঘোড়া তোলাই আছে। গুলি করার মত করে বন্দুকও প্রায় কাঁধের কাছে ধরা। দেখতে পেলেই 'চোট্' করতে এক মুহূর্ত লাগবে না।

আর এক পা এগুলেই গোল ঝাড়ের ওপাশে সবটাই দেখা যাবে। পদক্ষেপ এবার আরও ধীর। শরীরের ওজনটা ডান পায়ে রেখেছে। গুলি করার মুহূর্তে খুঁটি নেবার মত করে। এবার বাঁ পা সামনে ফেলবে। চোখের পলক স্তব্ধ। বন্দুক কানের কাছে। টিপে আঙুল লাগানই আছে। বুকভরে একবার নিশ্বাস নিয়ে নিল,—যেন গুলি করার আগে আর নিশ্বাস নেবার দরকার না হয়।

সট্ করে বাঁ পা দিয়ে পদক্ষেপ দিল। কিন্তু একি। ভীতিবিহ্বল চঞ্চল হরিণ নয়। ধীর স্থির বিরাটকায় ব্যাঘ্র। মাত্র দশ হাত দূরে। বাঘও যেন এই দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আর্জানকে দেখা মাত্র দুই বাহুর উপর খাড়া হয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে। দুজনেই চোখো-চোখি। তার মৃত্যুর জন্য উদ্যত অস্ত্র কাঁধের উপর লাগানই আছে। আর্জান বন্দুকের নলকে এতটুকু নাড়ায়নি।

নলটি নাড়লে হয়ত শিকারী-ব্যাঘ্র বুঝতো—অবকাশ নেই, তার মৃত্যুবাণ এখনই নিক্ষিপ্ত হবে। কই তা তো নয়। কোন সাড়া নেই দুপক্ষে, শুধু দুজনে চোখে চোখে তাকিয়ে আছে। দুজনই হতভম্ব কিন্তু তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য।

দুজনেরই চোখ এবার ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠেছে। বাঘ গোঁ গোঁ করে উঠেছে, আর্জানও গম্ভীর আওয়াজ করে উঠেছে,—শালা। এগুবি তো শেষ করব।

আর্জান সব ভুলে গেছে দুনিয়ার। দৃষ্টি তার একমাত্র বাঘের চোখে। ভুলে গেছে ডিঙি, ভুলে গেছে কলিম, ভুলে গেছে বে-পাশী বন্দুক, ভুলে গেছে পিটেল।

—খবরদার। এগুবি তো শেষ করব।

বাঘের রাগ ক্রমশ চরমে উঠছে, গোঙানি এবার গর্জনে। আর্জানের গালাগালিও চরমে উঠেছে।

এ 'গুলি-খেকো' বাঘ কিনা আর্জান জানে না। তবে সে যেন বন্দুককে চিনেছে! বন্দুককে সামনে রেখে লাফ দিলে আঘাত পেতে হবে—এটা সে যেন ধরেই নিয়েছে। বাঘের লক্ষ্য, বন্দুকের নলকে পাশ কাটিয়ে আর্জানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

বাঘের রাগ ও আক্রোশ এবার আরও চরমে। মুখে লালা ঝরছে। গর্জনও এখনও হিংস্র। সর্বাঙ্গ দোলা দিয়ে এক একবার ঝুঁকি দিচ্ছে। একবার বন্দুকের বাঁ পাশ কাটিয়ে ঝুঁকি দিচ্ছে, পরের বার ডান পাশ কাটিয়ে ঝুঁকি দিচ্ছে।

আর্জান প্রথমে গুলি করবার জন্যই উদ্যত হয়েছিল। গুলি করলেই নিজে হয়ে পড়বে নিরস্ত্র। এই স্বাভাবিক ভীতিতেই তখন মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়েছিল। তারপরই যখন বাঘ বাঁ দিকে ঝুঁকি দেয়, আর্জান বন্দুকের নল সেদিকেই ঘুরিয়ে ধরে ; আবার ডান দিকে ঝুঁকি দিলে, ডান দিকেই বন্দুকের মুখটা করে দেয়।

বাঘ একবার দুবার ঝুঁকি দিয়ে থামে ; আবার শুরু করে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আর্জানের কাছে বন্দুকের মুখ ঘুরানই যেন শেষ অস্ত্র মনে হল।

বাঘ এক এক ঝুঁকিতে এক ফুট দুই ফুট করে এগিয়ে পড়ছে। ঝুঁকি দেবার সময় দুই-তিন ফুট এগিয়ে পড়ে, আবার এক-দুই ফুট পিছিয়ে বসে। আবার ঝুঁকি দিয়ে দুই-তিন ফুট এগোয় ; আবার এক-দুই ফুট পেছয়। এ এক বীভৎস পাঁয়তারা। গোঙানি ও গর্জনে বন কেঁপে উঠছে। এক-এক গর্জনে বাঘের অগ্নিসম রক্তাভ মুখ-গহ্বর থেকে লালা ছিট্‌কে পড়ছে ছয়-সাত হাত দূরে।

বাঘ এবার এত কাছে যে, বাঘের লালা ছিটকে এসে পড়ছে আর্জানের মুখে ও দেহে। তবুও আর্জান শেষ দেখা দেখে নেবার জন্য বাঘের সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের মুখ একবার এদিক, একবার ওদিক করছে।

মৃত্যুর মুখে আর্জানেরও শেষ পাঁয়তারা !!

বাঘের গর্জন কানে যেতে কলিমের ব্যাপার বুঝতে দেরি হয় না। ডিঙি কূলে ভিড়িয়ে বলল,—ঢালি! মরেছে, আর্জান তবলা ঝাড় পেয়ে গেছে !! চল্‌ শীগ্‌গির, ছুটে চল্‌।

—ভয় নেই, আর্জান! এসে গেছি!—চিৎকার করতে করতে ওরা ছুটে চলে। কলিমের হাতে কুড়ুল, আর ঢালির হাতে কাটারি।

শুলো আর কাদার মধ্যে ওরা হরিণের বেগে যেন ছুটে এল। দূর থেকে এই তাণ্ডব কাণ্ড দেখে কলিম চিৎকার করে উঠল—সাবাস্‌! সাবাস্‌! সাবাস্‌! এসে গেছি।

কলিম আগে এসে গেছে। ঢালি তার পেছনে পেছনে। কলিম এসেই সেই তার পুরনো গালি আরম্ভ করল, তর্জন গর্জন আরম্ভ করল। আর কুড়ুলখানা বন্দুকের মত করে উঁচিয়ে ধরল বাঘের দিকে। কলিম আর্জানের পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

একটু দূরে ঢালি আসছিল এগিয়ে। সে থতমত খেয়ে গিয়েছিল এই দৃশ্য দেখে। থেমে গিয়ে এদিকে আসবে কিনা তাই ভাবছিল।

এমনি সময়ে বাঘ তার চাহনি কলিম ও আর্জান থেকে সরিয়ে অকস্মাৎ ঢালির দিকে হানলো। বাঘের গতিক দেখে কলিম দুই কদম ডাইনে সরে ঢালির দিকে যাবার পথ আগলে বিকট ধমক দিয়ে ওঠে, —খবরদার শালা, আবার ওদিকে!

মুখ ফেরাবার উপায় নেই। বাঘের চোখে চোখে তাকিয়ে থাকতে হবে। আস্তে আস্তে কথা বলার উপায়ও নেই—বাঘের দিকে অনবরত গর্জন ও গালাগালি করে যেতে হবে।

তাই কলিম বাঘের দিকে তাকিয়েই গালি দেবার মত করে বলল, —ঢালি। আয় শালা, আমার পেছনে আয়।

এবার তিনজনে একত্রে। তিনজনেই একত্রে চিৎকার। তিনজনেই মারমুখো। আর্জান বন্দুক উঁচিয়ে, কলিম কুড়ুল বন্দুকের মত বাগিয়ে ধরেছে, আর ঢালি কাটারি নিয়ে এদিক-ওদিক কোপ মারছে।

বাঘ এতক্ষণে ঝুঁকি দেওয়া বন্ধ করল। কিছুক্ষণ পরে গর্জনও বন্ধ করল। কিন্তু গর্ গর্ গোঙানি থামে না। আরও কিছুক্ষণ পরে বাঘ ওদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এদিক-ওদিক কয়েকবার দেখে নেয়।

গোল ঝোপের পাশে কেঁচকি-কাঁটার ঝাড়। এই গাছ দেখতে ঠিক অবিকল বড় আনারস গাছের মত। বাঘ মুখ ফিরিয়ে গোঁ গোঁ করতে করতে এক-পা দুই-পা করে রাজকীয় চালে কেঁচকি বনের পাশে গেল। তার বলদৃপ্ত পদক্ষেপে কোন ভীতির লক্ষণ নেই, কোন পলাতকের চিহ্ন নেই। হাত পনেরো গিয়ে আবার ওদের দিকে মুখ করে দুই বাহুর উপর উঁচু হয়ে বসল। মুখে গোঙানি—প্রতিবাদ ধ্বনি।

কলিম বলল, —চল্ এবার। খবরদার, পেছন ফিরবি না। বন্দুক শালার দিকে ধরে রাখ্।

ওরা আর কেউ কথা বলে না।

কলিম সাবধান করে,—খবরদার, গালি থামাবি না। —বলেই সেও গালি দিতে লাগল।

এক-পা দু-পা করে পেছন দিকে পা ফেলে সবাই পেছুতে লাগল। মুখ ওদের সামনে, চোখ বাঘের চোখে। একই ভাবে নদীর কূল পর্যন্ত চলে এল। বাঘের দৃষ্টি এতক্ষণে হালকা হয়ে এসেছে। একবার এদিক-ওদিক তাকায়, আবার ওদের দিকে তাকায়।

নদীর চরে এবার নামবে। নামলেই ওরা বাঘের চোখের আড়ালে পড়ে যাবে। অর্ধেক আড়ালে পড়েছে, অমনি বাঘ গলা বাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিয়েছে।

তা দেখেই কলিম গালির মত করে বলল, —দাঁড়া। আয়। উঠে আয়। —বলেই কলিম ওদের নিয়ে আবার বাঘের দিকে পাঁচ-ছয় হাত এগিয়ে এল। চিৎকার তখনও সমানে চলেছে।

কিছুক্ষণ পর বাঘ যখন আবার বসল, তখন ওরা আগের মতই পিছনে পা ফেলে ফেলে চরে নেমে পড়ল। বাঘের চোখের সম্পূর্ণ আড়ালে এবার।

কলিম দ্রুত সতর্ক করে, —খবরদার। ছুটবি না। ছুট দিয়েছিস কি মরেছিস!! ছুট দিলেই শালা তেড়ে আসবে।

এবার ওরা বনের দিকে চোখ রেখে চিৎকার করতে করতে সামনা-সামনি এগুতে লাগল।

ডিঙিতে উঠেই এক ধাক্কা দিয়ে মাঝ-নদীতে ডিঙি ভাসিয়ে দিল।

কলিম এবার ধীর স্থির ভাবেই বলল, —আর্জান, ক্যাপটা এবার রেখে দে, ঘোড়াটা ফেলে দে।

আর্জান আফশোসের সুরে বলল, —গুলিটা করলেই হতো।

—গুলি!! সাবাস্ তোকে, তুই যে গুলি করিসনি। গুলি করলে তোর রক্ষা ছিল না। —কলিমের কথায় অভিজ্ঞ বাওয়ালির দৃঢ় ঝঙ্কার।

মার্জাল নদী। ধুধু করছে। এপার থেকে ওপার প্রায় দেখা যায় না। এত বড় নদীতে কোথাও কোনও জীবনের চিহ্ন নেই। কোনো দিকে কোনো নৌকাও দেখা যায় না। পিটেল

বোটের পালের রেখাও মিলিয়ে গেছে। সাদা ধবধবে নদী। যেন শ্বেত বস্ত্রের শাড়ি আঁচল পড়ে আছে এপার ওপার দুই সুবজ বনের সীমানার মাঝে। তারই উপর দিয়ে আবারও ভেসে চলে ওদের ডিঙি—মার্জাল বনের তবলা ঝাড়ের সন্ধানে।

বারো

সেবার ভাদ্রমাসটা আর্জানের মন্দ চলেনি। তবলা কাঠ বিক্রি করে বিশ টাকা পেয়েছিল। পেলে কি হবে, আর্জানের অসুখ হয়ে পড়ে। অসুখ হলে অবশ্য খরচ বেশি কিছু নেই। লোনা দেশে ডাক্তার নেই যে খরচ হবে। তবে অসুখে পড়েছিল বলে দৈনন্দিন টুকটাক কিছু আয় করতে পারেনি।

আয় বন্ধ হলেও ফতিমা কিন্তু এ সময় টাকার খোঁটা বিশেষ দেয়নি। সারাদিন আর্জান বাড়িতে, তাতেই যেন সে একটা স্বস্তি অনুভব করত।

অসুখের সময় আর্জান বে-পাশী বন্দুকটা কলিমের কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। অসুখে বেহুঁস হয়ে থাকলে কখন কি হয়, এই জন্য কলিমের হেফাজাতেই রেখে দিয়েছিল।

আর্জান ফতিমাকে বলল, —যাও না এবার, বাঁজানের কাছ থেকে বন্দুকটা নিয়ে এসো না!

—না, ওসব হবে না। এখন কি দরকার? কি হবে ওটা দিয়ে?

—হবে আর কি, কিছুতো আয়-ট়ায় করতে হবে!

—কেন, অঘ্রান মাসে আবাদে কাজের কি অভাব? যাও না...ধান কাটা আছে, ধান তোলা আছে, ধান বেচা আছে! আরও শুনতে চাও? মুকসুদ মেঞা তো 'জন' খুঁজতেই এসেছিল।

আর্জান চুপ করে গেল! এদিক ওদিক দুদিন ঘুরে কাজ কিছু জুটিয়ে নিল। দিন পনেরো পর একদিন আর্জান বাড়ি এসেই ফতিমাকে বলল, —এবার!

—এবার কি?

—এবার কি করে ঠেকাবে! নতুন নায়েব আমাকে তলব করেছে, শিকারে যেতে হবে। এবার কি করে ঠেকাবে?

—নায়েব তলব করলেই হবে! কি দেবে নায়েব শিকার করলে? জমি দেবে? দেবে এক বিশ ধান?

—নতুন নায়েবকে তাই কি বলা যায়! দাঁড়াও, সইয়ে সইয়ে সব করতে হয়!

—আচ্ছা বেশ যাও, কিন্তু ধান আমাকে দিতেই হবে। বলো নায়েবকে, দিতেই হবে।

আর্জান বনেও গিয়েছিল, নতুন নায়েবকে সঙ্গে করেও নিয়েছিল। গাছাল শিকারে একটা শিঙেল মেরে দিয়েছিল। পুরুষ হরিণকেই ওরা শিঙেল বলে। 'মায়া' হরিণের শিঙ হয় না। সবই হয়েছিল কিন্তু আর্জান একবারও জমি বা ধানের কথা কিছুই বলতে পারেনি।

ধান বা জমি কিছুই হলো না, কিন্তু এই সুযোগে আর্জানের আবার পুরনো জীবন শুরু হল। ফাল্গুন মাস কেটে গেছে। ইতিমধ্যে সে ফতিমার মত নিয়েই নতুন নায়েবের সঙ্গে, বা কখনও তার নাম করে মাঝে মাঝে বনে শিকারে যেতে লাগল। এদিকে মাঘ মাসের পর আবাদে কাজ পাওয়া দায়। আর্জানের বন ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই আবার আগের মত বনে যেতে হয়।

সেদিন বুধবার। হোগলার হাট। হাট বেলা বারোটায় বসবে। অগণিত লোক হাটে

এসেছে। কপোতাক্ষীর খালে ডিঙি ও নৌকা ধরে না। নিকটে এত বড় হাট আর নেই।

আর্জান ছোট একখানা ডিঙি করে হাটে এসেছে। একলাই এসেছে। হরিণের মাংস বিক্রি করবে। সোজা বন থেকেই এসেছে। আসবার সময় গভীর অরণ্যে এক বান গাছের খোড়লে বন্দুক ও ছররার থলেটা রেখে এসেছে।

মাংস খুব বিক্রি হচ্ছে। টাটকা মাংস নিয়ে এসেছে। হরিণের মাংস বাসি হলে খেতে ভাল হয় বলে প্রবাদ থাকলেও আবাদের লোকে কিন্তু টাট্‌কা মাংসই ভালবাসে। তাই আজ আর্জানের মাংস খুব বিক্রি হচ্ছে।

এমন সময় একদল পুলিশ এসে আর্জানকে ঘিরে ফেলল। পুলিশ এদেশে বেশি আসে না। পাইকগাছা থানা ত্রিশ মাইল দূরে। তবে আজ পুলিশ্ এদিকে এসেছিল অন্য একটি বিশেষ কাজে। আর্জানের কথা ওরা জানে। সুযোগ পেয়েই আর্জানকে ধরল।

আর্জান ভেবাচেকা খেয়ে গেছে। দারোগাবাবু তর্জন করে বললেন, —আর্জান, বল্ কোথায় পেলি এই মাংস ?

—বাদার হরিণ বাবু।

—বাদার হরিণ বুঝলাম। সে তোর বনকরবাবু বুঝবে। কিন্তু কি দিয়ে মারা হল ?

—বাবু, নতুন নায়েব এসেছে ; তার বন্দুক আছে। শিকারের বড় সখ তার। তাই তার সঙ্গে গিয়েছিলাম।

—বটে।

বাদানুবাদ এখানেই শেষ হয়। দারোগাবাবু বোটে করে এখানে এসেছিলেন। আর্জানের মনে কোনও সন্দেহ যাতে না জাগে তার জন্য দারোগাবাবু মিষ্টি কথা দিয়ে বাদানুবাদ শেষ করলেন।

আর্জানও প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরদিন ভোরে নতুন নায়েবের কাছারি ঘাটে পুলিশের বোট দেখতেই আর্জানের বুক দুর-দুর করে উঠল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফরেষ্ট আপিসের পিটেল বোটও এসে হাজির। দারোগাবাবু-ইতিমধ্যেই ফরেষ্ট আপিসে খবর দিয়ে সুব্যবস্থা করেছেন। কালিকাপুরে কয়রা নদীর ওপারেই বন। বনে পুলিশের এক্তিয়ার নেই ; নদী পার হলেই গ্রাম—সেখানে আবার ফরেষ্ট আপিসের পিটেলের এক্তিয়ার নেই। তাই আর্জানকে ধরতে হলে—পুলিশ ও ফরেষ্ট আপিসের পিটেল, দুজনকেই চাই।

আর্জান বিপদের কথা কলিমকে বলতে গেলেই, কলিম তাকে আর ছাড়েনি। অন্য কাউকে কিছু না বলে আর্জানকে একটা ডিঙি করে পুব পাশ দিয়ে কয়রা নদী পার করে বনে ছেড়ে দিল। যাবার সময় গামছা ভর্তি করে চিড়ে বেঁধে আর্জানের হাতে দিতে কলিম কিন্তু ভোলেনি। আর্জানের বে-পাশী বন্দুক আগের দিন বনের মধ্যে যেখানে গাছের খোড়লে রেখেছিল, সেখানেই রয়ে গেল।

১৯৩৭ সাল। গভর্ণমেণ্ট আবাদের থানায় থানায় আদেশ জারি করেছে, —সব বে-পাশী বন্দুক আটক করতে হবে। সেই আদেশের বলেই পুলিশ আর্জানের পিছু নিয়েছে। অনেক গ্রামেই বে-পাশী বন্দুক বহু ধরাও পড়েছে।

এ-যাত্রা নতুন নায়েব আর্জানকে বাঁচিয়ে দিলেন। তিনি জবানবন্দী দিলেন যে, তাঁরই বন্দুকে আর্জান হরিণ মেরেছে। তবু পুলিশের সন্দেহ যায় না। আর্জানকে যখন বাড়িতে পাওয়া গেল না, তখন পুলিশেরা চলে গেল বটে, কিন্তু পিটেলের বোট গ্রামের পাশেই একটা খালের মধ্যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পাহারা দিতে থাকে নদী বরাবর। ওদের

সন্দেহ, আর্জান এই নদী পার হয়েই গ্রামে ফিরবে। নদী পার হবার সময়েই হাতে-নাতে তাকে ধরতে হবে কারণ একবার নদী পার হয়ে গ্রামে পা দিলেই পিটেলের আর এক্তিয়ার নেই।

এদিকে আর্জান গভীর অরণ্যে মিলিয়ে গেল। এই বন যেন তারই বন। এ বনের নাড়ি-নক্ষত্র তার নখদর্পণে। প্রতিটি গাছ যেন তার চেনা। কত ভাবেই না এই বনের সঙ্গে তার পরিচয়। কখনও মাছ ধরতে, কখনও কাঠ কাটতে, কখনও বা গোলপাতা কাটতে, কখনও বা ময়াল সাপের অথবা 'তারকেলে'র চামড়ার লোভে এসেছে ; আর এসেছে—বারবার এসেছে, হরিণের লোভে।

তবুও তার এই বনকে আজ নতুন লাগে। এতদিন সে এসেছে জীবিকার টানে, শিকারের নেশায়। কিন্তু আজ সে নিজে শিকারের বস্তু। হরিণ যেমন করে শিকারীর হাত থেকে বাঁচতে চায়, গাছের আড়ালে, ঝোপের আড়ালে, তার ক্ষিপ্র পদক্ষেপে, —তেমনি করে পিটেলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আর্জানকেও খুঁজতে হবে আশ্রয়। বন আজ তার কাছে আশ্রয়স্থল।

বন বিবিকে স্মরণ করে সে আজ বনের আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। নিঃসঙ্গ, খালি হাত, —বন্দুকও তার নেই।

কোথাও হয়ত ঝোপ দেখে তার মনে হয়—এরই আড়ালে হরিণ নিশ্চয় শুয়ে আছে। না। তাদের আজ সে বিরক্ত করবে না। একটা ঝোপ দেখে তার মনে হয়—এও তো একটা বাঘের রোদ পোহাবার জায়গা। না। ওদিকে আজ সে যাবে না। বেশ কিছু দূর এগিয়ে দেখে, একটা ছোট বিলের মত জলা জায়গায় তিনটি-কুমির শুয়ে আছে। কাছে মানুষ দেখলে ওরা তেড়ে আক্রমণ করে। না। আজ ওদের এড়িয়ে যেতে হবে। আর্জান এগিয়ে চলে—আরও গভীর অরণ্যে এগিয়ে চলে। আর্জান বানরের দল দেখে দেখে এগিয়ে যায়। সুন্দরবনে বানরের দল এক নির্ভয়ের নিশানা। যেখানে বানর আছে, বুঝতে হবে সেখানে বাঘ অন্তত নেই। গাছের উপর থেকে বানররাই বাঘকে সহজে দূর থেকে দেখতে পায়। দেখতে পেলেই বানরের দল কিচির-মিচির শব্দ করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। বানরের এই ডাক বনের সকল জীবের কাছে এক বিপদের সঙ্কেত। তাই আর্জান বানর দেখে দেখেই ক্রমে এগিয়ে যায়। বানর সাধারণত থাকে খালের কূলে কূলে। তাই আর্জানও নদী ও খালের ধারে ধারে এগুতে থাকে।

মনে তার চিন্তার ঝাঁক আসে। দারোগার কথা মনে পড়ে ; মনে পড়ে পিটেলের কথা, ফতিমার কথা, কালিকাপুরের কথা। কিন্তু এ সবই বিদ্যুতের মত এক একবার ঝিলিক মেরে মনের মধ্যে আবার মিলিয়ে যায়। গভীর বনে খালি হাতে কি সে হঠাৎ দেখবে, তাই-ই তার ভাবনা। হরিণ ? হরিণ তো তাকে দেখেই পালাবে। সাপ ? সাপ তো নিজের জীবন-ভয়ে পালাতে ব্যস্ত। বুনো শুয়োর ? আর্জান জানে বুনো শুয়োর এলে কি করতে হবে। বাঘ ? এইখানেই অস্বস্তি অনুভব করে সে। বন্দুক হাতে বাঘের সঙ্গে অনেকবার লড়েছে। সে লড়াই সে জানে। কিন্তু সে আজ খালি হাতে। সে জানে, কলিম একাই কীভাবে খালি হাতে বাঘের মুখোমুখি হয়। কলিম তখন কি করে তাও সে দেখেছে। কিন্তু সে তো কলিম নয়। সে কি করবে ? কোনও কিনারা পায় না। চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। আসুক তো, তারপর যা হয় করা যাবে। তার বেশি আর সে ভাবতে চায় না। ভাববারও যেন সাহস নেই।

ঠিক করল, এদিক-ওদিক না ঘুরে সে তার নিজের বন্দুকটার খোঁজে যাবে। বন্দুক না

হলে এভাবে সে কত সময় কাটাবে ? ঠিক করলে কি হবে ! বন্দুক তো বাঁশপোতা খালের কাছে। সে তো অনেক দূর।

বেলা চারটে বেজে গেছে। বনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। ভাল ডালপালা আছে দেখে একটা গাছ ঠিক করল। তাতে উঠতে গিয়ে দেখে, বাঘের নখের আঁচড়ে গাছের ছাল ও কাঠ কেটে দাগ বসে গেছে এক ইঞ্চি গভীর হয়ে। দুটো থাবার দশটা নখের পরিষ্কার চিহ্ন। বাঘ বিড়ালের মত করে দুপায়ে দাঁড়িয়ে গুঁড়ির গায়ে আলস্য ছেড়েছে।

নখ-চিহ্নের দিকে তাকিয়ে আর্জান নিঃশব্দে বিড়ম্বনায় হাসি হেসে ভাবল, —এক গাছে নিশ্চয় বাঘ দুবার আসবে না। ঠিক যেমন করে সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে ভাবে, এক গোলার গর্তে দ্বিতীয় গোলা পড়বে না। কালবিলম্ব না করে সেই গাছেই আর্জান উঠে ভাল করে বসে গামছা থেকে কিছু চিঁড়ে খেয়ে নিল। কিন্তু পানি ! কোথায় পাবে সে তেষ্টার পানি। নদীনালা পানিতে ভর্তি। কিন্তু সবই নোনা পানি। এবার সে আল্লার নাম করে সে-আশাও ত্যাগ করল।

এদিকের পিটেল বোটের লোকেরা কতক্ষণ আর চুপচাপ থাকতে পারে। তাদেরও নাস্তা আছে, খাওয়া দাওয়া আছে। কলিম ইতিমধ্যে তাদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে নিয়েছে। পান, তামাক, ডিম, তরিতরকারি দিয়ে তাদের সঙ্গে যেন আত্মীয়তা জমিয়ে নিয়েছে।

পিটেলের বাবু বললেন, —তাতো হলো, কিন্তু আর্জান গেল কোথায় বলোতো ?

কলিম বলল, —কাল তো হাটে যাবার কথা ছিল। তারপর সেখান থেকে নাকি তার খালার বাড়িতে যাবার কথা। হয়ত সেখানেই আটকে গেছে।

—না কলিম ! দারোগা বলে গেলেন, আর্জান বাড়িতেই এসেছে। নিশ্চয়ই সে বনে গিয়েছিল।

—না বাবু, ও-কথাটি বলবেন না। আমরা বাউলে মানুষ—কত সময় তো এ-কাজে সে-কাজে বিনা পাশেই বনে যাই ; কিন্তু আর্জান ! একদিনও বিনা পাশে বনে যাবে না। পিটেলদের বড্ড ভয় তার।

—আর বাঘের ভয় !

—তা বাবু যা বলেছেন। ...আমরা বন-বাদাড়ে মানুষ, আমাদের বাঘের ভয় করলে কি চলে !

—কিন্তু বিনা পাশে বনে যাওয়া কেন ? জানো, সুন্দরবনে বিনা পাশে একটা পাতাতেও হাত দেওয়া নিষেধ। জানো না !

—জানি বাবু। কিন্তু আমাদের রান্না-বাড়ি তো আছে। শুকনো ডালপালাও তো দু-একখানা লাগে। তা ছাড়া ধরুন, এই তো সেদিন জয়নুদ্দির জামাইয়ের খোঁয়াড় থেকে একটা গরু বাঘে নিয়ে গেল। যেতে হলো বনের মধ্যে, বাঘকে এই মুল্লুক থেকে চালান দিতে। এমনি তো লেগেই আছে।

—তা বেশ ! তা বেশ ! রাত্রে বোটে এসো কিন্তু, গল্প শোনা যাবে।

কলিম সত্য মিথ্যা গল্প দিয়ে ওদের মাৎ করে রাখে।

আর্জান গাছের ডালে বসে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। গাছের তলায় কিছুই দেখা যায় না। এমন সময় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অনেক দূরে বাঘের গর্জন। একবার, দুবার, তিনবার। আর্জান জড়সড়। মাদারের কথা মনে পড়তেই সে আর কালবিলম্ব করে না।

গামছা দিয়ে নিজেকে ডালের সঙ্গে বেঁধে ফেলল।

কিন্তু ওর মনে সন্দেহ—বাঘের এমন ডাক তো আর কখনও শোনেনি। এ তো শিকারের গর্জন নয়। তবে কি?

আবার যখন বাঘ অমনি করেই একটানা ডেকে ওঠে, আর্জান বেশ বুঝতে পারে, বাঘ এগিয়ে আসছে। তবে কি তারই গন্ধ পেয়ে এগিয়ে আসছে।

এমন সময় অন্যদিকে দক্ষিণ-পুব কোণে আরেকটা বাঘের ডাক শোনা গেল। আর্জান সশঙ্কিত, সে বুঝি বাঘের রাজ্যে এসে পড়েছে।

এ বাঘ ডাকলে দূরের বাঘ সাড়া দিয়ে ওঠে। আবার তার উত্তরে এ বাঘও ডেকে ওঠে। কয়েকবার এমনি ডাকাডাকির পর পশ্চিমের বাঘটি গর্জন করতে করতে ছুটতে লাগল। ছুটবার সময় আর্জান যেন বাঘের নিঃশ্বাসেরও শব্দ শুনতে পায়। বেপরোয়া হয়ে ছুটছে।

বাঘের মত্ততা দেখে আর্জান বুঝে নেয়, দূরের বাঘটি নিশ্চয় বাঘিনী। বসন্তে বাঘও খেলাধূলা করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। তাই সে ছুটেছে বাঘিনীর সাড়া পেয়ে। আর্জান নিশ্চিন্ত হয়ে গামছার বাঁধন খুলে এ ডাল থেকে অন্য ডালে আরাম করে বসল।

পরদিন ভোর হতেই আর্জান তার বন্দুকের খোঁজে বেরিয়েছে। বনের মধ্যে সহজেই দিকহারা হয়ে পড়তে হয়। বিশেষ করে সুন্দরবনে প্রায় সর্বত্র একই রকম দৃশ্য, একই রকম গাছ-গাছড়া, একই রকম খাল ও নদী। আর্জান দিক-হারা হয়ে পড়েছে। অনেক ঘুরল, তবুও বন্দুকের কোনও হদিশ পায় না। শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে অবশেষে বড় নদীতে খালের মুখে ফিরে এল। এখান থেকেই সে আগের দিন হরিণ মারতে বনের চত্বরে প্রথম প্রবেশ করেছিল। তারপর নিজের পদচিহ্ন অনুসরণ করে অবশেষে বন্দুকের খোঁজ পেল।

আজও তার সম্বল চিঁড়ে। কিন্তু মিঠে জল। পানি না হলে তো তেষ্টা মেটে না। আর্জানের হাতে তার বন্দুক। বন্দুকে জালের কাঠিও পুরে নিয়েছে। সে যেন আর কিছুই পরোয়া করে না। ফিরবার পথে এক গোল-ঝাড়ের মধ্যে এগিয়ে গেল। কয়েকটা গোল ফল ভেঙে তার পানিতে গলা ভিজিয়ে নিল।

আজ সে বাড়ি ফিরবে। যেমন করে হোক সে ফিরবেই। কিন্তু বনের পথে সময় ঠিক রেখে বলা কঠিন। কখনও পড়বে জলা জায়গা, কখনও পড়বে খাল। হয়ত কাপড় খুলে সাঁতার দিয়ে পার হতে হবে। সব কিছু এড়িয়ে আর্জান অর্ধেক পথও আসতে পারে না। মনকে বোঝাল, আজও তার কপালে রাত্রে বৃক্ষ-বাস আছে।

গতদিনের মত আজও সে ঠিকঠাক করে গাছে উঠে বসে। কিন্তু বসতে না বসতে আর্জান চঞ্চল হয়ে উঠল। ভীতও হয়ে পড়ল। কি যেন বনবাদাড় ভেঙে আসছে। মড় মড় করে গাছের ডালপালা ভাঙার শব্দ। সমগ্র বন যেন দুলে উঠছে। চারিদিকে পাখির দলের ত্রাহি ত্রাহি ডাক। এদিকে-ওদিকে বনের জীবজন্তু ছুটে পালাচ্ছে। হরিণের পাল ছুটেছে তীরবেগে।

আর্জান কূল-কিনারা পায় না। সেও কি বনের হরিণের পালের সঙ্গে ছুটে পালাবে! কি করবে কিছুই স্থির করতে পারে না। ঠিক করে শক্ত হয়ে বসে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। কি ভীষণ জীব । সমগ্র বন তোলপাড় করে তুলেছে। আর্জানের মনে হল, বন্দুকের গুলিতে একে সে রুখতে পারবে না। বুক তার কেঁপে ওঠে। এক হাতে বন্দুক নিয়ে ডালের উপর দাঁড়িয়ে উঁচু হয়ে দেখবার চেষ্টা করে। কিছুই তার লক্ষ্যে আসে না। দ্রুত এগিয়ে আসছে। গাছ-আগাছা দলাই মালাই করে ভেঙে তোলপাড় করে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

দৈত্য! হ্যাঁ, কলিম বলেছিল বটে দৈত্যের কথা,—আর্জানের মনে হঠাৎ খেলে যায়।

দৈত্য। কলিমের আরেকটা কথাও মনে পড়ে—খবরদার। দৈত্যের সামনে কখনও মাটি ছাড়বি না। ভূমি স্পর্শ করে থাকবি।

সড়সড় করে আর্জান নেমে পড়ল নিচে। মাটিতে পা স্পর্শ করতেই সে যেন ভরসা পেল

এবার আর্জানের দেহ যেন কে দোলাতে লাগল। প্রাণপণে গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে রইল। দেখতে দেখতে গাছের মাথার ডাল ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বনের শুকনো পাতা যেন ছুটে এসে আর্জানের দেহে তীরের মত বিঁধছে। দম আটকে মাথা নিচু করে আর্জান গায়ের জোরে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকে। কে যেন ওকে ভীষণ জোরে মাটি থেকে উপরে তুলবার চেষ্টা করছে।

বেশিক্ষণ না। মাত্র পাঁচ মিনিট। এই সামান্য সময়ে ওকে যেন ক্লান্ত করে দিয়ে গেছে। দেহে যেন আর কোনও শক্তি নেই। আর্জান মাটিতেই বসে পড়ে। আল্লার নামে শপথ করল, মাটি ছেড়ে আজ সে কিছুতেই গাছে উঠবে না।

বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে গেল সুন্দরবনের এই অঞ্চল দিয়ে দৈত্যের মত। এই দৈত্য বা দানবকে আবাদের মানুষ যমের মত ভয় করে।

পরদিন, আজ সে বাড়ি ফিরবেই। ভোর না হতেই হাঁটতে শুরু করেছে। দুপুর নাগাদ বন থেকে কয়রা নদীর ফাঁকা আলো দেখতে পেল। নদীর কূল বরাবর ওড়া গাছের ঝাড়। তারই আড়ালে আর্জান প্রায় বাঘের মত করে গুটি মেরে এগিয়ে এল। যতদূর দৃষ্টি যায়, কালিকাপুরের ঘাটে কোথাও কিন্তু পিটেলের বোটের সন্ধান পেল না।

আর্জান এবার ভয়ে ভয়ে 'কু' দিল। কোন সাড়া নেই। আবার 'কু' দিল। কোনও সাড়া ওপার থেকে আসে না। একটু বাদে কয়েকবার পর পর 'কু' দিল। এবারও কোন সাড়া নেই। আর্জান ভয় খেয়ে যায়। মনে সন্দেহ জাগে, তবে কি পিটেল বোট আমাকে না পেয়ে কলিমকেই ধরে নিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ নজর করে থাকবার পর আর্জান দেখে, ফতিমাই ডিঙি খুলে এপারে আসছে। আর্জান নিঃসন্দেহ হল, কলিম নিশ্চয় ধরা পড়েছে।

ফতিমা এপারে আসতেই আর্জান মুখ বাড়িয়ে দেখা দিল।

—তুমি যে? —আর্জান ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করে।

—তবে কে আসবে? পাড়ায় এখন মিনষে বলতে কেউ আছে নাকি!

—কেন, বা'জান কোথায় গেল?

—যাবে আর কোথায়! তোমার জন্য কান পেতে পেতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল। চলো, এবার একবার ওপার চলো!

—কেন কি হয়েছে?

—হবে আর কি! চলো, এবার বোঝাপড়া আছে!

তেরো

সত্যি এবার ফতিমা বোঝাপড়া করতে চায়। উঠানে আসতেই ফতিমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, —ঘরে চাল বলতে ধান-কুড়াও নেই, উনি বন-বাঘ-হরিণ-বন্দুক করে বেড়াচ্ছেন! পারব না এ সংসার চালাতে। কেন, মনে ছিল না বিয়ে করার সময়? হয়ে যাক আজ বোঝাপড়া।

আর্জান এই ব্যবহারের জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না। বনে আসবার পথে কত ভেবেছে,

এবার গিয়ে বাঘ বাঘিনীর কথা, দৈত্য দানবের কথা, —কত বলবে। সব কোথায় উবে গেল। ফতিমার কথায় তার নিদ্রাহীন, অভুক্ত, শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে যেন আগুন জ্বলে উঠল। কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

ফতিমা অনর্গল বলে চলেছে। আর্জান একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলল, —যা পার করো!

কলিম শুধু বাঘের ওঝা নয়। সে কলেরা-বসন্তেরও ওঝা। দুই বাঁকের মাথায় চন্দ্রঘোনা গাঁয়ে কলেরা হয়েছে, তাই সকালে জল-পড়া দিতে গিয়েছিল। আসবার পথে ভেড়ি থেকে হুঁকোর শব্দ পেয়ে কলিম তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে।

ভিতর-বাড়ির উঠানে এসে চিৎকার করে ওঠে, —এসেছিস্ আর্জান? পাশে ফতিমার উগ্রমূর্তি দেখে বলল, —তুই কি রে। কোথায় একটু আদর-যত্ন করবি, তা না খেঁকিয়ে উঠেছিস্, থাম তুই।

ফতিমার তখনকার মত থামা ছাড়া আর উপায় ছিল না। একখানা কুলো হাতে ছিল। ছুঁড়ে ফেলে দিল তা দাওয়ার উপর। মুখ ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে 'যেমন গুরু তার তেমন শিষ্য' বলেই হন্‌হন্ করে চলে গেল গোয়াল ঘরের দিকে।

—শুনেছিস্? —বলেই কলিম একটা ধাক্কা দিয়ে আর্জানের কাঁধটা তার দিকে ঘুরিয়ে দিল।

আর্জান ত্রস্ত হয়ে উত্তর না দিয়েই প্রশ্ন করল, —পিটেল, পুলিশের কি হল?

—পুলিশ। পুলিশ তো সেইদিনই কেটে পড়েছে। আর পিটেল!…পিটেলের বাবুকে মাৎ করতে কতক্ষণ লাগে। তার পরদিনই ওরা চলে গেছে। কিন্তু একটা কথা, কাল বেদকাশীর হাট আছে। আমার সঙ্গে তোকে একবার যেতে হবে। পিটেল বাবু বলেছে, —তোর সঙ্গে একবার দেখা না হলে 'রিপোর্ট' ঠিকমত নাকি দেওয়া যাবে না। ভয় নেই তোর, কিচ্ছু ভয় নেই।

—যদি ধরে চালান দেয়।

—দূর পাগল। কেন, অসুখ-বিসুখ হলে আমার কাছেই তো আসতে হবে। কোথায় পাবে নোনা দেশে ডাক্তার? বাবু ভাল লোক, কথার খেলাপ করবে না। কিন্তু তোর বন্দুকটা সাবধান। আজকাল আমার বাড়িতেই রাখবি। রাত্রেই দিয়ে আসবি। বলা যায় না, নায়েবের লোক তো আছে এ পাড়ায়।

কালিকাপুরে আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসে। কলিম আর্জানকে বনকর আপিসে নিয়ে গিয়েছিল। ওদের দুজনকে হাত করার জন্য পিটেলবাবু খুব করে পিঠ থাবড়ে আদর করেছিলেন। বাঘের উপদ্রব তো আছেই, —তাই একসঙ্গে বাওয়ালী ও শিকারীকে হাত করা কম কথা নয়।

আর্জানেরও আগের জীবন শুরু হয়ে গেছে। কতদিন আর বনে না গিয়ে তার সংসার চলবে। বাচ্চা বা বুড়ো হরিণ যা পায় তাই মেরে নিয়ে আসে। মাঝে একবার 'তারকেল' মারবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। গো-সাপ সুন্দরবনে যথেষ্ট পাওয়া যায়, গো-সাপকে এদেশে 'তারকেল' বলে। এই সময় এক একটা তারকেলের চামড়ার দর হয়েছিল পাঁচ-ছয় টাকা।

বৈশাখ মাস। নতুন নায়েব চৈত-কিস্তি আদায় করে দেশে ফিরবেন। যাবার সময় হরিণের মাংস সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। কাজেই আর্জানের ডাক পড়ল।

সেদিন দুপুরেই আর্জান যেতে চেয়েছিল বনে। কিন্তু বিশে ঢালি মাঝে পড়ে ঠিক করল, কাল সকালে যাওয়াই ভাল হবে।

বিশে বলল, —কি হবে আজ গিয়ে ? এক বেলাতে বসে শিকার না পেলে খালি হাতে ফিরতে হবে। তার চেয়ে কাল সকাল ও বিকেল দুবেলা চেষ্টা করে একটা না একটা পাওয়া যাবেই।

—ঠিক বলেছ ঢালি। —নায়েব মাংসের লোভে বলে উঠলেন। ঢালির মতলব বুঝে আর্জান তাতেই সায় দিল।

কাছারি বাড়ি থেকে আসবার পথে ঢালি মনের কথা খুলেই বলল, —বুঝলে-না শিকারী ! এক কাজে দু কাজ হবে। সকালে যাব, মধু কাটব, আর বিকেলে হরিণ নিয়ে আসব।

ঢালির মধুর লোভ খুব। তবে কখনও বন্দুক ছাড়া বনে যেতে চায় না। নায়েবের বন্দুক নিয়ে সকালে তিনজনে বনে উঠেছে। আর্জান, ঢালি আর সানাই মোড়ল। সানাই মোড়ল ওদের নতুন সঙ্গী। সানাই নায়েবের নবাগত পেয়াদা। বলিষ্ঠ চেহারা ; যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। বুকখানি পাটার মত, কালো রং, যেন সব সময় তেলে চক্‌চক্ করছে। লাঠিয়ালের বংশ। লাঠি খেলাও ভাল জানে। নায়েব সব দেখে শুনে ওকে পেয়াদা বানিয়েছেন। পেয়াদার একবার বনে যাবার বড় ইচ্ছা।

মধু কাটবার সাজ সরঞ্জাম সবই আছে। সানাই-এর হাতে বেতের ধামা। সানাই নতুন লোক, তাই তাকে মাঝখানে দিয়েছে। ঢালি আগে আগে, আর আর্জান পেছনে।

যাত্রা করার সময় আর্জান সানাইকে বলল, —মোড়ল, ভয়ডর করো না কিন্তু। আমরা আছি, তোমার কোনও ভয় নেই।

—ভয় ! ভয় কেন করব ? আমরা হলাম জাতে নমঃশূদ্র। ভয়ডর বলতে আমাদের কিছু নেই। তবে বনের খবর তোমরাই বেশি জানো। যা বলবে তাই করবো।

সানাই-এর নরম সুর শুনেই বিশে ঢালি বলে উঠল, —হ্যাঁ, এবার সে কথা মনে থাকে যেন ; বনে তুমি 'পেরজা' আমি পেয়াদা।

আর্জান কথা না বাড়িয়ে বলল, —নে এবার চল্‌।

বনে উঠলে সবারই কথা বন্ধ হয়ে যায়। এমন গম্ভীর আবহাওয়া সেখানে, আপনা থেকেই মনে হয়—এখানে কথা বললেই বিপদ।

ওরা তিনজনে নিঃশব্দে চলেছে। যে-বনে উঠেছে সেটা লোকালয়ের খুব কাছে। হরিণ বা বাঘ এ বনে বিশেষ দেখা যায় না। বিশে ঢালি তাই নিশ্চিন্ত মনে মধুর চাক দেখে দেখে এগিয়ে চলেছে। বেশ এগিয়েও গেছে।

সানাই নতুন লোক। শূলো দেখে দেখে পা ফেলে চলতে গিয়ে বেশ পিছিয়ে পড়েছে।

এদিকে আর্জান যেন গা ছেড়ে দিয়েছে ; মধুর জন্য অত ব্যগ্রতাও নেই, আর বাঘ বা হরিণের জন্য অত সতর্কতাও নেই। তাই সে-ও সানাই থেকে বেশ পিছনে পড়ে গেছে।

যে-পথ দিয়ে ঢালি চলেছে, ঠিক সেই পথ দিয়ে সানাইও চলেছে। আর্জানও সেই বরাবর এগুবে। ওরা তিনজনেই এক লাইনে।

অকস্মাৎ আর্জানের চোখে কি যেন নড়বার ছায়া পড়ল। তারই ডান দিকে। বেশ কিছুটা দূরে।

শিকারীর চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে খুঁজতে লাগে। সাপ ! এতদূর থেকে সাপকে দেখা যাবে ? হতেও পারে ! হলেও কিছু করার নেই। একটুকু সাবধান হতে হবে, এইমাত্র।

তারকেল। তাও তো হতে পারে। হলেই বা কি ? ঢালি ও মোড়ল দুজনেই এগিয়ে গেছে। তাদের ডেকে তারকেলকে ঘিরতে ঘিরতে কোথায় পালিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। ঢালি ও মোড়লকে কি সাবধান করবে ? না, মিছেমিছি সাবধান করতে গেলে ওরা ভীত হয়ে পড়বে। তবে কি আমার চোখের ভ্রম ? বাতাসে কি ডালের ছায়া নড়ে উঠল ? না, তা তো নয়, বাতাস তো নেই। হরিণ। না, তা হতেই পারে না। ছায়াটা মাটির সঙ্গে মিশে যেন নড়ছিল। চঞ্চল হরিণ এমন স্থির কখনও হয় না। তবে ?

শিকারী দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোখ দুটি তার বড় হয়ে উঠেছে। ঘ্রাণে অনুভব করার জন্য নাকের ডগা ফুলিয়ে ফুলিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে। বেশি সময় নয়। পরমুহূর্তে সেই ছায়া আবার যখন নড়ে উঠল, তখন মাটির সঙ্গে মেশান কাল রেখাকে চিনতে আর্জানের দেরি হয় না।

অতোবড় বাঘ কীভাবে শুয়ে আছে। কেমন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। পিছনের পা দুটো যেন লম্বা করে টান টান করে দিয়েছে। লেজটাকে সেই দুই পায়ের মাঝখানে লম্বা করে ফেলে নিয়েছে। মুঠো-হাত উঁচু শূলোর মাঝে শরীরটাকে বসিয়ে দিয়ে মাটির সঙ্গে লেপটে আছে। দূর থেকে কালো-হলুদ ডোরা কিছুই দেখা যায় না। শুধু পিঠের কালো রঙটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। মুখখানা তার সানাই-এর দিকে। এতটুকু শব্দ নেই, এতটুকু সাড়া নেই।

দেখামাত্র আর্জান সামনের গাছটার আড়ালে লুকিয়ে নিঃশব্দে বসে পড়ল। হাঁটু ভেঙে গুলি করবার মত বসে গুঁড়ির আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে থাকে।

বাঘ এমনভাবে শুয়ে আছে, মাথায় গুলি করবার উপায় নেই। ঝুপ করে গুটি মেরে একটু এগিয়ে আবার সে আগের মত মাটির সাথে মিশে গেল। দু-একবার উঁকিঝুঁকি মারে, আবার এগিয়ে যায় সট্ করে।

এবার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করবার সুযোগ থাকলেও গুলি করার উপায় নেই। আর্জান, বাঘ আর সানাই এক লাইনে। একটু এপাশ ওপাশ হলেই সানাই-এর গায়ে গুলি লাগবে।

আর্জানের মনে অস্বস্তি। ছট্‌ফট্ করতে থাকে। হাতে বন্দুক। ঘোড়া তোলাই আছে। সামনে শিকারের বস্তু। হিংস্র শিকার বন্দুকের পাল্লার মধ্যেই। অতি সন্নিকটে। সে নিজে শিকারের অলক্ষ্যে। শিকারের মন ও দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ। তবুও গুলি করার উপায় নেই। সামনেই সানাই মোড়ল।

সানাই কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে চলেছে। শূলো দেখে পা ফেলে ফেলে। বাঘ উঁকিঝুঁকি মারে গাছের আড়াল থেকে। সানাই একটু থামলে সে মাথা নিচু করে 'ঘাপটি' মারে। আবার উঁকি মেরে দেখে গুটিগুটি এগোয়। পরক্ষণে আড়াল নিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

আর্জানও লুকোচুরি খেলে এগোয় বাঘের দিকে গাছের আড়ালে আড়ালে।

বাঘ জানে না, তার পেছনে কি ঘটছে। সেও লুকোচুরি খেলে এগোয় সানাই-এর দিকে। গুঁড়ির আড়ালে মাটির সাথে মিশে মিশে।

সানাই নিশ্চিন্ত। সেও জানে না, তার পেছনে সাক্ষাৎ মৃত্যু কীভাবে এগিয়ে আসছে।

সবার আগে চলেছে বিশে ঢালি। সেও জানে না, তার পেছনে তিনজনে মিলে কি পাঁয়তারা চালিয়েছে।

বাঘ এবার চার পা আস্তে আস্তে এক জায়গায় করেছে। আর্জান শঙ্কিত হয়ে ওঠে, আর দেরি নেই। ইচ্ছা হল, সে চিৎকার করে বলে ওঠে—'সাবধান। তফাৎ যা।' কিন্তু চিৎকার করলে একমাত্র লাভ হবে, মোড়ল আরও ভেবাচেকা খেয়ে যাবে। বাঘের আক্রমণ ঠেকানো যাবে না। নিশ্বাস রুদ্ধ করে আর্জান মুখ বন্ধ করে রইল। বন্দুকের নিরিখ সে আরও সূক্ষ্মভাবে করবার চেষ্টা করে। বন্দুকের মাছি যাতে একটুকু কেঁপে না ওঠে।

বাঘ লেজ দিয়ে মাটিতে আঘাত করেছে। একবার, দুইবার··· । আর্জান আর মুহূর্ত দেরি করে না। বেপরোয়া চিৎকার করে উঠল, —সাবধান! সাবধান!

সানাই মোড়ল পেছনে মুখ ফিরিয়েছে! কিন্তু ঐখানেই শেষ! বাঘের বিকট হুঙ্কারে আর্জানের চিৎকার মিলিয়ে গেল। বলদর্পে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মোড়লের হাতে ছিল ধামা। বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের দায়ে মাথার উপর ধামাটা তুলে ধরে।

বাঘের লক্ষ্য ছিল মোড়লের ঘাড়। তার সামনের থাবা দুটি পড়ল ধামার উপর। থাবার চাপে মোড়ল বসে পড়েছিল প্রায়। শক্তিশালী হাঁটুর জোরে মোড়ল পরমুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বাঘ দুপায়ে দাঁড়িয়ে। দুই থাবা তার ধামার উপর। মোড়ল সবলে দুই হাত দিয়ে ধামা উঁচু করে 'পেলা'র মত দাঁড়িয়ে গেছে।

বিশে ঢালি ভাবতেই পারেনি এই বনে বাঘ আসবে। গর্জন শোনামাত্র কোথায় কি তার দেখবার চেষ্টা না করে প্রথমেই উঠেছে একটা গাছে। নিচের ডালে উঠে তাকিয়ে দেখে, বাঘ ও মোড়লের কাণ্ড। তাড়াতাড়ি উপরের ডালে উঠে চিৎকার করতে থাকে, 'আর্জান। আর্জান!' আর গাছের ডালপালা ঝাঁকি দিয়ে বাঘকে তাড়াবার চেষ্টা করতে থাকে। আর্জানের সাড়া না পেয়ে ঢালি আরও হতভম্ব হয়ে পড়ল।

আর্জানের সামনেই বাঘ। বাঘের পিঠ তার দিকে। আর মোড়ল ঠিক বাঘের আড়ালে। ধামা থেকে থাবা নামিয়ে বাঘ আবার যে আক্রমণ করবে—সে-চেষ্টা তার নেই। দুই থাবা ধামার উপর রেখেই গোঁ গোঁ করতে লাগল। বিস্ফারিত হাঁ করে গজ্ গজ্ করছে, আর একবার বাঁ পাশ দিয়ে, একবার ডান পাশ দিয়ে গলা বাড়িয়ে মোড়লের মাথা কামড়ে ধরবার চেষ্টা করছে। মোড়ল ডান দিকে মাথা নিলে সেদিকে গাঁ গাঁ করে হেঁকে শানিত দাঁত দিয়ে কামড়াতে চায়; আবার বাঁ দিকে মাথা নিলে সেদিকে আবার চেষ্টা করে।

বীভৎস হিংস্র মুখব্যাদান। জিহ্বা থেকে গল্‌গল্ করে লালা ঝরে পড়ছে, ছিটকে পড়ছে। এই লড়াই চলল বেশ কিছুক্ষণ। ধামা বেয়ে লালা যেন জল-ধারার মত মোড়লকে ভিজিয়ে দিল। চোখে মুখে সর্বত্র লালা ছিটকে পড়ছে এক একটি হিংস্র হাঁকে।

আর্জান বন্দুক ধরেই আছে। কিন্তু কোথায় গুলি করবে? গুলি যেখানেই করুক, সে গুলিতে মোড়লও জখম হবেই হবে। ছুটে পাশে গিয়ে গুলি করবে? বাঘ দেখতে পেলে ছুটবার অবকাশ দেবে না তাকে।

শিকার এখন তার থাবার মধ্যে। সে যেন রক্তপানের আগে তার সঙ্গে একটু খেলা করছে। হিংসা ও লালসা উগ্র করবার জন্য হিংস্র জন্তুমাত্রই শিকারের সঙ্গে খেলা করে থাকে। শিকার মরে গেলেও থাবা দিয়ে মরা শিকারকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে খেলা করে। এ যেন লব্ধ শিকার নিয়ে লালসা জাগাবার খেলা!

মোড়লের মুখে কোন চিৎকার নেই, আর্তনাদ নেই। তার খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবারই একমাত্র চেষ্টা। একবার যেন মোড়ল টাল সামলাতে পারে না। শূলোতে হোঁচট খেয়ে বাঁদিকে হেলে পড়েছিল আর কি! কিন্তু সামলে উঠল। হাঁটুতে যেন আর জোর নেই। তবু টান্ টান্ হয়ে রইল।

মোড়ল এই সময় বাঁদিকে এক ঝুলে দু-কদম সরে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘও পেছনের পা দিয়ে তার বাঁদিকে দু-কদম সরে দাঁড়াল।

এই অবকাশ। আর্জানের দিক থেকে মোড়ল ও বাঘ প্রায় পাশাপাশি হয়েছে। মোড়লই

বা আর কতক্ষণ যুঝবে ! আর্জান কালবিলম্ব করে না। সে ঠিক নিরিখ করে বাঘকে খতম করতে পারে, কিন্তু দৈবক্রমে মোড়লও যদি আহত হয় ! তা হোক ! মোড়ল তো আর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না। তার হাঁটুতে যেন আর জোর নেই।

আর্জান ঘোড়া টিপে দিল। দক্ষ শিকারীর লক্ষ্যভেদী তপ্ত সোহা। কিন্তু তাই কি ?

বাঘ দড়াম করে সেখানেই পড়ে গেল। সানাই মোড়লও সঙ্গে সঙ্গে কাৎ হয়ে পড়ে গেল।

আর্জান আঁৎকে চিৎকার করে উঠল,—সর্বনাশ !!

একটু দম নিয়ে বন্দুকে দ্বিতীয় গুলি পুরল। ঘোড়াটাও উঁচু করে দিল। তারপর এক-পা দু-পা করে এগুতে থাকে বন্দুক উঁচিয়ে।

বাঘ পড়ে আছে। তার দুই থাবার নখে ধামাটাও আটকে আছে। পাশেই মোড়ল এলিয়ে পড়েছে।

বিশ্বাস নেই ওকে ! আর্জান নিকট থেকে বাঘের বক্ষ লক্ষ্য করে আবার চোট্ করল। বুলেটের আঘাতে বাঘের দেহ সামান্য একটু কেঁপে উঠল মাত্র।

আর্জান ছুটে গিয়ে মোড়লকে ধরে। ধরবার উপায় নেই। সারা গায়ে লালা মেখে আছে। বুকের কাছে হাত দিয়ে দেখল, বুক ধুক ধুক করছে। বেঁচে আছে সে ! একবার কাৎ করে, একবার চিৎ করে দেখল, কোথাও কোনও রক্তের চিহ্ন নেই। গুলি তার গায়ে লাগেনি।

গালি দিয়ে ঢালিকে চিৎকার করে ডাকে—গাছে উঠে বসেছিস, শালা ! নেমে আয় শীগ্‌গির !

ডিঙিতে নিয়ে এসে প্রথমে মোড়লের মাথায় দুজন মিলে জল দিতে থাকে। নোনা জলও খানিকটা খাইয়ে দেয়। ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে এল।

কাছারি বাড়ি পৌঁছে আর্জান নায়েবকে বারবার বলে, মোড়লকে ভাল করে জল দিয়ে ধুইয়ে মানুষের বিষ্ঠা মাখিয়ে দিতে। বাঘের বিষ থেকে বাঁচবার এই একটা ওষুধই আবাদের মানুষ জানে।

নায়েব তাতে রাজি হননি ; মোড়লও ঘেন্নায় বিষ্ঠা মাখতে চায়নি।

পরে বাঘকে সবাই ধরা-ধরি করে কাছারি বাড়ির ঘাটে নিয়ে এল। হরিণ না পেলেও নায়েব কিন্তু বাঘ পেয়ে মহাখুশি। সদরে নিয়ে যাবার তোড়জোড় শুরু করলেন। আর্জানকেও যেতে বললেন। কিন্তু আর্জান উত্তরে বলে, —না, বাবু ! সদরে যেতে চাই না। সদরের খবর আমার জানা আছে। একবার গিয়েও দেখেছি শহরের মানুষের মতলবই আলাদা !

নায়েবও আর পীড়াপীড়ি করেন না। তার মতলব তার মনেই রইল। কিন্তু তিনি না করলে কি হবে, আশেপাশের গ্রামের যারাই ছিল সবাই আর্জানকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তারা বলল—যাও-না আর্জান, গেলে লাভ আছে। বাবুও তো বলছেন যেতে।

বেগতিক দেখে নায়েব মনে মনে লাভ-ক্ষতির হিসাব করে বললেন, —থাক্, ও না যেতে চায় তো থাক্। আমিই ওকে বক্‌শিস্ দিয়ে দিচ্ছি। এই নে পঞ্চাশ টাকা। —বলেই আর্জানের হাতে নোটগুলি গুঁজে দিলেন।

নায়েবকে সবাই ধন্য ধন্য করল। কিন্তু যে দু-একজন খবর রাখে তারা পাশে সরে গিয়ে বলল,—আরে, পঞ্চাশ টাকায় যদি দু-শ টাকা আসে মন্দ কি।

আর্জান টাকা পেয়ে প্রথমটা খুশিই হয়েছিল। কিন্তু একটু পরে তার অস্বস্তি লাগতে থাকে। মুখে কিছু বলল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক।

নায়েব তোড়জোড় করে বাঘ নিয়ে একখানা বড় নৌকায় উঠলেন। নৌকা ছাড়ার মুখে আর্জান একবার নৌকায় উঠল। নৌকায় উঠে নায়েবকে বলল, —বাবু, একই নৌকায় উঠলেন। বাঘের গন্ধে তো শুতে পারবেন না।

কথা উঠতেই সবাই মতামত দিতে লাগল। কেউ বলল বাঘকে পিছনে রাখতে, কেউ বলল সামনে রাখতে।

কথাবার্তা ও বাঘ নিয়ে সবাই ব্যস্ত। সেই ফাঁকে আর্জান একবার সানাই মোড়লের কাছে গেল। সানাই তখন একটু সুস্থ আছে। ছই-এর আড়ালে হুঁকো টানছে। আর্জান তার গাঁট থেকে পঁচিশ টাকা নিয়ে সবার আড়ালে মোড়লের হাতে গুঁজে দিল। দিয়েই কলকি কেড়ে নিয়ে তাতে একটান দিয়েই নৌকা থেকে ডাঙ্গায় লাফিয়ে পড়ল।

এক ধাক্কায় নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে আর্জান বলল, —বাবু, পেয়াদাকে একবার ডাক্তার-কবরেজ দেখাবেন কিন্তু।

নায়েব নৌকা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, —হ্যাঁ, দেখাব, দেখাব। আর্জান, তুমি কিন্তু ভিটের কথাটা ভেবে দেখো, ওরা বড্ড মুশকিলে পড়েছে।

এর পরের ইতিহাস কালিকাপুরের লোকেরা এইটুকুই জানে যে, সানাই সোজা তার নিজের বাড়িতে গিয়েছিল। নায়েব কোনও ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থাই করেননি। দুদিন পরে জ্বর আসে।জ্বরে প্রলাপ বকতে থাকে। অবশেষে সানাই বাঘের লালার বিষে সর্বাঙ্গ ফুলে পচে মারা যায়।

চোদ্দ

আর্জান কাছারি ঘাট থেকে একা একাই বাড়িতে ফিরছিল। সারা পথটা সে ভেবেছে, ভিটের কথা। নায়েব কি তাকে শেষ পর্যন্ত ভিটে ছাড়া করবে। সে ভাবতেই পারে না। এই ভিটেতেই তার বাজানের হেঁতাল গাছটা আছে। তার পাশেই রয়েছে আম্মার কবর। এ ভিটে যে তার। এই ভিটেতেই সে মানুষ হয়েছে। তবু নায়েব এই সর্বনেশে কথা বলে কেন? গাঁয়ের লোকেরা কি চায় সে কালিকাপুর ছেড়ে চলে যাবে? না, না, কেউ তা চায় না। আচ্ছা, যদি না চায় তবে ওরা নায়েবের সামনে কিছুই বলে না কেন?

আর্জানের চিন্তা গুলিয়ে যায়। মনে পড়ে যায় আজকের শিকারের কথা। ওর সাহস যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। বাঘের চাতুরি ও শিকার-কৌশল সে স্বচক্ষে দেখেছে। —দেখেছে কেমন করে এই হিংস্রজন্তু শিকার করে। এর আগে অনেকগুলি বাঘ সে মেরেছে। কিন্তু তা সবই সামনা-সামনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সেই হিংস্রমূর্তির সামনে বুক কাঁপলেও সে পেছয়নি। তার সঙ্গে যুঝেছে, লড়াইতে কখনও হার মানেনি। মনে পড়ে কলিমের দুর্জয় সাহসের কথা। কিন্তু আজ যে বাঘের চাতুরিও জানে। কেমন করে সে মোড়লের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বিশে ঢালি। প্রাণের মায়ায় কোথায় উঠেছিল। ভিটের মায়া। ভিটের মায়ায় সে কি করবে? কেনই বা সে ভিটে ছাড়বে?

আবার সব গুলিয়ে যায়। ও যেন কি ধরতে পারছে না। অদৃষ্টের জাল যেন ওকে ঘিরে নিয়ে এসেছে। না, নায়েবই যেন সে জাল বুনেছে। কই, গাঁয়ের এরা তো কিছু কথা বলে না। না, এ ভিটে কিছুতেই সে ছাড়বে না।

আর্জান বাড়িতে এল। এবার এসেই যেন ফতিমার উপর অপরিসীম মায়া অনুভব করে। তাকে যেন সে এক্ষুনি কাছে পেতে চায়। এসেই তাকে কাছে ডেকে নিল। কোনও কথা না বলে তার হাতে বাকি যে পঁচিশ টাকা ছিল তা দিয়ে দিল। বলল—এই নাও, তোমাকে দিলাম।

হাতে টাকা পেয়েই ফতিমা খুশি হয়ে উঠল। প্রশ্ন করল, —কোত্থেকে আনলে টাকা?

আর্জান ঘটনাটা বলতে লাগল। ফতিমার যেন সে-সব কানেই যায় না। তার দ্বিতীয় কাপড় নেই। প্রথমেই সে কাপড় কিনবে। সামনের হাটেই টুকটুকে লাল পাড় শাড়ি।

কাহিনীর শেষে আর্জান যেই বলল, —'হঠাৎ বাঘ মোড়লের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল...', অমনি ফতিমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াল, —ও! বুঝেছি, তুমি সেই বাঘ মেরেছ! আর তারই এই পুরস্কার! —বলেই ফতিমা নোট ক'খানা ছুঁড়ে ফেলে দিল আর্জানের মুখের সামনে।

আর্জান যেন কেমন হয়ে গেল। কোন কথাই আর সে বলল না। চুপচাপ উঠে বাড়ির বাইরে চলে গেল।

আর্জান চলে গেলে ফতিমা অবশ্য নোটগুলি কুড়িয়ে নিয়ে তুলে রেখেছিল। বুধবার হাটের দিনে তার থেকে আর্জানের হাতেও টাকা দিয়েছিল।

আর্জানের কিন্তু সর্বদা মাথায় ভিটের চিন্তা। ডাক্তার-আবাদ থেকে আছের সেখ এসে আর্জানের ভাগের জমি চাষ করছে। আছের আগেকার নায়েবকে একশত টাকা সেলামি দিয়ে এই জমি নিয়েছিল। আবাদের চালু নিয়ম—কাউকে জমি ভাগচাষ করতে দিলে, তাকে বসবাস করার ভিটেও দিতে হয়। কিন্তু এই জমির ভিটেতেই আর্জানের ঘর। তাই তাকে না তুললে আছেরকে বসান যাচ্ছে না। সেদিন নতুন নায়েব নৌকায় উঠে এই কথাই আর্জানকে বলেছিলেন।

আর্জান চেষ্টা করে, কীভাবে নায়েবকে খুশি রাখা যায়। আবার নায়েবেরও চেষ্টা, কীভাবে আর্জানকে কৌশলে ভিটে-ছাড়া করা যায়। নায়েবের মনে মনে ভয় আছে, —আর্জান শিকারী, খুবই অবশ্য শান্ত, তবু শিকারী তো! বন্দুক হাতে ঘোরাফেরা করে। বলা যায় না, রাগের মাথায় হঠাৎ কি করে বসে!

এবার ভাদ্র মাসে আর্জানের অবস্থা প্রায় অচল হয়ে উঠল। আর যেন সংসারের খরচ ওঠে না। এই সময় সুন্দরবনের বহু অংশই জলে জলাকীর্ণ হয়ে যায়। অতো জল ভেঙে হাঁটতে গেলে ছপ্‌ছপ্ শব্দ হবেই। তাতে চকিত হয়ে হরিণ আগে থাকতেই পালিয়ে যায়। তাছাড়া আর্জানের বন্দুক বে-পাশী। বে-পাশী বন্দুকের জন্য চোরাই বারুদ মশলা কিনতে হয়। দামও দিতে হয় অনেক। আর্জান যেন কূল-কিনারা করতে পারে না।

কলিম এতদিন ধরে একটা কথা চেপে রেখেছিল। বেদকাশীর বনকর-বাবুর সঙ্গে কলিমের খুব ভাব। তিনি একবার কথায় কথায় বলেছিলেন, —কলিম, তুমি বলো না একবার আর্জানকে আমার আপিসে কাজ করতে।

কলিম তার উত্তরে বলেছিল, —না বাবু, তাই কি হয়। আমরা হলাম চাষী। ভিটে মাটি ছেড়ে আমাদের কি নোকরগিরি পোষায়?

রসিদ সাহেব তখন আশ্বাস দিয়েছিলেন, —না, না, সে ভাবনা নেই। আর্জানকে কি আর আপিসে বসে থাকার কাজ দেব। সে থাকবে পিটেল বোটে। মাঝি হয়ে থাকবে। বনে বনে ঘুরবে, আর বন্দুক তো বোটেই থাকবে। দেখো, আর্জান খুশীই হবে। দশ টাকা মাইনে পাবে আর বোটেই খাওয়া-দাওয়া করবে।

এ কথার উত্তরে কলিম বিশেষ কিছু বলতে পারেনি তখন। এবং সে আর্জানকে এসব কথা এ পর্যন্তও বলেনি।

এবার নিদারুণ অভাবে আর্জানের অবস্থা দেখে কলিম সে-কথা পাড়ে। আর্জান যেন হাতে রাজ্য পেল। পরের জোয়ারেই বেদকাশী গিয়ে রসিদ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা হল। চাকরি পেয়েও গেল। বনে বিনা লাইসেন্সে শিকার করা নিষেধ। আর্জান তো বিনা পাশেই এ মুল্লুকের হরিণ শেষ করে দেবার মত করেছে। তাকে রোখা দায়। কাজেই রসিদ সাহেবও চাকরি দিয়ে আর্জানকে আটকাবার সুযোগ ছাড়তে চান না।

কিন্তু বাদ সাধল ফতিমা। কলিম যা ভেবেছিল তাই হল। ফতিমা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এতদিন আর্জান যা-ই হোক তার কাছেই ছিল। কিন্তু এবার সে তার কাছ-ছাড়া হবে। শুধু বন্দুক, বাঘ, আর বন করে বেড়াবে। সে কিছুতেই আর্জানকে এই চাকরি নিতে দেবে না।

কলিম বুঝিয়ে বলে, —দেখ্ ফতিমা, ওরকম করিস না। জানিস্, আর্জান কত বড় শিকারী ? ওর সাহস দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। তাই তো বনকর-বাবু ওকে ডেকে সেধে চাকরি দিলেন।

বা'জানের মুখে আর্জানের প্রশংসা শুনে ফতিমা চুপ করে গেল।

কলিম বলে চলে, —জানিস্, আর্জানকে এদেশে সবাই এক ডাকে চেনে। কে আছে আবাদে যে একা অতোগুলি বাঘ মেরেছে ? কার অমন বুকের পাটা আছে যে অমন করে বনে বনে একা ঘুরতে পারে ?

ইতিপূর্বে আর্জানের প্রশংসা অনেকেই করেছে ফতিমার সামনে। সে-সব সময় ফতিমা মুখে যাই বলুক, আর্জানের ওপর তার একটা শ্রদ্ধা জাগত। তবু আর্জান ফিরে আবার বনে যাক—তা কিন্তু মোটেই সে সহ্য করতে পারত না। আর্জানের একগুয়েমি ও বনের নেশা ফতিমাকে চিন্তিত ও ত্যক্ত করে তুলতো।

কিন্তু এখন বা'জানের মুখে আর্জানের মনখোলা প্রশংসা শুনে ফতিমা কি জানি কেমন হয়ে গেল। কেমন যেন ওর আর্জানের জন্য মনটা নরম হয়ে গেল। কোথায় গেল ওর রাগ, কোথায় গেল ওর ক্ষেপে ওঠা।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে বা'জানের কাছ থেকে উঠে কাজে মন দিল।

দুদিন পরেই আর্জান পিটেল বোটে চাকরিতে যোগ দিল। আর্জানের নতুন জীবন। বোটে ওকে বেশি কাজকর্ম করতে হয় না। বনের এটা-সেটা গল্প করেই কাটিয়ে দেয়। আর্জান বিনিয়ে গল্প করতে পারে না। দু-চারটি কথায় তার এক একটা বাঘ মারার গল্প শেষ হয়ে যায়। তবুও সবাই সেই দু-একটা কথা শুনবার জন্য কতভাবেই না ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

ব্যগ্র হবার কারণ ছিল। আর্জানের সম্পর্কে কত লোকের মুখে কত গল্প শুনেছে পিটেলের লোকেরা, তার ঠিকঠিকানা নেই। শুধু শুনেছে না, আজ ওরা দেখছেও—আর্জান কেমনভাবে টপ্ টপ্ করে হরিণ শিকার করে আনে। কথা নেই বার্তা নেই বনে চলে যায়, আর আসবার সময় হরিণ সে একটা আনবেই। অথচ সে আসার আগে পিটেলের লোকেরা কত চেষ্টা আর কত কায়দা করে তবে শিকার করতে পেরেছে।

বছর ঘুরে যায়। আর্জান চাকরি করছে। মাসে মাসে দশ টাকা পায়। প্রথম প্রথম ফতিমাকে খরচের টাকা দিতে হত। কিন্তু এখন আর বেশি দিতে হয় না। আর্জান চলে যাবার পর থেকে ফতিমা বাড়িতে একা। কিন্তু অমনভাবে একা থাকতে বড় ভয় ফতিমার। কিছুদিন পরেই কলিম তাকে ডেকে এনেছে। রাত্রিতে কলিমের বাড়িতেই থাকে। ভোরে আবার নিজের বাড়িতে যায়। কাজকর্ম করে, রান্না করে, সন্ধ্যার আগেই খাওয়া-দাওয়া

সেরে বাপের বাড়িতে চলে আসে। ফতিমার আম্মা এই টানা-হেঁচড়া জীবন যাপন করতে দিতে বেশি দিন রাজি হননি। ফলে এখন ফতিমা কার্যত বাপের বাড়িতেই থাকে আর ঘরদোর পরিষ্কার রাখবার জন্য দিনে একবার মাত্র নিজের বাড়িতে যায়। এই সুযোগে আর্জান কলিমের ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু টাকা জমাতে থাকে। জীবনটা যেন সহজ হয়ে এসেছে।

কিন্তু কাল হল এইখানেই। বিপদ কখনও একা আসে না, এ কথা আর্জান মর্মে মর্মে অনুভব করল। কলিমের কলেরা হল। কিন্তু সে কিছুতেই কোন ওষুধ খাবে না। ওষুধ খেতে ফকির আর বাওয়ালিদের নিষেধ আছে—কলিমও খেলো না কিছুতেই। কদিনের মধ্যে কথা জড়িয়ে এল, অজ্ঞান হয়ে পড়ল। অবশেষে মারা গেল।

কলিমের মৃত্যুতে যেন কালিকাপুরে কিছুদিনের জন্য অন্ধকার নেমে এল। কারও মুখে আর কোনও কথা ছিল না, —শুধু কলিমের কথা। আর্জান খবর পেয়েই ছুটে এল, তার মুখে অন্য কোন কথা নেই। —কলিম তাকে কবে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, কখন কি বলেছিল, শুধু সেই কথাই তার মুখে। চারদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিল। ছুটি ফুরলে আবার চলে গেল। কলিমের সংসারের কি হবে, তার সংসারেরই বা কি হবে—তা নিয়ে কোন কথাই সে বলেনি। মনমরা হয়ে যে-ভাবে এসেছিল সেই ভাবেই মনমরা হয়ে চলে গেল।

মাসের পর মাস ঘুরে যেতে থাকে। কলিমের মেঝ ছেলে সুখচাঁদ এখন জোয়ান হয়েছে। চাষ-বাস করে। তাছাড়া কলিম পাঁচটি গরু রেখে গিয়েছিল। কাজেই সংসার চলে যায়।

কিছুদিন পর আর্জান খবর পেল—আছের সেখ তার বাড়িতে চড়াও করেছে। ফতিমা রোজ নিজের বাড়িতে যেত, কিন্তু সে ভয়ে ভয়ে ইতিমধ্যে সব জিনিসপত্র সরিয়ে বাপের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। একদিন সকালে দেখে, আছের সেখ বাড়ি দখল করে বসেছে। ভাগচাষীর জমি বে-হাত হলে ভিটেও বে-হাত হবে—এই নিয়ম মেনে নিতেই হল। তাই বলে ফতিমা প্রথম প্রথম কিছুতেই মেনে নেয়নি। পাড়া মাতিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করেছে। করলে কি হবে ? ধনাই মোড়ল একটা কিছু করলে করতে পারত কিন্তু সে যখন নায়েবের বিরুদ্ধে কিছুতেই যাবে না, তখন ধীরে ধীরে মেনে নিতে হল নায়েবের ইচ্ছাকেই।

আর্জান সব কিছু খবর পেয়েও—বাড়িতে এল না কিছুদিন। সে নিজেকে অসহায় মনে করল। বোটের অন্য সবাইকে তার ভিটের কাহিনী বলেছে, —বলেছে তার আম্মার কথা, তার ভিটের হেঁতাল গাছের কথা, তার আম্মার কবরের কথা। একটা কিছু করবার জন্যে বোটের সকলে বললেও আর্জান তখন তখনই বাড়িতে ফিরে এল না— সে এসে যে কিছু করতে পারবে, এ ভরসা তার নেই। তার ভরসার খুঁটি সে হারিয়েছে—কলিম নেই।

পনেরো

আবাদের ভরসা হারালে কি হবে, বাদার ভরসা আর্জান হারায়নি। এখন তার গাদা বন্দুক নয়। এখন তার হাতে টোটা ভরা বন্দুক। বোটে অনেকগুলিই টোটা-বন্দুক। শিকারের কাজে বা আপদেবিপদে সবচেয়ে সেরা বন্দুকটাই আর্জানের হাতে সবাই দেয়।

—দেখছিস্ আর্জান, দূরে ওপারে বাঁশের মাথায় কে যেন একটা সাদা কাপড় বেঁধে রেখেছে ? —বোটের পিটেলবাবু উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

আর্জান গলুইতে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে একবার দেখে নিল। সেদিকে তাকিয়ে

আর্জান বলল, —বাবু! জানেন আমরা এখন কোথায়! ঝাপ্‌সী নদীর মাঝে। জায়গাটা বিশেষ ভাল না। ঐ 'দনে' দেখছেন, ঐ 'দনে'র মুখে নিশানা দিয়েছে।

যে সব খাল দুটি নদীকে যোগাযোগ করে দেয়, তাকে এদেশে 'দনে' বলে।

—কিসের নিশানা? —বাবুর ঔৎসুক্য আরও বাড়ে।

—জানেন তো, এখানে অনেকদিন পরে ঘের পড়ছে। নিশ্চয় কোন দল এসেছিল কাঠ কাটতে। তারা মানুষ দিয়েছে। তাই ঐ নিশানা। যাতে আর কেউ ওখানে না ঢোকে। ওদিকে বিপদের সম্ভাবনা।

আর্জানের কথা শুনে পিটেলবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মনে মনে তাঁর আশঙ্কা, 'নলেনে'র বড় বনকর আপিসে এবার গেলেই এই বাঘ তাড়াবার কথা উঠবে, আর তারই ঘাড়ে হয়ত সে দায়িত্ব এসে পড়বে।

—চলুন না বাবু! দেখেই আসা যাক কি ব্যাপার। —বলেই আর্জান বোটের মুখ ঘুরিয়ে দিল। কিনারায় এসে নোঙরও ফেলে দিল। পিটেল-বোটগুলি পানসি নৌকার মত। শোবার খোপ, রান্নার খোপ এবং একটা আপিস খোপও আছে। আর এই বোটের সঙ্গে ছোট্ট একখানা 'জালি' ডিঙি আছে। এদিক ওদিক দ্রুত যাবার জন্য বা ছোট ছোট খালে ঢুকবার জন্য এই ডিঙির ব্যবস্থা।

আর্জান ও দুজন মাঝি 'জালি' ডিঙিখানি নিয়ে চলল দেখতে। আর্জান নিয়মমত বন্দুকটাও নিয়েছে।

আর্জান দেখে এসে বলল—বাবু! নিশানা দেখলাম কিন্তু কোনও বাঘের চিহ্ন তো পেলাম না। কিন্তু বাবু, ওরা বেশিক্ষণ এখান থেকে যায়নি। অল্প কিছুক্ষণ আগেই গেছে।

—কিসে তুই বুঝলি?

—এই যে 'জো' দেখছেন, এই 'জো'র প্রথম পোয়াতে রওনা হয়েছে।

তখন ঝাপসী নদীতে আধা জোয়ার। সিকি জোয়ারের সময়, তার মানে দেড় ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে।

—কিন্তু কি করে বুঝলি? —বাবু আবার প্রশ্ন করেন।

—যে বাঁশের খুঁটি পুঁতেছে, তাতে এক 'জো'র পানিরও দাগ এখনও পড়েনি।

তাড়াতাড়ি নোঙর তুলে পাল টাঙিয়ে আর দুই দাঁড় ফেলে ওরা চলল সাঁই সাঁই করে সেই লোকদের ধরবার জন্য। আজ তো বিকেল হয়ে এসেছে। আজ রাতে ধরতে পারলে কাল সকালের ভাটিতে আবার এখানে আসতে পারবে। আর্জানের দৃঢ় ধারণা—সহজেই সে এই বাঘের নাগাল পাবে। ঝাপসী নদীর এই বনে সে অনেকবার এসেছে। এর আনাচ-কানাচ ওর সব জানা।

নলেন আপিসের আগেই পিটেল বোট সেই নৌকা ধরল। নৌকার লোকেরা সবাই মিলে যা বলল তাতে বোঝা গেল:

অনেক দূর থেকে এসেছিল কজনে মিলে গোলপাতা কাটতে। সাত দিন হল এসেছে। ঝাপসী নদীতে নৌকা রেখে গোলপাতা কাটছিল। গোলপাতা কাটার নৌকাগুলি প্রায় সবটাই খোলা। মাত্র হালের পাশে ছোট্ট একটি খুপরি থাকে। তাতে কোনমতে চেপেচুপে তিনচার জনে শুতে পারে। নৌকার বাকি জায়গাটা গোলপাতায় বোঝাই হয়। ওরা গত সাতদিনে অর্ধেকের বেশি বোঝাই করে ফেলেছিল।

আজ দুপুর গড়ালেই সকাল সকাল কাজ সেরে সবাই বন থেকে চলে আসে। এসেই সব ঠিকঠাক করে সবে গা ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম করছে। হালের ধারে একটা বসবার জায়গা,

তাকে কড়াল বলে। সেই কড়ালে একজন বসেছিল। তার পাশেই খাবার জলের বড় একটা মাটির জালা। বনে কাজ করতে এলে জালা-ভর্তি মিষ্টি জল নিয়ে আসতে হয়। নদীর জল এত লোনা যে মুখে দেবার উপায় নেই।

জালার পাশে হাত দুই ফাঁকা, তারপরই শোবার খুপরি। এই খুপরির ভিতরে একজন বসে ছিল। সে কিন্তু ভয়ানক ভীতু। নৌকা ছেড়ে একদিনও বনে নামেনি। পারতপক্ষে সে খুপরিও ছাড়তে চায় না।

খুপরির পরে গোলপাতা রাখবার দশ-বারো হাত জায়গা। তখন খুপরির ছই বরাবর উঁচু হয়ে পাতা বোঝাই হয়ে গেছে। তারপর নৌকার গলুই। তৃতীয় জন একটি লগি হাতে করে গলুইতে দাঁড়িয়ে নৌকা ঠিক-ঠাক করে নোঙর করছিল। কড়ালের লোকটি তামাক ধরিয়েছে। তার সঙ্গে বসে আরামে তামাক খাবার আশায় গলুই-এর লোকটি তাড়াতাড়ি হাতের টুকটাক কাজ সেরে নিচ্ছে।

সুন্দরবনে বড় নদীতে নৌকা সাধারণত নোঙর করতে হয় তীরের কাছে। মাঝ-নদী গভীরও যেমন, স্রোতের টানও তেমনি বেশি। ওদের নৌকা কূল থেকে প্রায় দশ হাত দূরে। এদেশে সর্বত্র নদীর এক পারে ভাঙন, অপর পারে চর। ভাঙনের পারেই নোঙর ফেলেছে। ভাঙনের দিকে ওঠানামা করা সুবিধা। চরের পারে এমন কাদা যে পা হাঁটু পর্যন্ত দেবে যাবে। সুন্দরবনের পলিমাটির কাদা নামকরা। পা বসে গেলে টেনে তোলাই এক বিপদ। বাদার লোকে এই কাদার নাম দিয়েছে 'প্রেমকাদা'। একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না।

এপারে নদীর তীর বেশ খাড়াই। মাটি ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ছোট বড় গাছের শিকড় স্পষ্ট দেখা যায়। তীর বারাবর বলাসুন্দরী গাছের ঝাড়। গোল গোল পাতা। হলদে রঙের ফুলে ঝাড় ভরে আছে।

তামাক টানতে টানতে হালের লোকটি হঠাৎ থেমে গেল। ঝুরঝুর করে মাটি ঝরে পড়ল পাড় থেকে নদীর জলে। সেদিকে কান খাড়া করে বলল, —দেখ্‌তো, দেখ্‌তো কি পড়ল?

—কি আর পড়বে। ভাঙনের মাটি পড়ছে। —বলেই গলুই-এর লোকটি বলাগাছের ঝাড়ের দিকে একবার তাকায়। ঝাড়ের মাঝ থেকে একটা লিকলিকে ডাল মাথা বের করে আছে। ঝির্‌ঝিরে বাতাসে দুলছে।

আবার যে যার কাজে মন দিল। খুপরির লোকটির উৎকণ্ঠা মিছেমিছিই বাড়ল।

এমন সময়ে অকস্মাৎ বজ্রের হুঙ্কারে বাঘ লাফিয়ে পড়ে। ঝোপের ভিতর থেকে লাফ দিয়েছে হালের দিকে লক্ষ্য করে। গলুইতে নোঙর, কাজেই নৌকার হালের দিকটা স্রোতের টানে একবার এপাশ, একবার ওপাশ করছে। বাঘ লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তার নখ-বিস্তারিত থাবা দুটি পড়ল নৌকার ডালিতে। ঠিক জলের জালা আর খুপরির মাঝখানে। আর তার গোটা দেহটা পড়ল ঝপাৎ করে নদীর জলে।

বাঘের গর্জনে আর আক্রমণে হালের লোকটি পাগলের মত হয়ে খুপরির দিকে ছুটে যেতে চায়। জলের জালা ডিঙিয়ে ফাঁকা জায়গাটা আসতেই সে পড়ে গেল। সেখানে কোন পাটাতন ছিল না, —নৌকার খোলের মধ্যেই পড়ল। সামনেই বাঘের থাবা ডালির উপর। গর্জন করতে করতে বাঘ দুই হাতের উপর ভর দিয়ে নৌকার উপরে উঠবার চেষ্টা করছে। এই হিংস্র মূর্তির সামনে হালের মাঝি অবশ। যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেখানেই মাথা নিচু করে বাঘের সামনে গুড়ি মেরে উবু হয়ে পড়ে রইল।

এক ঝাঁকানি দিয়ে বাঘ উঠে দাঁড়াল নৌকার উপর। নৌকাখানি দুলে উঠল। কিন্তু সেই

সামান্য ফাঁকা জায়গায় অত বড় দেহ নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে ? পেছনের দু-পা ডালির উপর। সামনের এক থাবা একটি শুঁরোর উপর, আরেক থাবা লোকটার পিঠের উপর। গোঁ গোঁ করতে করতে মুখ ঘুরিয়ে খুপরির দিকে তাকাল।

খুপরির ভিতরের মানুষটির কোন সাড়া নেই। মাথা বিছানায় গুঁজে চোখমুখ ঢেকে পড়ে আছে। ভয়ে আড়ষ্ট, যেন কোন চেতনা নেই।

বাঘ তখন সোজা খুপরিতে ঢুকে তার কোমরে গক্ করে কামড় বসিয়ে দেয়। কামড় দিয়েই উঁচু করে মুখে ঝুলিয়ে খুপরির ওপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

গলুইতে লগি হাতে মানুষটি যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়েই আছে। কোন চেতনা, কোন সম্বিত যেন তার নেই। বজ্রাহতের মত শক্ত ও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েই আছে।

বিড়াল যেমন করে ইঁদুর মুখে করে নেয়, বাঘও তেমনি করে মানুষটিকে মুখে উঁচু করে নিয়ে গলুইতে গেল। চার পা এক জায়গা করে এক লাফে লোকটিকে মুখে নিয়েই তীরে উঠে গেল, —ধাক্কায় নৌকা কাৎ হয়ে জল উঠবার মত।

সেই ধাক্কায় গলুই-এর লোকটি ধপ্ করে ডালিতে পড়ে আঘাত পেল। আঘাতে বুঝি তার চেতনা ফিরে আসতে চায়। আবছা চেতনা নিয়েই লগি হাতে গোলপাতা আর ছই-এর উপর দিয়ে হালের দিকে ছুটে গেল।

'মার, শালা' !—বলে দড়াম্ করে লগি দিয়ে বাড়ি মারল মাটির জালার উপর। জালা চুরমার হয়ে গেল।

হালের মানুষটি পিটেল বাবুকে কুপি জ্বেলে এনে দেখাল, তার পিঠে বাঘের থাবার চিহ্ন। কর্দমাক্ত পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে পিঠটা জুড়ে। সবাইকে দেখাবার জন্য তা মুছে ফেলেনি তখনও।

পরদিন সকালে পিটেল-বোট আবার ঝাপসী নদীতে ফিরে এল। সঙ্গে একজন গোলপাতার নৌকার লোকও আছে। সেদিন রাত্রে আর্জান আসতে চাইলে পিটেল বাবু বলেছিলেন, —আর্জান ! তুমি সাহস কর এই বাঘের পেছনে যেতে ?

—সাহসের কথা বলতে নেই বাবু ! অতবড় শক্তিশালী জানোয়ারের সামনে কখন কে সাহস হারায় বলা যায় না !

—তুমি যা বলেছ, ঠিকই বলেছ।

—ওর এক থাবায় আঠারো মানুষের বল। আর অতবড় চতুর জীবও আর নেই ! অতবড় জানোয়ারটা হেঁটে যাবে আপনার কানের পাশ দিয়ে—অথচ এতটুকু শব্দ পাবেন না।

পিটেল-বোটের একজন মাঝি বলল, —বাবু ! এই সুযোগে আপনিও শিকারীর সঙ্গে যেতে পারেন।

আর্জান বাধা দিয়ে বলল, —না ! না ! ওরকম ভাবে বলতে নেই। নিজের ইচ্ছা ছাড়া এই জীবের সামনে যাবেন না। কথায় বলে, 'বাঘের দেখা, আর সাপের লেখা'।

কাজেই ঠিক হয়ে আছে, আর্জান একাই যাবে। সকালে গোলপাতার নৌকার মাঝি সাদা কাপড়ের নিশানা বেশ খানিকটা ছাড়িয়ে গিয়ে দূর থেকে দেখিয়ে দিল, কোথায় তাদের নৌকা ছিল। সেখান থেকে অনেক দূরে, প্রায় মাঝ-নদীতে তিনটি নোঙর ফেলে পিটেল-বোট বাঁধা রইল। পিটেল বাবু অবশ্য বন্দুকে গুলি ভরে হাতের কাছেই রাখতে ভোলেননি।

আর্জান একাই ছোট্ট ডিঙিখানা নিয়ে চলল। সেই বলাসুন্দরীর ঝাড়ে ডিঙির মাথা ঢুকিয়ে ডাঙায় উঠে পড়ল। দূর থেকে আর্জানের ডিঙিখানা একটু একটু মাত্র দেখা যায়।

বাঘের পায়ের খোঁচ দেখে আর্জান প্রথমেই অনুমান করল, এ বাঘ নয়, বাঘিনী। পেছনের ও সামনের পায়ের দূরত্ব দেখেই বোঝা যায়, বাঘ ছোট কি বড়। তারপর সামনের থাবার আকার দেখে বোঝা যায়, বাঘ না বাঘিনী।

আর্জান এগিয়ে চলল পদচিহ্ন অনুসরণ করে। খুব বেশি সন্ত্রস্ত হবার কারণ ছিল না। বনটা খুবই পরিষ্কার। কোথাও বিশেষ ঝোপঝাড় নেই। বহুদূর দৃষ্টি যায়। গাছের লম্বা গুঁড়িগুলি স্পষ্ট দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত। যেন উৎসবের সামিয়ানার খুঁটির মত দাঁড়িয়ে আছে, এখানে ওখানে, সেখানে, —সর্বত্র।

শক্ত মাটিতে এলেই আর্জান বাঘিনীর খোঁচ হারিয়ে ফেলে, আবার নরম মাটিতে এলে থাবার স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পায়। বেশ কিছুদূর এসেছে। সামনেই ডান হাতে একটা মাঝারি খাল।

বাঘিনী তার শিকার মুখে নিয়েই সোজা খাল পার হয়ে গেছে। এ পারের ফাঁকা বন তার পছন্দ হয়নি। আর্জান মুশকিলে পড়ল। ডিঙিতে ফিরে গিয়ে নিঃশব্দে ডিঙিখানা বেয়ে ঠিক এখানেই আবার ফিরে এল। সোজাসুজি খাল পার হয়ে আবার খোঁচ অনুসরণ করে এগিয়ে চলে।

এপারে বনে মাঝে মাঝে প্রায়ই ঝোপ ঝাড়। একটা ঝোপের দিকে এগুতে গেলে পাশে ওপাশে তিন-চারটি ঝোপের দিকে লক্ষ্য রেখে তবে এগুতে হবে। পায়ের খোঁচ যে-ঝোপের দিকে গিয়েছে, বাঘিনী সেখান থেকে পাশের ঝোপের দিকেও যেতে পারে। এতদিকে লক্ষ্য রাখার ফলে আর্জানের গতি মন্থর। পনেরো মিনিটে দশ কদমের বেশি এগুতে পারে না। খালের এপারে এসেই আর্জানের স্থির বিশ্বাস হয়—নিকটেই বাঘ আছে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেন? তার উত্তর আর্জান হয়ত দিতে পারবে না। সুন্দরবন এমনিতেই নিস্তব্ধ ও গম্ভীর, কিন্তু বাঘ যেখানে থাকে সে-বন যেন থম্ থম্ করতে থাকে। গাছ-গাছড়া, ঝোপ-ঝাড়, জীব-জন্তু, পাখি, বাতাস, আলো—সব মিলিয়ে যেন তখন শিকারীর মনে এমনি একটা ধারণা জন্মায়।

কয়েকটি ঝোপ ছাড়িয়ে গেছে। হঠাৎ একটা ঝোপ দেখে আর্জানের মনে হল, এই জায়গায় নিশ্চয়ই বাঘিনী আছে। ঝোপটার অবশ্য কোনই বিশেষত্ব নেই। কেবল পেছনের গাছটা শুকিয়ে গেছে, ডালে একটিও পাতা নেই। তাই সূর্যের আলো কিছুটা প্রবেশ করেছে।

আবার খোঁচ ছেড়ে দিয়ে আর্জান ঝোপটা লক্ষ্য করেই এগুতে লাগল। বন্দুকের দুটি ঘোড়াই তোলা আছে।

এবার আর কদম নেই। ইঞ্চি ইঞ্চি করে আর্জান এগোয়। হঠাৎ আর্জান থেমে যায়। ঝোপের ওপাশে লাসের পা চোখে পড়ে। বন্দুক ধীরে অতি ধীরে কাঁধে বসিয়ে নিল। আরও দশ মিনিট ধরে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুলে গোটা লাসটা দেখা গেল। কিন্তু কৈ? বাঘিনী তো নেই…

শিকারীর সর্ব প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করে আর্জান অর্ধভুক্ত লাসের কাছে গেল। কিন্তু বাঘিনীর কোন পাত্তা নেই।

বাঘিনী অনেকবার এ-পাশ ও-পাশ করেছে। তার চিহ্ন রয়েছে। অনেক খুঁজে আর্জান সন্ধান পেল, এই ঝোপ থেকে কোন দিকে বাঘিনী এগিয়ে গেছে। মনে মনে আশঙ্কা, হয়ত

যা নিকটেই বাঘিনী আছে। শিকারীর দৃষ্টি দিয়ে ভাল করে চারিদিক দেখে নিল। তারপর খোঁচ দেখে এগিয়ে যাওয়াই স্থির করল।

চলতে চলতে বহুদূর এগিয়ে যায়। এমনিতেই এবার খোঁচ দেখে আর্জানের মনে হচ্ছিল, যেন কাল রাত্রেই বাঘিনী হেঁটে গেছে। পায়ের চিহ্ন সদ্য নয়। হঠাৎ একটা থাবার দাগের উপর হরিণের খুরের দাগ দেখে আর্জানের দ্বিধা কেটে যায়—বাঘিনী কাল রাত্রেই ঠিক চলে গেছে।

আর্জান ফিরে এল। বোটেই ফিরে এল। স্থির করল, এবার নতুন ধরনের পরীক্ষা করবে। রাত্রে লাসের পাশে গাছে উঠে শিকার করবে। বাঘিনী নিশ্চয় আজ রাত্রে আবার আসবে। অবশ্য সুন্দরবনে এ ধরনের শিকার অভিনব। বাসি-খাবারে সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগারের কোন আকর্ষণ নেই। তবে মানুষের লাস, —এলেও আসতে পারে।

অন্ধকার নামবার আগেই আর্জান একাই ডিঙি করে যথাস্থানে গেল। ডিঙিখানা একটু টেনে মালে তুলে রাখল। ডিঙি সাধারণত এ দেশে এইভাবেই চরের উপর টেনে তুলে রাখে। প্রবল জোয়ার-ভাটার দেশে তুলে রাখাই নিরাপদ। তা না হলে স্রোতে ডিঙি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নেয়ও মাঝে মাঝে।

যথারীতি একটা গাছ বেছে নিয়ে তার উপর উঠে বসল। সারা রাত কাটাল, কিন্তু বাঘিনীর কোন সন্ধান নেই। বনে একটা টুঁ শব্দও নেই। শেষরাতে বুঝল, বাঘিনী নিশ্চয় নিকটে নেই। তাই ক্লান্তি কাটাবার আশায় একটা বিড়িও ধরাল। বিড়ির গন্ধ পেলে বাঘিনী লাসের ধারে আসবে না, তাই আর্জান সারা রাত বিড়ি খেতে পারেনি।

গাছ থেকে নেমে ভাবল, শেষ চেষ্টা একবার করে যাবে। দেখা যাক, কতদূর গেছে, আর কোন্ দিকে গেছে। পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর্জান এগিয়ে চলে। হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর এসে পড়ল, —প্রায় তিন মাইল। বনের ভিতর তিন মাইল সোজা কথা নয়।

দূরে একটা বুনো শুয়োর দৌড়ে পালাচ্ছে। সাদা দাঁত দূর থেকেই দেখা যায়। আর্জান গুলি করতে চায় না। গুলি করলেই যে জানাজানি হয়ে যাবে, —এই বনে মানুষ এসেছে।

কয়েক হাত সরে একটা মোটা গাছের পেছনে আড়াল নিল। শুয়োর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আর্জান চমকে উঠল, —নিজেরই পায়ের ধারে অন্য একটি বাঘের পায়ের ছাপ। সদ্য ছাপ। হেঁটে চলে গেছে তার ডান দিকে। এই পায়ের ছাপ সে যাকে খুঁজছে তার নয়।

আর্জান বুঝল, বাঘের 'সাঁই'তে এসে পড়েছে। বাঘের এই আড্ডায় তাদের কে কোন্ দিকে আছে তা অনুমান করা এবার দুঃসাধ্য হবে।

দ্রুত ফিরে আসতে চাইল। চাইলে কি হবে ? দ্রুত আসবার উপায় নেই। সামনের দিকে না দেখলেও বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু দুপাশে আর পিছনে কড়া নজর রাখতে হবে।

তিন ঘণ্টায় ফিরে এল সেই লাসের ধারে। বেলা একটা। মাছি ভন্‌ভন্ করছে লাসের আশেপাশে। আর্জান অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বিফল মনে ডিঙির দিকে অগ্রসর হয়। ডিঙিতে এবার উঠবে। বন্দুকের ঘোড়া নামিয়ে দিল। বন্দুকও এত হাল্‌কা ভাবে ধরেছে যেন পড়ে যায় যায়।

সামনেই ডিঙি। পনেরো গজ দূরে। চমকে উঠে আর্জান ঝট্ করে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। টান্ টান্ হয়ে ডিঙির উপর শুয়ে আছে বাঘিনী। নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। আর্জানের দিকেই কাৎ হয়ে আছে। চোখ বুজে আছে, স্পষ্ট দেখা যায়। ডিঙির ডালি ছাড়িয়ে হাতের থাবা শূন্যে খানিকটা ঝুলছে। আর্জান বুঝল, কি বিপদ হতে পারে। বন্দুকে ঘোড়া তুলে নিরিখ করতে গেলে, ঘোড়া তোলার শব্দে বাঘিনীর নিদ্রা নিশ্চয় ভেঙে যাবে। তখন হয়ত

বন্দুক তুলে নিরিখ করবার অবকাশ দেবে না। তাই ঘোড়া না তুলেই আর্জান বন্দুক নিরিখ করল। বন্দুক তেমনি করে রেখেই আস্তে আস্তে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঘোড়া তুলে দিল। 'কট্'···নিঝুম বনে এ-শব্দটাও কি ভীষণ! অমনি চোখ মেলেই বাঘিনী ঘাড় উঁচু করেছে। অবসর নেই। মুহূর্তে আর্জান টিপে টান দেয়।

বাঘিনী এক লাফে ডিঙি থেকে মাটিতে দাঁড়িয় পড়ে। গর্জন করে ওঠে। আর্জান বন্দুক ধরেই আছে। নলের ধোঁয়া উড়ে গেছে। বাঘিনী হাঁ হাঁ করে হেঁকে ওঠে!

দোনলা বন্দুকের দ্বিতীয় টিপে আর্জান টান দিল। কিন্তু আর্জান হতভম্ভ। চোট্ হয় না। মুহূর্তে খেয়াল হল, দ্বিতীয় ঘোড়া তোলা হয়নি! ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘোড়া তুলে নিরিখ করতেই দেখে, বাঘিনী টলছে। পড়ে গেল। কিন্তু গর্জন তার থামেনি। হুঙ্কারে বন কাঁপছে।

আর্জান স্তব্ধ। বন্দুক ধরেই রইল, কিন্তু গুলি করল না। বাঘিনী রাগে গর্‌গর্ করছে। উঠবার শক্তি নেই। একটা গাছ কেটে নিয়ে গেছে, সামনেই তার গুঁড়ি এক হাত উঁচু হয়ে ছিল। বাঘিনী রাগে ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে দাঁত দিয়ে সেই গুঁড়ি কামড়ে খান্‌খান্ করতে লাগল। মানুষ যে-ভাবে কাঠ চেলা করে, ঠিক তেমনি ভাবে খান্‌খান্ করে খণ্ড খণ্ড কাঠ টেনে ফেলতে লাগল।

আর্জান বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আর দেরি করা ঠিক হবে না। বলা যায় না, বাঘিনী কখন আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। আর্জানের দ্বিতীয় বুলেট মাথা ভেদ করল।···বাঘিনী এবার নিস্তব্ধ!

ষোলো

—কি হলো আর্জান? কি হলো? —পিটেল-বোটের অন্য মাঝিরা জিজ্ঞাসা করে।

—হবে আর কি! নলেন আপিসের বাবু তো বাঘিনী দেখে মহাখুশী! তখনই বাবু বাড়িতে নিয়ে কত কি খাওয়ালেন। তোরা তো দেখলিই।

—কিন্তু বকশিস?

—কি আর বলি! বাবু বলেন, 'আর্জান, তুমি তো এখন সরকারী লোক। সরকারী লোকে সরকারী বন্দুকে সরকারী বন থেকে বাঘ মেরেছে, —এতে বকশিস আশা করে লাভ নেই।'

একজন বলল, —দেখেছিস্ নায়েবি কায়দা!

যে যা-ই বলুক আর্জানের কিন্তু এ সব ব্যাপারে গা-সওয়া হয়ে গেছে। সদর পর্যন্তও একবার সে গিয়ে দেখেছিল—এ ব্যাপারে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না।

নলেন আপিস থেকে ফিরে বেদকাশীর এলাকায় আবার তার পিটেল বোটের কাজে মন দিতে হল। মাসের পর মাস কাটতে লাগল। বছরও ঘুরে যায়। ঝাপসী নদীর বাঘিনী মারার পর আর্জানের নামডাক আরও ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে যে-ঘেরেই বাঘের উপদ্রব, সেখানেই আর্জানের ডাক পড়ে।

সে-ডাকে আর্জানও পিছ-পা হয় না। পিছ-পা হয় শুধু সংসারের ডাকে। সংসারের তাল যেন সে সামলাতে পারে না। বাড়িতে মাঝে মাঝে যায়। কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারে না। সমস্যা যেমন তেমনি রেখেই প্রতিবার ফিরে যায় পিটেলের চাকরিতে। ফতিমার হাজার ওজর-আপত্তি উপেক্ষা করেই আর্জান বারবার চলে যায়।

একবার ফতিমা বলল, —আচ্ছা, তুমি কি বল তো ? আর কতদিন এমনি ভাবে চলবে ! বা'জান যখন ছিল, তখন না হয় যা হয় করতে, কিন্তু এখন কি তাই চলে ? এ যে পরের সংসার। আমি পরের সংসারে আর কতদিন পড়ে থাকব !

সংসারের কথা উঠতেই আর্জানের নিজের ভিটের কথা মনে পড়ে। কি ভালই না বাসতো তার পুরনো ভিটেকে। সে-বেদনা চেপে গিয়ে আর্জান বলে,—আচ্ছা, আমাদের গরুটার কি হল ? মেজভাই কি গরুটা ভাড়া দিতে পেরেছে ?

—পেরেছে না তো কি ! পরের গোয়ালে থাকলে যা হবার তাই হয়েছে—শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

—কেন, তুমি দেখতে পার না ? গরুর খাওয়াটাও তুমি দেখতে পার না ?

—নিজের ঘর নেই, গোয়াল নেই। উনি গরুর ভাবনা দেখতে বলছেন ! —রাগে, অভিমানে ফতিমা ফেটে পড়ে।

আর্জান কথার মোড় ফেরাবার জন্য হঠাৎ বলে—জানো ? ফুফার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

—কোথায় ?

—বেদকাশীর হাটে। সেদিন হাটবার, আমিও ছিলাম হাটে।

—কি বলল ?

—বলল, তার ছেলের বিয়ে-থা দিয়েছে।

—দেবে আর না কেন ? ছেলে আছে, ঘর আছে, বাড়ি আছে। আর তোমার ! না আছে জমি, না আছে ঘর, না আছে দোর ! —বলেই ফতিমা রাগে ও দুঃখে হঠাৎ থেমে যায়।

আর্জান যে-কথাই বলে ফতিমার কাছে, ঐ হক কথাই এসে পড়ে —ঘর নেই, দোর নেই, ভিটে নেই, মাটি নেই।

রাগে সেদিন সারাদিন ফতিমা আর কোন কথা আর্জানের সঙ্গে বলেনি।

পাঁচ দিনের জন্য আর্জান বাড়িতে এসেছিল। যাবার দিন ফতিমা আর্জানকে অনুনয় সুরে বলল,—একটা ঘর কোথাও বানাও গো। তুমি যেখানে খুশি যেয়ো, কোনও বাদ সাধব না। আমি থাকব সেখানে। তুমি তো জানো, এবার আমি মা হবো···তোমার ছেলে হবে। তোমার ছেলেও কি পরের দোরে মানুষ হবে !

এমনিতেই আর্জান ভিটের কথায় নরম হয়ে যায়। ফতিমার নরম সুরে ও অনুনয়ে আরও অভিভূত হয়ে পড়ল।

মুখে শুধু বলল, —দেখি।

বাঙলার এই সুদূর দক্ষিণে জীবন যেন ঢিমে তালে চলে। আর্জানের জীবনকালে বাঙলার মাটিতে কত আন্দোলন হল। সেই ঢেউ যেন এখানে পৌঁছয় না। পৌঁছলেও তাতে কোন উদ্দামতা নেই। থানা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে, সদর থেকে এক-শ' মাইল দূরে এই আবাদ অঞ্চল যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। মামলা-মকদ্দমা এরা করতে জানে না—করতে ভয় পায়। খুবই কম করে। তাই সদরের সঙ্গে এদের জীবনের যোগ খুবই কম।

শাসনকর্তা বলতে এরা চেনে—নায়েব গোমস্তা। কোর্ট এদের কাছে জমিদারের কাছারি। রাজা বলতে এরা বোঝে, —দণ্ডমুণ্ডের কর্তা জমিদার, জোতদার।

আর সবই এদের কাছে শোনা কথা মাত্র। স্বাধীনতা, পরাধীনতা, ইংরেজ-শাসন

—সবই শোনা কথা। তবে তিন-চার বছর অন্তর যখন কেউ একবার সদরে যায়, তখন দেখে আসে ইংরেজ শাসন। কোর্ট দেখে, স্টীমার দেখে, রেলগাড়িও দেখে! তখন ধরে নেয়—এ সবই সাহেবদের কাজ।

আর আবাদের হাটে বাজারে মনোহারী দোকানে গেলে, মিলের কাপড়জামার দোকান দেখলে, এরা ভাবে সাহেবদের জন্যই নিশ্চয় এসব এদেশে এসেছে।

আন্দোলনের ঢেউ এদেশে সামান্যই পৌঁছয়। অসহযোগ আন্দোলন এল। কোন রেখাপাতই তার হলো না এদের উপর। কেবল যখন সেই আন্দোলনের পর এদের হাটে কিছু দেশী কাপড় আসতে লাগল, তখন বোঝে, —একটা কিছু বা হয়েছে।

আইনভঙ্গ আন্দোলনের কোন চিহ্নই এদের জীবনে পড়ে না। এমনিতেই লবণ এরা নিজেরাই তৈরি করে খায়। লোনা দেশে লবণ তৈরির ব্যাপারে কোন সাড়া জাগে না।

তবে একটা বিষয়ে এদের মনে খুবই আশা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল, —প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আইনের পরিবর্তন হলেও এদের জীবনে কিন্তু কোন বিশেষ পরিবর্তন এল না।

কিন্তু এবার যা ঘটলো, তা যেন ওদের গোটা জীবনে আলোড়ন এনে দিল। জাপানী যুদ্ধ। —কি যেন একটা ওলট-পালট করে দেবে! আর্জানের জীবনেও সেই ধাক্কা এল। সুন্দরবনেই নাকি জাপানীরা এসে যুদ্ধ করবে। বনের নদী-খালে মিলিটারী লঞ্চ চলতে শুরু করেছে। সাহেব সৈন্যরাও এখানে সেখানে সর্বদাই ঘোরাফেরা করে। এইসব সাহেব সৈন্যরা মাঝে মাঝে এসে আড্ডা গাড়ে বনকর আপিসগুলিতে।

বেদকাশীর আপিসে কাল একদল গোরা সৈন্য আসবে। আপিসের বাবু রসিদ সাহেব তাদের হরিণের মাংস খাওয়াতে চান। সদর আপিস থেকেও কড়া নোট এসেছে, —গোরা সৈন্যদের যেন আদর আপ্যায়ন করা হয়।

রসিদ সাহেব আর্জানকে ডেকে বললেন, —আর্জান। হরিণ তো একটা মারতেই হয়। অতিথি আসছে। আপ্যায়ন তো করতেই হবে।

আর্জান ধীরে ধীরে বলে, —মুশকিলের কথা বাবু! এ সময় কি সহজে হরিণ পাওয়া যায়? শীতকাল নয় যে হরিণ রোদ পোয়াতে চরে আসবে।

—সে কথা বললে হবে না। হয় আজ সকালে, না হয় আজ সন্ধ্যার মধ্যে শিকার চাই-ই চাই।

—চেষ্টা করব। কিন্তু কথা দিতে পারি না।

—তা বললে হবে না! তুমি গাছাল দেবে, না মাঠাল দেবে?

—এই ভরা বর্ষায় কি ঘুরে ঘুরে হরিণ পাওয়া যায়! কোনও শুকনো মালে উঠে গাছাল শিকার করার ফিকিরে থাকতে হবে।

—তা বেশ, চলো আমিও যাবো।

আর্জান অন্য সময় হলে আপত্তি করত। কিন্তু এখন আপত্তি করে না। ভাবে, —ভালই হল। বাবু সঙ্গে থাকলে, হরিণ না পেলেও তার দোষ কেটে যাবে।

সকালেই আর্জান বনের মালে উঠল। সঙ্গে রসিদ সাহেব। জল ভেঙে এগিয়ে বনের মধ্যেই একটা উঁচু জায়গায় গাছে উঠে বসল। হরিণ এলে ন-টার মধ্যে আসবে, আর তা না হলে বিকেল তিনটের সময়। বারোটা বেজে যায়, কোন হরিণের পাত্তা নেই।

মাঝে একবার জলে ছপাং ছপাং করে কি যেন ঝোপের আড়াল দিয়ে চলে গেল।

রসিদ সাহেব ফিসফিস্ করে বললেন, —যাও না আর্জান!

—বাবু, পাগল নাকি ? শূন্যের মধ্যে পানিতে হেঁটে শিকার ধরা যায় ! পানিতে একটু শব্দ হলেই কোথায় চলে যাবে তার দিশে নেই !

রসিদ সাহেব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। শিকার বুঝি মেলে না। আর্জান বুঝিয়ে শান্ত করে রাখতে চায়। দুজনে গাছের ডালে খুবই কাছাকাছি বসে। গায়ে গা লাগিয়ে।

তিনটে বেজে গেছে। বাবু অধৈর্য। আর্জান আপ্রাণে বানর ডাকছে। এমন সময় একটা খুব মন্থর ভাবে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ হয়ে ওঠে। বাবু ভয়ে কেঁপে ওঠেন। আর্জান এক হাতে তাকে চেপে ধরে রাখে।

আর্জান বাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলে, —হরিণ। হরিণ।

আর্জানের আশঙ্কা, বাবু বাঘের ভয়ে পড়ে না যান ! পড়লে আর শিকার হবে না ; তাই কোন হরিণ দেখতে না পেলেও একটু উঁকি মেরে দেখবার ভান করে বলল, —হরিণ। হরিণ।

একটু পরেই সত্যিই একটা হরিণ গাছের ধারেই এল। বাবু এবার নিশ্চিন্ত, তবে তাড়াতাড়ি গুলি করবার জন্য ব্যস্ত। বন্দুক আর্জানের হাতেই।

আর কথা বলার উপায় নেই। বাবু ধাক্কা দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে চান, —কই। গুলি কর।

আর্জান কিন্তু গুলি করে না। বাবুকে হাত দিয়ে চেপে ধরে কেবলই থামতে বলে।

হরিণ একদম গাছের নিচে এল, তবুও অর্জান গুলি করে না। কেমন যেন চিন্তান্বিত। গুলি করবার কোনও ভঙ্গি নেই। বাবুর চঞ্চলতা দেখে আর্জান অবশেষে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত দিয়ে ইঙ্গিত করল, —ওর শিঙ নেই। 'মায়া' হরিণ।

চঞ্চলা হরিণীর চোখে বিশেষ চঞ্চলতা নেই। হরিণের দৃষ্টি উপরে যায় না। তাই সে নিশ্চিন্তে গাছের পাতা খেতে লাগে। কিন্তু আর্জান কি করবে ? 'মায়া' হরিণ ! সে জেনে শুনে জীবনে কখনও 'মায়া' হরিণ হত্যা করেনি। এ শুধু 'মায়া' হরিণ নয়—গর্ভবতীও। কেমন করে সে একে হত্যা করবে ? শিকারী হয়ে শিকারীর সততা কি করে নষ্ট করবে !

কিন্তু বাবু ! তার সাহেব সৈন্যের আপ্যায়ন ! বাবু উতলা হয়ে ওঠেন। আর্জান বুঝি শেষ পর্যন্ত গুলি করবে না ! কিছুতেই তা হবে না ! রক্তচক্ষু করে আর্জানের দিকে তাকালেন। কথা বলার উপায় নেই। চোখ দিয়ে যত ভয় দেখানো সম্ভব তা আর্জানকে দেখালেন। এই রাগ শেষ পর্যন্ত কতদূর যেতে পারে, তা ভেবে আর্জান বিচলিত। তার চাকরিও হয়ত থাকবে না।

বাবু হাত বাড়িয়ে নিজেই বন্দুক ধরতে গেলেন।

আর্জান বাবুর হাত আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। এত কাছের শিকার তার চোখ লাগিয়ে নিরিখ করতে হয় না।

আর্জান কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে চোখ বুঁজে গুলি করে দিল, গর্ভিণী হরিণী যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই পড়ে গেল।

আর্জান অস্ফুট ক্ষুব্ধ স্বরে যেন একবার শুধু বলল, —'আমি মা হব। আমি মা হব।'

গোরা সৈন্যরা ঠিকমতই এসেছিল। খানাপানিও পুরাদমে চলেছিল। আর্জান কিন্তু কোনও অংশগ্রহণ করেনি। আর্জানের ক্ষোভের কারণ জানতেন বলে রসিদ আলি সাহেবও কোন পীড়াপীড়ি করেননি।

কিছুদিন পরে ইংরেজি মাসের সাত তারিখ এল। বনকর আপিসে মাইনে এসে গেছে। আর্জান মাইনে নিয়ে বাবুকে সেলাম দিয়ে বলল, —আমি বাড়ি যাব।

রসিদ সাহেব বললেন, —কেন ? মতলব কি ?

—না বাবু—আর বোধহয় চাকরি করতে পারব না। বাড়িতে বিপদ। গত হাটে খবর পেয়েছি। সংসারে ভয়ানক অসুখ-বিসুখ চলছে। —মিথ্যা কথা বলতে বাধলেও আর্জান মাটির দিকে চেয়ে বলেই ফেলল।

নিরুপায় হয়ে বাবু বললেন, —তা বেশ। অসুখ-বিসুখ সেরে গেলেই চলে এসো কিন্তু।

—দেখি। —বলেই আর্জান বিদায় নিল।

—চাকরি ছেড়ে এসেছি—বলেই আর্জান বাড়িতে উঠল। ফতিমা সামনেই ছিল। বাড়িতে এসেই তার চিন্তার বোঝা প্রথমেই ফতিমার কাছে ব্যক্ত করতে পেরে আর্জান ভয়ানক খুশি। যেন তার মাথার বোঝা নামিয়ে দিল।

ভাল হল, কি মন্দ হল, —সে-বোধ ফতিমার নেই। আর্জানকে কাছে পেয়েই আহ্লাদে আটখানা। আনন্দে সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। আর্জানের কথার কোন উত্তর তার মুখ দিয়ে বেরুল না। সেই আরক্তিম মুখে মিষ্টি হাসি হেসে আর্জানের দিকে তাকিয়েই রইল।

আর্জান এমন হাসি ফতিমার মুখে কখনও দেখেনি যেন। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর প্রায় ছুটে এসে ফতিমা দুবাহু প্রসারিত করে আর্জানের বুকে মাথা গুঁজে দিল।

আর্জান ফতিমার বাহু ধরে নাড়া দিয়ে তার মোহ ভেঙ্গে দিয়ে আদর করে বলল, —যাও, ভিতরে যাও। আমি তো এসেই গেছি। আর যাব না।

ফতিমা তাড়াতাড়ি আর্জানের পায়ের ধারে কাঠের বাক্সটা তুলতে যাচ্ছিল। কাঠের বাক্সটা আর্জানই এনেছে। বোটে তার যা কিছু থাকত তা ঐ বাক্সেই ছিল।

আর্জান ব্যস্ত হয়ে বলল, —না, না, তুমি যাও। পারবে না। আমিই নিচ্ছি।

ধীরে ধীরে আর্জান আবার পুরনো হয়ে উঠল কালিকাপুরে। সর্বদাই তার ভাবনা, কোথায় সে তার ঘর বাঁধবে। সবার সঙ্গে আলাপ করল—ধনাই মামু, কফিল, বিশে ঢালি প্রভৃতি সবার সঙ্গেই। কিন্তু কেউ কোন সমাধান দিতে পারে না। নায়েব কালিকাপুরে কোথাও এতটুকু জায়গা রাখেনি আর্জানের ঘর বাঁধবার মত।

কালিকাপুরের উত্তর পুবে ডাক্তারের আবাদ। এই গ্রামও কয়রা নদীর তীরে। তবে এর দক্ষিণ দিকে মাত্র কয়রা নদী। তার ওপারেই সুন্দরবন। নদীর তীরেই এই আবাদের কাছারি বাড়ি। তার পরেই হারেজ সর্দারের বাড়ি। তারই নামে এই পাড়ার নাম —সর্দার-পাড়া। এই সর্দার-পাড়া যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ছোট্ট একখণ্ড জমি পড়ে আছে। দুটো ভেড়ির মাঝখানে। লোনা জল ঢুকে ঢুকে এমন হয়েছে যে, এখানে দশ বছরেও কোন ফসল উঠবে না। লোনা জল বেশি উঠত বলেই ডবল ভেড়ি দেওয়া আছে।

হারেজ সর্দার আর্জানকে বলল, —আর্জান, তুমি এসো-না এখানেই। সর্দার মানুষ তুমি, 'সর্দার-পাড়া'তেই থাকবে। রাজি হও তো কাছারির সঙ্গে কথা বলি।

হারেজ ধনী চাষী। জমিদারের পক্ষেই সব সময় আছে। কিন্তু একটা গুণ আছে, —লোকে বিপদে পড়লে সে সাহায্য করতে সর্বদা অগ্রণী।

ভরসা পেয়ে আর্জান বলল, —তা বড়-মেঞা, আপনি যদি ডাকেন তো না এসে কি পারি ?

পুরনো ভিটের স্মৃতি আর্জানের মনকে পীড়িত করে। তাই সে তা থেকে নিজেকে দূরে

সরিয়ে নিতে চায়। কালিকাপুর সে ছাড়তেই চায় যেন।

কদিনের মধ্যে ঠিকঠাক হয়ে গেল। নায়েব কোনও দলিলপত্র দেবে না। ত্রিশ টাকা দিতে হবে সেলামি। এবং তা আগেই দিতে হবে। কবছর চাকরিতে আর্জান প্রায় এক-শ টাকা জমিয়েছিল। তাই সেলামির টাকা সহজেই দিতে পারে। দেখতে দেখতে আর্জান ঘর তুলে ফেলল। আর্জানের পক্ষে ঘরের জন্য বিনা পয়সায় বন থেকে খুঁটি আর গোলপাতা যোগানো বলতে গেলে কিছুই নয়।

বিনা আড়ম্বরেই আর্জান ফতিমাকে নিয়ে সর্দারি-পাড়ায় সংসার পাতলো। আর্জানের ভারি ভাল লেগেছে এই জায়গাটা। ওপারেই সুন্দরবন। তারই পাশে চর। অনেক বছর ধরেই এই চর পড়েছে। প্রায় একশত গজ চওড়া। চরে ফাঁকা ফাঁকা নতুন নতুন ঝাঁকাল কেওড়া গাছ উঠেছে। হাল্‌কা সবুজ রঙ্‌। থাকে থাকে উঁচু হয়ে যেন পুরনো গাঢ় সবুজ বনের সঙ্গে মিশে গেছে।

ওপারে চর পড়ে, —পলি মাটিতে হালকা সবুজ নতুন বন জন্ম নেয়। আর এপারে পুরনো মাটিতে লোনা পড়ে, —স্থাপিত হয় নতুন মানুষের বসতি। আর্জান বন ও মানুষের মধ্যে যেন জীবনের যোগসূত্র খুঁজে পায়।

সতেরো

আর্জানের সংসারে এখন আর দুজন নয়। এখন তিনজন— আর্জান, ফতিমা ও তাদের ছেলে। ছেলের নাম রেখেছিল তুফান সর্দার ; আদর করে সবাই ডাকত 'তুফো'। সে বছর আর্জান শুধু নতুন ঘরই করেনি। নতুন ঘরে নতুন মানুষও এসেছিল। আর্জান ভুলতে পারবে না, সেদিনের কথা, —যেদিন তার গৃহে নবজাতক কেঁদে উঠেছিল। সর্দারি পাড়ার সব ঘর থেকে মেয়েরা এসেছিল। শীতের সন্ধ্যা ছিল সেদিন ; আর্জানের বাড়ি গম্‌গম্‌ করছিল। ঘরে, আঙিনায় ও রাস্তায়, কোথাও আর্জান অন্ধকার থাকতে দেয়নি। যতগুলি পারে কুপি যোগাড় করে আলোয় আলোময় করে দিয়েছিল। —আর্জান ভুলবে না কোনদিন।

না ভুলবার আরও কারণ আছে। সে বছর থেকে আর্জান রাত্রে কখনও বাড়ি ছেড়ে বনে থাকত না। তাই বলে সে বনে যাওয়া ত্যাগ করেনি। না গিয়েও তার উপায় নেই। যে কয়েকটি টাকা পুঁজি করেছিল, তা অল্প কদিনেই শেষ হয়ে যায়। আজও পর্যন্ত কেউ জমি ভাগে দেয়নি তাকে চাষ-আবাদ করতে।

তবে বুদ্ধি করে আর্জান একটা কাজ করেছিল। বাঘ সে অনেক মেরেছে। অধিকাংশ সময় বাঘের চামড়া বা মাথার হাড় পায়নি। তবে কেউ কেউ বাঘের চামড়ার সঙ্গে মাথাটা আর নিত না। সেই সুযোগে আর্জান বাঘের মাথার হাড় আর দাঁত জমা করেছিল কিছু। সেগুলিই সে পিটেল বোট থেকে কাঠের বাক্স ভর্তি করে বাড়িতে এনেছিল।

লোনা দেশে মাঝে মাঝে গরুর মড়ক হয়। গরুর তেমন একটা অসুখে এদেশের লোক বাঘের দাঁত বা মাথার হাড় ঘষে কলা পাতায় মোড়ক করে খাইয়ে দেয়। তাতে নাকি অসুখ সেরে যায়।

আর্জানের এই হাড় থেকে তাই কিছু আয় হয়। সে যদি কিছু বেশি দাম চায়, তাও লোকে দেয়। কিন্তু ঐ কখনা হাড়ে আর কদিন চলবে। কাজেই সংসারে আবার অভাব দেখা দিল। বনকেই বুঝি তার আবার ভরসা করতে হয়!...বনে না গেলে কোত্থেকে সে

আর্জান বা করবে? দু-একদিন সে বনে গেছেও ইতিমধ্যে, কিন্তু বাধা ফতিমা।

সে আজকাল রাত্রে বনে যায় না বটে। তুফোই তাকে টেনে রাখে। তুফোকে ফেলে সে রাত্রে কোথাও যেতে চায় না। ভয়ানক ভালবাসে আর্জান তুফোকে। কিন্তু বনের দিকে দিনের বেলায় পা মাড়াতে গেলেও ফতিমা যেন আগলে ধরে আর্জানকে। কিছুতেই সে যেতে দিতে চায় না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে সে এখন ভয় দেখিয়ে বলে, —বেশ। রইল তোমার তুফো, —আমি চল্লাম। তুফোকে তুমিই দেখো।

আর্জান অমনি নরম হয়ে আসে। ফতিমা কিন্তু এতেই ক্ষান্ত হয়নি। মনে মনে তার অনেক মতলব।

কালিকাপুর ছাড়বার সময় দুঃখে ও বেদনায় ফতিমার বুক ফেটে গিয়েছিল। কালিকাপুরের ধুলো-মাটিতে সে মানুষ হয়ে উঠেছিল, কালিকাপুরের ভিটেতে সে সুখের সংসার পেতেছিল। সে মাটি ও ভিটে ছাড়তে তার প্রাণ চায়নি। চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল যেদিন সে কালিকাপুর ছেড়ে আসে। সে ভিটেমাটি অনেকদিনই তাদের হাতছাড়া হয়েছে সত্য, তবু এতদিন সে সেখানেই তারই পাশে ছিল। আজ সেই কালিকাপুর তার চোখের আড়ালে।

কিন্তু কালিকাপুরকে যখন ছাড়তেই হল, তখন সে আর্জানকেও এইবার বন-ছাড়া করবে—এই তার পণ। কালিকাপুরের দুঃখকে সে ভুলতে চায় আর্জানকে জয় করে, —আর্জানকে বন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে। সত্যসত্যই সে অনুভব করতে চায়, —আর্জানকে যে চাকরি ছাড়তে হয়েছে, কালিকাপুরও ছাড়তে হয়েছে, এ যেন তারই জয়। এতে তার জীবনে দুঃখ এসেছে, বেদনা এসেছে, অভাব অনটন এসেছে—তবু এ যেন তার জয়! এইবার সে আর্জানকে বন থেকে ছিন্ন করতে চায়। এ জয়ও সে নিশ্চয়ই করবে!

ডাক্তারের-আবাদে এসে ফতিমা শুধু নিজের ঘর-বাড়ি নিয়ে সংসার পাতেনি। গোটা সর্দার-পাড়া নিয়েই যেন সংসার পেতেছিল। কাউকে 'বু', কাউকে 'ফুফু', কাউকে 'চাচি' বলে ডেকে গোটা সর্দার পাড়া জুড়ে আত্মীয়তা পাকাপাকি করে ফেলেছে।

একদিন তো ফতিমা হারেজ সর্দারকে,বা'জান বলেই ডেকে বসল। কাউকে বাবা ডাকলে তাকে খাওয়াতে হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে কৃষক সমাজে এই রীতি চালু। নানা পিঠে বানিয়ে হারেজকে একদিন ফতিমা ঘটা করে খাওয়াল।

এই সুযোগে ফতিমা হারেজ সর্দারকে অনেক কথা শুনালো···তার সংসারের অনেক জমাট দুঃখের কাহিনী। সবার শেষে ফতিমা বলল, —আপনি দয়া না করলে আমরা বাঁচি কি করে? আপনার কথা তো সবই নায়েব মশাই মানে। একটা কিছু কাজ দেন না জুটিয়ে?

হারেজ সর্দার কথা বলতে ওস্তাদ। বলল—কার জন্য? আর্জানের জন্য! তার কাজের অভাব কি! নাম-করা শিকারী! আর্জান একবার মুখ ফুটে বললেই তো হয়। এত বড় বন পড়ে আছে। বললেই আমি বনের···

—না, না, বন না! —ফতিমা হারেজ সর্দারের মুখের কথা থামিয়ে বেমানান ভাবেই চিৎকার করে বলল।

আর্জান উঠানেই ছিল। ফতিমার প্রতিবাদ কানে আসতে আলোচনায় যোগ দিতে সেও এগিয়ে এল।

হারেজ সর্দার বলে চলে, —বুঝেছি, বুঝেছি। আমিও তো তাই চাই। ডাক্তার-আবাদের এত বড় কাছারি। —কত কাজ আছে।

আর্জান আসতেই তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, —কি আর্জান ? তুমি কি বল ?

আর্জান যেন ভরসা পেয়েই উত্তর দিল, —বনে দাঁড়িয়ে বনবিবিকে কি অমান্য করা চলে ! আপনার আশ্রয়ে আছি, যা বলবেন তাই করব ।

এরপর হারেজ সর্দার এ-কথা সে-কথা তুলে যাবার সময় ফতিমাকে আশ্বাস দিয়ে গেল, —মনে রাখব তোমার কথা ।

আর্জানের মনের যে অবস্থা তাতে সে কাছারিতে যে-কোনও কাজ পেলেই করে । অভাবের তাড়নায় এমন অবস্থায় হাজির হয়েছে যে, তার মনে কোনও বাচ-বিচার নেই । চাষবাসের জন্য জমি পাওয়া তার কাছে স্বপ্ন !···জমি থাকবে, গরু থাকবে, উঠান ভরে যাবে ফসলে, গোলা থাকবে তার উঠানে, —সবই স্বপ্ন । তাই সে-কথা আর মুখেও আনে না । সে চায় শুধু কাজ, —তা সে যে-কোন কাজই হোক ।

কিন্তু বন !···বনকে সে কি করে মুছে ফেলবে তার মন থেকে, তার জীবন থেকে । বনে গেলে সে যে ভুলে যায় জীবন-মৃত্যুর কথা, ভুলে যায় তার সংসারের কথা, অভাব অনটনের কথা । ভুলে যায় জীবনসংগ্রামে তার ব্যর্থতা, দুঃখ ও গ্লানি । এই বনকে সে কি করে ভুলবে । নিজে ভুলতে চাইলেও ভুলবার তার উপায় নেই । বন তাকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকে !

ডাক আসে তার চারদিক থেকে । এই অঞ্চলে বনে যেখানেই বিপদ, সেখান থেকেই ডাক আসে আর্জানের ।

—আর্জান ! আর্জান !

নদী থেকে ডাক শুনে আর্জান ছুটে আসে ভেড়ির উপর । ষ্টীমলঞ্চের একখানা বোট । বেনেখালি পিটেল আপিসের লোক তারা ।

—কি সমাচার ? —আর্জান অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে ।

—শীগ্‌গির চলো ! ফরেষ্ট অফিসারের ডাক পড়েছে ।

—কোথাকার ফরেষ্ট অফিসার ? —আর্জান ভয়ার্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে । তার হঠাৎ মনে হল, হয়তো বা বেদকাশীর বাবু চাকরি ছাড়বার জন্য তাকে পাকড়াও করতে এসেছে !

—আরে ! খুলনা সদরের বড়সাহেব— এফ্. ও. । —বোটের পিটেল বাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন ।

—তা, আসুন ! বসতে আজ্ঞা হোক । পান তামাক খান ।

—না, না, চলো শীগ্‌গির । তোমাকে পাব কি না ভাবছিলাম ! যদি বাঘ মারতে পার তবে ভাল পুরস্কার পাবে । বড় সাহেব নিজে বলেছেন ।

—একটু অপেক্ষা করুন । —বলেই আর্জান বাড়ির ভিতরে ফতিমার কাছে গেল । তার মত আদায় করা দুরূহ, তা জেনেও আর্জান সোজাসুজি কথা পাড়ল । পুরস্কারের কথাটাও বলল । খুলনা সদরের বড়সাহেবের ডাক ! —ফতিমা 'না' করতেও পারে না, 'হ্যাঁ' করতেও পারে না । গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ।

আর্জান আর কত দেরি করবে ! বলল, —কিছু মনে করো না, না গেলে যে মান-সম্মান থাকে না ! কোন ভয় নেই ।

ফতিমার মনে ভয়ের কথাটা যে বড় নয় তা জেনেও, অন্য কোন কথা না পেয়ে শুধু 'ভয় নেই' বলে আর্জান বেরিয়ে পড়ল ।

ছোট্ট জালি-বোটটায় যেতে আর্জানের বেশ মজা লাগছিল । সাদা ধবধবে বোট,

চার-পাঁচজনের বেশি লোক ধরে কি ধরে না। সাঁই সাঁই করে যেন ছুটে চলেছে। সাহেবী-বোট তাকে মনে করিয়ে দেয়, —সে সত্যিই আজ বড়সাহেবের কাছে চলেছে।

পথে যেতে যেতে সব ঘটনা শুনল। ওরা চলেছে কয়রা নদীর স্রোতে শিবসার একটি শাখা যেখানে মিশেছে। সেখানেই ষ্টীম-লঞ্চ নোঙর ফেলেছে। ২০৯নং লাট। সমস্ত সুন্দরবনটাই লাটের নম্বর দিয়ে ভাগ করা। এবার ১৯৪৫ সালে ২০৯নং লাটে ঘের পড়েছে। এই ঘেরে সুন্দরী গাছ প্রচুর। লোভে পড়ে বহু লোকে এখানে কাঠ কাটতে এসেছে। কয়েক শ' লোক কাঠ কাটছে। দলে দলে লোকেরা কাজ করে। যারা এসেছে তারা অধিকাংশই বিদেশী, —আবাদের লোক নয়।

ভীষণ একটা মানুষ-খেকো বাঘ এসেছে। সুন্দরবনের সব বাঘই মানুষ পেলেই খায়। কিন্তু যে-বাঘ একবার দু-একটা মানুষ শিকার করতে পারে—তার মানুষের প্রতি লোভের সীমা থাকে না। মরিয়া হয়ে সে মানুষ শিকারের সন্ধানে ঘোরে। এই ধরনের বাঘকে আবাদে মানুষ-খেকো বাঘ বলে। ২০৯নং লাটে এপর্যন্ত ছয়টি মানুষ খেয়েছে বাঘটি। এ-দল থেকে, ও-দল থেকে এক একটা মানুষ মেরেই চলেছে। দল থেকে মানুষ মারা পড়লেও সে-দল একদিন দুদিন পরেই আবার কাজে লাগে। অনেক খরচ, অনেক যোগাড়যন্ত্র করে ওরা এসেছে। কোন দলই সহসা ফিরে চলে যেতে চায় না। দলগুলির সঙ্গে বাওয়ালি আছে। তারা মন্ত্র দিয়ে কারও কাছে রুমাল, কারও কাছে ধুলো পড়ে দেয়। তাই নিয়ে বাকি লোকেরা আবার কাজে নামে। কেউ মারা পড়লে সবাই মনে করে, সে নিশ্চয় রুমাল অপবিত্র করেছিল, ধুলোকে অমান্য করেছিল—বাওয়ালির কোনও দোষ নেই।

এসব সত্ত্বেও যখন বাঘে ছয় ছয়টি মানুষ নিয়েছে, তখন ওরা বিচলিত হয়ে সদরে ফরেষ্ট আপিসে খবর দেয়। তাই বড়সাহেব হাজির। জাত সাহেব, —নিজেরও শিকারের শখ আছে। এসেই বললেন, —কই, কোথায় কি হয়েছে? দেখি আমি নিজেই শিকার করব। বেনেখালি আপিসের বাবু উৎফুল্ল ভাব দেখিয়ে বললেন, —আপনি নিজেই করবেন স্যার? তা হলে তো সবাই সাহস পাবে। কি উপায়ে শিকার করবেন, স্যার?

বড়সাহেব বললেন—কেন? গাছে মাচা বেঁধে। ছাগল সঙ্গে করেই নিয়েই এসেছি।

বড়সাহেব সুন্দরবনের খবর নিশ্চয় রাখেন। তাই বিট্ দিয়ে, বা পায়ে হেঁটে শিকারের কথা বাদই দিয়েছেন।

বাবু হাঁকডাক করে লোকজন নিয়ে কিছু দূরে এক খালের ভিতর গিয়ে মাচা বেঁধে ফেললেন। মাচার উপর গদিও উঠল। সন্ধ্যার আগেই নিচে ছাগল বেঁধে বড়সাহেব হ্যাট্-বুট্ পরে কোনমতে তো মাচায় উঠলেন।

বৃথাই কাটল সারা রাত। ধারে কাছেও বাঘ এল না।

রাত্রে সাহেবের সঙ্গে পিটেলে দু-একজন ছিল। এখন কি করা যায়, তা নিয়ে পরদিন সকালে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল। একজন পিটেলের মাঝি সাহেবের সামনে বলেই ফেলল, —সাহেব! তোমার কাম না সুন্দরবনে শিকার করা।

কথার মধ্যে একটা ঠাট্টার ভাব ছিল। ভেবেছিল সাহেব বাংলা কথা ভাল বুঝতে পারবে না।

সাহেব কিন্তু কথার ভাব বুঝতে পেরে ঠাট্টা হজম করে নিয়েই বললেন, —তোমাদের এই নোংরা বনে কি শিকার করা যায়! আচ্ছা বেশ, কে পারবে তোমাদের মধ্যে শিকার করতে?

সবাই একবাক্যে বলল—আর্জান, আর্জান সর্দার।

তাই আর্জানের ডাক পড়েছে।

আর্জানকে দেখেই সাহেব বললেন, —কে ? ...তুমি ? পারবে এই বাঘ শিকার করতে ?

—পারি না পারি সে আপনাদের দয়া। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—বেশ, তাহলে যাও। ঐ দেখো, রাইফেল, একনলা, দোনলা, সবই আছে। বেছে যেটা খুশি নিতে পার।

আর্জান সবগুলিই নাড়াচাড়া করে একটা একনলা বন্দুক আর চারটি বুলেট নিল। একনলা বন্দুকটি তার ভারি পছন্দ হয়েছে। তাছাড়া এদেশের লোকের ধারণা, একনলা বন্দুকেই ভাল নিরিখ হয়।

ছোট একটি মানুষ। খালি গা। পরনে একখানা লুঙ্গি। লুঙ্গিখানা টেনে মালকোছা দিয়ে গুটিয়ে নিল। কাঁধের উপর গামছা, তার কোণে দুটি বুলেট বেঁধে গলার সঙ্গে একটা প্যাঁচ দিয়ে ঝুলিয়ে রাখল। বাকি দুটি টোটা কোমরে গুঁজে নিল। বন্দুকটা কাঁধের উপর। দোহারা চেহারা। ফর্সা রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। বাইরে থেকে দেখে মনেই হবে না, এই লোকটির এতখানি দুর্জয় সাহস।

কপালটি চওড়া। পাতলা চুল। ছোটখাট সাধারণ মানুষ আর্জান। কিন্তু থাকবার মধ্যে আছে বেশ বড় একজোড়া গোঁফ...আধপাকা গোঁফ। আর আছে খুব শান্ত ধরনের দুটি বড় চোখ। সর্বদা বনে সতর্ক চাহনি দিতে দিতে চোখদুটি লালচে হয়ে গেছে। লক্ষ্য করলে এই চোখের একটি বৈশিষ্ট্য ধরা না দিয়ে যায় না—পলক খুবই কম পড়ে। তিন-চার মিনিটের আগে পলক পড়তেই চায় না।

আর্জান সঙ্গে কাউকে নেয়নি। একাই চলল দুর্গম গহন-অরণ্যে মানুষ-খেকোর সন্ধানে। ২০৯নং লাট ওর চেনা আছে। চেনা থাকলে কি হবে ? কোন দিকে গেলে বাঘের দেখা পাবে তার কোনও ঠিক নেই। তিন দিন আগে যেখান থেকে শেষ মানুষটি নিয়েছে, সেখানে বা তার ধারে কাছে আজও মানুষ-খেকোর থাকবার কোনও কারণ নেই। গত তিন দিন কোন দলই বনে ওঠেনি।

ঘণ্টার হিসাবে ঠিক কত আগে হেঁটে গেছে, বনের চাতালে থাবার দাগ দেখে তা অনুমান করা কঠিন। তাই খালের পাড় দিয়ে লক্ষ্য করে করে যাওয়াই ঠিক করল। কোন চিহ্ন পেলেই ধরতে পারবে, কোন জোয়ার বা ভাটার সময় মানুষ-খেকো খাল পার হয়েছে এবং কত ঘণ্টা আগে।

ছোট্ট মানুষটি হেঁটে চলেছে সরু খালের পাড় ধরে। পা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত 'প্রেম কাদা'য় বসে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে আর্জান বনের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

যতই সাবধানে আর্জান চলুক, কাদায় পা তুলবার সময় 'ভক্' করে একটু শব্দ হচ্ছে। তা হোক একটু-আধটু শব্দ। একবার খোঁচ পেলে তখন সে সতর্কে চলবে। খাল এঁকে বেঁকে বনের গহনে প্রবেশ করেছে। আর্জানও গভীর অরণ্যে এখন।

এবার খালটা একটা বড় বাঁক নিয়েছে। দুর্গন্ধের ঝলক আর্জানের নাকে আসে। বাঁকের মোড়ে একটা বড় ধরনের গাছ। বাদুড় ভর্তি। এত বাদুড় যে, গাছের পাতা সব যেন ঢেকে গেছে। কিচিরমিচির শব্দ। বনের মধ্যে এত গাছ থাকতে এই গাছটাই কেন বাদুড়ের দল বেছে নিল, তা বোঝা দুঃসাধ্য। বনের মধ্যে অতগুলি জীবন্ত সঙ্গী পেয়ে আর্জানের ভালই লাগে।

গাছটা পাশ কাটিয়ে আবার সরু খাল ধরে আর্জান চলে। মানুষ-খেকোর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কোন বানর বা হরিণেরও সাড়া নেই। বানর সাধারণত নদীর ধারেই থাকে। কিন্তু হরিণ ? নদীর চরে, বনের ভিতরে, সর্বত্রই হরিণের পদচিহ্ন। সুন্দরবনে যে-কোনও অঞ্চলেই হরিণের পদচিহ্ন অজস্র। এখানেও আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত আর্জান একটি হরিণেরও সাড়া পায়নি। তবে, তাহলে…

হঠাৎ আর্জান দাঁড়িয়ে গেছে। পা যেমন হাঁটু পর্যন্ত কাদায় দেবে ছিল, তেমনই আছে। মাত্র ত্রিশ হাত দূরে ঘুমিয়ে আছে মানুষ-খেকো।

আর্জানের দিকে নয়, আর্জানের উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। একটা গাছ কারা যেন কেটেছিল মাটি থেকে দু-হাত গুঁড়ি বাদ রেখে। গাছটা তারা নেয়নি। সেইখানেই পড়ে আছে। তারই উপর মাথা রেখে বালিশ করে মানুষ-খেকো শুয়ে আছে। দু হাত উঁচু গুঁড়িটায় মানুষ-খেকোর মাথা আড়াল পড়েছে। মাথা দেখতে না পেলেও পিঠটা দেখে আর্জান বুঝল, অতিকায় বাঘ এবং বেশ পুরনো বাঘ। পিঠটায় কালসিটে পড়ে গেছে।

আর্জান নিস্তব্ধ। কিন্তু তাকে মুহূর্তমধ্যে ঠিক করতে হবে কি কর্তব্য। গুলি করবে ? কোথায় গুলি করবে ? মাথায় আড়াল পড়েছে। দেহে এক গুলিতে ওর কিছুই হবে না। পাশে সরে গিয়ে মাথা নিরিখ করবে ? ঘুম ভাঙেনি। কেন ভাঙেনি সেটাই আশ্চর্য। পাশে সরতে গেলে শব্দ হবেই। জেগে পড়লে এই বাঘকে রোখা দায় হবে। গুলি না করে ধীরে ধীরে পালিয়ে যাবে ? তাতেও কাদায় নিশ্চিত শব্দ হবে। মানুক-খেকো যদি জেগে দেখে আর্জান পালাচ্ছে, —তাহলে রক্ষা নেই। আর যারই হোক, পলাতকের বাঘের হাতে নিস্তার নেই।

এ সবই আর্জানের জানা কথা। কয়েক সেকেণ্ড লেগেছে ভাবতে। ততক্ষণে সে গাঁট থেকে গুলি বের করে বন্দুকে পুরেছে। বন্দুক নিরিখের স্থানে এনে ঘোড়া তুলে দিল। ঘোড়া তোলার শব্দে মানুষ-খেকো চোখ মেলেছিল কিনা আর্জান দেখতে পায়নি। তবে সে মাথা উঁচু করেনি।

যতদূর সম্ভব মাথার দিক ঘেঁষে আর্জান গুলি করে দিল। কাৎ হয়ে শুয়েছিল। পুবদিকে মাথা। এক ঝাঁকানিতে পুবদিক থেকে পশ্চিম দিকে লাঠির মত সোজা হয়ে শুয়ে পড়ল। পর মুহূর্তে আচমকা ঘুম থেকে ওঠার মত চার পায়ে দাঁড়িয়ে গর্‌গর্‌ করতে করতে দক্ষিণমুখে চলল। আর্জান উত্তর দিকে চরের কাদায় দাঁড়িয়েই আছে।

গুলি-খেকো বাঘের পেছনে তখন-তখনই অনুসরণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুন্দরবনে শিকারীদের আহত বাঘের পেছনে তখন তখনই যাওয়ার রীতি নেই, নিষেধও আছে।

বাঘ অনেকক্ষণ চলে গেছে। আর্জান কয়েক কদম সরে বনের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। ফিরে আসাই ঠিক করল।

—কি খবর আর্জান ? দূর থেকে যেন গুলির ক্ষীণ আওয়াজ পেলাম ? —আর্জান ফিরে এলে সবাই এক সাথে প্রশ্ন করে।

—চলো, বলছি। —বলেই আর্জান সোজা সাহেবের কাছে গিয়ে বলল, —সাহেব, হলো না। কাছে পেয়েও হলো না। তবে আমি ছাড়ব না। বাঘ গেছে দক্ষিণ। নিশ্চিত ২০৬নং লাটে যাবে। কাল সেখানে লোকজন ও নৌকা নিয়ে যেতে চাই।

সাহেব বললেন, —সে হবে। আগে শুনি কি হলো ?

সব শুনে সাহেব ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, —ভুল করেছ দ্বিতীয়-গুলি না করে।

এমন মূর্খ তুমি।

আর্জান দৃঢ় উত্তর দেয়, —না, সাহেব! অতো মুখ্যু নই। উঠেই দক্ষিণমুখি চলতে থাকে। গুলি করলে, করতে হতো ওর পেছনে। তাতে ওর কিছুই হতো না। সুন্দরবনের বাঘকে তুমি চেন না সাহেব। দ্বিতীয়বার গুলি করলে লাভের লাভ হতো, আমি কোথায় দাঁড়িয়ে তা মানুষ-খেকো জেনে ফেলতো॥

পরদিন। আর্জান দল বেঁধে চলেছে ২০৬নং লাটে। এখান থেকে বারো মাইল দক্ষিণে। এই শিকারে সাহেবের অনুমতি ছিল বলে অনেকেই আর্জানের সাথে নৌকায় যেতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আর্জানের ছয়জন সঙ্গী হল। বেশ বড় একখানা নৌকায় খাবার-দাবার নিয়ে ওরা ২০৬নং লাটে এসে হাজির।

সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিল, তার নাম ছিদেম। বয়স বছর কুড়ি। বলিষ্ঠ যুবক। ভয়ানক শিকারের নেশা। তার একান্ত ইচ্ছা, আর্জানের সঙ্গে সে বাঘ শিকার দেখবে। আর্জান দূর-সম্পর্কে তার মামু। ছিদেম বেনেখালি পিটেল বোটে কাজ করে।

আন্দাজ মত স্থানে আর্জান নৌকা লাগিয়ে সকাল সকাল বনে উঠল। আর্জান সাধারণত কাউকে শিকারে সঙ্গে নেয় না। ছিদেম তা ভাল ভাবেই জানত। জানত বলেই সে বলল, —দেখ মামু, তুমি যদি আমাকে সঙ্গে না নাও, তাহলে তুমি বনে উঠে চলে গেলে তোমার পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে আমিও পেছনে পেছনে যাব।

ছিদেম ছিল আর্জানের ভারি অনুগত। আর্জানও খুব ভালবাসত তাকে। শিকারী হবার অনেক গুণই ছিল তার।

ছিদেমের কথায় আর্জান বলে, —না, না, তোর তা করতে হবে না। চল্ তুই আমার সঙ্গে।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আর্জান আর ছিদেম সমস্ত বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ-খেকোকে খুঁজল। কোনই সন্ধান না পেয়ে খানিকটা মন-মরা হয়ে নৌকায় ফিরে এল।

নৌকা যেখানে নোঙর করা আছে তার থেকে আধ-মাইল দূরে একটা মস্ত বড় বালুর চর। চরে অনেকখানি জায়গা নিয়ে খড়ের বন। নৌকার সবারই কেমন যেন সন্দেহ জাগে, এই খড়বনে বাঘ থাকলেও থাকতে পারে। রাত্রে সবাই পরামর্শের পর ঠিক করল, কাল খড়বনেই চেষ্টা করতে হবে।

ঘন খড়বন। মানুষের মাথার থেকেও লম্বা হয়ে উঠেছে। সকালে আর্জান একাই বন্দুকটা নিয়ে পরীক্ষা করতে গেল। প্রবেশের রাস্তা নেই। জোর করে প্রবেশ করতে গেলেই জানাজানি হয়ে যাবে। খুঁজতে খুঁজতে একটা জীবজন্তুর পায়ে হাঁটা পথ পেল। কিন্তু শুকনো খড়ের উপর কোন জন্তুর পায়ের চিহ্ন নেই। কিছুদূর এগিয়ে আর্জান আর অগ্রসর না হওয়াই ঠিক করল। এমন ঘন খড়ের বন, যে-কোনও সময় দু-হাতের মধ্যে বাঘের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তখন গুলি করলেও হাতাহাতির প্রশ্ন অনিবার্য।

আর্জান ফিরে এসে এবার সবাইকে নিয়ে চলল। তার বিশ্বাস, ধারে-কাছে কোথাও নিশ্চয় মানুষ-খেকো আছে। বেপরোয়া ভাবেই বন আর খড়বনের মুখে আর্জান বন্দুক হাতে হাঁটু গেড়ে যেন খুঁটি নেয়। নিয়েই অন্য সবাইকে ইঙ্গিত করে খড়বনে আগুন ধরিয়ে দিতে। দাউদাউ করে খড়বন পুড়ে গেল। দু-একটা বুনো শুয়োর আর খরগোস ছাড়া কিছুই বেরোয় না।

সেদিন ফিরে এসে আর কেউ বনে উঠবার নাম করে না। ভাবে, আর চেষ্টা করে লাভ

নেই। তবু আর্জানের ইচ্ছা, কাল একবার শেষ দেখা দেখে যাবে। স্বস্তি পায় না মনে—মানুষ-খেকো যাবে কোথায়?

তৃতীয় দিন। আর্জান বনে ঘুরছেই তো ঘুরছে। সঙ্গে ছিদেম আছে। থাবার চিহ্ন যে পায়নি তা নয়। পেলেও সে-সব যে অনেক দিন আগের, তা বুঝতে আর্জানের দেরি হয় না। কাজেই তা অনুসরণ করে লাভ নেই।

আর দেরি করলে নৌকায় যেতে যেতে অন্ধকার নেমে আসবে। তাছাড়া এ-কদিনে আর্জান ক্লান্তও হয়ে পড়েছে।

হতাশ হয়েই দুজনে ফিরে আসছে। বনে উঠলে কথা বলা নিষেধ। নিতান্ত আবশ্যক মত দু-একটা কথা ফিস্‌ফিস্ করে অবশ্য ওরা বলছে। নৌকার দিকে যতই এগোয় ছিদেম ততই যেন গা ছেড়ে দেয়, অসতর্ক হয়ে ওঠে। আর্জান তা দেখেই ধমক দিল, —দেখে চল্!

বনের ফাঁকে নৌকার কাছাকাছি নদীর প্রতিফলিত আলো দেখা যায়। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে ছিদেম উত্তর দেয়, —আর তো এসেই পড়েছি!

আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখতে দেখতে ওরা নৌকার ধারেই প্রায় এসে পড়েছে।

হঠাৎ ছিদেম বসে পড়ে। পাঁচ-ছয় হাত পেছনে আর্জান। ছিদেম বসতেই আর্জান তার দিকে তাকাল। ছিদেম গাছের আড়ালে বসে মামুকে দেখিয়ে দেয়।

গুটি মেরে চার পায়ে বসে গলা বাড়িয়ে নৌকা দেখছে···বন্দুকের আওতার মধ্যে আবার মানুষ-খেকো!

আর্জান মুহূর্ত দেরি করে না। ঘোড়া তোলার শব্দে মানুষ-খেকো ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল। দক্ষ শিকারী এমন সুযোগ কখনও হারায় না। তপ্ত লোহার আঘাতে মানুষ-খেকো যেখানে বসে ছিল সেখানেই পড়ে গেল। গোঙাবার সুযোগও তার হয়নি। পড়ে আছে নিশ্চল হয়ে। বিকেলের ঢলে পড়া সূর্যের আলোর রেখা গাছের ফাঁক দিয়ে তার গায়েও পড়েছে এক-আধটু।

দশ মিনিট পরে আর্জান কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে বলল, —চল্ ছিদেম! সাবাড় হয়েছে।

ছিদেম ভয়ে ভয়ে বলল, —না, মামু, আরেকটা গুলি কর।

—এক গুলিতেই শেষ করেছি। —গর্বের সুরে বলেই আর্জান কিছুটা এগিয়ে গেল। এক-তাল মাটি নিয়ে ছুঁড়ে মারল বাঘের গায়ে।

আর্জান উৎসাহের সঙ্গে বলল, —দেখ্‌লি তো—মরা, না জ্যান্ত?

হাঁ করে পড়ে আছে অতিকায় বাঘ। কানের কাছ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বিজয় উল্লাসে ছিদেম লেজটা ধরে একবার টানাটানি করল। আর্জানও সোৎসাহে বলল—দেখিছিস্ ছিদেম, ডান হাতের ধারে এই দাগটা! সেইদিন যে গুলি করেছিলাম্, তারই দাগ।

দুজনেই তাড়াতাড়ি নৌকায় এল। সকলেই এবার মেতে ওঠে জয়ের উল্লাসে। বাঁশ, দড়ি ও কাছি নিয়ে সবাই নেমে পড়ল। মানুষ-খেকোকে ওরা এবার বাঁধাবাঁধি করে নৌকায় নিয়ে আসবে।

আর্জান বাধা দিয়ে বলল, —দেখো! আজ রাত্রে না-ই বা আনলে। নৌকায় আনলে আজ আর ঘুমোতে হবে না। এমন গন্ধ ছাড়বে যে কেউ টিকতে পারবে না।

তবু দড়ি কাছি হাতে করেই সবাই বাঘ দেখতে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর্জানের কথায়

বাঘকে বনেই রেখে সে-রাত্রের মত সবাই নৌকাতে এল।

নিশ্চিত দুশো টাকা পুরস্কার মিলবে। বড়সাহেব নিশ্চয় এখনো আছে। কালই পুরস্কার আদায় করবে। আনন্দ আর ধরে না। নৌকায় যে-কয়টি মুরগি ছিল সবই জবাই করা হল। মনের আনন্দে চলল খাওয়া-দাওয়া।

পরদিন, বেশ ভোরে সবাই উঠেছে। বাঁশ, দড়ি ও কাছি নিয়ে সবাই একসঙ্গে মানুষ-খেকোকে আনতে চলল।

এসে দেখে—কি আশ্চর্য। বাঘ নেই। সবাই হতভম্ব। আর্জানের মুখেও কথা নেই। সেও হক্‌চকিয়ে গেছে। এমন যে হতে পারে, তার কল্পনার বাইরে।

ছিদেম ব্যঙ্গ করে বলল, —বলিনি তখন মামু, আরেক্টা গুলি করতে? কি? এবার দেখো আমার কথা ঠিক কি না?

আর্জান শান্তভাবেই বলল, —তোর কথাই ঠিক। কিন্তু আমি তো জীবনে এমন ঘটনা কখনও শুনিনি। মাথায় গুলি খেয়ে পড়ে গেছে, তারপর আবার বেঁচে উঠল।

—তাহলে বলো, মানুষ-খেকো কাল মরেনি।

—তাই বা বলি কি করে? কাল তো তুই লেজ ধরে টানাটানিও করলি। দেহে গুলি করলে ওরা বেঁচে ওঠে—ওতে যেন ওদের কিছুই হয় না। সে খবর আমি জানি। কেন? কাল তুই তো দেখলি—সেদিন মানুষ-খেকোর হাতের পাশে যে গুলিটা করেছিলাম। যেন ওর কিছুই হয়নি। রক্তের দাগও খুঁজে বের করা দায় ছিল। কীভাবে বাঁচে জানিস্? বাঘের চামড়া তুলতুলে নরম। ধরে একটু টানলেই উঁচু হয়ে আসবে আধ হাত। গুলি খাওয়ার পর একটু নড়াচড়া করলেই চামড়ার ছেঁদাটা সরে যায়। মাংসের ছেঁদার মুখ তখন পাশের চামড়া আটকে দেয়। রক্তপড়াও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ভাবছি, মাথায় গুলি খেয়ে মানুষ-খেকো বাঁচল কি করে? এমন আশ্চর্য কাহিনী কখনও শুনিনি!

আর্জানের মনে যখন এইসব চিন্তা তোলপাড় করছে, তখন আর সবাই কিন্তু শুধু আপশোষ করেই মরছে। কেন কাল রাত্রেই নৌকায় নিয়ে আসা হল না। হলই বা দুর্গন্ধ! নৌকায় না আনলেও কেন ওর চার হাত পা বেঁধে মালে ফেলে রাখা হল না! কেনই বা টেনে নৌকার ধারে নিয়ে রাখা হল না। তাহলেও তো জ্যান্ত হয়ে উঠলে কেউ না কেউ ঠাহর পেত। —আপশোষের যেন অন্ত নেই!

না পাওয়া গেলে বিশেষ দুঃখ ছিল না, কিন্তু এ যে পেয়েও পেল না! এই দুঃখে ওদের গা জ্বলে যায়। সারা দিনটা কেটে গেল নৌকায়। আর্জান বিশেষ কথা বলে না। সে যেন কিসের একটা অশুভ সঙ্কেত মনে করছে। তা না হলে কোনও কারণ খুঁজে পাবে না কেন? সারাদিন ধরে কিছুই ঠিক করতে পারে না। নৌকাতেই বসে বসে কেটে গেল। মোটামুটি স্থির হল, কাল যা হয় করা যাবে।

পাঁচ দিনের দিন। সবাই ভোরে উঠেছে। আর্জান এটা-ওটা কাজ করে কিন্তু কথা বিশেষ বলে না।

—কি হল গো মামু? শিকারে যাবে না নাকি? কোনই তোড়জোড়ের ফিকির নেই যে? —ছিদেম আর্জানের ভাবগতিক দেখে প্রশ্ন করল।

আর্জান যেন ছিদেমের কথা শুনতেই পায়নি। চুপ করে বসেই আছে। ছিদেম কাছে এসে আবার প্রশ্ন করল, —কি গো মামু, তোমার মতলবখানা কি বলো তো?

—না, যাব না।

আর্জানের কথা শুনে সবাই ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরল। যেন একসঙ্গেই প্রশ্ন করল,

—কেন ? কি হয়েছে ?

আর্জান এক কথায় জবাব দিল—না, যাব না।

সবাই অবাক হয়ে যায়। আর্জানের গোঁ দেখে সবাই এবার ব্যঙ্গের সুরে নিজেরাই বলাবলি করে :

—ও বুঝেছি। বড় শিকারী এবার ভয় পেয়ে গেছে।

—আরে না! শিকারীর মায়া জেগেছে। মরা বাঘ জ্যান্ত হয়েছে কি না, তাই মায়া হচ্ছে।

—আরে তাও নয়! আসলে বন্দুকটাই খারাপ। তাই ওর গুলিতে বাঘ মরল না।

ঠাট্টায় আর্জান বিরক্ত হয়ে বলেই বসল, —না, আমি যাব না। রাত্রে আমি 'খোয়াব' দেখেছি। বাঘটা ছিল বনবিবির বাহন। বনবিবি আমাকে বারণ করে বলেন, —'আমার এই বাহনকে মারবার চেষ্টা কোরো না।' বনবিবি নিজে এসে মানা করলেন।

স্বপ্নের কথা শুনে প্রথমে সকলে হক্‌চকিয়ে গেল। ছিদেম একটু চুপ করে থেকে বলল, —না মামু, এ তোমার বানানো কথা! বনবিবির বাঘ এটা হবে কেন ? বনবিবির বাঘ কি মানুষ খেয়ে বেড়ায়! বনবিবির বাঘ কি মানুষে দেখতে পায়!

ছিদেমের কথায় সবাই সাহস পেয়ে আবার ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করল।

বিদ্রূপে বিরক্ত হয়ে আর্জান শেষপর্যন্ত বলল, —আচ্ছা, যাব কিন্তু একটা শর্ত আছে। আমার সঙ্গে কেউ যাবে না। আমি একাই যাব।

ছিদেম শর্ত শুনেই বলল, —না, মামু, তা হবে না। আমি যাব। তুমি আর কাউকে নিয়ো না। কিন্তু আমি যাবই যাব।

ছিদেম নাছোড়বান্দা। শেষপর্যন্ত তাকে সঙ্গে নিতেই হল।

আর্জান ও ছিদেম আবার মানুষ-খেকোর সন্ধানে চলল। এবার তাদের কাজ অনেকটা সহজ। কাল যেখানে গুলি খেয়ে নিস্তব্ধ হয়, সেখান থেকেই থাবার খোঁচ দেখে দেখে এগিয়ে চলল।

চলেছে তো চলেছেই। কত মাইল যে এগিয়ে গেছে তার ঠিক নেই। মানুষ-খেকো এঁকে বেঁকে এ-বন থেকে সে-বন, এ-ঝোপ থেকে সে-ঝোপ করে এগিয়ে গেছে। কোথাও কোথাও শুয়ে গড়াগড়ি দিয়েছে, —তার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। একবার একটা ভিটের দিকে গেছে। আর্জান অমনি শিকারের সতর্কতা নিয়ে চুপিসারে এগিয়ে গেল, কিন্তু সেখানে দেখে মানুষ-খেকো নেই। সেখানে এমন লুটোপুটি খেয়েছে যে সারা ভিটেময় লোম ছড়িয়ে আছে। দুজনে আবার পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চলে।

সামনে একটি খাল। বেশ বড় খাল পঞ্চাশ হাত চওড়া হবে।

জল পর্যন্ত পায়ের চিহ্ন দেখে ছিদেম চুপিচুপি বলে, —দেখেছ মামু ? এখানে পানি খেতে নেমেছিল।

—দূর বোকা! ঐ দ্যাখ্, ওপারেও খোঁচের মত দেখাচ্ছে। সোজা পার হয়ে গেছে। চল্, পার হতে হবে।

দুজনেই কাপড় খুলে মাথায় কাপড় আর গামছা বাঁধল। ছিদেম মাথা বাঁচিয়ে আর আর্জান মাথা ও হাতের বন্দুক উঁচু করে সাঁতরে পার হল।

এপারে উঠে কাপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে আবার পদচিহ্ন অনুরণ করে এগিয়ে চলে। খালটি ছেড়ে এক মাইলেরও বেশি এগিয়ে গেছে। সুন্দরবন সাধারণত যেমন পরিষ্কার

থাকে, এখানে ঠিক ততটা পরিষ্কার নয়। ছোট গাছ-গাছড়া যেন একটু বেশি।

চলতে চলতে আর্জান খোঁচের দিকে হঠাৎ একবার তীক্ষ্ণ নজর দেয়, তারপর দুপাশে গাছ-গাছড়ার দিকে তাকিয়েই চিৎকার করে ওঠে। কোথায় গেল চুপিচুপি ইসারায় ইঙ্গিতে কথা, কোথায় গেল শিকারীর সতর্কতা! আর্জান চিৎকার করে উঠল, —সাবধান ছিদেম! বাঘ চক্র দিয়েছে। সাবধান।

মানুষ-খেকো শিকারী-বাঘের এ এক অভিনব চাতুরি। সব বাঘই ভালো শিকারী হয় না। অনেক অভিজ্ঞতার পর মানুষ-খেকোরা এই বিদ্যা আয়ত্ত করে। যখন বোঝে কোনও শিকারী তার পেছনে লেগেছে, তখন সে আশপাশে লুকিয়ে ওৎ পাততে যায় না। তা করলে ঝানু শিকারী খুব সতর্কতার সঙ্গে খোঁচ অনুসরণ করে বাঘকে সামনা-সামনি আক্রমণ করবেই। তাই মানুষ-খেকো আধমাইল-ব্যাপী গোলাকারে ঘুরতে থাকে।

গভীর অরণ্যে এক মহাবিপদ আছে। সহসা দিক-হারা হয়ে পড়তে হয়। সাধারণ শিকারী বুঝতেই পারে না, —সে সোজা হেঁটে চলেছে, না গোলাকারে হেঁটে চলেছে, বিশেষ করে সে-গোলাকার যদি দীর্ঘ জায়গা জুড়ে হয়। সুন্দরবনে চারিদিকে প্রায় একই গাছ, একই দৃশ্য। আর সূর্য যদি একটু মাথার উপরে ওঠে, তাহলে তো দিক্‌ভুল হবেই হবে।

মানুষ-খেকো তারই সুযোগ নেয়। শিকারী পিছু নিলে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে গোলাকারে দ্রুত চলতে থাকে। এক চক্রপূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অলক্ষিতে সে শিকারীর ঠিক পেছনে এসে পড়ে। শিকারী ভাবে বাঘ তার সামনে ; বাঘ ততক্ষণে তার পেছন থেকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আর্জান অভিজ্ঞ শিকারী। কিন্তু সে এতক্ষণ বুঝতে পারেনি। যে মুহূর্তে বুঝল, সেই মুহূর্তে চিৎকার করে উঠল, —সাবধান। ছিদেম, বাঘ চক্র দিয়েছে। সাবধান!!

আর্জান কথা শেষ করার সুযোগ পেল না। মানুষ-খেকোর বজ্রহুঙ্কারে মিলিয়ে গেল আর্জানের সাবধান-বাণী। আর্জান সামনে, তিন-চার হাত পেছনেই ছিদেম। মানুষ-খেকো ছিদেমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ে এক কামড় দিয়ে এক চাপে মট্ করে ঘাড় ভেঙে উধাও হল। মাত্র দুই সেকেণ্ড সময়। যেন উড়ে এসে উড়েই চলে গেল। আর্জান বন্দুক ঘুরিয়ে ধরবারও অবকাশ পেল না।

আর্জান লাফিয়ে পড়ে ছিদেমকে টেনে তুলল। রক্তস্রোতে ভেসে গেছে। বুকে হাত দিয়ে বুঝল, ছিদেম জীবিত নেই। মৃত দেহ মাটিতে রেখে আর্জান দাঁড়িয়ে পড়ল। মানুষ-খেকোর কি আর কোনও মতলব আছে? আর্জান চঞ্চল হয়ে ওঠে। না, তার কোন চিহ্ন নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে চারদিকে। এই ছিল কপালে? খোয়াব? স্বপ্ন? সে তো নিষেধই করেছিল। সে নিজেও আসতে চায়নি। ছিদেমকে তো সঙ্গে আনতেই চায়নি। কেন সে এল? কেন তুই এলি? মরতে এসেছিলি? বললাম বনবিবির কথা। বেশ, বনবিবির কথা না হয় না শুনলি, আমার কথা শুনলি না কেন? না, মানুষ-খেকো আর আসবে না। ও খাওয়ার লোভে আসেনি ; তাহলে তো ছিদেমকে নিয়েই যেত। আর আসবে না। প্রতিশোধ নিতে এসেছিল। একটুও অবসর দিল না। বন্দুক তুলবারও সময় হল না।

—হল না! চল্ এবার! চল! —জোরেই বলল, আর্জান বেশ চিৎকার করেই বলল। বুকভরা বেদনার দীর্ঘ নিশ্বাস চিৎকার করেই নিঃশেষ করল। তারপর, ছিদেমের রক্তাক্ত মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিল। নিজেদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করে নৌকায় ফিরে এল। বন থেকেও ফিরে এল সেবারের মত।

আঠারো

ছদিন পর আর্জান বাড়িতে ফিরে আসে। ফতিমা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে দিন গুনছিল। আর্জান আসতেই তুফোর আনন্দ আর ধরে না। মায়ের কোল থেকে প্রায় জোর করে নেমে আর্জানের কাছে ছুটে গেল।

আর্জান তুফোকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। বনের খবর, পুরস্কারের কথা কিছুই বলে না। ফতিমা আর অপেক্ষা করতে না পেরে নিজেই কথা পাড়ল, —কই। খবর তো কিছুই বললে না? কত টাকা পেলে, দেখি?

আর্জান হাসতে হাসতে বলল, —নাঃ, কিছুই হয়নি।

—তা বললে হবে কেন? ছদিন বনে কাটিয়ে এসেছ। তোমার সব মিথ্যা কথা। সাহেব-টায়েব কেউ আসেনি তাহলে?

ফতিমার মনে বিশ্বাস আনবার জন্য আর্জান সব ঘটনা বিশদ ভাবেই বলল। শুধু বলল না ছিদেমের ঘটনাটি। আগে থাকতেই ঠিক করে এসেছিল ছিদেমের কথা ফতিমাকে কিছুতেই বলবে না। এই ঘটনা শুনলে ফতিমা কি করবে তার ঠিক নেই। কিন্তু বিপদ এলো অন্য পথে।

কাহিনী শুনে ফতিমা ঝঙ্কার দিয়ে বলল, —বলিনি আমি? আমার কথা বনবিবি নিয়েছেন। তাই 'খোয়াবে' কথা বলেছেন। খবরদার। তুমি আর বাঘের পেছনে যাবে না।

আর্জান অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে ব্যস্ত ভাবে বলল, —না, না গো না—সব বাঘ না! সব বাঘই কি বনবিবির বাহন হয়?

—হয় না তো কি! সব বাঘই বনবিবির বাহন!

ফতিমা কথাগুলি এত জোর দিয়ে বলল যে আর্জান দ্বিতীয়বার প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। ফতিমা কিন্তু এখানেই শেষ করেনি। এর পর যখনই বনের কথা উঠেছে, তখনই বনবিবির স্বপ্নের কথা তুলে আর্জানকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে।

কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যায় ফতিমা হাসিখুশি মন নিয়ে আর্জানকে বলল, —কাল সকালে তুমি একবার কাছারি-বাড়ি যেয়ো,⋯বড়মেঞা যেতে বলেছেন।

কাছারির ডাক শুনতেই আর্জানের মনে আশঙ্কা জাগে। ডাক্তার-আবাদের ভিটাও বুঝি তার হাতছাড়া হয়, —এই তার ভাবনা।

ফতিমা আশ্বাস দিয়ে বলল, —না গো না, তোমার কোন ভয় নেই। ভালই হবে। কালই যেয়ো।

ফতিমা অনেক কথাই পাড়ল। ডাক্তার-আবাদের অনেক মারপ্যাঁচের কথা উঠল। আজকাল ডাক্তার-আবাদের কাছারির সঙ্গে মহেশ্বরীপুরের কাছারির নাকি ভয়ানক বিবাদ চলছে। বিবাদের বিষয় হল, একটি খালের মাছ ধরা নিয়ে। জমিদারে জমিদারে ঝগড়া হলে হারেজ সর্দারের দাম বেড়ে যায়, প্রতিপত্তিও বেড়ে যায়। তার লোকজনও দরকার হয় এই সময়। তাই ফতিমা খুশি হয়ে অনেক কিছু আশা করছে।

কথামত আর্জান সকালেই কাছারিতে হাজিরা দিল। ফতিমা হাজার আশ্বাস দিলেও তার মনের আশঙ্কা কিন্তু দূর হয়নি।

দূর থেকে আর্জানকে দেখতেই হারেজ সর্দার কাছে ডেকে নিয়ে বলল, —আর্জান, বুঝলে কাল তোমাকে যেতে হবে চৌকুনির কাটা-খালে। জবরদখল করতে হবে। জবরদখল করে কাটা-খালে মাছ মারতে হবে।

—বড় মেঞা। আমি তো ওসব কাজে নামিনি কোনদিন। আমি ওসব পেরে উঠবো না। —আর্জান অনুনয়ের সুরে উত্তর দেয়।

—সে কি! তুমি অতবড় শিকারী! কিছুই করতে হবে না, শুধু কাছারির বন্দুকটা নিয়ে খাল ধারে বসে থাকলেই হবে। —হারেজ জবরদখলের কাজটি যেন সহজ করে দেখাতে চাইল।

তবুও হাঁ বা না, কোন কিছুই না বলে—এর নাম, তার নাম প্রস্তাব করে আর্জান কোনমতে বাড়িতে ফিরে এল।

হারেজ বুঝল, আর্জানকে দিয়ে এ কাজ হবে না। অসন্তুষ্টও হল। দয়া-দাক্ষিণ্য সে খুব করত। সে দেখেছে তাতে তার মান, সম্মান, প্রতিপত্তি বাড়ে। লোকবল তার হয়। এই লোকবলের জন্য জমিদারের কাছারিতে তার এত আদর। জমি জোরজবর-দখল লেগেই আছে এই অঞ্চলে, এবং সে-ব্যাপারে হারেজের উপরই ডাক্তার-আবাদের কাছারির ভরসা।

হারেজ আগে ভেবেছিল, আর্জান নামকরা শিকারী। সে থাকলে এইসব কাজে খুব সুবিধা হবে। কিন্তু এবার আর্জানের ব্যবহারে মনঃক্ষুণ্ণ হল।

আর্জান এমনিতেই এইসব ব্যাপার পছন্দ করে না, ভয়ও আছে। তাছাড়া, কাছারি আসবার আগে মহেন্দ্র ঘটক তাকে ডেকে বলেছিল, —দ্যাখো, এসব ঝগড়াঝাঁটি, মারামারির মধ্যে তুমি যেয়ো না।

মহেন্দ্র ঘটক আর্জানের জীবনে নতুন লোক। বাড়ি তার খুলনা সদরের পুবে ডুমুরিয়া থানায়। ঘটকালি করার বংশ। কিন্তু সে অনেক কাল আগের কথা। এখন ব্যবসা করে বেড়ায়। সম্প্রতি মাছের ব্যবসা করে, —শুটকি মাছের ব্যবসা।

শীতের শেষে সুন্দরবনে প্রচুর চিংড়ি মাছ ধরা পড়ে। ডিঙিগুলি চিংড়ি মাছে ভর্তি হয়ে যায়। সুন্দরবনের শুটকি চিংড়ি ভারি মিষ্টি। তাই ব্যবসায়ীদেরও অভাব নেই। বনের সীমানায়, নদীর তীরে তীরে মাছ শুকিয়ে চালান দেবার 'খটি' বসে যায় অগণিত।

মহেন্দ্র ঘটক 'খটি' বানিয়েছে কয়রা ও মৈশালী নদীর মোহনায়। আর্জানের বাড়ি থেকে সিকি মাইল দূরে। গ্রামের মধ্যে আর্জানের বাড়িই খটির সব থেকে কাছে।

এই সব মালিকদের কাছারির সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি লেগে যায়। শুটকি মাছের ব্যবসায়ে বেশ লাভ। জমিদারেরা সহ্য করতে পারে না। কাছারির তরফ থেকে যতদূর সম্ভব সেলামী আর খাজনার বোঝা এদের উপর চাপাবার চেষ্টা চলে।

মহেন্দ্র ঘটক চালাক ব্যবসায়ী লোক। কাছারির লোকেরা যাতে বিশেষ জব্দ করতে না পারে, তার জন্য আশপাশের গ্রামবাসীদের সঙ্গে খুব খাতির করে নিয়েছে। সেই সূত্রেই আর্জানের সঙ্গে ঘটকের আলাপ।

তাছাড়া আর্জান এই খটিতে কাজ করে কিছু পয়সাও পায়। কাজেই সম্পর্কটা একটু ঘনিষ্ঠও হয়েছে।

আর্জানের ঘরের দাওয়ায় একদিন ওরা দুজনে বসে ছিল। পাশে ফতিমা পান সাজছিল। উঠি উঠি করে না উঠে ঘটক আর্জানকে প্রশ্ন করল,—আচ্ছা, তোমার জমি গেল, বাড়ি গেল, কিছুই করলে না?

আর্জান বলল, —কি আর করব? হাতে এক পয়সাও ছিল না যে নায়েবকে খুশি করব!

ঘটক আবার প্রশ্ন করল, —কালিকাপুরের লোকেরা কিছুই করল না?

আর্জানের কথায় হতাশার সুর, —তারা আর কি করবে বলুন?

ফতিমা এবার মুখ খুলল, —পাড়াপড়শিরা? কেউ যদি একটা কথা বলে। টুঁ শব্দও

করল না।...তারা কি করবে ? যে করলে করতে পারত, সে-ই কিছু করল না। ধনাই মামু একটা কথাও বলল না। উনি ? উনি তখন তো বনে বনে। কত কাঁদাকাটি করলাম। কত রাগারাগি করলাম। কেউ কিছু বলল না।

ঘটক বিস্ময়ে বলল, —আবাদের লোকেরা অমন কেন ! আমাদের ডুমুরিয়া পরগনায় হলে কি হত জান ? কেউ চুপ করে থাকত না—পাড়াপড়শি, গ্রামবাসী, কেউ চুপ করে থাকত না। জমিদারদের এত দাপট !...যাক্, চলো আর্জান, খটিতে যাবে নাকি ?

ফতিমা ঘটকের কথায় উৎসাহিত হয়ে বলল, —ঠিক কথা, ঠিক কথা ! আবাদের লোকে কেউ কিছু বলল না। কিছু বললে কি অমন করে আমার ভিটেমাটি চলে যেত !

আর্জান মাথা নিচু করে চুপ করেই আছে। অতীতের দিনগুলির কথা তার মনে পড়ে। স্বপ্ন জাগে মনে, গ্রামবাসী সব যদি এক হয়ে দাঁড়াত ! ঘটকের কথা যদি সত্যি হত !

আর্জানের পিছনে চার বছরের তুফো লাঠি নিয়ে একটা মাকড়সার জাল ভাঙছিল। জালে একটি মাছি পড়েছে।

সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই মহেন্দ্র ঘটক বলল, —দেখেছ আর্জান !...মাকড়সার জাল পাতা ! একলা কিছু করতে গেলেই ঐ মাছির মত জড়িয়ে মরতে হবে। এই জাল ছিঁড়ে তুমি একলা কোথাও যেতে পারবে না। কালিকাপুরেই থাক, আর ডাক্তার-আবাদেই থাক ! একটা সুতো কাটবে তো আরেকটা সুতো তোমাকে জড়িয়ে দম বন্ধ করে দেবে। একলা এর কবল থেকে রেহাই পাওয়া যায় না ! —বলেই ঘটক তুফোর হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে মরা মাছিটাকে সামনে নিয়ে এল।

লাঠি কেড়ে নিতেই তুফো কেঁদে অস্থির। আর্জান তাড়াতাড়ি ফতিমার কাছ থেকে পান নিয়ে ঘটকের হাতে দিয়েই ছেলেকে কোলে নিল। বলল,—চলুন, এবার খটিতে যাই।

ঘটকের প্রতি আর্জানের আকর্ষণের আরেকটা কারণ ছিল। ঘটকের একটা দোনলা বন্দুক আছে। ঘটকের শিকারের বড় শখ। মাঝে মাঝে আর্জানের সঙ্গে হরিণ শিকারে যেত। কিন্তু এখন তার শখ, একটা বাঘ শিকার সে করবে। ইতিমধ্যে একবার আর্জান একলা হরিণ শিকার করতে গিয়ে একটা বাঘ মেরে আনে। তারপর থেকে ঘটকের ইচ্ছা আরও বেড়েছে। একটা বাঘ শিকার সে করবেই।

আর্জানকে বললেই সে বলত, —না, ও-কাজ করবেন না। দুজনে শিকারে যাবেন না। ওতে বিপদ আছে !

ঘটক তার উত্তরে বলত, —তবে তুমি আমাকে একা যেতে বল ?

—একা গিয়ে আপনি পারবেন কেন ? ওভাবে হয় না। বাঘের দেখা ভাগ্যের কথা। ঐ হরিণ শিকার করতে করতে যদি 'বড়মেঞা'র সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তবেই মারবেন।

—না, তা হয় না ! তার মানে, আমার আর বাঘ শিকার হবে না ! আচ্ছা, চলো না, দুজনেই বন্দুক নিয়ে যাব। তুমিও বন্দুক নেবে, আমিও নেব।

—দুজন ! তাতে আবার দুই বন্দুক !...আরও বিপদ ! দুই ঘোড়া তুলে বাঘের পেছনে কাছাকাছি চলা-ফেরা করা, —ও কাজ করতে নেই, বাবু ! সে মূর্তি দেখলে কারও চেতনা থাকে না। কখন কীভাবে ঘোড়া-তোলা বন্দুকে চোট্ হয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। তা হয় না !

—তোমার কেবল 'তা হয় না', 'তা হয় না'—তবে কি হয় ?

—আচ্ছা, আপনার যখন অতই শখ, এক কাজ করা যাবে। তবে এ বছর না। সামনের সনে যখন আসবেন তখন একটু আগে আগেই আসবেন। একটা নতুন ফন্দি আঁটা যাবে।

উনিশ

হারেজের রাগের-ভাজন হবার সঙ্গে সঙ্গেই আর্জান বুঝেছিল, এর মাশুল দিতে হবে। কিন্তু সে যে এত শীঘ্র, তা ধারণাও করেনি। হারেজের আরও রাগের কারণ ছিল, —মহেন্দ্র ঘটকের সঙ্গে আর্জানের অত মেলামেশা সে পছন্দ করত না।

একদিন আর্জানকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে হারেজ বলল, —সেই যে সেলামী দিয়ে সর্দার-পাড়ায় এসে বসেছ, তারপর তো আর কিছুই দিলে না। জমিদারকে আমি কি করে খুশি রাখব ? পাঁচ-ছয় বছর তো হয়ে গেল, এবার কিছু দাও।

আর্জান কথা কমই বলে। চুপ করেই আছে। কিন্তু মনে মনে অনুভব করে,—বড়মেঞার মুখ দিয়ে যখন একবার কথাটা বেরিয়েছে তখন তাকে অবমাননা করা ঠিক হবে না। বড়মেঞাকে আর বেশি রুষ্ট করা উচিত নয়। ঝপ্ করে বলেই ফেলল—তা বড়মেঞা আপনি বললে আমি দিতে বাধ্য থাকব। কিন্তু...

—না, না, কিন্তু-টিন্তু নেই। যা হয় পারো দিয়ো।

এর পর থেকে আর্জানের মন ভারাক্রান্ত। কোত্থেকে টাকা এনে সে বড়মেঞাকে খুশি করবে। রাত্রে ফতিমাকে সব বলল। সেও কোন উপায় বলতে পারে না। কিন্তু এই গৃহের প্রতি ফতিমার মায়া অপরিসীম। এর থেকে সে যেন আর বিতাড়িত না হয়। এই গৃহ যে তারই নিজ-হাতে সাজানো। ফতিমার মনের এই আবেগ আর্জান তার প্রতি কথায় যেন অনুভব করল।

পরদিন আর্জান মন দৃঢ় করেই প্রস্তাব করল, —গরুটাই বিক্রি করে দিই। এক বিশ ধান পাওয়া যাবে। কি বল ?

ফতিমা সায় দিল,—বেশ, তাই কর। বড়মেঞাকেও কিছু টাকা দেওয়া যাবে, আর আমাদের কয়েক মাসের খোরাকও হবে।

ফতিমার এই রাজি হওয়াটা হঠাৎ নয়। কাল সারা রাত ধরে সে ভেবেছে। কোনও পথ পায়নি। হারেজের কথার উপর সে মিছামিছি নির্ভর করেছিল,—তাকে 'বা'জান' ডেকে আবেদন জানিয়েছিল আর্জানের যে-কোনও একটা চাকরির জন্য। এই তার প্রতিদান। এই সংসারে আবেদন-নিবেদনের কি কিছুই মূল্য নেই ? চিন্তার স্রোত তার গুলিয়ে যায়। কিন্তু এখন সে কি করবে ? গরুটার প্রতি তার ভয়ানক মায়া। তবু ক্ষুব্ধ মনে নিজে নিজের কাছেই প্রস্তাব করল,—দিক্, আর্জান গরুটা বিক্রি করেই দিক্। গভীর রাতে চোখ মেলে তাকাল। চারিদিকে অন্ধকার। আবার চোখ বুঁজে নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দেয়, —তা হোক্, যাক্ সব যাক্। আর্জান নিঃস্ব হয়ে যাক্। তা না হলে সে বুঝি বন ছাড়বে না। নিঃস্ব হয়ে সে যদি বন ছাড়ে, তবুও তার ভাল। কিন্তু তারপর ?...ঘটক। আসুক এবার ঘটক। সে হয়ত একটা কিছু পথ দেখাতে পারবে। অন্ধকারে ভরসার নিশানা পেয়ে ফতিমা তখনকার মত ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়ে আর্জান তার শেষ সম্বল গরুটি পরদিন বিক্রি করে দিল। হারেজ সর্দারকে দশ টাকা দিয়ে, সে বাকি টাকার ধান ঘরে আনল।

কিন্তু তাতে আর কদিন চলবে। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ চলল, আষাঢ়ও চলল। শ্রাবণ মাস, মাঠে কাজ পাওয়া যায়। পরের খেতে জন খেটে শ্রাবণ মাসও গেল কোন মতে। কিন্তু তারপর ? ঘটকের খটি পড়তে এখনও পাঁচ মাস বাকি। সে এলে আর্জানের কাজ বাঁধা আছে। কিন্তু সে যে অনেক দেরি।

কোনও পথ নেই। আর্জান হারেজ সর্দারের দ্বারস্থ হল। বড়মেঞা টাকা পেয়ে আর্জানের উপর কিছুটা খুশিই ছিল। বলল, —বেশ, তা এক কাজ কর। তুমি 'ঘোঘা'র তদারক কর। ধান কাটা অবধি তোমার এ কাজ রইল। মাসে মাসে খোরাকি ধান পাবে।

ভেড়ি তদারকের কাজ সাধারণত প্রজাদের ভাগের ভাগ করতে হয়। কিন্তু ডাক্তার-আবাদে ভেড়ির দায়িত্ব কাছারির হাতে। কাজেই অন্য আবাদে যেখানে বিঘা প্রতি দুই টাকা নিরিখ, ডাক্তার-আবাদে সেখানে আড়াই টাকা নিরিখ। তদারকের খরচ কাছারির। হারেজ তদারকের ধান কাছারি থেকেই নেবে। তবু লোক ঠিক করার ভার তারই হাতে।

আর্জান খুশি হয়ে সেলাম দিল। এ দেশের চলতি রীতি অনুযায়ী হাত বাড়িয়ে আশিস ভিক্ষা করে বলল, —যে আজ্ঞে, 'আশে' বড়মেঞা —বলেই আর্জান বিদায় নিল।

—নে, আর 'আশে' ভিক্ষে করতে হবে না। পূর্ণিমা অমাবস্যায় ভেড়ির কোল-ছাড়া হলে চলবে না কিন্তু আর্জান।

ফতিমা খবর শুনেই খোদাতাল্লার নাম স্মরণ করল। আনন্দে অধীর হয়ে তুফোকে জড়িয়ে ধরল।

আনন্দের আতিশয্য দেখে তুফো চিৎকার করে প্রশ্ন করে,—কি? কি? কি?

ফতিমা ব্যগ্র হয়ে বলল, —তোর বা'জান এবার কাঁকড়া মাছ শিকার করে বেড়াবে।

তুফো শুনেই আব্দারের সুরে বলল, —আমি কাঁকড়া মাছ খাব। আমি কাঁকড়া মাছ খাব।

—দূর বোকা! আমরা কি কাঁকড়া মাছ খাই! মুসলমানের পোলা হয়ে ও-কথা বলতেই নেই।

আর্জান কিছুদিনের জন্য 'হালে পানি' পেল বটে কিন্তু কাজটা বড় কঠিন। গোটা আবাদের প্রাণ ভেড়ি। সব নদীরই দুপাশে ভেড়ি। ভেড়ি ভেঙে নদীর লোনা জল একবার আবাদে ঢুকলে সে বছরের সফল তো মারা যাবেই, পর পর তিন বছর ভাল ধান হবে না। এই লোনা বিষের হাত থেকে ফসল ও জীবন বাঁচাবার জন্য অন্যান্য আবাদের মত ডাক্তার-আবাদেও চারদিকে ভেড়ি। চারদিকে মাপলে লম্বায় পাঁচ মাইল হবে। ডাক্তার-আবাদের ভেড়ি নাম-করা ভেড়ি। উঁচু আট হাত। মাথায় চওড়া ছয়-সাত হাত। সবটাই নদীর মাটি কেটে গাঁথা।

আর্জানের কাজ হল, একেই তদারক করা। ভেড়ির এক নম্বর শত্রু হল গাছ-গাছড়া। ছোট গাছ হলে বিশেষ ক্ষতি হয় না ; কিন্তু বড় গাছ হলেই ভেড়ির বাঁধন ফেটে যায়, আর সেই ফাটল দিয়ে নদীর লোনা-জল পথ করে নেয়। কাজেই আর্জানের একটা কাজ হল, কাটারি হাতে এই গাছ-গাছড়া কেটে বেড়ানো।

ভেড়ির দু-নম্বর এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষুদে শত্রু হল কাঁকড়া। লোনা জলে বড় বড় কাঁকড়া হয়। অসংখ্য কাঁকড়া। এরা ভেড়ির নিচে গর্ত করে বাসা বাঁধে। গর্ত করে প্রায় সুড়ঙ্গ কেটে ফেলে, আর সেই সুড়ঙ্গ পথে স্রোতের জল ঢুকে ঢুকে বাঁধের তলা ক্ষয় করে দেয়। প্রথমে এই পথে খেতে জল ঢোকে চুইয়ে চুইয়ে। বেশি দিন না দেখলে বাঁধ অবশেষে ধ্বসে পড়ে। এই ধরনের সুড়ঙ্গপথকে এদেশে 'ঘোঘা' বলে। এই ঘোঘা সারা-ই হল আর্জানের প্রধান কাজ। কোদাল হাতে, দিন নেই রাত নেই, আর্জানকে 'ঘোঘা মেরে' বেড়াতে হবে। তাই ফতিমা ঠাট্টা করে বলত, আর্জান এবার কাঁকড়া শিকারী!

'জোগার' দিকে,—অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় এবং তারই কাছাকাছি তিথিতে ভেড়ি

নিয়ে বড় বেশি সাবধান হতে হয়। জোগার জলে নদী পূর্ণমাত্রায় ভরপুর হয়ে ওঠে। স্রোতের টানও হয় প্রখর। জল যেন থৈথৈ করতে থাকে। এক এক সময় মনে হয় যেন তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে এ মাটির প্রাচীর।

মাঝে দীর্ঘ ধানের খেত ধুধু করছে। তারই চারিপাশে প্রায় গোলাকার হয়ে ঘেরা এই ভেড়ি। বাঁধের এক পাশে কোথাও বড় নদী, কোথাও খাল। আবাদের খালকেও বিশ্বাস নেই। কখন ফেঁপে উঠবে তার ঠিক নেই। বাঁধের ভিতর দিকে মাঝে মাঝে কয়েক ঘর চাষীদের বসবাস। চাষীদের পাড়াগুলি এক মাইল দুই মাইল অন্তর।

রাস্তা বলতে একমাত্র এই ভেড়িই আছে। তবুও এ পথ নির্জন। লোকে নৌকায় বা ডিঙিতেই বেশি যাতায়াত করে। আজকাল যে-কোন সময় দেখা যাবে, এই নির্জন ভেড়িতে ছোট্ট একটি মানুষ কাটারি আর কোদাল হাতে নিয়ে ঘুটঘুট করে তদারক করে বেড়াচ্ছে। কোথাও কোনও জনমানব নেই। না-ই বা থাকল। আর্জান এতে অভ্যস্ত। জীবনের অধিকাংশ সময় তার কেটেছে একা, গভীর অরণ্যে।

আর্জান বহুদিন বনে যায় না। মাঝে মাঝে বনে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তাছাড়া নানা লোকের কাছ থেকে অনুরোধও আসে শিকারে যাবার জন্য। কিন্তু সে জোর করেই পাঁচ মাসের জন্য বনে যাওয়া বন্ধ করেছে। ভেড়িব কাজে অবহেলা করে, এ কাজ সে হারাতে চায় না। এ কাজ হারালে তার খোরাকি ধান যে বন্ধ হয়ে যাবে!

তাই বলে শিকারীর শিকারের অভাব হয়নি। তবে বাঘ বা হরিণ নয়, —এবার সাপ। অসংখ্য সাপ ভেড়ির গায়ে। বর্ষাকালে চারদিকে জল। কোথাও স্থান না পেয়ে নানা রকমের সাপ সব আশ্রয় নেয় এই ভেডিব উপর। আর তারই মাঝে আর্জানকে ঘুরে বেডাতে হয় রাতে ও দিনে।

একদিন সন্ধ্যার দিকে বাড়ি এসেই আর্জান চিৎকার কবে বলল— তুফো! ও তুফান! শীগ্‌গির একটা কুপি নিয়ে আয়।

ফতিমা কুপি নিয়ে আঙিনায এসেই বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল।

সামলে নিয়ে বলল, —কেন তুমি সাপ মারলে? বলিনি তোমাকে পইপই করে, —কখ্‌খনো সাপ মারবে না।

আর্জান পাঁচ হাত দীর্ঘ সাপটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, —বলেছ তো! কিন্তু দেখেছ এর রং? খয়েরি রং। দাঁড়াস সাপ। মাটির সঙ্গে যেন মিশে থাকে। সন্ধ্যার দিকে যে-পথ দিয়ে ফিরব সেখানেই পড়ে ছিল। না মেরে যদি মাড়িয়ে দিতাম, তাহলে তোমার কি কোনও সুবিধা হত?

ফতিমা বলল, —তবু তুমি মারলে কেন? এ সাপ তো হিংসুটে নয়। কাউকে কিছু বলে না, শুধু গরুর বাঁট থেকে দুধ খেয়ে যায়। তোমাব তো আর গরু নেই। যাও বা ছিল, তাও দিয়েছ বিক্রি করে।

আর্জান ফতিমার কথায় আর কান না দিয়ে তুফোকে ডেকে একবার সাপটাকে লম্বা করে দেখাল, তারপর লেজটা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর মধ্যে।

কদিন পর ভোরবেলা আর্জান চলেছে ভেড়ির উপর দিয়ে অমাবস্যার 'জো' গেছে, কলটা একবার দেখতেই হবে। জমির নোনা ধুতে বা ধানের চারা বাঁচিয়ে রাখতে ঘেরের মধ্যে জমা বৃষ্টির জল কখনও আটক করে রাখতে হয়, কখনও বা ছেড়ে দিতে হয়। তার জন্যই কল বসানো। লম্বা কাঠের বাক্স বা গাছের ফাঁপা গুঁড়ি দিয়ে এই কল তৈরি। কলের দু-মুখে এমন ভাবে কপাট দেওয়া যাতে ঘেরের জল বেরুতে পারে কিন্তু নদীর লোনা জল

ঢুকতে না পারে। ভাটিতে নদীর জল বেশ নিচুতে নেমে গেলে এই কল দিয়ে জল সহজেই বের করে দেওয়া যায়। ভেড়ির নিচের দিকেই কল বসাতে হয়। ভেড়ি এখানে একটু দুর্বল হয়েই পড়ে। কাজেই আর্জানকে এদিকে বেশি নজর রাখতে হবে।

শঙ্খচূড় সাপ! এমন ভয়াল সাপ আর নেই। দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। রাগ ও হিংসা এর সর্ব দেহে। ছোবল মারবার সময় যেন শুধুমাত্র লেজের উপর দাঁড়িয়ে প্রায় মানুষের সমান উঁচু হয়ে ওঠে। ফণা বিস্তার করে যখন ফোঁস-ফোঁস করতে থাকে তখন মনে হবে, এর সামনে যেন আর রক্ষা নেই!

কলের দুপাশ সবুজ ঘাসে ভরে গেছে। সবুজ রঙের উপর হরিদ্রাভ শঙ্খচূড় বঙ্কিম দেহে দাঁড়িয়ে গেছে। ফুলে ফুলে ফোঁস-ফোঁস করছে। সামনে যেন কি একটা দেখেছে, তারই উপর এত রাগ! এই সাপটার কথা এ আবাদের সবাই জানে। হারেজও অনেকবার বলেছে এই সাপের ইতিকথা। এই শঙ্খচূড়ের জন্য কেউ সহসা এই কলের ধারে আসতে চায় না; হারেজ অনেকবার বন্দুক দিয়ে মারবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু বন্দুক আনতে আনতে এর দেখা আর পায়নি। দূর থেকেও এর গতি নজরে রাখবার চেষ্টা করতে কেউ সাহস পায় না। দেখতে পেলে তেড়ে এসে ছোবল মারবে।

আর্জান পিছিয়ে এল। মাটির উপর যেন কোনও শব্দ না হয়, মাটির উপর শব্দ হলে অনেক দূর থেকে সাপ বুঝতে পারে। ধীর পদক্ষেপে আর্জান পিছিয়ে এল। কিছু দূর এসে ঝট্‌পট্ দশ বারোখানা ছোট ও মোটা গাছের ডাল কেটে ফেলল। সবগুলি বগল-দাবা করে শিকারী এগিয়ে চলে। শঙ্খচূড়ের পেছনে আর্জান। উদ্যত ফণা লক্ষ্য করে আর্জান একটা ডাল সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারল। বন্দুকের অব্যর্থ লক্ষ্য থাকলে কি হবে, হাতের নিরিখ ব্যর্থ হল। সাঁ সাঁ করে শঙ্খচূড়ের পাশ দিয়ে ডালখানা বেরিয়ে গেল।

সচকিতে শঙ্খচূড় ঘাড় বাঁকায় আর্জানের দিকেই। মুহূর্ত দেরি না করে আর্জান পর পর তিনখানা ডাল ছুঁড়ে মারল। একখানা ওর মাজায় লেগেছে। ভাল ভাবেই লেগেছে। মাজা ভেঙে পড়ে গেল। যেখানে ভেঙে গেছে সেই অবধি খাড়া হয়ে আশপাশে ছোবল মেরে রাগে ও হিংসায় বিষ ঢালতে লাগল। এর পর নিশ্চিন্ত মনে আর্জান কাছে এসে শঙ্খচূড়কে পিটিয়ে শেষ করল।

বড়মেঞা! বড়মেঞা! এই নেন আপনার শঙ্খচূড়। —বলেই আর্জান হারেজের উঠানে সাপটাকে রাখল।

হারেজ দেখেই মহাখুশি। বলল—চলো, চলো, কাছারিতে নিয়ে দেখাই! কিন্তু শঙ্খচূড়কে মারলে কি করে? তা তুমি সব পার, শিকারী। তোমার অসাধ্য কিছু নেই!

হারেজের খুশিতেই আর্জান খুশি। ছেলেপিলের দল জমে গেছে। তারা সাপটাকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি দেখাতে চলল। বিপদ বুঝে আর্জান বলল, —না, না, এ আর দেখাতে হবে না।

হারেজ বলল, —যাক্ না, সবাই দেখে খুশিই হবে।

ছেলেদের দল সব বাড়ি ঘুরে অবশেষে আর্জানের বাড়ি হাজির।

—ও চাচি! ও চাচি! দেখে যাও, সাপ! সাপ! সাপ!—ছেলেরা দু-তিন জনে একত্রে চিৎকার করে।

ফতিমা 'সাপ' শুনতেই চমকে উঠে বাইরে ছুটে এল। মনে তার আশঙ্কা, আর্জানের কোনও অমঙ্গল হয়েছে।

—বা-বা ! এত বড় সাপ ! কি সাপ রে ? জ্যান্ত আছে নাকি ? —ফতিমা শিউরে ওঠে।

—জ্যান্ত কি করে থাকবে ? শ—ঙ্খ—চূ—ড় ! শ—ঙ্খ—চূ—ড় ! —ছেলের দল স্পষ্ট উচ্চারণ করে করে বলল। নামটা ভারি ভাল লেগেছে ওদের।

—কে মারল রে ?

—তাও জান না বুঝি ? আর্জান চাচা, আর্জান চাচা !

ফতিমা গম্ভীর হয়ে যায়। দৃঢ়স্বরে বলল, —যা, যা, এবার নিয়ে যা এখানে থেকে। বাঘ না পেয়ে এবার সাপ। মরণ আমার !...কেন আমি মরি না !

আর্জান কাছারি থেকে গড়িমসি করে বেশ বেলা করেই বাড়ি ফিরছে।...কেন, সাপটা মেরেছি তাতে কি হয়েছে ? শঙ্খচূড় যদি তাকেই কামড়াত, তাহলে কি ভাল হত ! ফতিমার কি ? তার তো আর ভেড়িতে ঘুরতে হয় না...কেন ফতিমার শিকার ভাল লাগে না ? শিকার ! সাপ আবার শিকার হয় নাকি ? সাপকে হত্যা করেছি। হত্যা না তো কি ? হত্যা ও শিকার মোটেই এক কথা নয়। হত্যার কি দরকার ছিল ? সাপের লেখা আর বাঘের দেখা।...হ্যাঁ, এই কথাই সে ফতিমাকে বলবে। লেখা যদি থাকে তবে মারলেও আসে যায় না, আর না মারলেও আসে যায় না। কিন্তু না মারলে সে তার ভেড়ির উপর দিয়ে যাবে কি করে...না, ভেড়ি তার নয়,—জমিদারের।...জমিদারের ভেড়ি, মাটি, ভিটে, সবই জমিদারের। জমিদারের ভেড়িতেই শঙ্খচূড় এসেছিল...মেরেছি, বেশ করেছি—ফতিমার তাতে কি ? কি ভয়াল সাপ, কি ভীষণ...গর্জন !

বাড়ির উঠোনে ফতিমাকে দেখে আর্জানের সব চিন্তা গুলিয়ে গেল।

—যাও ! যাও ! বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে। —ফতিমা যেন গর্জে ওঠে।

—কোথায় যাব ? —আর্জানও রেগে উঠে বলল। ভেবেছিল কি সব বলবে ফতিমাকে,—তা সে সব ভুলে গেছে।

—কোথায় যাব !! কেন, যাও ভেড়িতে গিয়ে মরো গে ! ফের উনি মনসার গায়ে হাত দিয়েছেন। মরণ আর আমার নেই ! —হাতের ঝাঁটা ফেলে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ফতিমা যেন খেঁকিয়ে উঠল।

তারপরই কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল ফতিমা। আর্জান হতভম্ব। চুপ করেই থাকে।

কাঁদতে কাঁদতে ফতিমা বলল, —মারো না ! এতই যদি মারবার শখ, আমাকেই একদিন মেরে ফেল না—সব মিটে যাক্ ! —ফতিমার চোখের জল বাঁধ মানে না।

আর্জান ধীরে ধীরে হুঁকো থেকে কলকেটা নিয়ে আগুনের আশায় এগিয়ে এল। ফতিমার কাছেই এল। ফতিমার থুতনিতে হাত দিয়ে একটু মিষ্টি হাসি হেসে বলল, —আচ্ছা গো বেশ, তোমার মনসার গায়ে আর হাত দেব না।

—না, তুমি কখ্খনো হাত দেবে না...কিছুতেই না ! —বলেই ফতিমা আর্জানের হাত থেকে কলকেটা নিয়ে আগুনের জন্য রান্নাঘরে দ্রুতপায়ে চলে গেল।

কুড়ি

সামনে ঈদ্। মাঝে একটা রবিবার, তারপরই ঈদের উৎসব। এদেশের সবচেয়ে বড় হাট বড়দল। বড়দল এখান থেকে প্রায় এক জোয়ারের পথ। প্রতি রবিবার বড়দলে হাট বসে। ঈদের সওদা করবার এই শেষ হাট।

আর্জান ও ফতিমার পরামর্শ চলে, ঈদে তুফানকে কি দেবে ? হাতে একটা পয়সাও নেই। তবু জল্পনা-কল্পনা চলে।

শনিবার সন্ধ্যায় ফতিমা আর্জানের সামনে দুটি টাকা রেখে বলল, —এই নাও, তুফোর একটা কামিজ আর পাজামা এনো।

আর্জান অবাক হয়ে গেছে। বলল, —কোথায় পেলে এই টাকা ?

—কেন ? মুরগির ব্যাপারী এসেছিল, তার কাছে সাদা মোরগটা বিক্রি করে দিয়েছি।

মুরগির ব্যাপারে সংসারে মেয়েদের একচ্ছত্র অধিকার। পুরুষদের এ বিষয়ে কোন কথা বলার উপায় নেই। কাজেই আর্জান একবার শুধু বলল, —সাদা মোরগটা বিক্রি করলে ! বেশ ! তুমি তো কিছু দিলে, কিন্তু আমি কি দিই ?

ফতিমা হিসাব করেই রেখেছে। বলল, —হাট-খরচের জন্য দু-পালি ধান নিয়ে যাও। খরচ করে যদি বাঁচাতে পার তাহলে একটা কিস্তি এনে দিও। বেশ দেখাবে তুফোকে মাথায় কিস্তি পরলে।

হাটে যেতে হলে আজ রাত্রেই বারোটা নাগাদ জোয়ারে যাত্রা করতে হবে। ভোরে জোয়ারের শেষে ডিঙি বড়দলে পৌঁছবে। দুপুর নাগাদ হাট জমে ওঠে। তারপর ফিরবার পালা।

হাজার হাজার নৌকা ও ডিঙি এসে জমে বড়দলের হাটে। চল্লিশ-পঞ্চাশ হা[illegible] লোকের কেনা-বেচা। লাখো লাখো টা[illegible]লেন-দেন হয়ে যায় একদিনে। এতবড় হাট এ অঞ্চলে আর নেই।

হারেজের ডিঙি করেই আর্জান হাটে এসেছে। এদেশের নিয়ম, অপরের ডিঙিতে কোথাও গেলে দাঁড় বেয়ে বা হাল ধরে সাহায্য করতে হয়। আর্জান একমনে সারা রাত হাল বেয়ে চলল। সবাই ঈদের সওদা করতে চলেছে। ডিঙিতে বসে সবাই তারই আলোচনা করে।

সকলের প্রসঙ্গ শেষ হলে আর্জানের প্রসঙ্গ এলেই হারেজ বলল,—আরে, ওর কথা ছেড়ে দাও। ও বাদার কেওড়া ফল, ভাসেও না, ডোবেও না।

সবাই হাসে, আর্জানও হাসে। হাসিতে আর্জানের প্রসঙ্গ চাপা পড়ে।

বড়দলে উঠে যে যার মনে হাট করতে চলে গেছে। ধান বিক্রি করে ফতিমার কথা মত আর্জান সব কিনল। কিন্তু তুফোর জন্য নিজের জিনিষটাই কিনতে মুশকিলে পড়েছে। দোকানি কিস্তির দাম চায় বারো আনা। আর্জানের কাছে বারো আনা পয়সাই আছে, কিন্তু সে দশ আনার বেশি কিছুতেই দিতে চায় না। আর্জান একবার দোকানির কাছে আসে, দরাদরি করে, আবার চলে যায়। আবার আসে, আবার দরাদরি করে,—অনুরোধ করে।

একবার দোকানিকে বলল, —বেশ। তাহলে চললাম !—বলেই অনেক দূরে চলে যাবার ভান করে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল।

দোকানি চেঁচিয়ে বলল,—বেশ, এগার আনা দেবে ?

আর্জান না শুনবার ভান করে আরও এগিয়ে গেল। সামনেই একটা খেলনার দোকান। খেলনা দেখতে দেখতে একটা ক্যাপবন্দুকের উপর আর্জানের নজর পড়ল। বুকের ভেতরটা তার যেন কেমন করে উঠল। বার বার দেখে। নিশ্চয় অনেক দাম। তা হোক, দাম করতে দোষ কি ? কিন্তু যদি বলে বসে দু-টাকা ! তা বলুক না, দেখতে তো আর দোষ নেই ! আর্জান বন্দুকটা হাতে করে জিজ্ঞাসা করল, —কত টাকা দাম ?

দোকানি বলল, —দুই আনা কম এক টাকা। চোদ্দ আনা। এই দ্যাখো, কেমন গুলি

চালান যায় ? —বলেই পট্ করে ক্যাপ লাগিয়ে আওয়াজ করল।

আর্জান মোহগ্রস্ত। মাত্র চোদ্দ আনা ! তা হলে তো সে দর করতে পারে ! ভেবেই বলল, —বারো আনায় দেবে ?

দোকানি দিতে চায় না। আর্জানের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে আবার সাজিয়ে রাখে।

আর্জান এগিয়ে গেল আবার টুপির দোকানটায়। দূর থেকে কিস্তির দিকে তাকায় কিন্তু দর করে না। দোকানি আড়চোখে দেখল, আর্জান ঘুরে এসেছে। সেও অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

একবার টুপির দোকান, একবার খেলনার দোকান। বার-বার হাঁটাহাঁটি করে। কিছুই স্থির করতে পারে না। ফতিমা বলেছে কিস্তি আনতে। বললে কি হবে ! সে তো প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'তুমি কি দেবে ?' না, আমার ইচ্ছার কথা নয়। তুফান কিসে খুশি হবে ? মাথায় কিস্তি পরলে তুফানকে ভারি মিষ্টি লাগবে ! তা হোক, বন্দুকটা পেলে সে কিন্তু ভারি খুশি হবে। বন্দুকটা কিনলে সঙ্গে একবাক্স ক্যাপও দেবে। বেশ আওয়াজ। বন্দুকটা কিনে ফেলি !...কিন্তু কাছে যে মাত্র বারো আনা পয়সা।

হঠাৎ আর্জানের চমক্ ভাঙে। পুব আকাশে কালো মেঘ করেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। হারেজ সর্দারের ডিঙি চলে গেল নাকি ?

ছুটে গেল ডিঙি দেখতে। ঘাটে ডিঙি নেই। মেঘ দেখে হাটের লোক সবাই চলে যাচ্ছে। হারেজ সর্দারকে অনেক ডাকাডাকি করল। কিন্তু কোথাও ডিঙির খোঁজ পেল না।

হারেজ সর্দারও আর্জানের অনেক খোঁজ করেছিল, কিন্তু কোথাও পায়নি। ঝড়ের লক্ষণ দেখে অবশেষে তারা চলে গেছে। ডাক্তার-আবাদের আর কোনও ডিঙি তো হাটে আসেনি।...আর্জান আর ভাবতেই পারে না, —ছুটে গেল বন্দুকের দোকানের দিকে।

তেল কিনেছিল দু-আনার। সেই দোকানে গিয়ে অনেক অনুরোধ করে অর্ধেক তেল ফিরিয়ে দিয়ে এক আনা নিল।

এবার আর্জান প্রায় দম বন্ধ করেই খেলনার দোকানে গিয়ে তেরো আনা পয়সা রেখে বলল, —না, না, আর তুমি কিছু বলো না ! কিছু বলো না ! নাও, নাও ! —বলেই বন্দুকটা তুলে নিল।

দোকানি পয়সা গুনে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আর্জানের চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলতে পারে না। আস্তে আস্তে ক্যাপের বাক্সটা আর্জানের হাতে তুলে দিল।

আর্জান অনেক খুঁজে অবশেষে একখানা ডিঙি পায়। তারা যাবে নারানপুর খালের মুখ দিয়ে। সেখান থেকে ডাক্তার-আবাদ হাঁটা পথে এক ক্রোশ হবে।

পথেই বৃষ্টি ও বাতাস শুরু হয়। ধীরে ধীরে ঝড়ো-হাওয়া দেখা দেয়। নারানপুরের খালের মুখে নেমে আর্জান ভেড়ির উপর দিয়ে ছুটতে থাকে। ভেড়ির শক্ত মাটির উপর বৃষ্টি পড়ে পিচ্ছিল কাদা হয়েছে। আর্জান পড়ে যায় যায়। তবু বুড়ো আঙুল টিপে টিপে ছুটতে থাকে। বৃষ্টিতে ভিজে শেষ হয়ে গেছে। তুফানের জামা আর বন্দুকটি কোনমতে বগলের নিচে রেখে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে।

দূরে কাছারিবাড়ি দেখা যায়। কেমন যেন সোরগোল বেশি। ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে আর শোঁশোঁ করে বাতাস বইছে—তবুও তার মধ্যে কাছারি-ঘর থেকে হাটের আওয়াজের মত শব্দ আসছে। কাছারির পাশে হারেজ সর্দার ও আরও ছ-সাত ঘর লোকের বাড়ি। বাড়িগুলি কেমন যেন নিস্তেজ। আর্জানের মনে শঙ্কা জাগে। নদীতে জোয়ার এসেছে। নদীর জল যেন ফুলে উঠেছে। বাতাসের বেগও ক্রমে বেড়ে ওঠে।

ফতিমা আকুল ভাবে প্রতীক্ষা করে আছে। ইতিমধ্যে সে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, অনেক আগেই হারেজ সর্দারের ডিঙি এসে গেছে, কিন্তু আর্জান তাতে ফেরেনি। আর্জান এলে অনেক কথা বলতে হবে, অনেক কথা জানতে হবে।

কিন্তু আর্জান আসতেই তুফান বন্দুক পেয়ে এমন মজা করতে থাকে যে, ফতিমা ও আর্জান সব কিছু ভুলে গেল।

এদিকে উঠানে জল এসে গেছে। ঝড়ের উদ্দামতা বাড়ছে। দমকা হাওয়ায় ঘরের চাল নড়ে উঠতে থাকে।

ফতিমা বলল, —জানো, এপাড়ার সবাই চলে গেছে। সবাই কাছারি বাড়ি গেছে। ওরা বলল, পুবে-হাওয়া দিয়েছে, লক্ষণ ভালো না। যে যার ঘর ছেড়ে কাছারিতে আশ্রয় নিয়েছে। আমাকেও ডাকতে এসেছিল। কিন্তু যাইনি। তুমি এখন কি করবে?

আর্জান চিন্তান্বিত হয়ে বলল, —আগে খেতে দাও তো! তারপর দেখি কি করা যায়।

আর্জান তাড়াতাড়ি কোনমতে খেয়ে নেয়। খাবে কি! বাইরের বাতাসের ঝাপটা আর শোঁশোঁ শুনবার জন্য কান পেতেই ছিল। ঘর ছেড়ে কি শেষ অবধি যেতেই হবে! মুখ ধুতে দাওয়ায় এসে হাওয়ার গতিক সঠিক বুঝে নিতে চাইল। এসে দেখে, জলে জলাকার। মেঘের ঝিলিকে পরিষ্কার দেখতে পায়। কই, যখন সে আসে তখন তো এতো পানি ছিল না! দাওয়ার খুঁটি এক হাতে ধরে উঠানে নেমে পড়ল। স্থির জল নয় তো! কেমন যেন জলের টান পায়ে অনুভব করে। উন্মনা হয়ে ওঠে আর্জান। তাড়াতাড়ি এক-কোশ পানি তুলে মুখে দেয়। দিতেই পাগল হয়ে উঠল যেন—'ওরে নোনাপানি! শীগ্‌গির কর! যেতে হবে, এক্ষুনি যেতে হবে। ভেড়ি ভেঙে গেছে। শীগ্‌গির কর!'

আর্জান হন্যের মত জল ভেঙে ছুটে গেল পাশের বাড়ির দিকে। ভাগ্যি, আসবার সময় সেখানে 'খোল্-ভেড়ি'তে একখান্ ছোট্ট ডিঙি দেখে এসেছিল। কোনমতে টানতে টানতে ডিঙি দাওয়ায় লাগিয়েই বলল—নাও, তাড়াতাড়ি করো। যা তুলবার তোলো! তোলো!

—আমার মরণ! আল্লা! —বলেই ফতিমা যা পারে তাই টেনে হিঁচড়ে ডিঙিতে তুলল। হাঁড়ি, কলসি, কাঠের বাক্স, সবই ধরাধরি করে তুলে ফেলল।

তুফান তার বন্দুক আর ক্যাপের বাক্স দুহাতে দুটো চেপে ধরে আতঙ্কে কেবলই বলে—কোথা যাবো? কোথা যাবো?

ফতিমা যেন কিছুই রেখে যেতে চায় না। ছোট্ট ডিঙিতে আর কত ধরবে! তবুও হাঁড়ি-কলসি যেন কিছুই বাদ দিতে চায় না। দুটি মুরগি ছিল। তাদের পা বেঁধে ডিঙির খোলে ফেলে দিল।

তুফান এক-টানা বলেই চলেছে—কোথা যাবো? কোথা যাবো?

ফতিমা হন্তদন্ত হয়ে উঠেছে। বলল, —যাবি আর কোথায়? যাবি যমের বাড়ি! —বলেই নিজের কথায় নিজে ভয় পেয়ে তুফানকে দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে।

আর্জান বলল, —খোলে বসো,—বসো এবার। দেখো যেন, তুফোকে বুকে জড়িয়ে রেখো। গরম করে রেখো ওকে। বড্ড পানি পড়ছে। দেখছো তো দমকা হাওয়া!

ফতিমা ডিঙির মাঝখানে; আর আর্জান গলুইতে বসে লগি মেরে ডিঙি নিয়ে চলেছে। খুব সাবধানে যেতে হবে। চারদিক জলে জলাকার হয়ে গেছে। বিলের জল আর নদীর জল প্রায় একাকার। ভুলক্রমে যদি নদীর জলের টানের মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে স্রোতে কোথায় নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

নদী আর ভেড়ির মাঝে লম্বা লম্বা কেওড়া গাছের সারি। মেঘের ঝিলিকে সেদিকে লক্ষ্য

রেখে আর্জান এগিয়ে চলে। ভেড়ি থেকে পঞ্চাশ-ষাট হাত ভিতরে সর্দার-পাড়ার সার-বাঁধা ঘরগুলির মাথা জলের উপর ভেসে আছে।' কেওড়া গাছ আর ঘরের মাথার মাঝ দিয়ে লগি মেরে মেরে আর্জান ডিঙি ঠেলতে থাকে। দমকা হাওয়ার দাপটে ডিঙি যেন এগুতে চায় না। প্রায় গলা-জল। 'না। হলো না।' —বলেই আর্জান জলে নামল। জল ভেঙে ভেঙে ঠেলে নিয়ে চলল ডিঙি।

তুফান মাকে আপ্রাণে জড়িয়ে ধরেছে। একটুও যাতে বৃষ্টি ওর গায়ে না লাগে তার জন্য ফতিমাও কয়েকখানা কাঁথা মুড়ি দিয়ে তুফানকে লেপটে ধরেছে বুকের মধ্যে। কাঁথার ফাঁকে ফতিমা কিছুই দেখতে পায় না। দেখবেই বা কি ? গাঢ় অন্ধকার। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। দমকা হাওয়ায় কেওড়া গাছের ডাল মড়্‌মড়্ করে ওঠে। তবুও কাঁথার আড়াল থেকে বিদ্যুৎ ঝিলিকে ফতিমা দেখবার চেষ্টা করে কতদূর এল। অনেক দূরে কাছারি-বাড়ির আলো মাঝে মাঝে দেখা যায়। আর শুনতে পায় মাঝে মাঝে আর্জানের ভরসা—'ভয় নেই। ভয় নেই।'

হঠাৎ আর্জানের ভয়ার্ত চিৎকার ফতিমার কানে আসে—'গেলাম রে। জন্মের মত গেলাম।' আচমকা ডিঙিখানাও দুলে ওঠে। মুখের কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে ফতিমা দেখে, —কোথাও আর্জান নেই। কোনও আওয়াজও শোনা যায় না। ফতিমা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, 'কোথায় গেলে। কোথায় গেলে।' ফতিমা দাঁড়াতে চায়, তুফান চিৎকার করে মায়ের পা জড়িয়ে ধরে। কোনও চিহ্ন নেই। ঝিলিকের আলোকে কর্দমাক্ত জলের তোলপাড় ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

আর্জান নেই। ফতিমা হতভম্ব। কি যে করবে। কোথায় যাবে! শুধু চিৎকার করে—কোথায় গেলে ? কোথায় গেলে ? তুফানও তারস্বরে ডেকে আকুল,—বা'জান। বা'জান!

মায়ের ও সন্তানের চিৎকার মেঘগর্জনে ডুবে যায়। দুজনে যেন ছট্‌ফট্ করতে থাকে, ডিঙিও যেন দুলে-দুলে ডুবে যায়-যায়। দমকা হাওয়া ডিঙিকে বুঝি এবার ঠেলে নিয়ে যাবে। তুফানকে খোলে বসিয়ে রেখে ফতিমা চিৎকার করতে করতে লগি টেনে ধরল।

মড়্‌মড়্ শব্দে কেওড়া গাছের একখানা ডাল ভেঙে পড়ল। ফতিমা লগি মারবে কি করে ? দমকা হাওয়া তাকে ডিঙির উপর দাঁড়াতে দেয় না। কিন্তু আর্জান। কোথায় গেল সে ? সে নেই। তড়িৎ বেগে চিন্তার পর চিন্তা খেলে যায়—শঙ্খচূড়। শঙ্খচূড়কে সে মেরেছিল। মনসার গায়ে হাত দিয়েছিল। বলিনি তখন !! লোহার বাসরেও কালনাগিনী প্রবেশ করেছিল। আল্লা, এ কি করলে তুমি! শঙ্খচূড়! শঙ্খচূড়ই!...ফতিমা চিৎকার করে উঠল,—কোথায় গেলে, কোথায় গেলে।

লগি মারতে ফতিমা জানে, ডিঙিও চালাতে জানে। ভাটি দেশের মেয়ে-মরদ সবাই নৌকা চালাতে জানে। কিন্তু শাড়ির উপর দমকা হাওয়া লেগে তাকে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। না, আর না! ফতিমা জলেই নেমে পড়ল। যেমন করে আর্জানও নেমেছিল।

তুফো এবার বা'জান ভুলে 'আম্মা, আম্মা' বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মা-ও বুঝি বা'জানের মত চলে যাবে!

ফতিমা যেন আর সহ্য করতে পারে না। গোটাকতক কিল্ বসিয়ে দিয়ে এক ধাক্কা মেরে তুফোকে খোলের মধ্যে ফেলে দিল। কিন্তু তুফোর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এতে দমে গেলে তার চলবে কেন! তখনই উঠে আবার আম্মার কাছে এল। ছোট্ট মুঠি দিয়ে আম্মার বাহু জড়িয়ে ধরল।

ফতিমা বুক-জলে দাঁড়িয়ে ডিঙি ধরে রেখেছে। একটা দমকা হাওয়া চলে গেলে চিৎকার

করে ওঠে—কোথায় গেলে ! কোথায় গেলে !

ফতিমা এখন কি করবে। কাছারির আলো এক এক ঝলকে দেখা যায়। ডিঙি নিয়ে যাবে সেখানে ? তারপর পাড়ার লোকদের ডেকে এনে আর্জানকে খুঁজবে !......না ! তার মন চায় না এই জায়গা ছেড়ে যেতে। আর্জান যাবে কোথায় ! মরলেও তো ভেসে উঠবে এইখানেই। তখনও যদি তার প্রাণ থাকে ! লক্ষীন্দরও বেঁচে উঠেছিল। না, সে যাবে না। কিন্তু তুফো ! ওকে বাঁচাই কি করে ! 'কোথায় গেলে ! কোথায় গেলে !'—আবার চিৎকার করে ওঠে।

ডিঙি সে যেন আর ধরে রাখতে পারে না। কি একটা যেন আসছে। বিদ্যুতের স্পষ্ট আলোকে পরিষ্কার দেখল, কি যেন একটা ভেসে আসছে। ভ্রূ আর চোখের জল এক হাত দিয়ে মুছে নিয়ে ভাল করে দেখবার জন্য বিদ্যুতের ঝিলিকের অপেক্ষায় থাকে। ওদের ডিঙির দিকেই আসছে। আম্মাকে অমন করে তাকিয়ে থাকতে দেখে তুফো চিৎকার করে বা'জানকে ডেকে উঠল।

খড়ের বোঝা। কে যেন তার গরুর জন্য যত্ন করে রেখেছিল, তাই বানের জলে ভেসে আসছে। ফতিমা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। যেমন-তেমন ভাবে একবার এদিক একবার ওদিক ডিঙি টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

না ! এমন করে হবে না ! সামনের কেওড়া গাছটার দিকে চলল। গাছ যখন ওখানে আছে, নিশ্চয় ডুব-জল হবে না। গুঁড়ির সঙ্গে গলুইয়ের দড়ি বেঁধে ফেলল। গাছের ওপাশেই নদী। কয়রা নদী। দড়ি ছিঁড়ে একবার ডিঙি নদীর জলে গেলে, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই ! ভাটির দেশের মেয়ে তা জানে। জোর করেই বাঁধল। জলরাশির মাঝে আর্জানকে সে খুঁজে বের করবেই ! ডিঙি হয়ত বাঁধন মানবে,...কিন্তু তুফো !

ডিঙি ছেড়ে এক পা যেতেই তুফো পাগল হয়ে উঠল। ফিরে এল ফতিমা। জলে দাঁড়িয়ে ডিঙির গলুইতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তুফো এবার মায়ের চুলের মুঠি টেনে ধরেছে।

'—আয় ! শীগ্‌গির ডিঙি নিয়ে আয় ! আয় !'—ডাক শুনতেই ফতিমা সচকিতে মাথা উঁচু করে। একটানে বাঁধন খুলে ডিঙি নিয়ে চলল শব্দ লক্ষ্য করে। —আছে,...আর্জানেরই যেন গলা ! আল্লা ! আছে আর্জান, এখনও বেঁচে আছে !

উঁচু ভিটের মাটি পায়ে ঠেকতেই আর্জান হাঁটু গেড়ে খুঁটি নিল। কুমির থম্‌কে গেছে। খুঁটি পেয়ে আর্জান ঠেলে উঠে দাঁড়াল। মাত্র কোমর-জল এখানে। কুমিরও জলের উপর ভেসে ওঠে, কিন্তু দাঁতের কামড় এতটুকুও শিথিল করতে চায় না। তা হোক ! আর্জানের চিন্তা, খুঁটি তাকে ভাল করে নিতে হবে। ভিটের মাটিতে ভাল করে পা বসিয়ে দিয়ে ডিঙির জন্য চিৎকার করে উঠল,—আয় ! শীগ্‌গির এদিকে আয় !

ছোট কুমির। ডান হাতের বাহু আর পিঠের ডানার মাংসপেশী একত্রে কামড়ে ধরে একটানে জলের তলে নিয়ে গিয়েছিল। শিকারী আর্জান জ্ঞানহারা হয়নি। লড়বার চেষ্টা করেছে। কিন্তু জলের নিচে অন্য হাত দিয়ে মারবার চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি।

জলের ভিতর সে তখন ভাসছিল। কুমির তাকে মুখে করে শোঁ শোঁ করে নিয়ে চলেছিল ! লড়বে কি করে সে ? কোনও খুঁটি তার নেই। একবার জলের উপর ভাসিয়ে তুলেছিল। কিন্তু দম নিতে না নিতে আবার জলের তলে নিয়ে যায়।

হঠাৎ যেন আর্জানের পায়ে একবার মাটি ঠেকে। কুমির চলেছিল মাঠের দিকে। দুই বাড়ির মাঝ দিয়ে সে যাবে। সামনে ছিল একটা পুরনো পোড়ো ভিটে। বিলের এত খবর কুমির জানবে কি করে?

কুমির ছোট হলে হবে কি, লেজের জোরে হেঁচকা টান দেবার চেষ্টা করে। আর্জানও এবার নিচু হয়ে বেঁকে হেঁচকা টান সামলাবার চেষ্টা করে।

কাছে আসতেই আর্জান ফতিমাকে বলল, —ডিঙিতে উঠে নে,…পানিতে না, পানিতে না!

কোনমতে গলুইতে বুক লাগিয়ে ফতিমা ডিঙিতে উঠে লগির খোঁচায় এগিয়ে গেল। তুফো বা'জানকে দেখে খোলের মাঝে এক-একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করে। এক-একবার দাঁড়ায় আর ধপাৎ করে পড়ে যায়। বাঁ হাতে তার বন্দুকটি ধরাই আছে।

ডিঙি কাছে পেতেই আর্জান বাঁ হাত দিয়ে গলুই জাপটে জড়িয়ে ধরল। দাঁতে দাঁত কামড়িয়ে বলে ওঠ,—মার্ শালাকে! শালাকে মার্!

লম্বা লগি দিয়ে ফতিমা দড়াম্ দড়াম্ পিটিত থাকে কুমিরকে।

এক-একবার যেই কুমির তার টান শিথিল করে, অমনি আর্জান গলুই ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে দমাদম্ ঘুষি মারে তার নাকে মুখে। আবার কুমির হেঁচকা টান দিতে গেলেই গলুই জড়িয়ে ধরে আপ্রাণে! মুখে তার গালি। ফতিমাকে বলে,—মার্ চোখে মুখে! গুঁতো মার্!

তুফানও যেন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ছোট্ট বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরে কুমিরের দিকে। গুলি করে ওকে সে মারবে!

ক'জনে মিলে এই সংগ্রাম ও চিৎকার চলে। কিছুক্ষণ পরেই কুমির হঠাৎ কামড় ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

কুমির ছাড়তেই রক্তের স্রোত আর্জানের গা বেয়ে পড়তে থাকে। যেন ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়তে চায়। হাত দিয়ে চেপে ধরবার চেষ্টা করে ক্ষতস্থান।

শরীর অবসন্ন। তা হোক। বাঁচবার তার শেষ চেষ্টা করতে হবে। তখনই জলের তলে ডুব দিয়ে একতাল মাটি তুলল। কুমিরের দাঁতে তার বাহুতে তিনটি ও পিঠের মাংসে তিনটি বিরাট গর্ত হয়ে গেছে। তখনও তা দিয়ে দর্‌দর্ করে রক্ত ঝরছে। সজোরে সেখানে কাদামাটি চেপে দিল। মাটি ঠেসে চেপে ধরে কোনমতে ডিঙিতে উঠল। দেহের শক্তি তার নিঃশেষ হয়ে এসেছ। গলুইতে এলিয়ে শুয়ে পড়ে বলল,—কাঁথা ছিঁড়ে বাঁধ্। জোরে বাঁধ্।

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে। জ্ঞান সে হারাবে না। তাই বুঝি যন্ত্রণায় জোরে চিৎকার করতে থাকে। তার ভয়, পাছে সে অজ্ঞান হয়ে যায়!

ফতিমা হন্তদন্ত হয়ে যত চেপে সম্ভব বেঁধে দিল। একটু পরে লগি তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল,—এবার তাহলে চলো কাছারি বাড়ি?

আর্জান যেন আর্তনাদ করে ওঠে,—খবরদার! ডিঙি একটুও সরাবি না। খবরদার! একটুও না!

দম নিয়ে আবার বলে, —ডিঙি একটু সরিয়েছিস্ কি রক্ষা নেই, ও-শালা আবার আসবে! পলাতকের রক্ষা নেই!

ফতিমা অবাক হয়ে বসে পড়ে। লগি পুঁততে থাকে। তুফান আর্জানের গায়ের কাছে বসেছে। তাকে স্পর্শ করে আর্জান ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

বৃষ্টিতে তুফান ভিজে ভূত হয়ে গেছে। আর্জান এবার আস্তে আস্তে বলল, —ওরে!

একদম ভিজে গেছে। বাক্স থেকে কাঁথা নিয়ে ওকে জড়িয়ে রাখো। রাত যেটুকু আছে এখানেই থাকতে হবে। তা না হলে ডিঙি ছাড়লেই শালা পিছু নেবে। নিকটেই আছে। ভয় পেলে রক্ষা নেই! ঐ না কাছারির আলো দেখা যায়? তা হোক, নড়ো না। এখান থেকে একটুও নড়বে না।

ধীরে ধীরে ঝড় ও বৃষ্টি কমে আসে। রাতও শেষ হয়ে আসে। পুব আকাশে আলোর আভাস দেখা দিয়েছে। আর্জান জোর করে উঠে বসে চারদিক একবার দেখে নিয়ে বলল,—চলো, এইবার চলো। দেখো, শালাকে তবুও বিশ্বাস নেই। পিছনের দিকে নজর রেখো।

কাছারি আসতেই সবাই ধরাধরি করে আর্জানকে তুলল। সারারাত সবাই আর্জানের কথা বলেছে। অল্প জায়গায় অত লোক। সবাই বসেই ছিল। কারও ঘুম নেই। সবাই যার যার ঘরদোরের চিন্তায় ব্যস্ত। তাছাড়া ভাটির টানে জল কমে এলেই সকলকে ভেড়ি মেরামতের কাজে হাত দিতে হবে। ছয় ঘন্টার মধ্যে ভেড়ির মেরামত না করতে পারলে, লোনা জলে আবার মাঠ ভরে যাবে।

ঝাড়ফুঁক যে যা জানে তা আর্জানের উপর করতে লাগল। এমন সময় কাছারির পিছনের বারান্দায় গরুর ভীষণ আর্তনাদ। ঝড়ের আগে যে যার গরুবাছুর ঐ বারান্দায় রেখেছিল। গরুর আর্তনাদ শুনে আর্জান চমকে উঠে বসে বলল, —ঐ, ঐ, শালা এসেছে! ঠিক পিছুপিছু এসেছে!

আর্জানের আশঙ্কা মিথ্যা নয়। হারেজের মোটা ছাগলটাকে কুমিরটা নিয়ে গেল। ভাটার টানে বিলের জল একটু কমে এসেছে। অল্প জলে স্পষ্ট দেখা যায়,—ছাগলটাকে টেনে নিয়ে গেল।

একুশ

কুমিরের কামড়ে আর্জান বেশ কিছুদিন শয্যাগত। কর্মক্ষমতাও নেই। তবু তাকে শয্যা ছেড়ে উঠতেই হবে! ফতিমা আর কতদিন এবাড়ি-ওবাড়ি ঢেঁকির কাজ করে অন্নের সংস্থান করবে? তাই আর্জান একদিন জোর করেই উঠে গেল কাছারি-বাড়ি।

হারেজ সর্দারের সঙ্গে দেখা হতেই আর্জান একথা সেকথা তুলবার পর কাজের জন্য আবেদন জানাল।

হারেজ বেশ তীক্ষ্ণ সুরেই বলল, —কাজ! ভেড়ির তদারক? বন্যার তোড়ে ভেড়ি তো ভেঙেই চুরমার হয়ে গেছে। ভেড়ি নেই, তো ভেড়ির তদারক! তুমিই তো দায়ী। তুমি যদি ভেড়ি ভাল করে দেখতে, তাহলে কি বাঁধ ভেসে যেত?

অপ্রস্তুতভাবে আক্রান্ত হয়ে আর্জান বলল, —আমি দায়ী! যে বন্যায় গ্রামের পর গ্রাম ভেসে গেল, তার জন্য আমি দায়ী! মনে আছে না বড়মেঞা, শঙ্খচূড়ের কথা? রাত নেই দিন নেই ঘুরে বেড়িয়েছি এই ভেড়ির উপর দিয়ে। বুক পেতে এই বাঁধকে রক্ষা করেছি।...আর আমিই হলাম দায়ী!

যে-আর্জান কোনদিন কথা বলে না, তার মুখে এত কথা শুনে হারেজ থতমত খেয়ে গেছে। অল্প কথায় আলাপ শেষ করবার জন্য কাটা জবাব দিল,—কোনও কাজ আমার হাতে নেই।

আর্জানের ঠোঁট আবেগে কাঁপছে। সংযত হয়ে বলল, —বেশ! —বলেই সে কাছারি

ছেড়ে চলে এল।

বাঁধ ভাঙলে অনেক কাজ আছে। কোথাও বাঁধ রিপু করতে হয়, কোথাও নতুন কল বসাতে হয়, কোথাও বা নতুন করে ভেড়ির গাঁথুনি তুলতে হয়। কাজ অনেক, কিন্তু এবার কাছারি নতুন চাল চেলেছে। এতদিন কাছারি থেকেই ভেড়ির সব কাজ করান হতো। এবার প্রজাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার যেমন জমি আছে সেই হিসাব পরিমাণ মত তাদের নিজেদেরই বাঁধতে হবে। এতে প্রজারা একভাবে খুশিই হয়েছিল। তাদের আশা, এতে তাদের খাজনা নিশ্চয়ই কমে যাবে। কিন্তু আর্জানের এল সর্বনাশ। আর্জানের কোনও জমি নেই। তাই তার কোন কাজও নেই। এত কাজের মধ্যেও তার কোনও কাজ মিলবে না!

ফতিমা চিন্তিত হল। এইবার বুঝি আর্জান আবার বনকেই ভরসা করে। না, সে কিছুতেই দেবে না আর্জানকে বনে যেতে কালিকাপুরের ভরসা গেছে, হারেজ সর্দারের ভরসাও গেছে,—ডাক্তার-আবাদের ভরসাও এবার গেল। ফতিমা এবার মনে মনে ভরসা করে মহেন্দ্র ঘটকের উপর। এবার সে এলেই তাকে বলবে,—তাদের দেশে নিয়ে যেতে। সবাই তারা চলে যাবে। যেমন করে তারা একদিন কালিকাপুর ছেড়েছিল, তেমনি করেই ডাক্তার-আবাদ ছেড়ে চলে যাবে ঘটকের গ্রাম। আর্জানকে নিয়ে সে নির্বাসনে যেতে চায়। এই নির্বাসন সংসার থেকে বনে নয়—বন থেকে সংসারে! আর্জান আবার যেন বনে না যেতে পারে। কোন দিনও না। না, কোনও দিনও না!

গতবারে আর্জানের কথা অনুযায়ী এবার মহেন্দ্র ঘটক সত্যিই আগে থাকতেই এল। পৌষ মাসেই খটিতে এসে পড়েছে। প্রতি বছর গ্রামে ফিরে সুন্দরবনের কত গল্প করে গাঁয়ের লোকের কাছে। নিজের শিকারের গল্পই বেশি। একবার খটি থেকে যাবার সময় হরিণের মাংস নিয়ে গিয়েছিল এবং গ্রামের সবাইকে খাইয়েছিল।

সেই অবধি গ্রামে মহেন্দ্র ঘটকের নাম-ডাক—খুব বড় শিকারী। কিন্তু এবার একটা বাঘ না মারলে 'বড় শিকারী'র আর সম্মান যে থাকে না!

কিন্তু আর্জান যে-নতুন ফন্দির কথা বলেছিল, —তা সে ভুলেই গিয়েছিল। ঘটক আসতেই আর্জান ভারি খুশি হল। ফন্দিটা তারও কাছে নতুন। অনেক শিকারীর মুখে এই কৌশলের কথা শুনেছে। তবে এই ফন্দিটা নিজে হাতে করেছে এমন লোকের সঙ্গে তার আজও দেখা হয়নি।

আর্জানের হাতের আর পিঠের ঘা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু বড় বড় দাগ হয়ে রয়েছে। ঘটক তা দেখেই চমকে উঠে বলল,—ও কি আর্জান?

আর্জান হাসতে হাসতে বলল, —আর বলেন কেন বাবু! মরতে মরতে বেঁচে গেছি! —বলেই সে কুমিরের আদ্যোপান্ত কাহিনী শোনাল।

কুমিরের দাঁতের ছটা স্পষ্ট দাগ গুনতে গুনতে ঘটক বলল, —বাঘ-শিকারী তো বাঘের পেটেই যায়, তুমি শেষে কুমিরের পেটে যাচ্ছিলে!

আর্জান বড় বড় গোঁফের ফাঁক দিয়ে মিষ্টি হাসি হেসে বলল, না বাবু! বাঘের পেটে আমি যাব বলেই তো বেঁচে আছি!

আর্জান উৎসাহ নিয়ে নতুন ফন্দির তোড়জোড় করতে লাগে। হাট থেকে বড় একটা মাটির হাঁড়ি কিনল। বেশ মজবুত হাঁড়ি। পাকা বেত জোগাড় করে খুর দিয়ে চেঁচে চেঁচে একখণ্ড পাতলা চওড়া বেতের ছিল্‌কে বানাল।

ফন্দির কথাটা ঘটককে আজও পর্যন্ত খুলে বলেনি। ঘটক জানবার জন্য ব্যগ্র। জিজ্ঞাসা করলেই আর্জান বলে—হবে, হবে, —বলব!

না বলার কারণ ছিল। ব্যাপারটা নিয়ে ছেলেমানুষি করলে বিপদ হতে পারে।

কয়েকদিন পর আর্জান বলল, —এবার সব তৈরি। শুধু খেয়াল রাখবেন, কবে বাঘ ডাকে। সন্ধ্যার দিকেই খেয়াল রাখবেন। কোন দিকে ডাকছে তাও কিন্তু খেয়াল থাকে যেন।

ঘটক আবাদে আসার পর কয়েকবার আর্জানের বাড়িতে এসেছে। এলেই ফতিমা আর্জানের আড়ালে ঘটককে মনের কথা খুলে বলত। তাদের সবাইকে ডুমুরিয়া গ্রামে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করত।—মনে মনে চলে যাবার যতই ঠিক করুক না কেন, 'নির্বাসনে যাবার' কথাটা মুখ ফুটে বলতে ফতিমার বাধত। তবু সে বারবার বলত।

ঘটক প্রশ্ন করত, কেন? কেন তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ?

উত্তরে ফতিমা শুধু ওপারের বনটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত।

ঘটক বুঝিয়ে বলে,—আরে মাছকে জল থেকে তুলে নিলে কি বাঁচে? বন।...বনকে আর্জান কি ভালবাসে জানো?

বনের নাম শুনতেই ফতিমা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বলে, —না,—না,—বন চাই না! আমাদের নিয়ে যেতেই হবে। যাব আমরা এদেশ ছেড়ে দূরে...বহুদূরে!

দু-একদিন যেতে না যেতেই একদিন সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ ডেকে উঠল। খুবই কাছে। ওপারে বনের একটু ভিতরে। ঘটক তখন একাই খটিতে। তাড়াতাড়ি আর্জানকে খবর দিতে চলল। সিকি মাইল পথ। চারদিকে অন্ধকার। ওপারে বন। বাঘ ঘন ঘন ডাকছে। বনে এই রাত্রে বাঘের সন্ধানে উঠতে হবে! ঘটকের বুক কেঁপে উঠল। কেমন করে এই সিকি মাইল ভেড়ির পথ পেরিয়ে আর্জানের বাড়ি পৌঁছবে! বন্দুকটা সঙ্গে নিল। দুটি গুলিও পুরে নিল।

প্রায় এক নিশ্বাসে এ দীর্ঘ পথ দৌড়ে আর্জানের বাড়ি হাজির।

—আর্জান! আর্জান! আর্জান!

—শুনেছি, শুনেছি, আমিও শুনেছি—বলেই আর্জান বাইরে এল।

ঘটক আলোতে এলেই আর্জান বলল,—এ কি করেছেন? বন্দুকের ঘোড়া তুলে রেখেছেন! শীগগির ঘোড়া নামান।

নিজেই বন্দুকটা নিয়ে আর্জান ঘোড়া নামিয়ে বলল, —কিন্তু বন্দুক এনেছেন কেন?

—কেন? শিকারে যাবে না এখন? বাঘ যে ডাকল!

—পাগল নাকি! বাঘ ডাকলেই বাঘের পিছনে যাওয়া যায়! এই রাত্রে!

—তবে?

—তবে আর কি! কাল যেতে হবে। তবে ঠিক রাখবেন কিন্তু, কোন্ দিকে বাঘ ডেকেছে।

—কিন্তু তোমার ফন্দিটা কি?

—হবে, পরে হবে, বলব!

পরদিন বিকাল চারটা নাগাদ আর্জান ও মহেন্দ্র ঘটক একটা ডিঙি নিয়ে চলল। ডিঙিতে শিকারের সাজসরঞ্জাম, সবই নেওয়া হয়েছে। এই নতুন কায়দায় শিকার হবে, কি হবে না—তা আর্জান জানে না। সেজন্য এপর্যন্ত কাউকে সে বলেনি।

ডিঙি ছেড়ে দেবার পর আর্জান ঘটককে বুঝিয়ে বলল—তার ফন্দিটা কি। হাঁড়ির নিচে

গাছ-কাটা দা-এর মাথা দিয়ে কুরিয়ে কুরিয়ে একটা ফুটো করেছে। নিচে দিয়ে বেতের ছিলকের মাথা ঢুকিয়ে হাঁড়ির ভিতর দিয়ে লম্বা করে বের করল। তারপর ছিলকের নিচের দিকে বড় বড় গিঁট দিল। যাতে টানলে বেরিয়ে না আসে।

হাঁড়িটা ঘটককে দিয়ে বলল, —এবার হাঁড়িটা দু-পা দিয়ে চেপে দাঁত দিয়ে জোরে বেতটা টেনে ধরুন।

—তারপর ?

—বলছি, তারপর !

ঠিকভাবে ধরে আর্জানের কথামত একখানা ভিজে নেকড়া নিয়ে হাঁড়ির ভেতর থেকে বেতের উপর চেপে টান দিতেই ব্যাঘ্র-গর্জনের আওয়াজ বেরুল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ...

আর্জান বলল, —না, ঠিকমত হলো না। প্রথম দু-তিনবার জোরে হবে, তারপর ঘন ঘন হয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। থাক, এখানে আর দরকার নেই। জায়গা মত গিয়ে করা যাবে।

—কিন্তু জায়গা মত বাঘ আসবে কেন ? সে তো কাল রাত্রে ডেকেছিল এখানে। এতক্ষণে কোথায় চলে গেছে তার কি ঠিক আছে ?

—না, ঠিক যে পথে কাল বাঘ গেছে, ঠিক সেই পথেই ফিরবে, ফিরতে ও বাধ্য।

বছরে এই সময়ে বাঘ ডাকতে শুরু করে বাঘিনীর জন্য। শীতের শেষ দিকে বসন্তের মুখে হালকাভাবে খেলাধূলা করবার জন্য বাঘ ও বাঘিনী পাগল হয়ে ওঠে। বাঘিনীর দেখা পাবার জন্য বাঘ বন থেকে বনান্তরে ডাকতে ডাকতে যায়। কিন্তু ঠিক যে-পথে যাবে, ঠিক সেই পথেই ফিরবে। নিজের পদচিহ্ন দেখে দেখে ফিরবে। এতটুকু এপাশ ওপাশ হবে না।

এরই সুযোগে সুন্দরবনের মানুষেরা 'কল-পাতা' শিকার করে। বাঘ যে-পথ দিয়ে চলে গেল সেখানে একটা বন্দুক রেখে আসবে। একটা তে-কাঠার উপর এক বিঘৎ আট আঙুল উঁচু করে বন্দুকের নলটা রাখে। তারপর টিপের সঙ্গে কালো সুতো বেঁধে বাঘের পথের উপর আড়াআড়িভাবে একটু উঁচু করে টানা দিয়ে আসে। ফিরবার সময় বাঘের পায়ে লেগে সুতোয় টান লাগতেই বন্দুকে চোট্ হয়ে যায়।

এই পন্থাকে এদেশে 'কল-পাতা' বলে। এতে কোন সময় বাঘ মারা পড়ে, কখনও বা পড়ে না। মাপজোখ একটু গোলমাল হলেই চোট হলেও গুলি বাঘের গায়ে লাগে না। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও আবাদের লোকে বলে,—এই জানোয়ার এমন চতুর যে কল-পাতা হয়েছে সন্দেহ করলেই সে মুখে ডাল-পালা নিয়ে এগুতে থাকে। তাতে কালো সুতোটা কাঠিতে লেগে আগেই চোট্ হয়ে যায়।

আর্জানের নতুন পন্থায় কিন্তু অত হিসাব-নিকাশের দরকার নেই। বাঘের থাবার খোঁচ খুঁজবারও আবশ্যক নেই। মোটামুটি কোনদিক থেকে কোনদিকে গেছে তা গত রাত্রের ডাক থেকেই বুঝে নিয়েছে!

সেই আন্দাজে বনে উঠল। ডিঙিখানা দূরেই রাখল। ডিঙি দেখে বাঘের সন্দেহ হতে পারে। একবার সন্দেহ হলেই বাঘ সাবধানী হয়ে পড়বে।

হাঁটতে হাঁটতে নদীতে একটা বড় খালের মুখে গেল। বাঘ দক্ষিণমুখো গেছে ; কাজেই আর্জান উত্তর পাড়ে খালের মোহানার কোণে বলাসুন্দরীর ঝোপের আড়ালে বসল।

ঝোপের আড়ালে বসল বটে, কিন্তু একদম খালের মুখেই। যাতে খালের ওপার বেশ পরিষ্কার দেখা যায় ; বন্দুকের নলের মুখও যাতে এপাশ-ওপাশ ঘোরান যায়। আর্জান এবার হাঁড়ি আর বেত নিয়ে ব্যাঘ্র-গর্জন আরম্ভ করল। ঘটক বন্দুক হাতে তৈরি হয়েই

আছে।

বড় নদীতে বেশ হাওয়া দিয়েছে। সেই হাওয়ায় নকল ব্যাঘ্রগর্জন ভেসে যেতে লাগল। নদীর ওপার থেকে তার প্রতিধ্বনি আসতে থাকে। ঘটকের মাঝে মাঝে ভ্রম হয়, ঐ বুঝি বাঘের উত্তর। প্রথম প্রথম ঘটকের মজাই লাগছিল, —খেলার মত মনে হচ্ছিল। কিন্তু যতই দেরি হতে থাকে ঘটকের শঙ্কা বাড়তে থাকে। বাঘের আক্রমণের নানা ছবি তার মনে ভেসে ওঠে।

শঙ্কা বাড়ুক, তবু সে শক্ত হয়ে আছে। ভরসা তার মনে, সামনে পঞ্চাশ-ষাট হাত চওড়া খাল। বাঘের আসতে হলে খাল পার হতে হবে। আর্জান বলেছে, বাঘ ঐ দিকে গেছে, ঐ দিক থেকেই আসবে।

আর্জান একটু ব্যঙ্গসুরে বলল,—অমন করে খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে না ! বাঘ তো আর শিকারে আসছে না যে অমন করে চুপিসারে আসবে ! বাঘ আসছে আজ অভিসারে !

ঘটক কোন উত্তর দেয় না। ঢোক গিলে আবার স্থির হয়ে বসে।

আর্জান 'বাঘ-ডাকছিল' প্রথম প্রথম চার-পাঁচ মিনিট অন্তর। আস্তে আস্তে ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়েছে। এবার দশ বা পনেরো মিনিট অন্তর ডাকছে।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। সূর্যের আলো কোথাও নেই বললেই হয়। গাছের মাথায় হয়ত বা কোথাও এক-আধটু স্তিমিত রৌদ্ররেখা তখনও আছে। ডান দিকে বড় নদীর বিস্তীর্ণ জলরাশি তখনও শুভ্র রঙে চক্‌চক্ করছে, কিন্তু সামনের খালের জলে বনের ছায়ায় অন্ধকার নেমে আসে।

আর্জান ঘটকের গায়ে হাত দিয়ে বলল, —শুনলেন, অনেক দূরে একটা আওয়াজ ?

ঘটক কথার উত্তর না দিয়ে বন্দুকের ঘোড়া তুলতে যায়।

—না, না, এখন ঘোড়া তুলবেন না ! —বলেই আর্জান হাত দিয়ে থামিয়ে দিল।

আর্জান এইবার একটানা কয়েকবার ডাক দিল। ডাক থামাতেই বাঘের উত্তর এবার স্পষ্ট শোনা গেল। শুধু স্পষ্ট নয়, সে ছুটে আসছে।

ঘটকের বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে। লজ্জায় তা সে এখনও বলতে চায় না। কার কাছে বলবে ? আর্জান ? তার চেহারা পাল্টে গেছে। মানুষ যেমন রেগে উঠলে তার চেহারা পাল্টে যায়, বাঘ নিকটতর হতেই আর্জানের চেহারাও তেমনি পাল্টাতে থাকে। চোখ দুটি বড় বড় হয়ে গেছে। হাত পা ইশ্‌পিশ্ করতে থাকে, যেন কি একটা করবে ! তীব্র ও প্রখর দৃষ্টি। সে-দৃষ্টিতে যেন আশেপাশের কোন কিছুই ছায়াপাত করে না। আর্জানের যেন অন্য কোনও কিছুরই অনুভূতি নেই ! গাছপালা, ঝোপ, খাল, মহেন্দ্র ঘটক—কোনও কিছুরই যেন অনুভূতি নেই। ঘটকের কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাহসও হয় না।

বাঘ চলে এসেছে। আর্জান তবু আরেকবার বেতে টান দিয়ে ভীষণভাবে গর্জন তুললো। ওপারে ঝোপের পেছনেই বাঘ। আর্জান দাঁড়িয়ে পড়ে। বুঝবার চেষ্টা করে বাঘের মতলব। বাঁ হাত দিয়ে ঘটকের ডান হাত চেপে ধরে, যেন ঘোড়ায় সে হাত না দেয়। ঘটকের হাত যেন শক্ত হয়ে আসছে। এক ঝাঁকানি দিয়ে আর্জান তার চেতনা এনে দিল।

না,—বাঘ সামনা সামনি পার হবে না। খালটি বনের ভিতর গিয়ে হঠাৎ বেশ সরু হয়ে গেছে। আর্জানের বুঝতে বাকি রইল না, সেখান থেকেই বাঘ খাল পার হবে। বাঘ সেদিকেই গেল।

একটানে আর্জান ঘটকের হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল। কেড়ে নিয়েই ডান হাতে

বন্দুক আর হাঁড়ি নিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে ঘটককে টানতে টানতে জলে নামল।

একটু শুধু চাপা গলায় বলল,—ওপার।

সাঁতরে ওপারে গিয়ে ঘটকের যেন একটু সম্বিত ফিরে এসেছে। আবার ঝোপের আড়াল। বন্দুক আর্জানের হাতে। ঘটককে ইঙ্গিতে হাঁড়ি নিয়ে আওয়াজ করতে বলল।

ঘটক যেন আওয়াজ বের করতেই পারে না। কেমন যেন হয়ে গেছে! টানতে গিয়ে হাত থেমে যায়। আবার টানতে যায়, আঙুলে যেন জোর নেই।

ওপারে ঠিক যে জায়গায় আর্জানেরা ছিল, সেখানেই বাঘ ছুটে এল। ছট্‌ফট্ করছে। একবার ডাকছে, একবার গোঁ-গোঁ করছে। কোথাও একমুহূর্ত দাঁড়ায় না। এই এদিকে মুখ বাড়িয়ে অপর পারে তাকায়, আবার ওদিকে ছুটে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখে।

আর্জান অনুমান করল,—আর দেরি করা উচিত হবে না। দেরি করলেই আবার ঘুরে খালপার হয়ে এপারে আসবে।

কিন্তু গুলি করবে কি করে। ছট্‌ফট্ করছে। শরীরের সর্ব অঙ্গ যেন ওর দুলছে। একসেকেণ্ড ও স্থির হয়ে থাকতে পারছে না।। মত্ত হয়ে উঠেছে। এ-কে আর্জান রুখবে কি করে! ঘায়েল করার মত গুলি না করতে পারলে রক্ষা নেই—এই মদমত্ত বাঘের সামনে!

আর্জান বেপরোয়া হয়ে উঠল। ওকে আবার ঘুরে খাল পার হতে দেব না! একই মাটিতে দাঁড়িয়ে ঐ মত্ত বাঘের মুখোমুখি হলে রক্ষে নেই! তাড়াতাড়ি বন্দুক রেখে দিল মাটিতে। হাঁড়িটা ঘটকের হাত থেকে টেনে নিয়ে নিজেই বেতে টান দিয়ে আওয়াজ তুলল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ...

বাঘিনীর দেখা পাবার আশায় বাঘ উন্মত্ত! ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। ঘটক জলের শব্দ শুনেই আর্জানের পেছনে আড়াল নিল। আর্জান তবুও বন্দুক হাতে নেয় না। তীরবেগে সাঁতরে আসছে। জলের উপর নাক-মুখ-চোখ দেখা যায়। গুলি করলে করা যেত! কিন্তু যদি, ...না, কোনও 'যদি' নিয়ে এই উন্মত্ততার সামনে খেলা করতে আর্জান রাজি নয়! সেও বেপরোয়া—সেও উন্মত্ত! বন্দুক মাটিতেই পড়ে রইল। হাঁড়িতে আবার টান দিল। বাঘ যেন একটুও এদিক-ওদিক না যায়! সোজা তার কাছেই আসে।...খালের অর্ধেক সাঁতরে এসে গেছে।

এবার আর্জান হাঁড়ি ফেলে দিয়ে নিজের মুখেই ব্যাঘ্র-গর্জনের মত আওয়াজ করতে লাগল। আর্জান গর্জন করতে করতে বন্দুক হাতে নিল। ঘোড়া তুলতে তুলতে হিংস্র উন্মত্ত জানোয়ার এপারের মাটি স্পর্শ করেছে। তা করুক! জল থেকে আরও উপরে উঠুক! সামনেই পলিমাটির কাদা। বাঘের গতি একটু মন্থর। আর্জানের থেকে মাত্র পনেরো হাত দূরে!

আর্জানের চোখোচোখি হতেই মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য যেন মদমত্ত বাঘ অবাক হয়ে তাকায়, —হিংস্র চোখের চঞ্চল ভ্রূ যেন এক মুহূর্তের জন্য থেমে যায়! আর্জান টিপে টান দিল। গুলির আঘাতে একটু টলতেই আর্জান দ্বিতীয় গুলি করল। চোখের ধার দিয়ে মাথার খুলির একটা অংশ ছিটকে পড়ে গেল। চার হাত পা কাদায় দেবে ছিল ; সেখানেই ঢলে পড়ে গেল।

আর্জানের গা-হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। সে আর দাঁড়াতে পারে না। যেখানে ছিল সেখানেই বসে পড়ল।

...আর্জানকে স্থির হতে দেখে ঘটকের সাহস ফিরে আসে। প্রশ্ন করল, —কি হলো আর্জান?

—সাবাড় ! —আর্জানের এর বেশি কথা বলবারও যেন শক্তি নেই।
ঘটক একবার ভাল করে শায়িত বাঘকে দেখে নিয়ে আর্জানকে বলল, —নাও, একটু বিশ্রাম করে নাও।
—না না, বিশ্রাম করলে হবে না। ওখানে পড়ে থাকলে কোন্ সময় কুমির এসে নিয়ে চলে যাবে তার ঠিক নেই।
একটু পরেই দুজনে মিলে বাঘের লেজ ধরে টেনে খালের জলে ফেলে টানতে টানতে বড় নদীর মুখে নিয়ে এল।
দুজনে মিলে এবার টেনে চরের উপরে তুলবার চেষ্টা করে। পারে না। কোনমতে জলের একটু উপরে তুলে আর্জান বলল, —থাক্, এইখানেই থাক্। এবার বসে একটু অপেক্ষা করা যাক।
—কিন্তু ডিঙি আনতে হবে না?
—না, ডিঙি এনে এ বাঘ ডিঙিতে তুলবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তার চেয়ে একটু অপেক্ষা করি। নদীতে জো এসেছে। কাঠুরে-নৌকা দু-একখানা এ-পথ দিয়ে এখন যাবেই। তাদের ডাকলেই হবে।
বন্দুকটা ঘটকের হাতে দিয়ে আর্জান বলল, —তবে গুলি ভরে রাখতে হবে। জলের ধারেই পড়ে রইল। বড় নদী তো, কুমিরের ঠাহর পেতে আর কতক্ষণ।
আর্জান ও মহেন্দ্র ঘটক পাশাপাশি বসল। নদীর বুকে তখনও ঘন অন্ধকার নেমে আসেনি। বনে কিন্তু অন্ধকার। বাঘের তর্জনগর্জনে এ মুল্লুকে আর কোন জীবজন্তু নেই। আর্জান তাই নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে।
বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে শান্ত হয়ে থাকবার পর ঘটক বলল, —কি দুর্জয় সাহস তোমার, আর্জান! কি লড়াইটাই না তুমি করলে এই হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে! কোথাও এতটুকু পিছপা হলে না! কিন্তু কোথায় তোমার এই সাহস লুকানো আছে? আবাদে তোমার এই চেহারা তো কোনও দিন দেখিনি! বাদায় তুমি দুর্দমনীয় কিন্তু,...
দুজনেই চুপচাপ। আর্জানের মুখে তৃপ্তির প্রশান্ত হাসি। আর্জানের কানে 'কিন্তু' কথাটা বিধে ছিল। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, —কিন্তু কি?...
—বাদায় তুমি দুঃসাহসী কিন্তু আবাদে তুমি অমন নিরীহ কি করে হও?
—ও। থাক্ ওসব কথা।...এখন যে রাত হয়ে এল। কোনও নৌকার যে দেখা নেই! তার চেয়ে এক কাজ করুন, —আমি ডিঙিখানা এনে দিচ্ছি। আবাদে গিয়ে লোকজন আর একখানা বড় নৌকা নিয়ে আসুন।

ঘটক ডিঙি নিয়ে ডাক্তার-আবাদে যেতেই হৈচৈ পড়ে গেল। দেখতে দেখতে গ্রামের প্রায় সকলেই জড় হয়ে পড়েছে আর্জানের ঘাটেই। সবার মুখে আর্জান ও মদমত্ত বাঘের কথা। যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। সবাই বনে আসতে চায়। একখানা, —দুখানা, —তিনখানা নৌকা ভরে গেছে লোকে। এ যেন জয়যাত্রা!
ফতিমা দাঁড়িয়ে ছিল তুফোকে কোলে করে বাঁধের উপর। ঘটক ফতিমার কাছে ছুটে এসে তুফোর গালে হাত দিয়ে বলল, —জানিস্! তোর বা'জান এ—ই এ—তো বড় বাঘ মেরেছে। ভী—ষ—ণ বাঘ। তোর বা'জান মেরেছে। যাবি? যাবি?
তুফো চিৎকার করে ওঠে,—বা'জান! বাঘ! বা'জান! বাঘ! —সে যেন থামতেই চায় না। জোর করে মায়ের কোল থেকে নেমে পড়ল। গুটিগুটি পায়ে ছুটে যেতে চায়

নৌকায়। সে-ও আজ বনে যাবে।

ফতিমা ? সে-ও বুঝি পারে না নিজেকে সামলাতে। পরাজয়। সে-ই না চেয়েছিল বনের বন্ধনকে ছিন্ন করতে ? চেয়েছিল না আর্জানকে বন থেকে ছিনিয়ে নিতে ? পরাজয়ের প্লাবনে মনের বাঁধ আজ বুঝি ধ্বসে যায়। চোখ দিয়ে তার দু-ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ে। আনন্দে না পরাজয়ে, তা সে জানে-না। সারা বন,—গোটা আবাদের মানুষ যেন আজ তাকে বনের দিকে ডাকে।

নৌকার পাশেই চরের কাদায় ঘটক দাঁড়িয়ে ছিল। তুফো ছুটে গিয়ে কাদার মধ্যে তার হাত জড়িয়ে ধরেছে। সে যাবেই বনে।

ফতিমা দূর থেকেই দেখে। এই ঘটকই না ছিল বনের মায়া কাটাবার তার শেষ ভরসা। হঠাৎ সে ঝাঁকি দিয়ে আঁচল গুটিয়ে ছুটে যায় তুফোর কাছে। পরাজয়ের গ্লানি মুখ থেকে মুছে ফেলে দিয়ে তুফোকে জড়িয়ে ধরে ঘটককে শুনিয়েই বলে, —চল্ তুফো। আমিও যাব।

ঘটক চলে যাবার পর আর্জান এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে একা চুপচাপ বসে আছে। সামনেই রক্তাক্ত বাঘ পড়ে আছে। ঘটকের প্রশ্ন তার মনে পড়ে যায়— 'বাদায় তুমি দুঃসাহসী কিন্তু আবাদে তুমি এমন নিরীহ কি করে হও।' —এ-প্রশ্ন তো আগে কেউ তাকে করেনি। নিরীহ ? সে সত্যিই তো নিরীহ। তার জমির কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে তার ভিটের কথা, হেঁতাল গাছের কথা, মায়ের কবরের কথা। হ্যাঁ, সে নিরীহ। সবই তার গেছে, তবুও কাউকে কিছু বলেনি। ...না—না—না—সে নিরীহ নয়। ঘটকই না তাকে বলেছিল মাকড়সার জালের কথা। একলা কেউ একে ছিন্ন করতে পারে না। সে-ও বুঝি একলা বলেই হারিয়েছে তার ভিটে, তার মাটি। না—না, সে নিরীহ নয়। বাঘ হিংস্র, বাঘ দুর্জয় সাহসী। একা পেয়েই সে তাকে শিকার করেছে। বাঘ একা তাই সে মরে—তাই সে ফাঁদে পড়ে !...না—না, সে নিরীহ নয়। বাঘের লেজটা সামনে পড়ে ছিল। হাতের মুঠোয় তা শক্ত করে চেপে ধরে আর্জান অনুভব করে নিজের পরাক্রমের শিহরণ !...না—না, সে ভীরু নয়।

———

সুন্দরবন

এক

বুড়ো আয়না মিস্ত্রি শুধু বুড়োই হয়নি, খানিকটা অথর্বও হয়ে পড়েছে। চোখেও কম দ্যাখে। কিন্তু বুড়ো হলেও বেশি কথা বলে না। তবে কথা যখন বলবে, একটা বিরক্তি ভাব নিয়েই যেন বলবে। সব কাজে সবার উপর বিরক্ত হয়েই আছে।

ডিঙি সরিয়ে কিনারা থেকে বেশ কিছুটা দূরে আয়না মিস্ত্রি লগি পুঁতছিল—রাতের মতো যাতে ডিঙিখানি কায়েমী করে বেঁধে রাখা যায়। লোনা জোয়ার-ভাটির দেশ! সাবধানের মার নেই। দেহের ওজন দিয়ে বুকের মধ্যে সাপ্‌টে লগি পুঁততে পুঁততে মিস্ত্রি রহিম বাওয়ালিকে বলল,—তোদের আর শখ মেটে না। বুড়ো হয়ে গেলি, তবু পাখির শখ গেল না! বেলা গড়িয়ে যায়, কোথায় ডিঙিতে আসবি, তা না, পাখি ধরবে। বনে এলেই যেন তোরা ছোক্‌রা হয়ে যাস!

রহিম বাওয়ালি বুড়ো মিস্ত্রিকে অমান্য না করেই বলল,—না, মিস্ত্রি, এখনও বেলা ঢের আছে। তুমি তো চোখে কম দ্যাখ। মেয়েটা আসবার সময় বলেছিল একটা পাখির কথা। আমি এক্ষুনি ফিরব। তুমি কিন্তু ফজরকে ডেকে নিয়ো। ঐ ওপারে কাঠ কাটছে। তালতলার বনে বেলা পড়ার আগেই ডিঙিতে ওঠা ভালো।

তালতলার বন। এমন কেন নাম হলো, তার কোনও হদিশ নেই। এখানে কেন, গোটা সুন্দরবনের কোথাও তালবন তো দূরের কথা, তালগাছের চিহ্নও মিলবে না।

এঁকে বেঁকে বনের ভিতর চলে গেছে খরস্রোতা খাল। খুব চওড়াও নয়, খুব সরুও নয়। এত জায়গা থাকতে কেন যে সুদরবনের পাখিরা এই খালটিকে পছন্দ করেছে—কেউ বলতে পারে না। এখানে ঢুকলেই দেখা যাবে নানা রঙের পাখি এই উড়ছে, এই বসছে। মাছ-রাঙা, চিল, চাতক, ফিঙে, গয়াল, মানিক, মদনা, শামখোল, দুধরাজ, রক্তরাজ, ভীমরাজ,—তাছাড়া তো বক আছেই। এত বক, যে এক একটা গাছের মাথা সাদা হয়ে থাকে। তারই জন্য আবাদের মানুষ খালটি নামকরণ করেছে—বক্‌-খাল।

আজ তিনদিন হলো ওরা এসেছে এই বক্‌-খালে। এসেছে নোনাখালি আবাদ থেকে। কয়রা নদীর উত্তরে নোনাখালি খুলনা জেলার অন্যতম দীর্ঘ আবাদ। উঁচু-ভেড়ি গোল হয়ে ঘিরে আছে এই আবাদকে। ভেড়ির পাশে পাশে বসতি। মাঝখানে ধুধু করছে ধানের খেত। খেতের ঠিক মাঝে কিন্তু আজও জমি ওঠেনি। সারা বছরই জল থৈথৈ করে সেখানে। এই আবাদেরই পুবদিকে আয়না মিস্ত্রির বাড়ি। বাড়ির পাশেই এক অশ্বত্থ গাছ। হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, সকলেই দূর দূর গ্রাম থেকে এসে এই গাছের ঝুরি ও ডালে ইট বেঁধে মানত করে বনদেবীর নামে। লোনা দেশে অশ্বত্থ গাছ হওয়াই এক আশ্চর্য। তাই ভাটি-দেশের মানুষ অবাক হয়ে বিশ্বাস করে এই গাছের আশ্চর্য ক্ষমতা না থেকেই যায় না।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে রাত্রে এই অশ্বত্থ গাছ এক ভীতির বস্তু। অন্ধকারে তারা কেউ এর ধারে কাছে আসতে চায় না। কিন্তু দিনের আলোয় এই গাছের তলায় ছেলেমেয়েদের হৈ-হল্লা লেগেই থাকে। পাড়ার দশবছরের মেয়ে মমতাজও ছেলেমেয়েদের কোলাহলের টানে রোজই এই গাছের তলায় আসে। দু'একটা খেলাতেও যোগ দেয়। তবু মমতাজ যেন কেমন নির্জীব। বেশির ভাগ সময় চুপচাপ বসে থাকে।

অন্যেরা তা সইবে কেন ? তারা কখনও অনুরোধ করে, কখনও বা টেনে জোর করে খেলায় নামাতে চায়। নামেও মমতাজ। কিন্তু আয়না মিস্ত্রিকে একবার দেখলে কেউ আর মমতাজকে টানাটানি করতে যায় না। আয়না মিস্ত্রি যেন মমতাজের এক আশ্রয়। মমতাজ ব্যাকুল হয়ে আয়না মিস্ত্রির অপেক্ষা করে,না, আয়না মিস্ত্রি মমতাজের টানে আসে এই অশ্বত্থ গাছের তলায়—তা বলা দুঃসাধ্য। মিস্ত্রি এলে মমতাজ তার কাছে গিয়ে বসবে, আর এটা-সেটা গল্প করেই চলবে।

মিস্ত্রি মমতাজকে কাছে পেলেই বলবে,—জানিস, তোর আম্মা আমাকে কেমন ঘটা করে সাবুদ খাইয়েছিল। কত রকম যে মাছ খাইয়েছিল, তা তুই বলতেই পারবি না!…

মায়ের কথা উঠতেই মমতাজ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মায়ের খুঁটিনাটি কথা শুনবার আগ্রহ তার থামতে চায় না। বলে,—নানা। আম্মা কেমন রাঁধতো ? আচ্ছা, আম্মা কোন পথে জল আনতে যেতো ? তার মাথায় কি ঘোমটা থাকতো ?… প্রশ্নের যেন অন্ত নেই। সে-প্রশ্নের কারণ অকারণও নেই।

আয়না মিস্ত্রি এমনিতে সব সময় বিরক্ত হয়ে থাকলে কি হবে মমতাজকে একবার পেলে গল্প করবার, আজে-বাজে কথা বলবার, আমোদ আহ্লাদ করবার নেশা তাকে পেয়ে বসে। সে আজ দশ বছরের কথা—তার সবচেয়ে ছোট মেয়ে মারা যাবার পর থেকে মিস্ত্রি এমনিধারা খিটখিটে হয়ে গেছে। এক মমতাজকে পেলেই বুড়ো অন্য রকম হয়ে যায়। অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার তামাক খাবার আকর্ষণও সেজন্যই।

মমতাজের বা'জান রহিম বহুদিন ধরে বাওয়ালির কাজ করে। বাওয়ালির কাজ মানে, প্রায়ই বনে যেতে হয়। বাঘ তাড়াবার কাজ। কাঠ, মধু বা গোলপাতা কাটবার দলের রক্ষক হয়ে বাওয়ালিদের সুন্দরবনে যাওয়া মানে—এক এক সময় একমাস দু'মাস কাটিয়ে আসা। কাজেই বছরের বাকি অল্প সময়টুকু যখন সে বাড়ি থাকে, মা-হারা মমতাজকে যেন বুকের মধ্যে করে রাখে। আদরে যেন সে মায়ের স্নেহকে পূরণ করে দিতে চায়।

এবার অবশ্য মাত্র তিন-চারদিনের জন্য বনে এসেছে। জ্বালানি কাঠ কাটবে। নিজের সংসারের জন্য। জ্বালানি কাঠ কাটতে তেমন হাঙ্গামা বা গাছ বাছাবাছি নেই। বনে আসবার সময় মমতাজ বা'জানকে আব্দার করে বলেছিল,—এবার তোমাকে আমার জন্যে একটা পাখি এনে দিতেই হবে। কতবার বললে, এনে দেবে। একবারও তুমি দাও না!

আব্দারের উত্তরে বাওয়ালি যেন অপরাধীর মতো বলল,—বরাবরই তো পরের কাজে বনে যাই। এবার তো নিজের কাজ, নিশ্চয় সময় অনেক পাব। এবার তোকে ঠিকই এনে দেব। তুই কিন্তু ঘরদোর সামলে রাখিস।

* * *

আজ তালতলার বনে সাঁজের বেলা পাখির কথা উঠতে বুড়ো মিস্ত্রি তিতিয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু মমতাজের আব্দারের কথা শুনতেই আর দ্বিতীয় কথাটি বলেনি।

রহিমের মতলব, এবার গয়াল পাখি সে একটা ধরবেই। দড়ির জাল ও আঠা দিয়ে আগে থাকতেই ফাঁদ পেতে রেখেছে। ডিঙি থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে একটা কেওড়া গাছ। কিছুটা হেলে আবার খাড়া হয়ে উপরে উঠেছে। মাথায় ঝাঁকাল পাতা। রহিম এই গাছটি বেছেই ফাঁদ পেতেছিল।

বাওয়ালি এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্য একমাত্র তার, গয়াল পাখির ডাক শোনা যায় কিনা। আজ দুদিন ধরে এই গাছে গয়াল পাখিকে উড়ে এসে বসতে দেখেছে। কাছে এসেই উপর দিকে ভালো করে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে—পাখি ফাঁদে পড়েছে কিনা।

একবার পাতার আড়ালে সামান্য একটু নড়তেই রহিমের বুঝতে বাকি রইল না। ফাঁদে পাখি আছে। কিন্তু খুব সাবধানে এগুতে হবে। যদি জানতে পায় তাকে কেউ ধরতে আসছে—অমনি ঝাঁপাঝাঁপি করে উঠবে। ফাঁদ থেকে মুক্ত হবার শেষ চেষ্টা সে করবেই।

বাওয়ালি তার কুড়ুলের ফলা পিঠের দিকে কোমরের বাঁধনের মধ্যে গুঁজে দিল। আপন ওজনে কুড়ুল ঠিকমতো ঝুলে রইল। ধীরে ধীরে এবার গাছে উঠেছে। সামনেই নিচু ডাল। বেশ মোটা ও শক্ত। তার ওপর দাঁড়ালেই আর একটি ডাল, হাতেই পাবে। সেটি ছাড়ালে আরেকটি সরু ডাল। তার ওপরেও কয়েকটি সরু ডাল-পালা চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। তারপর পাতার ঝাঁক। এই সরু লিকলিকে ডাল থেকে ফাঁদের দড়ি ঝুলছে। নিঃশব্দে এই দড়ি ধরতে হবে।

বাওয়ালির ভাবনা, কেমন করে নিঃসাড়ে গাছের মাথায় পৌঁছবে। কোনও শুকনো ডাল-পাতায় হাত পড়লে বনের সবাই চমকে ওঠে—পাখি তো দূরের কথা। বাওয়ালি উঠছে, ক্রমেই উপরে উঠছে। গুঁড়ি ও ডালের সঙ্গে বুক লাগিয়ে ও লেপটে। শরীরের ওজনটাও ঠিকমতো সরিয়ে সরিয়ে নিতে হবে। যতই ওপরে উঠবে, ততই সাবধানী হতে হবে। দেহের ওজন একটু বেতালে ঝুঁকে পড়লে গাছের ডাল কেঁপে উঠবেই উঠবে। সমস্ত মন, দৃষ্টি ও কান পাতার ঐ ঝোপের দিকে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে রহিম ওপরে উঠছে—নিঃশব্দে।

শুধু রহিম নয়। সুন্দরবনের এক হিংস্রতম জীবও। যার এক এক হাঁকে গোটা বন কেঁপে ওঠে। সেও নিঃসাড়ে, নিঃশব্দে, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে বাওয়ালিকে অনুসরণ করে এসেছে। বাঘ দু'পায়ে ভর করে দু'থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে প্রথম ডাল পর্যন্ত।

বাওয়ালিও আরেক ধাপ ওপরের ডালে উঠে হাত বাড়িয়েছে ফাঁদের দড়ি ধরতে। বাঘ হয়তো আর দেরি করতে চায় না। এতদূর পর্যন্ত বাওয়ালির অলক্ষ্যে এসেছে। কেমন করে এলো, সে এক আশ্চর্য। দৃষ্টি এড়ালেও ঘ্রাণকে বুঝি আর এড়ান যাবে না। বাতাস বইছে বটে, কিন্তু বনের ভিতর হাওয়া মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়। একবার থমকে দাঁড়ালে বাওয়ালির নাকে দুর্গন্ধ যেতে এতটুকু দেরি হবে না। দুর্গন্ধ ! না, বনের মাঝে এ গন্ধ দুর্গন্ধ নয়। আঁতকে ওঠার গন্ধ। বাঘ হুঙ্কার দিয়েই ঝাঁপিয়ে উঠল প্রথম ডালে।

ততক্ষণে বাওয়ালি ফাঁদের দড়ি হাতের কব্জিতে জড়িয়ে ফেলেছে। বীভৎস হাঁকে কেঁপে উঠে চেয়ে দ্যাখে, পায়ের নিচে মৃত্যুর করাল মুখব্যাদান ! বাওয়ালি তার দীর্ঘ জীবনে এমন বাঘের ফাঁদে কোনও দিন তো পড়েনি। মন্ত্র ! বাঘ তাড়াবার বাওয়ালি-মন্ত্র ! বাক্‌শক্তি দূরের কথা, সর্বাঙ্গের পেশী অচল, চিন্তা শক্তিও স্তব্ধ !

বাঘ গোঁ-গোঁ করছে। হেলান গাছের প্রথম ডালে উঠেছে। কিন্তু তারপর ! পরের ডালে রহিমের পা। এবার দু'পায়ে দাঁড়িয়ে তাকে ধরতে গেলে ঝুল সামলাতে পারবে কিনা,—তাতেই বোধহয় সে দোমনা।

বাওয়ালি স্তব্ধ হয়েই ছিল। দড়ির টানে না হলেও, বাঘের গন্ধে ও হুঙ্কারে ফাঁদের গয়াল পাখি মরণ-চিৎকার দিয়ে উঠেছে। মৃত্যুর সামনে চিৎকার তাহলে করা যায়! বাওয়ালি যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেল। গলা ফাটিয়ে সেও গালি দিয়ে ওঠে। দু'পায়ের কেঁচকিতে ডাল জড়িয়ে ধরে দু'হাতে কুড়ুল বাগিয়ে ধরল। সুন্দরবনের কাঠুরিয়াদের ছোট হাতলের মাথাভারি কুড়ুল। উদ্ধত হাতের কব্জিতে ফাঁদের পাখি ঝুলছে।

লব্ধ শিকারকে বাঘ আর অবহেলা করতে চায় না। বিকট হুঙ্কার দিয়ে উপরের ডালে বাওয়ালির পায়ে থাবা মারল। বিস্ফারিত বক্র নখের থাবা। বাওয়ালিও ক্ষিপ্ত। দেহের সর্ব শক্তি দিয়ে কুড়ুলের কোপ মারল বাঘের হাঁড়ির মতো মাথা লক্ষ্য করে। থাবার উপর শরীরের ভর থাকায় কুড়ুলের কোপের বাইরে মাথা সরাতে পারে না। সারবান সুন্দরী কাঠে যেমন করে কুড়ল বসে যায়, তেমনি করেই বসে গেল বাঘের কানের পাশে।

অত বড় জীবের আর গাছের ডালে ঝুল রাখা সম্ভব নয়। নখের মধ্যে বাওয়ালির পায়ের মাংস ও আঙুল ছিঁড়ে নিয়ে ধপাৎ করে পড়ল মাটিতে। মানুষ ও বাঘের রক্ত ছিটকে পড়ল গাছের ডালে ডালে।

শিকার ও শিকারীর হাঁক-ডাকে বুড়ো আয়না মিস্ত্রির অনুমান করতে কিছুই বাকি থাকে না। ফজরও ছুটে এল। খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে মিস্ত্রির কাছে এসেছে। দুই বাপ-বেটায় এবার বড় বড় লাঠি নিয়ে হৈহৈ করতে করতে ডাঙায় উঠেছে। যদি কোনমতে বাওয়ালিকে রক্ষা করা যায়! মিস্ত্রি একবার শুধু দাঁত কিড়মিড় করে বলল—পাখি! পাখি চাই!

দুজনে এগিয়ে দেখে, রক্তাক্ত বাওয়ালি জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে আছে। পায়ের পাতা খানিকটা উড়ে গেছে। রক্ত ঝরে পড়ছে। দু'জনে মিলে সমানে হাঁকাহাঁকি চিৎকার করেই চলেছে। বলা যায় না,—শালা কোথাও ওৎ পেতে থাকতে পারে! আতালি-পাতালি লাঠির বাড়ি মারে আর চিৎকার করে।

হঠাৎ বুড়ো আয়না মিস্ত্রি দাঁড়িয়ে পড়ে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। বাওয়ালির হাতের কব্জিতে ফাঁদের দড়ি জড়ান। গয়াল পাখিও আটকে আছে ফাঁদে। মিস্ত্রি পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পাখির দিকে। চোখের কোণ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ে।

ফজর সজোরে মিস্ত্রির বাহুতে নাড়া দিয়ে বলল,—কাঁদছ কেন? নাও, শীগ্‌গির,...বাওয়ালির ধড়ে প্রাণ আছে। বেঁচে আছে। নাও!

দু'জনে মিলে বাওয়ালিকে ধরাধরি করে ডিঙিতে নিয়ে এল। কালবিলম্ব না করে ডিঙি ছেড়ে দেয়। আর নয়, আর এক মুর্হুতও ওরা তালতলার বনে থাকতে চায় না। মাথায় জল ঢালতে ঢালতে, আর মুখে মিষ্টি জল দিতে দিতে বাওয়ালির চেতনা ফিরে এল। পায়ের পাতা জোরে বাঁধতে রক্ত পড়াও বন্ধ হয়েছে। তবুও বুড়ো মিস্ত্রির ভাবনা যায় না। তার সুদীর্ঘ জীবনে সুন্দরবনের বাঘে একবার ছুঁলে সে যে কাউকে বাঁচতে দ্যাখেনি।

পরদিন ভোরে ডিঙি নোনাখালি আবাদের যত কাছে আসতে থাকে বুড়ো আয়না মিস্ত্রি ততোই যেন কেমন হয়ে যায়—চঞ্চলও হয়ে ওঠে। বারবারই মনে পড়ে মমতাজের কথা,—তাকে কি বলবে! কি বলেই বা সান্ত্বনা দেবে! সে কি বা'জানকে দেখে শান্ত থাক্‌তে পারবে? নিশ্চয় মুষড়ে পড়বে! আচ্ছা, তখন যদি গয়াল পাখি তাকে দিই? নিশ্চয় অনেকখানি শান্ত হবে। না, না, পরে না, আগেই, বা'জানকে দেখবার আগেই তাকে পাখিটি দেব। খুশি-মন থাকলে বা'জানকে দেখেও তখনকার মতো সামলে নিতে পারবে। আমিই তাকে হাতে করে গয়াল পাখি দেব......ছুটে গিয়ে দেব।

ডিঙি এগিয়ে চলে। গলুই-এর মাথায় পাখিটি বাঁধা। প্রথম প্রথম ছাড়া পাবার আশায় ঝাঁপাঝাঁপি করেছে। কিন্তু তারপর ঝিমিয়ে গেছে। গলাটা দেহের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে ঠোঁট আকাশ-মুখো উঁচু করে বসে আছে তো বসেই আছে। কিন্তু বনের পাখি এবার বন ছেড়ে ফাঁকা মাঠে লোকালয়ের কাছে আসতেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মিস্ত্রিও চঞ্চল। সে আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না। একবার বাওয়ালির কাছে বসে, একবার গয়াল পাখির কাছে এগিয়ে যায়। মমতায় তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে চায়।

আবাদের ঘাটে ডিঙি লাগতেই মিস্ত্রির কল্পনা গুলিয়ে গেল। ধরাধরি করে ওপরে তুলবার সময় বাওয়ালি বলল,—মিস্ত্রি, কই, পাখিটি দিলে না!...দাও আমার হাতে।

মিস্ত্রি পাখির দিকেই তাকিয়ে। হাঁ বা না, কিছুই বলতে পারে না। ধীরে ধীরে বাওয়ালির হাতেই পাখিটি দিল।

বাওয়ালিকে কাঁধে করে চরের হাঁটু-সমান কাদা পেরিয়ে ওরা ভেড়ির ওপর উঠল। ভেড়ি পার হয়ে এবার ভিতর-মাঠে পড়েছে।

সকালবেলা অশ্বত্থ গাছের তলায় মমতাজ গুম্ হয়ে বসে ছিল। দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়েই ছুটে আসে। বাওয়ালিকে আর কাঁধে তুলে রাখবে কি! মমতাজ বা'জানকে দেখেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

বাওয়ালির চোখেও জল ঝরে পড়ে। মমতাজের মাথায় হাত বুলিয়ে একবার শুধু বলল,—ভয় নেই, আম্মা,...বেঁচে আছি! বলেই সে গয়াল পাখিটি মমতাজের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করল।

অশ্রুসিক্ত চোখে মমতাজ নজর দেয় পাখিটির দিকে। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে একটানে পখিটি ছিনিয়ে নিয়ে উড়িয়ে দিল আকাশে।

দুই

চৈত্র মাসের নোনা-ফাটা রোদ। কেওড়া গাছের ছায়ায় পাড়ার দুই দুরন্ত ছেলে—আছের ও সোনা। বসে বসে কাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছে, আর এটা-সেটা গল্প করছে।

বাঁধের উপর তারা আনমনে বসে। দুদিকে দীর্ঘ বাঁধ নদীর গা বেয়ে চলে গেছে। এই সেদিনও বাঁধ সবুজ নোনাঘাসে ঢাকা ছিল। ফাগুনের পর চোতের রোদে সেই সবুজ ঘাস কালসিটে হয়ে যেন মরে পড়ে আছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে মাটি ফেটে সাদা নোনা ফুটে উঠেছে। ঝলসানো রোদে চক্‌চক করছে।

ওদের পেছন দিকে ফাঁকা দুরন্ত মাঠ। সেদিনও সোনার ফসলে ভরে গিয়েছিল। আজ খাঁখাঁ করছে। ধান কেটে নিয়ে যাবার পর খড়ের গোছা সারা মাঠ ছেয়ে ছিল। গাঁয়ের লোকেরা আগুন দিয়ে সে সব পুড়িয়ে মাঠ যেন কালো করে দিয়েছে। এই ছাই হয়তো আগামী সনে খুলনা জেলায় এই আবাদ অঞ্চলে সোনা ফলাবে, কিন্তু আজ বাতাসের সঙ্গে উড়ে উড়ে খাঁখাঁ রোদকে আরও রুক্ষ করে তুলেছে।

সামনেই নদী। নোনাজলের নদী। তারপরেই বন। সুন্দরবন। গাঢ় সবুজ বন। চোতের রোদকে উপেক্ষা করেই যেন ঝরা-পাতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন সবুজ পাতায় সে আরও সবুজ হয়ে উঠেছে।

আছের আর সোনা বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিল। কেউ শুনবার নেই। যেদিকে

তাকাও কোথাও কোনো জনমানব নেই। দূরে ওদের পাড়ায় দু'একজন কাজকর্ম করছে। তারই এক-আধটু যা খট্‌খট্ শব্দ। কেওড়াগাছের উপর-ডালে দুটি বাঁদর অলসভরে এ-ওর পিঠ খুঁটছে।

আছের আশ্চর্য হয়েই বলল,—তুই কি বললি ?

সোনা সোৎসাহে বলল,—কেন ? আমি বুঝি বললাম না ! বললাম,—তোমাদের দেশে রেলগাড়ি আছে, আমার দেশে নৌকো আছে, বড় বড় পাল দেওয়া। তোমার দেশে বড় খেলার মাঠ আছে, আমার দেশে তার চেয়েও ঢের বড় মাঠ আছে—এপার-ওপার দেখা যায় না।

আছের প্রায় ধমক্ দিয়ে উঠল,—কেন, বলতে পারলি না—আমার দেশে সুন্দরবন আছে !

—দূর বোকা ! বাদার কথা কি বলার কথা !

সোনা গিয়েছিল তার বা'জানের সঙ্গে খুলনায়। ওদের নায়েবের বাড়ি খুলনা শহরে। খুলনার কথা বলতে বলতে নায়েবের ছেলের সঙ্গে যে-সব গল্প হয়েছিল তার কথা উঠে যায়।

একটু থেমেই আছের বলল,—কেন ? তুই বুঝি বলতে পারলি না বাঘের কথা ? আমার দেশে কত বাঘ আছে !

—বাঘ ! বাঘ তো 'কোনোদিন দেখিনি ! কী করে বলব ?

—না, উনি দ্যাখেননি। না দেখেছিস তো কি হয়েছে ! বানিয়ে তো বলতে পারতিস্। এ—ই এ—ত বড় মুখ, গোল গোল চোখ। এত বড় হাঁ করে গক্ করে কামড়ে দেয় ! এক এক থাবায় আঠারো মানুষের বল' !......

বলতে বলতে আছের তন্ময় হয়ে যায়। কাল্পনিক রেলগাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে যেন তাদের দেশের বাঘের গল্প করে শহরের ছেলেদের তাজ্জব বানিয়ে দিচ্ছে।

আছের সেই অবধি মনে মনে ভেবে রেখেছে,—যাবে সে একদিন চার জোয়ার আর চার ভাটির পথ ডিঙি বেয়ে খুলনা শহরে। রেলগাড়িও দেখবে, বঘের গল্পও করবে। কিন্তু তার আগে তাকে একবার বাঘ দেখে নিতেই হবে।

বাঘ দেখে নিতে হবে বললেই কি হয় ! সুন্দরবনে অনেক বাঘ আছে। অনেকে দ্যাখেও। কিন্তু যে দ্যাখে তাকে আর বন থেকে ফিরতে হয় না।

আছের ইতিমধ্যে অনেক বড় হয়ে গেছে। বেশ জোয়ানও হয়েছে। আছেরের বাবা নেই, মা-ও নেই। থাকে চাচার বাড়িতে। তাই ছেলেবেলা থেকেই তাকে খেটে খেতে হয়। কাজ করতেও সে ভালোবাসে। যে-কাজে গায়ের জোর লাগে, সে-কাজ পেলে তো ছুটে এগিয়ে যাবে। এত কাজ করে বলেই আছের আজকাল এমন জোয়ান হয়েছে।

আছেরের চাচা গরিব চাষী। তাই খেত-খামারের কাজে তার সংসার চলে না। প্রায়ই তাকে বনের ভেতরে যেতে হয়। কখনও মধু, কখনও কাঠ, কখনও বা গোলপাতা, আবার কখনও বা বন থেকে মাছ এনে বিক্রি করে তার সংসার খরচ চলে। অন্য কাজে না হলেও, কাঠ কাটবার সময় চাচা আছেরকে সঙ্গে নেবেই নেবে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি টেনে এনে ডিঙি বোঝাই করার কাজে জোয়ান আছের ওস্তাদ।

কত বছরই তো বনে গেল আছের। কিন্তু বাঘ আর তার দেখা হয় না। বনে অন্য কাজে গেলে সকালে গিয়ে বিকেলেই ফেরা যায়। কিন্তু কাঠ কাটতে গেলে অনেক রাত অনেক দিন বনেই কাটাতে হয়। চাচার বড় নৌকোও নেই, আর বড় নৌকো ভাড়া করার মতো

টাকাও নেই। তার ডিঙি খুবই ছোট। তাহলেও এই ডিঙি ভর্তি করবার মতো গাছের গুঁড়ি কাটতে কোনো কোনো সময় সাতদিনও বনে থাকতে হয়। তবুও এত বছরের মধ্যে আছের একবারও বাঘ দেখতে পায়নি।

বাঘ দেখতে না পেলে কি হবে, বাঘের হাঁক-ডাক সর্বদাই আছে। ঘরে রাত্রে শুয়ে শুয়ে বাঘের ডাক শোনে। বনে রাত্রে মাঝ-নদী থেকে তো আছের কত বাঘের ডাক শুনেছে। এই তো সেদিন এবাদুল মিঞার গোয়ালঘর থেকে একটা বাছুর নিয়ে গেল। গরুগুলি আর্তনাদ করে উঠলে সব বাড়ি থেকে ওরা টিন বাজিয়ে শব্দ করতে থাকে। তখন আছের ঘরের ফাঁক দিয়ে বাঘ দেখার চেষ্টা করেও কিছুই দেখতে পায়নি। পরদিন খুঁজে খুঁজে দেখে, বাড়ির নিকটেই নদীর ধারে বাছুরের শুধু চারখানা খুর পড়ে আছে।

সেবার বনে যাবার তোড়জোড় করে চাচা আছেরকে বলল,—চল্, কাঠ কেটে আনি। যাবি তো?

আছের বলল,—যাব তো! কিন্তু চাচা, তোমার শুধু বড়াই করা সার। একবারও তো বাঘ দেখাতে পারলে না!

—না, এবার তোকে বাঘ দেখাবই। ভালো ভালো কাঠ কাটতে হবে কিন্তু। পাঁচদিনের মধ্যে ডিঙি বোঝাই করলে তবে বাঘ দেখাব।

আছের এখন সংসারী। অনেক বড় হয়ে গেছে। তবু বাঘের নাম শুনলে সে যেন ছেলেমানুষের মতো হয়ে ওঠে। বাঘ দেখে সে খুলনায় গিয়ে বাঘের গল্প করবে—এই বাসনা আজও তার মনের মধ্যে চেপে বসে আছে।

গভীর সুন্দরবন। পাহাড়ী বনের মতো জংলা নয়। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে বন। নোনা মাটিতে যেন আগাছা বেশি জন্মাতে দেয় না। আবার পাহাড়ী বনের মতো গুরু-গম্ভীরও নয়। চারিদিকে নদী নালা বেয়ে স্রোতের ধারা তর্‌তর্ করে অনবরতই ছুটে চলেছে—কখনও বা জোয়ারের টানে, কখনও বা ভাটির টানে। যেন জীবন্ত এই বন।

অগুন্‌তি নদ ও নদী। বড় নদী ছেড়ে ছোট নদীতে পড়া যায়। আবার ছোট নদী ছেড়ে খালে পড়া যায়। তারপরও খাল ছেড়ে 'শিষে' ধরে বনের গভীরতম স্থানে ডিঙি হাজির হবে। 'শিষে'গুলি খুবই সরু। মাত্র সাত-আট হাত চওড়া। জোয়ারের সময় কানায় কানায় জলে ভরে ওঠে, আবার ভাটির সময় ক্ষীণ ধারা নরম পলিমাটির পর ঝিরঝির করে বয়ে যায়।

এমনি একটি শিষের মুখে আছেরের ডিঙি। দুপুর গড়িয়ে গেছে। শেষ গাছের গুঁড়ি ডিঙিতে তুলবার পরই চাচা বলল,—না, থাক্। আছের, আর দরকার নেই। আর ক'খানাই বা কাঠ ধরবে! তার জন্যে আরও একদিন দেরি করে লাভ কি! চল্, আজ চলে যাই।

—তা যা বলেছ চাচা! কিন্তু তুমি যে কথা দিয়েছিলে, তার কি হবে?

—কি বলেছিলাম?

—বাঃ, ভুলেই গিয়েছ! বললে বাঘ দেখাবে!

—হবে, হবে, চল্, যাবার পথে হবে। আজ পূর্ণিমা। বাঘ বন থেকে বনে ঘুরবেই ঘুরবে।

দু'জনে মিলে ঠিক করল, জোয়ারে বাড়ি ফিরবে। তবে জোয়ারের এখনও দেরি আছে। ফিরবার কথা ঠিক করলেও আছেরের মন খুঁতখুঁত করে। এখনও তো দু'একখানা গুঁড়ি ডিঙিতে ধরবে। চাচাকে ডেকে বলল,—এক কাজ করো, তুমি গোছল করে ভাত চাপিয়ে দাও, আমি ততক্ষণে দেখি আরও কিছু কাঠ আনতে পারি কি না। কাছেই যাব, তোমার

চিন্তা নেই।

চাচার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আছের কুড়ুল হাতে ডিঙি থেকে নেমে চলল। শিষেতে তখন জল নেই বললেই হয়। শিষে ধরেই এগিয়ে চলেছে। পরিখার মতো শিষেটি। বেশ গভীর। নিচুতে দাঁড়ালে ওপর থেকে আছেরের মাথা দেখা যায় কি যায় না। তলদেশ পাঁচ-ছ' হাত চওড়া। জল সামান্য থাকলে কি হবে, খাদে ভীষণ কাদা। পলিমাটির কাদা। চোরাবালির মতো এতে পা চেপে দিলে যেন কোমর পর্যন্ত সড়সড় করে দেবে যাবে। এঁটেল মাটি। একবার পা বসে গেলে যেন কামড়ে টেনে ধরে রাখে।

আছের এই কাদা এড়িয়ে পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে শিষে ধরে এগিয়ে চলেছে। কিছুদূর এগিয়ে একবার পিছন ফিরে দ্যাখে, চাচা কানে আঙুল দিয়ে ঝুপ্ঝুপ্ করে খালের জলে ডুব দিচ্ছে। কামটের ভয়ে কয়েকটা ডুব দিয়েই নৌকোয় উঠে পড়ল।

শিষের ভেতর দাঁড়িয়ে আছের দু'পাশের গাছ দেখবার চেষ্টা করে না। ভালো দেখা যায় না। সামনেই শিষে বাঁক নিয়েছে। তাও এবার পেরিয়ে গেল। না, এমন করে হয় না। উপরে উঠতেই হবে। নিশ্চয়ই এখানে ভালো খুঁটির গাছ পাওয়া যাবে।

পাড়ের খাড়াতেই বুক লাগিয়ে গাছের শিকড় ধরে হিঁচড়ে উপরে উঠেছে। উঠে গাছ দেখবে কি, নজরে পড়ল দুটি বড় বড় চোখ গাছের গুঁড়ির আড়ালে জ্বলজ্বল্ করছে। ওর দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এটা কী জন্তু? বাঘ? না! বাঘ হবে এই এত বড় জন্তু—চার পায়ে দাঁড়িয়ে ঝুলতে থাকবে! হলদে কালো ডোরা। এ যে কালো-মতো জানোয়ার লম্বা হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে আছে। বাঘ হলে তো বীর বিক্রমে গাঁগাঁ করে হেঁকে উঠবে। কৈ, এ তো নিঃশব্দে পড়ে আছে। না—এ বাঘ না!

কিন্তু কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—কী হিংস্র চাহনি! আছের যেন অবশ হয়ে আসছে। চিৎকার করে উঠল,—চাচা! এটা কী জন্তু! চা—চা, এটা কী......

অবকাশ দেয় না সুন্দরবনের রয়্যালবেঙ্গল টাইগার। ছোট হলে কি হবে—হিংস্র গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল আছেরের উপর।

আত্মরক্ষার জন্য আছের কুড়ুল বাগিয়েছিল। কুড়ুলের আঘাত উপেক্ষা করেই বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুড়ুল ছিটকে পড়ে গেল। থাবা মারল বাঁ কাঁধ লক্ষ্য করে। আছের কাঁধ সরাবার চেষ্টা করতেই নখের আঁচড়ে বাঁ দিকের বাহুর কয়েক পরদা মাংস উঠে এল।

আছেরের ডাক শুনতে না শুনতেই বাঘের হুঙ্কারে চাচার ব্যাপার বুঝতে দেরি হয়নি। কোনও উপায় নেই। কি-ই বা সে করবে। করবার কিছু নেই তার। দ্রুত ডিঙির বাঁধন খুলে দিয়ে বড় নদীতে পড়তে চাইল। একবার শুধু বলল,—চেয়েছিলি বাঘ দেখতে! দেখলি তো বাঘ!

কিছুক্ষণ থেমে থেকে দাঁতে দাঁত কামড়িয়ে বলল,—সাধ মিটেছে! বাঘ দেখার সাধ মিটেছে!

বাঘ দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাবা মারতেই আছের পড়ে গেল। ঠিক শিষের কিনারায় ছিল। পড়ে গেল শিষের ভিতর। কোনমতে একটা গাছের শিকড় ধরে টাল সামলে দাঁড়িয়ে গেছে শিষের দেয়াল ঘেঁষে।

আছের পড়ে যেতেই বাঘ দু'পায়ে দাঁড়িয়ে টাল সমলাতে পারে না। পড়ল শিষের ভিতর গড়িয়ে পলিমাটির কাদায়। চটাং করে চার পায়ে লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে চার পা-ই দেবে গেল পলিমাটির চোরা কাদায়। যত জোর দেয়, ততই যেন দেবে যেতে থাকে।

আছের এবার হিংস্র হয়ে ওঠে। না, ওকে উঠতে দেওয়া হবে না! উঠলেই আমাকে ও

শেষ করবে। ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের উপর। শরীরের সমস্ত ওজন ও শক্তি দিয়ে চেপে ঠেসে দিতে লাগল কাদার ভিতর।

বাঘ তবু ঘাড় বাঁকিয়ে কামড়াতে চায়। বেপরোয়া হয়ে আছেরই ওর ঘাড়ের উপর হিংস্রভাবে কামড়ে ধরল। এ যেন আছেরের মরণকামড়। বাঘের চামড়া ও মাংস ভেদ করে যায় আছেরের হিংস্র দাঁত।

শিষেতে ঝিরঝির করে নোনা জল বয়ে চলেছে। ঘাড় পর্যন্ত দেবে গেছে বাঘের। নোনা জল চোখে নাকে ও মুখে ঢুকে দম আটকে আসতে থাক। আছের পিঠের ওপর চড়ে আছে। এবার ওর মাথা চেপে দিতে থাকে জলে ও কাদায়।

আছের অনুভব করে, বাঘের পিঠে আর যেন জোর নেই। পিঠ দুমড়িয়ে শক্তি জড় করার আর চেষ্টা করে না। দম আটকে বাঘ মৃত।

তবু পিঠ ছেড়ে আছের উঠতে চায় না। বিশ্বাস নেই ওকে। লেজটা তখনও উঁচু হয়ে আছে কাদার উপর। লেজের কালো-হলদে ডোরা দেখে আছেরের হাসি পেল। চিৎকার করে বলল,—বাঘ!

আছেরের মত্ততা এবার থেমেছে। মনে পড়ল—চাচা। চিৎকার করে ডেকে উঠল,—চা-চা! চা-চা!…কোনও সাড়া নেই।

না। আর দেরি করলে হবে না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। লেজের মাথা শক্ত মুঠোয় ধরে লাফ দিল। বাঘের পিঠের ওপর দাঁড়িয়েই লাফ দিয়ে তীরের কাছে এল। লেজ ধরে উল্টো দিকে টানতে টানতে গোটা লাসটা টেনে তুলল।

জলের ওপর ভাসিয়ে নিয়ে লেজ ধরে টানতে টানতে খালের মুখে হাজির। চাচা নেই। চলল আবার খাল ধরে নদীর মুখে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ডাকে, 'চা-চা, চা-চা!' নিঃসঙ্গ নিঝুম বনে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে তার ডাক।

জোয়ার তখনও আসেনি। চাচা বড় নদীতে বেগোনে বেশি দূর এগুতে পারেনি। নদীর মুখে আসতে না আসতে ডিঙি দেখা গেল। আছেরের গলা শুনতে পেয়েই চাচা দ্রুত বেয়ে এল।

চাচা স্তম্ভিত। লজ্জায় সে যেন মাথা উঁচু করতে পারে না। লজ্জা ঢাকবার জন্য বলল,—তুই বেঁচে আছিস্! আয়, আয়,……বেঁচে আছিস্! একি বীভৎস চেহারা। ও কি,…তোর মুখে কি?

এতক্ষণে আছেরের খেয়াল হলো তার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে বাঘের গায়ের লোম বিঁধে বিঁধে রয়েছে। ঠোঁট ফুলে গেছে। ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গোছা গোছা লোম বেরিয়ে আছে। বীভৎস চেহারা। মুখ ফুলে গেছে। সারা গায়ে মুখে ক্ষত-বিক্ষত চিহ্ন। বাঁ হাতের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।সেদিকে যেন তার ভ্রূক্ষেপ নেই। লেজ ধরে টেনে বাঘের লাস খানিকটা উঁচু করে বলল,—চাচা দ্যাখো! দেখেছ! তুমি বাঘ দেখেছ? আমি বাঘ দেখেছি। তুমি রেলগাড়ী দেখেছ? আমি বাঘ দেখেছি!!

তিন

নোনা নদীর দেশ। থেকে থেকে নদীগুলি ফুলে ওঠে, আবার যেন তলিয়ে যায়। প্রতিদিন আসে দু'বার জোয়ার, দু'বার ভাটি। এই গোন ও বেগোন ঠেলে বাঙলার দক্ষিণে ভাটি অঞ্চলের মানুষকে দিন কাটাতে হয়। বিশ্রাম নেই তার। জোয়ার আর ভাটির তালে

তালে তার কাজ করে যেতে হবে।

এই লোনা জলের জোয়ারের সঙ্গে চাষীদের লড়াই। নদীর মাটি কেটেই তারা নদীকে বেঁধে ফেলে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে। এ দেশে নদী যেমন অগুনতি, ভেড়িও তেমনি অফুরন্ত।

ভেড়ি ওঠে বটে, কিন্তু নদী শান্ত হয় না। কৃত্রিম বন্ধনকে ভাঙবার জন্য তার অবিরাম চেষ্টা। মাইলের পর মাইল দীর্ঘ ভেড়ি তুলবার জন্য চাষীদের দল বেঁধে কাজ করতে হয়। একজন দু'জন বা দশজনের সাধ্য নয়। শত শত হাতে একতালে এই মাটির প্রাচীর ওঠাতে হয়। তেমনি একে রক্ষা করাও একজন বা দু'জনের অসাধ্য। একবার কোথাও প্রচীর ধ্বসে ফেলতে পারলে নদী যেন সেখানে প্রবল দুরন্ত হয়ে ওঠে। শত শত মানুষ সেখান বুক পেতে না দাঁড়ালে ভেড়িকে রক্ষা করাই দায়।

খুলনা জেলার এই লোনা অঞ্চলে মছলন্দপুরের চাষীরাও একসাথে কাজ করতেই অভ্যস্ত। যে কাজেই তারা হাত দিক, দশে মিলে দল বেঁধে হাত দেবে—তা না দিয়েও উপায় নেই।

তবুও মছলন্দপুরের মাটিতে দশে মিলে মানুষ হয়েও ইসমাইল যেন কেমন অন্যরকম হয়ে উঠেছে। বড় হয়েও সে ভাব তার যায়নি।

সেদিন জয়নুদ্দির সঙ্গে কথা উঠতেই ইসমাইল বেশ জোর দিয়েই বলল,—না, না, ওর মধ্যে আমি নেই!

জয়নুদ্দি তিরস্কার করে উঠল,—তোর জীবনে কিচ্ছু হবে না। কারও সঙ্গে হাত মেলাবি না, সে 'আত্মীয়-ব্রাদার' হলেও না। হবে না তোর কিছু।

জয়নুদ্দি, সম্পর্কে ইসমাইলের শ্বশুর। তাই ওরকম তাড়া লাগিয়ে কথা বলবার অধিকারও আছে। কথা উঠেছিল নৌকো গড়বার। মছলন্দপুরের সকল বাসিন্দাই ভাগ-চাষী। প্রজা বলতে কেউ নেই। কেউ বলতে পারবে না—এই ভিটে আমার ভিটে। পরের জমিতে লাঙল দিয়েই তারা পেটের অন্ন জোটায়। এক-ফসলী দেশ। তাতে অবশ্য অভাবের কারণ ছিল না। সোনার ফসলের দেশ। ফসল ঠিক মতো হলে, যেন মাঠে সোনা ঢেলে দেয়।

কিন্তু তা'তে কি হবে! ভাগের ভাগ যা ঘরে আসবে তা'তে কারও মাত্র বছর খোরাক হয়, কারও হয় না। তাই লোনা দেশে চাষীর স্বপ্ন—নৌকো। একখানা বড় নৌকো কোনমতে করতে পারলে আয়ের পথ খুলে যায়। নদীর দেশে নৌকোর চাহিদা লেগেই আছে।

জয়নুদ্দি এককালে নৌকো গড়ার মিস্ত্রি ছিল। সহজে হিসাব দিয়েই ইসমাইলকে বলল,—যদি করতে চাস্ পঞ্চাশ-মনী ডিঙি, তাহলে পড়বে পঁচাত্তর টাকা। আর যদি শখ থাকে একশ-মনী বাছাড়ীর, তাহলে পড়বে দু'শ টাকার ওপর।

—তা তো পড়বেই। তাই তো বলছি, এখন পারব না। নৌকো বড় না হলেও ভাড়া খাটিয়ে লাভ হয় না।

সুযোগ পেয়ে জয়নুদ্দি বলল,—সেই জন্যেই তো বলছিলাম, আয়, একসাথে দু'জনে মিলে একখানা বাছাড়ী বানাই। দু'জনে ভাগে চালাব।

এই কথারই উত্তরে সেদিন ইসমাইল অমন জোর দিয়ে প্রতিবাদ করে উঠেছিল।

ইসমাইলের দেহও যেমন বলিষ্ঠ, মনও তেমনি সাহসী। ফলে তার নিজের প্রতি বিশ্বাস অটুট। ভাবে, সে একাই দাঁড়িয়ে যাবে। পয়সা আয় করে কেমনভাবে একলা বড় হতে হয়, তা সে দেখিয়ে দেবে। কারও সাহায্য সে চায় না। না, কোন কাজেও না।

মনে মনে ফন্দি করল, এখন থেকে সে মাঝে মাঝে কাঠ কেটে জমিয়ে রাখবে। তারপর দরকার হলে নিজেই নৌকো গড়বার কাজ শিখে নেবে।

নোনাদেশে কাঠ যোগাড় করা তেমন শক্ত নয়। মছলন্দপুর থেকে দু'বাঁকের মাথায় সুন্দরবন। এই গাঁয়ের লোকে নানা কাজে হামেশাই সুন্দরবনে যায়। সুন্দরবনের নিয়ম-কানুন ওরা জানে, বাঘের চাল-চলতির খবরও রাখে, আর বনের সম্পদ কোথায় কি আছে তারও হিসেব ওদের দখলে।

লোনাজলে লোনামাটির কাঠই মজবুত ও টেকসই। সুন্দরী কাঠের নৌকোই লোনা জলে টিকে থাকে। কিন্তু বনের এই অঞ্চলে সুন্দরী গাছ প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। এবার যেখানে বনের কাঠ কাটবার সরকারী অনুমতি মিলেছে, সে-ঘেরে কোথায় সুন্দরী গাছ আছে ইসমাইল তা ভালোভাবেই জানত।

কিছু সুন্দরী গাছ আনার তোড়জোড় চলল। সঙ্গে জয়নুদ্দি ও নিতাই মোড়ল। মাঝারি একখানা ডিঙি নিয়ে ক'দিনের মতো ওরা বনে প্রবেশ করল।

এ-নদী সে-নদী বেয়ে প্রবেশ করেছে গভীর বনে। কয়রা নদী থেকে কাশীর খাল ধরে আড়পাঙাশিয়া পড়ল। আড়পাঙাশিয়া বিরাট নদী। তারপর নাম না জনা খাল ও পাশ-খাল দিয়ে এসে হাজির গহন অরণ্যে।

এইবার যে খালে প্রবেশ করবে তারই তিন বাঁকের মাথায় ইসমাইলের জানা সুন্দরী গাছের 'লাট'।

খালের মুখে আসতেই ইসমইল আচমকা বলে উঠল,—মোড়ল! ডিঙি ভেড়াও এখানে।

জয়নুদ্দি এই লাটের খবর জানত না। উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল,—এখানে কেন রে? এখানেই তোর সেই লাট নাকি?

কাটারি হাতে নিয়ে এক লাফে ডাঙায় উঠতে ইসমাইল উদ্যত। বলল,—দাঁড়াও এখানে হবে কেন? দ্যাখো-না কি করি!

বলেই কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে একখানা সরু ডাল কেটে ফেলল। তারই মাথায় সাদা কাপড়ের ফালি ঝুলিয়ে, খালের ঠিক মুখে চরের ওপর পুঁতে দিল। চরের ঝিরঝিরে হাওয়ায় সাদা নিশানা দুলে দুলে উড়তে লাগে।

মোড়ল অবাক। ভাবে ইসমাইলের এ আবার কি খেয়াল! কোনও বাঘের মন্তর জানে নাকি? হবেও বা। তা না, হয়তো......

ডিঙিতে উঠে ইসমাইল মোড়লকে বললে,—বুঝলে না? নাঃ, তুমি কিচ্ছু জানো না!

অভিজ্ঞ জয়নুদ্দি বিরক্ত হয়ে বলল,—ইসমাইল, বনেও তোর একঘেঁড়েমি গেলো না। অমন করে ফাঁকি দিতে নেই। দশজনে মিলেমিশে তো কাজ করতে হয়!

ইসমাইল শ্বশুরের বকুনি অনুমান করেই মোড়লের দিকে তাকিয়ে ছিল। বকুনিতে কান না দিয়ে মোড়লকে বুঝিয়ে বলল,—বুঝলে না মোড়ল! এখানে আর কেউ আসবে না। আর কেউ সন্ধান পাবে না এই সুন্দরী গাছের লাটের।

বনে-বাদাড়ে এ ধরনের নিশানা এক মর্মান্তিক সঙ্কেত। বনের কোনও লাটে বাঘে মানুষ নিলে, দলের বাকি লোকেরা ফিরবার সময় খালের মুখে এমনিধারা সঙ্কেত রেখে যায়। নতুন কোন দল এসে এই নিশানা দেখলে, আর সেই খালে প্রবেশ করে না।

খালের তিন বাঁকের মাথায় সুন্দরী গাছের সারি দেখতেই ওদের মন খুশিতে ভরে ওঠে। ইসমাইলের মুখে গর্বের হাসি। সেই-ই যেন এ সম্পদের মালিক। খুশি মনে তিনজনেই

কাজে লেগে যায়।

ঝপ্‌ঝপ্ করে বেশ কতকগুলি গাছ কেটে ফেলল। তারপর বেলা গড়াবার আগেই সবগুলি গাছের ডালপালা ছেঁটে গুঁড়ি বের করে নিল। গুঁড়িগুলি বেড়ে দুই হাত থেকে আড়াই হাত হবে। রক্তের মতো লাল সারবান কাঠ। ওদের আনন্দ ধরে না। আর কোন দলই এই কাঠের সন্ধান পাবে না।

সন্ধ্যার আগেই ডিঙি বোঝাই। তবু পুরো বোঝাই হয়নি। আরও একদিন লাগবে। তিন বাঁক পিছিয়ে এসে বড় খালের মুখে ডিঙি চাপিয়ে ওরা রাত কাটালো।

রাত কাটালো ভালোই—নিঃশব্দে, নির্ভাবনায়। ভোরের আলোর রেখা আকাশে দেখা দিতেই ডিঙি খুলে আবার চলল। পুরো জোয়ার। ইসমাইলের পোঁতা নিশানার খুঁটি স্রোতের টানে তরতর করে কাঁপছে। সাদ কাপড়খানা শিশিরে ভিজে চিমসে গেলেও ঠিকই ঝুলে আছে—বিদেশীর কাছে আতঙ্কের বাণী নিয়ে। এই সাদা নিশানা দেখলে কেউ এ-মুখো হবে না।

গাছ যা কাটবার, কাটা হয়ে গেছে। এইবার ছাটাই করে ডিঙি বোঝাই করার পালা। জয়নুদ্দি ডিঙিতে গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত। মোড়ল ও ইসমাইল দু'জনে মিলে একটা একটা করে গুঁড়ি ডিঙিতে নিয়ে তুলছে। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। তাই কাজকে আর যেন ওদের কাজ বলে মনে হয় না। গুঁড়িগুলিও যেন হাল্কা লাগছে।

একটা গুঁড়ি দু'জনে দু'মাথায় ধরে সবে উঁচু করেছে। তারপর বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো কি যে হয়ে গেল, দু'জনের কোনও বোধ নেই। ব্যাঘ্রের বজ্রহুঙ্কার। সঙ্গে সঙ্গে অতবড় গুঁড়িখানা ইসমাইলের কাঁধ থেকে ছিটকে পড়ে গেল।

চোখ মেলে ইসমাইল দ্যাখে, সে মাটিতে পড়ে আছে, আর বাঘ মোড়লকে কামড়ে ধরে ঘাড় উঁচু করে বনের মধ্যে নিয়ে চলেছে। একবার দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় বাঁকিয়ে হিংস্র চাহনিতে ফিরে তাকাল। তাকাল যেন ইসমাইলের দিকেই।

হতভম্ব ইসমাইল যেন দেহের সর্বশক্তি জড়ো করে তড়িৎবেগে সামনের গাছটিতে হিঁচড়ে উপরে উঠল। হাত পা কাঁপছে, বুকে হৃৎকম্প, বাক্‌শক্তিও নেই। কোনমতে গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে বসে রইল।

বাঘের অন্য কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কা'কেও তোয়াক্কা করবার নেই। এই রাজ্য যেন তারই রাজ্য। তবুও বোধহয় আহারের জন্য নিরিবিলি স্থান চাই। সামনেই মাত্র কয়েক হাত চওড়া একটি সরু খাল। স্বচ্ছন্দে একলাফে পার হলো। পাশে একটু ফাঁকা উঁচু ঢিবি। সেখানে মোড়লকে সামনে রেখে বসল। কামড় ছাড়তেই জিহ্বায় রক্তের আস্বাদ পেয়েই বোধহয় গাঁগাঁ করে উঠল। বেশ কয়েকবার। শিকার! তার লব্ধ শিকার! সামনেই পড়ে আছে। যেন খেলার ছলে একখানা থাবা দিয়ে মোড়লের পায়ে নাড়া দিল। মোড়ল সামান্য দুলে উঠল। জীবনের শেষ চিহ্ন বোধহয়। বাঘ চমকে উঠে যেমনভাবে বসেছিল তেমনিভাবেই এক লাফে দশ হাত পিছিয়ে গেল। আবার শিকারের অভিনয়। গুটি মেরে বসে লেজ নাড়তে থাকে। নিঃশব্দ। শব্দ হলে যে শিকার পালাবে! নির্মম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোড়লের উপর। আবার পিছনে লাফিয়ে আসে। আবার সেই অভিনয়!!

গাছের ডালে ইসমাইল। সেখান থেকে সবই স্পষ্ট দেখা যায়। এই দৃশ্য সে দেখতে চায় না, তবু সে দ্যাখে। শিউরে শিউরে উঠতে থাকে। কোনও শব্দ করবার সাহস নেই। শিকারমত্ত বাঘের সামনে তাহলে রক্ষা থাকবে না।

জয়নুদ্দি ডিঙিতেই ছিল। ব্যাঘ্র-হুঙ্কারের পর ভুল বুঝবার অবকাশ নেই। কারও কোনও সাড়া নেই।—দু'জনেই নিশ্চয় বনবিবির অপমান করেছিল। তারই শাস্তি। তা না হলে এমন কখনও হয়! দু'জনেই গেলি!...ডিঙি খুলে জয়নুদ্দি দ্রুত বড় খালের মুখে চলল। খালের মুখে ইসমাইলের সেই পতাকা ঠিকই উড়ছে। উড়ুক,...এবার তো উড়বারই কথা!

বিমূঢ়ের মতো বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল মাঝ-নদীতে। কিন্তু কতক্ষণ আর একলা একলা অপেক্ষা করবে। ভাটির টান আসতেই তাকে ডিঙি ভাসিয়ে দিতে হলো আড়পাঙাশিয়া নদীর উদ্দেশে।

ইসমাইল এতক্ষণে সুস্থ হয়েছে। চিন্তাশক্তিও ফিরে এসেছে। কিন্তু তার দৃষ্টি একমাত্র বাঘের দিকেই। তার রক্ত-লেহন, মাংস-ভক্ষণ, ক্ষুধার তীব্রতা, আহারের পরিতৃপ্তি—সবই যেন ছবির মতো দেখল। আর আত্মরক্ষার কথা, পালাবার কথা যে মনে হয়নি, তা নয়। কিন্তু সে-পথ রুদ্ধ। সামান্য নড়াচড়া করলে, সামান্য শব্দ হলে রক্ষা নেই। শ্বশুরের কথাও মনে হয়েছে। আছে, সে নিশ্চয়ই ডিঙিতে আছে। আমাকে ফেলে সে নিশ্চয়ই যাবে না। কিন্তু যাই কি করে? ইসমাইলের চিন্তা থেমে যায়। দেখা যাক্ কি হয়!

বনে আঁধার নেমে আসে। দূরে ঢিবিতে বাঘকেও আর দেখা যায় না! এবার নিশ্চয় চলে যাবে। চলে গেছেও হয়তো! কিন্তু ইসমাইলের কোনও 'হয়তো' নিয়ে কিছু স্থির করবার সাহস নেই। যেমনটি বসেছিল, তেমনিভাবেই বসে রইল—সারারাত।

ভোরের আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ইসমাইল চারদিক তন্নতন্ন করে দ্যাখে। বাঘের কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু ভরসা কি! আগের দিনও তো তারা প্রথমে বাঘের কোনও সাড়া পায়নি। না, দুঃসাহস করে লাভ নেই! আজও দেখি। একখানা না একখানা নৌকো, না-হয় ডিঙি এদিকে আসবেই। দলের পর দল কাঠ কাটতে আসার কথা। তাদের একদল নিশ্চয়ই এই খালে আসবেই। আল্লা! বড় নৌকোই আসে যেন! যেন সে-দলে দশজন থাকে। বড় একদলের আশায় আশায় ইসমাইলের দিন কেটে যায়। ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে প্রায় অবসন্ন।

হঠাৎ একসময় মনে পড়ল—তারই পোঁতা নিশানার কথা। চঞ্চল হয়ে উঠল। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। মনের জ্বালা ও বেদনা সুন্দরী গাছের ডালে মাথা ঠুকে শান্ত করতে চাইল,—দশজনের দলই যেন আসে...সে-নিশানা কি তিন দিনেও মাটির উপরে ঢলে পড়েনি......

সে-দিন, সে-রাতও কেটে গেল। বাঘের কোনও সাড়া নেই। অন্য কোনও জীবেরও যেন সাড়া ছিল না এই বনে। ভোর না হতেই একদল বাঁদর এ-গাছ থেকে ও-গাছ লাফিয়ে চলেছে। জীবনের সাড়া পেয়ে ইসমাইলের মনে যেন ভরসা এলো। বেপরোয়া হয়ে গাছ থেকে নেমেই প্রায় এক ছুটে বড় খালের মুখে এলো। তাড়াতাড়ি এক গাছে উঠে আবার প্রতীক্ষা।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায় উন্মুখ অপেক্ষায়। দূরে নদীর বাঁকে একখানা ডিঙির আভাষ মেলে। কারা যেন কাঠ বোঝাই করে ফিরছে। মৃতদেহে হঠাৎ সাড়া জাগবার মতো ইসমাইলের শ্রান্ত ক্লান্ত অঙ্গ চঞ্চল হয়ে উঠল। চিৎকারের পর চিৎকার। আপ্রাণে ডাক ছাড়ে।

ডিঙি ভিড়তেই ইসমাইল বলল,—দাঁড়াও, দাঁড়াও বড় মেএগা, আমি আসছি।

বলেই একখানা ডাল ভেঙে নিয়ে ছুটল। চরের ওপর তখনও তারই পোঁতা নিশানা নদীর হাওয়ায় দুলছিল। এক টানে তুলে ফেলল। তুলেই সেখানেই আবার হাতের

ডালখানা পুঁতে দিল। একটু ইতস্তত। তারপর এদিক ওদিক দু'বার তাকিয়ে গায়ের ফতুয়া খুলে ডালের মাথায় ঝুলিয়ে দিল। প্রায় দম বন্ধ করে পুরানো নিশানা হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ডিঙিতে হাজির।

ডিঙির সবাই অবাক। বড় মেঞা ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল,—ও কি! ওরকম করলে কেন? কি হয়েছে?

—দাঁড়াও বলছি...আগে বসতে দাও।

ডিঙিতে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে সব ঘটনা ইসমাইল বলল বটে। কিন্তু নিশানার কথা কিছুতেই ভাঙলো না। কোথায় যেন ওর বাধে।

মছলন্দপুরে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে গেছে। ইসমাইল নিজের ঘাটেই উঠল বটে, কিন্তু বাড়িতে না গিয়ে সোজা শ্বশুরের বাড়িতে হাজির।

ইসমাইলের পুনর্জন্মে সকলেই অবাক। গ্রামের সকলেই ধরে নিয়েছিল, বাঘের হাতেই প্রাণ দিয়েছে। জয়নুদ্দির আদ্যন্ত বিবরণ কারও বিশ্বাস না করার কারণ ছিল না। ইসমাইলকে এমনভাবে ফিরে পেয়ে সকলেই যেন একযোগে প্রশ্ন করল,—

—কি করে বাঁচলে? দু'দিনে কোথায় ছিলে?

—দেখি, কোথায় ধরেছিল?

—মোড়লের কি হলো?

—দাঁড়াও,...বলছি...বলব,—বলেই ইসমাইল বেশ ব্যগ্রভাবে জয়নুদ্দির কাছে এসে চোখে মুখে আকুল আগ্রহ নিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলল,—শ্বহুর, শ্বহুর! তোমার কাছে নৌকোর কাঠ আছে? আছে? কাঠ আছে?

—নৌকোর কাঠ! তার মানে?

—হ্যাঁ, নৌকোর কাঠ! নৌকো বানাবার কাঠ!

—হ্যাঁ, আছে। কিন্তু কেন? কি হয়েছে?

চিন্তার অবকাশ দিল না জয়নুদ্দিকে; ইসমাইল আবার প্রশ্ন করল,—আর কার কাছে আছে, বলতে পার? কার আছে?

জয়নুদ্দি মাথা চুলকিয়ে বলল,—হ্যাঁ, বোধহয় মোল্লাদের ঘরে কিছু আছে।

—আছে!!

ইসমাইলের বাঁহাতে তখনও সেই সাদা নিশানাখানা। হাঁটু ভেঙে সামনে ধরে দু'হাতের চাপে চড়চড় করে নিশানা ভেঙে ফেলতে ফেলতে বলল,—হ্যাঁ শ্বহুর, আমি তুমি, মোল্লারা, সবাই মিলে বাছাড়ী বানাব। মস্ত বড় নৌকো! মছলন্দপুরের বাছাড়ী!!

চার

সুন্দরবন। সবুজের সমারোহে সজীব এ-বন। এ-বনে জীবনের প্রবাহ অবিশ্রান্ত ও নিরবিচ্ছন্ন। বয়োবৃদ্ধ হয়ে ঝরে পড়ার আগেই নবীনের সবুজ পত্রাভরণ যেমন তাকে অন্তরাল দেয়, তেমনি সেই আবরণ আপন গর্ভে নবীনের আগমনকে অলক্ষ্যে রাখে। জীবনের নিরবচ্ছিন্নতায় জন্ম ও মৃত্যু ঢাকা পড়ে।

শুধু বন নয়, বনের উপকূলবাসীদের নিকটেও জন্ম ও মৃত্যুর হিসেব জীবনের নিরবচ্ছিন্নতায় অবহেলিত। হাজার প্রশ্ন করেও জানা যাবে না, এদের জন্মের তারিখ বা বছর। জানবার আবশ্যকই বা কি! বনানীর এক কোণে জন্ম যখন পেয়েছে, জীবনের

আপন তাগিদে একদিন যৌবনে উদ্বেলিত হয়ে উঠবেই তো। যেমন করে গোলপাতার ঝাড় সুন্দরবনের লবণাক্ত কর্দমে জন্মলাভ করেও জীবনের তাগিদে এঁকেবেঁকে মাথা চাড়া দিয়ে জীবনের আধিপত্য জানায় সবুজ পাতার বিস্তারে লোনা জলের উপর।

আবশ্যক নেই সত্য। কিন্তু আবশ্যক একদিন হয়েছিল ফারিদার জীবনে। মর্মন্তুদভাবেই আবশ্যক হয়েছিল।

ফারিদা ফজলের বউ। না, তার চেয়েও বোধহয় বলা ভালো, ফজল ফারিদার মিন্‌সে।

সংসারের বড় বউ ফারিদাকে যা বলত তা একটুও বাড়াবাড়ি নয়। সে বলত,—সেই তোর যখন সাদি হয়েছিল, তখন তো ছিলি একরত্তি মেয়ে। তখন থেকেই তো দেখছি তোর রাশভারি, তোর দাপটি। আর কিছু না হোক, দু'একটা ছেলেপিলে হলেও ফজলের ওপর এমন দাপটি হয়তো মানাতো। আরে! মিন্‌সের ওপর অতো দাপটি করতে নেই!

ফারিদার দেহখানাও যেমন ভারিক্কিপানা, কথাবার্তায়ও তেমনি রাশভারি। উত্তরে বলত,—না হয় পোলার মা হইনি, তাই বলে কি সংসারটা গোল্লায় দেব। আচ্ছা বলো তো, আমাদের মতো গরিব ঘরে অমন করে গান-বাজনা নিয়ে মশগুল থাকলে কি চলে। না মুখে দুটো অন্ন জোটে!

—না হয় দুটো গান গাইলো, তাই বলে কি কোনও সাঁঝে তোমার হাঁড়িচড়া বন্ধ হয়েছে?

—বন্ধ হতে কতক্ষণ। এই তো, সেদিন ভোর সকালে একতারা নিয়ে গজল গান ধরেছে তো ধরেছেই। হাট-বার। জোয়ার ফুরিয়ে যায় যায়, সেদিকে কি আর হুশ ছিল!

ফজলের সেদিন হুশ ছিল না সত্যি। তার জন্যে বকাঝকা করে ফারিদা আদ্যশ্রাদ্ধ করতে ছাড়েনি। কিন্তু আজ সেই কথার সূত্রে গজল গানের কথা উঠতেই ফারিদার দুর্বলতা ধরা পড়ে। হঠাৎ গলা নামিয়ে বড় বউকে বলল,—তা যাই বল না কেন, ফজলের গান শুনলে হুশ হারাতে হয়! তাই না!

এ-পাশ ও-পাশ মুখোমুখি দুই ঘর। বড় মেঞা রসুল ও ছোট মেঞা ফজলের। এক সংসার বলা চলে, তাহলেও দুই হাঁড়ি। বড় বউয়ের উস্কানিতেই এক উঠানে এরা দুই ঘর করেছে। সেদিন বড় বউ উঠান পেরিয়ে ছোট মেঞার নিন্দাই শুনতে এসেছিল। কিন্তু ফারিদার গলায় ফজলের প্রতি দুর্বলতার ইঙ্গিত পেয়েই তখনকার মতো উঠান পেরিয়ে নিজের কাজে মন দিল।

* * *

সে-বছর ফজলের সংসারে দুর্দিন এলো। এলো কিন্তু ফজলের গান-পাগলামির জন্য নয়, এলো মিষ্টি ধানের দেশে নোনার দাপটে।

ভরা ভাদরের গাঙে লোনা পানি যেন থৈথৈ করে উঠল ভেড়ির মাথা অবধি। ঘোর অমাবস্যার খরতর টান। রাত্রের অন্ধকারে চকের মানুষ বেরিয়ে পড়েছে আলো ও কোদাল হাতে। ভেড়ি কোথাও ধসে পড়লে, সবাইকে জড়ো হয়ে বুক পেতে ঠেকাতে হবে। একবার এই লোনা বিষ ঘেরে প্রবেশ করলে আর রক্ষা নেই। সে-বিষে এ চকের মানুষ জর্জরিত হবে সারা বছর।

পুবে হাওয়া দিল। ঝরঝর ধারায় বাদল নেমেছে। চাষীরা জড়সড়। ভেড়ি কোথাও ধসে গেলে এরা হয়তো কোদাল ও হাতের ক্ষিপ্রতায় প্রতিরোধ করতে পারত। কিন্তু পুবে

হাওয়ায় গাঙ থেকে থেকে আরও ফুলে ওঠে। ভেড়ি ছাপিয়ে লোনা পানি সর্বত্র উপ্‌ছে পড়তে থাকে মাটির কৃত্রিম বাঁধনকে উপেক্ষা করে। এমন সর্বগ্রাসী আক্রমণকে চাষীরা সেদিনের মতো ঠেকাতে পারে না। ভাদ্রমাসের অমাবস্যার জোয়ারকে আবাদের মানুষ যমের মতো ভয় করে। ভয় নিরর্থক নয়। সে-বছর হাহাকার দেখা দিল শুধু ফারিদার সংসারে নয়, চকের প্রতি সংসারে। ধানের বদলে চিটের বোঝাই উঠেছিল প্রতি খলেনে।

ফাগুন পেরিয়ে চোত মাস পড়েছে। কিন্তু আর তো সংসার চলে না। ফজল দাওয়ায় বসে একতারা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ফারিদা মুখ-ঝাড়া দিয়ে উঠল,—ওতেই কি পেট ভরবে?

ফজল অবাক হয়,—কেন? খালুই ভরে তো মাছ এনে দিলাম ভোর সকালে!

—মাছেই পেটের আগুন নিভবে? ধানের মোড়াটা দেখেছ? একবার ডালা উল্টে দ্যাখো, ক'পালি ধান আর আছে?

—কি করতে বলো আমাকে?

—কি আর বলব? আমার মুণ্ডুশ্রাদ্ধ করো! যাও-না বনে একবার। দ্যাখো-না কত লোক কত ভাবেই তো এটা-সেটা আয় করছে। তুমি যেতে পারো না?

—বেশ, আমাকে তুমি বাঘের পেটে যেতে বলছ?

—ছিঃ! বাঘের পেটে যেতে বলব কেন! কেন, যারা বনে উঠছে সবাই বুঝি বাঘের পেটে যাচ্ছে। ধারে কাছে বুঝি বাওয়ালি-ফকির নেই! তাদের কাছ থেকে বুঝি কিছু মন্তর পড়ে নেওয়া যায় না!

—তা, বেশ!

—বেশ কি? ঐ একতারা নিয়েই মজে থাকো। তা'তেই পেট পুরবে!

বাঘ সম্পর্কে ফজলের যতটা ভীতি না থাক, বনে ওঠা নিয়ে অনিচ্ছাই ছিল বড়। তাহলেও সে না গিয়ে পারে না।

তোড়জোড় চলে। গুইসাপ মারতে যাবে। গুইসাপের চামড়ার বেশ চড়া দাম। নানা শৌখিন জিনিস তৈরি হয় এতে। তারই সুযোগে আবাদের লোকে অবাধে গুইসাপ মারতে শুরু করে। সুন্দরবনে আছেও অজস্র। কিন্তু মারতে মারতে এমন অবস্থা যে, বনে সাপের উপদ্রব হয়ে ওঠে ভীষণ। গুইসাপ সাপ-ভক্ষক। এদের দাপটে বিষাক্ত সাপেরাও সংযত থাকে। অবশেষে গুইসাপ মারা সরকারি ভাবে বে-আইনী ঘোষিত হলো।

তারপর থেকে এই ব্যবসা চলেছে তলে তলে। তা'তে বিশেষ অসুবিধা হয়নি আবাদের মানুষের। ধরা পড়বার উপক্রম হলেই অতি সহজেই এরা গা ঢাকা দেয় বনের অগুনতি নদী, নালা ও খালের পথে।

তোড়জোড়ের বিশেষ তেমন কিছু নেই। তিনজন লোক চাই। তিনজন যে যেতেই হবে, এমন নয়। তবে তিনজন না হলে কোনও কাজে এরা বাদায় সহসা ওঠে না। তিনজন হলে তবে যেন একটা ছোটখাটো দল হয়। ফজলের সাথী হলো, দুর্লভ ও মাধো। দুর্লভের কিন্তু মাত্র একটা চোখ। তাহলেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে কারও চেয়ে কম নয়।

তোড়জোড়ের মধ্যে আর আছে ছোট একখানা ডিঙি ও কয়েকগাছি লাঠি। অন্য কোনও অস্ত্রের দরকার নেই। লাঠি পিটিয়ে গুইসাপ মারতে হয়। অস্ত্রের আঘাত করলে চামড়ার দাম কমে যায়। ছোট, ধারাল দু'একখানা ছুরি অবশ্য চাই। বনে বসেই চামড়া খসিয়ে নিতে হবে। বে-আইনি সম্পদ তো,—বলা যায় না, পিটেল পুলিশের সামনে পড়লে ঝটপট সরাতে হতে পারে। তাছাড়া ছিল মাধোর হাতে একখানা কুড়ুল। ওটা হিসাবের মধ্যেই নয়,

কুড়ুল ছাড়া বনে ওঠা চলে না।

বাউলে-ফকিরের কথা তিনজনে ভুলেই ছিল। ফারিদা জোর করে বেদকাশীর ফকিরের কাছে ফজলকে পাঠাল। সওয়া-পাঁচ আনা পয়সা লাগবে। তার ব্যবস্থা ফারিদা আগেই করে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত ফকির মন্ত্র পড়ে একখানা রুমাল দিয়ে বলল,—ফজল, এই রুমাল কাছে রাখিস্। তোদের কারও বিপদ হবে না। ভয় নেই। বনবিবি কোনওদিনই আমার ওপর গোঁসা করেনি।

গুইসাপ বা গোসাপ মারতে আর কোনও বিশেষ হাঙ্গামা নেই। বনের অতি গভীরে যেতে হয় না। যাবে আর আসবে। রোজ ভোরে নাস্তা খেয়ে বনে উঠবে, আর বেলা থাকতেই ফিরবে। তবে একটু পিটেল পুলিশের বোটের জন্য নজর রেখে রেখে বনে ঢুকতে বা বেরুতে হবে। এই যা।

তাই বলে বনের সর্বত্রই গোসাপ ঝাঁকে ঝাঁকে পাওয়া যায় না। সরু খাল হওয়া চাই। জোয়ারের জল অন্তত ভালোভাবে খেলা চাই। যাতে জোয়ারের টানে মাছ এসে বোঝাই হতে পারে। এই মাছের লোভেই গোসাপ এমনিধারা-খালে জড়ো হয়। মাছ খেয়ে খেয়ে খালের চর বরাবর ঝোপ-ঝাড়ে অশ্রয় নেয় বা বিশ্রাম করে।

তেমনি এক খাল ধরে ওরা তিনজনে চলেছে নিয়ম মতো। মাধো জলের কিনারা ধরে চরের কাদা ভেঙে ভেঙে। নগ্নদেহ, মাত্র একখানা গামছা পরা। হাতে লাঠি। উপরে, ডাইনে ও বাঁয়ে,—সবুজের মেলা। নিচুতে, চরে ও জলে যেন পলিমাটির মসৃণ প্রলেপ। পেছন থেকে দেখলে দেখা যাবে, পিঠের পেশীগুলি সবল ও সজাগ। যে-কোনও মুহূর্তে যেন শক্তি জড়ো করতে উন্মুখ হয়ে আছে। ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলেছে ধাপে ধাপে। যেন আদিম মানুষের বন্য জীবনের এক ছবি।

গোসাপ থাকলে ঝোপে ঝাড়ে আছে। সাড়া পাওয়া মাত্র যেন সে জলে পড়তে না পারে। সেই মতলবেই মাধো একটু আগে আগে খালের জলকে আগল দিয়ে চলেছে।

ফজল ঝোপের এপাশ ধরে চলেছে। ওড়া গাছের ঝোপ। খাল ও বনের সীমানা যেন নির্দেশ করছে এই ওড়া গাছের ঝাড়। বেশি উঁচু নয়, বড়জোর মানুষের সমান। ঘন ঝাড়। এরই মাঝে গোসাপ লুকিয়ে আছে কিনা তাই দেখে দেখে চলতে হবে ফজলকে। ফজলের বেশও একই রকম। তবে একটু তফাৎ এই যা,—গলায় সেই মন্ত্রপড়া রুমাল জড়িয়ে বাঁধা। ফজলের রঙ অনেকটা ফর্সা। মুখ দেখলে বোঝা যায় না, কিন্তু পিঠ বেশ ফর্সা। বনে শিকারীর এ রঙ থাকলে মানায় না। সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে গোসাপ শিকার তো। অতো হিসাব নিকাশের আবশ্যক কি। নুইয়ে নুইয়ে ওরা ঝাড়ের ভিতর দৃষ্টি দিয়ে চলেছে।

ফজলের পেছনে দুর্লভ। এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে কুড়ুল। আঘাত হানবার জন্য তার অতো সচকিত ভাব নেই। তার সঙ্গে তো আর গোসাপের প্রথম দেখা হবে না।

তিনজনেই চুপচাপ। বন এমনিতেই মানুষকে নিঃসাড় করে দেয়। তাঁতে আবার এরা যে-কাজে চলেছে, সে-কাজে নিশ্চুপ থাকতেই হবে। একটা গোসাপ মেরেই ক্ষান্ত হলে হবে না। একটায় তে শ্রমের হিসাবেও পোষাবে না, ভাগের হিসাবেও না। ইতিমধ্যে ওরা দু-একটা গোসাপ পায়নি যে তা নয়। কিন্তু শিকার পেয়েও উল্লাস বা সোৎসাহভাব দেখাতে যায়নি। তেমন কিছু করলে এ-খালে আর কোন গোসাপের দেখা পাওয়া ভার হতো। একে একে ঝুপঝাপ করে খালে পড়ে সবাই উধাও হয়ে যেতো। নির্বাক ছবির মতো ওরা যেমন কাজগুলি সেরে নিচ্ছে, তেমনি এগিয়েও চলেছে। লাঠির আঘাতও যখন করে, তখনও তা

যেন নিঃশব্দেই করতে চায়।

কিন্তু এই খালধারে শুধু ওঁরা তিনজনেই তখন শিকার সন্ধানে মত্ত হয়ে ওঠেনি। শিকার যার পেশা, শিকার যার নেশা, শিকার ছাড়া যার জঠর-অগ্নি শান্ত করার আর কোনও পথ নেই—সেও মত্ত। মত্ত বটে, কিন্তু বাঘের এমন সংযত মত্ততার তুলনা নেই। তার সমস্ত তেজ, হিংসা, ক্রোধ, দুর্ধর্ষতা—সব-কিছুই সংযত করে রাখে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য। এমন সংযত যে, বনের শুকনো পাতাও তার থাবায় মর্মরিত হয়ে ওঠে না।

ভিন্‌দেশী এই ত্রয়ীকে বনের বাঘ দেখেছে অনেক আগেই। দেখেই ক্ষিপ্ত হয়নি। ক্ষিপ্ত হওয়াটা বাঘের ভান মাত্র। রোষ-কষায়িত হিংস্রমত্ত চেহারা বোধহয় ওর শিকারপূর্বের মুখোশ মাত্র। দেখার সঙ্গে সঙ্গে শান্ত মনেই আড়াল নিয়েছে। হয়তো বেশ কিছুক্ষণ দেখে দেখে অনুমান করেছে, কোন্ পথে ওরা এগুবে। তারপর রাজ্য ঘুরে বনের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে এগিয়ে ওদের আগুপথে এক ঝোপের আড়ালে শক্তি জড়ো করে বসে আছে। সুযোগের অপেক্ষায় বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। ফজলের দল একবার একটা গোসাপ ঘায়েল করতে গিয়ে বেশ সময় নিয়েছিল। তবু শিকারমত্ত বাঘ উন্মত্ত হয়ে ওঠেনি। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শান্তমনে ওদের আসতে দিয়েছিল নিজের খপ্পরে।

পরের ঘটনা সহজ ও সরল। ফজল এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হলো, বুঝি বা গোসাপ সাড়া দিয়েছে। খালের দিকে মুখ করে উবু হয়ে দেখতে গেছে।

শিকারী এমন সুযোগ ছাড়বে কেন! তীর বেগে ছুটে এসে বিরাট মুখ-ব্যাদানে কামড়ে ধরল কোমর ও তলপেট। গোঁগোঁ করে উঠেছে। এতো নিকটে বলেই হয়তো হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আবশ্যক হয়নি। উঁচু করে একটানে নিয়ে চলল। দুর্লভ পেছনেই। কুড়ুল হাতেই ছিল। দিশেহারার মতো ছুটে এসে দু'বাহু তুলে কুড়ুলের কোপ মারল। বাঘের ক্ষিপ্রতা দু'বাহু তুলে কুড়ুলের কোপের অবকাশ দেবে কেন! বেপরোয়াভাবে ফজলকে মুখে নিয়ে গোঁগোঁ করতে করতে এগিয়ে গেল।

একটু এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল দুর্লভের দিকে। মুখে মৃত ফজল ঝুলছে। রোষকষায়িত দৃষ্টিতে ভীষণভাবে গলায় খাঁকারি দিয়ে উঠল। বন যেন থরথর করে কেঁপে ওঠে।

দুর্লভকে এমন ভয় দেখাবার কোনই আবশ্যক ছিল না। এমনিতেই সে দিশেহারা। বাঘ দৃষ্টির বাইতে যেতেই যেন নেশার ঘোরে মাটি থেকে কুড়ুলখানা তুলেই মাধোর কাছে ছুটে এলো। কুড়ুল হাতে রেখেই মাধোকে জড়িয়ে ধরেছে। কুড়ুলের ফলকে সুন্দরবনের পলিমাটির সঙ্গে বাঘের লেজের কয়েকগাছা লোম লেগে সাপটে আছে।'

দুর্লভ ও মাধো পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে যেন খানিকটা ধাতস্থ। ফিরে এলো বন থেকে।

শুধু দু'জনকে ফিরতে দেখে ফারিদা আঁতকে উঠেছে। কতবার প্রশ্ন করলো,—ফজল কই ? ফজল কই ? কোন উত্তর নেই। সামনে কুড়ুলখানা পড়ে আছে। বাঘের লোম দেখে চিনতে বাকি থাকে না। ডুকরে কেঁদে ফেটে পড়ল ফারিদা।

★ ★ ★

বেদকাশীর ফকির ফারিদাকে দেখেই এগিয়ে এসে সম্ভাষণ জানায়,—কি সমাচার!

ফারিদা কথা বলবে কি, কেঁদেই অস্থির। কান্নার মাঝে একবার ফুলে ফুলে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল,—বলো ফকির! বলতে হবে তোমাকে! কিসে আমার এমন সর্বনাশ করলে ? কেন ? মন্ত্র! দাওনি তুমি মন্ত্র...বনবিবির এমন দয়া হলো কেন ? কে—ন ?

একটানা অভিযোগ, হয়তো বা অভিশাপ। ফকির ব্যথিত হৃদয় নিয়ে বলল,—না, মা! ফকির মন্ত্র ঠিকই দিয়েছে।

ফারিদার অভিশাপের ভয়ে নয়, বন ও বন্য জীবের প্রতি সমস্ত আস্থা ও ভরসা নিয়ে ফকির বলে চলে,—কি জানো মা? একটা দিন কোনও মন্তর খাটে না। ফজলের জন্মদিন কবে ছিল জানো? কারও জন্মদিনে আমরা জীবন রক্ষা করতে অপারগ।

ফারিদা এবার উচ্ছ্বাস-উদ্বেলিত হয়ে ওঠে,—কি বললে ফকির,...জন্মদিন! জন্ম ও মৃত্যু!

ফারিদা প্রতিবাদ করবে কি! বনের মনুষেরা তো জন্ম ও মৃত্যুর হিসেব রাখে না।

শূন্য ঘরে ফারিদা ফিরে এলো। এতদিন যার নামেই বারে বারে ধিক্কার দিয়েছে, এবার সে-ই তার শূন্য জীবনে প্রধান আশ্রয় হলো—ফজলের একতারা!

ফারিদা অসাধ্য সাধন করেছে। সাঁঝের বেলায় ভেড়ির ওপর দাঁড়ালে শোনা যাবে, ফারিদার অন্ধকার ঘর থেকে ভেসে আসা একতারার টুং টাং টুং গজলের সুর। আরও কান পেতে থাকলে নিশ্চয় শোনা যাবে—নদীর ওপারের শূন্য বন থেকে সে-সুরের প্রতিধ্বনি...টুং টাং টুং।

পাঁচ

জাত-শিকারীর ধরনই আলাদা। দশ মিনিটের আলাপেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, ফটিকের গায়ে জাত-শিকারীর রক্ত নেই। হরিণ দু'চারটা বা বাঘ দু'একটা মারেনি যে তা নয়। কিন্তু তার গল্প এমনভাবে বলবে, মনে হবে বুঝি-বা সে এই মাত্র শিকার করে বাদা থেকে আবাদে এসেছে। তার সাহসের স্বীকৃতি তখন তখনই না দিলে যেন নয়!

বক্‌স গাজির প্রায় মুখের সামনে এক হাতের বুড়ো আঙুলের পর আর এক হাতের আঙুল রেখে বলল,—বন্দুকের হিসনে ঠিক এক বিঘত আট আঙুলের মাপে রেখেছি। আমার কড়ে আঙুল একটু ছোট কিনা, তাই সাড়ে-আঠারো আঙুল মাপ দিয়েছি। যাদুকে কলে পড়তেই হবে।

বক্‌স গাজির জামাই ফটিক। ও-বছর যখন সাদি হয় বক্‌স গাজির ইচ্ছে ছিল, ফটিককে ঘর-জামাই করে রাখবে। ঘর-জামাই করে রাখবার ক্ষমতাও ছিল গাজির। সুন্দরবনের রায়মঙ্গলের কাছাকাছি বাড়ি। এ-আবাদে বিপদেরও যেমন অন্ত নেই, তেমনি ফসলেরও যেন শেষ নেই। গাজি বছর বছর অঢেল সোনার ফসল ফলায়। তাহলে কি হবে, ফটিককে বশ মানানো দায়। ফটিক কোথাও বশ মানতে চায় না—বাদায়ও না, আবাদেও না। অন্তত মুখে তো নয়ই।...ফটিক শ্বশুরবাড়ি এসেছিল সাবুত খেতে। শিকারী জামাই। টাটকা হরিণের মাংস যদি না খাওয়ালো, তবে সে কেমন সুন্দরবনের জামাই। আর কেমনই বা শিকারী। বিশেষ করে যখন শ্বশুরের ঘরে টোটা বন্দুক বর্তমান। ঠিক হয়েই ছিল, আজ সকালে বনে হরিণ শিকার করতে উঠবে। কিন্তু বাদ সেধেছে কাল রাত্রের বাঘের ডাক।

রাত্রে বাঘ এমন ডাক ডেকেছে যে, সবাই তখন জেগে পড়ে। সুন্দরবনে বাঘের ডাক মেঘলা আকাশে বাজ পড়ার শব্দের মতো। দু'তিন মাইল দূরে হলেও মনে হবে অতি সন্নিকটে।

ফটিক বলল,—দ্যাখো শ্বশুর, রায়মঙ্গল বাঘের তো বড় সাহস। 'মানবেলয়ের' এত কাছে এসে হাঁক দিচ্ছে। না, কাল আর হরিণ এ-মুলুকে মিলবে না।

কথার পিঠে কথা বলার ঝোঁক নিয়ে হাল্কাভাবেই বক্‌স বলল,—তা'তে আর কি হবে! হরিণ না হয় না হবে, বাঘ তো আছেই।
কাল হলো এইখানেই। ফটিক ঝমাৎ করে বলল,—দেখা যাক্।
সেই সূত্রেই ফটিক আজ বিকালে বন থেকে ফিরে এসে কল পাতার কথা বলছিল। বাঘ যখন রাত্রে সঙ্গিনী খুঁজবার মতলবে ডাকতে ডাকতে এক বন থেকে আরেক বনে যায়, তখন তারা ঠিক সেই পথেই ফিরবে। একটুও এদিক ওদিক যাবে না। সাধারণত পরের দিনই রাত্রে ফিরে আসে। মাপের হিসাব ঠিক থাকলে কল পাতা খুবই সহজ। বাঘের পথে কালো সুতোর টানা দিতে হয়। বন্দুকের তোলা ঘোড়ার সঙ্গে এই সুতো বাঁধা থাকে। ছোট তেকাঠার উপর আঠারো আঙুল উঁচু করে ঠিক মতো বন্দুকের নল বসাতে পরলে, চোট্ হবে অনিবার্য। হৃদ্‌পিণ্ডের কাছাকাছি গুলি লাগবে এবং প্রায়ই তা মোক্ষম হয়।
বন থেকে আসা অবধি বাড়ির সবাই কান খাড়া করে আছে। বনের মাইল খানেকের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ হলে, সে রাত্রেই হোক, আর দিনে হোক, স্পষ্ট শোনা যাবে। সুন্দরবন যেমন নিঝুম, তার কোলের আবাদও তেমনি নিরালা। সামান্য শব্দ-তরঙ্গ ভেসে ভেসে বহুদূর চলে যায়।
কান খাড়া করে ছিল না শুধু বাড়ির মেয়েরা। একে তে তা'রা সাংসারিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত, তার উপর তা'রা বন ও বনবিবি নিয়ে বেশি মাতামাতি পছন্দই করে না।
রাত্রি গভীর হতে আবাদে বেশি সময় লাগে না। এক অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস ছাড়া, আবাদের মানুষ সন্ধ্যা হতেই বিছানা নেয়। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের কথা অবশ্য আলাদা। ঘরে ঘরে পাকা ধানের গন্ধে তখন এরা পাগল হয়ে ওঠে।
রাত্রির প্রথম প্রহর পার হয়ে যায় দেখে ফটিকের বউ এসে বললে,—কি গো, বিছানা নেবার নাম নেই যে?
ফটিক খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলে,—দাঁড়াও বন্দুকের আওয়াজ হলো বলে।
—রাখো তোমাদের সাহসের কথা! বনে কল পেতে বাড়ি এসে হুড়কো লাগিয়ে সলা চলেছে।
—দেখি তোমার কেমন সাহস! দিনে দিনে একদিন বনে যাও দিকি!
—আর তুমি বুঝি সাহসের বড়াই করে বেড়াও না! অতো বড়াই ভালো না!
—সাহস আছে বলেই তো বড়াই করি। বড়াই করতে গিয়ে বনে মরলে তো, কবর দিতে তোমায় ডাকব না!
—না-হয় না ডেকো! এখন সবাই ঘুমোও তো!
সত্যি সত্যি সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই বনের নির্জনতা মানুষকে সহজেই অবসন্ন করে আনে। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে বন্দুকের আওয়াজ স্পষ্ট শোনা গেল। ফটিকের বউ-ই প্রথম শুনতে পায়। শুনতে পেয়ে সবাইকে ডাকাডাকি করে তুলল। শুনতে পেলেও তখন তখনই করার কিছু ছিল না। শুভ বা অশুভ সংবাদ জানাবার তাগিদেই ফটিকের বউ সবাইকে ডেকে তোলে।
বন্দুকের চোট্ বা বাঘ নিয়ে আবাদে অতি উৎসাহিত হবার কিছু নেই। হামেশাই অমন ঘটনা এখানে ঘটছেই। সকালে ফটিক ধীরে সুস্থে নাস্তা খেয়ে বনে ওঠার জন্য তৈরি। ভাবছিল, সঙ্গী একজন থাকলে ভালোই হতো। মুখে অবশ্য কিছু বললে না।
ফটিকের মনের ভাব বুঝে নিয়ে বক্‌স গাজি কোনও মতামতের অপেক্ষা না রেখে বলল,—চল্ ফটিক, আমিও যাচ্ছি। বাঘ যা পড়বে তা'তো জানি! বন্দুকটা তো তাড়াতাড়ি

ধুয়ে মুছে রাখতে হবে। সারারাত পানি ও নোনায় পড়ে আছে।

—তা যা বলেছ, ঠিকই। চলো যাই।

খাল পেরিয়ে ডিঙি চরে তুলে দু'জনে মিলে বনে উঠল। থম্‌থমে বন। বাঘের আনাগোনা-পথে কোনও জীবজন্তুরই পাত্তা পাওয়া যায় না। এক কুমির আর শুয়োর ছাড়া। সুন্দরবনের কুমিরকে উভচর বলা চলে। চরে উঠে রোদ পোহান ওদের বাতিক। তাছাড়া মাছের লোভে সামান্য জলা জায়গার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। দেখা সাক্ষাৎ প্রায়ই হলেও, বাঘ কিন্তু ওদের বিশেষ ঘাঁটাতে যায় না। বাঘেরও তো প্রাণের ভয় আছে। বনে প্রায় সম-শক্তিশালী জীবেরা অযথা রেষারেষি করতে যায় না। আর শুয়োর তো একগুঁয়ে ও নির্বোধ। হয়তো ঠিক নির্বোধ নয়, লুকোচুরি করে বেঁচে থাকার স্পৃহা ওদের কম। তাহলেও এ-যাত্রা শ্বশুর ও জামাই-এর সঙ্গে কোন কুমির বা শুয়োরের দেখা হয় না।

ওরা সোজাসুজি বন্দুকের ধারে এলো। বাঘ বা কোন জীবই ধারে কাছে পড়ে নেই। ঠিকই চোট্ হয়েছে। ফটিকের বউ মিথ্যা বলেনি। বন্দুকটা ছিটকে কাত হয়ে পড়ে আছে।

অন্যদিকে কোন দৃষ্টি না দিয়ে ফটিক তাড়াতাড়ি বন্দুকটা হাতে নিল। নতুন টোটা পুরে সাবধানির মতো নলটা ঝুলিয়ে দিল মাটির দিকে।

ফটিক বন্দুকের তদারকেই ব্যস্ত; কল পেতেছিল, কলের ফাঁদে বাঘ পড়েনি। সুন্দরবনের বাঘ এক গুলিতে বহুসময় ঘায়েল হয় না। একবারে ঘায়েল না হলে, দ্বিতীয়বার তখন তখনই তাকে পাওয়া দুরূহ। কিন্তু সুন্দরবন সর্বত্র এক হলেও, সুন্দরবনের বাঘ সব এক নয়। রায়মঙ্গলের বাঘের কথা ফটিকের অজানা।

ফটিকের অজানা থাকতে পারে, কিন্তু বক্‌স গাজি বাঘ শিকারী না হলেও, রায়মঙ্গলের উপকূলবাসী। বাঘ না দেখে উদ্বেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সরে পড়তে চায়। এবং তা যত শীঘ্র সম্ভব। বাঘ যে এসেছিল তা তার পদচিহ্নেই স্পষ্ট। বক্‌স নাক বড় করে গন্ধে হদিশ পাবার দু'একবার চেষ্টা করল বৃথাই।

এমন অবস্থায় বনে কথা বলার উপায় থাকে না। মানাও আছে। বক্‌স আকারে ইঙ্গিতে ফটিককে কাছে এনে সরে পড়বার জন্য প্রায় হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। কোন্ দিকে বা কোন্ পথে যাবে তাও বিশেষ চিন্তা না করে এগিয়ে চলল। চিন্তার অবকাশই বা কোথায়!

বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে। সহসা দু'জনেই শিহরিত হয়ে ওঠে। বাঘের পথ ধরেই ওরা এগিয়ে চলেছে! দুই জোড়া চোখ বাঘের পদচিহ্ন ও রক্তচিহ্নের ওপর। দাঁড়িয়ে পড়ল। এগুবে না পিছুবে? এগুলো বাঘের মুখোমুখি পড়বে। গুলিবিদ্ধ হিংস্রতম জীব এমন স্পর্ধার প্রতিশোধ নিতে এতটুকুও দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। পিছু হটলেও রক্ষা নেই। আর যারই হোক, পলাতকের বাঘের হাতে নিস্তার নেই।

এমন দোটানায় পথ কেটে বেরুবার পন্থা সুন্দরবনের দক্ষ শিকারীরা জানে। কিন্তু ফটিক সে-দক্ষতা আজও অর্জন করেনি। না করলেও বড়াই করতে সে ছাড়বে কেন? কিন্তু এখন বড়াই তো মুখে নয়, কাজে দেখাতে হবে। শ্বশুরের সামনে জামাই হয়ে কে-ই বা পরাজয় মানতে চায়; ফটিক এগিয়ে চলল রক্ত-রঞ্জিত পথ ধরে। বনে বন্দুক যার হাতে সেই নেতা। স্বাভাবিকভাবেই বক্‌স ফটিকের অনুগামী হলো।

কিছুদূর যেতে দেখা গেল বাঘের খোঁচ ঠিকই আছে, রক্তচিহ্ন আর নেই। কিসের ইঙ্গিত, আর কী-ই বা এর মানে—তা ভাববার অবস্থা এদের কি আর আছে! সামনেই বড় খালের ফাঁকা আলো—তা'তেই দু'জনে মশগুল। আর কিছু না হোক, সরে পড়বার অবকাশ হয়তো মিলবে।

মেলে না সে অবকাশ। বাঘ কলে ঠিকই আহত হয়েছিল। যেভাবে গুলি লেগেছে তা'তে ঘায়েল হবারই কথা। তবে রায়মঙ্গলের বাঘ। তেজ ও জীবনীশক্তি বোধহয় এদের আলাদা। আহত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সামনে এক কেঁচকি বনের ঝাড়ে। আহত হলে বন্য জীব মাত্রই জলের ধারে আশ্রয় খোঁজে। এত হিসেব করবার ক্ষমতা থাকলে নিশ্চয় এমুখো হতো না, বা বড় খালের ফাঁকা আলো দেখে এতটুকুও আশ্বস্ত হতো না।

বাঘের খোঁচ সোজা সামনের কেঁচকি ঝাড়ে এগিয়ে গেছে। ফটিকের ঝাড়ের দিকেই লক্ষ্য। বন্দুকের নলও সেদিকে এবার উদ্যত। ডান দিকে খানিকটা এগুতেই ঝাড়ের ভিতরটা সবটাই দৃষ্টিতে এলো। না, কিছুই নেই! ফাঁকা ঝাড়!

বাঁ দিকে খাল। ফটিক ঝাড় দেখতে পাঁচ-ছয় কদম ডাইনে গিয়েছিল। বক্স কিন্তু লাইন ছাড়েনি। এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। ফটিক ইঙ্গিত করল, সোজা খালের দিকে এগুতে। দু'জনেরই মুখ খালের দিকে। সামনে বক্স, পিছনে ফটিক। খালের চরে পৌঁছুবার জন্য দু'জনেরই মন উৎফুল্ল। তাড়াতাড়ি যেতে পারলেই হয়। আর কিছু না হোক, চরে দাঁড়িয়ে পেছন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে সামনে বন্দুক উদ্যত করা যাবে।

তা হয়তো যাবে। সামনে মাত্র পঁচিশ গজ। তারপরই খালের বিস্তৃত চর। এইটুকু তো পথ। এক দমেই পৌঁছে যাওয়া যবে। বনে আবার দৌড়ান মানা। ওরা হেঁটেই চলেছে; হেঁটে চললেও গতিবেগ প্রায় দৌড়বার সামিল।

তবে চুরি করে দৌড়তে তো নিষেধ নেই। অন্তত এ-বনের রাজা বাঘের তো নয়। আহত বাঘ যে এই কেঁচকি ঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল তা অবধারিত। পদচিহ্ন তার সাক্ষী। মানুষের সাড়া পেতেই সজাগ হয়ে ওঠে। ক্ষত বা আঘাতের কথা ভুলে জিঘাংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

বহুদূর বিস্তৃত গোলাকার পথে বেড় দিল। এতটা দীর্ঘ পথ সে অতিক্রম করেছে তীরবেগে। হাঁটু ভেঙে-ভেঙে ঘাড় ও মাথা নিচু করে করে ছুটে চলেছে। সারা দেহটাকে যেন হাত ও পায়ের চার খুঁটির মধ্যে দাবিয়ে লম্বা করে দিয়েছে। যেন বাতাসের মধ্যে ডুব-সাঁতার কেটে চলেছে।

অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে। ফাঁকা বনে এতটা বেড় না দিলে লুকোচুরি চলে না। প্রতিটি পদক্ষেপে নিশ্চয় সে ক্ষতের যন্ত্রণা অনুভব করেছিল। যন্ত্রণাই হয়তো অধিকতর ক্ষিপ্ত ও হিংসামত্ত হবার কারণ।

কিন্তু আর লুকোচুরি নয়। এবার আওতার মধ্যে। ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেষ কয় গজ মাটি ছেড়ে শূন্যে ভর করে ফটিকের উপর পড়ল। হুঙ্কার, দন্ত-বিকৃতির বিকট চেহারা, নখ-বিস্তৃত বিশাল থাবার আঘাত,—কিছুরই আবশ্যক ছিল না ফটিককে ঘায়েল করতে। অতবড় দেহের ওজনের আঘাতই পিষ্ট হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট।

বক্স গাজির পক্ষে হতভম্ব হয়ে যাবারই কথা। বন্দুক তার হাতে নেই। কাজেই গোড়া থেকে আত্মরক্ষার চিন্তাই ছিল মনে। কেঁচকি বন পিছনে ফেলে এসেই দেখছিল, সামনের গরান গাছে উঠে আত্মরক্ষা করা সম্ভব। গরান গাছ। তা হোক। আঁচড় খেয়েও ওঠা যাবে। ভাবনা তার শেষ না হতেই বজ্রনিনাদ। একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে বুকে আঁকড়ে সেই গাছটিতেই উঠে পড়ল। প্রথম ডাল হাতে পেতেই দ্বিতীয় ডালে উঠে পড়ল নিমেষে।

এতক্ষণ বাঘ কি করছে, সে খেয়াল গাজির ছিল না। পেছন ফিরে তাকাল। এমন দৃশ্যের জন্য সে-প্রস্তুত ছিল না। জামাই ধরাশায়ী। সামনে বাঘ। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে-

যেন এখনই দৌড়ে আসতে পারে তীরের মতন। শক্ত লম্বা লেজটি উত্তোলিত। মাঝে মাঝে উর্ধ্বমুখী লেজে শিহরন খেলছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার দিকেই। মুখে চাপা গর্জন।

বক্‌স গাজি দুটো শিষ-ডালের গোড়া শক্ত করে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে চিৎকার করল। বাঘকে ভয় দেখাতে চায়। প্রাণভয়ে ভীত পলাতক মূর্তিমান হিংস্রতম জীবকে ত্রস্ত করতে চায়।

বাঘ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ফটিক একবার পা নাড়তেই বক্‌স যেন পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠে আর ডালপালা ঝাঁকাতে লাগে।

ফটিক যন্ত্রণায় ছটফট করছে। স্পষ্ট দেখা যায়, বন্দুকটা হাতের মুঠোয় ধরাই আছে। লব্ধ শিকার অমন ছটফট করেই থাকে। বাঘের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একবার তাকিয়ে দেখল মাত্র। আবার নজর দিল গাজির দিকে। গাজির মতলব কি, তাই সে জানতে চায়।

ফটিকের কতটা জ্ঞান ছিল তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। তবে ঝটিতে হাতের মুঠোয় বন্দুকের নল উঁচু হয়ে উঠল। বন্দুকের গোড়ালি ফটিকের পায়ের কাছে। মুহূর্ত মধ্যে বন্দুকে আওয়াজ হয়ে ওঠে। বাঘও লুটিয়ে পড়ে কাছেই।...কিন্তু ফটিক !!

বাঘ পড়তেই গাজি ডালপালা নাড়া বন্ধ করে ফটিককে আপ্রাণে নাম ধরে ডাকতে থাকে। কোনও সাড়া মেলে না। তবুও ডাকে। ডেকেই চলে। সামান্য একটু নড়াচড়ার পর ফটিক শেষবারের মতো এলিয়ে পড়ল।

গাজি অনেকক্ষণ গাছে চুপচাপ বসে। গাছ থেকে নামতেই তার সাহস হয় না। কিন্তু বেলা গড়িয়ে যায় দেখে শেষ পর্যন্ত চোখ-কান বুজে একদৌড়ে খালের চর ধরে পালিয়ে এলো।

* * *

গ্রামে সকলেই খবরটা পাবার জন্য উন্মুখ। গুলির আওয়াজ সকলের কানেই গেছে।

গাজিকে এবার ফটিকের মৃত্যুর খবর গাঁয়ে বলতে হবে। কেমন ভাবে কথা পাড়বে, তাই তার ভাবনা। সঙ্গে সঙ্গে বাঘেরও মৃত্যু-খবর দিতে পারবে বলে মন অবশ্য খানিকটা হাল্কা।

কিন্তু যার হাল্কা হবার নয়, তার ? ফটিকের বউ ডুকরে কেঁদে উঠল। প্রথম ধাক্কা কাটতেই অশ্রুসিক্ত ঠোঁট কামড়ে ধরে বলে উঠল,—বনে মরলে তো কবর দিতে তোমায় ডাকব না! বনে মরলে তো কবর দিতে তোমায় ডাকব না !!

এক-একবার আছড়ে পড়ে আর বুকফাটা চিৎকার করে,—ডাকব না! ডাকব না!

ঐ এক কথা বারবার বলতে বলতে পাগলের মতো সেও সবার সঙ্গে জোর করে ডিঙিতে উঠল বনে আসবার জন্য।

ছয়

যশোহর-খুলনার এক সেকেলে মা। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সামনে একটু দূরে কেরোসিনের ডিবে। আলো যতটা দিচ্ছে তার চেয়েও কালো ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করছে দ্বিগুণ। মায়ের দৃষ্টি আলো ডিঙিয়ে উপর দিকে। ঠিক দৃষ্টি নয়, তাকিয়ে আছেন। রাতকানা, তাই কোন কিছু দেখবার চেষ্টা না করে মাঝে মাঝে পলক ফেলে তাকিয়ে আছেন। বিধবা মা। রাত্রে খাওয়ার বালাই নেই। জলাহার যা হবার তা সমাপন হয়ে গেছে। হামান-দিস্তা নিয়ে পান থেঁতিয়ে চলেছেন ঢবঢব করে টিমে তালে। মাঝে মাঝে তর্জনী দিয়ে দেখছেন, পান-শুপারি কতটা গুঁড়িয়ে মিশে গেছে। অল্প আলো হলেও দেখা

স্বায়, আঙুলের ডগা বেশ লাল হয়ে এসেছে।

চোখের তেজ হারালেও কানের তেজ একটুও কমেনি। হুড়কোর একটু আওয়াজ হতেই আধা-ফোকলা মুখে বলে উঠলেন, কিরে মহেন্দির! পারলি কিছু করতে? কই, আওয়াজ-টাওয়াজ তো কিছু শুনতে পাইনি।

—না, মা! হলো না। কোন পাত্তাই মেলেনি।

—তোর আর হবে না। এতো বাঘ মারার শখ যখন, তখন তোর বাঘের পেটেই যেতে হবে একদিন!

—অভিশাপ দিচ্ছ তো! যাক্ বাঁচা গেল, তাহলে আমি আর বাঘের পেটে যাচ্ছি না। জানো তো, মা'র অভিশাপ কোনদিনই সত্যি হয় না।

—রাখ্ তোর ঢঙ্। নে, এখন বন্দুকটা রেখে হাত-পা ধুয়ে আয়। যা খাবিটাবি খেয়ে নে।—বলেই তাড়তাড়ি শেষবারের মতো হামানদিস্তায় পান ছেঁচে হাতের তেলোয় গোটা করে তুলে নিলেন।

বাঘের কারবার রাতের অন্ধকারে। খাস বনের খবর হয়তো আলাদা, কিন্তু গ্রামে এলে বাঘ কেমন বুঝে ফেলে, শত্রু তার চারদিকে। বেশি হাঁক-ডাকও করে না, শিকারও করে রাত্রের অন্ধকারে চুপিসারে।

বাঘকে খুঁজে পাওয়াও দুরূহ। বিশেষ করে যশোর-খুলনার নওয়াপাড়া অঞ্চলে এবং আরও বিশেষ করে শ্রীধরপুর গ্রামে। খুবই পুরানো গ্রাম। এককালে সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। দালান-কোঠায়, রাস্তা-ঘাটে এ-অঞ্চল বোধহয় গম্‌গম্ করতো তখন। বার ভূঞার রাজ্য ও শাসন ভেঙে পড়ার পর থেকে ধীরে ধীরে শ্রীধরপুরের শ্রী যেন কোথায় উবে গেল। একদিকে যেমন বিলাসভোগী জমিদারদের বংশগুলি শরিক বিবাদে হলো ছিন্ন-ভিন্ন, তেমনি অন্যদিকে জীবিকার সন্ধানে ও প্রতিপত্তির লোভে গাঁয়ের লোকজন দেশছাড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

এ অঞ্চল বলতে গেলে এখন জঙ্গলাকীর্ণ। তার উপর আবার ভাঙা দালান কোঠা ধীরে ধীরে গাছ-আগাছায় ঢাকা পড়ে হয়ে উঠেছে বন্য জীবের নিভৃত আশ্রয়। এমন অঞ্চলে শিকারীর পক্ষে এককভাবে বাঘের মতো জীবকে সহজে খুঁজে পাওয়া দায়।

দায় হলেও মহেন্দ্র বসুর দায়ও কম নয়। শ্রীধরপুরে এ এক মজার মানুষ। এমন মজার মানুষের দেখা এককালে বাঙলা দেশে বহু গ্রামে মিলতো। এরা সাধুও না, আবার সংসারীও না। মা, ভাই, বোন, বৌদির সঙ্গেই সংসারে জড়িয়ে থাকে। দায়-দায়িত্বও পালন করে। কিন্তু বিয়ে-থা করে কখনও পুরো সংসারী হবে না। অকর্মণ্য নয়, বরং কর্মবীর বলা যেতে পারে। এমন কাজ নেই যা তারা লেগে পড়ে থেকে উদ্ধার করে না। বসন-বাসনে এরা সাধু। চরিত্রেও সাধু। সততার প্রতিমূর্তি বলা যেতে পারে। খালি পা, পরনে ধুতি আর গায়ে হয়তো বা ফতুয়া, না হয় সাধারণ কামিজ।

সাধু বটে, তবে বৈরাগীও নয়, বিবাগীও নয়। মাছ মাংস কোনটাতেই আপত্তি নেই। কিন্তু মানুষের সাথে ব্যবহারে বৈষ্ণব। সাহস এদের প্রায় দুর্জয় বলা যেতে পারে। কোনও বিপদ আপদ এদের কাছে বিপদ আপদই নয়।

মহেন্দ্র তেমনি এক মানুষ। মায়ের চার সন্তান। মহেন্দ্র তৃতীয়। অন্যান্য ভাইরা অন্যত্র সচ্ছলতায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মা তাদের কারও সঙ্গে থাকেন না। 'মহেন্দির'ই তাঁর প্রিয়। মহেন্দ্রের সঙ্গে এই পোড়ো গ্রামে পড়ে থাকতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়, তবু তার সঙ্গেই থাকেন ও থাকবেনও।

দক্ষিণ বাঙলার এমন পোড়ো অঞ্চলে এক মহাআপদ বুনো শুয়োর। মহেন্দ্রের একটা বন্দুক আছে। এটা তার পৈত্রিক সম্পত্তি। বিলাতী বন্দুক, মনে হয় আজও যেন নতুন চক্‌চক্ করছে। মহেন্দ্রেরও যত্নের যেন সীমা নেই। এই বন্দুকের জন্য মহেন্দ্রের ঘাড়ে এক দায় এসে পড়েছে। আশপাশের গ্রামকে বুনো শুয়োরের দাপট থেকে রক্ষা করা। এ কাজে মহেন্দ্র দক্ষ।

কিন্তু এবার বাঘের উপদ্রব। অগতির গতি মহেন্দ্র। তার চেষ্টারও বিরাম নেই। মহেন্দ্রের ভয়-ভয় যে করে না, তা নয়। সুন্দরবনের কাছাকাছি যশোর-খুলনায় বাঘের কথা হলে, রয়্যালবেঙ্গল টাইগারের কথাই প্রথম মনে হয়। এ যাবৎ তার সঙ্গে দেখা না হলেও—গল্পে গুজবে, প্রবাদে ও কাহিনীতে এই জীবের ভীতিপ্রদ চেহারা যেন অন্য সবার মতো মহেন্দ্রেরও চোখের সামনে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনও হদিশ করা যায় না। অবশেষে মহেন্দ্রেরই বাড়ির পাশে গোপাল গোয়ালার একটা বাছুর নিয়েছে। লাশ পেতে বিশেষ দেরি হয় না। আম-কাঁঠালের বাগান পেরিয়ে শনের খেত। প্রায় মাথা-উঁচু শন-খড়ের এক ঝোপের মাঝে পাওয়া গেল। সবটাই প্রায় খেয়ে ফেলেছে, খাদকের পুনরাগমনের আশা বৃথা। তা ছাড়া ধারে কাছে এমন গাছ নেই যে গাছাল শিকার করা যাবে।

তিন বিঘে জমি নিয়ে শনের খেত। তার পরেই খোলা মাঠ। খোলা মাঠ ঠিক নয়, ধানের ক্ষেত। শীতের শেষে এখন অবশ্য ফাঁকাই। তবে কলাইগাছের আবরণে গাঢ় সবুজ রঙ। কলাইশাকের আস্তরণের উপর বাঘের পদচিহ্নের কোন ছাপ থাকার কথা না। ছিলও না। এই খেত পেরিয়ে বাঁশঝাড। দীর্ঘ ও সজীব ঝাড়গুলি। সজীবতায় ও নমনীয়তায় বাঁশঝাড়কে বাঙলা দেশের সৌন্দর্যের প্রতীক বলা যেতে পারে। দেখতে নমনীয় হলেও চরিত্রে কিন্তু বড় রুক্ষ। অন্য কোনও গাছকে এর ধারে কাছে হতে দেয় না। কাজেই ঝাড়ের তলা ফাঁকা ও পরিষ্কার।

মহেন্দ্র প্রায় আনমনে বাঁশঝাড়ের তলায় এসেছে। নজর সামনের জঙ্গলের দিকে। এবার সে সতর্ক। গাঁয়ের অনেকেই পেছনে জটলা করছে এবং ভয়ে খানিকটা হৈ-হল্লাও করছে। মহেন্দ্র সতর্ক পদক্ষেপে এগুতে থাকে। সঙ্গে গোপালের ছেলে মাধো। মাধোর বয়স বছর ষোলো হবে। সাহসের চেয়ে মনের আবেগে মহেন্দ্রের সঙ্গ নিয়েছে। বাছুরটাকে সে বড় ভালোবাসত।

মহেন্দ্রের ঝোপের দিকে লক্ষ্য। আস্তে আস্তে একটা কেয়াফলের গাছের প্রায় নিচে এসে গেছে। মাধো ত্রাসে চিৎকার করে ওঠে,—মাথার 'পরে। ঐ যে !!

কেয়া গাছের ডালে। যেমন গায়ের ছাপ গোল গোল, তেমনি গোল গোল তার চোখ। চিতা বাঘ বা এদেশে যাকে বলে 'গুলো বাঘ'। মহেন্দ্র সচকিত হয়ে তাকাতেই দেখে, প্রায় লাফ দিয়ে পড়ার উপক্রম। হয়তো বা মহেন্দ্রকে আরেকটু এগুতে দেবার জন্য অপেক্ষা করছিল। লেজ শক্ত করেছে, গোটো-করা দুই থাবার উপর ভরও করেছে।

মহেন্দ্রের গুলি করতে কাল বিলম্ব হয় না। কেঁদো নিচে পড়ল। লাফ দিয়েই পড়ল যেন আলগোছে চার থাবায় ভর করে। কিন্তু তার পরেই ধরাশায়ী।

*　　*　　*

ঘরে ফিরে আসতেই মা অভ্যর্থনা জানালেন,—কিরে মহেন্দির! তাহলে এবার বাঘ-শিকারী হলি!

শুধু মা নয়, এ-অঞ্চলের সবাই মহেন্দ্রকে বাঘ শিকারীর সম্মান দিয়ে বসলো। মহেন্দ্র 'হ্যাঁ'-ও করে না, 'না'-ও করে না। করবেই বা কি। 'না' করলে তো সবাই ধরে নেয় ওর বৈষ্ণব বিনয়। কিন্তু মহেন্দ্রের শান্ত মনে খটকা লাগতে থাকে। কেঁদো মেরে বাঘ-শিকারীর পদবী নিতে বাধে। যত দিন যায় ততই মনে খোঁচা লাগে বেশি বেশি করে। সুন্দরবনের কাছাকাছি বাস করে কেঁদো মেরে বাঘ মারার বাগাড়ম্বর করা মানায় না। সুন্দরবনে একবার বাঘের দেখা পাবার জিদ ক্রমেই মনে জাগে।

জাগলে কি হবে, সুন্দরবনে যাবার লোভ বহুদিন মনে মনেই পুষতে হলো। সুন্দরবনে যাব বললেই যাওয়া হয় না। অনেক তোড়জোড় আবশ্যক। হাতে বেশ অবসর সময় চাই, নৌকো চাই, ভালো মাঝি-মাল্লা চাই, সুন্দরবনের অজস্র খাল-নালা ও নদ-নদীর জ্ঞান ও ধারণা চাই, আর সর্বোপরি বনের সঙ্গে পরিচিত—এর জীব-জন্তু, গাছ-গাছড়ার সঙ্গে পরিচিত—লোক থাকা চাই। এমন লতাও আছে এ-বনের ঝোপ ও ঝাড়ে যার পাতার রসে বিদেশী শিকারীকে অন্ধ হয়ে ফিরতে হয়েছে বন থেকে।

ভাগ্যক্রমে এক সুযোগ এলো কয়েক বছরের মধ্যেই। খুলনা-যশোহরের মধ্যবিত্তদের সংসার তখন দু'নৌকায় পা দিত। একদিকে কলকাতা, অন্য দিকে আবাদ। শিক্ষাদীক্ষা, চাকুরি-বাকুরি করে সংসারে দাঁড়াতে হলে, কলকাতা ; আর জমির উপর নির্ভর করে বাঁচতে হলে, আবাদ।

এদেশের লোকের আবাদের লোনা মাটির প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার। সামান্য কিছু অর্থ যোগাতে পারলেই আবাদের দু'চার বিঘে জমি কিনবেই কিনবে। কিনবেই বা না কেন! সোনার ফসলের দেশ। শীতের মরসুমে ভাটি অঞ্চলের নদী-নালায় এমন নৌকো দেখা যাবে না, যা সোনার ফসলের ভারে ডুবুডুবু হয়নি।

মহেন্দ্রের বাল্যবন্ধু প্রতুল। ওকালতি করে সবে নাম ডাক হয়েছে। দেখা হতেই প্রতুল উৎফুল্ল হয়ে বলল,—যাবি না দক্ষিণে? একা একা যেতে হবে, ভালো লাগছে না!

মহেন্দ্র অনাসক্ত ভাব দেখিয়ে বলল,—কি হবে তোর সঙ্গে গিয়ে। জানি, তুই যাবি তোর জমির লোভে, আর আমার লাভের লাভ—ভাটো দেশের নোনাপানি খেয়ে দিন কাটাতে হবে!

—না রে! দশ বিঘে মতো জমি কিনবার সুযোগ পেয়েছি গুনোরিতে—গুনোরির আবাদ দাকোপেরও দক্ষিণে। বাদা তো বেশি দূর নয়। তুই তো আবার শিকারী। চল্ না।

দাঁড়া, কি বললি? ঠিক বলছিস তো! মহেন্দ্রের সুর পাল্টে গেছে!

বা রে! ঠিক বলব না! গত সনেই প্রথম যাই। আবাদ যে এমন তা কি আর ধারণা ছিল। সে কী দুর্ভোগ! বাঘের হাঁকাহাঁকির চোটে অস্থির। সন্ধ্যা না হতেই দোর বন্ধ করে ঘরে থাকতে হতো।

কথাবার্তার আর বেশি আবশ্যক হয় না। অগ্রহায়ণের শেষাশেষি ওরা চাল-চিঁড়ে আর মশলাপাতি গুছিয়ে নিয়ে যাত্রা করল। চালের দেশে চলেছে, চাল বা চিঁড়ের বিশেষ আবশ্যক ছিল না। কিন্তু দক্ষিণের অমন সবল ও পুষ্ট চাল মিঠে পানির লোকের পেটে সহসা সহ্য হয় না।

দাকোপ পর্যন্ত স্টীমারে গেলেই চলতো। তারপর দাকোপের মতো বড় হাটে টাবুরে-নৌকো পেতে বিশেষ বেগ পেতে হতো না। কিন্তু দুই বন্ধুতে যাত্রা-পথকে দীর্ঘতর

করার আনন্দে খুলনা থেকেই নৌকোয় যাত্রা করল।

এই সময়ে খুলনা থেকে আবাদে যাবার নৌকোরও অভাব হয় না। আবাদে যাবার নদী-পথগুলি শীতের মরশুমে যেন নৌকোতে নৌকোতে ধূলপরিমাণ হয়ে ওঠে। ফসলের গন্ধে বুঝি পাখির দল ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে থাকে। এতো ফসল যে আবাদের লোকেরা তা কেটে ঘরে তুলতে অপারগ। খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল চারিদিক থেকে দলে দলে ডিঙি ডোঙায় করে এসে ধান কাটার কাজে যোগ দেয়। যে যে-ভাবেই আসুক, এক মাস গতর খাটালে ধানের আঁটিতে তাদের ডিঙি বোঝাই করে দিতে আবাদের লোকে কার্পণ্য করে না। কাজেই মাঝি-মাল্লা সবাই এ-সময় আবাদের নামে বলতে গেলে ডিঙির বাঁধন খুলেই থাকে।

ভৈরব, রূপসা, পশর ও চুনকুড়ির পথ ধরে ওরা দাকোপ এলো। সেদিন দাকোপের হাট। আবশ্যক মতো কাঁচা সওদা কেনাকাটি করে নেয়।

কমপক্ষে পনেরো দিন তো গুনোরিতে থাকতে হবে। দক্ষিণে আরও ভাটিতে হাট নেই বললেই হয়। দাকোপেই সে-রাতের মতো বিশ্রাম করার কথা। কিন্তু শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠি, ভাটি শুরু হবে শেষ রাতে। বিশ্রামের বদলে ভাটির অপেক্ষায় ব্যগ্র মনে সময় কাটাতে হলো। এই ভাটি হাতছাড়া হলে, পরের ভাটিতে গুনোরি পৌঁছতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবে। সন্ধ্যায় বনের ধারে কাছে কেউই আনাগোনা করতে চায় না, বিদেশীরা তো কেউ সাহসও করে না।

গুনোরি এসে গুছিয়ে-গাছিয়ে সড়গড় করে নিতে চার-পাঁচ দিন কেটে গেল। প্রতুল তো ধান কাটার কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। ক'দিনের মধ্যে ধান খলেনে উঠে এলো প্রায়। এর পর মাড়াইয়ের কাজ। মাড়াইয়ের আগে অবশ্য ধানের আঁটি রোদ খাইয়ে নিতে হবে। ক'দিন ধরে কুয়াশা পড়ছে। ফলে রোদ খাওয়াতেও কিছুদিন বেশি সময় লাগবে। এবারই অবসর। মহেন্দ্র উশখুশ করতে থাকে। কথাও পাড়ে। বনে শিকারের কথা। নবীন মোল্লার সাথে কথা পাড়লে সে বলল, কি শিকার?

মহেন্দ্র থতমত খেয়ে বলল, হরিণ শিকার।

এই ক'দিনেই যা দু'একটা বাঘের গল্প শুনেছে তাতে বাঘের কথা মুখে আনা যে বেয়াদবি, তা মহেন্দ্র বুঝে ফেলেছে।

নবীন মোল্লা ঠাট্টার সুর নিয়ে বলল, তা হরিণ খুঁজতে খুঁজতে যদি বড় মেঞার সঙ্গে মোলাকাত হয়, সে আপনার ভাগ্যি!

এ-কথা বলেই আবার বলল, তাই বলে বাঘের কথা কিন্তু মুখে আনতে যাবেন না!

নবীন মোল্লার এসব কথা বলার খানিকটা অধিকার ছিল। নিজে পুরো বাওয়ালি না হলেও অনেকবার বাওয়ালির সঙ্গে বাঘ সরিয়ে দিতে বনে ঘুরেছে; হরিণ শিকারও দু'চারটে করেছে।

ঠিকঠাক হলো বনের অনেক ভিতরে গিয়ে শিকার করতে হবে। তবে ডাঙায় নয়, ডিঙি করে বড় নদীর চরে চরে। উত্তরের 'বাবু শিকারী'কে নিয়ে বিপদে পড়তে চায় না নবীন মোল্লা। কন্‌কনে শীতের রাতের পর মিষ্টি রোদ নদীর চরে উপ্‌ছে পড়তেই দলে দলে হরিণ আসে রোদ পোহাতে।

এ-পন্থায় সুন্দরবনের হরিণের দেখা পাওয়া সহজ হলেও শিকার করা সহজ নয়। বড়

নদীর মাঝ দরিয়া থেকে বেশ দেখা যাবে, ছোট বড় হরিণের দল চপল পায়ে ঘুরে ফিরে যেন চরের ওপর মাছের মতো সাঁতরে বেড়ায়। বন্দুকের পাল্লার বাইরে থাকলে ওরা নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার। কিন্তু ডিঙি একটু এগিয়ে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আনতে গেলেই চকিতে বনের আশ্রিত জীব বনের মাঝে কোথায় যেন উবে যাবে।

সেখের টেক্। দক্ষিণে কালীখাল। পুবে পশর, পশ্চিমে শিব্‌সা এবং উত্তরে সেখের খাল। চার বর্গ মাইল পরিমাণ স্থান। সুন্দরবন দুর্গম। কিন্তু এই চত্বরটুকুর দুর্গমতার তুলনা নেই। ঐতিহাসিকদের অনুমান, এইখানেই রাজা প্রতাপাদিত্য তাঁর শিব্‌সা দুর্গ ও কালিকা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার চিহ্ন আজও বর্তমান। কোন কোন মন্দির তো আজও বনের আড়ালে মাথা উঁচু করে আছে।

পোড়ো-ঘরবাড়ি, আর সুন্দরী, গরান, গর্জন ও গেঁয়ো বৃক্ষরাজি আর হেতাল, বলাসুন্দরী, গিলে লতা ও গোলপাতা—সকলে মিলে জড়াজড়ি করে যেন নিবিড়ভাবে দুরধিগম্য করেছে এই চত্বরকে। যেমন বাঘ, তেমনি হরিণ। খাদ্য ও খাদক কেমন করে এমন একত্রে বসবাস করে—সে এক বিচিত্র ব্যাপার।

ডিঙিতে মহেন্দ্র, প্রতুল, নবীন মোল্লা ও আরও দু'তিনজন। ভোর থাকতে যাত্রা করেছিল। সেখের খাল ছাড়িয়ে এতক্ষণ পশরে ভাটির টানে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। ডাইনে সেখের টেক্। সকালের এমন রৌদ্রস্নাত চরে হরিণের দেখা না পাওয়া আশ্চর্য। মাঝে মাঝে চরের কিনারায় দু'একটা বানরকে ঘাসের মুথো খুঁজে বেড়াতে দেখা গেল। কিন্তু হরিণের চিহ্ন মেলে না। নবীন মোল্লা বেশ বিব্রত। সে অতিশয় আশ্বাস দিয়েছিল সবাইকে।

পশর এখানে একটানা দক্ষিণে সাগর মুখে এগিয়ে গেছে। এপার ওপার প্রায় দেখা যায় না। এত বড় নদীতে একটু আধটু আঁকাবাঁকা ধরা দেয়.না চোখে। তবু তীর ধরে এগুলে দেখা যাবে, উপকূল ভাগ করাতের মতো খাঁজকাটা। ছোট ছোট টেক্‌গুলি একের পর এক জলরাশির মাঝে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বার বার টেকগুলি পেরুবার মুখে নবীন মোল্লা বন্দুক হাতে মহেন্দ্রকে সতর্ক করে দিচ্ছে। যেন এইবারই শিকার মিলবে। নতুন শিকারীর মতো মহেন্দ্রও বন্দুক কাঁধে নিয়ে বারবার সতর্কও হচ্ছে। কিন্তু বৃথা। সামনে আরেকটা টেক্। টেকের শেষ বিন্দুতে একক একটি কেওড়া গাছ। একা দাঁড়িয়ে থাকলেও তার ঘন পাতার আবরণে বেশ আড়াল পড়েছে। নবীন মোল্লা আবারও সতর্ক করলো। গভীর বনের এমন পরিবেশে কোনও সতর্ক বাণীকে অবজ্ঞা করা যে-কোনও লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। মহেন্দ্র তো দূরের কথা। কাঁধে তুলে ঘোড়ায় হাত দিয়েই আছে।

ডিঙির গলুই টেক্ বেড় দিতেই দ্যাখে, শিকার ওদের সামনে। গলুই-এর সামান্য ছায়া চোখে পড়তেই সবে মাথা উঁচু করেছিল সমঝে নিতে। বন্য জীব মাত্রই বিপদের সংকেত পাওয়া মাত্র দৌড়ে পালায় না। মুহূর্তের জন্য একবার দেখে নিতে চায়, বিপদ তার কোন্ দিকে। তারপরই তড়িৎগতি। হরিণ হলে তো সে-গতির তুলনা নেই।

মহেন্দ্র সে অবকাশ দিল না। মুহূর্তের মধ্যে ধূম্র উদ্‌গিরণ করে বন্দুক আওয়াজ করে উঠল। দীর্ঘকায় শিঙেল হরিণ টলতে টলতে বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

সঙ্গে সঙ্গেই নবীন মোল্লার উল্লাস,—সাবাস বাবু, সাবাস।

আর সবাই চুপচাপ। মোল্লা একটু পরেই বলে,—কিন্তু মুশকিলের কারবার হলো তো!

প্রতুল এতক্ষণে ভয়ে আড়ষ্ট গলায় সবাক হয়ে ওঠে,—কেন ? মুশকিল আবার কি হলো ?

—না তেমন কিছু নয়। চরে পড়লেই ভালো ছিল। শিকার ঠিকই হয়েছে। ওকে ধারে কাছেই পড়তেই হবে। পড়েছেও ঠিক। তবে বনে তো একটু উঠতে হবে। তাই!

মহেন্দ্রের উৎসাহ এবার অদম্য। ওদের কথাবার্তার মধ্যেই নামবার তোড়জোড় করতে থাকে। হালের লোকটি স্বাভাবিকভাবেই চরে ডিঙি লাগাতেই মহেন্দ্র নেমেও পড়ল। নবীন মোল্লাও অনুগামী হয়ে চরে নেমেছে। নেমে একবার মহেন্দ্রের হাতে দোনলা বন্দুকটির দিকে তাকাল। ভয়ানক ইচ্ছা হলো, সে নিজেই বন্দুকটি হাতে করে বনে ঢোকে। লজ্জায় বন্দুকটি চাইতে পারল না। মৃত্যুর মুখোমুখি এমন ঘটনা ঘটে। শুধু বলল,—একটা তো খালি হয়েছে, ওটাতেও গুলি পুরে নিন বাবু!

মহেন্দ্র বন্দুকের নল ভেঙে গুলি পুরতে পুরতে নবীন মোল্লা হরিণের জায়গাটিতে এসে গেছে। অজস্র হরিণের পদচিহ্ন। তার মাঝে কোনটি কার বা কবেকার, তা ঠিক করা দুঃসাধ্য। মহেন্দ্র কাছে আসতেই আন্দাজে দু'জনে হরিণের পলায়ন পথ ধরল। সন্দেহভঞ্জন হতে সময় লাগে না। সামনেই তাজা রক্তের চিহ্ন।

অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। এতদূর আসতে হবে মোল্লা তা আগে ভাবতে পারেনি। কিন্তু এখন কি করা! পিছুতে সম্মানে বাধে, এগুতে শঙ্কা জাগে! সেখের টেক্, এ-টেক্‌কে বিশ্বাস নেই। তবু মহেন্দ্রের উৎসাহ মোল্লাকে যেন টেনে নিয়ে চলল। লব্ধ শিকারের প্রতি শিকারীর আকর্ষণ দুর্দমনীয়।

বেশিদূর্ আর এগুতে হলো না। কয়েক কদম এগিয়ে হোদো ঝাড়ের পাশ কাটালেই একেবারে মুখোমুখি। ত্রিশ হাতের মধ্যেই। অমন বিশালকায় বাঘের হিংস্র দৃষ্টির তীব্রতা আচম্বিতে স্তম্ভিত করে দেবে যে-কোন জীবকে। মহেন্দ্র আড়ষ্ট। নবীন মোল্লাও হতবাক্।

গোটা হরিণটার উপর চেপে বসে রক্ত পানে লিপ্ত ব্যাঘ্র চাপা গর্জন করে ওঠে। নিম্ন অধর বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। চাপা গর্জন ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। রোষকষায়িত কটাক্ষ। ভ্রূ দুটি যেন ওঠা নামা করতে থাকে। ললাটের কালো রেখার এই কম্পন দেখলেই মনে হবে, দুর্জয় শক্তি, বেগ ও ক্রোধকে যেন কোনমতে রুদ্ধ করে রেখেছে মুহূর্তের জন্য।

নবীন মোল্লা মহেন্দ্রের কাছ থেকে কয়েক কদম পেছনে ও খানিকটা পাশে। মোল্লা হতবাক্ হলেও জ্ঞানহারা হয়নি। মহেন্দ্র বুঝি জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছে। সর্ব অঙ্গ নিশ্চল।

না, নিশ্চল হলেও ঢলে পড়ল না। মন তার সজাগ ছিল না, কি ঘটেছে আর ঘটতে পারে—সে-বোধ মহেন্দ্র হারিয়ে ফেলেছে। তবু কেমন করে সে যেন বন্দুকের নল উঁচিয়ে ধরল। উঁচিয়ে ধরতেই বাঘের ক্ষিপ্ত গর্জন হঠাৎ স্তব্ধ। বাঘের গর্জন বুঝি-বা এতক্ষণে মোল্লা ও মহেন্দ্রের কাছে সহজ হয়ে এসেছিল। হিংস্র ও উগ্র চাহনির সামনে এই স্তব্ধতা এবার তার চেয়েও ভয়ংকর মনে হলো। বিস্ফোরণের পূর্বমুহূর্ত।

পলকের অবকাশ নেই। লেজ দিয়ে মাটিতে বাড়ি দিতেই মোল্লা সর্বদেহ কাঁপিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো,—মারো !!

মহেন্দ্র যেন চিৎকারের ধাক্কায় গুলি করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে ব্যাঘ্রহুংকার। শ্রীধরপুরের শুয়োর শিকারের অভ্যাস মতো মহেন্দ্র কয়েক কদম পাশে সরে এলো। পাশে সরে আসবার অবকাশ কি করে পেলো, সে-হিসাব মিলবার নয়! বজ্র-

হুংকারের সঙ্গে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়লো মহেন্দ্রের পূর্বস্থানে। গুলির প্রত্যাঘাত কতটা লম্ফনকে ব্যাহত করেছিল তা অনুমানসাপেক্ষ। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

তবু বিশ্বাস নেই। কোন অবকাশ দিতেও নেই। মোল্লা চিৎকার করে উঠলো,—মারো,...গুলি মারো!

দ্বিতীয় বুলেট মাথা ভেদ করতে অতবড় দেহের সর্বস্পন্দন স্তিমিত।

বন্দুকের কুঁদো মাটিতে রেখে নলের ওপর হাত ভর করে মহেন্দ্র সন্ন্যাসীর মতো নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল। একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলল,—অভিশাপ!

* * *

নবীন মোল্লা খানিকটা হৈ-হল্লা করে মহেন্দ্রকে প্রায় টেনে নিয়ে এলো ডিঙির কাছে। চরের ওপর শীতের প্রশান্ত পশর নদীর হাওয়া চোখেমুখে লাগতেই মহেন্দ্র যেন ধাতস্থ হলো।

ডিঙির লোকেরা তে বিপদের ইঙ্গিত পেয়ে লগি তুলে এক খোঁচায় ডিঙিকে স্রোতের টানে ফেলে দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল।

ওদের দু'জনকে দেখতেই গলুই চরের ওপর আবার এগিয়ে দিয়ে প্রতুল সাগ্রহে প্রশ্ন করল,—কি রে মহেন্দির! ফিরে এসেছিস!

প্রশ্নের প্রতি খেয়াল না করে মহেন্দ্র স্বগত উক্তির মতো যেন বলল,—মায়ের অভিশাপ কখনও সত্য হয় না! তাই না!!

সাত

সুন্দরবন দুর্গম ও দুরধিগম্য। মিথ্যা কথা, এমন সুগম ও সহজ-অতিক্রম্য বন অন্য কোথাও মিলবে কিনা সন্দেহ। জলপথ ধরলে এ-বনের যে-কোন অংশের অন্তস্তলে পৌঁছান যাবে অতি সহজেই। স্থলপথ ধরলে নাতিদীর্ঘ স্পষ্ট শুঁড়িগুলি যেন আহ্বান করতে থাকে। এগিয়ে যাবার নেশা ধরে যায়। কি যেন এক মায়া ও মোহ মনকে আবিষ্ট করে, ভুলিয়ে দেয় অতীত ও অনাগতকে।

নিশ্চল পাথরে গাঁথা মন্দির বা মসজিদের যদি ভয় বা ভক্তিবিহ্বল মানুষকে মোহগ্রস্ত করবার ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে এমন জীবন ও রোমাঞ্চে ভরপুর বনের পক্ষে সে-মানুষকে মোহগ্রস্ত করবার অপরিসীম ক্ষমতা থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। যুগ যুগ ধরে দক্ষিণ বাঙলার মানুষকে এই বন অভিভূত করে রেখেছে নানাভাবে, বিচিত্রভাবে।

তাই বনের উপকূলবাসী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এক ছোট চাষী-সংসারের অভিরাম যখন এই মোহে একবার জড়িয়ে পড়েছিল, কেউ তাকে অভিশাপ দেয়নি, কটূক্তিও করেনি।

যখন সে ছোট শিশু, তার দাদামশায় একবার তাকে কান পাতিয়ে 'বরিশাল গান' শুনিয়েছিল। গুড়ুম....গুড়ুম...গুড়ুম—বনের ওপর দিয়ে ভাদরের ভরা আকাশ ভেদ করা চাপা নিনাদ ধ্বনি।

দাদামশায় তর্জনি তুলে দিকনির্ণয় করে বলল,—অভি! শুনছিস, শুনতে পাসনি!

অভিরামের সে-নিনাদ শুনতে না পাবার কিছু ছিল না। উত্তরে শুধু বিস্ফারিত চোখে

ধীরে ধীরে মণি-যুগল নাড়িয়েছিল।

—জানিস্ অভি, লঙ্কার রাজা রাবণ। তারই তোরণ-দ্বার আজও খুলছে ও বন্ধ করছে। তারই আওয়াজ। বুঝলি ? ঐ শোন্।

শিশুমনে নেশা ধরে যায়। কল্পনা প্রসারিত হতে থাকে বনকে ঘিরে। রাম-রাবণ। সে তো তার রক্তে—হাজার হাজার বছর ধরে যার কাহিনী এদেশের আবালবৃদ্ধকে আপ্লুত করে রেখেছে। সেই রাবণের সিংহদ্বার। কতবড় না জানি, তাই এমন কামান গর্জনের আওয়াজ।

অভিরাম দু'কানে আঙুল দিয়ে সজোরে চেপে ধরে। বোঁ-বোঁ আওয়াজ হয়—রাবণের চিতা জ্বলছে। সেই রাবণের সিংহদ্বার।

সত্যি কি তাই ? সত্য নাও হতে পারে, বানানো কথা। বন। বনই আড়াল দিয়ে রেখেছে সে সন্দেহকে। শুনেছে বনের ওপারে সমুদ্দুর। সমুদ্দুর পার হয়ে রাম লঙ্কায় গিয়েছিল। সেই সমুদ্দুর। হয়তো সত্য। বনের দিকে অভিরাম তাকায় নিবিড় চিত্তে। বনও যেমন সত্য, সুন্দরবনের নিরুপদ্রব কামানগর্জনও তো তেমনি সত্য। সিংহদ্বারের আওয়াজ। হয়তো সবই সত্য। রহস্যময়ী বনের সর্ব আচরণই সত্য বলে মনে হয় শিশু অভিরামের কাছে।

অভিরাম তো এখন অনেক বড়ই হয়েছে। তবুও বনের আচরণ-রহস্যে উদ্বেলিত হতে এতটুকু সময় লাগে না। এ শুধু অভিরামের বেলায় নয়। বনের ছায়ায় যাদের জীবন-যুদ্ধের আনাগোনা চলে, তারা সবাই এমনিধারা। অশীতিপর বৃদ্ধও যেন এখানে এ-বিষয়ে ছেলেমানুষই থেকে যায়। সমভাবে সংসার-জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যেও এরা ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তা না হলে এমনই বা হবে কেন ?

নিমাই মোড়ল ছিল অভিরামের সমগোত্রীয়। একখানার বেশি দু'খানা তাদের লাঙল ছিল না। ছিল না তিন বিঘা জমির একটুও বেশি খাস-দখলে। তবুও নিমাই মোড়ল আজ শত বিঘা জমির মালিক।...অভিরামের নিজের চোখে দেখা, মনছুর মোল্লার চারচালা ঘর, দু'দুটো গোলাভর্তি ধান। তাদের বিস্তৃত উঠানে কবিগানের লড়াই চলতো রাতভোর। ছুটোছুটি করে কত খেলেছে অভিরাম এই আঙিনাতে সন্ধ্যা রাত অবধি। কোথায় গেল সে-সব। সবই যেন উবে গেছে। সে-আঙিনা আজ লোনা আগাছায় ভরে উঠলেও কেউ দেখবার নেই।

ভাগ্যে বা দুর্ভাগ্যে বিশ্বাসী না হয়ে উপায় কি বা আছে অভিরামের। তাহলেও সে লড়তে চায়—যেমন করেই হোক, তার সংসারের মোড় সে ফেরাবেই।

বক্চরের আবাদে বিঘা তিনেক জমি ছিল ওদের ভেড়ির খোলে। তিনজন খাইয়ে,—মা, বাবা ও অভি। এখন আর তিনজন নেই। বিয়ে-থা করেছে। কচি কচি শিশুরাও মুখর করেছে আঙিনাকে। আয় না বাড়ালে তো চলে না। জীবিকা-যুদ্ধের লড়াইতে এরা বিশ্বাসী। লড়াই যে এদের করতে হয় সেরেফ্ বাঁচবার জন্য—প্রতিনিয়ত বন, নদী ও বন্যজীবের সঙ্গে। তেমনি রহস্যে, বিশ্বাসী এদের মনও প্রতিনিয়ত আশা করে থাকে—কোনও রহস্যজনক ভাবেই এদের ভাগ্য ফিরে যেতে পারে। তাই নতুন কিছু করবার জন্য অভিরাম পিছ-পা হয় না।

অভিরাম ভাবল,—এ-চকে তো সবাই বড়ান ধান চাষ করে, কিন্তু সে এবার পাটনাই ধান

বুনবে। দেখা যাক-না একবার, পাটনাই ধানের বেশ ভালো দরও পাওয়া যায়। নোনার দাপটে পাটনাই ধানের শেষ পর্যন্ত কি হবে'কে জানে। অনেকেই মানা করেছে। তবুও দেখা যাক-না একবার। দেখলেও সে। কিন্তু অভিরামের সে-বছর হারও হলো না, জিতও হলো না। দরে সুবিধা হলেও, ফসলের আঁটিতে সুবিধা হলো না। হরেদরে এক কথা রইল।

একবার ভাবল,—না, একখানা ডিঙি বানিয়ে ফেলি। বনের সম্পদ তো আছে—কাঠ আছে, মাছ আছে, মধু আছে, গোলপাতা আছে। আর কিছু না হোক, হাটে হাটে বেচাকেনা করে ঘরে মোটা টাকা তুলতে পারবে। হল সবই। কর্মঠ অভিরামের পক্ষে এসব কাজ তেমন কিছু শক্ত নয়। ডিঙি হলো, বনের সম্পদ আহরণও হলো, হাটে হাটে বেচাকেনাও হলো। ঘরে কিছু বাড়তি টাকা যে এলো না, তা নয়। কিন্তু তা ভাগ্যের মোড় ফেরাবার মতো নয়।

সেদিন শীতের সন্ধ্যায় রঙিনা বাওয়ালির খলেনে আড্ডা জমেছে। এ-চকের সে-চকের ধানের ফলনের, আর দালালদের ধানের দাম কমাবার কথা হতে হতে হঠাৎ বনের কথা উঠে গেল। বাওয়ালির দাওয়ায় বনের গল্প সহসাই উঠে যায়।

বাওয়ালি গল্প বলে যায়,—আর যা-ই বলো, এ-বাদার কোনও হিসাব নেই। কত কি-ই না তোমরা দেখতে পাবে এই বনে। ভিটেবাড়ির কথা তো তোমরা জানো। কত ভিটে যে আছে তার ইয়ত্তা নেই। একটু ঘোরাঘুরি করলে দেখতে পাবে, কত মন্দির আছে। কত সাধুর আড্ডা যে ছিল এই বনে! এখন অবশ্য তাদের কোনও দেখা পাওয়া ভার।

কে একজন আড্ডায় বলে উঠল,—বাওয়ালি! তুমি নিজের চোখে কোনও সাধু দেখেছ?

বাওয়ালি হয়ে মিথ্যে কথা বলার উপায় নেই। ঘাড় নেড়ে তাকে জানাতে হলো, না সে দ্যাখেনি।

তা জানালেও, বাওয়ালিরা অতো সহজে নিজের আধিপত্যকে ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চায় না। তাহলে যে ওদের আসর ও পসার জমে না। কথার জের টেনে বলল,—তা দেখিনি বটে···কিন্তু সেদিন যা দেখেছিলাম, তা এ-জন্মে ভোলার মতো না।

অভিরাম আর থাকতে পারে না। বলে ওঠে,—কি দেখেছ? নতুন কি দেখেছ, বলো।

কয়েকটি মুহূর্তের জন্য রঙিনা বাওয়ালি দম নিয়েছিল। কিন্তু সেই কয়েক মুহূর্তের জন্য আসরের সবারই কল্পনা পাখা মেলে নানা পথে। বাঘ, সাপ বা কুমিরের কথা সুন্দরবনে জল-ভাতের মতো। ত নিয়ে নিশ্চয়ই নয়। কেউ ভাবে দৈত্যের কথা। দৈত্য-দানবের দাপটের কাহিনী অনেক বাওয়ালি রসিয়ে ও রাঙিয়ে বলে; আর সন্ধ্যার আসরের লোকেরা তা মশগুল হয়ে শোনে। অবিশ্বাসও করে না।

আবার কেউ ভাবে, হয়তো বা বনবিবির কথা। বনের আইন-ভঙ্গকারীরা যে বনবিবির হাতে সমুচিত শিক্ষা পায়, বা অনুগতেরা বনবিবির অপরিসীম দয়ায় পুরস্কৃত হয়—এ-সব কাহিনী খুব নতুন না হলেও, বনের উপকূলবাসিদের কাছে প্রতিবারই রোমাঞ্চের কারণ হয়ে ওঠে।

না, সে-সব কিছু নয়। বাওয়ালি বলে চলে,—না, তোমরা যা ভাবছ তা নয়। সেবার গিয়েছিলাম লাসের খোঁজে। আসছি সুপতি বন-অফিসের কাজ সেরে। ঝাণ্ডড়ামোহনা ঘেঁষে মার্জাল নদীর জোয়ার ধরে। আলকী নদীর ত্রিমোহনায় আসতেই দেখি কাঠুরিয়া নৌকোর এক বহর। কাঠ বোঝাই হয়নি, তবু জোয়ার ধরেছে।

খোঁজখবর নিতেই শুনলাম, ওদের দল থেকে দু'দুটো মানুষ নিয়েছে। কিন্তু যখন ওদের মোড়লকে রাত্রে খোদ্ নৌকো থেকে বাঘে নিয়ে গেল, তখন আর ওরা টিকে থাকতে পারেনি। ভিন-দেশীদের থাকবারও কথা নয়। কোনও লাস না নিয়েই ফিরে এসেছে। বারবার আমাকে অনুরোধ জানাল, মোড়লের লাস এনে দিতে পারি কিনা। অনেক টাকাও দিতে চাইল। কিন্তু ওরা আর কেউ সে-বনমুখো হতে চায় না।

সেই লাসের খোঁজে গিয়েছিলাম। পথের ঠিকানা বিশেষ দেয়নি। শুধু বলেছিল,—আলকী নদীর ভাটিতে 'নেমক খালাড়ী' ছাড়িয়ে গিয়ে ডান দিকের তিন নম্বর পাশ-খালে। পাশ-খালে ডিঙি ঘোরালেই দেখা যাবে একটা গাব গাছ। সেখানেই ওদের বহর ভেড়ানো ছিল। তোমরা নিশ্চয় ধরতে পেরেছ জায়গাটা কোথায়,—'বড়বাড়ির'র পথে আলকী নদীর মোহনার পশ্চিম-বাদা।

বাওয়ালির জমাটি আসর থম্‌থমে হয়ে উঠেছে। 'বড়বাড়ি' থেকে আলকী নদীর মোহনা এক-ভাটির পথ। 'বড়বাড়ি' মানে রাজা প্রতাপাদিত্যের শিব্‌সা দুর্গ। সুন্দরবনের অন্তস্থলে এই দুর্গ এককালে পশর ও মার্জালের মতো দুই বিশাল নদীর জলপথকে আগল দিত। এই 'বড়বাড়ি'র নামের মাঝে যেন কি একটা মমতা, কি একটা আপনবোধ রয়েছে। মোগল-রণে যুঝে প্রতাপ কতখানি দক্ষিণ বাঙলার মানুষের মন জয় করেছিলেন জানি না। তবে মগ ও ফিরিঙ্গিদের দমন করে, তাদের অত্যাচার, অনাচার ও কু-আচার থেকে ত্রাণ এনে প্রতাপ এদেশের মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন অনাবিল ও অপরিমেয়।

আলকী নদীর দু'ধারে, বিশেষ করে পশ্চিমে বড় ভীষণ অরণ্যানী। বাদার যারা খোঁজ রাখে, তারা কেউই সহসা এখানে এগুতে চায় না।

রগুনা বাওয়ালি আবার বলে চলে,—হিসাবে ভুল হয়ে গেল। খরস্রোতা ভাটির টানে তিন নম্বর পাশ-খাল ছাড়িয়ে গিয়ে আরও অনেক দূরে, বোধহয় চার নম্বর পাশ-খালেই প্রবেশ করলাম। ঠিকমতো গাব গাছ পাইনি অবশ্য। তবুও বেশ খানিকটা ভিতরে প্রবেশ করে একটা গাব গাছও মিলল। নিশ্চয় মানুষের আনাগোনা এখানে এককালে ছিল। নইলে গাব গাছ আসবে কেন!

বনে তো কত বছর ধরে ঘুরছি। তবুও আমারও গা ছমছম করতে লাগল। বেশিদূর এগুতে হয়নি। সে-দৃশ্য ভুলব না! উঁচু ডাঙা। ভিটে মাটি। গাছ-গাছড়া লতাপাতা বিশেষ নেই। ভিটের ওপর ছড়িয়ে আছে—অগুনতি টাকা আর টাকা! চেয়ে দেখি,—সামনেই এক লোহার সিন্দুক। এক-পাল্লা ঢাকনা খোলা। সিন্দুক থেকে মাটি পর্যন্ত যেন রাশি রাশি রূপোর টাকা ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হয় যেন, এই মাত্র কেউ ঠাসা টাকা-ভর্তি সিন্দুকের একটা পাল্লা খুলতেই এমনি ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ধনরাশি।

আসরের একজন প্রশ্ন করলে,—বলো কি বাওয়ালি! তুমি কি করলে?

—থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অনেক কথাই মনে এলো। আমি যেন সাহস হারিয়ে ফেললাম। দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। মনে হয় আরও দু'এক কদম এগিয়েও গিয়েছিলাম। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারিনি। কোনও 'মায়া' নয় তো!!......

—ফিরে এলাম। লাসের 'তেষ্টা'য় আর যাওয়া হলো না। ফিরে এসে বুড়ো গুরুর কাছে গিয়েছিলাম। শুনতেই গুরু সজোরে চিৎকার করে বলল,—খবরদার! ওর ধারে-কাছে যাবি না। বনবিবির ও-সম্পদে যে হাত দিতে যাসনি, বেঁচে গেছিস।

......সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার আসর কিছুক্ষণ থম্ মেরে রইল। তারপর, এ-কথা

সে-কথার পর ভেঙে গেল। রঙিনা বাওয়ালি আসর ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে অভিরাম জিজ্ঞাসা করল,—তখন কি বললে বাওয়ালি ?...আলকী নদীর ভাটোতে চার নম্বর ডানহাতি পাশ-খালে ?

বাওয়ালি একবার অভিরামের মুখের পর তাকাল, তারপর সহজভাবেই উত্তর দিল,—হ্যাঁ। বলেই অন্য কথা পাড়ল,—অম্বুবাচির কর্জধানের কথাটা মনে আছে তো, অভি ?

আসর ভেঙে যাবার সুযোগ নিয়ে অভিরাম সে কথার উত্তরে হ্যাঁ বা না—কিছুই না বলেই কেটে পড়লো সেদিনের সন্ধ্যার মতো।

কেটে পড়লো বটে, কিন্তু শৈশবের কল্পনা আর যৌবনের বাসনা মিলে তাকে মোহগ্রস্ত করে রাখল রঙিনা বাওয়ালির এই সন্ধ্যার আসর। কাউকে কিছু বলে না, মনের কথা মনেই লালন করে চলল কিছুদিন।

সপ্তাহখানেক বাদে পিসির বাড়ি যাবে বলে স্থির করল। হড্ডা নদীর কূলে পিসির বাড়ি। আধা জোয়ার এগিয়ে হড্ডা নদীর ভাটিতে পাঁচ বাঁকের মাথায় এই গাঁ বা আবাদ। ডিঙি গোছগাছ করে নিল। বাড়িতে বলে গেল, পিসির বাড়ি একরাত কাটিয়ে বুধবার নলেন বন-অফিস হয়ে বিষ্যুৎবার নাগাদ ফিরবে। যাবার পথে ছেলেবেলার বন্ধু মধু কাপালির কাছ থেকে গাদা-বন্দুকটি চেয়ে নিয়ে গেল। তাকে বলল,—হড্ডা ও শিব্‌সার মোহনায় মদনা ও মানিকজোড় পাখির যেন মেলা বসে। পিসিদের একদিন পাখির মাংস খাওয়ানো তার বড় লোভ।

বিষ্যুৎবার পার হয়ে গেল। শুক্র, শনি, রবিবারও পার হয়ে যায়, তবুও অভিরামের ঘরে ফেরার নাম নেই। দেখতে দেখতে যখন আরেক বুধবারও পার হয়ে যায়, সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। সাধারণত বনের মানুষেরা অতো সহজে এ-বিষয়ে চিন্তিত হয় না। বনবাদাড়ের রাজ্য, সময় ও দিন ঠিক রেখে চলা দুরূহ। কিন্তু অভিরাম তো এবার পিসির বাড়ি গেছে, তাতে এত দেরি দেখে সবাই বলল,—এমন তো হবার কথা নয়।

তার ওপর মধু কাপালি তার নিজের বে-পাশি বন্দুকটা নিয়েও ভাবনায় পড়েছিল। এখনও অভিরাম ফেরে না কেন ? বে-পাশি বন্দুক নিয়ে ধরা পড়ল না তো !

মধু কাপালি খোঁজ খবর নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অভিরামের পিসির বাড়ি গিয়ে হাজির। তারা বলল,—কই, অভি তো এমুখো আসেনি।

কাপালি শুনে তো অবাক। শুধু অবাক নয়, চুপ হয়ে যায়। কিসের আশঙ্কায় যেন মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে কাপালির।

এমন অবস্থায় বাদা-অঞ্চলে বাওয়ালিরাই একমাত্র আশ্রয়। রঙিনা বাওয়ালিকে একান্তে ডেকে কাপালি পরামর্শ করতে চাইল। মুহূর্ত মধ্যে বাওয়ালির সেদিনকার সন্ধ্যার আসরের কথা মনে জাগে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাতে এক-বদ্‌না জল ছিল। হঠাৎ উপুড় করে গোটা জলটাই ঢেলে দিল। শীতের নোনা মাটি শোঁ-শোঁ করে এক-বদ্‌না জল শুষে নিল। বাওয়ালি সেদিকেই তাকিয়ে। পরমুহূর্তে কাপালির চোখে চোখ রেখে বলল,—চল্, ডিঙি ঠিক কর। কাউকে বলবি না। তুই এগো, আমি আসছি।

বাওয়ালি ও কাপালির ডিঙি নদীপথে এক ক্ষীণ দোয়ানিয়া খালের স্রোত ধরে নলেনের বন-অফিস এগিয়ে শিব্‌সায় পড়ল।

তারপর আড়ুয়া শিব্‌সা। এবার মার্জালি নদীর ভয়াবহ স্রোতের টানে বাওয়ালি হাল ধরেছে শক্ত হাতে। জোয়ার আসবার আগেই আলকী নদী ধরতে হবে। তা না হলে বানের তোড়ে কোথায় যাবে ডিঙি কে জানে।

হিসাবে ভুল হয়নি। বান এসে পড়বার আগেই বাওয়ালি আলকীর মোহনার ঘোলা এড়িয়ে ওপারের বনের কোলে আশ্রয় নিল।

কাপালি নিমিত্ত মাত্র। কাপালি শিকারী, হরিণ শিকারে অনেকবারই বনে এসেছে। কিন্তু বন্দুক ছাড়া এমনভাবে এমনিধারা কোনও দুঃসাহসিক কাজে কারও সাথী হয়নি। বনের সরু 'খাড়ি'তে ডিঙি ঢুকিয়ে দিলে কাপালি বলল,—বাওয়ালি, এবার গাছে উঠে বসলে হয় না ?

—দূর বোকা ! জানিসনে, আলকী দু'মুখী। মার্জালি থেকে উঠে মার্জালেই ডুব দিয়েছে। জো'র বান এলে দু'মুখ দিয়েই জল ঢুকবে। সেই জো'তেই আমাদের এখনই রওনা হতে হবে। পানি থমকে দাঁড়িয়েছে, জো' এলো বলে।

বানের ধকল সামলে নিয়েই জোয়ারে ডিঙি ভাসিয়ে ওরা এগিয়ে চলে।

বেলা সবে গড়িয়েছে। চার নম্বর খালে পৌঁছতে বিশেষ দেরি হলো না।

বাওয়ালি ভাবছে, কাপালিকে নিয়ে কোন বিপদে না পড়তে হয়। বিপদের সামনে কোন্ মানুষ কি হয়ে যায়, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

আশ্চর্য। খালের মুখে ডান-হাতি গরান গাছটায় অমন করে একটা বানর ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ করছে কেন ? বাওয়ালির হালের চাপে ডিঙির গতি মন্থর। বারবার লক্ষ্য করেও হদিশ পাওয়া যায় না। ডিঙির উপর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে বানরটার দিকে তাকিয়ে বাওয়ালি বুঝবার চেষ্টা করল। ডিঙির ওপর দাঁড়াতেই বানর যেন আরও ডাকাডাকি করতে থাকে।

বাঘের গন্ধে বা ভয়ে ? না, তাহলে তো একগাছে অমনভাবে স্থির হয়ে থাকতো না। এক ডাল থেকে আরেক ডালে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতো। তবু বলা যায় না, হলেও হতে পারে। বানরের ক্রোধ, ভয়, মায়া-মমতা বা প্রতিহিংসাপরায়ণতা বোঝা দায়। বিশেষ করে বন্য বানরের।

রঙিনা বাওয়ালি ইঙ্গিতে কাপালিকে জানায়,—চল্, ডাঙায় উঠতে হবে।

বাওয়ালি নিজের গলুইটা চরে লাগিয়ে প্রথমে একাই ডাঙায় উঠল। ভালো করে দেখে নিতে চায় যতদূর দৃষ্টি যায়। কিন্তু বাওয়ালি এধার ওধার দেখবে কি, বানর ততক্ষণে সামনের গাছে লাফিয়ে আবার কিচিরমিচির করতে থাকে। তবে কি বানর ওদের দেখেই ভয়ে অমন করছে।

কাপালি বাওয়ালির পেছনে এসে গেছে। দু'জনে এবার সামনের গাছের তলায় এগিয়ে গেল। এগিয়ে যেতে না যেতেই বানর এক লাফে তারও সামনের গাছটায় গিয়ে সামনে আবার কিচিরমিচির করে।

ওরাও এগিয়ে যায়, বানরও গাছের পর গাছ এগিয়ে যায়। বাওয়ালি ভাবে,—ওদেরই ভয়ে বা যে-জন্যেই হোক, বানর যেদিকে চলেছে সেদিকে 'বড়-মিঞা' নিশ্চয় নেই। থাকলে বানর কখনও সে-মুখো হতো না।

এগুতে এগুতে তো অনেক দূরই এলো। বানরের বাঁদরামি তবুও থামে না। হ্যাঁ, বাওয়ালির একবার বাঁদরামির কথাই মনে হয়েছিল। পেছনে তাকাল,—দূরে কোনমতে নদীর ফাঁকা আলো দেখা যায়।

এ কোন্ ফাঁদে পড়তে হলো আলকীর চার নম্বর খালে। বাওয়ালি তার বৃদ্ধ গুরুর নির্দেশের কথা স্মরণ করার চেষ্টা করে'।

না,...বানর তো এবার আর এগুতে চায় না। মাথার উপরই কিচিরমিচির করে চলেছে। বানরের এমনিতে ডাক খুবই মিষ্টি। সে-ডাকে যেন তার হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত হয়। কিন্তু শান্ত ও নিঝুম পরিবেশ ছাড়া সে-ডাক সে ডাকে না। তেমন পরিবেশ না হলে সে-ডাকের স্নিগ্ধতা ধরাই পড়ে না যে! সে-ডাকের আহ্বানে সঙ্গিনীরা এসে জড়ো হয়,হরিণের পালও এগিয়ে আসে নির্ভয়ে। কিন্তু বিচলিত ও উতলা মনের এই কিচিরমিচির আর দাঁত খিচুনির অর্থ বোঝা দায়।

এতক্ষণে বাওয়ালি ও কাপালি বুঝি এদিক-ওদিক দেখবার অবকাশ পেল। দেখবে কি! সম্মুখেই ভীতিপ্রদ অজস্র পদ-চিহ্ন। এক পদ-চিহ্নের উপর আরেক পদ-চিহ্নের ছাপ। হেঁটে চলে যাবার চিহ্ন নয়, বারবার হাঁটাহাঁটির নজির।

......পচা গন্ধ! ভুক্ত লাস সামনেই পড়ে আছে। মানুষের লাস। বন্দুক! বন্দুকটাও সামনে পড়ে আছে। বে-পাশি বন্দুক।

কাপালি আর কাপালি নেই। হাত-পা কাঠ হয়ে এসেছে। পড়ে যাবে বুঝি। বাওয়ালি হঠাৎ এক ধাক্কা মেরে অস্বাভাবিক জোরে বলল,—যা,...নে বন্দুকটা,...নিয়ে আয়।

এমন কড়া আদেশই বোধহয় আবশ্যক ছিল মধু কাপালির সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে।

সুন্দরবন হিংস্র বন। হিংস্র বনেরও বুঝি মায়া ও মমতা আছে। আলকী বন ছেড়ে যাবার বেলায় বাওয়ালি তারই ইঙ্গিতে অভিভূত। ডিঙির বাঁধন খুলবার আগে কাপালিককে বলল,—মধু, গামছায় চিঁড়ে কলা ছিল না? দে, গিট্ খুলে ওই চরে রেখে দে। যা আছে সবটাই রেখে দে।

বানরটার কিচিরমিচিরে এতক্ষণে আরও দু'একটা বানর এসে জুটেছে। তারা সবাই চরের সেই গরান গাছটায় চুপচাপ বসে আছে।

দেখতে না দেখতে আবাদের ডিঙি বাদার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আট

দুর্ধর্ষ হলে, বনেই দুর্ধর্ষ হতে হবে—এমন আশা করা বাদা-আবাদের মুখোমুখি বাসিন্দাদের কাছে স্বাভাবিক। তাই মোকামের সমবয়সী অধর গাইন ব্যঙ্গ সুরেই বলল,—থাক্, বোঝা গেছে তোর ওস্তাদির কথা! পারবি এই মালঞ্চকে ঘায়েল করতে?

পারুক আর না পারুক মুখে আস্ফালন করতে বাধা কি! বলল,—রেখে দে তোর মালঞ্চ-ফালঞ্চ। ইচ্ছে করলে কি না হয়!

সুন্দরবনের মাঝামাঝি মালঞ্চ নদী। অধর গাইন কিন্তু হরিণ মালঞ্চের কথাই বলেছিল। বনের হরিণের নাম আবার কে দেবে! তবু মালঞ্চ নদীর এপারের অধিবাসীরা ওপারের বনচারী এক হরিণের পরিচয় দেয় মালঞ্চ নামেই।

সুন্দরবনের মানুষ বন্য হরিণের সৌন্দর্য বিশেষ মুগ্ধ নয়নে দ্যাখে না। কিন্তু বাঘের কথা বলো, অমনি তার সৌন্দর্য বর্ণনায় মেতে উঠবে। চেহারায় শৌর্যের ছাপ না থাকলে ওদের মনই ধরে না। কিন্তু মালঞ্চ চঞ্চল, চপল, ভীতিবিহ্বল বন্য হরিণ হলেও, তার ঔদ্ধত্য দিয়েই

এপারের মানুষের মনকে জয় করেছে।

বাঁকের মাথায় বনের টেক্। এখানে বন যেন নদীর মধ্যে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই টেকের মাথায় মালঞ্চকে হামেশাই দেখা যাবে। কত শিকারী কতভাবেই না চেষ্টা করেছে মারতে। কিন্তু এমন সজাগ যে, বন্দুকের পাল্লার মধ্যে মালঞ্চকে আনাই দুরূহ। যদিও বা আনা যায়, নিরিখের অবকাশ দেবে না। মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উধাও হবে তার ঠিকানা নেই। প্রথম প্রথম দেশী-বিদেশী অনেক শিকারীই চেষ্টা করেছিল। সকলকেই ব্যর্থ হতে দেখার পর এই হরিণকে নিয়ে আবাদের মানুষের জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই।

কেউ বলত, মানুষের প্রতি মালঞ্চের নিশ্চয় কোনও বিশেষ টান আছে। তা না হলে এমন বেপরোয়া আনাগোনা করবে কেন!

কেউ বলত, বনবিবির সঙ্গে মালঞ্চের যোগ না থেকেই পারে না। পাল্লার মধ্যে পেয়েও শিকারীর হাত তা না হলে বারবার কেঁপে ওঠে কেন!

কারণ যা-ই থাকুক—এই টেকের মোহ মাতোয়ারা করবার মতই। সামান্য এক-রশি পরিসর জমি। খটখটে জমি। অথচ সুন্দরবনের নামকরা গাছ সবগুলিই প্রায় আছে—বাইন, গরান, কেওড়া ও সুন্দরী।

তিন দিকে নদী। ফাঁকা আলো ও বাতাস। দাঁড়িয়ে হোক বা শুয়ে হোক মালঞ্চ বেশ দেখতে পায়—বনের মানুষের আনাগোনা। ডিঙি ও নৌকো করে ওরা যায় ও আসে। কেউ গল্প করে, কেউ নিঃসাড়ে, কেউ বা গান গেয়ে।

অনেকদিন হলো আবাদের লোক ওকে আর মারবে না বলেই ঠিক করেছে। নিজেরা মারবার চেষ্টা করে না, বাইরের কোন শিকারীকেও ওরা মারতে দেয় না। মারতে বাধা দেওয়া না দেওয়া একই কথা। কারণ ওদের এখন দৃঢ় বিশ্বাস, মালঞ্চকে কেউ মারতেই পারবে না।

দীর্ঘ শিঙ। অস্বাভাবিক দীর্ঘ। তবু মালঞ্চের দেহ অনুপাতে বেমানান নয়। সাদা ডোরাগুলি দুপাশে যেন ঋজু রেখায় সাজনো। আবাদের মানুষ তো অনেক হরিণ দেখেছে। কিন্তু এমনটি বড় দেখা যায় না। গণ্ডদেশের ছোপ যেন ধবধবে সাদা। বিলম্বিত কান দু'টি সচকিতের মূর্ত প্রতীক। যেমন ইচ্ছা ঘুরিয়ে যে-কোন দিকের ক্ষীণ আওয়াজ গ্রহণ করতে পারে। বনের সব হরিণই এ-ক্ষমতা রাখে। কিন্তু মালঞ্চের এক বিশেষত্ব আছে।

খুব লক্ষ্য করলে এই বিশেষত্ব ধরা না পড়ে যায় না। হরিণ যখন যেদিকে দৃষ্টি দ্যায় সেদিকের শব্দ ইঙ্গিতে ধরবার জন্য কর্ণ-যুগলকে বর্শার ফলকের মতো বাঁকিয়ে ধরে। কিন্তু মালঞ্চ যখন দৃষ্টি দেবে সামনে, কানকে ঘুরিয়ে ধরবে পেছনের আওয়াজে সজাগ হবার জন্য। আবার চোখের দৃষ্টি পেছনে দিলে, কানকে তৈরি রাখবে সামনের আওয়াজ ধরবার জন্য। অনেকে অনেকভাবে মলঞ্চকে দেখেছে বলে, তার এই দুই দিকেই সজাগ থাকবার বিশেষ পারদর্শিতার কথা সবারই জানা।

মালঞ্চের এতো ইতিহাস আছে বলেই অধর গাইন সেদিন অমন সহসা মোকামের ওস্তাদিকে মালঞ্চের নাম তুলে ব্যঙ্গ করল।

ব্যঙ্গ করলেও এর পরিণাম কতদূর যেতে পারে তা অধরের অজানা ছিল না। সেই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি ও-কথা চাপা দিয়ে বলল,—সেদিন নারানপুর হাটের 'কায়জে'র কি হলো শেষ পর্যন্ত?

খানিকটা হতাশায় রেশ টেনে মোকাম বলে,—হবে আর কি। ঢাল, সড়কি, মায় বন্দুকও হাজির করতে কসুর করিনি। শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে দু'তরফই মিটমাট করল। যেমন চৌধুরীর কাছারি, তেমনি মিত্তিরদের কাছারি। কেউ নদী পার হলো না। যে পারের যে।

—তার মানে?

—মানে আর কি! ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম একাই। কেউ না এগুতে চায়, আমি একাই সড়কি নিয়ে গাঙ্ পার হব। তাই কি আর দিলো! সবাই মিলে শুধু—'সবুর! সবুর! দেরি কর!' আরে, অমন দেরি করলে কি কিছু হয়! আর কিছু হতে পারে কিন্তু 'কায়জে' আর হয় না।

—তাহলে হাট-ফাট আর বসবে না?

—বসবে না কেন! নদীর দু'পারেই হাট বসবে।

—তার মানে সওদার ফেরে একবার আমরা এ-হাট আর ও-হাট করে পারাপারি করব! না?

তা'তে ওদের আর কি হয়েছে। কাছারির তো হাট তোলার ব্যাপার। আমাদের লাভের লাভ, ধান চাল নিয়ে একবার এ-হাট একবার ও-হাট করতে হবে; আর দু'হাটেই দুই কাছারিকে তোলা দিতে হবে।

যেন ঢেউয়ের নিচে জলের শিরা চিনতে পেরে অধর মাথা নেড়ে বলে উঠল,—ঠিক বলেছ, এরই নাম মালেকের কৌশল।

'মালেকের কৌশল' মাথায় ঢুকতে তখনকার মতো যে যার চলে যায়।

মোকাম কিন্তু মালঞ্চের কথা ভুলতে পারে না। জায়গা-মতো ব্যঙ্গ করলে, লোকে সেকথা সহসা ভোলে না। যে-সাহসিকতার ওপর তার নিজের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে—তার ওপর অধর গাইন নয়, মালঞ্চই ব্যঙ্গ করছে বলে যেন তার মনে হলো। মালঞ্চই বা কেন, গোটা বনই যেন ওর দুর্ধর্ষতাকে পরিহাস করছে। এর সমুচিত উত্তর দিতেই হবে! লোকের বারণ! বারণ তো এমনি হয়নি! মারতে পারেনি বলেই তো বারণ এসেছে। যদি কেউ মেরে ফেলতো, তাহলে কি আর এসব কথা উঠতো! এবার মোকামের শিরায় যৌবনের রক্ত বারণ-মানাকে উপহাস করে ওঠে!

তোড়জোড় করার কিছুই নেই। বন্দুক তো ঘরেই আছে। ঘাটে কারও না কারও ডিঙি পাওয়া যাবেই। আর বোঠের দু'খোঁচ দিলেই তো গহন বন।

তবুও মোকামের তোড়জোড় শুরু অন্যভাবে। মালঞ্চের টেকের দিকে মোকাম প্রায়ই আনাগোনা করে। কয়েকবার মালঞ্চের সঙ্গে দেখাও হল।

কিন্তু সকালে একবারও দেখা হয়নি। বেলা গড়ালে তবে মালঞ্চ এখানে আসে। খাবার খুঁজবার চেষ্টা এখানে বিশেষ করে না। ঘোরে ফেরে, বসে চর্বণ করে, আবার ঘোরে ফেরে। একবার তো ডিঙির ওপর বসে বোঠেখানা বন্দুকের মতো ধরে মোকাম তাক্ করতে গিয়েছিল। মুহূর্ত মধ্যে মালঞ্চ যেন কোথায় উবে গেল।

অবশেষে 'গাছাল' দেবার কথা মোকাম ভেবে নিয়েছে। বেলা হতেই গাছে উঠবে। অনেক, অনেক উপরে উঠে বসতে হবে। চার হাতের উপরে হরিণের দৃষ্টি যায় না, তবু বলা যায় না, মালঞ্চ সব ব্যাপারেই স্বতন্ত্র।

একদিন মোকাম সকাল-সকাল গাছে উঠে বসলো। খুব উপরে কায়দা মতো তে-ডালাও

পেলো। গাছাল শিকারে বিশেষ অসুবিধা নেই। তবে ধৈর্যের পরীক্ষা। নিঃশব্দে অপেক্ষা। মশা, মাছি, পিঁপড়ে—সব-কিছুই উপেক্ষা করে আগমন-পথে কান পেতে থাকতে হবে। বিড়িটিও পর্যন্ত খাওয়া চলবে না।

যতই বেলা গড়িয়ে আসে, ততই মোকাম সজাগ ও সচিকত হয়ে ওঠে। দুপুরে যাও-বা একটু বাতাস ছিল, তাও স্থির হয়ে এসেছে। জোয়ারের জলের চাপ এসে নদীর স্রোতকেও স্তব্ধ করে দেবার মতো। চারিদিকে নিস্তব্ধতা।

বেশ দেখতে পায়, চার-পাঁচ জনের একখানা ডিঙি জোয়ারের শিরা ধরে এগিয়ে আসছে। মোকাম চিন্তায় পড়ল। এবার মালুঞ্চ এলে তো বিপদ। সবই জানাজানি হয়ে যাবে। মনে মনে কামনা করল—তোরা এলিই যখন, তখন জোরে, আরও জোরে বেয়ে যাস্ না কেন।

ডিঙি চলে যেতেই আবার নিঃসাড়। হাত-পা অবশ করে গাছের ডালে বসে আছে। আরও কতক্ষণ বসতে হবে কে জানে। একঝাঁক সাদা বক এসে টেকের গাছগুলির উপর চক্কর দেয়। সুন্দবনে যখন এমনি বকের ঝাঁক কোনও গাছে বসে—সে-গাছকে প্রায় সাদা করে তোলে।

সঙ্গী পেয়ে মোকামের মজাই লাগছিল। ঝাঁকের অর্ধেক ততক্ষণে গাছের মাথায় বসেছে। তাদেরই নিচে মোকাম। হঠাৎ গোটা বকের ঝাঁক যেন ঝাঁকা মেরে পাখার বিকট ঝাপটা দিয়ে উড়ে গেল। হয় তারা মোকামকে দেখেছে, না-হয় তার গন্ধ পেয়েছে।

তবু মোকাম ঠিকই বসে আছে। যার আসার কথা, তার প্রতীক্ষায়।

...পড়ন্ত বেলা। মিছেমিছি প্রতীক্ষা। অবশেষে বিরক্ত হয়েই মোকাম সেদিনের মতো ফিরে এলো।

গাছাল শিকারে বিফল হওয়াতে মোকাম এবার একদিন মাঠাল শিকার পরখ করতে চায়।

পায়ে হেঁটে শিকার। শূলোর ফাঁকে ফাঁকে, শুকনো পাতা ও ডাল এড়িয়ে এড়িয়ে নিচু হয়ে চলেছে। অনেকখানি নুইঁয়ে চলেছে। বন্দুকের ভারও নুইয়ে চলতে সাহায্য করেছে। আরেকটু এগুলেই টেকের দিকে আড়াল দিয়ে চলতে হবে। মোটা গাছ বা জোড়া গাছের আড়ালে আড়ালে। ঠিক যেমনটি বাঘ তার শিকারের দিকে এগিয়ে আসে।

ঠিক বাঘের মতো বটে, কিন্তু অমন তুলতুলে নরম পায়ের বিচরণ মানুষের পক্ষে কি করে সম্ভব। অমন নরম আধারে এক এক থাবায় আঠারো মানুষের বল কি করে বাঘ ধারণ করে—তা এক আশ্চর্য।

...টুক্ করে শব্দ হলো—পায়ের চাপে মরা শামুকের খোল ভেঙে যাবার শব্দ। মোকাম প্রমাদ গোনে—তোর তো যাবার কথা চুনখোলায়, তা এখানে এসে মরেছিস্ কেন। এতোদূর এগিয়েও বুঝি বা হতাশ হতে হবে।

না, বনের আর কোনও জীবকে শামুক ভাঙার শব্দ সন্ত্রস্ত করে তোলেনি। এগিয়ে চলল নিঃশব্দে। নিঃশ্বাসকে প্রায় স্তব্ধ করে।

বেশ কিছুট নদীর কূল ঘেঁষেই মোকাম চলেছিল। 'ওড়া' গাছের ঝাড়ের কম্পনে কেমন যেন জীবনের স্পন্দন। তাহলে? না, মালঞ্চ মা হয়েই যায় না। দীর্ঘ শিঙের দ্বিতীয় স্তবক দেখা যায়। মোকাম এবার অতি সাবধানী। আরও কয়েক কদম এগুতে হবে। তাহলে

নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সহসা কিছুটা ডাইনে বানরের সন্ত্রস্ত কিচিরমিচির। সঙ্গে সঙ্গে—টুিউ! টুিউ! টুিউ! আর নদীর কিনারায় ওড়া গাছে একটু শব্দ। ব্যস্, আর কিছু না। মোকাম নুয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সতর্ক সন্ধানীর মতন। শিকার এবার যাবে কোথায়? তিন দিকে নদী। বনের দিকে আসতে হলে মোকামের সামনে দিয়েই যেতে হবে। এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে মোকাম বন্দুকের নল উঁচিয়ে আছে।

বিশ্বাস ভাঙতে বেশি সময় লাগে না। মোকাম তাড়াতাড়ি টেকের পরে এগিয়ে যায়। কোথাও কিছু নেই। পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে বুঝতে চায়। সে-চেষ্টা আর করতে হয় না। স্পষ্ট দেখতে পেলো,...দূরে নদীর জল ছেড়ে উঠে পড়েছে। উঠতে না উঠতে মালঞ্চ বনের অতলে উধাও।

* * *

এবার বাদা থেকে আবাদে ফিরে আসা অবধি মালঞ্চের নদী-পথে পালাবার ছবি বারবার মোকামের মনে ভেসে ওঠে। কেমন করে অতোবড় জানোয়ার নিঃশব্দে নদীর জলে পড়লো। না, হয়তো বা জলের শব্দ তার কানে আসেনি। কিন্তু না আসবার কারণ তো ছিল না। তেমন দূরে তো সে ছিল না। তাহলে মালঞ্চ নিশ্চয় তাকে দেখতে পায়নি। দেখতে পায়নি বলে ভয়ার্তের মতো হয়তো সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচতে চায়নি। বনে বানরের বিপদ সংকেতধ্বনি কিচিরমিচির শুনতে পেয়েই সরে পড়েছে মাত্র!

মনে মনে খানিকটা সমাধান পেলেও মালঞ্চের শিঙ উঁচিয়ে সাঁতরে পালাবার ছবি বারবার তার কাছে স্বপ্নের মতো ভেসে ওঠে।

অধর গাইনের সঙ্গে ইতিমধ্যে কয়েকবারই দেখা হয়েছে। মোকাম একবারও তার কাছে বনের কথা তোলে না, পাছে বন থেকে মালঞ্চের কথায় এসে যায়। দুর্ধর্ষতার পরীক্ষার আগে মালঞ্চের নামও সে মুখে আনতে চায় না।

একবার তো অধর বলে বসে,—কি রে মোকাম! অনেক দিন মাংস-টাংস খাই না! এর মাঝে কেউ বনে-টনে গেল না?

মোকাম তাড়াতাড়ি বলে,—রাখ্ সেকথা, আগে তোর গোহাটের কি হলো তাই শুনি দেখি!

—না, এবার তেমন আমদানি হয়নি। যা পেলাম তার থেকেই বেছে একটা গাই গরু এনেছি। জানি না ক'দিন নোনা-পানি খেয়ে বাঁচবে। আরে ভাই, আনা-টানা কি যাই-তাই কথা!

—কেন, কি বিপদে পড়লি?

—তা আর বলার না! মুশকিলে পড়লাম আশাশুনির খালে। না আছে খেয়া, না আছে পাটনি। ধারে কাছেও কোনও ডিঙি নেই। ওর নাম 'ডাকাতির খাল'। বেলা গড়াতেই কোন নৌকোর পালের চিহ্নও দেখা যাবে না।

—কি করলি তবে? সঙ্গে তো গরু আছে!

—আরে শুধু কি গরু, মিঠে পানির গরু! তা'তে আবার গাই গরু! জলে কি নামতে চায়! নিজেই আগে জলে নেমে টানাটানি করে সাঁতারে পার হয়ে এলাম।

—সাঁতরে!—মোকাম কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

নদী-নালা দেশের লোকের পক্ষে সাঁতার কথাটায় অমন জোর দেওয়া নিতান্তই অস্বাভাবিক। অধর গাইনের কানেও খট্‌কা লাগে। কথাবার্তাও আর বেশি এগোয় না।

ক'দিন পরেই মোকাম হিঙ্গে গাছের কাঠ খুঁজে বেড়ায়। হিঙ্গে গাছের কাঠ ভারি পাতলা। এদেশে পাঙ্গাস বা অন্য মাছ ধরার জাল ঐ কাঠ দিয়ে ভাসিয়ে রাখে। যেন সোলার মতো হালকা কাঠ। আটি বেঁধে বেঁধে ভেলার মতো বানিয়ে ফেললো। তার ওপর কাঁচা ডালপালা সাজিয়ে দিতেই পুরো ফাঁদ তৈরি হয়ে যায়। জলের ওপর ভেসে চলতে থাকলে, কোন ঝাঁকাল ভাঙা ডাল ভেসে আসছে বলে ভ্রম হবেই হবে।

সেদিন পড়ন্ত বেলায় পুরো জোয়ার। ভরা জোয়ার না হলে সমস্ত ফাঁদই বেচাল হয়ে যেত। সুন্দরবনের নদী জোয়ার ভাটায় ওঠা-নামা করে দশ বারো হাত। ভাটিতে জলের ওপর থেকে তীর দেখা, আর মাটি থেকে একতলা বাড়ির ছাদ দেখা এক কথা। তখন জলের সমতল থেকে তীরের জীবকে লক্ষ্যে আনা দায়।

উজানে অনেকখানি এগিয়ে মালঞ্চের চোখের আড়ালে নদী পার হয়ে মোকাম হিঙ্গের ভেলা ভাসিয়ে দিল। মালঞ্চ সেদিন ঠিকই এসেছে। ভেলার ওপর বন্দুক রেখে ডালপালার আড়ালে মোকাম সাঁতরে চলল। ঠিক সাঁতার নয়। ভেসে ভেসে চললো যাতে এতটুকু 'সাড়' না হয়।

আবাদের নদীতে অমনভাবে ভেসে যাওয়া খুবই বিপদ। কুমিরের অবাধ আনাগোনা। ডাঙার জীবের মতো জলের জীব অতো বুদ্ধি ধরে না, তাই ভয়ডরও কম। বেপরোয়া আক্রমণ করে বসে। তবে ওদের আনাগোনার ইঙ্গিত মেলে। আশে পাশে তখন শুশুক অনবরত উঠছে আর 'শোষ' শোষ' করছে। মোকাম নিশ্চিন্ত ছিল, অন্তত ধারে কাছে কুমির আপাতত নেই। কিন্তু হাঙর অজস্র এবং যেখানে সেখানে। চুপিসারে এসে প্রায় চুপিসারেই হাত-পা কেটে নিয়ে যায়। মোকাম আজ মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে—শিকার-নেশায় মত্ত। অমন এক-আধটু বিপদকে আমল দেবার অবকাশ তার নেই।

মোকাম এগিয়ে চলেছে। মালঞ্চ এপাশ ওপাশ পাক খেয়ে খেয়ে তার চপলতার আভাষ দিচ্ছে। দূর থেকে মোকামকে লক্ষ্যে আনবে কার সাধ্য!

মোকামের কি যেন পায় ঠেকে। বাদার নদীতে সাঁতার দিতে গিয়ে অগুনতি বড় বড় মাছের গায়ে পা লাগবে তা'তে আর আশ্চর্য কি আছে! মোকামের আশঙ্কা হাঙরে না পেছন ধরে। জলের নিচে জোরে জোরে নিঃশব্দে পা দাপাদপি করল।

আর এগুবার আবশ্যক নেই। আওতার মধ্যে এসে গেছে। এবার ধীরে ধীরে অতি ধীরে কূলের দিকে এগিয়ে যায়। দেখে মনে হবে যেন ভাসমান ডালপালা জোয়ারের টানে ঘোলায় পড়ে কূলের দিকে নিজে নিজেই পাক নিচ্ছে।

পায়ের নিচে মাটি ঠেকতেই বেশ শক্ত হয়ে খুঁটি নিল। লক্ষ্য মালঞ্চের প্রতি। মালঞ্চ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দীর্ঘ ঘ্রাণ নেবার যেন চেষ্টা করছে। মোকামের বিপরীত দিকেই নাক যেন উঁচিয়ে ধরেছে। এই ক্ষণিকের সতর্ক স্তব্ধতা পর-মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে উধাও হবার পূর্বাভাষ। নাসারন্ধ্র উর্ধ্বমুখী করে দীর্ঘ শৃঙ্গকে পিঠের ওপর বিছিয়ে দিয়ে পদসঞ্চালনে বন্য হরিণ যে কী ক্ষিপ্রতা আনতে সক্ষম, তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা দুরূহ। মনে হবে না যেন, এ কোনও ভয়ার্ত জীবের পলায়ন। বন্য হরিণ যেন তখন

আগন্তুকের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানায়,—আছে তোমাদের পায়ে ও অঙ্গে এই ক্ষিপ্রতা ?

এমন অবস্থায় মোকাম দেরি করতে চায় না। করেও না। দড়াম্ করে গুলি চালিয়ে দিল।

কিন্তু গুলির আওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনবে কি, বীভৎস আওয়াজ ব্যাঘ্রগর্জনের। মুহূর্ত মধ্যে বনের মাঝে যেন তোলপাড়। গর্জনের প্রতিধ্বনি একে অন্যের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মিলিয়ে গেল।

মোকাম থতমতো খেয়ে গেছে। দিশেহারার মতো কয়েকবার গুলি করে দিল বনকে লক্ষ্য করে। বন্দুকের আওয়াজ থামতে বনও থম্ মেরে গেছে। মোকাম দাঁড়িয়ে আছে। কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারে না। তীর ধরে ডিঙিতে হাজির হবার সাহস নেই, নদী-পথে উজান ঠেলে ডিঙি পর্যন্ত পালাবার উপায়ও নেই, ক্ষমতাও নেই।

একটু পরে বাঘের গোঙানি বেশ খানিকটা দূরে মনে হতেই দম বন্ধ করে এক-ছুট। তারপর দ্রুত ডিঙিতে উঠেই এক ধাক্কায় মাঝ-নদী।

মাঝ নদীর আশ্রয়ে আসতেই মোকামের মনে দুর্ধর্ষতার হিসাব, জয়-পরাজয়ের হিসাব গুলিয়ে যায়। জেগে ওঠে মমতা। মালঞ্চের প্রতি অসীম মমতা। কেন অমন করে বনের এক নিরীহ জীবকে বাঘে ও মানুষে মিলে ঘেরাও করে মারতে গিয়েছিল।

বারবার বহুবার বহুদিন ধরে মোকাম কামনা করেছে, মালঞ্চ যেন সে-যাত্রা বেঁচে থাকে। কত দিনই না আসতে যেতে সেই টেকে উঁকি মেরেছে, মালঞ্চকে দেখতে পাবার আশা নিয়ে। পায়নি দেখতে।

কিন্তু ক'দিন আর! মালঞ্চ আবার আসতে শুরু করেছে। কিন্তু সে-মালঞ্চ আর নেই। শিঙ-ভাঙা মালঞ্চ। একটা শিঙের দুটি স্তবকই নেই। তবু ভাঙা শিঙেও মালঞ্চের ঔদ্ধত্য অস্পষ্ট থাকে না। মালঞ্চ আসে—কিন্তু পড়ন্ত বেলায় আর আসে না। সকালের দিকে আসে, সকালেই ফিরে যায়।

নয়

ছোট একখানা ডিঙি চলেছে। খানিকটা ছিপের ঢঙে তৈরি। ডিঙিতে মাত্র দু'জন—কলিম ও এফাজ।

কলিমের চেহারা বেশ গাঁট্টাগোট্টা। দেখলেই মনে হবে কর্মক্ষম দেহ। দেহের যেখানে সেখানে মাংসপেশি উঁচু উঁচু হয়ে আছে। বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেলেও দেহের বাঁধনে কোথাও শিথিলতা নেই। বাঘের মতো মুখখানাতে সামান্য দু'একগাছি গোঁফ ও দাড়ি আছে।

সুন্দরবনের গহন অরণ্যে মৈশেলী নদী। খুব বড় না হলেও, ছোটও নয়। বাঁক নিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেছে বনের মধ্যে। এপার ওপার দু'পারেই বন। এপারে চড়ার ওপর কেওড়া গাছের ঝাড় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘন সবুজ পাতায় ঢেকে আছে তাদের শাখা-প্রশাখা। ওপারে ভাঙন ধরেছে। বান, সুন্দরী, তবলা, গরান—সব গাছ যেন মিলেমিশে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনের গভীরে যেমন গাছগুলি হয়, তেমনি। লম্বা লম্বা গুঁড়িগুলি স্পষ্ট দেখা যায় ; মাথায় পাতার ছাতা। জোয়ারের টানে ডিঙিখানি পুব কিনারা ধরে চলেছে কেওড়া গাছের ছায়ায় ছায়ায়।

কলিম ও এফাজ ঘরে ফিরছে আজ সকালে। গিয়েছিল বন-কর অফিসের ডাকে। কলিম 'বাউলে'। বাঘের বাওয়ালির ডাক পড়ে সুন্দরবনে যখন তখন। নাম-করা 'বাউলে' হলে তো কথাই নেই।

কলিম কোন কাজেই পিছ-পা হয় না। তবে একটা জিনিস তার চাইই। হুঁকো না হলে তার চলে না। তামাক এত ভালোবাসে যে বলবার নয়। বোঠে হাতে নিয়ে হাল বেয়ে চলেছে। দু'হাত দিয়ে নয়। এক পা আর এক হাত দিয়ে। বোঠের মাথা পর্যন্ত ডান পা তুলে দিয়েছে, আর বাঁ হাত দিয়ে বোঠের মাঝখানে ধরেছে। ডান হাতে হুঁকো। টেনে চলেছে অনর্গল। ভারি আয়েশী ও আরামের হাল ধরা।

পরনে আট-হাতি কাপড়, তাও আবার গুটিয়ে টেনে পরা। ভাগড়া পায়ের গোছা তালে তালে দুলছে স্পষ্ট দেখা যায়। চোখ দুটি কিন্তু দেহের তুলনায় ছোট। ছোট বললে ভুল হবে ; চেখের উপরটা মাংসল, তাই চোখ দুটো ছোটো দেখায়। ভারি হাসি-খুশি। সব সময় রসাল গল্প করবে আর হাসবে। অদ্ভুত ভ্রূ কুঁচকে হাসবে। চল্লিশ বছর ধরে সে-হাসির রেখা কপালে দাগ হয়ে বসে গেছে। ওর দিকে তাকালে কারও গম্ভীর হয়ে থাকবার জো নেই।

কলিম পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়ে, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ফাঁকে দেখা যায় মুচকি হাসছে।

—চাচা, হাসছ কেন ?—এফাজ হেসে ফেলেই প্রশ্ন করল।

—নাঃ, বন-কর বাবু বলে কিনা, একটা বাঘও মারতে চায়, কুমিরও মারতে চায়। শিকারী হবার শখ দেখ-না। বললাম, 'বাবু, বাঘ কখনও দেখেছেন ?'

—না।

—'বাবু,কেঁদো দেখেছেন ?'

—না।

—'বাবু,খাটাস দেখেছেন ?'

—না।

—'বাবু, বিড়াল দেখেছেন ?'......

দু'জনেরই হাসি থামতে সময় লাগে। বাঘ-কুমিরের কথাটাই এফাজের কানে বিঁধেছিল। হাসি থামতেই উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে,—আচ্ছা চাচা, তুমি তো জীবনে বাঘ নিয়েই কাটালে, বাঘে-কুমিরে কখনও লড়াই দেখেছে ?

—লড়াই ? না, লড়াই দেখিনি তো।...তবে, বাঘে-কুমিরে কোলাকুলি দেখেছি।

—কি রকম ?

—হ্যাঁ, সত্যি কোলাকুলি, একেবারে চার হাত-পায়ে ভালোবাসার কোলাকুলি !

এফাজ আরও অবাক। ব্যগ্র হয়ে এক-নজরে তাকিয়ে বলে,—কি রকম ?

কলিম বেশ গম্ভীর হয়ে বলে,—শুনবি ? শোন্, সেবার মালঞ্চ নদীর মোহনায় কূলে কূলে বেয়ে চলেছি। ভোর বেলা। দূর থেকে দেখি, একটা বাঘ চরে শুয়ে আছে। ওভাবে বাঘকে কখনও চরে শুতে দেখিনি। দূরে ডিঙি আলগোছে ভিড়িয়ে সতর্ক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। হাততালি দিলাম, হেঁকে কথা কইল্যাম। তবুও ঘুম ভাঙে না যেন। নাঃ, একটা-কিছু হয়েছে ভেবে সাহস-ভরে এগিয়ে যাই। দেখি......

এফাজের যেন আর তর সয় না,—কি দেখলে ?

—দেখি, বাঘ ও কুমিরে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে।

—ঘুমিয়ে আছে ?

—দেখি, বাঘ একপাশ দিয়ে কুমিরের গলা কামড়ে, আর কুমির আরেক পাশ দিয়ে

বাঘের গলা কামড়ে দু'জনে চার হাত-পা জড়িয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে।
জ্যান্ত ?
কি জানি ভয়ে ভয়ে কাছে যেতেই দুর্গন্ধের ঝলকে নাক বন্ধ করতে হলো।
—ওঃ বুঝেছি, এই বুঝি তোমার বাঘের কেরামতি! বোঝা গেছে চাচা, তোমার বাঘের ক্ষমতা!—এফাজের গলায় একটা যেন তাচ্ছিল্যের সুর।
কলিম অন্য সব বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা আমোদ করবে, কিন্তু বাঘের প্রতি কোনও অবজ্ঞা যেন সহ্য করতে পারে না। বলল,—দেখ্, এফাজ, আর যা করিস ও-জীব নিয়ে ওরকম হেলাফেলা করবি না।
—রেখে দাও তোমার কথা। দেখা আছে তোমার বনবিবির বাহনকে!
—কোথায় দেখলি ?
—দেখেছি, এই তো সেদিন চৌকুনির শিকারী একটা মেরে গাঁয়ে নিয়ে এসেছিল।
একটা ব্যঙ্গের হাসি কলিমের ঠোঁটের কোণে,—ওঃ, মরা বাঘ দেখে এতো হম্বিতম্বি!—পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে বনের দিকে তাকিয়ে বলল,—দেখ্ এফাজ, বনে বসে এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে নেই।

ডিঙি এগিয়ে চলে। নদীতে কোথাও আর কোন ডিঙি নেই। থাকবার কথাও নয়। এবার কাঠ-কাটবার ঘের পড়েছে রায়মঙ্গল নদীর বাদাতে। কাজেই এদিককার বনে কোনও নৌকো বা ডিঙির দেখা পাবার আশা নেই।
হেমন্তের নরম সকাল। ঝিরঝির হাওয়ার সঙ্গে সকালের মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে। যেদিকে তাকাও ঘন সবুজ বন। ছোট শুভ্র নদী এঁকেবেঁকে এগিয়ে অবশেষে বাঁক নিয়ে বনের আড়ালে চলে গেছে।...সব-কিছু মিলে কলিমের মনকে আনমনা করে তোলে।
বাওয়ালি একটা গানের কলি গুন্‌গুন্ করে ওঠে। কাঁখে ভরা-কলসীর জল যেমন ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে, তেমনি ভরা-নদীতে জোয়ারের টানে আর মৃদু উত্তরে-বাতাসে মাঝদরিয়ার জল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গভীর বনের নিস্তব্ধতায় তার সুর কানে ধরা না দিয়ে যায় না।
একটা-কিছু হঠাৎ আবিষ্কারের উৎসাহ নিয়ে এফাজ আঙুল দেখিয়ে বলে,—চাচা! ঐ না একটা হরিণ এপারে সাঁতরে পার হয়ে আসছে? ঐ যে কান দুটো দেখা যায়!
—কই ?—বলেই কলিম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,—এফাজ! হরিণ না, সাবধান কিন্তু! সাবধান!
সাঁতরে আসবার গতি ও তার মতলব বুঝবার জন্য কলিম বোঠে থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কলিমের সাবধান-বাণীতে এফাজের মুখ ফ্যাকাসে। তার হাতেও একখানা বোঠে ছিল। ভয়ে ভয়ে লাঠি বাগাবার মতো সেখানা ধরবার চেষ্টা করে। দাঁড়াতে সাহস পায়নি। গুটি মেরে বসেই আছে। বুক দুরুদুরু করলেও একটা সাহস আছে ওর মনে,—হরিণ হোক, আর যাই হোক, ও জলে আর আমি চলন্ত ডিঙিতে। জলে না পড়লেই হলো।—তাই সে ডিঙির উপর দাঁড়াতে যায়নি।
কিন্তু ও যেই হোক, ওকে এড়িয়ে যেতে হবে। কলিম হাল থামালেও ডিঙি থামে না। স্রোতের টানে ধীরে ধীরে এগিয়েই চলেছে। না, এভাবে এগিয়ে গেলে হবে না। সামনা-সামনিই দেখা হয়ে যাবে। তবে কি ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে হটবার চেষ্টা করবে? না—খরস্রোতের মুখে ডিঙি মুখ ঘুরলেই তার আগেকার গতি থামে না। স্রোতের টানে তখনও সমানে এগুতে থাকবে। সে গতি থামাতে থামাতে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে

মাঝ-নদীতেই......কলিম আর চিন্তা করতে চায় না। চিৎকার করে তাড়া লাগিয়ে বলল,—শিগ্‌গির বোঠে ধর্। আসবার আগেই ওকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

কলিম বলল বটে এবং নিজেও দেহের সর্বশক্তি দিয়ে বোঠের টান দিল, কিন্তু এফাজ যেন কেমন হয়ে গেছে। বোঠেই এখন তার একমাত্র অস্ত্র। সে নিরস্ত্র হতে যেন চায় না। যেমনভাবে লাঠির মতো করে ধরে ছিল, তেমনিভাবে ধরে রইল।

কলিমের আশঙ্কা মিথ্যা নয়। মাঝ-নদীতে আসতেই আরও যেন জোরে সাঁতরে আসছে। হয়তো ডিঙি তার লক্ষ্য নয়, হয়তো মাঝনদীর প্রবল টানে পড়ে জোরে সাঁতরে পার হতে চেয়েছে। কিন্তু কলিম প্রমাদ গুনলো। সুন্দরবনের হিংস্রতম জীব। বাঘের চোখ ও মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। বাঘ ও ডিঙি এবার মুখোমুখি।

এফাজ স্থির থাকতে পারে না। বাঘ নিকটে আসতেই দু'হাতে বোঠে বাগিয়ে মারবার ভঙ্গি করে।

কলিম যেন আর্তনাদ করে উঠল,—করিস কি! করিস কি!

এফাজ 'ডাঙায় বাঘের' খবর রাখে না। সুন্দরবনের এই জীবকে অস্ত্র উদ্যত করে ভয় দেখানো যায় না—সে বন্দুক হলেও না। ওর হিংস্র চাহনি আর গর্জনের সামনে হাত তো দূরের কথা,—সর্বদেহ অবশ হয়ে আসে।

কিন্তু বাঘ এখন জলে ; নাকের ডগা অবধি জলে ডোবা।' আর ও নিজে ডিঙিতে। সাহস-ভরে ভয় দেখাবার সুযোগই বটে !!

কলিম আর্তনাদ করে বিপদ এড়াতে চাইলে কি হবে! এফাজের উদ্যত বোঠে শূন্যে উদ্যত হয়েই রইল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র গাঁগাঁ গর্জন করে যেন জলের উপর দাঁড়িয়ে পড়ে। বুক পর্যন্ত উঁচু করে থাবা বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ডিঙির গলুই ও এফাজই তার লক্ষ্য ছিল। থাকলে কি হবে, জলে ঝাঁপিয়ে থাবা মারবার আন্দাজ ওর নিশ্চয় নেই। চলতি ডিঙি এগিয়ে যায়। মুহূর্তে চোখ-মুখের জল ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে আবার হেঁকে ওঠে বুক পর্যন্ত জলের উপর তুলে। দু'হাতে এক সঙ্গেই যেন থাবা মারবে। কলিমও সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে ওঠে, বাওয়ালির বেপরোয়া প্রতি-আক্রমণ—শালা! এগুবি তো শেষ করব! খবরদার!

বাওয়ালি বোঠে উদ্যত করে না। শুধু বুক ফুলিয়ে হিংস্র মুখ করে গলুইতে হাঁটু গেড়ে খুঁটি নিল। যেন সে বোঝাপড়া করতে চায় এই ভীষণ জানোয়ারের সঙ্গে।

ডিঙি স্রোতের টানে খানিকটা এগিয়ে গেছে। এবারের আক্রমণে বাঘের দুই থাবা পড়ল মাঝ-ডিঙির ডালিতে। থরথর করে কেঁপে ওঠে ডিঙি। বাঘের হিংস্র চোখের উপর তার রক্ত-চক্ষু রেখেই কলিম এক-ফাঁকে গর্জন করে বলল,—এফাজ, খবরদার নড়বি না। বসে থাক্।

এজাফ হতভম্ব হয়ে বসেই আছে। বাঘ নিরস্ত হতে চায় না। ভ্রূক্ষেপ নেই তার কলিমের গোঙানি ও গালাগালিকে। এক ঝাঁকানি দিয়ে দুই থাবায় ভর করে উঠে পড়ল ডিঙির উপরে। সরু ডিঙিতে তাল সামলাতে এত বড়ো জানোয়ারের একটু সময় যায়। গোঁগোঁ গর্জন ও রাগ তার একটুও থামেনি।

ডিঙির খোলে চার পা রেখে কোনমতে তাল সামলে নিয়েছে। এফাজের দিকেই মুখ করে আছে, লক্ষ্য সেদিকে। কলিম আচমকা অনুভব করল, এফাজ এই মূর্তির সামনে ধীরে-

ধীরে বুঝি আড়ষ্ট হয়ে আসছে। ভীষণ জোরে চিৎকার করে বলল—এফাজ ! এফাজ ! শিগ্‌গির পানিতে পড়, পানিতে পড়!

হুঁকো-কল্‌কে কাছেই ছিল। কোন উপায় না দেখে, 'পানিতে পড়' 'পানিতে পড়' বলতে বলতে কলিম ক্ষিপ্র বেগে ছুঁড়ে মরল কল্‌কে এফাজকে লক্ষ্য করে।

কল্‌কের আঘাতে এফাজ সম্বিত যেন ফিরে পেল। ঝপাং করে পড়ল জলে। এফাজের দিকেই বাঘ একটা শুঁরো ডিঙিয়ে এগিয়ে গেল। কলিম অমনি চিৎকার করে,—ডুব দে ! ডুব দে !

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত দাঁতে গোঁঙানি। বাঘ ঘাড় বেঁকিয়ে হিংস্র চাহনি দিয়েছে কলিমের প্রতি। কলিম পিছপাও হতে চায় না। হাঁটুর উঁপর উঁচু হয়ে বুক চিতিয়ে সে-ও বারবার গর্জন করতে থাকে,—শালা, এগুবি তো শেষ করব!

তবু বাঘ যেন বাগ মানতে চায় না। ওর দিকে দু'পা এগুতে হবে, নইলে বাঘ কখনও পিছু হটতে চায় না। কলিমের বাঘের সামনে রুখে দাঁড়াবার পন্থাই এই। কিন্তু সে তো মাটির উপর দাঁড়িয়ে এই হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার কায়দা। এ যে নদীর মাঝে ডিঙির উপর বোঝাপড়া। কলিম এগুবে কোথায় ? এগুলে যে বাঘের থাবার মধ্যে এসে যেতে হয়! তবে কি হাতা-হাতিই করবে ?

হঠাৎ কলিম মনস্থির করে বসে। গালাগালি করতে করতে আর চাহনি বাঘের দিকেই রেখে ঝপাং করে সে-ও জলে পড়ল। জলে পড়ে, কিন্তু ডিঙি ছাড়ে না। এক হাতে গলুই ধরে রইল। আরেক হাতে আগের মতোই শাসাতে থাকে।

বাঘ বুঝেছে, সে জয়ী—কলিম পলাতক। বীরবিক্রমে এগিয়ে এলো কলিমের দিকে। তার দৃষ্টি, কলিমের গলুই আঁকড়ে ধরা হাতখানার দিকে। দাঁত খিচিয়ে এগিয়ে আসে। একবার হাতখানা কামড়ে ধরতে পারলে হয়। তারপর এক ঝাঁকানিতে টেনে তুলবে ডিঙির উপব। কলিম তবুও ডিঙি ছাডতে চায় না।

স্রোতের টানে সবাই ভেসে চলেছে। এফাজ সাঁতরে ভেসে চলেছে ডিঙির বেশ কিছুটা আগে আগে। একবার তীরের দিকে এগিয়ে চলেছিল। তৎক্ষণাৎ কলিম যেন মারমুখো হয়ে ওঠে,—খবরদার ! ডিঙির কাছাকাছি থাক।—এফাজ ডিঙির কাছাকাছি আছে বটে, কিন্তু প্রায় ডুবেই আছে। কোনমতে এক-একবার মাথা তুলে দম নেয়, আবার ডুব দেয়।

বাঘও চলেছে ডিঙিতে ভেসে ভেসে।

কলিমও চলেছে ভেসে ভেসে ডিঙির গলুই ধরে। তার লক্ষ্য, যেন কোনমতেই ডিঙি কূলের দিকে না যায়।

বাঘ এবার কলিমের অতি সন্নিকটে। প্রায় তার থাবার মধ্যেই। পেছনের পা ভেঙে বসেই পিঠটা লম্বা করে থাবা মারল। পেছনের পা ভাঙতেই কলিম ঝট্ করে হাত সরিয়ে নিতে চাইল। চাইলে কি হবে ? হাত সরাতে না সরাতে হিংস্র বাঁকা নখে হাতের খানিকটা মাংস উড়ে গেল। হাতাহাতির ধাক্কায় এক পাক খেল ডিঙি।

এফাজের গলুই ঘুরে এসেছে এপাশে। কলিম অমনি জাপ্‌টে ধরল ক্ষত হাতেই। পিছু হটলে যে রক্ষা নেই। হাত থেকে তখন তার রক্ত ঝরে পড়ছে।

ডিঙি ঘুরতেই বাঘ দূরের গলুইতে। আবার এফাজের সামনে। কলিম শাসিয়ে উঠল,—ডুবে থাক্, ডুবে থাক্।—এফাজ ডুবে তো থাকবেই! ছিলও ডুবে, কিন্তু

সুন্দরবনের জলেও নিস্তার নেই! কুমির ও কামট যেন কিলবিল করে। তবু বাঘের হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে, এ-যাত্রা কুমির কামটের ভয় করলে চলবে না। তাই বেপরোয়া হয়ে দু'জনেই জলে পড়ে আছে।

এদিকে এফাজ জলের তলে। বাঘ কিছুই দেখে না। ঘাড় বেঁকিয়ে কলিমের দিকে আবার নজর দিল। কলিম লুকিয়ে নেই। গর্জে ও শাসিয়ে চলেছে। বাঘ শুরো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আবার কলিমের দিকে এগিয়ে এল। কলিম আগে থাকতে সতর্ক হয়ে আছে। বাঘ আসতেই বোঁ করে ডিঙি ঘুরিয়ে দেয়। এবার কিন্তু গলুই ঘুরে এলে জাপ্‌টে ধরে না। ধাক্কা দিয়ে বোঁ-বোঁ করে চরকির মতো ঘোরাতেই লাগল।

চরকি পাক খেয়ে বাঘ গোঁগোঁ করে বটে, কিন্তু কি যে করবে যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। এফাজ নোনা জলের শুশুকের মতো বারবার ডুব দিয়েই চলেছে। ঘুরপাক খেয়ে বাঘ ঝোঁক দিয়েছে জলে পড়বার। কলিম বেপরোয়াভাবে একটানা চিৎকার করে—সাবধান! সাবধান! একদম ডুবে থাক্।—যাতে এফাজ ডুব দেবার ফাঁকে ফাঁকে কোনমতে শুনতে পায়।

এবার তিনজনেই জলে। নিঃসাড় বনের মাঝে মৈঁশেলী নদীর স্রোতের টানে হিংস্র শিকারী আর তার সাক্ষাৎ লুব্ধ দুই লোভনীয় শিকার।

—ডুবে থাক্, ডুবে থাক্—বলতে বলতে কলিমও জলের গভীরে ডুব দিল। এফাজ ডুবেই আছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে আরও কিছুক্ষণ ডুবে থাকতে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, তবু ডুবে থাকে জোর করে। নোনা পানির ঢোক গিলে গিলে আরও...আরও কিছুক্ষণ থাকতে চেষ্টা করে।

দু'মিনিট পরে দু'জনেই উঠে দেখে—আগের মতো কান আর নাকের ডগা উঁচু করে ডাঙার জীব ডাঙা-মুখো। বেশ কিছুদুর এগিয়েও গেছে। হিংস্র জানোয়ার নদী পার হতে চেয়েছিল। পার হয়েই ওপারে চলল। ফেলে আসা শূন্য ডিঙিখানি তখনও মাঝ-নদীতে ধীর গতিতে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। কে শিকার, কেই বা শিকারী, কে ঘাতক, কেই বা পলাতক—সবই যেন মৈঁশেলী নদীর লোনা পানির ঘোলায় ঘুলিয়ে যায়!

★ ★ ★

শান্ত নদীতে ঝিরঝিরে হাওয়ায় দুলে দুলে ডিঙি এগিয়ে চলে। সামান্য দু'একটা কথা ওরা যা বলেছে, শান্ত বনে তাও প্রতিধ্বনিত হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। নিস্তব্ধ আসরে তারের ঝংকারের রেশ ঠিক যেভাবে মিলিয়ে যায়। কে বলবে, এই কিছুক্ষণ আগেও এই নিঝুম নিরালা বনে প্রশান্ত নদীর জলে কী প্রলয় কাণ্ড চলেছিল!

জল থেকে ডিঙিতে উঠে ক্লান্ত এফাজ একবার গা এলিয়ে দম নিতে চেয়েছিল। দেয়নি কলিম তাকে বিশ্রাম নিতে। দ্রুত ছেড়ে যেতে হবে যে এই এলাকা।

এতক্ষণে সে-এলাকা অনেক অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। দু'জনেই বিশ্রাম নিতে ব্যাকুল। সহসা বোঠে থামিয়ে কলিম বেশ কিছুক্ষণ বনের দিকে লক্ষ্য করে বলল,—এফাজ! না, হলো না! থামলে রক্ষা নেই। বোঠে ধর্। চরে তো একটা বানরও দেখছি না, সবই তো গাছে গাছে। তেমোহনায় বাঁ দিকের নদীতে আগে পড়ে নিই, তারপর

বিশ্রাম-টিশ্রাম ! নে, ধর্।

সকালে রোদে নদীর চরে বানর দলে দলে আসে। পলিমাটির চরে কচি ঘাসের মুথো খুঁজে বেড়ায়। বানরের দলকে গাছ থেকে চরে নামতে না দেখেই ওদের আশঙ্কা।

কলিম বলল,—জানিস্, ও-শালা ঠিক পিছু পিছু এসেছে। দেখবি ! দেখতে চাস্ তো তেমোহনায় ঠিক দেখতে পাবি।

—না চাচা, দেখতে চাই না। তোমায় দেখাতে হবে না।

ত্রিমোহনায় মৈঁশেলী ফেলে ডিঙি বাঁ দিকের কয়রা নদীতে পড়বে। কয়রায় পড়তেই কলিম আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল,—ঐ দ্যাখ্, ঠিক শালা এসেছে। বনের আড়ালে আড়ালে ডিঙির ঠিক পিছু পিছু এসেছে। ঐ দ্যাখ্, এব্বার ছেড়ে চলে যাব বলে কেমন করে মুখ বাড়িয়ে দেখা দিয়েছে। দ্যাখ।

এফাজ বিহ্বল হয়ে বলল,—না চাচা, আঙুল দেখিয়ে অমন তাচ্ছিল্য করে কথা বলো না।

রয়েলবেঙ্গলের আত্মকথা

বাঘে আবার কথা বলতে পারে নাকি? নিশ্চয় পারে। অন্যান্য অনেক জীবের মতো ওদের ভাবনাও আছে, ভাষাও আছে। আছে ওদের ভালোবাসা ও দ্বেষ, আছে ওদের আদর ও নিষ্ঠুরতা। দুঃখ-বেদনাও যেমন আছে, তেমনি আছে আনন্দ ও উল্লাস। সর্বোপরি আছে প্রখর বুদ্ধি। বুদ্ধি যে কী তীক্ষ্ণ তার পরখ পেতে অতি বুদ্ধিমান মানুষেরও দেরি হবে না একবার ওদের রাজ্যের সীমানায় পদার্পণ করলে। এমন জীবের ভাষা না থেকেই পারে না। কিন্তু সে-ভাষাকে মানুষের ভাষায় রূপ দেওয়া এক দুরূহ কাজ।

মানবগোষ্ঠীর ভাষাগুলির উপর অনিবার্যভাবে প্রভাব বিস্তার করে স্থানীয় আবহাওয়া। একইভাবে নিশ্চয় রয়্যালবেঙ্গলের ভাষাও প্রভাবান্বিত। এই কথা মনের তলে রেখে সুন্দরবনের মানুষ জংলী ভাষার প্রকাশ ও প্রকাশভঙ্গিকে নানাভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি—এই আশা নিয়ে, এতে হয়তো ওদের ভাবনাকে ভাষায় রূপ দেওয়া কিছুটা সম্ভব।

এক

জেলেনৌকোর লোকগুলি খালে পাটা-জালে মাছ ধরছে। বেলা হেলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খালের কিনারার কাছাকাছি এসেছে। মাছ ধরার কাজ এইবার শেষ। এখন জাল গোটো করে তুলবার পালা। ওরা কিন্তু এবার আমার খুব নিকটেই এসে পড়েছে। আমিও অতি সাবধানী। ভাঙনের পাড়, তাতে আবার ভাঁটির শেষ। তিনপোয়া ভাঁটির জল থেকে বনের চাতালের পাড় অনেকখানি উঁচুতে। আমি পেছনের পায়ে খাড়া হলে যতটা উঁচু হয়, তার থেকেও উঁচুতে।

জাল ধুয়ে নৌকোর পাটাতনে তুলবার সময় এপারে মরতে এসেছে কেন জানি না। তবে আমি নিশ্চিন্ত হলাম, ওরা অন্তত আমার কোন খোঁজ পায়নি। হয়ত ভেবেছে চরের পাড় থেকে ভাঙনের পাড়ে কোমরজলে সহজে দাঁড়াতে পারবে। ওদের একজন কোমর-জলে দাঁড়িয়ে একমনে জাল গুটিয়ে গুটিয়ে তুলছে। বাকি লোকগুলি হাপর ঠিকঠাক করতেই যেন ব্যতিব্যস্ত।

আমি অতি সন্তর্পণে মাটির সঙ্গে একদম লেপটে হাতের টানে টানে একটু একটু এগিয়েছি। সামনে একটা হেঁতাল গাছের ঝাড়, অর্ধেকটা আগেই খালের গর্ভে গেছে ; বাকি অর্ধেকটাও ভেঙে পড়ার মতো। তারই আড়ালে আমি এগিয়েছি একদম পাড়ের কিনারায়।

তাড়াতাড়ি কাজ সারাবার জন্য ওরা যে যার কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে। কোনওদিকে তাকাবারও বুঝি ফুরসুত নেই; এমন সুযোগ সুন্দরবনের রয়্যালবেঙ্গল কখনও কিন্তু-কিন্তু করে ছেড়ে দেয় না। আমিও দিইনি—ঝাঁপিয়ে পড়েছি নিঃশব্দে। আমি নিঃশব্দে ঝাঁপ দিলে হবে কী ? নৌকোর গলুই তো বেশ নিচুতে, আমার দেহের ওজন এবং উড়ে পড়ার ধাক্কায় পাটাতনে ভীষণ একটা শব্দ হলো যেমন, তেমনি গোটা জেলে-নৌকোখানি থরথর করে দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ের এক-চাক মাটিও ঝমাৎ করে সশব্দে জলে এসে পড়লো আমার পিছনের পায়ের ধাক্কায়।

নিঝুম নেতিধোপানীর বনে চমকে দেবার মতো শব্দে বা নৌকোর দোলানিতে ওরা সচকিত হবার আগেই মুহূর্ত মধ্যে গলুইতে পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে থাবার আঘাতে আর নখের টানে জলে দাঁড়ানো লোকটাকে টেনে এনেই এক ভীষণ গর্জনে ঘাড় আর কাঁধ গক্ করে কামড়ে ধরেছি। শুধু কামড়ে দিইনি, সঙ্গে সঙ্গে আমার গরান-কাঠের চেয়েও শক্ত চোয়ালের চাপে ঘাড়টা সশব্দে মট্ করে ভেঙে দিয়েছি। ভেঙে দিয়েই প্রচণ্ড ভাবে নৌকোর গলুইটা এক ধাক্কায় দাবিয়ে প্রকাণ্ড লাফ দিয়েছি লোকটাকে মুখে নিয়েই। এক লাফেই বনের চত্বরে।

তক্ষুণি চলে যাইনি। এবার বাকি লোকগুলোকে ভয় দেখানোর পালা। তা না হলে, যদি ওরা আমার কিছু করে বসে। ওখানে দাঁড়িয়েই ঘাড় বেঁকিয়েছি ওদের দিকে। ভয় দেখাব

কি ? দেখি, ওরা তো ভয়েই আড়ষ্ট, যেন ওরা কাঠের মতো নিশ্চল হয়ে গেছে। তবু আমার মুখের শিকারকে আরও শক্ত করে কামড়ে ধরে আমার রক্তচক্ষুকে আরও তীক্ষ্ণ করে চাপা গর্জন করে উঠেছি। গোটা বন যেন সে-গর্জনে গম্‌গম্‌ করে উঠলো।

আমি এখন উন্মত্ত। দাঁতের কামড়ে শিকার পিষ্ট হলে আমরা যেন শক্তিমত্ততা আর ক্ষমতাদম্ভে মেতে উঠি। তাজা রক্তের আস্বাদ আমাদের পাগল করে দেয়।

বীরদর্পে এখন শিকার মুখে নিয়েই ধীর পদক্ষেপে একটু আড়ালে গিয়েছি। আমার এবার আর কাউকে তোয়াক্কা করার নেই। খুশী মনে রাজকীয় আহারে বসেছি। কামড় খুলতেই তাজা গরম রক্ত গলগল করে বেরুতে থাকে। লোলুপ রক্তপানে আমি মতোয়ারা!

এই দুর্ধর্ষ ঘটনা যেখানে ঘটে তার নাম, 'নেতিধোপানী'র বন। আমরা বন্যজীবেরা চিনি একে 'মেছো'-বন ব'লে। প্রচুর মাছ এখানে। তাতে আবার 'মরাবালি' খাল। এই খালকে তো মাছের আড়তই বলা যায়। আমি কিন্তু মাছ-শিকারে বা মাছ খেতে এখানে আসিনি—এসেছিলাম আমার মায়ের খোঁজে। আমি তো নিজেই এখন বুড়ো, আর মা তো নিশ্চয় এতদিনে অনেক অনেক বুড়িয়ে গেছে। তবু আমি আশা ছাড়িনি—একদিন না একদিন কোথাও দেখা হয়ে যাবে মা-র সঙ্গে।

ঘুরছি তো ঘুরছি। বনটা বড় ফাঁকা লাগছে, অন্য কোনো জীবজন্তুর দেখাই মিলছে না। একটু দাঁড়িয়ে পড়েছি, ব্যাপারটা বোঝার জন্য। সুন্দরবনে সকাল বেলায় বনের হাওয়া নদীর দিকেই যায়। কিন্তু আজ, কেন জানি না, ফুরফুরে হাওয়াটা ওলট-পালট বইছে। ফলে আমার গায়ের ভোটকা ও বিভীষিকাময় গন্ধ বনের চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। এই গন্ধ কোনও জীবের নাকে একবার গেলে আর তাদের স্থির থাকা সম্ভব নয় ; কোথায় যে তারা উবে যাবে তার ঠিক নেই!

মেছো-বন ব'লে একবার আনমনে খালটার কিনারায় এসেছি। মরাবালি খালটা কিন্তু বেশ বড়। নদীই বলা যায়। মাছের বাহার দেখলেও দেখতে পারি, সেই আশা নিয়েই ধারে এসেছি। একা আমি শুধু নই,—মাছের গন্ধে মানুষেরাও এসেছে এই তল্লাটে। একখানা চলন্ত নৌকো সামনেই। তক্ষুনি গা ঢাকা দিয়ে পিছু নিলাম। দেখি, বেশ কয়েকজন লোক নৌকায় আছে। ওরা বিশেষ কেউ দাঁড় বাইছে না, দিব্যি আরামে স্রোতের টানে-টানে ভাঁটোতে চলেছে।

খালের কিনারা থেকে আমি খানিকটা পাশে। শুধু পাশেই নয়, ওদের থেকে বেশ খানিকটা পিছনেও বটে। যাতে আমি নিশ্চিন্ত মনে ওদের লক্ষ্যে রেখে সহজে অনুসরণ করতে পারি।

ভোরের স্পষ্ট আলোয় বেশ দেখছি, নৌকোর ওপর মাছ-মারা একটা বড় জাল গোটানো রয়েছে। আর নৌকোর এপাশে আর ওপাশে রয়েছে বড় বড় হাপর।

হাপর নিয়ে আমার এক তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। এগুলো দেখতে যেন নদীতে উপুড়-করা ডিঙি—অর্ধেক থাকে ডুবে, অর্ধেক ভেসে। বড় গাছের গুঁড়ির মতো লম্বাটে ও গোল। তবে চারিদিকের ঢাকাটা গোলপাতার মতো ফাঁক ফাঁক, যাতে নদীর জল এর মধ্যে অতি সহজেই আসা-যাওয়া করতে পারে। একটা না কিন্তু, নৌকোর ওপাশেও একটা বাঁধা। রাত্রে এইসব জেলে-নৌকো কিনারা থেকে অনেকখানি দূরে নোঙর করে—প্রায় মাঝ-দরিয়ায়। নৌকোর লোকেরা দিনের পর দিন মাছ ধরে, আর সঙ্গে সঙ্গে পুরে রাখে এই হাপরে। বেশ ক'দিন ধরে মাছগুলোকে জ্যান্ত রেখে অবশেষে নিয়ে যায় দূর-দূরান্তে।

এ সবই আমি আমার যৌবন বয়েস থেকেই লক্ষ্য করে করে দেখেছি। সুযোগ পেয়ে গভীর রাতে এই ধরনের নৌকোয় একবার হানা দিই শিকারের লোভে। খানিকটা সাঁতরে নৌকোয় উঠতে গিয়ে দেখি, হাপরে পা না রেখে নৌকার ডালি ধরাই দায়। কিন্তু পা রাখতেই গোটা হাপরটাই আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে থাকে—সবটাই যেন জলের তলে চলে যেতে চায়। আর সেইসঙ্গে আমার মুখটাও বুঝি জলের তলে যাবে।

এই বিপদকে হয়ত সামাল দেওয়া যেতো, কিন্তু হাপর জলের তলে যাবার আগেই ওর ভেতরের বড় বড় মাছগুলি যে কীভাবে খড়বড় আর খলখল করে উঠলো তা বলার নয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর মাঝি-মাল্লারাও হৈহৈ করে নৌকোর ছাউনি থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়েছে—ওদের আশঙ্কা হয়ত কেউ ওদের মাছগুলি নিয়ে পালাচ্ছে। তা না হলে কেউ কি খালি হাতে অমন করে আমার সামনে আসে।

জলের তলে পুরো-ডোবা হাপরের ওপরে আমাকে দেখে যে যা পারে লাঠিসোটা টেনে-টুনে মারমুখো হয়ে ওঠে। আমার তখন কাহিল অবস্থা। যে-থাবাখানা হাপরের উপর রেখেছিলাম তার বাঁকা নখগুলি কেমন করে না-জানি আটকে গেছে হাপরের ফাঁকে ফাঁকে। নৌকোর মানুষগুলোকে তেড়ে আক্রমণ করতে যাওয়া তো দূরের কথা, সাঁতরে ভেসে থাকাও এখন দায় ; একটা থাবা তো সাঁতারে ভেসে থাকার কাজেও লাগাতে অপারগ হয়ে পড়েছি। আমার অবস্থা সসেমিরা। কোনোমতে থাবাকে হাপর থেকে মুক্ত করে সে-যাত্রা বেঁচে আসি।

এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আমি আর হাপর-নৌকায় রাত্রে শিকার করতে যেতে চাই না। তাই আজ ভালো করে ওদের লক্ষ্যে রেখে তক্কে তক্কে ছিলাম—কখন বেলা থাকতে থাকতে সুযোগ পাওয়া যায়। পেয়েও যাই। তাই তো বহুদিন পরে আজ মানুষের তাজা রক্তপানের সুযোগ মিলে যায়।

এই ঘটনার কিন্তু এখানেই ইতি নয়। বারবার অনেকবারের মতো এবারেও যে আমাকে কীভাবে মানুষের অসীম সাহস ও বুদ্ধির সামনে চমকে উঠতে হয়েছিল, সে-ঘটনা না বলা পর্যন্ত আমার এই আত্মকথা কখনই পূর্ণ হবে না।

কিন্তু আমার এই অপূর্ব শিকারদক্ষতা ও সাহসিকতা একদিনে আসেনি। কখনও ঠকে, কখনও বা ঠেকে ; কখনও হেরে, কখনও বা জিতে ; কখনও মায়ের শাসনে, কখনও বা মায়ের আদরে ; কখনও বা মাতৃহারার সাবালকত্বে পৌঁছবার অদম্য প্রচেষ্টায় আমার সংগ্রামী জীবনকাহিনী গড়ে উঠেছে। সেইজন্যই মা-কে তো আজও পর্যন্ত ভুলতে পারিনি। মা-কে বুঝি জীবনে কখনও ভোলা যায় না।

দুই

বয়েস তখন আর কতো হবে আমার—ঠিক বলতে পারবো না, তবে একবারের বেশি বর্ষার ভোগান্তি হয়েছে আমার জীবনে।

উল্লাসে আমি আটখানা। আপাতত সে-উল্লাস মনের তলে চাপা। আগে আমার শক্তি ও দাপটি দেখাতে হবে। এতবড় সাহস, আমার সামনে এখনও হাত-পা ছুঁড়ছে।

চার পা গোটো করে ফেলেছি। লেজটা পেছনে লম্বা টানটান হলেও প্রান্তভাগ যেন আপনা থেকে উর্ধ্বমুখী হয়ে একবার এপাশে একবার ওপাশে মাটির ওপর নিঃশব্দে আঘাত

করছে। সামনের ভাঁজ করা বাহুর মধ্যে কাঁধ বসিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি। রোখের চোটে থাবা ও পায়ের আঙুলগুলি চিড়বিড় করছে, দেখে নিচ্ছে পায়ের তলার মাটি ধাক্কা সামলে নেবে তো!

পলকের অপেক্ষা না করে ঝাঁপ দিয়েছি। ও মা! এ কী হলো! শুয়োরছানা ছাপিয়ে ওপার গিয়ে পড়েছি। মা তো বাহুর ওপর ভর করে বসে বসে দেখছে। নিশ্চয় ভাবছে—এর দ্বারা কিচ্ছু হবে না! তা হোক, ছুটে এসে আবার তাক্ করেছি ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। শুয়োরছানা তখনও ছট্‌ফট্ করছে।

কিছুটা শক্ত-সমর্থ হয়েছি বটে, কিন্তু কিছুতেই মাপসই লাফ দিতে পেরে উঠি না। মা নিশ্চয় মনে মনে ধিক্কার দেয়—কোথাকার একটা উড়ন্ত বাচ্চা এসে জুটেছে আমার জীবনে!

এর আগে যখন আরও ছোট ছিলাম তখন তো মা চাপা ঘরঘর আওয়াজে ডেকে কাছে নিতো। ডাকলে কী হবে! আমরা কি চুপচাপ থাকার জীব! এদিক ওদিক খুটখুট করে ঘোরাফেরা করাই ছিল আমার নেশা। নেশা হবে না কেন, বনটা কী সুন্দরই না! যেদিকেই তাকাও না কেন, শুধু গাছ আর গাছ। গাছের কী বাহার! কোনটা সরু, কোনটা সাই মোটা, কোনটার পাতা গোল, কোনটার পাতা লিকলিকে। লতাপাতা তেমন না থাকলেও, যেখানে ঝোপ সেখানে লতাপাতাগুলো এমন জড়াজড়ি করে থাকে বলার নয়। দেখলেই মনে হয়, কেউ বুঝি বা আমার জন্য ঘাপ্‌টি মেরে আছে ওখানে।

আমাদের ডেরাটা কিন্তু ভারী উঁচু আর খটখটে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘন ছায়ায় ঢাকা পরিষ্কার চত্বর। শুধু কিছু খোলামকুচি ছড়িয়ে আছে। জানি না, কেমন করে আমাদের ভিজে কাদামাটির বনে এমন ডেরা মিললো। ডেরার চারিপাশে গোল হয়ে খানিকটা হঁদো বনের ঝোপ। এমন উঁচু ঝোপ যে আমি এখানে বসে বনের চত্বর মোটেই দেখতে পাই না। মা কিন্তু শুয়ে শুয়েই গলা বাড়িয়েই সবই দেখতে পেতো।

মা কী ভীষণ সাবধানী ছিল—একটু কিছু শব্দ হলেই ছুটে চলে যেত আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে। আমার তখন কী ভয়ই না করতো। মা না থাকলে ভয়ে ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকতাম হঁদো ঝোপের আড়ালে।

মা এমনি করেই আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যেতো খাবার আনতে। আর কিছুক্ষণ পরে দেখতাম, এক খাব্‌লা মাংস এনে আমার সামনে ফেলে দিচ্ছে। তখন কী আনন্দ! অমন খাবার পেলে কেউ ঝাঁপাঝাঁপি না করে থাকতে পারে!

বেশ কিছুদিন এমনিধারা মজার দিন কাটার পর মা কিন্তু আর আমার জন্য মাংস বয়ে আনতো না। হরিণ, শুয়োর বা অন্য কোনও শিকার যেখানে পেতো সেখানেই ফেলে রেখে খালি-মুখে ডেরায় ফিরে আসতো। তারপর আমাকে আদর করে সঙ্গে নিয়ে যেতো সেই শিকার-করা খাদ্যের কাছে। মনের আনন্দে তখন পেট ঢাই করে খেতাম।

আমি তখন এমন বোকা ছিলাম বলার নয়। শিকার করা খাদ্যের কোন্ পাশটা আগে খেতে হয় তাও জানতাম না। হয়ত খুরের দিকটা চাবাতে শুরু করেছি ; মা তখন গাঁ-গাঁ করে রেগে হরিণের গলায় কামড় বসিয়ে দেখিয়ে দিতো—বোকা কোথাকার! হরিণের এইখানটা আগে খেতে হয়।

মা যে আমাকে কীভাবে সাবালক করে তুলেছে, বলার নয়। আরেকটু বড় হলে, মা তখন জ্যান্ত-শিকার মুখে করে নিয়ে আসতো। হয়ত প্রকাণ্ড একটা হরিণ ঘাড়ে করে এসে হাজির। কেমন করে অতবড়ো জন্তুটাকে ঘাড়ে করে আনতো তা দেখলে অবাক হতে হয়।

জন্তুটা ঘাড় থেকে ফেলেই মা চুপচাপ বসে থাকতো। মা-কে তখন আর কিছুই বলতে হতো না ; আমি নিজেই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আর এক-একটা মরণ কামড় বসিয়ে ওটাকে মেরে ফেলে খেতে শুরু করতাম। সবশেষে মা এসে যোগ দিত আমার সঙ্গে।

এইভাবেই বেশ কিছুদিন চলে আমার জীবন। আরও বড় হয়ে উঠেছি, ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা বর্ষা কেটে গেছে। এখন মা আমার জন্য আর শিকার ঘাড়ে করে আনে না। আমাকে সঙ্গে নিয়েই শিকারে বেরোয়।

রাতের আঁধার। তাহলেও বেশ খানিকটা আমরা দেখতে পাই। রাতেই বনে বনে ঘুরতে ভারি মজা। এখন তো বনের প্রায় সব জীবজন্তুই নিস্তব্ধ হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। কী জানি, ওরা বোধহয় রাতে দেখতে পায় না ভালো। তাই চুপচাপ শুয়েই থাকে। আমরা কিন্তু মজাসে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মা তো ঘুরছে, কিন্তু মা তার তালেই আছে। একটু যায় আর কান খাড়া করে—কোনও শব্দ, কোন ক্ষীণ বেতাল শব্দ কানে ধরা পড়ে কি না।

বেতাল বলছি এই জন্য—সকলেই ভাবে রাতে গভীর বন বুঝি নিঝুম নিস্তব্ধ। তা মোটেই নয়। কতরকম পোকা-মাকড়ের ডাক ; নানা তালে ও সুরে তারা ডাকে। সবার উপর ঝিঁঝিঁপোকার ডাক। সে-ডাক বড় তীক্ষ্ণ আর একটানা। ডাকছে তো ডাকছেই। নিশাচর পাখিও জায়গায় জায়গায় কম সোরগোল.করে না। সুন্দরবনে বাদুড়পাখির বেশ আড্ডা আছে। তারা কিচির-মিচির ডাকও যেমন দেয়, তেমনি গন্ধও ছড়ায় বনে। মশার ভন্‌ভনানি কি কম।

কিন্তু এতরকম শব্দ কানে ধরা পড়লেও এ-সব শব্দের মাঝে একটা তাল ও লয় আছে। যেমন আছে জোয়ার-ভাঁটার টানে সুন্দরবনের খরস্রোতা নদী ও খালের কলকলানিতে। বন থেকে ফাঁকা চরে এলে নদী ও খালের তেমাথায় সাপের ফোঁসফোঁসানির মতো শুশুকের ভীতিপ্রদ শব্দ। তারও মাঝে যেন একটা তাল আছে। এই সব-কিছু শব্দ মিলেমিশে গোটা বনে যেন একটা ছন্দ-সমন্বিত তরঙ্গ ঝংকৃত হয়।

আমাদের মতো শিকারী-জীবকে এরই মধ্যে বেতাল শব্দের জন্য সজাগ ও সচকিত থাকতে হয়। বেতাল শব্দ কেই বা করবে ? নিশ্চয় কোনো প্রাণী, আর প্রাণী হলেই তো সে আমাদের খাদ্য। তাই মা অমন করে মাঝে মাঝে কান খাড়া করছে। একবার সন্দেহ হলেই মায়ের কী সতর্কতা ; শব্দকারীর অজানিতেই তার দিকে এগুতে হবে তো।

আমাদের বিক্রমের দোসর নেই। কিন্তু আমাদের থেকে অন্যেরা অনেকেই হয় দ্রুতগামী, না-হয় ছোটার মুখে আমাদের চেয়ে ঝটিতে বাঁক নিতে পারে। আর তা না হলে সে হতে পারে অন্য কোনও মতলববাজ বন্যপ্রাণী। যে-ই হোক, অতি সন্তর্পণে মা-কে এগুতে হবে তার খুব কাছাকাছি অবধি ; যাতে একলাফে বা খুব বেশি হলে আরও একটা লাফে বিদ্যুৎবেগে তার ঘাড়ে পড়তে পারে।

সেদিন বেশ কিছু দূর ঘুরতে ঘুরতে বড় নদীর চত্বর ছাড়িয়ে একটা ছোটনদীর চত্বরেএসে পড়েছি। হঠাৎ মা সচকিত। সঙ্গে সঙ্গেই ঘাপ্‌টি মেরে গোটা শরীরটা মাটির সঙ্গে প্রায় লেপটে দিয়েছে। তারপর মাথা পেছনে ঘুরিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে নিঃশব্দে মুখ-ঝামটা দেয় আমাকে। মা কী বলতে চায় তা বুঝে ফেলেছি। প্রথমটা মায়ের নিঃশব্দ মুখের ঝামটায় থতমত খেলেও আজ ঠিক করেছি মায়ের পিছুপিছু যাবই—দেখি কী দিয়ে কী করে মা।

আমি তখন মায়ের লেজটার কাছাকাছি। মা একটু এগুতেই পিছু নিয়েছি। তখন এটুকু বুঝবার বয়েস হয়েছে যে মায়ের পেছনে পেছনে যেতে আমাকে মায়ের মতো সাবধানী হয়ে

এগুতে হবে।

কিন্তু কী কঠিন ঐভাবে যাওয়া। ঘাপ্‌টি মেরে মাথা, পিঠ ও লেজ নিচু করে এগুতে হবে। তাও দ্রুত নয়, প্রতিটি থাবা ও পা ভাঁজ করে একটি একটি করে ছোট্ট ছোট্ট কদমে নিঃশব্দে যেতে হবে। প্রতিটি পা বা থাবা মাটিতে রাখার সময় খেয়াল থাকে যেন কোনও শুকনো পাতা বা ডাল তার চাপে না পড়ে। পড়লেই কুড়মুড় করবে, না হয় মট্‌ করে শব্দ হবে। যাকে শিকার করবো সে-ও তো সজাগ ; শব্দ হলেই সে উল্টো দিকে ছুটে নাগালের বাইরে চলে যাবেই যাবে।

সামনেই কয়েকটি গরান গাছ বেড় দিয়ে হঁদো বনের ঝাড়। ঝাড় ভেদ করে সোজা যাবার উপায় নেই। তেমন করতে গেলে ডালপালা দুলে খস্‌খস্‌ শব্দ করে উঠবে। তাই মা পাশ কাটিয়েছে, ঝাড় বেড় দিয়ে ঘুরে ওদিকে যাবার পথ নিয়েছে। মা মাথা নিচু করে এগুলেও আমি উৎকণ্ঠিত ও চঞ্চল হয়ে আমার ছোট্ট মাথাটা উঁচু করে দেখবার চেষ্টা করছি। এমন করা ঠিক নয় জেনেও আমি আর থাকতে পাচ্ছি না। না, কিছুই দেখতে পেলাম না।

মা কিন্তু এখন আরও সাবধানী, গতি তার আরও শ্লথ। মুশকিল হলো, সামনেই ঝাড় শেষ হতেই বড় জাতের একটা গিলে লতা গরান গাছ জড়িয়ে জড়িয়ে মগডালে উঠে গেছে। কতটা উঠে গেছে তা বলতে পারব না, তবে এই লতায় চাপ পড়লে মগডালেও টান পড়তে পারে। ভ্রূক্ষেপ না করে মা অতি সন্তর্পণে গিলে লতা পেরিয়েছে। আমিও লতার কাছাকাছি। তারপর কী যে ঘটে গেল বলতে পারবো না। হঠাৎ মগডালের পাখি ভয়ার্ত ডাক ডেকে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির মধ্যে যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝোপটি থেকে দলছাড়া এক হরিণ-শিশু ট্রিউ ট্রিউ চিৎকারে উর্ধ্বশ্বাসে শব্দের গতিতে যেন উড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মা চারপায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। গোল-গোল চোখে আমার দিকে তাকালো। আমি তো হতভম্ব। কথা নেই বার্তা নেই ছুটে এসে মা এক থাবা মারল। আদরের থাবা নয়, নখ-বিস্তৃত থাবা। থাবার চোটে ডিগবাজি খেয়ে যেই উঠে দাঁড়িয়েছি, অমনি ছুটে এসে আবার আর এক থাপ্পড়। নখ-বিদ্ধ হয়ে কানের পাশে জ্বালা করছে। কেন ? আমি কী দোষ করেছি ! আমিই কি হরিণকে সচকিত করে দিয়েছি ? ভারি অভিমান হলো। চুপ করে পড়ে রইলাম অনেকক্ষণ মুখের জ্বালা সহ্য করে।

মা-ও লেজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে ডেরায় ফিরে এলো। আমিও বেশ দূরত্ব রেখে রেখে মায়ের পিছু পিছু ফিরে এলাম। এলাম বটে, কিন্তু মায়ের কাছে আর ঘেঁষিনি সে-রাতের মতো। এতে কার না অভিমান হয় বলো—দোষ করিনি, তবুও দোষী হয়ে গেলাম। অভিমানে আর মায়ের দিকে তাকাতেও চাইনি।

তিন

অভিমান। কিন্তু মায়ের ওপর আর কতক্ষণ অভিমান করে থাকা যায়। মায়ের কোল ঘেঁষে আদর পাওয়ার জন্য আঁকুপাঁকু করছি। একবার আমার দিকে তাকালেই হয়। না, মায়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ভোর না হতেই হঠাৎ সটান উঠে চলতে শুরু করছে।

একবার ইচ্ছে হলো পিছু নেবার। না, গতরাতের কথা মনে হতেই যেন আরও নিশ্চল হয়ে পড়ি। মা সোজা চলে গেল। বনে কতটুকু বা সামনে দেখা যায়। যতদূর নজর যায়

তার মধ্যে মা একবারও আমাকে কোনও ইসারা করে না। এই ইসারার জন্য কী ব্যগ্রই না তখন হয়ে উঠেছিলাম। না, মানভঞ্জনের কোন সাহস জোটে না আমার।

আমি আমার ডেরায় আছি। ঘুরছি, ফিরছি আবার শুয়ে শুয়ে ভাবছি—কী করা। সন্ধে হতেই মন ছট্‌ফট্‌ করে বেরিয়ে যাবার জন্য। যেতে সাহস নেই বললে ভুল হবে : আসলে আমার আশঙ্কা—মা এসে যদি আমাকে না দেখতে পায়, তাহলে আর কোনদিনও সে ফিরে আসবে না। ভাবনার এমনি টানা-পোড়েনে একটা দিন কেটে গেল। পরের দিনও গেল। মা তবু ফিরে আসে না। সন্ধে হয়ে আসছে, হঠাৎ দেখি মা ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু ঠিক মা তো ? আর কেউ নয় তো। যদি আর কেউ হয় তাহলে আমার কী করার আছে তা জানি না। না, কাছে আসতেই মার গন্ধ পেয়েছি। গন্ধেই আমরা অন্যকে নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করতে পারি। মায়ের গন্ধ হলে তো কথাই নেই।

মা-র মুখে বেশ বড় একখণ্ড মাংস ; হরিণের পা হবে হয়ত। সব ভুলে গেলাম, মান-টান সব কোথায় উবে গেল। খিদের গ্রাস, তাতে আবার মায়ের মুখে—ছুটে গিয়ে এক কামড় দিলাম। মা তখনও মুখের কামড় আলগা করেনি। টেনে হিঁচড়ে মার মুখ থেকে যেন কেড়ে নিলাম।

মা অবশ্য আহ্লাদে আটখানা হয়নি। দাঁড়িয়ে একটু দেখলো, তারপর নিশ্চিন্ত মনে পাশে বসে রইল। অনেকক্ষণ বসে রইল। বসে বসে মা কী ভাবলো তা মা-ই জানে। আমি প্রথমে হা-ভাতের মতো গব্‌গব্‌ করে খেয়ে নিলাম। শেষবেশ হাড়খানা মুখে নিয়ে মার কাছে এসে বসলাম। মাংস রাখিনি এতটুকুও মার জন্য। আমি তো এখন বেশ বড় হয়েছি, হরিণের ঠ্যাংটা পুরোই খেয়ে ফেলতে পারি।

সারা রাতটা মা আমার কাছেই রইলো কিন্তু আদর করে আমাকে একটুও কাছে টেনে নেয়নি। ভরা পেট, আর মা কাছেই আছে—তাতেই আমি মশগুল। কিন্তু মার মতলব মার কাছে, তা বোঝা আমার অসাধ্য। কী হবে অতো ভেবে।

পরদিন সাত-সকালে ডেরার উঁচু চত্বরে মা এদিক ওদিক কয়েকবার ঘুরলো—তারপর হঠাৎ ছুট দিলো। ক'দিন আগে যখন আমাকে ছেড়ে যায়, তখন ধীর চালে এগিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে মিশে যায়। কিন্তু আজ অমন ছুটে গেল কেন ? কিছুই বোধগম্য হয় না। কিন্তু এমন গম্ভীর মা-কে পিছু অনুসরণ করতে আজও সাহস হয় না।

মায়ের ওপর জুলুম করার সাহস একবার হারালে যে নিজেকে স্বাধীনচেতা করে তুলতে হবে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার পথ যে বেছে নিতে হবে—সে-কথা প্রথম প্রথম বুঝিনি। বুঝতে বেশ ক'দিন সময় গেল। আজ ক'দিন হয়, না খেয়ে-দেয়ে পড়ে আছি নিজের ডেরায়। কাঁহাতক আর পারা যায়।

নিজের মনে নিজে খেলে সময় কাটিয়েছি। কখনও ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে, কখনও বা গাছে খানিকটা উঠবার চেষ্টা করে, কখনও বা শুয়ে-বসে-ঘুমিয়ে। একসময়ে দেখি ইঁদো ঝোপের একটা ডাল মাটি ঘেঁষে মাথা বের করে বাতাসে দুলছে। ডালটি পাতার ভারে এতক্ষণ মাথা নুইয়ে ছিল। হঠাৎ মনে হলো—ও একটা জীবন্ত প্রাণী। কী, এতবড় সাহস আমার সামনে নড়ছে। গুটি মেরে মেরে এগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এক লাফে। আমার লাফ এখনও সহসা মাপসই হতে চায় না। তা হোক, বারবার আক্রমণে ডালটা থেঁতো করে দিয়ে তবে শান্ত হলাম। শিকার তো হলো, কিন্তু শিকারের ভান করে তো পেট পুরবে না।

বেরিয়ে পড়লাম। ডেরা পেছনে ফেলে, বেশ পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি। শিকার আমাকে করতেই হবে আজ। খিধের জ্বালা আর কতো সহ্য করা যায়!

ইতিমধ্যে কয়েকটা খাল সাঁতরে পেরিয়েছি। তাতেই অনুমান করতে পারি কতদূরে চলে এসেছি। তবুও কোনও জীব মেলে না। আমাকে দেখে তো কাউকে পালাতেও দেখি না। তেমন দেখতে পেলে তো লুকিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে শিকার ধরবার চেষ্টা করা যেত।

কোন শিকার দেখতে না-পেলেও তো তার গন্ধ আগে পাওয়ার কথা। কিন্তু আজ নিজের গন্ধ এমন প্রবল লাগছে যে, তা ছাপিয়ে অন্য কোন গন্ধ নাকে যেন আসেই না। বাতাস যেদিকে চলেছে সে দিকেই এতক্ষণ চলছিলাম। সে-বাতাসে শুধু আমার ঘর্মাক্ত দেহের ঝাঁঝালো গন্ধ। এমন কেন ঘটছে? ভেবেই ব্যাপারটা বুঝে নেবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম—বাতাসের মুখোমুখি। কই, এখন তো আর নিজের গন্ধ নাকে আসে না।

আর দ্বিতীয় চিন্তা না করে বাতাসের মুখোমুখি এবার এগিয়ে চললাম। অনেকক্ষণ এগুবার পর অন্য কোন কোন জীবের গন্ধের ঝলক নাকে যেন লাগে। ভরসা আসে এবার নিশ্চয় শিকার মিলবে। খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে আস্তে আস্তে চলেছি। সচকিত কানে মাঝে মাঝে কিছু বেতাল শব্দও ধরা পড়ছে। তাতে বারবার আরও বেশি সচকিত হয়ে পড়ছি।

একটা বড় খালের পাশে পাশে চলেছি বাতাসের মুখোমুখি। সহসা ভারি ক্ষীণ মোলায়েম আওয়াজ কানে ধরা পড়ে। সচকিত ভাবে কিছুটা এগুলে অনুমান করতে বেগ পেতে হয় না—পাখির ডাকের মতো গাছের মাথা বরাবর ভাসা আওয়াজ, মাটির কোল ঘেঁষা আওয়াজ নয়। কু-উ-উ, কু-উ-উ,—মৃদু স্বরে বানরের ডাক।

তাই হোক, আজ বানব খেতে হবে। কিন্তু ওরা যে গাছের মাথায় লাফালাফি করে। আমিই বা কম কী গাছে উঠতে। কিছুটা তো উঠতেই পারি। কয়েকটা বানর নিচে চরের কিনারায় ঘাসের মুথো খুঁটছে আর খাচ্ছে। ঘাপ্‌টি মেরে ডালপালার শব্দে বুঝে ফেলি বেশ কয়েকটা গাছের উপরেও আছে! গাছটা কেওড়া গাছ, বেশ বড় ঝাঁকাল গাছ। ডালপালা পাতায় ঢাকা। আমরা মাটির জীব, উপরের দিকে তেমন দৃষ্টি দিতে পারি না। তা না পারলেও সাড়া-শব্দে ঠিকই বুঝে নিয়েছি, ওদের বড় একদল ঠিকই উপরে আছে। ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো এখনও কাছে এগুতে পারিনি। না, আর এগুতে গেলে হবে না। কালবিলম্ব করলে গাছের উপরের দল ভয়ার্ত কিচমিচ শব্দে সজাগ করে দেবে তলার সঙ্গীদের।

হয়েছেও তাই। সংকেত পেয়েই ঘাসের মুথো ফেলেই ওরা মাটি থেকে ক্ষিপ্র লম্ফনে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাছে উঠতে লাগে। আমিও তীরের মতো ছুটে এসে এক লাফে গাছের গুঁড়ি অবধি এসে পড়েছি। না, হলো না। মুহূর্ত মধ্যে ওরা মগডালে! না, কিছুতেই আজ ওদের ছাড়া নেই! নখ বিস্তারে হিঁচড়ে গুঁড়ি বেয়ে উঠলাম গাছটাতে। আমি একটু উঠতে না উঠতে ওরা ঝপঝপ করে যেন ঝুল খেয়ে পাশের গাছটির মগডালে গিয়ে পড়ছে। কোন পথ না দেখে আমিও ঝপাং করে মাটিতে লাফিয়ে পড়লাম; পড়েই এক উল্লম্ফনে পাশের গাছটির প্রথম ডালটি ধরে ফেলেছি।

ফেললে কী হবে! ততক্ষণে ওরা সে-গাছের মগডাল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আরও সামনের গাছটির মগডালে ঝুলে ঝুলে এগিয়ে গেল। ওরা যেন উড়ে চলেছে গাছের মগডালে মগডালে, আর আমি চলেছি ল্যাফিয়ে লাফিয়ে একটার গুঁড়ি থেকে আরেকটার গুঁড়িতে। কেউই নিঃশব্দে নয়। ওদের ভয়ার্ত কিচিরমিচির আর আমার হিংস্র গোঙানি ও হুংকার। বনাঞ্চল যেন তোলপাড়।

গাছের পর গাছ অতিক্রম করে চলেছি দু'তরফেই। হঠাৎ কী যে বুদ্ধি খেলে গেল!

একবার আমি ঠিক সামনের গাছটিতে উঠবার চেষ্টা না করে, সেটাকে পেছনে ফেলে তারও আগের গাছটিতে প্রথম ধাপে উঠে পড়েছি। বানরের দল তখন সে-গাছে পৌঁছয়নি। সবে ঝুল দিয়েছে এই গাছের মগডাল ধরবার জন্য। ঝুল দিয়েই দেখে আমি সে গাছে আগেই এসে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গ্যাঁক করে ধরবার জন্য হুংকার ছেড়েছি।

আমি তো অনেক নিচে এবং আমার বিলম্বিত থাবার নখাগ্র মগডালে পৌঁছবার কোনই সম্ভাবনা নেই, তবু তো বীভৎস ব্যাঘ্র-হুংকার। একটা বানর হতভম্ব ও বিহ্বল হয়ে আমার নাক বরাবর মাটিতে পড়লো। আর যায় কোথায়! বিদ্যুৎ বেগে মাটিতে পড়ে তাকে গক্ করে কামড়ে ধরেছি। আমার হিংস্র দাঁতের পংক্তিতে বিদ্ধ হয়ে বারেক দাপাদাপি করেছিল মাত্র।

আমার জীবনের প্রথম লব্ধ শিকার!

চার

প্রথম শিকার। আমার নিজস্ব প্রথম শিকার। আমি কতটুকুই বা বড় হয়েছি। তবু আমার খিদে মেটাবার এ অতি সামান্য উপকরণ। এক কামড় খেলে, আরেক কামড় পুরো হবেই না। তা হলেও এ আমার প্রথম শিকার—মুখে আবদ্ধ শিকারের দাপাদাপিতে সেই গর্বই অনুভব করছি।

মাথাটা উঁচু করে শিকারকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছি। একবার এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে নিলাম। তারপর ধীর পদক্ষেপে চললাম অন্যত্র। যেখানে আমরা শিকার করি সেখানে বসে আমরা খাই না। মায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এই সাবধানতার কথা আগেই জেনেছি।

বেশ-কিছুটা এগিয়ে মনে হলো, এ যেন আমার চেনা গাছ, চেনা খাল, চেনা বন-চত্বর। আমাদের ডেরার কাছেই তো!

অনুমান সত্য মনে হতেই ছোটখাটো খালগুলি পেরিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে চললাম। মুখের মধ্যে শিকার এলিয়ে পড়েছে! তার হাতপাগুলো আমার চলতি দেহের দোলায় চোখের সামনে দুলছে। মুখে তাজা রক্তের আস্বাদ উদগ্র। দ্রুত ডেরায় যাবার নেশা পেয়ে বসলো।

কিসের নেশা জানি না। তবে এসেই দেখি, মা চুপটি করে ডেরায় বসে আছে, কতোদিন পরে আজ মা-র সঙ্গে দেখা! মাকে কতো আদর করার কথা, আমার খুশির মেজাজ কতো ভাবেই না আমার জানাবার কথা। কিন্তু না, সে-সব কিছুই করি না। মা একটু গলা বাড়িয়ে আমাকে দেখছিল মাত্র। তার দিক থেকেও কোনও ব্যগ্রতা দেখি না। আমিও শিকার মুখে রেখে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়েছি। সে-গর্ব দেখাবার অছিলায় শিকারের হাত-পাগুলো সামান্য দোলাচ্ছিলাম এদিক-ওদিক। গর্ব! গর্ব হবেই বা না কেন? দ্যাখো না, তোমাকে ছাড়াই আমি শিকার করে নিয়ে এসেছি!

মা কিন্তু ঠিক যে-ভাবে বসেছিল, তেমনি ভাবেই চুপচাপ বসে আছে। কী জানি ওর কী মতলব, কীই বা ভাবছে। আমি দূরে বসে আমার লব্ধ শিকার ভক্ষণ করে ফেললাম সবটুকুই। মা একটুও এগিয়ে এলো না তাতে ভাগ বসাতে। খিদে শান্ত হতে আমিও সেখানেই বসে রইলাম চুপচাপ। আড় চোখে দেখছি; মা কী করে। দেখি, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করছে। চলেও গেল চকিতে আমার আড়ালে।

গেল বটে, আমি কিন্তু আগেকার মতো তেমন বিদায় বেদনা অনুভব করি না। মন যে

খারাপ হয়নি, তা নয়। তবে অসহায়ও বোধ করি না। মা তো দেখে গেল—তার সন্তান সাবালক হয়ে উঠেছে। সেটাই বোধহয় সে দেখতে এসেছিল। বুঝি না মায়ের মন!

বেশ ক'টা রাত কেটে গেল। একদিন ঘুরিফিরি, আবার ফিরে আসি ডেরায়। গায়ের রক্ত চন্‌মন্‌ করে। উঠতি-বয়েসে কেই বা এমন আটকে পড়ে থাকতে চায়। সেদিন মিছেমিছি অনেকদূর একটানা দৌড়ে গেলাম। এতদূর গেছি যে মন আর চায় না ফিরে আসার কথা ভাবতে। খিদে পেয়ে বসেছে, শিকারসন্ধানে এবার মত্ত হতে চাই। ফিরে আসার কথা ভুলেই রইলাম। কিসের জন্য ফিরব? আমি কি জলে পড়েছি? মস্ত এক গাছের শুঁড়িতে আমার সুতীক্ষ্ণ নখ বসিয়ে আঁচড়ের টানে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলাম। যেন আমার বাহুর অসীম শক্তি আর ধারালো নখের ক্ষমতা পরখ করে বেরিয়ে পড়লাম শিকার সন্ধানে।

শিকারমত্ততার জন্য বেরিয়ে পড়েছি বললে সবটা বলা হয় না। আগত যৌবনের আরেক নেশাও পেয়ে বসেছে। চিনতে চাই বনকে। কী অপূর্ব এই বন! বন তার ছায়ায় আবৃত করে আমাকে যেন বাঁচিয়ে রেখেছে। পারি না আমরা সহ্য করতে ফাঁকা আলো আর রোদের ঝলসানি। কতদূর এই বনের ছায়া—তা দেখবার ব্যাকুলতা দেখা দেয়। আমি যদি চলে যাই সোজা একমুখো, তাহলে কোথাও গিয়ে কি এর শেষ মিলবে? না কি এর শেষ নেই। আমার খাদ্য কোনও কারণে কি নিঃশেষ হয়ে যাবে এই বনে? শিকার খুঁজে খুঁজে যখন হন্যে হয়ে যাই, তখন এক-এক সময়ে তা যে মনে হয় না, তা নয়।

কিন্তু না, শেষবেশ তো খাদ্য মিলে যায়ই। খাদ্যের অভাব কিসে? এক-এক বনে এক-এক শিকারের জীব যেন গম্‌গম করে। কোন বনে হরিণের সন্ধান পাই পালে পালে। কোথাও বা শুয়োরের দেখা পাই ডাইনে বাঁয়ে। কোথাও দেখি খরগোসের মেলা। কোথাও বা সজারুর ঝমঝমানি আমাকে প্রলুব্ধ করে চারিদিক থেকে। মাছের তো সীমা পরিসীমা নেই—আর তা যে ছোট, বড় ও কত রকমের তা বলার নয়।

আমি দেখতে চাই, আমি জানতে চাই আরও কতরকমের খাদ্য আছে এই বনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, আর সে-সব শিকার করার কত অভিনব সব কায়দা আয়ত্ত করতে হবে ঠকে ঠকে, ঠেকে ঠেকে।

দেখতে চাই ও জানতে চাই—এই গোঁ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি বনরাজ্যে আমার যৌবনের রক্তে জাগ্রত নেশা নিয়ে। কত দিন, কত বর্ষা পার করে দিয়েছি এই নেশায় তার ইয়ত্তা নেই। বলতে গেলে, এই নেশার ঘোর কাটে মাত্র বুড়ো হবার উপক্রম হলে।

এই ঘোরার পেছনে আরও একটা আশা যে মনের তলে সুপ্ত হয়ে ছিল না—তা বলতে পারি না। কিন্তু যৌবনের প্রথম দাপটে তা ভুলে থাকলেও শেষ দিকে তা আর চাপা ছিল না। কিন্তু সে পরের কথা পরে হবে।

ঘুরে বেড়িয়েছি মানে সাঁ সাঁ করে ছুটেছি, তা নয়। এক-এক বনে হাজির হয়ে বিচরণ করেছি সেখানে কয়েকটা বর্ষা কাটিয়ে। তা না হলে তো সে বনের আটিঘাঁটি জানা যায় না, না পাওয়া যায় বিচিত্র খাদ্যবস্তুর সন্ধান, না আয়ত্ত করা যায় শিকারের অভিনব সব পন্থা।

বনকে চিনে রাখবার, তাকে সনাক্ত করার মানসে আমরা এক-এক বনকে চিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে। যে-বনে আমার জন্ম তাকে আমি চিনি 'ডেরার-বন' বলে। তারপর বড় নদীটার কোল ঘেঁষে যে সুন্দর গাঢ় সবুজ বন চলে গেছে তাকে আমরা জানি 'বানর-বন' বলে। বানর তো আমাদের বনে সর্বত্র আছে, কিন্তু এই বনে এতো বানর যে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিকার করা আমাদের দায় হয়ে উঠে। গাছের মগডালে বসে দূর থেকে আমাদের

ইঙ্গিত পেতেই বনের সব জীবকে যেন আগে থাকতেই ওরা সতর্ক করে দেয়।

'বানর-বন' ছাড়িয়ে আরও এগুলে আমরা হাজির হব 'পাখি-বনে'। এখানে এত পাখির আনাগোনা যে বলার নয়। পাখি থাকলে আমাদের বিশেষ আক্ষেপ করার ছিল না। তবে এইসব পাখির ডিমের লোভে এই বনে সাপের অন্ত নেই। সাপের সঙ্গে অবশ্য আমাদের বিশেষ বিবাদ নেই। সাপেও আমাদের সঙ্গে বিশেষ বিবাদ করতে আসে না। সাপের মাংসে আমাদের বিশেষ রুচি নেই। এদের রঙ-বেরঙের আঁকা-বাঁকা সড়সড়ে কিলবিলে দেহগুলি দেখলে আমাদের কেমন যেন গা-শিরশির করে। তাই সাপকে এড়িয়েই চলি। তাছাড়া সাপের ছোবল নিয়ে আমরা বড় মুশকিলে পড়ি। বন্য সব জীবেরই আত্মরক্ষা বা আক্রমণের কিছু না কিছু অস্ত্র থাকে; আর আমরা সে-অস্ত্র এড়িয়ে বা কাটিয়ে আক্রমণ করি। সাপের তো হাত-পায়ের বালাই নেই। মুখই ওদের একমাত্র অস্ত্র। ছোবল-উদ্যত মুখকে সহসা ওদের লম্বা ঘাড় বাঁকিয়ে আমাদের মুখোমুখি করে দিতে পারে। কাজেই পাল্টা আক্রমণে ওদের ঘায়েল করতে আমরা বড় বিব্রত বোধ করি। ওদের এড়িয়ে চলাই ঠিক। ওরাও আমাদের এড়িয়ে চলতে চায়। আমরা তো ওদের খাদ্য নই। খামোকা ওরা আমাদের ভোটকা গন্ধ শুঁকতে আসবে কেন?

'পাখি-বনে'র পরেই আছে 'কুমির-বন'। এখানকার ছোট ছোট নদীতে এত কুমির যে ওরা ভেসে থাকলেই গোটা নদীটাই যেন কুমিরে ঢাকা পড়ে যায়। আমরা হলাম ডাঙার জীব। ওরা ডাঙায় উঠলে না-হয় লড়াপেটা করতাম; কে হারতো, কে জিততো তা বলা না গেলেও ওদের দাঁতের কামড়ে পড়লে আর কিছু না হোক হাত-পা পঙ্গু হতে আর কতক্ষণ! তাছাড়া ওদের কাঠের মতো শক্ত চামড়া ছেদ করে মাংস বের করা দায়। তাই, মিছেমিছি ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাই না। ওরাও আমাদের শক্তির কথা জেনে আমাদের বিশেষ ঘাঁটাতে চায় না। না চাইলেও, আমাদের বনে চলাফেরা করতে হামেসাই খাল-নদী পারাপার হতেই হয়। তাই 'কুমির-বনে'র নদী-নালা আমাদের চিন্তায় ফেলে।

আরও দূরে গেলে দেখা মিলবে—'মৌ-বন', 'হেঁতাল-বন', 'গরান-বন' এমনি ধারা আরও অনেক বন। কিন্তু আমাদের দেওয়া নাম শুনে কারও পক্ষে সুন্দরবনে কোনও কিছু হদিশ করতে পেরে ওঠা দায়। তার চেয়ে একদিন আধো-জাগা আধো-ঘুমের ঘোরে কতকগুলি নাম যেটুকু শুনেছিলাম তার কিছুটা বলে দিলে আমার চারণ-ভূমিকে চিনবার সুবিধা হবে নিশ্চয়। কেমন করে অতো কাছ থেকে এই নামগুলি শুনেছিলাম, সে-ঘটনা আজও আমার কাছে এক রহস্য হয়ে আছে। তার কূল-কিনারা আজও আমি করত পারিনি। আমার সে কাহিনীটি পরে শুনে কেউ যদি হদিশ করতে পারে তো ভালোই হয়।

রোদ ওঠার দিকে যে খুব বড় নদী তার নাম রায়মঙ্গল। তোমরা কী সব দিক-বিদিক বলো, সে-সব আমার বোধগম্য নয়। আমরা দুটো দিকই চিনি—রোদ ওঠার দিক আর রোদ চলে যাবার দিক। আরেকটা দিক যদি বলো সে তো শুধু নীল জল আর নীল আকাশে একাকার—সমুদ্দুর। সেদিকে কে এগুবে? আমরা মরতেও এগুই না। রায়মঙ্গল নদীর পাশেই নীল জলের কোল ঘেঁষে যে বনভূমি সে হলো—'গোনা'। এই 'গোনা'য় ছিল আমার ডেরা যেখানে আমি মায়ের সঙ্গে অনেকগুলি বর্ষা কাটিয়েছি। আমার একান্ত পরিচিত স্থান। ছেলেবেলা যে পরিবেশে কাটে, তাকে কি কেউ ভুলতে পারে? আমরাও পারি না। যেখানে গাছ-গাছড়া, নদী-নালা জীবনে প্রথম চিনেছি, যেখানে জীবনের প্রথম শিকারে বেরিয়েছি মায়ের নির্ভয় নিরাপদ আশ্রয়ে—সে কি কেউ ভুলতে পারে? আমিও ভুলিনি।

'গোনা' ছাড়িয়ে রায়মঙ্গল বরাবর এগুলে পাবে একে একে—'বাগমারা', 'চাঁদখালি', 'আড়বেশি'। 'আড়বেশি' ছেড়ে আর বেশি এগুনো যাবে না। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। সাদা আলো দেখা যাবে। অমন খোলামেলা অঞ্চলে আমরা মোটেই যেতে চাই না। মনে হয় আমরা বুঝি বনের নিরাপদ আড়াল ও আশ্রয় হারিয়ে ফেললাম। কেমন যেন তখন অসোয়াস্তি বোধ করতে থাকি। আমরা তো বেশি উপর দিকে বিশেষ তাকাই না। বনের গাছের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে আমাদের নাক বরাবর তাকাই। তেমনভাবে তাকালে ফাঁকা জায়গাকে সাদাই মনে হবে। তাইতেই তো টানা সাদা কিছু দেখলেই সেদিকে এগুতে আমরা সাতবার ভাবি।

'আড়বেশি' থেকে যদি এগিয়ে যাও এবার রোদ চলে যাবার দিকে—প্রথমেই পাবে 'সজনেখালি'। তার পাশেই রোদ চলে যাবার দিকে বিশাল নদী 'মাতলা'। এই 'মাতলা' নদী বরাবর নীল জলের দিকে এগুলে আসবে 'পীরখালি'। তারপর পর পর পেয়ে যাবে—'মাতলা বন', 'চামটা', 'গোসাবা', 'ছোটহোরদি' আর 'মায়াদ্বীপ'। তারপরই নীল জলরাশি, আর তো এগুতেই পারবে না। এবার রোদ ওঠার দিকে এগুলেই ফিরে চলে আসবে 'গোনা'—সেই আমার 'ডেরা-বন', সেই যেখানে আমি কাটিয়েছি মায়ের সঙ্গে অনেক বর্ষা।

এই গোটা বন-এলাকা হলো আমার জীবন-ভোর চারণ-ভূমি। যে চারণ-ভূমিতে আমার খাদ্যের যেমন অভাব নেই, তেমনি আমার দাপটেরও শেষ নেই।

পাঁচ

দাপটের শেষ নেই—বললাম বটে, কিন্তু এই দাপট এমনি-এমনি হয়নি। কত না কসরৎ করে তবে এই দাপট করা যায়!

প্রথম প্রথম ভাবতাম আমাদের দাপটকে কে রুখবে! আমাদের তো মোক্ষম সব অস্ত্র আছে—আছে অসীম শক্তিধর দুই বাহু, আছে নখ-বিস্ফারিত দুই থাবা, আছে বিশাল ধারালো দাঁতে পিষ্ট করার ক্ষমতা, আছে বজ্রসম হুংকার। না, এতেই আমাদের দাপট করা সম্ভব হতো না। আমাদের আরও অস্ত্র আছে—আমাদের তীক্ষ্ণ ঘ্রাণ-গ্রহণকারী নাসারন্ধ্র, আমাদের শব্দভেদী আক্রমণের সহায়ক কর্ণযুগল, আমাদের রোষকষায়িত ভীতি-বিহ্বলকারী গোল-গোল রক্ত চক্ষুদ্বয়, আর সর্বোপরি আছে আমাদের ক্ষিপ্র লম্ফনকারী দেহের কল্পনাতীত গুরুভার।

কিন্তু শুধু অস্ত্র থাকলেই হয় না। সেই অস্ত্রকে ব্যবহার করার মতো বুদ্ধি তো আয়ত্ত করতে হবে। এই আয়ত্ত তো একদিনে হয় না, জীবন-ভোর ঠেকে ঠেকে আমরা আয়ত্ত করেছি।

'বাগমারা' বন, আসলে এর নাম হওয়া উচিৎ ছিল 'বানর-বন'। কেন না জানি এতো বানর এসেছে এখানে মরতে। এদের ধরাও হুজ্জত আর খেয়েও পেট পোরে না। সেবার শেষরাতে চলেছি রায়মঙ্গল নদীর কূল ধরে। ঠিক কূল নয়, কূল থেকে বেশ খানিকটা দূরে নদী বরাবর চলেছি। শীতকাল, রোদ উঠতে না উঠতে হরিণের দল আসবে চরে রোদ পোহাতে। আমরা মাংস খাই, তাতে আবার নিশাচর; রোদের ঝলক আমাদের সহ্যই হয় না, কেমন যেন গা চিড়বিড় করে ওঠে। কিন্তু ওরা তৃণভোজী, তাতে আবার দিনের জীব, ভারি রোদ-বিলাসী। তার উপর আবার চর বরাবর সার বেঁধেছে কেওড়া গাছের ঝাড়।

কেওড়ার কচি পাতা ও ফলের প্রতি ওদের বড্ড লোভ।

আর আমাদের লোভ ওদেরই তাজা রক্তে ও মাংসে। তারই সুযোগ-সন্ধানে এমন ভোর রাতে এখানে আসা। জায়গা মতো এসে বসে আছি ভালো করে আড়াল নিয়ে। সারা রাতটাই চরে বেড়িয়েছি এদিক ওদিক বনের মালোতে। কোনও কিছু মেলেনি। এবার একটু বসে পড়তেই ঝিম এসেছে। কিন্তু দারুণ খিদেয় ঝিম আর ঘুমে পরিণত হয় না। হঠাৎ হরিণের গন্ধের ঝলক। গন্ধ পেতেই মাটি ও শূলো ঘেঁষে ঘাপটি মেরেছি। গন্ধ যতটা পেয়েছি, তাতে বলতে পারি—এক-আধটা হরিণ নয়, দলবদ্ধ হরিণের পাল। তা না হলে এমন গন্ধ আসে না। গন্ধ পেতেই উঁকিঝুঁকি মেরে বুঝবার চেষ্টা করছি—কোথায় হতে পারে?

গন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিয়েছি এবার শিকার আমার সাধ্যের মধ্যে। গোনা' বনে শিকার করতে করতে এ শিক্ষা আমার হয়েছে : আমি যখন শিকারের গন্ধ পাই তখন শিকার আমার গন্ধ কিছুতেই পায়নি বলে নিশ্চিত ধরে নিতে পারি। যে-বাতাস শিকারের গন্ধ আমার নাকে এনে দেয়, সে-বাতাস তো আমার থেকে ঘুরে শিকারের কাছে যায় না। বাতাস যে বনেও টানাভাবে বয়ে যায় একদিক থেকে আরেক দিকে। তাই চোখে দেখলে বা কানে শব্দ পেলেই আমি আর কখনও তক্ষুনি শিকারের জন্য এগিয়ে যাই না। তখন লুকিয়ে আমাকে এমন স্থান নিতেই হবে যেখান থেকে আমি শিকারের গন্ধ পেতে পারি। অবশ্য সে সময়ের মধ্যে শিকার যেন কোনভাবেই আমার সন্ধান না পায়। এ বড় দুরূহ কাজ। অনেক ঠেকে গন্ধ সম্পর্কে এতো বেশি সজাগ হয়েছি।

আমাদের গায়ের গন্ধ যে বড্ড তীব্র—এ কথা মুহূর্তের জন্যও আজকাল ভুলি না। 'গোনা'-বনে কতবারই তো দেখলাম—আমি আগে শিকারকে দেখেছি, শিকার আমাকে দেখতে পায়নি, গন্ধের কথা ভুলে লোভে পড়ে আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে এগুতে লেগেছি ; বেশ দেখছি, শিকারের দৃষ্টি অন্যত্র ; হঠাৎ দেখি, শিকার সচকিত হয়েছে। শুধু সচকিত নয়, পলকের মধ্যে প্রাণপণে ছুট দিয়েছে। কিন্তু ছুট দিয়ে কখনও তো সে-শিকার আমার দিকে আসেনি। আমার ঠিক উল্টো দিকে বিদ্যুৎ বেগে পালিয়েছে।

আবার যখন শিকার না দেখতে পেয়েও শুধু গন্ধ পেয়ে তার দিকে আড়ালে আড়ালে এগিয়েছি, তখন কোন শিকার এমন আগেভাগে পালায়নি।-তাই নিবিড় বনাঞ্চলে আমাদের নাসারন্ধ্রই এক অন্যতম অস্ত্র। শুধু অন্যতম নয়, হয়ত বা এক মহা অস্ত্র।

আজ শিকার আমার সাধ্যের মধ্যে মনে হতেই গুটি মেরে দক্ষতার সঙ্গে আড়ালে আড়ালে এগিয়েছি গন্ধের গতিপথ ধরে। দূরে গাছের ছায়ায় হরিণপালের চলাফেরার আভাসও পেতে দেরি হয় না। এবার দম নিতে মুহূর্তের জন্য নিঃসাড়ে অপেক্ষমান। বহু পরিশ্রমে শূলোর ফাঁকে ফাঁকে আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে এতটা পথ এসেছি! কিন্তু নিশ্চলতা শুধু দম নিতে নয়। সামান্য আরেকটু এগুতে হবে শিকারের দিকে। তবেই বিদ্যুৎ গতিতে এক লাফে ওদের একজন না-একজনকে থাবার আঘাতে নখবিদ্ধ করতে পারব। কিন্তু এই আরেকটু এগুনোর মধ্যেই আমাদের মোক্ষম দক্ষতা দেখাতে হবে। দেখাতে হবে আমরা কী সাবধানী আর কী চতুর। তারই জন্য এই মুহূর্তের নিশ্চল প্রতীক্ষা।

মুহূর্তের নিশ্চল অপেক্ষা আমাকেও সে-বারের মতো নিশ্চল করে দিল। হঠাৎ গাছের মগডাল বেতালে দুলে ওঠে ; হরিণের পাল সঙ্গে সঙ্গে তাদের কান খাড়া করে ঘুরিয়ে ধরে। মগডালে বানরের আর্তনাদের আভাষ পেতেই প্রাণপণে ছুট দিল। বানরগুলিও তাদেরই

গতিপথে ডালে ডালে তরতর করে এগিয়ে গেল।

আমি হতভম্ব। তাহলেও হাল ছাড়িনি। আপসোসে ভারাক্রান্ত না হয়ে চার পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। প্রকাশ্য আলোকেই মাথা উঁচু করে এদিক-ওদিক দেখে নিলাম। বুঝে নিলাম নদীর কূল ধরেই ওরা সোজা ছুটে পালিয়েছে। বনের গহনে এবার অনেক ঘোরাপথ ধরে ছুটতে ছুটতে ওদের সন্ধানে আবার চললাম। কেমন যেন রোখ চেপেছে মাথায়।

আপাতত আড়ালে চলার চাইতেও দ্রুত এগিয়ে যাবার প্রশ্ন। মাথা সামান্য নিচু করে ছুটেছি। বেশ কিছুটা ঘোরাপথে এগিয়ে আবার নদীর চরের লাইন ধরেছি। আশা, নদীর সীমানায় মাঝে মাঝে উঁকি মারলে আঁচ মিলবে ওরা কোথায় আবার নিশ্চিন্ত মনে গাছের আলোছায়ায় চরতে শুরু করেছে। আমার আশা মিথ্যে নয়। অনতিদূরে বন হঠাৎ বেঁকে নদীর মধ্যে যেন খানিকটা মাথা বাড়িয়েছে। আর ট্যাকের দীর্ঘায়িত সেই চরে দু-একটা বানর ঘাসের মুথো খুঁটছে। ভালো করে চেয়ে দেখি, হরিণের পাল তাদেরই পাশে ছায়ার মতো এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে।

আমার আশা মিথ্যা না হলে কি হবে, আমি শঙ্কান্বিত। কারণ, আমি কতবারই তো প্রতারিত হয়েছি। নিশ্চিত বলে দিতে পারি, বানরেরা অমন নিশ্চিন্তভাবে চরে ঘাসের মুথো খুঁটে খুঁটে খেলে কী হবে, ওদের আরেক দল নিকটেই গাছের উপর আছে। পাহারাদার হয়ে আছে। তাই বলে চুপচাপ বসে পাহারা দেয় না। অতিচঞ্চল এই বানরের দল এ-ডাল ও-ডাল ঘোরা-ফেরা করে আর কচি পাতা ও ফল খাবার তালে থাকে। তারই ফাঁকে ফাঁকে কেউ এদিক কেউ ওদিক নজর দিয়ে লুকিয়ে পাহারা দিতে থাকে।

বসে রইলাম। ভালোভাবে আড়াল নিয়ে বসে রইলাম। প্রথম যৌবন আমার, তাতে ভীষণ খিদে। চুপচাপ কি বসে থাকা যায়। না, যায় না। বে-হিসাবী আক্রমণের জন্য ইস্‌পিস্ করছি। তবুও নিজেকে কোনমতে সংযত করে রেখেছি। না করেও লাভ নেই। হুংকারে ও ক্ষিপ্রতায় বন কাঁপিয়ে তুলতে পারি এখন। কিন্তু তাতে আমার চেয়েও ক্ষিপ্রতর ওরা কোথায় উধাও হবে তার ঠিক নেই। নিজেকে বোঝালাম সংযত হতে। কাজ হাসিল যদি করতে চাও তবে আরও সংযত হও। বসে আছি, মাঝে মাঝে অন্যদিকে মন চলে যায়। হঠাৎ একবার মনে হলো,—আচ্ছা, ওরা আর কতক্ষণ এদিকে চরবে? গাছের তলা আর নদীর চর তো ছায়ায় ঢেকে গেল বলে। ওরা তখন নিশ্চয় উল্টো দিকে সেই দূরের নদীর ধারে ঢলে পড়া রোদে চরতে যাবে।

কিন্তু সেখানে যাবে কোন পথ ধরে? সেও তো আমার জানা, হরিণের চট্ কোথা দিয়ে কোথায় গেছে। পালে পালে হরিণ চরে, তাদের খুরের চাপে শুকনো চাতারেও পায়ে-হাঁটা পথ হয়ে যায় বনের বুকে। আর এই চট্ চলে যায় সামান্য এঁকেবেঁকে গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে এড়িয়ে বনের গহনে। এই চট্ অনুসরণ করে হরিণের পাল ক্ষিপ্রবেগে উধাও হয়ে যায় স্বচ্ছন্দে। এই চট্ চিনতে কারও অসুবিধা হয় না। চেরা-খুরের ঘন ঘন পদচিহ্ন তো আছেই, তাছাড়া পথময় থাকে ওদের নাদির গন্ধ।

মনস্থির করে ধীরে ধীরে আর সাবধানীর মতো আগে থাকতেই চললাম সেই উল্টোদিকে হরিণের চট্ ধরে। ঠিক চট্ ধরে নয়, বেশ দূরে দূরে। কেন না আমরাও যে-পথে যাব সেখানেও তো আমাদের পদচিহ্ন ও গন্ধ থেকে যাবে। হরিণের ঘ্রাণশক্তি আমাদের চেয়েও এতটুকু কম নয়, বরং বেশিই হবে। ওদের কালো কালো নাসারন্ধ্র যে ভাবে উঁচু করে ধরে তাতে তো তাই মনে হয়। এত হিসেব-নিকেশ করে না চললেও বনে ঘোরাফেরা করা যায়, কিন্তু তাতে শিকার মেলা দায়।

চলেছি তো চলেছি। অনেক দূর এসে গেছি। বেলাও ঢলে পড়ার উপক্রম। এবার বাতাস বন থেকে নদীর দিকে যাবে, অবশ্য বাইরে যদি প্রবল বায়ু-প্রবাহ না থাকে। বাতাসের গতি বুঝে আমাকে দ্রুত তৈরি হতে হবে। মুখখানা বেশ উঁচু করে ধরলে আমাদের গোঁফ আর থুত্‌নির ফুরফুরে লোমের দোলানিতে বাতাসের গতি বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

হঠাৎ সচকিত। দেখি, সামনেই কয়েকটা গাছ কাৎ হয়ে পড়ে আছে, আর আশপাশে খণ্ড খণ্ড কাঠ ছড়িয়ে আছে। ভালো করে চারদিক নজর দিলাম—কোনও বলবান জীব ধারে কাছে আছে কিনা। না, সবই চুপচাপ। কাটাগুঁড়ি শুঁকে বুঝে ফেলেছি অনেকদিন আগেই এই কাণ্ড হয়েছে, আজ বিচলিত হবার কিছু নেই। কাটা গাছটাই বেশ পছন্দ হলো, ডাল-পালা পড়ে বেশ আড়াল মতো হয়ে আছে। সেই আড়ালেই থাবা ও পা বেশ করে মাটিতে চেপে বসিয়ে নিয়ে ঘাপটি মেরেছি। গোটা শরীরটাই লেপটে দিয়েছি মাটির মধ্যে শূলোর ফাঁকে। নিঃসাড়, নিঃশব্দ অপেক্ষা আমার খাদ্য আহরণের।

আমি তো ওদের থেকে হাজারগুণ শক্তিশালী। আমার তো শঙ্কান্বিত হবার কিছু নেই। একেবারে কিছুই নেই বললে ভুল হবে। চাতুরিতে এবং ক্ষিপ্রতায় আরেকবার হার মানবার লজ্জাটাও তো কম শঙ্কার বিষয় নয়। সেই শঙ্কায় শঙ্কান্বিত আমার নিশ্চল অপেক্ষা।

আর কতকাল এমনভাবে থাকতে হবে কেন জানে! অস্থির হয়ে উঠবার উপক্রম। এমন সময়ে সহসা নাসারন্ধ্রে যেন ক্ষীণ আভাস ধরা পড়ে। ওরা ঠিকই আসছে। চট্ ধরেই যেন এগিয়ে আসছে। আমাদের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ হলেও প্রখর নয়। খুব দূরের জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় না। তা হলেও বেশিক্ষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতে হয় না। অনেকগুলিই লাইন বেঁধে সামনে এসে গেছে। পাছে ডালপালার আড়ালে থেকেও আমার জ্বলজ্বলে চোখ ওদের নজরে আসে তাই আমার চোখের চাহনির তীব্রতা কমিয়ে ছোট ছোট চোখে আরও ঘাপটি মেরে রইলাম। হাত-পা ইশপিশ করতে শুরু করেছে, থাবার নখও বিস্ফারিত হবার জন্য উন্মুখ।

লাইনের প্রথমেই আছে বড় একটা শিঙেল। ওর পিঠের উপর ছড়ানো দীর্ঘ ডালপালা বিস্তৃত শিং দেখে কেমন যেন বিরক্তি বোধ হলো। দাঁতের কামড় বসাতে গিয়ে আমার নাক-চোখ-কান না বিধ্বস্ত হয়ে যায় শেষটায়। মুহূর্ত মধ্যে স্থির করে ফেলেছি ওকে এড়িয়ে পেছনের একটা মায়া-হরিণকেই ধরতে হবে।

ওদের পথের সামনেই ছোট খাদ মতো। শিঙেল খাদে না নেমেই টপ্‌কে পার হলো। তার দেখাদেখি পেছনেরটাও টপ্‌কে গেছে। আর দেরি করতে ভরসা পাই না। শিঙেল আমাকে ছাড়িয়ে গেছে, আমার গন্ধও একবার পেয়েও বসতে পারে। মুহূর্তমধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রায় নিঃশব্দেই, কেননা হুংকারে ওদের কাউকেই তো ভীতগ্রস্ত করার আবশ্যক নেই। ঘাড়টাই আমাদের লক্ষ্য। অন্য কোথাও ধরলে নিরীহ হরিণও যে তাঁর ধারালো খুরের চাটিতে কীভাবে ক্ষত-বিক্ষত করতে পারে তার অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমি এখন অভিজ্ঞ হরিণ-শিকারী। এক কামড়ে ঘাড়টা চেপে ভেঙে দিলাম। যাদু যাবে কোথায়! সকাল থেকে বিকেল অবধি কীভাবেই না ধৈর্য ধরেছি আর পরিশ্রম করেছি। শুধু খাদ্যের জন্য নয়, প্রতিহিংসার স্পৃহাও জেগে উঠেছে মনে।

ছয়

'আড়বেশি'-বন চিরকাল আমার মনে থাকবে। কয়েকটা বর্ষা কাটাতে না কাটাতে সেই 'আড়বেশি'-বনে এবার এসে গেছি।

এক নতুন ধরনের একদল জীবের সঙ্গে এখানেই প্রথম দেখা। এরা বনবাসী নিশ্চয় নয়। তা যদি হতো তাহলে তো এতদিনে বনের মাঝে একদিন না একদিন দেখা হতোই। এই প্রথম এদের সঙ্গে বনের চত্বরে আমার দেখা।

কিন্তু এরা কী ধরনের জন্তু! মা তো আমাকে এদের নিয়ে কী করবো তা কোনও দিন শেখায়নি। আমাকে সঙ্গে নিয়েও কোনদিন এমন জন্তুর সামনেও তো যায়নি। এরা কি আমাকে তেড়ে আসবে? তেড়ে এলেই বা কীভাবে আমাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করবে? কিছুই জানি না। ছোট বা বড় যে-কোনও জন্তুর সামনে আমরা যে-ভাবে সাবধানী হই, অভ্যাস মতো তেমনি আড়াল নিয়ে ঘাপ্‌টি মেরেছি। ইঁদুরের মতো একটা ছোট্ট জীব হলেও, আগে থাকতে যদি তার সঙ্গে পরিচিত না থাকি তা হলে তো কথাই নেই, আমরা তক্ষুনি পিছু হটে ঠিক শিকাবির মতো ওৎ না পাতলে ভরসা পাই না। শত্রুর আচমকা আক্রমণে আমরা কিছুতেই নিজেদের বিহ্বল হতে দেব না। কাপুরুষ বলে কেউ ঠাট্টা করলেও না!

ঘন শুঁড়ির আড়াল থেকে দেখে নিতে চাই এরা কারা? এরা কি আমাদের মাংস খাবার মতলবে বনে এসেছে? লক্ষ্য করতে করতে সহসা স্মরণে আসে—না, এদেরই আবছায়া মূর্তি দূর থেকে কতবারই না দেখেছি! হ্যাঁ, নদীর ওপর চলতি-নৌকোতেই দেখেছি। তখন তো মনে হতো এরা চলতি নৌকোরই একটা অঙ্গ। এদের যে একটা আলাদা সত্তা আছে, এরা নৌকো থেকে বিচ্ছিন্ন একটা আলাদা জন্তু—তা তো তখন ভাবিনি! কোনদিন তা মনেও হয়নি!

অদ্ভুত এই জীব! চার-হাত-পা আমাদেরই মতো। বেশ দেখছি, পেছনের পায়ের ওপর ভর করে এরা কেমন তরতর করে এগিয়ে চলেছে। সামনের থাবায় ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে গাছের ডালের মতো লম্বা লম্বা কী সব জিনিষ। হাড় বা লাঠি, না হয় আর কিছু-বা।

এরা আত্মরক্ষা বা আক্রমণ করেই বা কী ভাবে। এরা কি মুখ দিয়ে কামড়ায়! কিন্তু এদের মুখ ও দাঁত যে বড় ছোট্ট ছোট্ট বলে মনে হচ্ছে। তবে কি এরা শুধু ঝোলান থাবা দিয়ে জাপটে ধরে শিকার করে? হবেও বা। লম্বা আঙুল লক্ষ্য করলে নজরে আসে, কিন্তু আমাদের মতো তো বিস্ফারিত বাঁকা নখ দেখতে পাচ্ছি না।

হাঁকডাক তো এরা বিশেষ দিতে পারে বলে মনে হয় না। বেশ দেখতে পাচ্ছি, কান খাড়া করে কিছু কিছু শুনতেও পাচ্ছি—এরা কী-সব একে অন্যেকে হাত, ঠোঁট ও চোখ নেড়ে বলাবলি করে। ভারি মজা লাগছে এই জন্তুদের দেখতে।

দল পাকিয়ে ক'জনে মিলে বনের চত্বর দিয়ে চলেছে। আমরা তো এক-সময়ে একজনকেই মাত্র আক্রমণের লক্ষ্য করি। আচ্ছা, আমি যদি এখন একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাহলে অন্যেরা তখন কী করবে? হরিণের পালের মতো তখন বাকি সবাই কী পালিয়ে বাঁচতে চাইবে? না তারা মৌ-মাছির মতো সবাই মিলে আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে আক্রমণ করবে?

এতো সব জিনিষ প্রথমেই জানতে হবে আমাকে। তা না হলে বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লে বিপদে পড়ে যেতে পারি। তাই ঠিক করে ফেলেছি—আজ কিছু করব না, সারাদিন

ওদের আড়ালে থেকে আর পিছুপিছু ঘুরে বুঝে নিতে হবে এই অদ্ভুত জীবগুলোর মতিগতি। তারপর অন্য একদিন ওদের মাংস আস্বাদ করার কথা না-হয় ভাবা যাবে। মাংসে নিশ্চয় রসালো হবে ; বানর, হরিণ বা শুয়োরের মতো তো এদের দেহ লোমে ঢাকা নয়।

কিন্তু সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছি ওদের ঐ থাবায় ঝোলানো লাঠিগুলো নিয়ে। লাঠিগুলো তো হরিণের সিং থেকেও বেশ লম্বা। কী জানি, ওগুলো দিয়েই হয়ত ওরা আমাকে খুঁচিয়ে মারতে চাইবে।

এরা তো খানিকটা বানরের মতো দেখতে। তাহলে কী হবে, এরা তাদের চেয়ে অনেক বড, অনেক উঁচু। বানর মারতে তো এতো ভাবতে হয় না। তারা আমাদের দেখেই ভয়ে মরে, পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করে। কোনমতে জাপটে ধরলেই হয়—তা থাবাই মারো, বা নখ বসিয়ে দাও, বা কামড়ে ধরো। একটা কিছু করলেই তখন ওরা অক্কা পেয়ে যায়।

মনে হয়, বানরের চেয়ে এরা অনেক শক্তি রাখে। সামনা-সামনি গেলে লম্বা হাতে লাঠিসোটা নিয়ে আমাকে কী বিপদে ফেলবে কে জানে ? কালো চুলে ঢাকা মাথাটা তো দেখতে বেশ শক্তই মনে হয়। হ্যাঁ, মাথার নিচেই সরু ঘাড়খানাই থাবা মারবার জুতসই জায়গা। কিন্তু তাও তো কম উঁচুতে নয়! লাফের সঙ্গে নিশ্চয় আমাকে জোড়া পায়ে দাঁড়িয়ে নিতে হবে। থাবা মারতে হবে আমার দেহের চাপে হয় পেছন দিয়ে, না-হয় পাশ দিয়ে। নয় তো ওদের লম্বাটে বাহু দিয়ে আমাকে কী বিপদে ফেলে কে জানে! একবার মাটিতে ফেলতে পারলে তো কথা নেই—তখন কার সাধ্য আছে আমার সঙ্গে যুঝবে!

আর ভাবতে পারি না। কিন্তু ওদের মতলবখানা কী ? কেন মরতে এসেছে আমার মুলুকে! বেশ দ্রুতই এগিয়ে গেল একটা খাল বরাবর। আমিও দূর থেকে বেশ আড়াল নিয়ে অনুসরণ করে চলেছি, যেন ওরা আমার কোনও গন্ধ বা সন্ধান না পায়।

না, আর তো ওরা এগোয় না।...ঝট্ করে বসে পড়েছে। আমার থাবার আঙুল চিড়বিড় করে ওঠে। তবু সংযত হয়ে আছি। হাতে লাঠি ছিল, সেটা কাঁধে তুলেছে।

আমার কাছে অবোধ্য হয়ে ওঠে, কেন ওরা বসে পড়েছে। সেটাই ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করি...এমন সময় ভীষণ এক চাপা আওয়াজ, আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের লাঠির মুখে আগুনের হল্‌কা, আর তারপরই ধোঁয়া। আওয়াজে তো আমি চম্‌কে উঠেছি। মাথা আরও নিচু করে দিলাম। আওয়াজ কী ভীষণ। মনে হলো এবার যেন কী একটা ঘটে যাবে !!

দেখি, নিমেষে একটা হরিণ কয়েক কদম লাফিয়ে এলো। এসেই ধপাস্ করে উল্টে পড়ে গেল। পড়েই শেষ। কী দিয়ে যে কী ঘটে গেল—কিছুই বোধগম্য হতে চায় না। নতুন এক জীব, হঠাৎ বসে কাঁধে লাঠি তুললো, তারপরই আগুনেব হল্‌কা। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের দিনে আকাশ ভেঙে পড়ার আওয়াজ, আর কিছু ধোঁয়াও উড়ে গেল ; তারপরই হরিণের হুমড়ি খেয়ে পড়া।

এমন ধারা সব ঘটনার কার্য-কারণ বুঝতে অন্যদের কতদিন লাগতো জানি না। তবে আমরা বন্য-জীব, আমাদেরই বনের খাদ্য ও মৃত্যু নিয়ে এই ঘটনা—তাই আমাদের বুঝতে বিশেষ দেরি হয় না। কেননা, এমন অঘটনের কার্য-কারণের ছাপ ও অনুমান মনেরেখেই এই বনে আমাকে দাপটি করে বেড়াতে হবে তো।

আমার ছোট্ট জীবনের অভিজ্ঞতায় শেষ পর্যন্ত বুঝে নিয়েছি—এরাই হচ্ছে মানুষ। আর এদের ঘায়েল করার প্রধানতম অস্ত্র হচ্ছে—এদের চলাফেরায়, কাজে-অকাজে অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ নেওয়া।

মায়ের কথা মনে পড়ে। আচ্ছা মা কি এ সব জানতো ? জানতোই যদি তবে আমাকে গোড়া থেকে শেখাইনি কেন ? কেমন যেন ক্ষোভ জাগে মায়ের প্রতি !

সাত

ক্ষোভ কী অভিমান, তা জানি না। তবে জীবনে মানুষ সম্পর্কে এত জেনেছি যে, সে না-জানার ক্ষোভ কবে উবে গেছে।

কী ধূর্ত আর সাহসী মানুষেরা। পদে পদে এদের ধড়িবাজী আমাকে বিমূঢ় করেছে। আমরা আগুনকে ভীষণ ভয় করি তা এরা বেশ জানে। গায়ের জোরে এরা আমাদের কাছে কিছুই না, এক এক থাবায় এদের দু-দশটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারি। কিন্তু এরা কি এক আগুনে-লাঠি বানিয়েছে তাতে এরা আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার অনেক আগেই অনেক দূর থেকে ঘায়েল করে দেয়।

আমরা আড়ি পেতে শিকার ধরি। শুধু আড়ি পাতি না, ঘাপটি মেরে আড়ালে আড়ালে এগিয়ে নিঃশব্দে শিকারের পিছু ধরি। কিন্তু মানুষেরা তো বনের জীব না, তবুও বন যেন এদের নখদর্পণে। বনের আঁটিঘাঁটির সন্ধান এরাও আমাদের মতো জানে। গুঁড়ি ও ঝোপের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে আমাদের সহসা চম্‌কে দিতে চায়। আমরাও তক্কে তক্কে থাকি। একবার যদি বুঝি ওরা আমাদের ঠাহর পেয়েছে বা আমাদের দেখে ফেলেছে তাহলে সহসা আমরা ওদের পেছনে লাগি না। ওরা যে তখন সতর্ক হয়ে পড়ে, সজাগ হয়ে পড়ে ; তখন সামনা-সামনি বোঝাপড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। নিতান্ত ক্ষুধার্ত বা বেপরোয়া না হলে তেমন ঝুঁকি আমরা নিতে চাই না। ওরা আমাকে দেখেনি, কিন্তু আমি ওদের সন্ধান পেয়েছি—তা নাক দিয়ে হোক, কান দিয়ে হোক অথবা চোখ দিয়ে হোক—তখন আমি ওদের পেছন নেবই। তক্কে তক্কে থাকব ওদেব অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ নিতে।

'আড়বেশি'-বনে মানুষের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। এ বনে হেঁতাল, গেঁয়ো ও গরান গাছই বেশি, তাই মানুষের যাতায়াতও কম। এখন আমি এসে গেছি 'হরিণ-ভাঙ্গা'-বনে। 'আড়বেশি'-বন থেকে রোদ চলে যাবার দিকেই 'হরিণভাঙ্গা' নদী। তারই কোলে 'হরিণ-ভাঙ্গা'-বন। নদী বরাবর এগুচ্ছি। ঠিক নদীর কূল ধরে এগুচ্ছি না। কূল থেকে বেশ খানিকটা দূরে দূরে। নদীর কূলের ধারে আমরা বেশি ঘুরি না। কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। কাল সাঁঝের বেলা এই বনে আসি। অনেকেই হয়ত জানে না, আমরা রাত্রে কিন্তু বেশ দেখতে পাই ; আর সব চেয়ে ভালো দেখি সাঁঝের বেলায়। নতুন বনে সব ভালো করে দেখে-দেখে এগুতে হবে তো, বেশ সকাল-সকাল আড়মোড়া দিয়ে আবার ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছি।

হঠাৎ দেখি, চারজন মানুষ চর ভেঙে উপর দিকে উঠেছে। তখন ভাঁটি, চরটাও বেশ দীর্ঘ—এত দীর্ঘ যে আমাদের পার হতে হলে একটার পরেও আরেকটা লাফ দিতে হবে। মুহূর্ত মধ্যে দূর থেকে আড়াল নিয়ে ঘাপটি মেরে দেখছি—এরা বনে উঠবার সময় ভারি সতর্ক হয়েছে। চারজনে কাছাকাছি প্রায় একত্রে চরের কাদা ঠেলে বনে উঠছে। হাতে ওদের লাঠিসোটা কী সব আছে। একজনের হাতে মোটা একটি দড়িও আছে। দড়ি দেখে ডিঙিও লক্ষ্য করলাম, কেননা দড়িটা ডিঙি পর্যন্ত গেছে। ডিঙিটা আবার বোঝাই কালো জাল। নিশ্চয় ওরা মাছ ধরতে এসেছে নদীর এই তেমোহানায়।

ওরা তো মালে উঠেই কেবলি ফালুক-ফুলুক এদিক-ওদিক তাকায়। ভাল করে দেখতে

চায় কোনও বিপদ-আপদ আছে কিনা। নিচের দিকে মাথা নিচু করে আমাদের থাবার কোনও চিহ্ন আছে কিনা তাও বুঝি পরখ করছে।

তবুও তখনি একটা কিছু করে বসবার কথা একটুও ভাবছি না। ওরা নিজেরা বড্ড কাছাকাছি থেকে এই সব কাণ্ড করছে। অমন ভাবে ঘন হয়ে থাকলে আমাদের কেমন যেন দ্বিধা আসে। বেপরোয়া আক্রমণ করলে ঝাঁকের মধ্যে একটা না একটা ঘায়েল হবেই ; কিন্তু বাকি সবাই সঙ্গে সঙ্গে কী জানি কী করে বসে। আমরা কখনও বেহিসাবী হঠকারিতা করি না।

বুঝলাম ওরা দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছে—এখানে সহসা কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই। এবার চরের শক্তমতো জায়গাটায় একটা খুঁটি ভালো করে পুঁতে তাতে জালের দড়ি বেঁধে ডিঙিতে উঠলো। তারপর নদীর জলে জাল ফেলতে ফেলতে সোজা ওপার। আর ওদের দেখা নেই। কে জানে কোথায় গেল ?

নিজেকে নিজে প্রবোধ দিই—যেখানেই যাক্, ওরা ঠিকই ফিরে আসবে। সন্ধ্যার আগেই ওরা আসবেই এই জাল তুলে নিতে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার বেশ আগেই ওরা আসবে। ওরা তো বনের জীব নয়, বনের অন্ধকারে ওরা মরতে আসবে কেন !

কিন্তু দিনের আলো নিবু-নিবু হতে তো অনেক দেরি। ততক্ষণ আমিই বা কী করি। এভাবে ওতপেতে তো অতো সময় থাকা দায়। ওতপেতে সুযোগের অপেক্ষায় দীর্ঘ সময় থাকা যে কী কষ্টকর—তা অন্যের পক্ষে অনুমান করা দুরূহ। তখন শরীরের সর্ব অঙ্গই যেন টান্‌টান্ হয়ে থাকে—যে কোন মুহূর্তে ঝটিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হতে পারে একটা কিছু এস্‌পার-ওস্‌পারের জন্য।

তবে কি একটু ঘুরে-ফিরে আসব ? না, তাও করা ঠিক নয়। আমরা চলাফেরা করলেই বনের চেহারাই পালটে যায়। তখন আমার উপস্থিতিটা ওদের কাছে অনুমান-সাধ্য হয়ে উঠতে পারে। কেননা, আমরা ঘোরা-ফেরা করলেই অন্য কোন বন্য-জীব সে এলাকার ধারে কাছেও আসবে না। এমন কী, কোন পাখিও ধারে কাছের কোনও গাছেও এসে বসবে না। শক্তি ও ক্ষমতা আমাদের অপরিমিত। তারই এ এক অভিশাপ আমাদের জীবনে। বনের অগণিত জীব ও প্রাণীর মধ্যেও আমরা নিঃসঙ্গ।

অবশেষে স্থির করে ফেলেছি, এইখানেই পড়ে থাকব—তবে ওতপেতে নয়, খানিকটা অলসভাবে। সব জীবই ভাবে হয়ত, তারা বুঝি আমাদের করতলগত হয় আমাদের শক্তি ও ক্ষমতার দাপটে। না, তা বোধহয় ঠিক নয়। তারা আমাদের কাছে পদানত হয় আমাদের ধৈর্যর জন্যও। ধৈর্য আমাদের কল্পনাতীত। আমরা এতটুকু চঞ্চল ও অস্থির না হয়ে প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন অপেক্ষা করব শিকারের অসতর্ক মুহূর্তের জন্য।

পড়ে আছি তো পড়েই আছি। বেলা মাথার উপর এলো, তারপর ঢলেও পড়লো, তবুও কোথাও টু-শব্দ নেই। এবার পড়ন্ত বেলা। সহসা দেখি, ঐ ওপার থেকে ওরা দল বেঁধে ডিঙি বেয়ে আসছে। ঠিক বেয়ে আসছে না, একজনে জালের টানা দড়িটা টেনে টেনে এপারে এগুচ্ছে আর বাকি ক'জনে জাল গোটো করে নদী থেকে নৌকোয় তুলছে। জালের সঙ্গে যেই মাছ উঠছে অমনি তাকে জাপটে ধরে ডিঙির খোলে ফেলছে। এক একটা মাছ বেশ বড়, এত বড় যে এপার থেকে দেখে আমারও যে লোভ হচ্ছে না, তা হলফ করে বলতে পারব না। আমরা মাছও খাই, তাই বলে নিরীহ মেছো-কুমিরের মতো মেছো-বাঘ নই। মাছ আমাদের চাটনি। ওটা খাই মুখটা বদলাবার জন্য। কাঁহাতোক এক ঘেয়ে মাংস খেয়ে থাকা যায় বলো। কিন্তু এই জলের জীবকে আমরা কী করে ধরি ?

সে-কাহিনী পরে হবে। ইতিমধ্যে আমার দেহ ও মনে শিহরণ এসে গেছে। ওরা তো মাছ ধরার উল্লাসে মেতে উঠেছে। আমিও কিছুটা আরও এগিয়ে গেছি। এবার চরের জাল বাঁধবার খুঁটিটা আমার আওতার মধ্যে। যা ভেবেছি ঠিক তাই। ডিঙি এসে গেছে কূলে, ওদের যেন আর কিছুই ভাববার নেই ! ঐ তো খুঁটিটা,—যাবে আর একটানে তুলে নিয়ে আসবে। তারপরই তো এক ধাক্কায় মাছ বোঝাই ডিঙি স্রোতে ভাসিয়ে দেবে। বনের কথা ভাববার কী আছে ? বনের চত্বরে তো উঠতে হবে না।

যে-মানুষটা দড়ি টেনে টেনে ডিঙি নিয়ে আসছিল, সে এখনও একটা মাছও ঝাপটে ধরতে পায়নি। তার তো বুঝি একটামাত্রই কাজ—দড়ি টানা আর শেষ ধাপে তাড়াতাড়ি খুঁটিটা তোলা। ডিঙি থেকে চরে নামবার মুখে কী যেন চিৎকার করে বললো। এইবার লাফ দিয়ে ডাঙার চরে নেমেছে। কয়েক কদম ওর এগিয়ে আসতে হবে খুঁটি অবধি। খুঁটির দিকেই ওর একমাত্র দৃষ্টি। শিকারের এমন অসতর্ক মুহূর্ত কাকেই বা না প্রলুব্ধ করে। আমার পা ও থাবা চন্‌চন্‌ করে উঠেছে, লেজের ডগা নড়ে উঠেছে, বাঁকা নখগুলি চিড়বিড় করে বিস্ফারিত হতে চায়। ওষ্ঠাধর বিমুক্ত হয়ে দংশনের বৃহৎ দাঁতগুলিকে উন্মুক্ত করে দিতে উন্মুখ। না তবুও না। সুন্দরবনের নরখাদক তবুও অপেক্ষা করতে জানে। কিছুতেই হঠকারিতা করতে যাব না।

কয়েক কদম এগিয়ে শিকার এবার মাজা ভেঙে মাথা নিচু করে খুঁটি তুলতে গেছে। এই তো মোক্ষম মুহূর্ত। এক নিমেষও যেতে দেব না—তীব্র বেগে কদমে এগিয়ে বিকট হুংকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছি উবু হওয়া লোকটার উপর।

বজ্রের মতো হুংকারের তরঙ্গে গক্‌ করে ওর মাজায় কামড় বসাবার শব্দ নিজেও শুনতে পেলাম না। একটানে দড়ি ও খুঁটি থেকে ওদের হাতই বলো বা থাবাই বলো হিঁচড়ে নিয়ে মুখে তুলে নিয়ে এলাম চরা থেকে চত্বরে। যাবার আগে গর্জে উঠে একবার তাকিয়ে দেখে নিলাম—বাকি ওরা কোনো আগুনে-লাঠি উদ্যত করেছে কিনা। না, আমার বেপরোয়া হুংকার ও গর্জনে যে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি ভাবেই 'থ' মেরে দাঁড়িয়ে আছে।

এই সর্বপ্রথম মানুষের মাংসের আস্বাদ পেলাম। কী নরম আর তুলতুলে মাংস। এদের গায়ে ছাল ও লোম বলতে কিছু নেই। তল পেটটা খেতেই বোধ হয় সবচেয়ে মিষ্টি। অন্য কোনও শিকার হলে ঘাড়টাই খাই, কিন্তু মানুষ হলে আমি বলবো তলপেটটাই আগে খেয়ো।

শুধু নতুন খাদ্যের লালসার তৃপ্তি নয়। মানুষ শিকার করে নতুন এক আত্মবিশ্বাসের শিহরণ যেন আমাকে আরও বলশালী করে তুলেছে। হরিণ, শুয়োর প্রভৃতি বন্যজীবকে আমরা প্রচুর শিকার করি,এসব শিকারে প্রচণ্ড শক্তি লাগে, অনেক সাধনাও লাগে। কিন্তু মানুষ শিকারে যে বুদ্ধির খেলা লাগে তার তুলনা নেই। বুদ্ধির খেলায় যদি হেরে যাই, তখন আগে ভাগেই সরে পড়ি। আর যখন জিতে যাই, তখন উন্মাদনায় মেতে উঠি।

কিন্তু মানুষ শিকারে আমাদের সাহসেরও পরিচয় দিতে হয় ভীষণ ভাবে। সুন্দরবনের বন্য-জীবদের শিকারে বিফল হলে আমাদের তেমন ভীত হবার কিছু থাকে না, সরে পড়বার জন্য কোন ব্যস্ততাও থাকে না। বরং বন্য জীবেরা পালিয়ে যাবার জন্য তখন দিশা পায় না। কিন্তু মানুষ শিকারে ব্যর্থ হলে বহু সময় আমাদের প্রাণ নিয়েই টানাটানি বেধে যায়। বড্ড সাহস দেখাতে হয় মানুষ শিকারে।

তাই মানুষ শিকারের প্রথম অভিজ্ঞতা আমার মনে এনেছে এক আত্মবিশ্বাস।

ছেলেবেলায় মা-কে দেখতাম এক মহা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বনে ঘোরাফেরা করতো। কী তার সেই দাম্ভিক রূপ। আজ বুঝি দুনিয়াকে তোয়াক্কা না করার মনোভাব মা-র এসেছিল মানুষ শিকার করতে করতে। আমার এই অভিজ্ঞতার পর মা-কে এখন দেখলে কী মজাই না লাগতো।

আট

কিছুদিন হলো দেহের শক্তি ও সামর্থ্য যেন টগ্‌বগ্‌ করছে। অনুভব করলাম পুরো যৌবন বুঝি এসে গেছে। আমার একা-একা আর ভালো লাগে না। আমার এই অমিতবিক্রমকে, আমার এই তেজকে কোন সমজদারের সামনে তুলে না ধরলে যেন তৃপ্তই হচ্ছি না। কাকেই বা দেখাব আমার এই আসুরিক শক্তি। বনের অন্য কোন জীবন্ত প্রাণীকে? তাদের সঙ্গে তো আমার খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক, শিকার ও শিকারীর সম্পর্ক। তারা হবে আমার সমজদার!!

তা না হলে তো আমার সমগোত্রীয় কোন জাতভাইকে খুঁজতে হয়। তেমন দু'একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে পীরখালি-বনে, বা পঞ্চদুয়ানি-বনে। দেখা হলেই তারা দূর থেকে আমাকে মুখ-খিচুনি দেয়। যেন তাদের খাদ্যে ভাগ বসাতে এসেছি। তা কেন হবে? আমাদের রাজ্যে তো অঢেল খাদ্য। তা ছাড়া তুমিও আমার খাদ্য নও, আমিও তোমার খাদ্য নই।

আমি তখন মুখ ঘুরিয়ে অন্য পথ ধরি। আসতে আসতে এবার চাম্‌টা বনে হাজির। এসে দেখি এখানে গোলগাছের ছড়াছড়ি। গোলঝাড় বড় ঘন। আড়ালে এখানে বিশ্রাম নেয়াও যেমন আরাম, তেমনি নিঃসাড়ে ও নিঃশব্দে কোন শত্রু আমার ধারে কাছে আসতেও পারবে না। ঝাড়ের পাতা এমন ঘন এবং দীর্ঘ যে, কেউ এর লিকলিকে ডগাগুলি ভীষণভাবে না দুলিয়ে এবং খস্‌খস্‌ শব্দ না করে প্রবেশ করতেই পারবে না।

তাই এই বনে এসেই মনে হয়েছিল এখানে আমাদের অনেকের আড্ডা না হয়ে যায় না। অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েও যেতে পারে। হয়ত বা আমার মায়ের সঙ্গেও দেখা হতে পারে। সেই ক্ষীণ আশা মনের কোণে রেখে বীরদর্পে বিচরণ করে চলেছি চাম্‌টা-বনে।

ক'দিন পরে একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—সেই হেঁড়ো মুখ আর বিস্ফারিত মুখের খিচুনি। আমিও সঙ্গে সঙ্গে এবার বীরোচিত ভাবে মুখের খিচুনি না দিয়ে ছাড়িনি। সেও আর এগোয়নি, আমিও আর এগোইনি। সমানে সমানে নিষ্ফল বিবাদ করে লাভ কী! ফলে দু'জনে দু'দিকে চলে যাই।

আরও বেশ কিছুদিন চলে যায়। এবারের মতো শীত শেষ হয়ে গেছে কিন্তু বর্ষা আসেনি। নাকে যে গন্ধ আসছে তাতে বলতে পারি বনে বনে ফুল ধরেছে। বাইন গাছের-ফুল। একটা গাছের তলায় ভাঙা-ভাঙা রোদে শুয়ে আছি। মৌমাছির গুঞ্জন চারিদিকে। আমরা এই সময়টাকে মধু-মাস বলে চিনি। এইবার যেমন মধুর ধুম পড়ে যাবে, তেমনি আমাদের দেহে উৎসাহের ধুমও দেখা দেবে একই সঙ্গে। কত মানুষ যে আসবে এই মধু-মাসে ছোট ছোট দলে মধু কাটতে তার ইয়ত্তা নেই, আর আমাদেরও মহাসুযোগ মানুষ শিকারের।

চাম্‌টা-বনে সঙ্গী খুঁজে বেড়াচ্ছি তো বেড়াচ্ছি। এমন সময়ে একজনকে দেখে থ' মেরে গেছি। হঠাৎ দেখে দূর থেকে মায়ের আদলই যেন মনে হলো। মুখখানা হাঁড়িমুখ নয়;

যেন মায়ের মতো একটু ছোট ও একটু লম্বাটে। বিষ-ঝরা হিংসুটে দাঁত খিচুনি নয়। খিচুনি না হলেও দাঁত বের করে ঘর্‌ঘর্‌ করে উঠেছে। ঠিক তেমনিভাবে আমিও ঘর্‌ঘর্‌ করে উঠলাম। দেখি কী হয়!

এগিয়ে এসেছি দু'জনেই। ওর চোখের ভ্রূর কালো দাগের টানটা আমার মায়ের সাথেও যেন কোথায় মিল আছে। আরও কাছাকাছি। দু'জনাই ঘর্‌ঘর্‌ করতে করতে একে অপরের শিকারী-গুম্ফ স্পর্শ করেছি। না, এ তো আমার মায়ের গায়ের গন্ধ নয়। গন্ধ দিয়ে ঠিক আমি আমার মাকে চিনতে পারব, তা বহু বর্ষার পর বর্ষা কেটে গেলেও। সে-গন্ধে যেন এক আশ্চর্য আশ্রয়ের নিশ্চয়তা ছিল। তবে···না, আর তবে নয়। এ-গন্ধও আমাকে আকৃষ্ট করেছে। হঠাৎ-দেখা সঙ্গীও আকৃষ্ট হয়েছে নিশ্চয়, তা না হলে ও অমন করে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়েছে কেন? না, আর কোনও সন্দেহ নেই—যেমন সঙ্গী চেয়েছিলাম, তেমনি যেন পেয়ে গেছি!

মুহূর্তমধ্যে বিদ্যুৎবেগে একটা সুন্দরী গাছের গুঁড়ির গায়ে দাঁড়িয়ে থাবার বিস্ফারিত বক্র নখে সমস্ত শক্তি দিয়ে গুঁড়ির ছাল ও ডগ্‌ডগে লাল কাঠ ফাল্‌ফাল্‌ করে মাটিতে ফেলতে লাগলাম। সঙ্গীকে যেন বলতে চাই—দ্যাখো, দেখবে আমার গায়ে কী ভীষণ শক্তি!

তারপর এক লাফে চমক লাগিয়ে পলকের মধ্যে এমন উধাও হয়ে গেলাম যে সঙ্গী দেখে অবাক না হয়ে পারবে না। নিশ্চয় ভাববে—এর গতি যেন হরিণের চেয়েও দ্রুত! শুধু তাই নয় পরমুহূর্তেই আবার ভিন্ন পথে লুকিয়ে সঙ্গীর সামনে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লাম যে সে হকচকিয়ে গেছে।

তবু বুঝে ফেলেছি, শুধু এ-সব দেখিয়ে আমার প্রতি ওর নির্ভরতা, আমার শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি ওর একান্ত ভরসা প্রকট হবে না। হয় আমার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে ওর সামনেই পরাহত করতে হবে, না হয় কোন কঠিন ও লোভনীয় শিকার ওর চোখের সামনে নিমেষে ধরাশায়ী করে ফেলার ক্ষমতা দেখাতে হবে। কিন্তু দুটোর কোনটাই তো চাইলেই করা যাবে না। প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে এখনও তো দেখা হয়নি। এলে নিশ্চয় দেখিয়ে দেব—কী অসীম শক্তি আমার বাহুতে। আর দুঃসাহসিক শিকার? সহসা তার সুযোগ পাওয়া ভার। তবে মধুর তল্লাসে মৌয়ালিরা এলেই সে-সুযোগ নিশ্চয় মিলবে।

কিন্তু আমার এখন ওকে ছেড়ে দূরে কোথাও শিকার সন্ধানে যেতে মনে শঙ্কা জাগে। কী জানি, ফাঁক পেলেই যদি কেটে পড়ে। এ যে আমার এখন সত্যকারের সঙ্গী তা বুঝে ফেলেছি—এ যে আমার সঙ্গিনী, বাঘিনী।

দু'জনে মিলে ঘোরাঘুরি করি, খেলাধূলা করি। কখনও সঙ্গীকে আমোদিত করার জন্য নকল শিকারের মহড়া করি, কখনও বা একে অপরকে আদর করি। ঘোরাঘুরি করি বটে কিন্তু সে-ঘোরার পেছনে কোনও উদ্দেশ্য নেই, খিদে তেষ্টা মেটাবার কোনও প্রচেষ্টাও নেই, অথবা শিকার খুঁজে বের করার কোন প্রবৃত্তিও নেই।

কিন্তু আমার মন উচাটন হয়ে আছে সঙ্গিনীকে আমার শিকারমত্ততা একবার দেখাবার জন্য—তখন আমার কী ক্ষিপ্রতা, কী বীভৎস হিংস্রতা, আর হুংকারের কী প্রচণ্ডতা!

এই সময়ে আমরা কিন্তু জীবিকা আহরণের অনেক বন্য আইন লঙ্ঘন করি। খাদ্যের সন্ধানে তো এ শিকার নয়। এ শিকার নিজের পরাক্রম দেখিয়ে সঙ্গিনীর মনকে বিগলিত করে তোলার জন্যই।

যদি বন্য-জীব হয়—নিঃসাড়ে অনুসরণ করা বা ওতপেতে অপেক্ষা করার ধার ধারি না। দেখা পেলেই ছুটে গিয়ে তেড়ে আক্রমণ করি বেপরোয়ার মতো।

আর যদি মানুষ হয়—তাহলে, ওরা কেন বনে এসেছে, দলে কেমন ভারি, কোনদিকে ওরা এগুবে, বাতাস কোনদিকে বইছে, ওদের পথের মাঝে কোথায় বা ভালো আড়াল পাব, হাতে ওদের কী অস্ত্র আছে, ওদের ডিঙিই বা কোথায় রেখে এলো, কোন মুহূর্তে ওরা একটু ছাড়া-ছাড়া হবে, ওদের কাজে ওরা সবচেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে কখন, সর্বোপরি ওদের অসতর্ক মুহূর্তের জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা—এইসব আইন যেন আমরা কোন কিছুই মানতে চাই না, কিছুই জানতে চাই না এই সময়ে আমাদের চন্‌মনে মত্ততায় ! এই জন্যই তো মধু-মাসে মৌয়ালিরা এতো শিকার হয়ে পড়ে আমাদের দাপটে।

সঙ্গিনীর প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে এপাশ-ওপাশ ঘোরাফেরা করছি বটে, কিন্তু উচাটন মন নিয়ে আমি কান খাড়া করে আছি। মধু-মাস তো, আমাদের দৃষ্টির মধ্যেই শিকার জুটেও যেতে পারে।

কান খাড়া করেছি একটা বিশ্রী ও বিকট শব্দের সম্ভাবনায়। আজকাল মৌয়ালিরা বনে প্রবেশ করার মুখেই প্রচণ্ড শব্দ করে। প্রথম প্রথম যে আমাদের মনে এতে একটা শঙ্কা জাগেনি, তা নয়। কী যেন এক নতুন অস্ত্র ওরা বুঝি নিয়ে এসেছে। কিন্তু দু'দিনেই বুঝে ফেলেছি—আগুনে-লাঠির মতো নয় এ-অস্ত্র। আমাদের নজরকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। গাছের গুঁড়িতে কী যেন একটা ছুঁড়ে মারে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ আর ধোঁয়া। প্রচণ্ড বটে, কিন্তু কেমন যেন ছড়ানো আওয়াজ, আগুনে-লাঠির মতো জমাটি নয়। শব্দই সার, কাউকে এ-যাবৎ এতে মরতে দেখিনি। আমাদের একটু মিছেমিছি ভয় দেখানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই বিকট শব্দে তো ওরা মৌমাছির কামড় থেকেও বাঁচবে না। তা, আমাদের কাছ থেকে এরা সে-বিদ্যেটা তো শিখেও নিতে পারে ! আমরাও মধু খাই। মৌচাক ভেঙেই খাই। মৌচাক থেকে মধু খেতে যাবার আগে ছোটাছুটি করে বেশ করে ঘেমে নিই। আমাদের গা থেকে ঘামের গন্ধ ছুটলে মৌমাছি আর গায়ে বসতে চায় না। তবে চাক খুব নিচু ডালে হলেই আমরা একটু-আধটু মধু খেতে পারি।

বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হয় না। হঠাৎ একটু দূরেই সেই বিকট আওয়াজ—ব-ম্ ! সচকিত হয়ে ঘাড় উঁচু করেছি। মুহূর্তমাত্রও দেরি করতে চাই না। সঙ্গিনীর দিকে একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম। সে-ও আমার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে যেন চ্যালেঞ্জ জানালো—যাও দেখি, দেখি তোমার হিম্মত !!

আর কি আমি দাঁড়াতে পারি ! ছুট দিয়েছি—শব্দভেদী ছুট। আগেই তো বলেছি—কান, নাক ও চোখের মধ্যে কানই আমাদের বেশি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য। এই শব্দভেদী ছুট কিন্তু চুপিসারে নয়, হঠাৎ চমক্ লাগিয়ে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়া নয়। হুড়মুড় করে বন কাঁপিয়ে তীরের বেগে মরণ আঘাত করা। হয়ত এতে ওরা আগে থাকতেই আমার সাড় পেয়ে যাবে। তা পাক, থতমত খেয়ে ঠিকভাবে চিন্তা করার আগেই আমি পৌঁছে যাব বীরবিক্রমে।

হলোও তাই ; ওরা যে ক'জন আছে, তা আগে থাকতে হিসেবই করিনি। তবে একজনের দিকেই তীব্র দৃষ্টি দিয়ে ছুটে চলেছি—এতে যে নানা বিপদ আসতে পারে, সেদিকে এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ না করেই। দূর থেকে দেখি—যে এখন আমার শিকারের লক্ষ্য সে একটা গাছে তাড়াতাড়ি উঠবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরে উপরের ডাল হাতড়াচ্ছে। তাই ছুটেছি শ্বাস রুদ্ধ করে, ঝড়ের গতিবেগ নিয়ে।

শিকারের দিকে দৃষ্টি রেখেও বেশ দেখতে পাচ্ছি—ও একা নয়। আগেই বলেছি,

আমাদের গোলগোল চোখের মধ্য-মণির পার্শ্ব বলয় খুবই বিস্তৃত, ফলে একটা বিন্দুতে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও সামনের গোটা অংশে আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়। তা থেকেই বুঝে ফেলেছি, ওরা কয়েকজনে আছে, আর তাদের একজনের কাছে সেই মারণ-অস্ত্র আগুনে-লাঠিও আছে।

তা থাক্, বিপদ আছে জেনেও আমি আজ যেন তাতে এতটুকুও বিচলিত নই। আমি আজ শুধু হিংস্রতায় মত্ত নই, আমি যেন উন্মত্ত। আমি বেশ জানি, আমার লম্ফ-ঝম্ফ, আমার তীরের মতো গতিবেগ, আমার গর্জন, আমার হাঁকডাক—সবই আমার সঙ্গিনী দূর থেকে উঁকি মেরে মেরে দেখছে।

গাছে উঠতে উদ্যত আমার লক্ষ্যের লোকটাকে যেন উড়ে গিয়ে দু'পায়ে ভর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে থাবা মেরেছি তার ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত বাঁকা নখ বসিয়ে টেনে নামিয়েছি মাটিতে। কোন অবকাশ না দিয়ে এক কামড়ে উর্ধ্বে তুলে ধরেছি। মুখে করেই ভীম-বেগে লাফ দিয়ে প্রাণপণ ছুটে চলেছি। সঙ্গে সঙ্গে আগুনে-লাঠি গর্জে উঠেছে আমার পিছনে। আমি ততক্ষণে পগার-পার।

কোনও কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে যেন তীর বেগে এসেছি সঙ্গিনীর কাছে। তার সামনে অর্ধমৃত শিকারকে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ফেলে দিয়েই এবার দম নিতে বসেছি। সঙ্গিনী এতক্ষণে আমারই কাছে এসে বসেছে, তার বিগলিত মন নিয়ে আমার গায়ে গা লাগিয়ে। আর আমি বীরদর্পে হাঁফাতে হাঁফাতে এদিক-ওদিক মুখ ঘোরাচ্ছি। আমার জিহ্বায় তখনও গরম রক্তের আস্বাদ।

নয়

মধু-মাসটা বেশ মধুময় ভাবেই কেটে গেল। আহারের চিন্তা আমাকে যেন তেমনভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেনি। আমাদের আহার মানেই তে শিকার। কাজেই শিকারেও যেন স্পৃহা ছিল না। সঙ্গিনীকে নিয়েই আহ্লাদে আটখানা হয়ে আছি। যেন মত্ত হয়ে দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল।

বর্ষা আগত। শুধু আগত নয়, এসেও গেল ক'দিনের মধ্যে। আমাদের বনের বর্ষার রূপ ও মেজাজই আলাদা। খোলা জায়গা বা নদীর ওপর বৃষ্টি আমার ভালো লাগে না। তীর বেগে জল পড়তে থাকে, আর দূরের দৃষ্টি কেমন যেন ধোঁয়াটে হয়ে ওঠে। কিন্তু বনের মাথা তো পাতার বুননিতে আবৃত, আর সে আবরণ ভেদ করে খোলা আকাশ তো প্রায় অদৃশ্য। আমার সঙ্গিনীর দেহের সুন্দর কেশদামের আবরণীর মতো বনের ঘন পাতার বুননির ওপর ঝর্‌ঝর্ অঝোর ধারায় আছড়ে পড়া বর্ষা সুন্দরবনের বনানীকে এক অপরূপ রূপ ও গুঞ্জনে যেন মধুর করে তোলে।

আর সেই জলধারা যখন পত্রাভরণ ভেদ করে পাতা থেকে পাতায় গড়িয়ে টপ্‌টপ্ করে বনতলের ঝরাপাতার ওপর পড়ে, তখন এক তালময় ছন্দের শব্দ সারা বনে ছড়িয়ে পড়ে। ভারি আমার ভালো লাগে এই তালময় ঝংকৃত শব্দ। খানিকটা বৃষ্টি বাঁচিয়ে কোন ভিটেমাটির কোলে বড় গাছের গুঁড়ির নিচে কুণ্ডলী পাকিয়ে একমনে নিশ্চিন্তে শুনি এই ঝংকার।

করবই বা কী এখন ? খাদ্যের সন্ধানে আমাদের এ সময়ে বিশেষ কিছু করণীয় থাকে না। কারণ এই ঝম্‌ঝম্ শব্দে পূর্বাহ্নে শিকারের আগমন বার্তা অনুসরণ করার কোনও

সুযোগ থাকে না।

আমারও শঙ্কার কিছু কারণ ছিল না। কে এই ঘোর বর্ষার বাদলা দিনে আমার পেছনে লাগতে আসবে। কাজেই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সময়টা আমার আনন্দে কাটাবার কথা। কিন্তু আনন্দে কাটবে কি! আমার সঙ্গিনী তো আমার কাছে নেই। বর্ষার প্রাক্কালে কবে যে কী ভাবে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল তা বলার নয়।

তার যাবার কিছুদিন আগে থেকেই আমার যে সন্দেহ হতো না, তা নয়। সঙ্গিনী তখন যেন কিছুদিন ধরে নিরাসক্ত হয়ে উঠেছিল, কিসের জন্য সে যেন আনমনা হয়ে থাকতো। যেমন অলস হয়ে উঠেছিল, তেমনি চলাফেরায় যেন ধীরস্থির হয়ে এসেছে বলে মনে হতো। দেহের সে চঞ্চলা-চপলার চট্‌পটে ভাব আর তেমন ছিল না।

আমিও খানিকটা বিব্রত হয়ে তখন সতর্কভাবে থাকতাম—কী জানি কখন কী ঘটে যায়! কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, কখন যে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি আমার কাছ থেকে কেটে পড়লো, তা বুঝতেই পারিনি। বড় চালাক ছিল আমার সঙ্গিনী—বড় ধূর্ত।

মা-ও বুঝি এমনি চালাক আর ধূর্ত ছিল। তা না হলে তার বাচ্চার কাছ থেকে সে অতো সহজে ভেগে পড়লো কী করে? তাহলেও সঙ্গিনীর প্রতি যত অভিমান বাড়ছিল, মনে মনে মায়ের প্রতি ততই যেন আকৃষ্ট হচ্ছিলাম। সত্যি কথা বলতে কী, মা চলে যায় বটে, কিন্তু সে-চলে যাবার মধ্যেও একটা মায়ের স্নেহের ছাপ ছিল, একটা বেদনাহত মনের মঙ্গল-কামনা ছিল। এ-কথা অবশ্য তখন বুঝিনি, কিন্তু আজ বড় হয়ে বুঝি, সে-যাবার মধ্যে আমাকে সাবালক করে তোলার একটা মস্ত বাসনা ও ইচ্ছা ছিল।

কিন্তু সঙ্গিনী চলে যাবার মধ্যে গোড়া থেকে অনুভব করেছি, এটা তার আমাকে এড়িয়ে চলার প্রচেষ্টা। কেন? বারবার ভেবেছি, কেন এমন হলো। কই, প্রথম প্রথম সে তো আমাকে আদর করতে কসুর করেনি। কিন্তু বর্ষা আসতেই ওদের যেন ভোল পালটে যায়। কিন্তু কেন এমন অঘটন ঘটে। বহুদিন তার কোনও হদিশ পাইনি।

মধু-মাস এলেই কেমন করে যেন প্রতিবারই আমার সঙ্গিনী জুটে যায়। এই সময় বন থেকে বনে ঘুরি, আর আমাদের হেঁড়ে গলায় কেমন যেন মিষ্টি ও মোলায়েম করে ডাকি—প্রথমে জোরে হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ করে একটানা হাঁক্ দিই; তারপর ধীরে ধীরে গলার খাদ একটু একটু করে নামিয়ে নিয়ে সঙ্গিনীর প্রতি আমার আকুল আহ্বানকে যেন দীর্ঘায়ত হাঁফ্ ছাড়ার মতো করে বাতাসের সঙ্গে বিলীন করে দিই। এমন ডাক কিন্তু আমরা রাতেই দিই। শেষ পর্যন্ত একজন না একজন সঙ্গিনীর সাড়া মিলে যায়। তারপর হন্তদন্তভাবে ছুটে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি।

প্রতি বর্ষা কাটবার পর মধু-মাস পড়তে না পড়তে এমনিভাবে আমার একজন না একজন সঙ্গিনী জুটেই যায়। আবার মধুমাস কেটে যাবার মুখেই বিচ্ছেদের পালা। এমনি বারবার হতে থাকলে, একবার জেদ চেপে যায়—আমাকে জানতেই হবে এমন কেন ঘটে।

সেবার বিচ্ছেদের পালা শেষ হবার বেশ কিছুদিন পরে সঙ্গিনীকে খুঁজছি তো খুঁজছি। অনেক দূর এসে গেছি। 'ছোটহর্দী'র বন। পশুর গাছের ফাঁকে ফাঁকে ধোন্দল গাছের ঝোপ। হঠাৎই দেখা মিলে যায় সেবারের সঙ্গিনীর সঙ্গে। দেখেই চিনতে পেরেছি। সে না হয়ে যায় না। কিন্তু এ কী মূর্তি! সঙ্গিনীর যে এমন ভয়ংকর মূর্তি হতে পারে, তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। যেন কাছেই এগুতে ইচ্ছে হয় না।

তবুও এগিয়ে গেলাম। বেশ কাছেই এগিয়েছি। নিজের অজান্তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি এবার। তবে কী ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম! না, আমাদের তো কোনো ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত

হবার কথা নয়। যে-কোনও বিপদে-আপদে ভয়াল মূর্তিতে ভীমবেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। না, কেমন যেন বাধা এলো! এ যে আমার সঙ্গিনী, কার সঙ্গে আমি শক্তিদর্প নিয়ে পাল্লা দেব!! দিলাম না। দাঁড়িয়েই রইলাম যেন নির্বিকার রূপে।

সামান্য দূরেই ধোন্দল ঝোপের আড়ালেই আচম্‌কা খরখর শব্দ। পলকের মধ্যে আমার কান ও চোখ সেদিকেই নিবিষ্ট হয়ে যায়। এক ঝলক যেন দেখতে পাই—আমাদেরই মতো দেখতে ছোট্ট একটি বাচ্চা। কিন্তু সেদিকে আমার দৃষ্টি পড়তেই সঙ্গিনীর অবস্থা আর দেখবার নয়—একেবারে মারমুখো। বাচ্চার দিকটা আড়াল করে আমার সামনে এসে এমন মুখখিঁচুনি দিলো যে বলার নয়। আমি বেশ খানিকটা পিছিয়ে গেলাম। তবু সঙ্গিনীর প্রতি এতটুকুও ক্ষিপ্ত হইনি। কিন্তু খুদে বাচ্চাটার প্রতি রাগ, ঈর্ষা আর প্রতিশোধের জন্য আমার রক্ত টগ্‌বগ্ করে উঠেছে। কিন্তু এগুবো কী! সঙ্গিনীর বীভৎস দাঁত-খিঁচুনি দেখে আমি হতভম্ব।

বুঝতে দেরি হয় না,—এর জন্যই, এই বাচ্চাকে আড়াল দেবার জন্যই সঙ্গিনী এমন রূঢ় হয়ে উঠেছে আমার প্রতি। এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতেও সংকোচ করেনি! আমাকে ফাঁকি দিয়ে এর জন্য ছেড়ে চলে আসতেও দ্বিধা করেনি।

তবুও ঈর্ষায় মত্ত হয়ে একবার ঝোঁক দিয়েছিলাম বাচ্চাটার শব্দ লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়তে। আর যাবে কোথায়!! সঙ্গিনী একদম কাছে এসে রুখে দাঁড়িয়ে সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপিয়ে গর্জে উঠেছে। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করেনি বটে, কিন্তু তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে।

সে আগুন-চোখ যেন আমাকে বুঝিয়ে দিলো—বাচ্চার ওপর প্রতিশোধ নেবার আগে বাঘিনীকে ক্ষত-বিক্ষত করে ধরাশায়ী করা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

থমকে গেলাম। আমার পৌরুষে তেমন কিছু করাটা হেয় কাজ বলে মনে হলো। তাই শুধু থমকে গেলাম না—সোজা পেছন ফিরে চলতে শুরু করলাম। চলার সময়ে একবারও পেছন ফিরে দেখার ইচ্ছাও হলো না—বাঘিনী খুশী, না অখুশী!

দশ

পেছন ফিরে চলতে শুরু করেছি তো করেছিই। তখন চলার কথাটা মনে বড় হয়ে ছিল না। বড় হয়ে ছিল আজকের ঘটনাগুলি; কেমন যেন একই সঙ্গে বিভোর ও বিব্রত করে রেখেছিল আমার মনকে। তাই চলছি তো চলছি।

'ছোট হর্দী'র বনের সীমানা পেরিয়ে এবার এসে গেছি 'মায়াদ্বীপ'—বনে। নীলজলরাশির প্রান্তে এই বনভূমি। সুন্দরবনের শেষ সীমানা; তারপরই বালির বিস্তৃত বেলাভূমি। বেশ খানিকটা আরও হেঁটে গেলে দেখা যাবে, নীল জলরাশির ঢেউ এসে অনবরত শোঁ-শোঁ শব্দে আছড়ে পড়ছে। সুবিস্তৃত এই বালির চর 'বালিয়াড়ি'। বালির সমতল প্রান্তর নয়। বনের মালের মতো টানা চত্বরও নয়। ছোট ছোট টিপির বালুরাশি ঢেউয়ের আকারে উঁচু-নিচু হয়ে পড়ে আছে গোটা বেলাভূমি জুড়ে।

আমাদের চারণভূমির বর্ণনা করতে গিয়ে সুন্দরবনের নানা অংশের নানা নামের কথা বলেছিলাম। সেই প্রসঙ্গে যে-ঘটনার কথা তুলি, সেই ঘটনা ঘটে এই 'মায়া দ্বীপে'র বনে।

বনে ঠিক নয়, বনের কোলে। বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। রোদও বিশেষ নেই। রোদ আমরা বিশেষ সহ্য করতে পারি না। রোদে একটু বেশিক্ষণ থাকলেই গা

চিড়বিড় করে ওঠে। আমরা সারা জীবন তো ঘনপাতার ছাতির তলে থাকি, তাই জল আর ঠাণ্ডায় বেশি অভ্যস্ত। তবে এখন রোদটা ঘোলাটে থাকায় বালিয়াড়ির ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়াটা ভালোই লাগছিল। খোলা জায়গায় বালির ঢেউয়ের খাদের ভেতর গা এলিয়ে দিয়ে সেদিন ঘুমিয়েও পড়ি।

নিরিবিলি জায়গায় ভারি আরামে অঘোর ঘোরে ঘুমুচ্ছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ দেহের পেছন দিকে তীব্র একটা আঘাত, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন কানে এলো আগুনে-লাঠির চোটের আওয়াজ। আগে কোনও দিন তো আগুনে-লাঠির চোট্ খাইনি, তাই বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা কী। এইটাই কি মৃত্যুর আঘাত? প্রথম যেদিন মানুষকে দেখি সেইদিনই দেখেছিলাম বটে আগুনে-লাঠির চোটের পর একটা হরিণকে ধপাস্ করে পড়ে মরে যেতে। তারই ঝাপসা ছবি যেন ক্ষীণভাবে মাথায় আসে। আসতেই মাথা উঁচু করে একবার দেখবার চেষ্টা করি। ঘাড় উঁচুও করেছিলাম মনে হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই! আমার সব-কিছুই যেন অবশ ও অসাড় হয়ে এলো। এই বোধহয় আমার—মৃ—ত্যু—!

...তা-র-প-র—বোধহয় অনেক পরে মানুষের কথা, অনেকগুলি মানুষের কথা আবছায়াভাবে কানে এলো। শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু চোখ মেলবার ক্ষমতা নেই। যেমনভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলাম, তেমনিভাবেই পড়ে থেকে কথাগুলি শুনি। তারা তখন একে অন্যকে শোনাচ্ছিল বনের নানা অংশের নানা নামগুলি। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটার পর সব চুপচাপ্। আর কোন সাড়া পাইনি।...আরও অনেক পরে আমার চোখ মেলবার ক্ষমতা আসে, হাত-পাও নাড়াচাড়া করতে সক্ষম হই। ধীরে ধীরে উঠে বসি। দেখি, কোথাও কেউ নেই। তবে কী কিছুই না! কিন্তু তা তো নয়—পেছনের উরুতে যেন ভীষণ ব্যথা, আর চারিপাশে বালুর উপর মানুষের অসংখ্য পায়ের ছাপ। তাহলে তো মানুষের দল নিশ্চয় আমার কাছে এসেছিলো। কই, তাদের তো কাউকে দেখছি না।

কী যে সেদিন ঘটেছিল তার কোনও হদিশ আজও করতে পারিনি। এর পর বালিয়াড়িতে আর কোনও দিন শুতে যাইনি। বালিয়াড়িতে গেলেই কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কা পেয়ে বসতো আমাকে।

এই ঘটনার পর 'মায়াদ্বীপে'ই বেশ দিন কয়েক কাটাতে হয়। অনেক দিন অবধি দুর্বল হয়েই ছিলাম। শিকারের ঝুঁকি নেবার বুঝি ক্ষমতাই ছিল না। তবুও কিছু খাদ্য সংগ্রহ করতেই তো হবে।

সেদিন তখন রাতের 'ছোট-বেলা' উঠেছে, কিন্তু বেশ বড় হয়ে। দিনের বেলার মতো তো অতো তেজ নেই। তবুও বেশ ফুটফুটে আলো ছড়িয়েছে।

এদিকে খালের জল ক্রমশ নিচে নেমে চলেছে। হু-হু করে জল ছুটে বেরিয়ে চলেছে বড় নদীতে। বিস্তীর্ণ বালির চরও বেরিয়ে পড়েছে। এমন খোলা জায়গায় আমরা সহসা নামি না। নীল জলরাশির কাছাকাছি এই বন ; এমন বনে সাধারণত মানুষের দল হানা দেয় না। তাই নিশ্চিন্ত মনে খালের খোলা চরে নেমে পড়েছি। মাছ খেয়ে রাতটা কাটাব বলে স্থির করেছি।

দূরে খালের একদম গোড়ায় গেলে সেখানে মাত্র থাবা-ভেজানো জলে দাঁড়িয়ে সোজা মুখ দিয়ে গপ্‌গপ্ করে মাছের ঝাঁক থেকেই খেতে পারি। কিন্তু সেই খালের গোড়া পর্যন্ত যেতেও তো অনেক দূর হাঁটতে হবে। তাই সাবেকি মতেই মাছ ধরতে শুরু করি।

খালের জলের কিনারায় গিয়ে খাড়া হয়ে বসে পড়ি। এমন করে বসি যাতে দুই থাবা দিয়ে তালি মারতে পারি। দৃষ্টি খালের একদম কিনারার জলের মধ্যে। যেই দেখি দু-তিনটে

মাছ কিনারার সামান্য জলে একত্র চলেছে, অমনি তালি দেবার মতো করে দুই থাবার আঘাতে মাছগুলিকে তেলোতে চেপে ধরি। মাছগুলি যে আমাদের বিশাল থাবার আঘাতে তক্ষুণি মারা পড়বে, তা কী বুঝিয়ে বলার বিষয়! কিন্তু তাই বলে তখন-তখনই সে-মাছগুলি গালে পুরে দিই না। আমাদের বিরাট মুখ-গহ্বরে ছোট দুটি মাছ কতটুকুই বা স্থান দখল করবে আমাদের চর্বিত-চর্বণের স্বাদ আনবার কাজে।

তাই আমরা তখন থাবার চাপে পাশেই বালুর চরে মাছগুলিকে চেপে রেখে দিই এবং একটু এগিয়ে গিয়ে আবার বসে পড়ে একই ভাবে তালি মেরে মাছ ধরি। ধরেই একই ভাবে বালিতে চেপে রেখে আবারও এগিয়ে যাই। এমনিভাবে অনেক দূর এগিয়ে যাবার পর খালের জলে জোয়ারের উল্টোস্রোত আসবার আগেই ফিরে আসি, আর আসবার পথে মাছগুলিকে চটপট্ গালে ভর্তি করে পুরে খেতে খেতে পূর্বস্থানে ফিরে আসি।

এই হলো গিয়ে আমাদের তালি দিয়ে মাছ খাওয়া। এটা খাওয়া বটে, তবে বলতে গেলে, এটা ঠিক খাওয়া নয়; চাল-জল দিয়ে আচ্‌মন করার সামিল। কিন্তু এতে এক বিপদ আছে। রাত্রে আমাদের এই তালির শব্দ খাল ও নদীর জল ধরে বহুদূর ভেসে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপস্থিতির ঢাক পেটানো হয়ে যায়। এতে আমরা কখনও স্বস্তি অনুভব করি না। বন্য জীবের স্বস্তি বনের লুকোচুরিতে, অন্যকে অজানিতে আচমকা চমক্ দেওয়াতেই।

এগারো

স্বস্তি না পেলে কী হবে, বালিয়াড়ির ঘটনাতে এমনই দুর্বল হয়ে যাই যে আমাকে মাছের 'নিরামিশ' আহারে বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়।

তারপর সুস্থ হয়ে উঠলে, আবার চলে আমার বন্য জীবন। অনেক বর্ষাই পরপর এভাবে কেটে যায়। বড় তোড়জোড় করে শিকার করি, খাই, আর অলসভরে বিশ্রাম করি। কখনও বা শুয়োর, কখনও বা হরিণ, কখনও বা মানুষ শিকার করি,...খাই,...আলসেমিতে সময় কাটাই। 'মধুমাস' এলে তবে কিছুটা বৈচিত্র্য আসে আমাদের জীবনে। তখন সঙ্গিনীর খোঁজে, তার মন-পাওয়া আর তাকে সঙ্গ দেওয়ার কাজে তন্ময় হয়ে দেখতে-দেখতে দিন কেটে যায়।

এইভাবেই চলে যায় দিন। কত বর্ষা যে পার হয়ে গেল, তা বলতে পারব না। তবে অনেক বর্ষাই তো কেটে গেল। এখন তো বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছি!

বয়স তো আমার কম নয়। কম নয় কেন, বুড়োই হয়ে গেছি বলা যায়। এখন অতো চট্‌পট্ লাফ্-ঝাঁফ্ দিয়ে শিকার করতে পারি না। তাছাড়া, অতটা পথ নিঃশব্দে গুটি মেরে শিকারের কাছে এগিয়ে যেতেও এখন আমার পক্ষে বেশ কষ্টই হয়। ফলে, হরিণ খাওয়া আমার ভাগ্যে বহুদিন জোটে না।

হরিণগুলো ভারি তুখোড়। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, কত না জানি নিরীহ ও গোবেচারি। কিন্তু ওদের ঐ লিক্‌লিকে পায়ে এমন ছুটবে যে ওদের ধারে কাছে সহসা পৌঁছনই দুরূহ। কক্ষনও ওরা আবার একা-একা থাকবে না, থাকবে দলবেঁধে—অনেক, অনেকগুলি একসঙ্গে। কতগুলি তা ঠিক বলত পারব না, তবে সবগুলি মিলে নিশ্চয় আমার খোরাক হয়ে যাবে—এক বর্ষা থেকে আরেক বর্ষা অবধি।

অমন দল বেঁধে থাকলেও আমার কোনও অসুবিধা ছিল না। তবে দলের সবাই যদি

কখনও একই সঙ্গে মাথা নিচু করে ঘাস-পাতা খেতো, তাহলে আমাকে কে পায় ! না, তা কক্ষনও করে না ; ওদের মধ্যে একদল যখন মাথা নিচু করে খাবে, তখন আরেকদল মাথা ঊর্ধ্বে উঁচু করে মুখের গ্রাস চিবুতে থাকে।

তাতেও ফাঁকি দিয়ে ওদের কাছে এগুনো অসাধ্য ছিল না। কিন্তু ওরা কী তীব্রভাবেই না নাক-কান-চোখ সজাগ রাখে !! তাও কি সবাই মিলে কখনও একই দিকে ? না, কেউ এদিক, কেউ ওদিকে, সবাই মিলে সব দিকে।

দূর থেকে ঘাপটি মেরে যখনই উঁকি মারি, তখনই দেখি—কেউ না কেউ হয় আমার দিকে চেয়ে আছে, কেউ না কেউ না হয় আমার দিকে নাক উঁচিয়ে ধরেছে, আবার কেউ না কেউ না হয় আমার দিকে কানটা ঘুরিয়ে ধরেই আছে। ওদের কান ঘুরানো দেখলে আমাদের হাসি পেয়ে যায়, কিন্তু আমরা তো হাসতে পারি না—তাই তখন মুখখানাকে গলার লোমের মাঝে চেপে ধরি, পাছে মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরিয়ে যায় ! সর্ব-অঙ্গ স্থির রেখে হরিণগুলো শুধু কানটা ঘুরিয়ে ধরবে একবার পেছনে, একবার পাশে, একবার সামনে !

একবার যদি আমার পায়ের চাপে শুকনো পাতা মুড়মুড় করে ওঠে, বা যদি কারও নাকে আমার গায়ের গন্ধের রেশ লাগে—তক্ষুণি সে ছুট্ দেবে ঠিক উল্টো দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গেই বাকি সবাই সেদিকেই মরণ-ছুট দেবে ঝোপ-ঝাড় ভেঙে বিদ্যুৎগতিতে। আমি তখন দেহ উঁচু করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিব চাটি। করবই বা কী !

হরিণগুলো কেন যে আমাদের মতো একসাড়ে হয় না ? কেন যে অমন দলে-দলে থাকে ! মুহূর্তের জন্যও একা-একা হয় না। তেমন যদি হতো, তাহলে দেখে নিতাম কেমন করে ওদের টপ্‌টপ্ করে খেয়ে ফেলা যায় !

তাই বলছিলাম, এই বয়েসে অতগুলি চোখ, অতগুলি কান, আর অতগুলি নাককে ফাঁকি দিয়ে অব্যর্থ শিকারে যাওয়া আমার পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। হরিণের আস্বাদ বহুদিন আমার কপালে জুটছে না। কিন্তু বাঁচতে হবে তো !

মানুষ ধরা আমার পক্ষে অনেক সহজ। আজকাল তো মানুষ ধরার তালেই থাকি। কিন্তু তাতে অসুবিধা ছিল না। তবে ওরা তো বনের বাসিন্দা নয়। ওদের বনে পাওয়াটাই ভাগ্যের কথা। একবার পেলে অবশ্য পেটপুরে খেয়ে নিই। তখন বেশ কিছুদিন না খেয়ে থাকলেও চলে।

মুশকিলটা হচ্ছে, ওদের পাওয়াই দুষ্কর। কদাচিৎ ওদের বনে পাওয়া যায়। রক্ষে, বনে কাঠ, মধু, গোলপাতা আর মাছ ছিল। সেই লোভে ওরা বনে আসে ; তাই আমিও বেঁচে আছি আমার এই দুঃসময়ে।

মনে হতে পারে, তাহলে তো আমার দিনগুলি ভালই চলে যায়। মানুষগুলোর গায়ে আর কতটুকুই বা শক্তি। আবার অনেকেই তো আমার দাঁত-খিচুনি দেখলেই ভয়ে অসাড় হয়ে যায়, হাত-পায় ওদের যেন খিল ধরে যায়। গর্জনে একটা হাঁকও দিতে হয় না।

সবই সত্যি মানছি। কিন্তু ওদের ভারি বুদ্ধি। কখন যে কী করে বসে তা ঠাহরই করতে পেরে উঠি না। এক-এক সময়ে ওরা এমন কাণ্ড করে বসে যে আমার মাথা ঘুরে যায়।

একদিন হঠাৎ সন্ধান পাই, একদল মানুষ এসেছে বনে কাঠ কাটতে। বলতে পারব না—ঠিক কতজন এসেছে। তবে দলে ওরা বেশ ভারি। বড় বড় নৌকো করে সব এসেছে। রোজই কাঠ কাটে এমনভাবে দলবেঁধে যে, ছোঁ মেরে কাউকে তুলে নেবার

সুযোগই পাই না। এইভাবে দলবেঁধে থাকবার কায়দাটা ওরা নিশ্চয় হরিণের কাছ থেকেই শিখেছে, হরিণের মতো ওরা অবশ্য তীর বেগে পালাতে পারবে না। তাহলেও, ওরা সবাই মিলে এমন কাণ্ড করে বসতে পারে যে, আমি হয়ত ছোঁ-মারতে গিয়ে পার পাব না। একে অপরের পাশে এমন করে ব্যূহ বানিয়ে ওরা বনে চলাফেরা করতো বা কাঠ কাটতো যে সেদিকে এগুতে হলে দশবার ভেবে এগুতে হবে।

আর কিছু না হোক, ওরা দলে যেমন ভারি, তেমনি প্রতিজনের হাতে কিছু না-কিছু অস্ত্রও আছে। আর কিছু না হোক, একখান্না কুড়ুল তো আছেই।

তবু আমি ওদের পেছনে লেগে আছি। রোজই সন্ধ্যার আগেই দেখি, ওরা নৌকোয় এসে গেছে সবাই। এসে মাঝ-নদীতে নৌকো নোঙর করে দিব্যি লক্‌লকে আগুন জ্বেলে কী-সব করে। তারপরই চলে ওদের খাওয়া-দাওয়া। আমি অন্ধকারে আর ঝোপের আড়ালে বসে বসে দিনের পর দিন দেখেছি। খাওয়া শেষ হতে না হতেই নৌকোর আলো সব নিবিয়ে দিয়ে ঝট্ করে সব ঘুমিয়েও পড়ে। দেখতে না দেখতে নিঝুম নিস্তব্ধ বনে নৌকোর খুপ্‌রি থেকে ঘর্‌ঘর্ শব্দ আসতে থাকে।

একদিন নয়, বেশ ক'দিন এই শব্দ লক্ষ্য করে বুঝলাম—এটা ওদের ঘুমনোর শব্দ, আমাকে কোনও ভয় দেখাবার জন্য এই শব্দ নয়।

শব্দের মধ্যে একটাই আমাদের বিচলিত করে—লাঠি দিয়ে কী একটা জিনিসের পরে মানুষেরা পেটায় আর খ্যান্-খ্যান্ শব্দ তোলে, এই বিশ্রী শব্দ শুনলেই আমার সারা গা যেন রি-রি করে ওঠে। মনে হয়, কী যেন একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে।

এবার আমার মতলব ঠিক করে ফেলেছি। অনেকদিন তো শিকার জোটেনি, খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। নৌকোর লোকগুলো তো বেশ কিছুক্ষণ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। চুপিচুপি জলে নেমে পড়ে সাঁতরে এসে নৌকোর ডালি ধরেছি। এইবারই তো মুশ্‌কিল, ঝাঁকি দিয়ে উঠতে গেলেই যে নৌকো বড্ড দুলে ওঠে। না, দুললো না। ভাগ্যি বোঝাই নৌকো ছিল।

লোকগুলোর কী সাহস দেখেছ !! খুপরিতে একটা কাঠের দরজাও করেনি, একটা মোটা চট্ দিয়ে ঢেকে রেখেছে মাত্র।

ভাগ্যি ওরা টানা সাদা কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখেনি। সাদা কাপড়ে, সাদা রঙে আমাদের ভারি অস্বস্তি। বিশেষ করে তা যদি এক-টানা অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে। কেমন যেন তখন মনে হয়—ওদিকটা বন নেই, ফাঁকা। সারা জীবন দিন-রাত্রি গাছের শুঁড়ি আর সবুজপাতা দেখতে দেখতে এমন হয়েছে নিশ্চয়। টানা সাদা রং দেখলেই আমরা থমকে যাই। সহসা আর সেমুখো এগুই না। নৌকোর লোকগুলো বোধহয় সে-খবর জানতো না।

খুপ্‌রির কাছে নিঃশব্দে এসে মুহূর্তের জন্য থমকে কান খাড়া করেছি। পরিষ্কার ঘর্‌ঘর্ শব্দ। এইবার আমি বেপরোয়া! থাবা দিয়ে চট্ সরিয়ে উঁকি মেরে দেখি, পরপর সব শুয়ে আছে। কিন্তু সবারই কাঁথা মুড়ি দেওয়া, আপাদমস্তক ঢাকা।

খুপ্‌রিতে বেশ ঘন অন্ধকার। সে-অন্ধকারে আমি কিছুটা দেখতে পেলেও, বুঝতে পারছি না—ওদের মাথাগুলি কোন্ দিকে বা পা কোন্ দিকে।

একবার শঙ্কা জাগে মনে—আমি তো খুপ্‌রিতে ঢুকে পড়েছি। আর তার মধ্যে অতগুলো মানুষ। শেষ-বেশ খাঁচার মধ্যে আটকে না পড়ি!

মুহূর্তমধ্যে ঠিক করে ফেলেছি, ঝমাৎ করে একটার মাথা ও মুখ একসাথে কামড়ে দাঁত বসিয়ে দেব। কেমন করে হঠাৎ আমার এ বুদ্ধি এলো জানি না। ঠিকমতো কামড় বসাতে

পারলে সে আর চিৎকার করতে অবকাশ পাবে না, আমিও সহজেই শিকার নিয়ে সরে পড়ার সুযোগ পাবো। কিন্তু মুশ্‌কিল হলো, ওরা সব ওদের মাথা রেখেছে—ঐ ওদিকে, দরজার দিকে নয়। থাবা এক-কদম সামনে রেখে এগুতে হবে ওদের মাথা অবধি। কিন্তু থাবা রাখি কোথায়? কারও গায়ে থাবার চাপ পড়লে তো জেগেই যাবে।

এসব কিন্তু খুব দ্রুত ভাবছি ; এমন সময় দেখি, ডানদিকের লোকটার মাথাটা কাঁথার নিচে থাকলেও বেশ উঁচু হয়ে আছে। কোনও হাঙ্গামার মধ্যে আমরা সাহস দেখতে কখনও পিছ্‌পাও হই না। বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে ঝমাৎ করে তারই গায়ের উপর পা দিয়ে কাঁথা সমেত গোটা- মাথা ও মুখ নিজের মুখের মধ্যে পুরে দ্রুত কামড়ে ধরলাম।

বেশ জোর্‌ করেই কামড়ে ধরেছি। আমার হিংস্র দাঁত বসে গেল অতি সহজেই। কোনও চিৎকার করার সুযোগই পেল না। ঠোঁটে গরম রক্তের আস্বাদ, কেমন যেন আমার মত্ত অবস্থা।

চিৎকার ও হাঁকডাক না করতে পারলে কী হবে, মানুষটা তার পা-দুটো দমাদম আছড়াতে লাগলো ধপ-ধপ করে। তাতেও আমি বিচলিত হইনি, ও তো করবেই। আমাদের কামড়ে মৃত্যুর মুখে সব শিকারই অমন করে।

কিন্তু কাল হলো—এবার পায়ের দাপাদাপি একটা টিনের ওপর হতে থাকে। টিনের খ্যান্‌-খ্যান্‌ শব্দে আমি চম্‌কে উঠেছি। এবার তাহলে তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। কাঁথা সমেতই উঁচু করেছি শিকারের মাথাটা। কিন্তু এ কী! মাথাটা যে আসতে চায় না। গোটা কাঁথাটা যে আমার চার পায়ের তলায় চাপা পড়েছে—আমি তারই উপরে দাঁড়িয়ে!

অগত্যা, নিজের পিঠটা দুমড়ে এক পা হালকা করে ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে নিতে গিয়ে দেখি,—পাশের লোকটা কাঁথা ছুঁড়ে ধড়ফড় করে উঠে পড়েছে। ঠিকই ভেবেছিলাম, অত শব্দে একটা কিছু অঘটন ঘটে যেতে পারে। দরজাটা বন্ধ করে দেবে না তো এবার!

এদিকে পায়ের দাপানিতে টিনটা ধপাস করে কাৎ হয়ে পড়েছে। যেন জলে ভেসে গেল চারিদিকটা। জল, না আর কিছু! কী যেন একটা বিশ্রী গন্ধ!

বনের চত্বর হলে এতক্ষণে আমি কোথায় এক লাফে উবে চলে যেতাম, তার হদিশ থাকতো না। কিন্তু এ যে শিকার মুখে নিয়ে কেমন যেন ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছি! লোকটা অন্ধকারে আমাকে বুঝি দেখতে পায়নি। তা না হলে একটা চিৎকার নিশ্চয় করতো। খস্‌ শব্দে লোকটা আগুন জ্বাললো। অমন একবিন্দু আগুনে আমি ভয় পাবো? লোকটাকে এবার আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। ও নিশ্চয় আমাকেও চিনতে পেরেছে। কিন্তু ওকে এড়িয়ে আমাকে দরজা দিয়ে বেরুতে হবে। মুহূর্ত অপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

গোল গোল চোখ দুটো আরও রোষ-কষায়িত করে আর দাঁত বসান মাথাটাকে নিচে চেপে ধরে গাঁ-গাঁ শব্দে ধমক দিয়ে উঠি। লোকটা বুঝি আড়ষ্ট হয়ে গেছে। থরথর করে কাঁপা হাত থেকে আগুন নিচে পড়ে গেল। সে-মুহূর্তে খুপ্‌রি অন্ধকার। টেনে হিচড়ে শিকার নিয়ে পালাবার এই তো সুযোগ!

কিসের সুযোগ!! দেখি, মুহূর্তের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছে দাউদাউ করে খুপ্‌রির ভেতরই।...আগুন! বাপ্পইরে!

ধুত্তোর আমার শিকার! আগে তো বন্ধ খুপ্‌রির আগুন থেকে পালানো। মুখের খাদ্য উগ্‌রে ফেলে পালাতে পারলে বাঁচি। পালিয়েও এলাম। কিন্তু কোনোমতে। আমার অতবড়ো দেহটা ঘুরিয়ে খুপ্‌রির দরজা দিয়ে বেরুবার সময়ে লেজটা বুঝি আগুনের হলকায় ছ্যাঁক করে উঠল।

কী বাঁচাই বেঁচেছি সেবার! তবু দলের একজনও আমার পিছু নেয়নি। ওরা সবগুলো আগুন ঠেকাতে উঠে-পড়ে লেগেছে। যে-আগুনের আতঙ্ক দিয়ে ওরা আমাকে তাড়ালো, সে-আগুন নেবাতে ওদের কী দাপাদাপি! মানুষেরও আগুন-আতঙ্ক কী কম!

বারো

জলাতঙ্ক! কিসের জলাতঙ্ক! সুন্দরবনে লালিত জীবের জলাতঙ্কের কথা বলা প্রায় ঠাট্টার সামিল। সুন্দরবনকে এক হিসাবে বলা যায় জলা-বন। চারিদিকে জলে জলাকার। নীল জলরাশির কাছাকাছি বিশাল সব নদীর মোহানা; এত বিশাল যে এপার-ওপার দেখা যায় না। তারপর আছে সারা বন ছড়িয়ে অসংখ্য বড় বড় নদী, নদীর পর আছে খাল, খালের পরে পাশখাল, তারপরও আছে শিসে বা শীর্ণ জল-ধারা। এই সব বড় বড় নদ-নদী, খাল ও শিসে আমরা অনবরত পারাপার করি। বর্ষার শেষদিকে বনের পর বন তো জলের প্লাবনে ডুবেই থাকে।

কাজেই আমাদের জলজীব বললেও কোনও দোষের হবে না। জলজীবের আবার জলাতঙ্ক কিসের?

তবু আছে। আমাদের সে-আতঙ্কের কথা মানুষেরা জানে, আর সুযোগ বুঝে তা আপদে বিপদে কাজেও লাগায়।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা বর্ষা কেটে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে আবার এসেছি 'চামটা'র বাদায়। দূর থেকে দেখি, একখানা বড় নৌকো ছোট নদীটার প্রায় মাঝ-দরিয়ায় নোঙর করা। তাতেই সন্দেহ হয়েছে—নৌকোর বহর না হলেও এবং মাত্র একখানা নৌকো হলেও এরা কয়েকদিন এখানে থাকবে। আর কিছু না হোক, অত বড় নৌকো বনের সম্পদে বোঝাই করতে তো দু-একদিন সময় নেবেই।

মানুষগুলো আজকাল বড় চালাক হয়ে উঠেছে। কিছুতেই নৌকোর কাছি বনের গাছের সঙ্গে বাঁধবে না। তেমন বাঁধলে আমাদের ভারি সুবিধে। থাবা আর বাঁকা নখের সাহায্যে কাছি টেনে টেনে দিব্যি মালোর গায়ে নৌকা নিয়ে আসতাম। তাতে নৌকোর লোকের এতটুকুও ঘুম ভাঙতো না; আমিও অতি সহজে নৌকো থেকে মানুষকে মুখে তুলে বনের মধ্যে চকিতে উধাও হতাম। জীবনে যতবারই এমন সুযোগ পেয়েছি, ততবারই কাজে লাগিয়েছি।

তা না, আজকাল সব নৌকোই, তা এককই আসুক আর বহরে আসুক, বাদায় রাত কাটাতে হলে মাঝ-নদীতে নোঙর ফেলে থাকবেই থাকবে। টানা কাছিতে বনের মালোর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখবে না।

নৌকোখানা কিন্তু এপারে নয়, ওপারের কাছাকাছি। ওপার থেকেই নিশ্চয় গোলপাতা কেটে বোঝাই করছে। মাত্র একখানা হলে কী হবে, বেশ বড় নৌকো; আর দলেও ওরা বেশ ভারি। বোঝাই করতে খুব বেশি দিন লাগবে বলে মনে হয় না। নৌকো বোঝাই হলে আমাদের সুবিধা। জল থেকে নৌকোর ডালি তখন বেশি উঁচু থাকে না। উঁচু থাকলে জল থেকে ডালি ধরে উঠতে সময় সময় বেশ বেগ পেতে হয়। শুধু তাই নয়, তেমন হালকা থাকলে আমাদের দেহের ওজনে নৌকো বেশি বেশি দুলে ওঠে। বোঝাই নৌকোতে সামান্য হ্যাঁচ্‌কা মেরে ওঠাও যেমন সহজ, তেমনি নৌকোও বেশি দোল খায় না।

নৌকো এপার হোক বা ওপার হোক, আমাকে জলে নামতেই হবে। নৌকোর লোকেরা

ঘুমিয়ে পড়ার বেশ খানিকটা পরে সুড়সুড় করে জলে নেমে পড়লাম। বুক সমান উঁচু করে সাঁতরে চলেছি। নদীতে যতই ঢেউ থাকুক আর যতই স্রোত থাকুক না কেন, আমরা ঠিক এমনি ভাবেই বুক পর্যন্ত উর্ধ্বে তুলে ধরে সোজা সাঁতরে যাবই যাব। স্রোতের টানে আমরা একটুও এদিক-ওদিক হতে চাই না। দেহে স্রোতের টান লাগতেই আমাদের যেন রোখ এসে যায়, গায়েও দ্বিগুণ জোর এসে যায়।

সাঁতরে কাছে এসে দেখি, নৌকোর ডালি এখনও জল থেকে বেশ উঁচুতে—মাত্র গুরো অবধি গোলপাতা বোঝাই হয়েছে। ভাগ্যি, নৌকার গায়ে একখানা জালি-ডিঙি বাঁধা ছিল। ওতে প্রথমে উঠে সেখান থেকে বড় নৌকোতে উঠতে বেগ পেতে হবে কম।

সঙ্গে সঙ্গে তাতেই আমি উঠে পড়েছি। ঝাঁকি মেরে বিনা শব্দেই ডিঙিতে ওঠা আমার পক্ষে কিছু না। কিছু না হলেও ডিঙিখানা বড্ড আতাড়ি-পাতাড়ি দুলে উঠল। দোলানিতে আমার কোন ব্যতিব্যস্ত হবার কারণ ছিল না। অমন লম্বা লেজ থাকাতে দোলানির টাল সামলানো তেমন কিছু নয়। মানুষগুলো লেজ ছাড়া কেমন করে যে দেহের টাল সামলায় তা ভেবে পাই না।

কিন্তু টাল সামলালে কী হবে, ডিঙিখানা দুলে দুলে বড় নৌকোর গায়ে লেগে লেগে ঢক্-ঢক্ শব্দ করতে লাগে। বিপদ গুনলাম। এবার তো লোকগুলো জেগে যাবে! হলোও তাই। ভিতর থেকে হেঁড়ে গলায় কে যেন তাড়া দিতে লাগে—ওদের বুড়ো মাঝিটা হবে নিশ্চয়।

ঠিক আমার মাথার উপরে খুপ্‌রির জানালাটা। জানালায় ঝুলানো ঝাঁপিতে খস্‌খস্ শব্দ। শব্দ লক্ষ্য করে আমিও ডিঙির গলুইতে চার-হাত-পা জড়ো করে ফেলেছি। ঝাঁপি উপর দিকে ঠেলে তুলতে গিয়ে মাঝির একখানা হাত বেরিয়ে পড়েছে; ঝাঁপি তুলে. নিশ্চয় এবার উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করবে—কেউ ডিঙি নিয়ে চলে যাচ্ছে কিনা? মানুষের বুদ্ধি তো! আমায় একবার দেখে ফেললে কী দিয়ে কী করে বসবে কে জানে। তর সইলো না। হাতখানায় একবার নখ বসাতে পারলেই হবে।

ঝমাৎ করে দু'পায়ে ডিঙির গলুইতে দাঁড়িয়ে পড়েছি। সঙ্গে সঙ্গে থাবা মেরে নখ-দংশনে হাতখানা আঁকড়ে ধরে মেরেছি এক টান। আঠারো মানুষের বল আমাদের এক-এক থাবায়। হ্যাঁচ্‌কা টানে সড়্‌সড়্ করে আমার লোভনীয় খাদ্যকে জানালার ফোকর দিয়ে টেনে নিয়ে এলাম।

কিন্তু আমি যে শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছি ভাসমান ছোট্ট ডিঙির গলুইতে—সে-কথা ভুলেই গেছি। বুড়োও হয়ে গেছি, তাতে আবার খাবার জন্য পেটে জ্বালা ধরেছে। লোভে পড়ে ভুল করে বসলাম। সে-ভুলের মাশুল এবার আমাকে দিতে হলো।

হ্যাঁচ্‌কা টানে মাঝিকে সড়সড় করে টেনে নিয়ে এলাম বটে, কিন্তু সেই ঝুলে ছোট ডিঙি সরে গেল অনেকখানি। আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও পড়লো একেবারে জলে। দীর্ঘ লেজও এবার আমাকে সামাল দিতে পেরে ওঠে না। আমিও সেই সঙ্গে পড়লাম জলে। তখনও মাঝির বাহু আমার নখাগ্রে আটকানো। ডিঙিখানি ধাক্কা খেয়ে সরে গেছে অনেকখানি। অন্য থাবা দিয়ে যে ডিঙির ডালিতে ঝুলে থাকবো জলের মধ্যে তারও পথ নেই।

কই! মাঝির তো ভেসে উঠবার কোনও লক্ষণ নেই। বরং আমার নাক-মুখ জলের তলে যাবার উপক্রম। বিস্তারিত নখকে তাড়াতাড়ি সংকুচিত করে মাঝির হাত থেকে আলগা করতে আমি উদগ্র। নাকমুখ যাতে জলের তলে না যায় তার জন্যে এবার পাগ্‌লা

হয়ে উঠেছি। সর্বদেহ জলের তলে গেলে আমরা এতটুকু বিচলিত হই না। কিন্তু নাক মুখ জলের তলে গেলে যেন দম-আটকে আসে—মৃত্যু-ভয় পেয়ে বসে।

মাঝির বাহু থেকে বাঁকা নখ কোনোমতে আলগা হতেই যেন মনে হলো, এ-যাত্রা বুঝি রক্ষা পেলাম।

কিন্তু মাঝিটা কোথায় গেল ? জলের তলে ? মরুক্‌গে ! কুমিরের পেটে যাবি ? তা যা ! আমার খাবার শিকার অন্যে খেয়ে যাবে ? যাক্‌গে !

দীর্ঘ হাঁফ ছেড়ে নাক-মুখ থেকে সশব্দে জল ঝেড়ে চলে এলাম এপারে। নৌকোর লোকেরা এতক্ষণে কী হল্লাই না লাগিয়েছে। লাঠিসোটা নিয়ে কী হম্বিতম্বি না করছে। আর মাঝে মাঝে চিৎকারে বুঝি বুড়ো মাঝিকেই ডাকছে।

এপারে এসে ঝোপের আড়ালে উবু হয়ে বসে থাবার যে-নখগুলি মাঝির বাহুতে বসিয়েছিলাম, সেগুলি চাটছি—যদি কোনওভাবে রক্তের আস্বাদ মিলে যায়। আর ভাবছি—লোকগুলো কী বোকা ! ওরা ভাবছে আমিই বুঝি মাঝিকে নিয়ে এসেছি। আরে, মাঝিকে নিয়ে আসবো, না নিজের নাক-মুখকে জলের তলে ডোবা থেকে রক্ষা করবো !! জল, বৃষ্টি, প্লাবনকে আমরা থোড়াই কেয়ার করি, কিন্তু নাক ও মুখ জলের তলে যাবার আতঙ্ক আমাদের প্রবল।

কিন্তু মাঝি গেল কোথায় ! শেষপর্যন্ত জলের তলে মরে ভেসে গেল নাকি ! হবেও বা। এইসব আপসোসের কথা ভাবছি, এমন সময়ে দেখি, ওপার থেকে একটা মানুষ ডাকছে চিৎকার-মত্ত নৌকোর লোকগুলোকে। লোকগুলোর বুদ্ধি আছে, সঙ্গে সঙ্গে নৌকায় মশাল জ্বেলে দিল।

মশাল জ্বালতেই ওপারের ডাঙার লোকটা জলের ধারে এগিয়ে এলো। কে আর হবে, বুড়ো মাঝিই হবে নিশ্চয়। ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে নৌকোয় ফিরে এলো।

নৌকার লোকগুলোর হাসি আর আনন্দ কে আর দেখে ! আমার কিন্তু আপসোসের সীমা নেই। তখন এপার না এসে ওপারে উঠলেই হতো ! তাহলে দেখতাম, বুড়ো মাঝি বাঘের কাছ থেকে কী করে রেহাই পেত !

তেরো

বুড়ো মাঝিকে যেমন নিরস্ত্র বন্যজীবের কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছিল, তেমনি বৃদ্ধ ও দক্ষ শিকারী বাঘকেও নিরস্ত্র মানুষের দঙ্গলের কাছ থেকে রেহাই পেতে কীভাবে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছিল—তারও নজির রয়েছে আমার জীবনে।

তখন 'চামটা' বন থেকে নীল জলরাশির দিকে ঘুরতে ঘুরতে 'ছোটহর্দী'-বনের কোল ঘেঁষে 'বাগমারা'-বনে এসেছি। আমরা কিন্তু জানি এই বনটাকে 'শুয়োর'-বন বলে। বড্ডো শুয়োরের আড্ডা এখানে।

এই বন আমার ভালো লাগবারই কথা। শুয়োর খাওয়া যায় হামেশা। তাই এই বনটা মা-র কথা বড় মনে করিয়ে দিতে থাকে। মা আমাকে খুব বেশি বেশি শুয়োরের মাংস খাওয়াতো। মা-র শুয়োর শিকারের কায়দাটা রপ্ত ছিল ভালোই মনে হয়।

শুয়োর কিন্তু হরিণের মতো ক্ষিপ্রগামী নয়। দৌড়-এ এরা আমাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না ; সহজেই এদের শিকার করতে পারি। আর তখন মাংসও খাওয়া যায় প্রচুর, প্রায় পেট পুরে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এদের ঘাড় আর দাঁত নিয়ে। ঠিক ঘাড় নিয়ে মুশকিল নয়,

ঘাড়টা প্রায় নেই বলেই যতো অসুবিধা। আমরা প্রায় সব জন্তুকেই ঘাড়ে আঘাত করে ঘায়েল করি অতি সহজে ও দ্রুত। থাবার প্রচণ্ড আঘাতে, না হয় কামড়ে ঘাড় মট্‌কে শিকারকে নিস্তব্ধ করি। কিন্তু শুয়োরের ঘাড় এত ছোট যে তাতে থাবার আঘাত করা দুরূহ বা দুরন্ত বেগে কামড়ে মট্‌কে দেওয়া দায়।

আর শুয়োরের দাঁত এমন শক্ত ও ধার যে তাতে আমাদের হাড় অতি সহজেই কেটে যায়। ঐ সাদা ধবধবে দাঁত দেখলেই আমরা তেড়ে এগিয়ে যেতে দশবার ভাবি।

শুয়োরগুলো এসব কথা জানে। জানে বলেই, যখনই আমরা ওদের আক্রমণ করতে যাই, তখনই ওরা বড় গাছের গুঁড়িতে পিঠ দিয়ে রুখে দাঁড়ায় মুখোমুখি। আমাদের তখন ওদের দিকে এগুনো দায়। জানি, বেপরোয়ার মতো তেড়ে আক্রমণ করলে জিতবো, কিন্তু আমাদের কোনো না কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্ষত হবেই। শুয়োর বড় একরোখা আর জেদী।

এমন অবস্থায় আমাদের একমাত্র কৌশল হয়, ছলনা। একটু দূরে হঠে এমন ভাব দেখাতে থাকব যেন আমরা শুয়োরকে শিকার করার ব্যাপারে নিরাসক্ত হয়ে পড়েছি। হয় অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখব, না হয় চোখ বুঁজে চুপটি করে পড়ে থেকে ঘুমোবার ভান করব, না হয় শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে পিঠ চুলকাবো, না হয় গাছের গুঁড়িতে নখ চালিয়ে নখ বিস্ফারিত করার অভ্যাসে মত্ত হব—এমনিধারা একটা কিছু করব বটে, কিন্তু সারাক্ষণ আড়চোখে দৃষ্টি ওর দিকেই।

যে-মুহূর্তেই শুয়োর ফাঁকতালে পালাতে দৌড় দেবে, তক্ষুণি ছুটে গিঁয়ে ওর পেছন থেকে এক খাবলা মাংস তুলে নেব—উদ্দেশ্য, এমনি ভাবে বিক্ষত করে রক্ত ঝরিয়ে শেষ-বেশ শুয়োরকে কব্জা করা।

এ-কাজে মা বড় ওস্তাদ ছিল নিশ্চয় ; তা না হলে অমন করে হামেশাই শুয়োর শিকার. করতে পারতো না। তাই বাগমারি বনে আসতেই মা-র কথা বড্ড মনে পড়ছে। আর ক্রমেই জিদ হয়ে উঠেছে, যে-কোনও ভাবে মা-কে খুঁজে বের করতেই হবে। মা যাবে কোথায় ?

মা এখন এতদিন পরে কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে ! কত বর্ষা তো একে একে কেটে গেল, তবু বলতে পারি মা-কে দেখলেই চিনতে পারব। মা-র গায়ের গন্ধ যেন আমার নাকের ডগায় এখনও লেগে রয়েছে।

ব্যাঘ্রের জীবনে এ এক অভিশাপ—সবাই আমাকে হয় ভয় করবে, না হয় স্বজাতি হলে হিংসুটেপনা করবে। এক মা ছাড়া আমাদের জীবনে আর কেউ নেই, যে কিনা আমাদের মনে নির্ভরতা আনতে পারে, যে কিনা আমাদের মনে উল্লাস আনতে পারে। তাই তো এই বুড়ো বয়েসেও এতটা মা-পাগলা হয়ে উঠেছি।

এসব কথা শীতের মেঘের মতো মনে এক-একবার ভেসে আসছে, আর চলে যাচ্ছে 'বাগমারা' বনে বিচরণের ফাঁকে ফাঁকে। এরই মধ্যে হঠাৎ দেখি একদল লোক ডিঙি বোঝাই হয়ে খাল বেয়ে আসছে। কী এদের মতলব ? কোনও বন্যজীব মারতে আসছে ? তা তো মনে হয় না। এদের কারও হাতে তো আগুনে-লাঠি দেখছি না।

কোন জালও তো দেখা যায় না ডিঙিতে। তাহলে মাছ মারতে এসেছে বলে মনে হয় না। অহলে মতলব কী হতে পারে ?

কারও কারও হাতে দা, কুড়ুল বা লম্বা লাঠি বা বোঠে আছে। কিন্তু তাকে সুন্দরবনে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আসা বললে বিদ্রূপের মতো শোনাবে।

এসেছে ঠিক পুরো ভাঁটির সময়। জোয়ার-ভাঁটা সুন্দরবনে এক বিচিত্র জিনিস। এই দেখা যাবে, টইটুম্বুর যে নদী-নালা সব জলে থৈথৈ করছে। কিন্তু ভাঁটি এলে কিছুক্ষণের

মধ্যে দেখা যাবে, কোথায় এইসব জল যাবে তার হদিশ নেই। নদীর কিনারা থেকে জল নিচে নেমে যাবে এতদূর যে আমরা দু'লাফেও এগিয়ে জল ছুঁতে পারবো না। এতটা জায়গা কিন্তু শুধু কাদা। আর সে কাদা কী যা-তা কাদা!

সে-কাদা মোলায়েম পলিমাটির পেলব চরের কাদা। ধবধবে আঠালো। পা দিলেই তা দেবে যাবে আমাদের থাবা ও হাঁটু ছাড়িয়ে দেহ পর্যন্ত।

বড়নদীর এক পাড়ে ভাঙন, অন্য পাড়ে চর। দীর্ঘ চরটাই এমনি কাদার প্রলেপ। ভাঙনের পাড় খাড়াই। ভাঁটির সময় সেখানে ওঠা-নামা করা দায়।

কিন্তু খাল বা ছোটনদীতে প্রায়ই দেখা যায় দু'পারেই চর। আর চর মানেই সেই নরম ও আঠালো কাদা। পা দেবে গেলে তোলাই হাঙ্গামা। তাই তো আমরা ভাঁটির সময় চর বেরিয়ে পড়লে আর ছোট নদী-খাল পার হতে যাই না। জলের মাঝে তাও কিছুটা লাফালাফি করে হিম্মত দেখানো যায়, কিন্তু বাদার এই কাদায় তাও সম্ভব নয়।

কিন্তু এই নিরস্ত্র লোকগুলি অমনভাবে ডিঙি বোঝাই হয়ে এসেছে কেন? তারই সন্ধান নিতে ভালো করে আড়াল নিয়েছি। ব্যাপারটা আগে ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে নিতে হবে, তারপর অন্য কথা।

যদি ওরা মাছ ধরতেই এসে থাকে, তাহলে নিশ্চয় খালের গোড়ায় যাবে। ডিঙিতে সেই মাছ ধরার কালো কালো জাল এখনও দেখতে পাইনি। কীভাবে যে ওরা মাছ ধরবে তা বুঝে উঠতে পারছি না।

যাতে আমার গায়ের গন্ধ ওদের নাকে না যায়, সেদিকে খেয়াল রেখে অনেকটা পথ ঘুরে খালের গোড়ায় আমি আগেই এসে গেছি। এসে দেখি ওরাও সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছে। আমার অনুমান মিথ্যে নয়।

ডিঙি থেকে ওরা নেমেই মাটি-কাদা এনে খালের জলটা বেঁধে ফেলল। আমি বেশি এগুতে পারিনি। আমার সামনেই বেশ খানিকটা ফাঁকা চাতাল বা চত্বর। কেন যে মরতে এখানে কোনও গাছ বা ঝোপ জন্মায়নি তা বলতে পারব না। আমার হয়েছে মুশকিল, এই ফাঁকা চাতালে তো আমি এগুতে পারি না। এগুতে যাইওনি। যেখানে ফাঁকা চাতাল শেষ হয়েছে তারই পাশে ঠিক খালের সীমানায় একটা ঝাঁকালো এবং হেলানো কেওড়া গাছ। গাছটা ঝুঁকে পড়েছে খালের ওপর। খানিকটা দূরে হলেও আমি ভালোভাবেই লক্ষ্য করছি, ওরা কী দিয়ে কী করে।

ওরা প্রথমেই ভালো করে খালের চির্‌চিরে জলধারা বেঁধে ফেললো। তারপর একজন কাটারি হাতে করে দ্রুত হেলানো-গাছটার কাছে এলো। দ্রুত মানে, কাদার মধ্যে হাঁটু অবধি দাবিয়ে দাবিয়ে যতটা দ্রুত সম্ভব।

আমি সচকিত, এই বোধহয় আমার সুযোগ। চার হাত-পা জড়ো করেছি, দুই থাবা ইস্‌পিস করছে। থরথর করে কাঁপছে পায়ের মাংস। আমি তৈরি। আঙুলের নখগুলি যেন আরও বক্র হয়ে বেরুতে উদ্যত।

লোকটা চাতালের উপরে ওঠে না। খালের চরে দাঁড়িয়েই গাছের ডালপালা কাটছে। আমি মাত্র তার মাথাটাই দেখছি। এতটা ফাঁকা চাতাল পেরিয়ে ওর মাথা তাক্‌ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে থাবা মারবো—কিন্তু সেই অবকাশে যদি মাথাটা খালের আড়ালে নিচু করে দেয়! ঝোঁক দিয়েও নিজেকে টেনে রাখলাম। ...না, সবুর!

সবুর করাই ঠিক। আড়চোখে দেখি, দূরে বাকি লোকগুলো সবাই এই লোকটার দিকে

তাকিয়ে আছে উৎকণ্ঠিত হয়ে। বনে এতক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও ওদের সচকিত ভাবটা যায়নি। সবুর করতে আমরা অভ্যস্ত। সহসা হঠকারিতা করা ঠিক নয়। করিও না। জীবনে তো কতবারই দেখেছি—সবুরে শেষবেশ মওকা মিলে যায়, মেওয়াও ফলে।

ফস্‌ফস্ করে লোকটা ডালগুলি কেটে কাদা ভেঙে ভেঙে নিয়ে গেল। সবুর করেছি বটে, কিন্তু মনে মনে একটা আপসোস হতে থাকে—ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হয়েছে!

দূর থেকে দেখি, বাঁধের ধারে জল টল্‌মল্ করছে। সেই জলে ওরা সবাই মিলে ডালগুলি ফেলে তার উপর কাদা বোঝাই করে চাপান দিল। তারপর ক'জনে ডালের ডগাগুলি ধরে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ছোট ছোট সাদা মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে চাপান-দেওয়া কাদামাটির ওপর পড়তে শুরু করেছে।

আর কথা নেই, বাকি লোকগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে টপাটপ্ মাছগুলি ধরে ধরে জমা করছে। সাদা চক্‌চকে মাছ, হয়ত বা তৈলাক্ত পার্শে মাছ। মানুষ মাছধরার কত অভিনব কায়দাই না জানে!

আমি তো সবুর করেই আছি। কিন্তু মাছধরা দেখেই আমার কি কার্যসিদ্ধি হবে? এমন সময়ে, কেন না-জানি, একজন দা-হাতে সেই গাছটারই কোলে এলো ভক্‌ভক্ করে কাদায় ছুটে। আমার গায়ের লোম আবার খাড়া হয়ে উঠেছে একটা কিছু এস্‌পার-ওস্‌পার করার জন্য।

কিন্তু কী মতলবে কী জানি, এসেই লোকটা দাখানি এক কোপে গাছের গুঁড়িতে আটকিয়ে রেখে ছুটে ফিরে গেল। আমাকে দেখেছে নিশ্চয়, তা না হলে অমন করে অস্ত্র ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে কেন? এইভাবেই কি আমার এক মহা সুযোগ মাঠে মারা যাবে! বোধহয় আমার আর দেরি করা ঠিক নয়। কিন্তু খালের অমন নরম কাদায় কী করে ঝাঁপিয়ে পড়ি! চার-হাত-পা যে কাদায় দেবে যাবে!

সবুর! লোকটা ঠিকই আবার ফিরে আসছে। এবার ওর হাতে ছোটহাতলের কুড়ুল। আমাদের চেনা অস্ত্র। খুবই ব্যথা লাগে এই অস্ত্রের আঘাতে। তা হোক্! ও অস্ত্র দিয়ে আমাকে রুখতে পারবে না। তেমন সাহসী হলে বড় জোর আমাকে একটা আঘাত করবে। কিন্তু আমি! আমি ততক্ষণে ওকে সাবাড় করব। আমার তো খেতেই হবে আজ। শিকার আমার আজ চাই-ই।

লোকটা খালের খাদ থেকে বনের চাতারে উঠে আসবার চেষ্টা করছে। এই সুযোগ। বুক অবধি দেখাও যাচ্ছে স্পষ্ট। ঝমাৎ করে এক দৌড়ে ফাঁকা চাতার যেন উড়ে এসে থাবা মেরেছি ঘাড় লক্ষ্য করে। কিন্তু লোকটা ভয়েই হোক আর পা হড়্‌কেই হোক মাথা নিচু করতে গিয়ে সর্‌সর্ করে গড়িয়ে পড়েছে খাদের ঢালুতে। কাদায় সাবধানে কিছুটা নেমে লোকটাকে এবার টেনে এনে কামড়ে ধরব বলে পিঠ নিচু করে বিস্ফারিত নখে থাবা এগিয়ে দিয়েছি।

এগিয়ে দেব কী! সব ক'টা লোক একত্রে হৈহৈ করে হাঁক দিয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, দলসুদ্ধ এগিয়ে আসছে। গোল-গোল চোখে এবার দাঁতের খিঁচুনি দিয়ে গর্জন করি ভয় দেখাবার জন্য।

আগুনে-লাঠি নেই, হাতে ওদের কিছুই নেই। সেইটাই হলো কাল! কিছু না পেয়ে সবাই মিলে খাদের জলা-কাদামাটি আমার দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলো আপ্রাণে গালির পর গালি দিয়ে।

আমার চোখে-মুখে কাদামাটি। কাদামাটির দলা একটানা ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়ছে। এবার

আমার রুখে এগিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা। কাদামাটিতে দাঁড়িয়ে দেহকে শূন্যে তুলে ব্যাঘ্র-লম্ফ তো দেবার কোনো উপায় নেই। ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিশোধ নিতে চাই।

কিন্তু এগুবো কী! দু'চোখের মধ্যে, নাকে-মুখে-কানে কাদামাটি পড়ে আমাকে যেন বেহুঁস করে দিল। দুনিয়া অন্ধকার আমার সামনে!

তাড়াতাড়ি কোনোমতে পিছন ফিরে চলে এসে তবে নিষ্কৃতি পাই।

চোদ্দ

বাগমারি-বন থেকে এসেছি 'নেতিধোপানী'র বনে। এই সেই বন যেখানে বীরদর্পে হাপর-নৌকো থেকে জ্যান্ত মানুষটাকে মুখে করে একলাফে বনের চত্বরে উঠেছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে মায়ের কথা ভেবেই এসেছিলাম সেবার এই বনে।

তারপর 'মরাবালি'-খালে বড় বড় মাছের ফাল্ দেখবার জন্য এগিয়ে যাই। দিব্যি করে বলতে পারি, মাছ খাবার লোভ সেদিন তেমন ছিল না। তবে সুযোগ এলে মানুষ-খাবার লোভ কি কেউ ছাড়তে পারে! হয়েছিলও তাই। এমনি ভাগ্য, মানুষই এবার জুটে গেল শেষ পর্যন্ত।

কীরকম দাপটের মাথায় 'নেতিধোপানী'র বনে যেন উড়ে গিয়ে ছোঁ মেরে নিয়ে এসেছিলাম মানুষটাকে বনের চাতারে—সে-কথা তো এই "আত্মকথা" শুরু করার মুখেই বলা হয়ে গেছে। বনের বেশি ভেতরে গিয়ে বসিনি। একটু এগিয়েই নিশ্চিন্ত মনে খেতে বসেছি।

খাব বলে ঠিক করলেই আমরা অমনি খেতে শুরু করি না। শুরু করতেও পারি না। প্রথমে তো অনেক লড়াপেটা করে তবে শিকার ধরতে হয়। এই লড়াপেটার জন্য যে তোড়জোড় করতে হয় সারাদিন ধরে, তার তুলনা নেই। তারপরও আছে, শিকার করার পর যাতে তার কোনও সঙ্গী বা সঙ্গীরা আমাকে বিপদে ফেলতে বা আমাকে কোনভাবে বিব্রত করতে না আসে, তার জন্য তর্জন-গর্জনে তাদের ভয় দেখাতে হয়। জানান দিতে হয়—যদি তোমরা এগিয়ে আসো, তাহলে তোমাদেরও এমনি করেই শেষ করবো!!

এতসব করে কখনই তক্ষুণি খেতে বসা যায় না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। তাইতে তো খেতে বসেও আমরা মরা বা আধমরা শিকারকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খেলি। মিছেমিছি নানাভাবে থাবা দিয়ে শিকারকে টানাটানি করে বা ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার করার ভান করি। এইভাবেই আমরা মুখে ও গলায় লালসার লালা ঝরিয়ে ভিজিয়ে নিই। যাতে আমার খাদ্যের মাংসপিণ্ড বা চিবোনো হাড়গুলি অতি সহজেই গলাধঃকরণ করা যায়।

নেতিধোপানীর বনে তখন থাবা ও নখাগ্র দিয়ে নকল-শিকার করে মৃত মানুষটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছি আর তারপর খাব্‌লা খাব্‌লা খেতেও শুরু করেছি। যে-কোনও বিপদ সম্পর্কে আমি এতই নিশ্চিন্ত যে, নৌকোর দিকে পেছন ফিরে আর বনের দিকে মুখে করে প্রায় চোখ বুঁজে মহা আরামে চর্বণ ও ভোজনে মগ্ন।

অকস্মাৎ বাজ পড়ার মতো জোড়া লাঠির তীব্র আঘাত আমার লেজের ওপর। আমরা চম্‌কে যাবার জীব নই। তৎক্ষণাৎ ঘুরে রুখে দাঁড়িয়েছি। ঘুরেই দেখি, হাপর-নৌকোর লোকেরা মারমুখো হয়ে গর্জন করে উঠেছে। আমার মাথার উপর উদ্যত একজনের হাতে কালসিটে দীর্ঘ জাল-পোতার লাঠি, আর আরেকজনের হাতে একখানা সুন্দরী-বল্লা। সুন্দরী-বল্লাও এত দীর্ঘ ও ভারী যে তার মাথা খানিকটা নুয়ে পড়েছে। বল্লার গোড়াটা

কুড়ুলের তের্ছা-কোপে কাটা। গোটা কাটা-অংশটা লাল ডগ্‌ডগে। যেন রক্তমাখা কোন ধারালো অস্ত্র উদ্যত।

আমি ক্ষিপ্ত ! এত বড়ো সাহস, আমার সঙ্গে ওরা যুঝতে এসেছে !! এত কাছে যে লাফ দিয়ে শরীরের ওজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব তার জায়গা নেই। থাবা উদ্যত করেছি পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে প'ড়ে। ব্যাদিত মুখ-গহ্বরে ওদের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন ঝাঁপ দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ এক হাঁক্ দিলাম। হাঁকের চোটে আমার মুখ-গহ্বরে যে একখণ্ড মাংস তখনও ছিল, তা ছিট্‌কে পড়লো ওদের সামনেই।

ওরাও বুঝি দিশেহারা। কোনো পথ না পেয়ে অমিতবিক্রমে আমার দন্ত-বিস্ফারিত বিশাল মুখ-গহ্বরে রক্তাক্ত সুন্দরী-বল্লা সোজা ঢুকিয়ে দিল। আমিও অব্যর্থভাবেই ঝুঁকে পড়েছি ওদের লক্ষ্য করেই। ওদের শক্ত হাতের মুঠোতে আর আমার আক্রমণের ঝুঁকে-পড়া বেগে সুন্দরী-বল্লা সড়সড় করে ঢুকে গেল একদম আমার গলার ভেতরে।

পেছনে ঝুঁকে যে বল্লা গলা থেকে বের করে আবার ওদের মাথা কামড়ে ধরবার চেষ্টা করব, তার সুযোগ আর হল না। সুন্দরী বল্লা আমার গলায় বুঝি একদম আট্‌কে গেছে। আরেকজন তো জালের পোক্ত খুঁটি দিয়ে আমার থাবা ও পিঠে পিটিয়ে চলেছে।

আমিও দিশেহারা। কোনও পথ না পেয়ে বাহু ও থাবা দিয়ে বল্লা জাপ্‌টে ধরেছি। আমার অসীম শক্তিধর বাহুর হ্যাঁচকা টানে এবার লোকটার মুঠো থেকে বল্লা আল্‌গা হয়ে এলো বটে, কিন্তু মুখ থেকে বল্লার লাল ধারালো দিকটা আল্‌গা আর হয় না। মুখ-গহ্বরে-বিদ্ধ বল্লা নিয়ে গর্জাই বা কীভাবে, আর তেড়ে আক্রমণই বা করি কী করে !

ঝটিতে সরে পড়ি বনের আড়ালে। গলায় আটক বল্লা মুখে রেখেই উঁচু করে নিয়ে চলে যাই আড়ালে অনেকদূর। শেষমেশ উগ্‌রে আর বাহুর টানাটানিতে বল্লা হঠাৎ মুখ থেকে খুলে আসে। সুন্দরী-বল্লার রাঙা রঙ আমার রক্তে আরও রঞ্জিত হয়ে পড়ে আছে আমারই সামনে বনের চত্বরে।

আর তারই পাশে আমিও ক্লান্তিতে ও যন্ত্রণায় চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকি অনেকক্ষণ।

বলিহারি মানুষের দুর্জয় হিম্মত !!

পনেরো

নেতিধোপানীর বনে চোট্ খেয়েও ওখানেই বেশ কিছুদিন কাটাই। কাটাই বললে ঠিক বলা হয় না—কাটাতে যেন বাধ্য হই। গলার ব্যথায় বহুদিন প্রায় কিছুই খাইনি। শুয়ে, গড়িয়ে, আর ঘুমিয়ে দিন কেটে যায়। এই সময় মায়ের কথা বারবারই মনে হতো—অসুস্থতা সকল জীবকেই বোধহয় মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সময়টা যখন শুয়ে গড়িয়ে কাটাচ্ছি তখন একটা জীবই আমাকে বড্ডো বিরক্ত করেছে। আমাদের গায়ের ভোট্‌কা গন্ধ কেউ যে সহ্য করতে পারে না। শুধু সহ্য করতে পারে না তাই নয়, এই গন্ধ সকলের মনে ত্রাস আনে ; তারা তখন প্রাণ-ভয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। এমন কী মাছিরাও আমাদের কাছে আসে না। তবে একটা মাছি, নাম তার 'সিসি'—একমাত্র সেই মাছিই আমাদের গন্ধে আকৃষ্ট হয়। এই সিসি মাছির দাপটে নিরিবিলি শুয়ে থাকতে পারা যেত না। শিকারমত্ত হয়ে ঘুরবার সময় মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়,—হয়ত এই সিসি মাছির ঘোরা-ফেরা থেকে শত্রুরা আমার উপস্থিতি জেনে ফেলেছে। এদের উপর আমাদের ভীষণ রাগ। বিরাট মুখ ব্যাদানে পিষ্ট ও শেষ করতে চাইলে কী হবে, ফাঁক আলে

এরা কেমন করে যে সরে পড়ে তা ধরতেই পারি না।

সুস্থ হবার মুখে একদিন যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। চললাম 'চাম্‌টা'র বনে। একটা বর্ষা এখানে কাটতেই আবার চলতে শুরু করি। শেষে এসে পড়ি 'চাঁদখালি'-বনে। এখানে অনেক শুয়োর পাওয়া যায়। বলতে গেলে এখানেই আমি শুয়োর শিকারে ওস্তাদ হয়ে পড়ি। মা-ও তো শুয়োর শিকারে দক্ষ ছিল। মা-র সে-দক্ষতা কি এই বন থেকেই ? হবেও বা ! তাহলে তো আমার ডেরা-বন—'গোনা'-বন নিকটেই হবে। কেমন যেন আনমনা হয়ে উঠি !

ডেরা-বনের কথা মনে হতেই আমি ছুটতে শুরু করি। ছুটছি তো ছুটছিই। শিকারমত্ততার দাপটে জোড়া পায়ের কদমে নয়, পুলক-মত্ততার আবেশে সর্বাঙ্গ ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে আগে-পিছু পায়ের কদমে। এই ছোটা যেন মনের এক অজানা অনুরাগ-পুলকে।

নদী ও খালগুলি দেখা অবধি যেন কেবলই মনে হয়—এ যেন আমার অনেক, অনেক আগের পরিচিত। বিশেষ করে নদী ও খালের বাঁক দেখলেই যেন মনে হতে থাকে অতি শৈশবের শিহরনগুলি। চিনি, আমি এদের চিনি। হ্যাঁ, এই তো সেই গাছের সারিগুলি, যেখানে আমি আমার জীবনে প্রথম শিকার করি।

তাহলে তো মা-কে এবার পাবই। এ যে আমার ডেরা-বন। মায়ের সঙ্গে তাহলে দেখা হয়ে যাবে !!

পুলকে পুনরায় সর্বদেহে শিহরন বোধ করি। মনে ও দেহে শিহরনের এই দোলাকে দীর্ঘায়িত করার মানসে দাঁড়িয়ে পড়েছি। দৃষ্টি আমার চারিদিকে, কোথাও বুঝি আচমকা মা-কে দেখেও বসতে পারি !

সুন্দরবনের মাহাত্ম্য অনেক। কোনো আগন্তুককে শুধু দিশেহারা করে না, দিক্‌হারাও করে। এ-বনে সর্বত্র প্রায় একই দৃশ্য। কোথাও কোথাও এমন একঘেয়ে যে কোনও দিক্‌দর্শী-চিহ্ন মেলা দায় ; তাই সহসা দিক্‌হারা হয়ে পড়তে হয়। আমরা এই বনের অধিবাসী, তবু আমাদেরও এই বিপদ সম্পর্কে সাবধানী হতে হয়। তাছাড়া আমরা ঠিক একই পথে ফিরতে চাই। কেননা, জানা পথে অনেকটা নিশ্চিন্তে ফেরা যায়।

এই কাজে আমরা একটা অভিনব পন্থা গ্রহণ করি। সোজা চলতে চলতে যেখানটায় মোড় নিয়ে চলি তারই কাছাকাছি যে ছোট ঝোপ পাই সেখানেই আমরা হিসি করে তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে রাখি। ফিরবার পথে নিজের পদচিহ্ন দেখেও যেমন, তেমনি এই উগ্র গন্ধের প্রতি খেয়াল রেখে রেখে ঠিক একই পথে ফিরি। এরই সুযোগ নিয়ে আমাদের শত্রুরা আমাদের চলা-ফেরার পথে কালো সুতোর টানা দিয়ে আগুনে-লাঠির কল পাতে। তেমন-কিছু সন্দেহ হলে আমরা তখন ডালপালা মুখে নিয়ে চলি, যাতে আমাদের দেহটা লাইন মতো পৌঁছবার আগেই আগুনে-লাঠিতে চোট্‌ হয়ে যায়। সাবধানতার মার নেই !

ডেরা-বনকে সনাক্ত করতে পেরেই আমার আনন্দের আর সীমা নেই। দু'পায়ে দাঁড়িয়ে গাছের গুঁড়িতে নখ বসিয়ে ছালগুলি টেনে টেনে মাটিতে ফেলে দিলাম। ঘন কিন্তু বেঁটে হেঁতাল গাছের একটা ঝোপ দেখেই তাতে আমার হিসির গন্ধ ছড়াতে ভুলিনি। জীবনে যেন এই পথ, আমার ডেরায় আসার এই পথ, খুঁজে পেতে এতটুকু দেরি না হয়।

না, আর দেরি করতে চাই না। আবার দে-দোল দোলে ছুটেছি। এই তো সে-ই জায়গা ! এখানেই তো মায়ের এক হরিণ-শিশুর শিকারকে পণ্ড করে দিয়েছিলাম। এসে গেছি। এসে গেছি আমার জন্মস্থানে—গোনা-বনে এসে গেছি ! এ-বনের প্রতিটি গাছ তো

এককালে চিনতাম। ঠিকই চলেছি—আমার ভিটের দিকে।

দেখতে দেখতে আমাদের পরম প্রিয় আশ্রয়স্থলে পৌঁছে গেছি। কে বলে এটা এককালে মানুষের ভিটে ছিল। কে বলে এতো খোলামকুচি তাদেরই পরিত্যক্ত খাদ্যভাণ্ডারের ! কেন, এগুলি তো আমার মা-ও মুখে করে আনতে পারে।

ভিটের মাটিটা কী সুন্দর ! ঝরঝরে ধুলোরাশি কী সুন্দর ! মুখখানা তাতেই একবার বুলিয়ে অনুভব করে নিই—আমার মায়ের গায়ের গন্ধ তখনও লেগে আছে কিনা। আমার মায়ের ভূমি—মাতৃভূমি ! আমার জন্ম-ভিটে !

অনেকবার ঘুরে ঘুরে গোটা ভিটে অঞ্চল ধূলিধূসর করে দিয়ে এবার ক্লান্তিতে ও আরামে শুয়ে পড়েছি যেন মায়ের কোলের উষ্ণতায়। ঘুমিয়েও পড়েছিলাম বোধহয়।

হঠাৎ এক মোলায়েম শব্দে জেগে গেছি। চরের পলিমাটির প্রলেপের উপর চলন্ত ডিঙি এসে লাগলে যে মোলায়েম অথচ খস্ খস্ শব্দ হয়, ঘুমের ঘোরে এ যেন সেই ধরনের শব্দ বলে মনে হলো

এই তো, আমি এইমাত্রই তো এলাম আমার জন্ম-ভিটেতে। তর সইলো না যেন কারও, অমনি ডিঙি এসে ভিড়েছে ! কোনও কথা নেই, তক্ষুনি তড়াক করে আড়ালে গা-ঢাকা দিতে হলো।

উঁকি মেরে স্পষ্ট দেখি, একে একে কয়েকজনে ডিঙি থেকে উঠে এলো। এরা আনাড়ী শিকারী না হয়ে যায় না। তা না হলে, বনে পা দেবার পরও অমন করে কি কেউ কথা বলে !

প্রথমে যে মালোতে উঠলো, তার হাতে সেই আগুনে-লাঠি। তারপরও যে উঠে এলো, সেও হাতে করে এসেছে আগুনে-লাঠি। তারপরও যে উঠছে, সে তো নরম পিচ্ছিল মাটিতে পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল ; কিন্তু তারও হাতে আরেকটা আগুনে-লাঠি। তারও পরে যে ডিঙি বেঁধে রেখে চত্বরে এসে দাঁড়াল তারও কাঁধে যেন কী একটা অস্ত্র ঝুলছে—হয়ত বা ছোটহাতলের কুড়ুল।

এত সব দেখে আমার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে। আমি যে এখানে এসেছি, এরা যেন তা আগে থাকতেই জেনে-শুনেই এসেছে। তা না হলে অতোগুলো আগুনে-লাঠি সঙ্গে নিয়ে আসবে কেন ? আর অতো তাড়াতাড়ি ঠিক জায়গামতো এসে হাজির হবেই বা কেন ? আমাকে শিক্ষা দিতে এসেছে ? অতোগুলো আগুনে-লাঠি দেখে মাথায় রোখ চেপে গেছে। ভেবেছ কী তোমরা ! আগুনে-লাঠি উঁচিয়ে ধরে আমাকে জন্ম-ভিটে থেকে তাড়াবে ? আমার গায়ের রক্ত যেন গরম হয়ে উঠেছে, গায়ের লোম যেন খাড়া হয়ে উঠছে। পেটে খিদের তাড়না ছিল না, তাই খাদ্যের লোভে বেপরোয়া হবার কারণও বিশেষ ছিল না। অনেক ঘুরে, গোটা বনাঞ্চল ঘুরে ঘুরে অবশেষে আমার শৈশবের ডেরার,—আমার জন্ম-ভিটের সন্ধান পেয়েছি। এখান থেকে আমাকে হটাতে কিছুতেই দেব না। না, কিছুতেই না !!

আমি বেপরোয়া হয়ে উঠেছি। না, তাই বলে আমি হঠকারী নই। অতোগুলি আগুনে-লাঠির সামনা-সামনি গিয়ে পড়ব, এমন বোকা আমি নই।

ভিটে ছেড়ে এসেছি। সরে গিয়ে ভালোমতো আড়ালও নিয়েছি। না, ওরা কিছুতেই সন্ধান পাবে না আমার। আমি সরে এসেছি বাতাসের স্রোত ধরে। কোনও গন্ধের আভাসও মিলবে না ওদের।

ওরা সব ক'জনই একত্রে খটখটে শুকনো ভিটের উপর এখন। একজনে ভিটের এপাশে নরম চত্বরে হঠাৎ কী যেন দেখেছে। দেখবে কী আর ! আমার পায়ের খোঁচ নিশ্চয়। আর অমনি সবাই মিলে হুমড়ি খেয়ে মাথা-ঘাড় নিচু করে পরখ করতে লাগে। মনে হলো, জীবনে যেন ওরা আমাদের পদচিহ্ন দেখেনি।

সুযোগ ! আক্রমণের এমন সুযোগ কে ছাড়ে ? থাবা আর পেছনের পা গুটিয়ে তৈরি হয়েই পড়েছি। ভারি সুযোগ ছিল বন-কাঁপানো গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের সুন্দরবনে শিকারের সাধ মিটিয়ে দেবার !

না, থেমে গেলাম। আমি যে ওদের থেকে বেশ দূরে আছি। এতো দূর থেকে হঠকারিতা না করাই ঠিক। ওরা যখন আমার পেছন নেবার মতলবে আছে, দাও ওদের আসতে, দাও আমার আরও খপ্পরে আসতে।

গুটিগুটি আরও সরে যেতে আরম্ভ করি। কখনও ভালো আড়াল পেলে মাথা-ঘাড় নিচু করে আর হাতের ও পায়ের ভাঁজগুলো বসিয়ে দিয়ে গুটিগুটি দৌড়ে যাই ; আর কখনও বা ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল তেমন না থাকলে যেন চুপিচুপি মাটির সঙ্গে লেপ্‌টে শূলোর ফাঁকে-ফাঁকে নিজেকে 'তারকেল' বা গো-সাপের মতো টেনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

বড়ই কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজ এইভাবে মানুষকে, আমার শিকারকে, খপ্পরে টেনে আনা। যতই পরিশ্রম হচ্ছে ততই যেন প্রতিশোধ-স্পৃহা শানিত হচ্ছে। এছাড়া যে আমার আর কোনও পথ নেই। একবার এই ভিটে ছাড়া হলে, একবার 'গোনা বন' ছেড়ে গেলে যে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা হবার আশা শেষ হয়ে যাবে। না, আমি চাই এমন প্রতিশোধ যাতে আর কেউ কোনোদিন আমাকে এমনভাবে ভিটে ছাড়া করতে না আসে !

ওরা ঠিকই পেছন-পেছন আসছে। আমি ওদের চেয়ে একটু দ্রুত এগিয়ে চলেছি। কিন্তু কেন এই মানুষগুলো আমাদের পেছনে লাগে ? আমরা ওদের অনেককে মারি। মারি, ওদের খেতে চাই বলে। কিন্তু কই ! ওরা আমাদের মারে বটে, কিন্তু কোনদিনও তো ওদের খেতে দেখিনি আমাদের মেরে !! যদি ওরা খেতো, তাহলে কোনোদিন না কোনোদিন বনের চত্বরে আমাদের খেতে দেখতাম। কই, কোনোদিন তো তা দেখিনি !

তবে কেন ওরা আমাদের মারে ? তাতেই আমাদের জিদ,—সুযোগ পেলেই ছেড়ে কথা কইব না।

কিন্তু ওরা ভারি চালাক। ওদের চালাকির কত ঘটনাই তো পরখ করেছি আমার জীবনে। তাই আমিও খুব সাবধানী হয়ে পড়ি ওদের সঙ্গে দেখা হলেই। আমিও হয়ে উঠি বড় চালাক। এই চালাকির খেলায় কখনও বা আমরা হারি, কখনও বা জিতি। হারবই বা না কেন ? ওদের হাতে যে ভীষণ সব অস্ত্র ! আর জিতবই বা না কেন ? আমাদের মনের তেজ ও বাহুর শক্তি যে অপরিমেয় !

অনেক ভাবনাই তো এখন মনে আসছে। একবার মনে হলো যেন ব্যঙ্গের মতো—ওরা ভাবছে আমি পলাতক ! আর ওরা এগিয়ে আসছে সাহসী আক্রমণকারীর মতো ; আর আমি ভাবছি, সাহসী যোদ্ধার মতো আমি ওদের আমার খপ্পরে নিয়ে এলাম বলে !

ভেবেছিলাম আমি ওদের চক্করে ফেলব। বাইরে থেকে যেমন, তেমনি বনের ভেতরেও সুন্দরবন বড় একঘেয়ে মনে হবে আপাতদৃষ্টিতে। সর্বত্রই যেন একইরকম দৃশ্য। কোনও দিক্‌চিহ্ন প্রথম দৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া দায়। এরই সুযোগে, বনের মধ্যে এসে যারা আমাদের পেছনে লাগে, তাদের আমরা বেঘোরে ফেলি চক্কর-কৌশলে। এটা আর কিছু নয়—বেঘোরে ফেলে আচমকা পেছন থেকে আক্রমণ করা।

টানা সোজা না চলে খুবই বড় চক্রের আকারে ঘুরি। তাতেই দিক্‌ভ্রম ঘটে। অনুসরণকারীরা ভাবে তারা তো সোজাপথে আমার পেছন-পেছন এগুচ্ছে ; আর ততক্ষণে আমি বড় চক্রের পথে ঘুরে অনুসরণকারীদের আমার সামনে ফেলেছি। এই সময় দ্রুত পায়ে এগিয়ে অতর্কিতে তাদের পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আজ যারা আমার পেছন নিয়েছে তারা তো বনে নতুন, এদের চক্করের বে-ঘোরে ফেলতে এতটুকুও বেগ পেতে হবে না।

এমন সময় সামনের বিস্তৃত গোলঝাড় আমার মতলব পাল্টে দিল। শৈশব কাল থেকেই এই গোলঝাড় আমার সুপরিচিত।

খুবই ঘন ও বিস্তৃত। ঝাড়ের তিনদিকের টানা-সীমানার গা ঘেঁষেই দীর্ঘায়ত গরান বনের ঠাসাঠাসি ; আর সামনের দিকে একটা খাল। বেশ চওড়া খাল। গোল-গাছগুলি বেশ পুষ্ট আর পাতাগুলিও অনেকটা সোজা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। কেন জানি না, মানুষেরা এর পাতা কেটে নিয়ে যায়নি বহুদিন।

আমার ডান হাতে এই ঝাড় রেখে তারই কোল ঘেঁষে সোজা খালে চলে এসেছি। পা চেপে চেপে হেঁটে এসেছি যাতে আমার খোঁচ্-অনুসরণকারী শত্রুরা কোন পথ ভুল না করে। খালে তখন আধা-জোয়ার। সোজা গিয়ে খালের চরের উপর আমার পদচিহ্ন রেখে রেখে জলে নেমে পড়লাম। চরা-কাদার উপর চিহ্নকে আর পদচিহ্ন বলা চলে না। যেন গত্ত-গত্ত খোঁচের দাগ পড়েছে। তাহলেও অনুমান করতে বেগ পেতে হবে না—আমি জলে নেমে সোজা খাল পার হয়ে গেছি।

স্রোতের নোনা-পানিতে নেমে পড়লাম বটে, কিন্তু ওপার যাই না। সাঁতরে ডাইনে খানিকটা এগিয়ে এপারের গোলঝাড়ের মধ্যেই উঠলাম। এবার দ্রুত গোলপাতার ডগা ঠেলেঠুলে আমার খালে এসে পড়ার পথের ধারে ঘাপটি মেরে ওত পেতে রইলাম। বেশ খানিকটা আগে আসতে লিক্‌লিকে গোলপাতার দোলানি ওরা দেখতে পায়নি।

স্থির হয়ে বসে আছি যেন গাছের গুঁড়ির মতো নিশ্চল ও নিস্তব্ধ। দ্রুত আসাতে বেশ হাঁপিয়েও গেছি। কিন্তু শব্দের ভয়ে নিশ্বাস দ্রুত ফেলা যাবে না। অতি সংযত ভাবেই নিশ্বাস ছাড়ছি। শিকারের পূর্বমুহূর্তে আমরা কী পরিমাণ যে সংযমী হয়ে উঠি তা বলার নয়।

কোনোমতে গোলপাতার ফাঁকে ফাঁকে সামান্যই দেখছি। তার সঙ্গে ওদের পথ চলার যে ক্ষীণ শব্দ কানে আসছে তাতেই বলতে পারি আমার অনুমান কোনমতেই মিথ্যা হবার নয়। আমার পরিষ্কার খোঁচগুলি ওদের সোজা খাল-কিনারা অবধি টেনে নিয়ে গেছে। ওদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ কবার অবকাশ ছিল না যে, ওদের যমদূত ধারে কাছে কোথাও থাকলেও থাকতে পারে!

এতক্ষণ ওরা আগুনে-লাঠিগুলি উঁচিয়ে ছিল। খালের জলের মধ্যে খোঁচ চলে যেতে দেখে ওরা এখন ওপারের পদচিহ্ন লক্ষ্যে আনার চেষ্টায় বিব্রত। আগুনে-লাঠিগুলি সবাই মাটিতে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভাবনায় পড়েছে নিশ্চয়—কেমন করে আগুনে-লাঠি বাঁচিয়ে নিঃশব্দে পার হবে এই খাল।

আমি এখন ওদের এত কাছে যে বিন্দুমাত্র দেরি করতে চাই না। ওদের চক্করে না ফেলে হঠাৎ এমনভাবে আমার খপ্পরে ফেলতে চাইলাম কেন, তা জানি না। হয়তো প্রতিশোধ নিতে চাই, দারুণভাবে প্রতিশোধ নিতে চাই। যেন জীবনে ওরা কখনও গোনা-বনে, আমার ডেরা-বনে, আসতে আর সাহস না পায়। বিন্দুমাত্র দেরি করতে চাই না। দেরিতে কী যে

বিপদ ঘটতে পারে, তা ভাববারও আমার সময় নেই। সামান্যমাত্র কোনো কারণে আমার গন্ধ পেলেও পেতে পারে, সামান্য শব্দে এমনকি একটা ঝিঁঝি পোকাও যদি হঠাৎ ডেকে ওঠে এই গোলপাতার ঝাড়ে, বা বাতাসের ধাক্কায় শিষ-গোলপাতা যদি থর্‌থর্‌ করে দুলে ওঠে—তাহলে আমার বিপদ ও বিপাকের অন্ত নেই। সবক'টি আগুনে-লাঠি এই গোলপাতার ঝাড়ের দিকে উঁচিয়ে ধরবে। উদ্যত অতগুলি আগুনে-লাঠি এড়িয়ে কি···

না, মুহূর্তের দ্বিধা নেই ! ভীম বেগে, প্রবল পরাক্রম ও জিঘাংসা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। গর্জনে গোটা বন থর্‌থর্‌ করে কেঁপে ওঠে। নিজের গর্জনের কম্পিত প্রতিধ্বনি কানে এলে আমরা যেন আরও শক্তিমত্ত হয়ে উঠি। বনও আর মাত্র নীরব দর্শক নয়। বনের প্রতিধ্বনি মেঘগর্জনের মতো ভেঙে ভেঙে প্রকম্পিত করে তুলছে। বনও বুঝি ইঙ্গিতে চায়—তার আশ্রিত জীবের ক্ষিপ্ত আক্রোশ-নিনাদ যেন তার প্রতিধ্বনির উর্ধ্বে ওঠে, আরও উর্ধ্বে ওঠে। তার গহনে অনুপ্রবেশকারীরা যেন ভীত কম্পিত হয়ে পালাবার দিশা না পায় !!

প্রথমেই যাকে সামনে পেয়েছি এক থাবার থাপ্পড়ে ধরাশায়ী করেছি। পাশের জন থতোমতো খেয়ে আগুনে-লাঠিতে চোট্‌ করে দিয়েছে। বে-হিসেবী চোট্‌ ! কাকে ক্ষত করল কে জানে। চোটের আওয়াজে আমি যেন এবাব উন্মত্ত। ক্ষিপ্ত বাঘের ক্ষিপ্রতা ওদের কল্পনার বাইরে। আগুনে-লাঠি দ্বিতীয়বার উঁচিয়ে ধর্‌তে তাকে অবকাশ দিই না। উদ্যত ও বিস্ফারিত থাবার সামনে ঘাড় ও মাথা একটু কাৎ করেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই কামড় বসিয়ে দিয়েছি তার বাহু আর কাঁধ-বরাবর। এক ঝট্‌কায় মুখ থেকে তাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার হুংকার দিয়ে উঠি। আমার তেজ, শক্তি ও প্রতিহিংসাকে রুখবে কার সাধ্য ! আমাকে ভিটে ছাড়া করার দম্ভকে চূর্ণ করে বিজয় হুংকারে গোটা বনকে আবারও প্রকম্পিত করে পলকের মধ্যে আমি উধাও। ফিরেও তাকাইনি, কে ধরাশায়ী হলো আর কে হলো না তা দেখবার জন্য।

রাগ প্রশমিত হলে একবার শেষরাতের অন্ধকারে এসেছিলাম বাদা-আবাদের এই যুদ্ধক্ষেত্রকে দেখবার মানসে। তখন খাদ্যের লোভও যে ছিল না, তা নয়। কেউই ছিল না সেখানে, কোনও লাশও ছিল না সেই নিস্তব্ধ নিথর বনাঞ্চলে।···কী নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর সুন্দরবন এখন কী শান্ত ও সমাহিত বনানী !

গল্পগুচ্ছ

সুন্দরবনের ছাটা-বাড়ি লাঠি

সুন্দরবনের পূব সীমানার কোলে ৪নং ছোটো মোল্লাখালির জেলে বাড়ির এক বড় ছেলে। জেলে পল্লী বটে, তবে সবে গড়ে ওঠা পল্লী। তাহলেও এই পল্লী এখনও বিধবা-পল্লী নামে খ্যাত হয়ে ওঠেনি। এদের দুশো ঘরের মধ্যে পৌনে দুশো ঘরেই বিধবা সৃষ্টি হয়েছে মানুষ-খেকোর দৌরাত্ম্যে। বাঘের দৌরাত্ম্যেই বা বলি কি করে। এদের যুবকদের বনে ওঠার নেশা আর মাছ মারার তাগিদ ও টানই কি কম দায়ী।

বাড়ির বড় ছেলে। বয়স আর কতো হবে। বড়োজোর আট-নয় বছর। বাবা আদর করে নাম দিয়েছিলো—ভোলানাথ। কচি বয়সে কান্নাকাটি করে বিশেষ দাবি-দাওয়া আদায় করতো না। যেমন কিনা ওর দিদি ছোটো বেলায় চিৎকার করে পাড়া মাতিয়ে তার দাবি আদায় করে তবে ছাড়তো। ভোলানাথই বটে। অমন ভারিক্কি নাম দিলে কি হবে, শেষমেশ আটপৌরে নাম এসে দাঁড়ায়—ভুলু। তবে বাবা মাঝে-মাঝে 'ভোলানাথ' বলেই ডাকেন—তখন যেন তার গলায় বিগলিত আদর ঝরে পড়ে।

বাড়িতে দু-পোতায় দুখানা ছোট্ট দোচালা ঘর। গোলপাতার ছাউনি। তার একখানাতে বাবা, মা, আর ভুলু রাত কাটায়। ভারি খটখটে পলিমাটির 'দাওয়া'। তারই ওপর মোটা মাদুর আর তেল চিটচিটে বালিশ নিয়ে ওরা দিব্যি ঘরের দু-কোণায় রাত কাটিয়ে দেয়। শ্রাবণ মাস। ভুলু খেয়ে-দেয়ে তার কোণায় বিছানা নিয়েছে। শ্রাবণধারার একটানা ঝমঝম আর ডোবা পুকুরে ব্যাঙের টানা ঐকতানে ভুলুর চোখ ঘুমে ঢুলঢুলু হয়ে এসেছে।

বাবা ওপাশে আজ সকাল-সকাল এসে মাদুরে গা এলিয়ে দিয়েছে। কোন কথা নেই তার মুখে। ভুলু ভাবে,—আমি জাগা আছি দেখেও বাবা একটা কথাও বললো না ; একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়!

হবে আর কি! দাওয়ার কুপির আলোতে পানের বাটার সামনে বসে সমানে মায়ের বক্‌বকানি চলেছে। বাবা ঘর থেকে দৃঢ় অথচ শান্ত ভাবেই বলে,—না, তা হয় না ; কাল সকালেই যেতেই হবে।

ঘুমন্ত চোখেই বাবার এই ধরনের দৃঢ় ভাবে কথা বলার ভঙ্গিটার কথা মনে পড়ে। বাবা অধীর মণ্ডলের চেহারাটাই দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। যেমন বিশাল বুকের পাটা, তেমনি ঘাড়ের নাতিদীর্ঘ গর্দান শক্তি ও মনের গোঁ-এর দ্যোতক। যখন এই ধরনের কথা বলে, দেহের কোনো-অঙ্গই তার নড়াচড়া করে না, এমনকি চোখেও তার কোনো প্রতিফলন নেই। তবে পাতলা ওষ্ঠ যুগলে ও চিবুকে মুচ্‌কি হাসির রেখা দেখা দেয়। কথাগুলিতে হাজার দৃঢ়তা থাকলেও মুখমণ্ডলে এই হাসির রেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভুলু বুঝে ফেলেছে কি নিয়ে মা-বাপের বিবাদ-বিসংবাদ চলেছে। এর শেষ পরিণতি কিসে, তাও তার জানা। মা ক্রমশই সোচ্চার হয়ে উঠবে. তারপর চলবে উচ্চকিত কিরে ও

শাপান্ত, শেষমেশ মায়ের ফুঁপিয়ে কান্না আর অনুনয় আর মনে-মনে বনবিবির কাছে ছোটোখাটো- 'মানস'।

ভুলু পাশ ফিরেই ঘুমিয়ে পড়লো। একবার শুধু ভেবে নিলো, কাল সকাল-সকাল যেন উঠি।

শুধু ভুলু নয়, সুন্দরবনের উপকূলবাসী জেলেদের প্রতি সংসারের ছেলে-মেয়েদের অভিজ্ঞতা আছে,—বনে ওঠা নিয়ে বাপ-মায়েদের মধ্যে অহরহ এই ধরনের বাদ-বিসংবাদ কেমন ঘটে ও তার পরিণতিটাই বা কি হয়!

পরদিন ভোর সকালে বাবার দু-একটা কথা শুনতে পেয়ে ভুলু ধড়ফড় করে বিছানা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। এগিয়ে দরজার ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে দ্যাখে, বাবা বনে যাবার জন্য তৈরি হয়েই পড়েছে। দেখেই অতি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হাফপ্যান্ট হাঁটু থেকে কোনমতে টেনে তুলতে-তুলতে চিৎকার করে বলে,—বাবা! দাঁড়াও, চলে যেও না, আমি আসছি…আসছি!

বলেই বাঁ-হাতের মুঠোয় প্যান্টটা কোমরে চেপে ধরে গুটি-গুটি ঘরের কোণে গেলো। গত রাতে ঘুমের ঘোরে যা ভেবেছিলো তাই,—বাবা 'ছাটা-বাড়ি' লাঠিটা নিতেই ভুলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটা নিয়ে বাইরে আসে।

মা তখন বিদায় দিতে নীরবে কাঁদছে। বাবা তো ভুলুকে দেখেই উল্লসিত,—আরে! তুই না হলে তো ভুলেই যেতাম রে! আর যখন মনে পড়তো তখন হয়তো উজান ঠেলে ফিরে আসাই হতো না আর। ভোলানাথ! তুই এখন বড় হয়ে গেছিস, তোকে না হলে আর আমার চলে না।…এখন আমি নিশ্চিন্ত,—বলেই লাঠি সমেত ভোলানাথকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগে।

ভোলানাথের আত্মগর্বের হাসি আর মায়ের অশ্রুজলে জেলে-ডিঙিখানি পাঁচজন আবাদী সাঙাৎকে নিয়ে ভাটির টানে পড়লো। সেই সুদূর ভাটোয় বাঘের রাজ্যে শিষে ও খালে নোনা মাছের তিয়াসে।

ছাটা-বাড়ি লাঠি। এ এক বিস্ময়কর লাঠি। সাহিত্য সম্রাটের বর্ণনায় লাঠির মহত্ত্ব এক সময়ে বাঙালী যুবক মনে যে উদ্দীপনা এনেছিলো, সে-কথা এই সুন্দরবনী লাঠিকে দেখলে মনে হবেই। বাঘ-মারা লাঠি। সুন্দরবনের নিরস্ত্র মানুষের হাতের এ এক মহা অস্ত্র। বাঘও একে সমীহ করে। একক ভাবে এগুলে হয়তো তেমন তোয়াক্কা করে না; কিন্তু দলবদ্ধ মানুষের জোড়া-জোড়া হাতে এই লাঠি উদ্যত হলে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী এবং ক্ষিপ্রতম আক্রমণ-কারী জীবও দশবার দ্বিধাগ্রস্ত হবে। কেইবা গণ-ধোলাইকে উপেক্ষা করতে পারে! বন্দুকের সামনে মৃত্যু তো অনিবার্য, কিন্তু তার অগ্নি-গোলা তো নির্দিষ্ট পথে ও নিরিখে ধাবিত হয়। সে-পথকে যে এ দুর্দান্ত জীবও এড়িয়ে যাবার কায়দাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমবেত ছাটা-বাড়ির হিসাব পাওয়া যে দায়!

এই ছাটা-বাড়ি লাঠি আর কিছু নয়,—সুন্দরবনের পশুর গাছের পাকা ও শক্ত সারাংশ দিয়ে তৈরি। প্রথমে দেখতে লালাভ থাকে; কালে তা কালসিটে হয়ে যায়।

দুই ইঞ্চি বেড়ের একটি রড। তিন হাত লম্বা। মাথায় একটা ঈষৎ মোটা গোল বলের মতো, তারপরই ফুটখানেক পরিষ্কার রড—যাতে দুহাতের দুমুঠো দিয়ে সাপটে ও আপ্রাণ শক্তিতে ধরা যায়। সেখান থেকে দুই ইঞ্চি বেড়ের রড়টা টানা নিচের দিকে নেমে গেছে ধীরে ধীরে ঈষৎ সরু হয়ে। আর এই অংশে আটটি শির বা পোল তোলা থাকে এবং লাঠির শেষ প্রান্ত হল মতো। দেখলেই মনে হবে,—এই লাঠির সজোর কষাঘাত গায়ের মাংস

ছিন্নভিন্ন করে ভিতরের হাড় ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।

অধীর বারবার বহুবার ছাটা-বাড়ি নিয়ে নিজের এক কাহিনী ভোলানাথকে শুনিয়েছে। ভোলানাথও প্রতিবারই তন্ময় হয়ে শোনে। এই বয়স প্রশ্ন করার বয়স। না, কোনও প্রশ্ন না করে মুগ্ধ হয় শুনতে থাকে।

অধীরের তখন উঠতি যৌবন। গেছে মৌলী হয়ে সুন্দরবনের গভীরে। আড়বেশি নদীর কোলে ঝিলা-বনে। পাঁচজনের এক দল। সঙ্গে এক অভিজ্ঞ বাউলেও আছে। মধু ভাঙবে। তাই সবাই এদিক-ওদিক গাছের ডালে ডালে মধুর চাক ঢুঁড়ছে। নিঃসাড় বন দেখে বাউলে সচকিত। চারিদিকে কড়া নজর। দলের সকলের হাতে মধু ভাঙার সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও একখানা করে ছাটা-বাড়ি লাঠিও আছে।

বনের চত্বর মোটামুটি খট্‌খটে আর উর্ধ্বমুখী বর্শার ফলকের মতো ঘন শূলোয় প্রায় ঢাকা। শূলোগুলি আর কিছু নয়—পলিমাটির চত্বরের সামান্য নিচু দিয়ে দীর্ঘ গাছগুলির যে শিকড়ের জাল ছড়িয়ে গেছে তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য এগুলি উর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। বেশি না, মাত্র কোনোটা মুঠোম হাত, কোনোটা বা এক বিঘেৎ। ভারি ছুঁচোলো ও পাতলা, কিন্তু যেন লোহার মত শক্ত। কোথাও বেশ ঘন, কোথাও বা ফাঁকা-ফাঁকা। বনের চাতাল বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। খুব অভ্যস্ত না হলে নিচের দিকে না তাকিয়ে হাঁটা-চলাই দায়।

ওরা পাঁচজনে প্রায় কাছাকাছি থেকে একত্রে এগিয়ে চলেছে। এমন সময় আচমকা বাউলের নজরে আসে, সামনেই এক মানুষখেকো। ভারি আরামে শূলোর ফাঁকে-ফাঁকে দেহখানা বসিয়ে দিয়ে আর এক গুচ্ছ ঘন শূলোকে বালিশ করে দিব্যি দুপুরের ঘুমে অচেতন। দেখেই বাউলের মুখে আঙুল। সবাইকে ভীষণভাবে সতর্ক করে দেয়। মুখে কোনও শব্দ নেই ওদের কারও। হাতের ভাষা দিয়েই বাউলে বললো, না, ওকে পাশ কাটিয়ে গেলেও বিপদ। জেগে যদি দ্যাখে আমরা চলে যাচ্ছি, তাহলে রক্ষা নেই। ঠিক আড়ালে আড়ালে আমাদের পিছু নিয়ে এক অসতর্ক মুহূর্তে আক্রমণ করবেই। তৈরি হও সবাই। ছাটা-বাড়ি জোরসে ধরো। কোনমতে চুপিসারে আরেকটু এগিয়ে সব্বাই একসাথে পেটাবো।...চলো।

এতো কথা বলতে বাউলের বেশি হাত নাড়াতে হয় না। সাঙাৎ-রা এভাবে বাগে পেলে পেটাতে অভ্যস্ত।

প্রথম বাড়ি খেয়ে মানুষখেকো একটু নড়াচড়া করলেও অচিরে এলিয়ে পড়ে। বাউলে আর অধীরের বলশালী বাড়িগুলি বাঘের নাকে-মুখে-মাথায় পড়ে। নাক দিয়ে রক্ত গল্‌গল্ করে ক্ষারিত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে যায়।

সে-সময় ব্যাঘ্র-প্রকল্প চালু ছিলো না। তবুও বিনা লাইসেন্সে বাঘ মারা নিষেধ ছিলো। ওরা দ্রুত্ পরের কাজটা সেরে নেয়—সবাই মিলে চামড়া, নখ, লাকিবোন, মাথার হাড় এবং নানা অঙ্গের হাড়ের টুকরো যেন লুটে নেয়। এসব ওদের ওষুধ আর মাদুলি-বানাতে কাজে লাগে।

অধীর মণ্ডল কিছু নেয় না, মাত্র যে-একটা হিংস্র দাঁত ওর ছাটা বাড়ির ঘায়ে ভেঙে যায়, সেটাই-খুঁজে পেতে নিয়ে আসে।

বাড়ি ফিরে এসেই গম্ভীর হয়েই থাকে। দু-একবার গল্পটা বলে বটে, কিন্তু সারাক্ষণই ওর ভাবনা, কোথায় এবং কেমন করে দাঁতটা রাখবে। শেষমেশ ছাটা-বাড়ির লাঠিটার মাথায় করিয়ে কুরিয়ে দাঁতটাকে শক্ত করে বসিয়ে দেয়। হয়ত নিজের ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস জাগরূক রাখতে চায় এমনি ভাবেই।

আর ভোলানাথ ! গল্পটা শোনা অবধিই লাঠিটাকে আর সে লাঠি দ্যাখে না—দ্যাখে শুধু বাঘের ছায়া ! আজ সকালে যখন বাঁ-হাতের মুঠোয় তার পরম্ভ হাফপ্যান্ট চেপে ধরে লাঠিটা অতি গর্বের সঙ্গে এনে বাবাকে জড়িয়ে ধরে, তখনও তার চোখ অনিমেষ ভাবে আবদ্ধ বাঘের ঐ ভাঙা দাঁতের প্রতি।

* * * *

অধীরের সাঁই মোল্লাখালি থেকে গোঁয়ার ও গাড়ল নদী বেয়ে সজনেখালি বন-কর অপিসে আসতেই ভাটার টান শেষ। আবার সেই টান পেতে ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

এই ঘণ্টা ছয়েক সময় ওদের আবশ্যকও ছিলো। বিনা পাসে সুন্দরবনে প্রবেশ নিষেধ। বিনা-পাসে তো এই বনের একটা পাতায়ও হাত দেওয়া যাবে না, মাছ ধরা দূরের কথা।

অপিস থেকে পাস বের করতে করতে সন্ধ্যাও হয়ে আসে। আর সেই সঙ্গে নদীতে ভাটার টানও এসে যায়।

শ্রাবণের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কখনও কখনও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। এবার ওদের প্রায় সোজা দক্ষিণে নামতে হবে গোমর নদী বেয়ে। গোমর বেশ চওড়া নদী। অমাবস্যার গোনে এ নদীর জল দুরন্ত বেগে ছোটে।

ওরা যাবে দক্ষিণে ব্যাঘ্র-প্রকল্পের 'মধ্যমণি'।

মনে করা ভুল হবে, গোটা সুন্দরবনই বুঝি ব্যাঘ্র-প্রকল্পের আওতায়। সমগ্র বনের মধ্যে মাত্র পুবে বাংলাদেশের সীমানা বরাবর 'হরিণভাঙা' নদী আর পশ্চিমে 'গোসাবা' নদীর অন্তর্বর্তী বনাঞ্চলটাই ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এলাকা। এই এলাকা আবার তিন ভাগে চিহ্নিত :

'কোর' বা 'মধ্যমণি', এই এলাকার মাঝখানে বলা যেতে পারে। বাঘের প্রধান আড্ডা ও বিচরণভূমি। চামটা-বনকে ঘিরেই এই অংশ। এই অংশেই বিখ্যাত হলদি-টাওয়ার।

এই অংশেরই দক্ষিণে 'প্রিমিটিভ' বা 'উঠতি বন' বিস্তৃত হয়ে আছে সমুদ্রকূল অবধি। এরই মধ্যে গোনা-বন ও বাঘমারা-বন। নতুন গাছ-গাছড়া, মাটিও তেমন শক্ত নয়। যোগার জোয়ারে এ অঞ্চল সহজে প্লাবিত হয়।

আর 'মধ্যমণির উত্তরে 'বাফার' অঞ্চল বা 'সীমান্ত-রক্ষক' অংশ। মধ্য-মণিকে বাঘের দুর্গ বললে অত্যুক্তি হয় না। এই দুর্গের সমগ্র উত্তরাঞ্চল জুড়ে 'বাফার' এলাকা। এরই গা ঘেঁষে শুরু মানুষালয় বা আবাদ অঞ্চল। সজনেখালি-বন, পাখিরালয়-বন, সুধন্যখালি-বন, পীরখালি-বন, চাঁদখালি-বন, ঝিলা-বন, আরও অনেক ছোটখাটো বন ছড়িয়ে আছে 'বাফার' এলাকায়। বাঘের-মানুষের চিরন্তন দ্বন্দ্বে এই এলাকা প্রথম ধাক্কা সামলাবার রণক্ষেত্র বাঘেদের তরফে। এখানে ওরা টহল দিতে আসে যেন ওদের দুর্গকে রক্ষা করতে। আর সেই সঙ্গে ওদের শিকারের তল্লাসিতে।

মাছের সাঁই সাঁই-সাঁই বেগে চলেছে 'মধ্যমণির' দিকে। সামান্য বৃষ্টি যেমন পড়ছে তেমনি মৃদু পুবে বাতাসও দিয়েছে। এই বাতাসকে ওরা কাজে লাগিয়েছে পাল তুলে। ডিঙির গলুই 'কুল-কুল' কথা বলে উঠেছে।

এতক্ষণ ডানদিকে আবাদ আর বাঁ-দিকে পীরখালি বন। সামনে গোসাবা নদীর বিশাল ত্রিমোহনা। এপার-ওপার দিনের আলোয় না দেখার মতো।

তে-মোহানা ছাড়াতেই ডান হাতে ধুপনির বন,—'মধ্যমণি' এলাকা সংলগ্ন। এখানেই নেতাধোপানি ভগ্নমন্দির। নেতা ধোপানি মনসাদেবীর বোন। এই বোনই বলতে গেলে

মনসাদেবীকে সর্পবিশারদ করে তোলেন। তাই মনসাদেবী কালে সর্পদেবী হয়ে ওঠেন। এখন এই ভগ্ন মন্দির অঞ্চলে বাঘ যেন গিজগিজ করে। এখানে এলেই মালুম হবে, তুমি ব্যাঘ্র-প্রকল্পের মধ্যমণির আওতায় এসে গেছো। অনেকেই আসে এই গভীর বনের মন্দির দেখতে। এর সামনেই শক্ত লোহার জালে ঘেরা একটা টাওয়ার করা আছে, দূর থেকে দেখার সুযোগ করে দিতে। এই ভাঙা মন্দিরে প্রবেশ করা দুরূহ। বিষধর সাপ এখানে যেন কিলবিল্ করে।

'মধ্যমণির' মুখেই বাঘের দৌরাত্ম্য দেখলেই আঁতকে উঠতে হয়। মন্দির ও টাওয়ারের মাঝে একটা সরু শিষে-খাল। জোগার জো' এলে এই শিষেতে জল আসে। মন্দিরে যাবার জন্য শিষের উপর একটা শক্ত কাঠের সাঁকো বানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। উঁচু জায়গা পেয়ে বাঘেরা এই সাঁকো দিয়ে চলাফেরা করতো। অজস্র কাদামাখা থাবার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে এই সাঁকোর পাটাতনে। একবার এসে দেখা যায়, বাঘ কি জানি কি কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে সাঁকোটা থাবার সবল আঘাতে আর হিংস্র দাঁতের কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে পুরো ভেঙে ফেলেছে। সুন্দরবনের বাঘের রাগ ও তেজের পরিমাপ করা দায়।

'মধ্যমণি'-তে ওদের সাঁই এসে গেছে। আর কয়েক বাঁক মাত্র এগিয়ে 'পালাবন'। এই বনে ওরা যাবে তারা-নদী বেয়ে। তারা নদী মাঝারি গোছের। এতে কিছুটা এগিয়ে গেলে ডানহাতে বানিখাল প্রবেশ করেছে বনের গভীরে। এইখাল কিন্তু দোয়ানী বা ভারানী নয়, অন্যমুখে কোনও নদীর সঙ্গে যোগ নেই। বহুদূর এগিয়ে জলামতো হয়ে বনের চত্বরে মিশে গেছে।

সাঁই-এর গন্তব্যস্থল এই বানিখাল। এতো ঘোর-প্যাঁচ খেয়ে এখানেই এলো, কেননা অধীর একবার এখানে এসেই অঢেল মাছ পেয়েছিলো। সেই লোভেই সময়-অসময় ঝা বৃষ্টি-বাদল উপেক্ষা করে আবার আসা।

লোভেতে তো কোনও দোষ নেই, ওদের তো মাছ মেরেই পেটের ভাত যোগাতে হবে। তবে এবার বড্ড বে-টাইমে এসে গেছে। গোন-বে-গোনের পথ, তাই এমন ঘটনা সুন্দরবনে হামেসাই ঘটে। 'বাঘের-টাইম' বলে শিকারীদের একটা সময় চিহ্নিত আছে। দুপুরে বিশ্রাম ও গড়িমসির পর বেলা চারটায় বাঘেরা তাদের খাদ্য-শিকারে বেরোয়। সে-টাইমও চলে গেছে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার প্রথম ভাগের শেষে ওদের সাঁই বানিখালে এসে পৌঁছে। তখনও যে কিছুটা কাজ সেরে নেবে, তারও উপায় নেই। সম্ভবও নয়। তা হবে হঠকারিতার সমান। বাঘ তখনও বনে-বনে ঘুরছে শিকার সন্ধানে। ডিঙিতে রাত কাটাতেই হবে এই নিঝুম অন্ধকারে।

সমস্যা হচ্ছে, খরস্রোতা নদীতে কি করে ডিঙি বেঁধে রাখবে নিরাপদে ? মহলের কোনও গাছের সঙ্গে কাছি বেঁধে রাখাও এক মহা বিপদ। 'মধ্যমণি'র বাঘেরা তেমন সুযোগ কখনই ছাড়বে না। মাঝরাতে এসে কাছি দুই থাবায় ধীরে ধীরে টেনে তীরের কাছে এনে ঘুমন্ত মানুষকে অতি স্বচ্ছন্দে মুখে তুলে নিয়ে যাবে।

এ-সব তো ওদের জানা, তাই ছোট্ট ডিঙির সঙ্গে ওদের নোঙরও থাকে। সাবধানীর মতো ওরা নোঙর ফ্যালে প্রায় মাঝ-নদীর কাছে।

অধীর সবাইকে বললো, —নাও, এখন ঠিকমত নিশ্চিন্তে বসে উনুন ধরাও। চালে ডালে পাকাও, সঙ্গে কয়েকটা আলু ফেলে দিও ; আর রসুন ফোঁড়ন দিও। যা বৃষ্টিতে ভিজেছি, 'শরীল' এতে গরম থাকবে।

সাঙাৎ বীরেন বলে, —তা তো ভালই হবে, দাদা। কিন্তু রাতে বনের মধ্যে আগুন

ধরাবে, বড়মেঞা যে বুঝে ফেলবে মানুষ এসেছে এই বনে।

—তা কি তোরা ভাবচিস্ এতক্ষণও ওরা ঠাহর পায়নি। ডিঙি দেখেই ওরা বুঝে নিয়েছে. আর সারারাত ধরে মালে বসে বসে নিঃশব্দে আমাদের লক্ষ্য রাখবেই।

—কাল সকালেও থাকবে ??

—থাকবেই তো! তুই কি একবার মাছের সন্ধান পেলে ঘাপটি মারিস না! তবে কি জানিস, তখন অনেক দূর সরে ঝোপের আড়ালে আমাদের লক্ষ্যে রাখবে...আমরা তো তখন দিনের আলোয় দল বেঁধে ছাটা-বাড়ি উঁচিয়ে থাকবো, কোনও কিছু ঘাবড়াবার নেই রে আমাদের!...আমি তো দেখেছি, ওদের মতলবকে কেমন করে বে-মতলব করে দিতে হয়!

খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর সকালে উঠেই ওরা মহা খুশি। পরিষ্কার আকাশ। দেবতার সোনালি আলো ছড়িয়ে পড়েছে বনের সবুজঘন পাতার ছাতার ওপর।

তাড়াতাড়ি ডিঙি বানিখালের মুখে বেঁধে মহলে উঠেছে। দড়ি, জাল আর খুঁটোগুলি হাতে-হাতে নিয়ে এবার বনে। সাঙাৎরা সবাই আগে অনেকবারই বনে এসেছে। বনে চলাফেরায় অভ্যস্ত। সবাই মালের চারিদিকে ভাল করে.নজর দিয়ে তারপর নরম মাটিতে বড়মেঞার কোনও সদ্য খোঁচ আছে কিনা তা দেখতে দেখতে বনে প্রবেশ করেছে।

অধীর সবার আগে কিন্তু অন্য সবাই তাকে ঘেঁষে-ঘেঁষে কাছাকাছি থেকে এগুচ্ছে। ওরা এখন খালের কোল ধরে এগিয়ে যাবে বেশ কিছুটা খালের আগ-মাথার দিকে। তারপর খাল-পাটা জালে বাঁধতে হবে এপার-ওপার গোটা খালটাই। ভাটিতে খালেরজল বেশ নেমে গেছে। প্রথমে জালটা বাঁধবে উপর দিকে। দু-পারের গাছের গুড়িতে গুড়িতে। পরে যখন খালটা জোয়ারের জলে ভরে যাবে, আর সেই সঙ্গে মাছের ঝাঁকও আলতো ভেসে যাবে আগ-মাথায়, তখন সাঙাৎ-রা আবার এসে খাল-পাটা জালের নিচের দিকটা ডুবে ডুবে খাদে খুঁটো পুঁতে ভালভাবে আটকে দেবে। ভাটির টানে মাছের ঝাঁক জালে এসে আটক পড়তে থাকলে জেলেদের আনন্দের সীমা থাকে না বটে, কিন্তু ওদের বনের বিপদও এই সময়ে ঘনিয়ে আসে।

তা আসুক ওরা পাঁচজনে এগিয়ে চলেছে। আর ভাবছে—ভাববেই বা কি আর—বাঘ, বাউলে, আর মাছের কথা। তাতেই মত্ত।

অধীর তো বাউলে নয়, কখনও কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে বাউলে হয়নি ; তবু কার্যগতিকে বাউলের দায়িত্ব এসে পড়েছে। তাই মস্করা করে করে সাঙাৎদের চাঙ্গা রাখবার চেষ্টার বিরাম নেই।

এমন সময়ে ডানদিকে একটা লতানে বেতঝোপের মধ্যে খর্খর্ শব্দ। সবাই সন্ত্রস্ত ও টান্টান্ হয়ে পড়েছে। অধীরেরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেদিকে। ছাটা-বাড়ি লাঠি সবাই একহাতে ধরে ফেলেছে। মুহূর্তে একটা দাঁতালো বুনোশুয়োর ঘোৎ-ঘোৎ করতে করতে ছুটে পালিয়ে গেলো ঝোপ থেকে।

অধীর সবার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হেসে বলে,—আমাদের চলার শব্দে 'বড়মেঞা' বলে ভেবেছিলো। মুখবাড়িয়ে দ্যাখে, চারপেয়ে নয়, দোপেয়ে! যেন লজ্জা পেয়ে ছোট্ট লেজ নাড়াতে নাড়াতে দে-ছুট্!

বীরেন যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে আবেগে বলেই বসে,—আচ্ছা বাউলেদা! তুমি অমন মুচ্‌কি হাসলে কেন?

—কেন?...ওটা আমার অভ্যাস। জানিস আমার বউ কি বলে? বলে, আমরা তোমার

মুচকি হাসিতে ভুললেও 'বড়মেঞা' কিন্তু তোমার মুচকি হাসিতে ভুলবে না। খেই-মেই করে দাঁতখিঁচিয়ে গর্জে উঠবে, তাতে হয়ত সে থমকে যেতে পারে।...অমন মুচকি হাসি তোমাকে বাঁচাবে না।

সবাই মুচকি নয়, হো-হো করে হেসে ওঠে। বনের গভীরে এমন হাসা নিষেধ আছে। তেমন হাসির আবেগ বনে আসতেই চায় না। তাহলেও এই হাসির ঝঙ্কারে ওদের শঙ্কান্বিত মনে বুকের ধুকধুকানি যেন খানিকটা কমিয়ে দিলো।

জায়গা মতো স্থানেই এসে ওরা খালের এপারে গাছের গুঁড়িতে জাল বেঁধে দিয়েছে। এবার কে খালের ওপার দড়ি বাঁধতে যাবে? তা নিয়ে যদি কারও মনে শঙ্কা জাগে, তাই অধীর আগে ভাগে বলে,—আমিই যাচ্ছি ওপারে। তবে আরেকজনকে তো লাগবেই। কে...।

'কে' বলতেই উৎসাহী যুবক বীরেন দ্রুত এগিয়ে এলো। শুধু উৎসাহের জন্য কিনা, তা বলা দায়—হয়তো ও বাউলেদার সঙ্গই ছাড়তে চায় না।

শেষ ভাটিতে ছোটো খালের ঝির-ঝিরে জল পেরিয়ে যাওয়া তেমন কিছু নয়। তবে সুন্দরবনের পালিমাটির 'প্রেম কাদা' হাঁটু অবধি আঁকড়ে ধরবে—এই যা।

ওপারে উঠেই অধীর বলে, —বীরেন, তুই দু হাতে ছাটা-বাড়ি বাগিয়ে থাক এই গাছের গোড়ায়, আমিই ফস করে জালের দড়িটা ফাঁস-গিটে লটকে দিচ্ছি।

কাজ সেরে খোটাগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে অধীর একটু জোরে-জোরে বলে,—চল্ এবার, আমরা দুজনে এপার দিয়ে খালের মুখে ডিঙিতে যাচ্ছি,...তোরা তিনজনে ওপার দিয়েই এগিয়ে চল্। দেখিস, ছাটাবাড়ি লাঠিটা যেন দু হাতের মুঠোয় থাকে।

হাঁটতে শুরু করলে শুলোর গতিকে পরস্পরে সামান্যএকটু-আধটু তফাৎ হয়েই পড়ছে। অধীর একবার ওপারের তিন সাঙাৎকে বলল, —হাওয়াটা যে-পানে বয়ে যাচ্ছে সে-পানেই বেশি নজর রাখিস্। তোদের একজনের তো পাতলা দাড়ি আছে, তা দিয়ে হাওয়ার গতিটা বুঝে নিবি।

বাতাসের গতি সুন্দরবনে এক মহা নির্দেশক। বনের বাঘ এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। ওরা বাতাসের গতি অনুমান করে নেয় ওদের ঠোঁটের দু কোনায় যে গোঁফ আছে তা দিয়ে। বাঘ কখনই মুহড় বাতাস ছাড়া শিকারের দিকে এগুবে না। ওরা ওদের গায়ে তীব্র গন্ধ সম্পর্কে অতি সচেতন। যেমন ওদের চলনের টুক্ শব্দও শিকারের কানে যাতে না যায়, তেমনি ওদের গায়ের গন্ধও শিকারের নাকে যেন কোনও মতে ধরা না পড়ে।

খালের মুখে এতক্ষণে ওরা এসে গেছে। অধীর তো নাক্-কান-চোখ সজাগ রেখে মাথা এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে। নাকের ডগাও ফুলিয়ে ফুলিয়ে শ্বাস গ্রহণ করছে—যাতে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও ওরা না হারায়।

সর্ব প্রচেষ্টা বৃথাই !!

বন শেষ হতেই নদীর চরে ডিঙি দেখা যায়। আর দেখা যেতেই বীরেন যেন নির্ভয়ের হাফ্ ছেড়ে বাঁচে। কতক্ষণই বা দেহ-মন টান্-টান করে সচেতক হয়ে থাকা যায়!

বীরেন অন্যমনস্ক। এবার তাড়াতাড়ি ডিঙিতে ওঠার একমাত্র চিন্তা। শিকারের এই অন্যমনস্কতাতেই বাঘের কাছে অতি প্রেয় ও চরম মুহূর্ত। এই সুযোগের অপেক্ষায় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছোট্ট ঝোপের আড়ালে ঘাপ্‌টি মেরে থাকে।

ছিলও তাই। পলক পড়তে না পড়তে তীব্র বেগে দুই বিশাল ঝম্পনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বীরেনের ওপর পলিমাটির দীর্ঘ চরে। শিকার করার এই ধাপে বাঘের ক্ষিপ্রতা আর তার

যে-কোনো অঙ্গেই মুহূর্তে শক্তি জড়ো করার ক্ষমতার তুলনা নেই—বিশেষ করে সুন্দরবনের মানুষখেকোর। বাঘের এমনিতে ধীর গতি। ক্ষীণকায়া হরিণের সঙ্গে যেমন দৌড়ে পেরে ওঠে না, তেমনি ঘোৎকা বুনো শুয়োরেও বাঘে তাকে ছুটে ধরার আগেই গাছের গুড়িতে খুঁটি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু শিকার-মুহূর্তে বাঘের ক্ষিপ্রতা যেন বিদ্যুৎসম।

বীরেনের ওপর এক ঝিলিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে ও পিঠে জোড়া থাবার আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করেছে। মুখ-থুবড়ে কাদার মধ্যে সে পড়তেই ঝমাৎ করে তাকে এক কামড়ে তার ঘাড় মটকায়।

ঘাড়ে দাঁত বসাতে বসাতে বড়ো-বড়ো গোল-গোল চোখের তীর্যক চাহনিতে একবার দেখে নেয়,—সামনেই ক্ষিপ্ত যমদূত! —অধীর। সে-ও কাঁধে ঝোলা খোটার বোঝা ফেলে দিয়ে ছাটা-বাড়ি মাথার উপর তুলতে ব্যতিব্যস্ত। সে-ও যেন গজরায়,—শালা! এতো বড়ো সাহস! আয় শালা!!

—তবে রে!! তোর আবার এতো দাপট!!

—বাঘ গর্জন ও গোঙানিতে এমনি ধারা আওয়াজ তুলে যেন সেকেণ্ড পার হতে দেয় না। বীরেনের ঘাড়ের কামড় এক ধাক্কায় ছাড়িয়ে নিলো। দুরন্ত বেগে ছুটেছে অধীরের দিকে।

ছাটা-বাড়ি উদ্যত করার অবকাশ মেলে না। বাহু ও পিঠে জোড়া থাবার আঘাতে অধীরও ধরাশায়ী। চরের কাদায় পড়েছে বটে, কিন্তু কাৎ হয়ে পড়েছে।

শিকারের এত মোটা শক্তিশালী গর্দান, বাঘের হয়ত অনুমানের বাইরে ছিলো। তবুও তার মুখের বিশাল ব্যাদানে কামড় বসিয়েছে গর্দানে। দাঁত বসে গেছে কানের পেছনের পেশিতে আর পিঠে। দেহের দুপাশে কাদায় দুই থাবা দিয়ে মুখে ঝুলিয়েছে অধীরকে। এবার চর থেকে বনে ওঠা।

মুহূর্তে অধীর বুঝে নেয়, সে জ্ঞানহারা হয়নি। বেশ শুনতে পায় খালের ওপারে দলের তিনজনের ঝোপঝাড়ে লাঠির পেটানি আর দাপানি, —মার শালাকে!...একজনকে মেরেছে, আরেকজনকে টেনে নিয়ে চললো বনে! নিয়ে গেলো রে!! নিয়ে গেলো রে!!

বাঘের দীর্ঘ লম্বা জিহ্বা, দাঁতের ফাঁক দিয়ে গায়ে এসে ঘেঁষটে ঘেঁষটে লেগে ওকে আরও সজাগ করে তোলে।

বাঘের মুখে ঝুলছে। বুকের তলায় দুই বিশাল থাবার মধ্যে অধীরের দেহ। হাতের লাঠিটা বাঘের দাপটে হাত থেকে পড়ে গেছে, ...না! একবার ওকে বনে নিয়ে যেতে পারলে কামড়ে-কামড়ে খাব্‌লে -খাব্‌লে খেয়ে ফেলবে। না, কিছুতেই নয়! ওকে টেনে নিয়ে যেতে দেয়া নয়,...কিছুতেই নয়,...না!!—সর্বাঙ্গের শক্তি যেন ওর চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

মানুষখেকো ওকে টানতে টানতে চরের আরও উপরে উঠেছে। এবার বনের চাতাল চর থেকে একটু উঁচুপানা। বাঘও বুঝি শক্তি জড়ো করেছে ওকে মুখে করে ঝাঁকি দিয়ে উপরে উঠতে।

না! আর দেরি নয়। গায়ে যেন তার ভীমের মতো তাগদ অনুভব করে অধীর!—দু হাত দিয়ে বাঘের দুই থাবার বাহুকে ঝমাৎ করে জাপটে ধরে। কাৎ হয়েই আপ্রাণ শক্তি সেও কেন্দ্রীভূত করে তার বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়ে।

বাঘ অচল। কিছুতেই সে কামড়ে জোর রেখে থাবা ছাড়াতে পারে না, কদম দেওয়া তো দূরের কথা। অধীরের নিম্নাংশ দেহটা প্রায় সমতল পলিমাটির চরে ছ্যাড়্‌-ছ্যাড়্‌ করে উপরে উঠছিলো। এবার হঠাৎ অসমতল জমি পেয়ে নিম্নাংশ আটকে যাবার মতো। ওর হাঁটুও

মাটিতে বসিয়ে যেন খুঁটি মেরেছে। অধীরের হাঁটুর জোরও এখন বাহুতে চালিত। ভীমের শক্তি এখন দ্বিগুণ।

বাঘও তার বাহু ও থাবা আরও দৃঢ় ভাবে আট্‌কে গিয়ে আর সঙ্গে-সঙ্গে মুখের কামড়ে জোর রাখতে গিয়ে তার গলার ও কাঁধের ঝাঁকুনি দিতে অপারগ।

বাঘের বেগতিক। কোনও পথ নেই। বীরবিক্রমে শিকার করতে এসে এমন ঝামেলায় তো সে কখনও পড়েনি। মুখের কামড়ে তার শিকার, অথচ তার শক্তিশালী বাহুদ্বয় অচল।

হঠাৎই মুখের কামড় ছেড়ে দেয়। মানুষের ক্ষত-ঝরা রক্তের স্বাদও তার অনুভব করার অবকাশ নেই। কামড়, ছেড়ে এবার গলা-কাঁধ-বুকের সমবেত ঝাঁকুনীতে বজ্রসম বাহুবন্ধন মুক্ত করে নেয়।

এখন !!···না, এটা বড়ো ঝামেলার মানুষ, না ওকে নয়।

বহু বন্ধন-মুক্ত করতে যে ঝোঁক দিতে হয়, সেই ঝুলেই চটাং করে ছুটে গেলো দূরে গেঞ্জীপরা মৃত বীরেনের মুখ উপুড় হয়ে কাদায় গুঁজে পড়ে থাকা শবদেহটার দিকে। তাকেই এক কামড়ে তুলে নিয়ে বনে নিমেষে উধাও।

—উধাও। শালা উধাও। আয় শালা !! —অধীর বাঘের পরাক্রমকে পরাস্ত করে এখন যেন সে নিজেই এক সুন্দরবনের বাঘ বনে গেছে। বাঘের মতো আবার রুখে দাঁড়াতে চায়। মাটি থেকে উঠে ছাটা-বাড়ি হাতড়াচ্ছে। —ও শেষ করবে বাঘের হিম্মতকে।

কিন্তু বাঘ ততক্ষণে উধাও।

* * * *

খালের ওপার থেকে তিন সাঙাৎ ছাটা-বাড়ি উঁচিয়ে এপারে এসে গেছে। বীরেনের রক্ত ছড়ানো কাদামাটির পাশ দিয়েই এসে গেছে অধীরের কাছে। অধীর তখনও গর্‌গর্‌ করেছে। সারা দেহ রক্ত ও কাদায় লেপটানো। এক বীভৎস চেহারা। দেহের পেশিগুলি তখনও চন্‌মন্‌ করছে—মনে হবে এখনই বুঝি আবার লড়াইয়ে নামবে। ওদের সামনেই কয়েকবার বলেই চলে,—আয় শালা। আয় শালা !!

সাঙাৎরা বলে,—চলো দাদা, ডিঙিতে ওঠো।

ডিঙিতে ওঠার কথা শুনতেই অধীর যেন এ জগতে ফিরে আসে। বলে,—তা, খাল-পাটা-জাল নিয়ে এসেছিস তো ?···ওঃ আনিসনি ? তা চল্‌ জাল নিয়ে আসি।

ওদের তিনজনের পা স্তব্ধ হয়ে থাকতে অধীর বলে,—তা, আমি একাই যাচ্ছি, আমি জাল না নিয়ে ফিরবো না—বলেই অধীর বনের দিকে পা বাড়ায়।

—তা দাদা, এপার দিয়ে কেন ? ওপার দিয়েই চলো, সবাই যাচ্ছি।

—না, ওপার নয়, এপার দিয়েই যাবো। শালা যে এপার দিয়েই বনে উধাও হয়েছে। শালার পথেই যাবো।

যাবার আগে কানের পিঠে কেমন যেন সুড়-সুড় করে। ভাবে হয়ত রক্ত বেরুচ্ছে। হাত দিয়ে কেঁকে ফেলতে চায়। এনেই দ্যাখে,—এক দলা বাঘের লালা রক্তমিশ্রিত হয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো। তাড়াতাড়ি চর থেকে খানিকটা পলিমাটি তুলে সে জায়গাটায় চেপে দেয়।

জাল নিয়ে সেবারের মতো বন থেকে ফিরে আসে। পথে গোসাবার নামকরা আর সবার প্রিয় ডাক্তার বর্মনের কাছে। তিনি ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন,—না, তোমার প্রাণের ভয় নেই। বাঘের দাঁতের কামড় ঘাড়ের শিরোগুচ্ছকে ছিন্ন করেনি ; বেঁচে গেছো।

তবে আমার হাসপাতালের পাশের ঘরটাতে প্রায় একমাস থাকতে হবে। কোনও চিন্তা করো না।...তোমরা সাঙাৎরা, বাড়ি গিয়ে খবর দাও, আজই। এই জোয়ারেই চলে যাও।

অধীর বুঝে নেয়, এই জো'র পিঠ পিঠ ভাটি ধরতে পারলেই বাড়ির সবাই ভোর সকালে এসে যাবে। ভুলুও নিশ্চয় এসে যাবে। তার কথাই ওর বারবার মনে পড়ছে!

ভোর না হতেই ওরা এসে গেছে। ভুলু আসার পথে তার ছোট্ট বোঠেটা ঝপ্‌ঝপ্ করে ফেলে ডিঙির গতি বাড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো।

হাসপাতালে এসে প্রথম সে-ই চুপিচুপি আঙুল টিপে টিপে ঘরে ঢোকে। মাথার ব্যান্ডেজ দেখে বাবাকে সনাক্ত করতে ওর এতটুকুও দেরি হয় না। ভুলু 'বাবা' বলে ডাকবার আগেই অধীর তার কাতর গলায় ডেকে বসে,—বাবা ভোলানাথ! এসে গেছিস, আয়, ভালো আছিস?

ভুলু তখন ছুটে শায়িত বাবার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাবা ওর গায়ে হাত বোলাতে থাকে। কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চুপচাপ। তারপরই মাথা তুলে এদিক-ওদিক চাহনি দিতে থাকে। ভুলু কি যেন খুঁজে পেতে চায়!

বাবা তার সেই মিচ্‌কি হাসি দিয়ে বলে,—কি খুঁজছিস্, খুঁজতে হবে না, এই নে—বলেই ছাটা-বাড়ি লাঠিটা বিছানার তল থেকে কোনোমতে টেনে এনে ওর হাতে তুলে দেয়।

কচি হাত দিয়ে লাঠিটার গায়ে মমতাভরে বোলাতে বোলাতে বলে,—বাবা, তোমার হাতখানা দাও দিকি।

হাত বাড়িয়ে দিতেই বলে,—না, এক হাত না, দুহাতই দাও।

—কেন, দুহাত কেন রে?

—বাঃ, তুমি দু হাত দিয়েই না 'বড়মেঞা'র থাবায় খিল মেরে দিয়েছিলে! আমি সব শুনেছি? সব শুনেছি তোমার সাঙাৎদের মুখে।

দুটো হাত আর ছাটা-বাড়ি দুহাত দিয়ে জড়িয়ে বাবার বুকে তার চিবুক ঠেকিয়ে চোখ বুজে নেতিয়ে পড়লো—কি জানি কেন? হয়তো ক্ষণিকের স্বপ্ন দেখতে!

আলতো ঘোমটায় নির্বাক মা পাশে দাঁড়িয়ে। দু-চোখ বেয়ে তার চোখের জল ঝরে পড়তে থাকে।

সুন্দরবনের সততা

সমগ্র সুন্দরবনের এক সামগ্রিক রূপ প্রলম্বিত হয়ে আছে আবহমান কাল থেকে—এর ইতিহাসে, এর ঐতিহ্যে এবং এর কৃষ্টিতে। আজও সে-রূপ প্রকটিত হয়ে আছে এ অঞ্চলের মানুষের সমাজে বনওয়ালিদের মাধ্যমে।

সে-রূপ সুন্দরবনকে খণ্ডিতভাবে দেখলে সহজে অনুধাবন করা যাবে না। কতই না কেন নিবিড়ভাবে ও নিবিষ্ট হয়ে দেখা যাক সুন্দরবনের প্রাণশক্তির খণ্ডিত বিকাশগুলি—সুবিস্তৃত সবুজঘন বনানী; বিশাল খরস্রোতা নদী ও তার অসংখ্য খাড়িগুলি; জল-স্থল-নভস্থলের অগণিত হিংস্র ও অহিংস্র প্রাণীদের; সুদূর দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ; রঙ-বেরঙের পাখি ও মৌমাছির কাকলি ও গুঞ্জন; দুরন্ত বরষা ভীতিকর কালো মেঘের ছায়ায়; প্লাবন, ঝড় ও ঘূর্ণির নিদারুণ দাপট; সর্বোপরি জীবন ও মৃত্যুর অবলীলাক্রমে কোলাহল ও স্তব্ধতা!

গোটা সুন্দরবনের অন্তরের মর্মকথা হলো—সততা। এই সততার ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী প্রকৃতি ও মানুষ মিলেমিশে।

প্রকৃতির সৃষ্টি—বন ও বাঘ। তারই আওতায় বন যেমন বাঘের রক্ষক, তেমনি বাঘও বনের রক্ষক।

মানুষের বেলায়ও এই সততার তাগিদ সংক্রামিত। তা না হলে, বনে পা রেখে কখনও মিথ্যা না বলার অঙ্গীকার, বনে কখনও কাউকে বঞ্চনা না করার অনুজ্ঞা, বা বনে কারও বিপদে ছুটে যাবার দায়বদ্ধতার কথাই বা আসে কেন? সুন্দরবনে বনওয়ালিদের জেম্মায় এই বিধি অমোঘ। তা মানুষালয়ের অধিবাসীরা তাদের জীবন-যুদ্ধে যতই না কেন দ্বেষ-বিদ্বেষ-প্রবঞ্চনাতে প্রলুব্ধ হোক?

বনওয়ালি, বা বাউলে, বা গুণিন—যাই বলি না কেন, এদের কোনও ধর্মের ভেদাভেদ নেই। মুসলমান গুরুর শিষ্য হিন্দু, আবার হিন্দু গুরুর শিষ্য মুসলমান। এদের কাছে একমাত্র ধর্ম হলো—সুন্দরবন।

কিছুদিন আগেও এই গের্দে এম. শেখ এমনি একজন বড় বনওয়ালি বা বাউলে। ঐ ইংরেজী কায়দার নামেই সে পরিচিত। বাউলের বাড়ি 'গোবরা' গ্রামে, সাতক্ষীরা মহাকুমায়।

দুর্জয় সাহসী, বনে গেলে সে যেন দ্বিগুণতর দুর্জয় সাহসী হয়ে উঠতো—কোনও বিপদে কাউকে রক্ষা করতে সে ছিলো বেপরোয়া।

অত্যন্ত দৃঢ় সত্যবাদী; কখনও কোনও অবস্থায়, সে বাদায় হোক আর আবাদে হোক, মিথ্যা কথা বলতো না।

কোনও মন্ত্রে সে বিশ্বাস করতো না। তবে ভূতপ্রেত মানতো। সুন্দরবনের অসম্ভব কাণ্ডকারখানার বেলায় বলতো,—এ জিন বা দৈত্যের কাজ না হয়ে যায় না।

দেখতে পাতলা গোছের লোক। ছোটো-ছোটো দাঁত, হাসলে মুক্তোর মতো ঝিলিক দিতো। সব সময়ই হাফ-প্যান্ট পরে থাকতে ভালোবাসতো।

অন্য সব বাউলের মতই এম. শেখ এক ওস্তাদ শিকারীও। বনে উঠলে সে কখনও দুটি বুলেটের বেশি আর একটিও নিতো না। বলতো,—কি হবে নিয়ে। সুন্দরবনের বাঘের মুখে একবারের বেশি চোট্ করার সুযোগ কখনই পাবে না।—অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী শিকারীর মতোই কথা।

বনে উঠবার সময় বাড়ির সামনে ডানদিকে বাবলা গাছের তলায় ওর আব্বার যে কবর ছিলো, তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকে আধঘণ্টা অবধি। সময় সময় তখন 'আব্বা' বলে বিগলিত কণ্ঠে আশীর্বাদ মাগুতো।

বনওয়ালি এম. শেখের এ গের্দে দুই শিষ্য—বেদে বাউলে ও হাজিরুদ্দিন বাউলে। দুজনাই সমান দুর্দান্ত সাহসী ও পরের মঙ্গল কামনায় ব্রতী।

তবে বেদে বিদ্যানুরাগী এবং কালজয়ী সাহিত্যও পড়েছে অনেক। স্মৃতিশক্তি নিদারুণ। গল্প করতে খুবই ভালবাসে। যেমন সুমধুর সুন্দরবনী গানও জানে, তেমনি কথাবার্তায় আমুদে।

হাজিরুদ্দিন কিন্তু এমনিতে খুবই ধীরস্থির, কথাবার্তাও কম বলে। বনে বিপদের সামনে প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি প্রখর। ছোটো ছোটো টিপ্পনিতে মানুষকে হাসিয়ে রাখে সর্বদা। অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ এবং সুন্দরবনের সততার জীবন-দর্শনকে যেন আগল দিয়ে রক্ষা করতে চায়।

সাংসারিক কর্তা হিসাবে বাউলে হাজিরুদ্দিন গাজী খুবই প্রতিপত্তিশালী মানুষ। বিরাট তার নিজের সংসার। তার নিজের দুই বিবি এবং মোট ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনীর সংখ্যাও অনেক। গোসাবার অনতিদূরে নদীর ওপার, নিজের ছেলেমেয়ে ও ঘনিষ্ঠ

আপনজনদের সংসার প্রায় পাশাপাশি বসিয়ে একটা ছোটো 'গ্রামের' পত্তন করেছে যেন। আর এরা সব্বাই বাউলের কথা সর্বদা শিরোধার্য করেই চলে।

বয়স বেশি হয়ে যাওয়াতে আজকাল বাউলে নিজে বড় একটা বনে ওঠে না। তাই গত বছর নিজের দুই বড় ছেলেকে দুখানি ডিঙির সাঁইদার করে বনে পাঠিয়েছে মধু কাটতে।

এদের একজনের নাম মনসুর ; প্রথমা বিবির বড় ছেলে। আর দ্বিতীয়া বিবির বড়ছেলে রসিদ অন্য ডিঙির সাঁইদার।

এমনিতে এ-দুজনায় ভারি ভাব। কোনও বড় কাজ একত্রে ছাড়া করে না। দুজনারই বয়স কাছাকাছি—চল্লিশের ধারে কাছে। দু-জনাই দুজনকে ভাই বলে ডাকে। এদের অন্তরের গভীরে দুই সতীন মায়ের রেষারেষির বিন্দুমাত্র প্রতিফলন হয়েছিলো কি না. তা বলা সম্ভব নয়। তবে পিতার যে একটু আনুকূল্য ছিলো মনসুরের প্রতি, তা হয়তো অনুমান করলেও করা যেতে পারে। কেননা, দুজনার মধ্যে সমান গুণাবলি থাকলেও পিতা হয়তো দেখেছিলেন, মনসুর যেন যে-কোনও অভিযানে দলের স্বাভাবিক নেতা হয়ে ওঠে। তাই কাউকে গুরু এম শেখের বা গুরু-ভাই বাউলের কাছে কোনও কাজে পাঠাতে হলে মনসুরের ডাক সর্বাগ্রে পড়ে।

এই সর্বাগ্রে ডাক পড়ার ব্যাপারটা আত্মীয়স্বজন সবারই নজরে এসেছে। কারণ বয়োবৃদ্ধ বাউলে হাজিরুদ্দিনের এক মহা ভাবনা এসেছে, কার হাতে বাউলেগিরির মহান দায়িত্বটা রেখে যাবে ? এই দায়িত্বের মর্যাদাটা রক্ষা করা যে বড় দায় ॥

* * *

বনের সম্পদ আহরণে দল বেঁধে যাওয়া যেন উপকূলবাসী সাঙাৎদের এক মহোৎসব। সবার আগে বৃদ্ধ বাউলে হাজিরুদ্দিনের কাছে 'আশে' বা আশীর্বাদ মাগতে গেলো। মন্ত্রের মতো বাউলে তখন যেন বলে.—....এসো তা হলে, মনে রেখো, বনে পা রেখে কখনও মিথ্যা কথা বলবে না, কখনও মিথ্যাচার করবে না, না কখনও না ; কেউ বিপদে পড়লে ছুটে এগিয়ে যেতে ভুলো না, না কখনও না।....একটু থেমে যেন ব্যাখ্যার মতো করে আবার বলে,—দেখো, তোমাদের যদি কারও মনের তলে বিবাদ-বিসম্বাদ থাকে তবে গ্রামে এসে ফ্যারাজ সালিশী করে নিও। বনে কাউকে বঞ্চনা করার কথা মনেও ভাববে না। দেখো তাতে বনবিবির রোষই মিলবে।....ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো। তোমাদের কাজ সফল হোক।

ওরা বেশ ভারিক্কি দলে ভাটির টান ধরলো। তোড়জোড়ও করেছে। দুখানি ডিঙি। ডিঙির খোপে খোপে মাটির কলস ও টিনের সারি, আর বেতের ধামাও অনেকগুলি। এ ছাড়া আরও নানা সাজসরঞ্জাম—কারণ ক'দিন যে বনে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। এক যা ভরসা, খরার সময়। মাসটা চৈত্র মাস, কাল-বৈশাখী ঝড়ের বিশেষ ভাবনা নেই।

যাচ্ছে দুই মৌলি-সাঁই, মধু ভাঙতে। 'চামটা' বনে। চামটা বনকে যেমন বাঘের দুর্গ বলা যেতে পারে, তেমনি এটি মধুরও বিরাট আড়ৎ। বাংলাদেশ থেকেও লোকেরা আজও এখানে আসে মধুর লোভে, বাঘের আক্রমণ উপেক্ষা করেই। উপেক্ষা করলেও কেউ কেউ যে বাঘের হাতে প্রাণ দেয় না, তা নয়। তা হলেও মধু এমন সম্পদ আর এতো সহজলভ্য এখানে যে তার লোভ ছাড়া বড় দায়।

চামটা বন বিরাট এলাকা। ওদের নির্দিষ্ট স্থান বৈকুণ্ঠ নদীর আট নং খাল। এসেও গেছে যথাসময়ে। মধুর চাক খুঁজে খুঁজে সমানে ভেঙে চলেছে যেন উৎসবের মেজাজে।

দুই সাঁইতে মোট এগারো জন সাঙাৎ ছিলো। ওদের সবাই বনে কিন্তু একটা দলে খুবই কাছাকাছি থেকেই একত্রে এগুচ্ছে। কোনও ভাগাভাগি হয়নি। তাহলেও সাবধানের মার নেই, দলের ছ'জন চাক-ভাঙা ও মধু সংগ্রহের কাজ করে চলেছে ; বাকি পাঁচজনের দায়িত্ব, ছাটা-বাড়ি লাঠি উঁচিয়ে কাছাকাছি থেকে পাহারা দেওয়া। সমবেতভাবে উদ্যত ছাটা-বাড়ির সামনে সহসা বাঘ এগুতে চায় না। দু-দলের লোকই কিন্তু মাঝে মাঝে কাজের বদলা-বদলি করে নিচ্ছে। এই কাজের মধ্যে দুই সাঁইদার মনসুর ও রসিদও আছে।

ঝমাঝম্ ও তালে-তালে যেন দ্রুত কাজ এগিয়ে চলেছে। গত চারদিনে মধুও প্রচুর জুটেছে। ওদের ধারণা, প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মতো।

চামটা বন বেশ পুরনো বন। চত্বরও উঁচুপানা। যেন বাংলাদেশের গভীর সুন্দরবনের মতো। গাছগুলিও বড়ো বড়ো এবং দেখলে মনে হবে, কেউ বুঝি সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের আরেক বিশেষত্বও এই বনে দেখা যাবে। বনে গাছ তো নানা ধরনের আছে—সুন্দরী, গরান, বান, গেঁয়ো, কেওড়া, পশুর প্রভৃতি। এদের মধ্যে যেন পাল্লাপাল্লি আছে। এক একটা ধরনের গাছের এক-এক জায়গায় আধিপত্য। যেখানে সুন্দরী গাছ সেখানে শুধু সুন্দরী গাছই, অন্য কাউকেও হতে দেয় না। দৈবাৎ দু-একটা অন্য গাছও ছড়িয়ে ছিটিয়েও হতে দেখা যায়—কিন্তু তা ঐ পর্যন্তই। খাল পেরিয়ে হয়তো দেখা যাবে, সেখানে আবার আরেক গাছের আধিপত্য।

গরান গাছের নিজেদেরই তো রকমফের আছে—মঠ গরান, কালি গরান, জাত গরান ও ঝামটি গরান। এই রকমফেরদের মধ্যেও আধিপত্য একইভাবে। তাদের এক একজনের এলাকায় অন্য কাউকে হতে দেবে না।

যে-এলাকায় ওরা এবার মধু সংগ্রহে এসেছে সেটা মঠ গরানের রাজত্ব।

পাঁচ দিনের দিন সবাই ডিঙিতে উঁকি মেরে মেরে দেখলো—কটা কলসি আর টিন ওরা মধু বোঝাই করেছে—না আর তো বেশি ধরবে না বলেই মনে হয়!

মনে হলে কি হবে! এই রোমাঞ্চকর মধু-সংগ্রহের যে এক নেশা আছে। সেই নেশার ঘোরে পাঁচ দিনের দিন ওরা আবার বনে উঠলো।

দলে মনসুরের এক জামাই-বাবুও আছে, নাম তার নুরালি। কিছুটা কাজের পর সে মনসুরকে কাছে ডেকে চুপি-চুপি বলে,—না, না মনসুর, ডিঙিতে আর মধু ধরবে না, চলো ফিরে যাই। দুপুর তো গড়িয়ে যাবার মতো....তাছাড়া কি জানো! আমার কেমন যেন বারবার মনে হচ্ছে, বনটা আজ গরম। খেয়াল করোনি, আজ একটা বানরেরও এতো বেলার মধ্যে আমরা দেখা পাইনি!

মনসুরও ফিস্-ফিস্ করে জানতে চায়,—কেনো! আর কোনও ইঙ্গিত পেয়েছো কিনা 'বড়মেঞার' ?

নুরালি চুপ করে থাকে। মনসুর ঝট্‌পট্ ভেবে নিয়ে চারদিকে একবার নজর দিয়ে বলে,—আমাদের ফিরে যাওয়াই ঠিক। তবে ভাই রসিদের মতটা নেয়াও দরকার।

বলেই হাতের ইসারায় আর বনের পাখির ডাকের নকলে মৃদু 'জোড়া কুই' দিয়ে দ্বিতীয় সাঁইদারকে কাছে আসতে বললো।

রসিদ আঙুল টিপে টিপে কাছে এসে সব কথা শুনলো। যে-কথা একবার ওরকম থমথমে মুখ থেকে শুনলে বনের গভীরে কি কেউ দ্বিমত হতে পারে। বিশেষ করে যখন আসল কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

রসিদের দ্বিমত না থাকার কথা শুনেই মনসুর বলে,—ভাই, আমার যে একটা 'ফাও'

নেবার ছিলো। মাত্র একটা মঠ্-গরানের খুঁটি আমার ঘরখানির জন্য। তা না হলে সামনের বোশেখী ঝড়ে ঘরখানি ভেঙে পড়বে। চলো সবাই খালের ধারে ডিঙির কাছাকাছি। একটা খুঁটি দেখেও রেখেছি। ডিঙিতে উঠবার মুখেই সবাই মিলে তুরন্ত কেটে নেবো।

এই 'ফাও' ব্যাপারটা আর কিছু নয়, সুন্দরবনের সাঁইদাররা যখন আইনমাফিক বনের পাশ নিয়ে সম্পদ আহরণ করে তখন তারা নিজের দরকারি কিছু একটা বন থেকে 'ফাও' হিসাবে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু এমনিতে বিনা পাশে কোনও গাছ তো দূরের কথা, গাছের একটা পাতা আনাও বে-আইনী এবং শাস্তিযোগ্য। বন-কর বাবুরা যেন এটা দেখেও দেখেন না। উপকূলবাসীদের বনের উপর তাদের স্বাভাবিক অধিকারের একটা স্মৃতি হয়ে আজও বুঝি বহাল আছে।

রসিদ প্রায় মাথা নিচু করে বলে,—ভাই মনসুর, আমি তো আগেই বলে রেখেছি, আমার তো 'ফাও' হিসাবে কয়েকটা কালি-গরানের নরম বল্লার চাই; আমার ডিঙির ছই নেই বললেই হয়, নতুন করে বানাতে হবে—বলেই রসিদ মাথা চুলকোতে থাকে।

মনসুর ঝমাৎ করে বলে,—তা ভাই, কালি-গরান এখানে কোথায় পাবে? এ তো মঠ্-গরানের এলাকা। চলো, বাড়ি ফেরার পথে যদি পাই, তাহলে আমরা সবাই মিলে কালি-গরানের বল্লার নিশ্চয় বন থেকে এনে দেবো। চলো আজ আমরা যাত্রা কবি। এদিকে দেবতা আকাশে ঝুলে পড়ার মতো। 'বড়মেঞার' টহলদারির সময় হয়ে এলো! চলো।

রসিদ দূরে বনের গভীরের দিকে তাকিয়ে একবার শুধু টেনে-টেনে উচ্চারণ করলো,—য....দি !!

পার্শ্ব-উক্তির মতো বসিদ নুরালির দিকে মুখ করে আক্ষেপ জানালো,—এখানেই তো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দু-একটা কালি-গরান খুঁজে মিলতে পারে!

এই উক্তিকে উপেক্ষা করেই মনসুর সবাইকে নিয়ে ডিঙির দিকে এগুলো। ডিঙির কাছাকাছি এলে দলের ছ'জনে গিয়ে উঠলো ডিঙিতে গোছ-গাছ করে যাত্রার জন্য তৈরি হতে। বাকি পাঁচজনে বনের প্রান্তরে রইলো মনসুরের গরান খুঁটিটা দ্রুত সনাক্ত করে কেটে ফেলতে।

কেটেও ফেলেছে। গাছটা হুড়মুড় করে মগ-ডালগুলির জড়াজড়ি মুক্ত করে সশব্দে ঝপাৎ করে পড়লো। ওরা পাঁচজনে মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে চায় না। যে যার ছাটাবাড়ি লাঠি সামনে রেখে কোমরে পিঠে ঝোলা ছোটো হাতলের কুড়ুল বের করেছে। ঝমাঝম ডাল-পালা ছাটাই করতে চায়। সুন্দরবনের মানুষ এসব কাজ এমন দ্রুত সেরে নিতে পারে, তা বলার নয়।

বলার নয় বটে কিন্তু বাঘেরও তা অজানা নয়। এমন অন্যমনস্ক থাকার মুহূর্তের লহমাটা সে অবহেলা করতে চায় না, করেও না। বন কাঁপানো হাঁ হাঁ হুঙ্কারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সামনেই ছিলো দুজন, নুরালি আর রসিদ। তাদের মুখ ছিল বাঘের আসার লাইনের দিকে। তারপরই তৃতীয়জন মনসুর বাঘের দিকে পিছন করে ডাল কাটছে—সেই-ই বাঘের লক্ষ্য।

শিকারী বাঘের কিন্তু লক্ষ্য থাকে লভ্য শিকার মুখে করে বনের আড়ালে পালাবার রাস্তাটা বাধাহীন রাখার।

বাঘ যেন বজ্র হুঙ্কার দিয়েই শূন্য থেকে উড়ে এসে পড়ে। পড়েই থাবা মেরেই সামনের দুজনকে, নুরালি ও রসিদকে আতঙ্কগ্রস্ত ও হতভম্ব করে ধরাশায়ী করে। করলেও তার লক্ষ্য কিন্তু মনসুরের পিঠটা। পেছন থেকে পিঠে থাবা মেরে দুপায়ে দাঁড়িয়ে ঘাড়ে সহসা

এবং দ্রুত কামড় বসানো যায় এবং তা শিকার ধরাশায়ী হবার আগেই। করলোও তাই। এতোগুলি কাজ করতে তার এক লহমাও লাগেনি। দুরন্ত ক্ষিপ্রতা।

ক্ষিপ্রতায় সুন্দরবনের সাঙাৎরাও বা কম কি? বাঘের থাবায় পড়ে গিয়েও রসিদ একটানে সামনেই পোতা ছাটা-বাড়ি লাঠিটা তুলে আপ্রাণ শক্তিতে বাঘের পিঠে বসায় কষাঘাত। বিপদে সাহসী মানুষের বুঝি এমনি শক্তি ও ক্ষিপ্রতা আসে।

মুহূর্তে বাকি সবাই ছাটা-বাড়ি লাঠি উঁচিয়ে 'শালা। মার শালা' হাঁকে হিংস্রপ্রাণীর মতো ক্ষিপ্ত মূর্তিতে এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডিঙির দু'জনেও ছাটা-বাড়ি তুলে ধরে 'আইছি! মার শালাকে! মার! ভয় নেই!' বলে হাঁক দিয়ে পড়ি-মরি করে ছুটে আসছে।

অতো বড়ো পরাক্রমশালী বাঘ ছাটা-বাড়ির ঘেরাওতে পড়লো বুঝি! প্রমাদ গুণে তৎক্ষণাৎ কামড় ছেড়ে মুখ খিচিয়ে তীব্র এক হুঙ্কারে এক লাফে উধাও হলো।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই ধরাধরি করে মৃত মনসুরকে ডিঙিতে নিয়ে যায়। যাবার সময় বনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে নজর রেখে রসিদ বলে,—সাবধান! সবাই টানটান থাকিস্। ও শালা কিন্তু যায়নি! ধারে কাছে আছেই! চিল্লা 'শালাকে মার্', লাঠিও উঁচু। আরও উঁচু। বনের দিকে পিঠ না! কখনও না! পেছন ফিরে হাঁট্!'

* * *

ওরা যেন ছুটে যাবে প্রথমেই বাউলে হাজিরুদ্দিনের কাছে। কিন্তু সুন্দরবনে তুরন্ত যাবো বললেই তুরন্ত যাওয়া যায় না। মাঝপথে বেগোনে পড়ে। রাতের অন্ধকারে মাঝ-নদীতে নোঙর করে থাকতে হলো। ভোর-রাতের জোয়ারে আবার ওদের সরু ডিঙি দুখানি বাইচ-নৌকোর মতো ছুটে চললো বাড়িমুখো।

যাওয়ার পথে গোসাবা আসতেই ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ঘাটে ডিঙি লাগায়। ওদের ইচ্ছা, একবার রিপোর্ট করে যায়। শুধু ওদের ইচ্ছাই নয়, এমন ঘটনায় ব্যাঘ্র-প্রকল্পে জানানও আইন মোতাবেক বাধ্যবাধকতা আছে।

শবদেহের আবরণ খুলতে খুলতে প্রকল্পের সবাই বললো,—আরে! আর খুলতে হবে না। আমরা সবাই চিনি। ও তো মনসুর, বাউলের ছেলে না?—তবে ঘটনার আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে শুনে নিলো।

ডিঙি দুটি এবার বাড়ির ঘাটে লাগবে। এবারই ওদের সবার দুশ্চিন্তা ও ভয়—বাউলেকে কি বলবে? কি কৈফিয়েত দেবে? সে যে ভেঙে পড়বে!!

বাউলে দেখেই প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যায়। একে তো বাউলে চুপচাপ, এখন যেন আরও গম্ভীর ও নির্বাক। বাড়ি ও পাড়ার সবাই কান্নায় ভেঙে পড়লো। সে ক্রন্দনের রোলও বুঝি সুন্দরবনে উড়ে যেতে চায়!

নির্বাক বাউলের চোখের কোণে কোনও জল নেই। সে শুধু অহেতুক ব্যস্ত হয়ে পড়ে—মৃত্যুর পরে সামাজিক কর্মগুলি দ্রুত সেরে ফেলতে।

সেরেও ফেললো সন্ধ্যার আগমনে। বারবাটিতে একটা খোলা জায়গায় কবরে মুঠো করে মাটি দিতে বাড়ির সবার সঙ্গে আরও কতো যে মানুষ এসেছিলো তার ইয়ত্তা নেই।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে কবরের চারিপাশে সারিবদ্ধ বাতি জ্বেলে দিয়ে হাজিরুদ্দিন কবরের পাশেই ওক্তের নমাজ পড়লো অনেকক্ষণ ধরে।

তবুও ওর মন যেন শান্ত হয় না।—কেন? কি অন্যায় করেছিলো মনসুর? কিসে বনবিবির রোষ এমন করে পড়লো?—কিছুতেই ওর মন শান্ত হতে চায় না।

রাতে কিছু খাবে না জানিয়ে বিছানায় রাতের নির্জনতা পেয়েই ওর চোখের জল আর বাঁধ মানে না,—কিসে…কিসে মায়ের এই রোষ ? সারা রাত ধরে অশ্রুজলের ধারা বুঝি ক্লান্ত করে দেয় ওর চোখদুটিকে।

কয়েকবার ভাঙা গলায় 'মা…মা' ডেকে উঠে পড়লো। ভোরও হয়ে যাবার মতো। দেবতার মোলায়েম স্নিগ্ধ ছটা এসে পড়তেই আবার হাজিরুদ্দিন যেন সমস্যায় ভারাক্রান্ত নির্বাক বৃদ্ধ বাউলে হয়ে উঠলো।

সাঙাৎরা এসে জড়ো হলে বাউলে বলে,—তা তোরা মধু-টধু কিছু আনতে পারিসনি ?

—কেন পারবো না ? পরিমাণে অনেক মধু এনেছি।

—তা, যা সজনেখালি বনকর অপিসে। যা, সকাল-সকাল গিয়ে বিক্রী করে আয়। যা।

সন্ধ্যা না হতেই ওরা বিক্রী সেরে ফিরে এসেছে। প্রায় পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে। টাকা নিয়ে হাজিরুদ্দিনের কাছে এসেছে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতে। বাউলে সকলকে সমান ভাগে বিলিয়ে দিলো।

সাঁই সংক্রান্ত সব কাজ শেষ হতেই বাউলের উঠোনের কোণটায় নজর পড়ে। পড়তেই যেন চঞ্চল হয়ে আঁতকে ওঠে,—তা, এটা কি ? কাঁচা গরান খুঁটিটা এখানে কেন ?

নুরালি আর রসিদ প্রায় একই সঙ্গে বলে ওঠে,—ও কিছু নয় ! মনুসর সাঁইদারের ফাও।

—ফাও !…এই ফাও-এর কথা তো এতক্ষণ বলিসনি ! বলেই মঠ-গরানের খুঁটির কাছে এগিয়ে গেলো।

খুঁটিটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে আদরের সুরে বলে,—মনসুরের ! মনসুরের !

এবার সাঙাৎদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে,—তা, সাঁইদার রসিদ কিছু ফাও আনেনি ?…বল্ সব,…কি, সব যে চুপ মারালি !…বল্, সব বল্…

কারও মুখে সাড়া নেই, কেউই উত্তর দিতে চায় না।

বাউলের মুখে এবার আদেশের সুর,—আনেনি ?…কী ? বল্ শীগগীর বল !

ওরা আর চুপ থাকতে পারে না। নুরালী আস্তে আস্তে সব ঘটনা বিশদভাবে বললো। মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে বাউল আবার চুপ হয়ে গেছে। দেখেই বোঝা যায়, তার এই স্তব্ধতা গুম মেরে যাবার স্তব্ধতা নয় ; যে কার্য-কারণ সারাক্ষণ খুঁজে পাচ্ছিল না, সেটা যেন ঝিলিক মেরে হঠাৎই প্রতিভাত হয়েছে—এটা সেই শান্ত হবার স্তব্ধতা—বাউলের সারা চোখে-মুখে তারই আভাব স্পষ্ট।

চিন্তার যন্ত্রণার থেকে মুক্ত হয়ে কতক্ষণই বা নীরব থাকা যায়। শান্তভাবে স্বগত উক্তি বেশ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে থাকে,—বনবিবি মায়ের কেন এতো রোষ ?…বনে বঞ্চনাকারীর স্থান নেই !! …শেষমেশ তুই বনে পা রেখে 'ফাও' নিয়ে বঞ্চনা করতে গেলি !!

একটু থেমেই বেশ জোরে-জোরেই বলে,—হ্যাঁ মনসুরের ঘরে এই খুঁটি লাগিয়ে দেবো, আমি নিজেই লাগিয়ে দেবো,…কালই লাগিয়ে দেবো।

এখানেই এই পর্বের শেষ নয়। ক'দিন পরে ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে এক বাবু এসে হাজিরুদ্দিন বাউলের ডাকাডাকি করেন। বাউলে হাজির হলে তার হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিয়ে বলেন, —এই নাও, মনসুরের বনে বাঘের হাতে মৃত্যুতে এই সরকারী ক্ষতিপূরণ এসেছে। তোমার মনসুরের বউ-এর হাতে তুলে দিও।

শুনেই টাকা নিয়ে অন্দরমহলে মনসুরের বউ-এর কাছে ঈষৎ ন্যুজ বৃদ্ধ বাউলে প্রায় ছুটে

গিয়ে বলে,—এই নাও বড়বৌমা, এই তোমার মনসুরের সরকারী ক্ষতিপূরণ।···· কিন্তু এই বৃদ্ধ বাউলের একটা আদেশ আছে, তুমি এখনই ছুটে গিয়ে রসিদ-বৌমার হাতে এর অর্ধেক টাকা দিয়ে এসো····যাও ছুটে যাও,····এখনই। ····একটু দাঁড়াও, যদি না নিতে চায়, বলো আমারই আদেশ !! যে বঞ্চিত হয় তার হাতেও তো কিছুটা খোরপোশ দিতে হয়! ওকে আরও বলো, রসিদই প্রথমে বিপদে এগিয়ে যায় মনসুরকে বাঁচাতে····বলো, এটা আমার আদেশ। যাও ছুটে যাও····এখনি।

এতদিনে বাউলের মনে প্রশান্তি ফিরে এলো। বাউলেরা যে সুন্দরবনের সততার ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

আইরাজ

বেশ কিছুদিন আগের কথা। তখনও ব্যাঘ্র-প্রকল্প সুন্দরবনে চালু হয়নি। মানে, তখনও বাঘ মারা আইনত অধিকার ছিলো, তবে অনুমতি নিতে হতো, এই যা।

আর পুলিশ কর্তাদের বনকর আপিস্ থেকে সে-অনুমতি পেতে তো কোনও বেগ পাবার কথা নয়। পেতেও হয়নি। জেলার পুলিশ সাহেব ও বাসন্তী থানার দারোগাবাবু দু'খানা লঞ্চ নিয়ে দিব্যি চলেছেন সুন্দরবনের গভীরে। দু'জনের দু'খানা লঞ্চ হলেও পুলিশ সাহেবের লঞ্চেই ডেকের ফাঁকা জায়গায় সকালের মিষ্টি রোদে আড্ডা জমিয়েছেন দু'জনে। দু'খানা লঞ্চ প্রায় পাশাপাশি চলেছে ঘুট্‌ঘুট্ করে।

শিকার? না, ওদের জানা আছে এ-ভাবে সুন্দরবনে শিকার হয় না। এমন ভাবে নিরাপদে বসে সুন্দরবনে বাঘ-শিকার তো দূরের কথা, বাঘের দেখাও মিলবে না। তবে অনেক দূর থেকে হরিণের পালে বরাত-ঠুকে গুলি করলেও করা যেতে পারে। যেতে পারে বটে, কিন্তু চঞ্চলা হরিণ আহত হয়েও কিছুটা বনের ভিতর যাবেই যাবে। বনের কিনারায় সেই আহত শিকার অনুসরণে আচমকা আক্রান্ত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে সুন্দরবনে। বাঘ এমন সময়ে হরিণের মাংসের লোভ ত্যাগ করে মানুষের মাংসের জন্য শুধু উতলা হয়ে ওঠে বললে ভুল হবে, দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। যে কোনও ঝুঁকি নেবে মানুষকে ঘায়েল করার জন্য।

ওদের লঞ্চ দু'খানি ছোট্ট খাল দুগ্যোদোয়ানি ছেড়ে গোমর নদীতে পড়ে কতো নদনদী ছাড়িয়ে দক্ষিণে এগুলো তার হিসাব করা দায়। পীরখালি, আঁধার-মানিক, খোলাখালি, চরগাজী, অবশেষে বড়গাজী খাল পেরিয়ে ন'বাকি দোয়ানিতে পড়েছে। দোয়ানি মানে, এই সব খাল বা নদী সাধারণত পুব-পশ্চিম টানা হয়ে দুটো উত্তর-দক্ষিণ টানা বড় নদী যোগ করে দেয়। ফলে দোয়ানির দু'মুখ দিয়েই একই সময়ে যেমন খরস্রোতা জোয়ারের জল হু-হু করে প্রবেশ করে, তেমনি দু'মুখ দিয়েই ভাটির স্রোতও হুড়-হুড় করে সমুদ্রগামী হয়ে বেরিয়ে যায়। এই প্রতিক্রিয়ায় জলযানকে দোয়ানির দু'মুখে দু'রকম স্রোতের টানে পড়তে হয়। এতে যন্ত্রযানের বিশেষ ভাবনার ছিলো না, মাত্র প্রথম আধাপথ স্রোতের টানে দ্রুত যাওয়া যায়, কিন্তু বাকি আধাপথে স্রোতের বিরুদ্ধে শ্লথ হয়ে পড়তে হয়, এইটুকুই যা। কিন্তু ডিঙি নৌকোকে তখন বড় ভাবনায় পড়তে হয়ই।

পুলিশের কর্তাদের লঞ্চে বসে গতি নিয়ে বিব্রত হওয়ার বিশেষ কারণ ছিলো না। ওরা যাবেন বা যাবার ইচ্ছা ব্যাঘ্র-সঙ্কুল 'চাম্‌টা' বনের কাছাকাছি অবধি। ভাটি অঞ্চলে বিশাল গোসাবা নদী থেকে উঠে ন'বাকি দোয়ানি এঁকে-বেঁকে পুবে সমুদ্রগামী ঝিলা নদীতে

পড়েছে। এই খিলা বেশ কিছুটা ভাটিতে বাঁ-হাতে 'চামটা' বন।

যে-কোনও দোয়ানির মাঝপথে দু'পাশের পরস্পর বিরোধী জলধারা এসে থমকে যায়। জল-ধারার গতিবেগ স্তিমিত হয়ে আসে। আর অমনি জলের পলি-কণা ঝরে পড়ে নদীর তলদেশে—প্রকৃতির ভূমি-গঠন কাজ চলে। আর এই এলাকায় প্লাবনের জল বনের অভ্যন্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই আশপাশের বনাঞ্চলে জীবজন্তুর ব্যবহারও ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে পড়ে।

লঞ্চ দু'খানি এখন ন'বাকি দোয়ানির মধ্যভাগে। কর্তাবাবুরা ডেকের উপর বসে সুন্দরবনের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করছেন আর এটা-সেটা গল্প করছেন। ওরা সুন্দরবনের অভিজ্ঞ লোক হিসাবে সঙ্গে একজন বাউলে এনেছেন। বাউলে আসবার সময় তার একজন অনুগত সঙ্গীও নিয়ে এসেছে—চিত্তমের্ধা। এরাও মাঝে মাঝে কর্তাদের সঙ্গে টিপ্পনি কেটে চলেছে।

লঞ্চ মাঝ-নদী বরাবর। ওরা সবাই বিস্তৃত জলরাশির উপর উৎসুক চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ চিত্তমের্ধা চিৎকার করে বলে ওঠে,—ওই! ওই-যে!....কুমির ভেসেছে! ওই!—বলেই আঙুল দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করে।

মের্ধার চিৎকারের ধাক্কায় সবাই যে-যার বন্দুক হাতড়াবার চেষ্টা করে। বাউলে এক নজর দেখেই বলে,—না কর্তা, বোধহয় কুমির নয়।

দু'জন কর্তাই প্রায় একসঙ্গে জোরে বলে ওঠেন,—নয়, তো কী! কী হতে পারে!

বাউলে শান্তভাবেই উত্তর দেয়,—না বাবু, কুমির কি কখনো নদী পারাপার করার চেষ্টা করে! ও যে সোজা পার হতে চলেছে....কুমির কি অতো দীর্ঘ লম্বা হয়ে ভাসে ?? ....কুমির লেজ কখনও ভাসায় না। পিঠের শিরদাঁড়া, চোখ আর উঁচু নাকটাই ভাসিয়ে রাখে। সাঁতরে এগুবার সময় হালের কাজ করে ওদের লেজ। অতো লম্বাপানা হয়ে কুমির ভাসে না।....কুমির না।

আরও উৎকণ্ঠিত হয়ে দারোগাবাবু বলেন,—তবে ওটা কী ? জলে আর কোন্ অমন দীর্ঘ জন্তু আছে ?

—কর্তা, সাবধান! আমরা বেকায়দায় পড়তে পারি। ওটা আর কিছু নয়, সুন্দরবনের সাংঘাতিক বিষধর সাপ.....কোনও আইরাজ নিশ্চয়....নিশ্চয়! হয় ওকে আগে পার হয়ে যেতে দিন, না হয় আমাদের লঞ্চ ওর আগেই বেরিয়ে যাক। ওর পারাপারের পথ আগলে ধরবেন না। তাড়াতাড়ি যা হয় একটা কিছু করুন। করুন শীগগির!

পুলিশ সাহেব তো সারেঙ-সাহেবকে সজোরে আদেশ দিলেন,—জলদি স্পীড বাড়াও, দ্রুত সোজা বেরিয়ে যাও।

যথা আদেশ, সারেঙ-সাহেব লঞ্চে স্পীড দিলেন। কিন্তু স্পীড তেমন ওঠে না। ন'বাকির মাঝামাঝি অঞ্চল যে! কোনও স্রোতের বিশেষ টান নেই।

এদিকে আইরাজ এসে পড়েছে। বেগতিক দেখে বড়কর্তা চিৎকার-মিৎকার করে ওঠেন,—লঞ্চ ঘুরিয়ে দাও, ঘোরাও!—এ কথা আবার মাত্র একজন সারেঙকে তো বললে হবে না। দুটি লঞ্চই প্রায় পাশাপাশি চলেছে। তাই চিৎকার আর ইঙ্গিতে দু'হাত নেড়ে নেড়ে দু'জনকেই আদেশ দিলেন। দুই কর্তাই এখন লঞ্চের খুপরির ছাদে।

বিপদ ছিলো, স্পীড থামিয়ে হঠাৎ পাশাপাশি লঞ্চের গতিপথ কূল বরাবর করতে গেলেই ঠোকাঠুকি হয়ে যেতে পারে। তবে সারেঙদের দক্ষতায় সেটা ঘটেনি বটে, কিন্তু এই সব করতে গিয়ে লঞ্চ দু'খানার পেছনটা আইরাজের লাইনে এসে পড়েছে।

আইরাজ কোনও কিছুই ভ্রূক্ষেপ করে না, ঠিক সোজাসুজি নদী পার হবেই সে। নদীতে তখন ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঝিরফিরে ঢেউ। আইরাজ সেই ঢেউয়ের মধ্যে মাথা উঁচু করে এগিয়ে আসছে। দেড় বিঘেৎ ফণাকে পেখমের মতো বিছিয়ে ধরার চেষ্টা করছে। যেন সামনে পেলেই ছোবল মারবে তার গতিপথ রুদ্ধকারীকে। লঞ্চ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ফেলেছে, জলের তলের চাকাও তাদের স্তব্ধ। স্তব্ধ হলেও লঞ্চ দু'টি গতিবেগের ঝোঁকে তীরের দিকে ছুটে চলেছে।

আইরাজও লঞ্চের পেছনে সাঁ সাঁ করে এগিয়ে আসছে। লঞ্চ দু'খানি বুঝি ওর শত্রু। তাদের ওপর তার বিষাক্ত দাঁতের ছোবল মেরে মৃত্যু-বিষ ঢালতে চায়। লেজ এবার খল্‌বল্‌ করে দ্রুত নাড়াচ্ছে। কোনোমতে উঁচু হয়ে ফণা শূন্যে তুলবার চেষ্টা। কিন্তু জলের উপর তেমন করে শক্ত হয়ে উঁচিয়ে ফণা উদ্যত করতে পেরে উঠছে না।

আরোহীরা কেউ ডেকে, কেউ বা খুপরির ছাদে। এমন নিরাপদ আশ্রয়ে থেকেও কেউ নিশ্চিন্ত নয়। জলের উপর আইরাজের কিলবিলে গতি আর আক্রোশ দেখে ওদের দেহ ও মন শির্‌শির্‌ করে উঠছে।

বাউলের মনে হঠাৎই আশঙ্কা জাগে লঞ্চের দু'পাশের নারকোল দড়ির গোছাগুলি নিয়ে। লঞ্চে-লঞ্চে ধাক্কা-নিবারণী নদীর জলছোয়া এই ফিন্‌ডারগুলির সন্ধান না পেয়ে যায় আইরাজ! পেলে নিশ্চিত গোছা বেয়ে উঠে আসবে। মাঝিমাল্লা যাকেই পেলো তাকেই চিৎকারে বলে,—শীগ্‌গির যা, কাতার গোছাগুলি টেনে উপরে তোল্‌। যা শীগ্‌গির যা! কোনও কাছি ডালির উপর দিয়ে যেন ঝুলে না থাকে। যা টপ্‌কে-টপ্‌কে ছুটে যা!

হঠাৎ আইরাজকে আর কেউই দেখতে পায় না। আইরাজ অদৃশ্য। লঞ্চের মুখটা কূলের পলি-কাদায় গেদে আটকে যাবার উপক্রম দেখে সারেঙ আগেই লঞ্চের চাকা উল্টোগামী এস্টার্ন চালিয়ে দিয়েছে। পেছন-গিয়ারে চাকা বেগে চলেছে। তবুও লঞ্চ কূলের দিকে এগিয়ে চলে। এবার পুরোদমে পেছন-গিয়ার। নদীর জল লঞ্চের চাকা ছুঁড়ে ছুঁড়ে তীরে মারছে তোলপাড় করে।

কিন্তু আইরাজ ডুব দিয়েই বুঝি আতঙ্কের শিহরণ এনে দিলো গোটা লঞ্চে। একে-তো বাউলে নারকোল দড়ির ফিন্‌ডারের কথা তুলে লঞ্চে বসে নিরাপদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিয়েছে সবার, তার উপর আইরাজ অদৃশ্য হয়ে আতঙ্ক চরমে তুলে দিলো। মায় পুলিশ কর্তা এবার চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন,—তোমার রাইফেলটা লোড্‌ করা আছে তো?

খোঁজ নিলেন অবশ্য রাইফেল লোড্‌ আছে কি না, কিন্তু তাতেও ভরসা নেই বুঝে খুপরির ছাদে রাখা লগিগুলি হাতড়াতে থাকেন আর ঝুঁকি মেরে ফিন্‌ডারগুলো দেখবার চেষ্টা করেন।

কাণ্ড দেখে বাউলে বলে—না, বাবু! লগি দিয়ে খোঁচা-খুঁচি করবেন না। ওতে হিতে বিপরীত হবে, আইরাজ আরও ক্ষেপে যাবে।

জলের আথালি-পাথালি তোড়ের মধ্যে কোথায় গেলো আইরাজ? দেখতে না দেখতে পুরোদমে চালু চাকার ছুঁড়ে মারা জলের তোড়ের সঙ্গে আইবাজ তীরের ওপর ঝমাৎ করে পড়েছে দলামলা হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

না, পরক্ষণেই টানটান হয়ে সামান্য জলে কূল বরাবর এগিয়ে যায়। বাউলে আর দেরি করতে চায় না। হাতের বন্দুকে ছরা-টোটা ভরাই আছে। চার নম্বর বাক্‌সট্‌ চোট করে দেয়। খুবই নিকটে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কথা নয়। হয়ও না। মাজা বরাবর রক্ত ফিনকি দিয়ে

উঠেছে। সে কি আক্রোশ আইরাজের! ফোঁস ফোঁস করে এবার গর্জাচ্ছে—ক্রুদ্ধতার যেন সীমা নেই। শত্রুকে সামনে না পেয়ে চরের উপরই বিস্ফারিত ফণা তুলে ছোবল মারতে থাকে।

মাজা-ভাঙা ক্লান্ত আইরাজকে কূল ঘেঁষে সামান্য জলে খল্‌বল্‌ করে কোনওমতে আবার চলতে দেখে বাউলে মের্ধাকে প্রায় দাব্‌ড়ি দিয়ে বলে,—ছোট্‌! লগি দিয়ে চরে ঝাঁপিয়ে পড়, চল।

নিজেও এক হাতে বন্দুক নিয়ে অন্য হাতে চরের ওপর লগির ঠেকো দিয়ে লাফিয়ে পড়ে। বাঘ-শিকারের মতো তো নিঃশব্দে এগুবার আবশ্যক নেই। চরে পড়েই সজোরে চিৎকারে বলে,—নে সাঙাৎ! বন্দুক নিয়ে চল। নদ্দী বরাবর বনের কিনারা দিয়ে। আমাকে না, বুঝলি, আমার দিকে নজর দিবি না....শুধু দেখবি বনের দিকে। 'বড়মেঞা' আমাকে তাক্‌ না করে! এমন সুযোগ সন্ধানে 'বড়মেঞা' থাকেই—বুঝলি, থাকেই।

বলেই বাউলে চরের হাঁটু-কাদায় থপ্‌থপ্‌ করে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। হাতে লগিখানা উদ্যতভাবে ধরাই আছে। বেশ কিছুটা এগিয়েও গেছে।

সহসা তার গতি মন্থর, সামনেই আইরাজ। কেন জানি, এতক্ষণ পলির প্রলেপ দেওয়া চরে আইরাজ উঠবার চেষ্টা করেনি। এবার আইরাজ তার গতিকে থমকালো। চরে উঠবে নিশ্চয়। মাথা নিচু করেই বনের চত্বরের দিকে চর বেয়ে আস্তে আস্তে ওঠে। বাউলে মুখে আর কথা বলে না। শুধু আঙুলে তুড়ি মেরে মের্ধাকে ইসারা করে,—আর এগুবি না, দাঁড়া ওখানে।

আইরাজ বনে উঠতে গিয়েও যেন উঠতে চেষ্টা করে না। বনের মুখে এখানে কূল বরাবর একটা দীর্ঘ হেঁতাল গাছের ঝাড়। জোয়ারের জল এসে এসে এই লম্বা ঝাড়ের তলদেশের মাটি ধুয়ে নিয়ে গেছে। ঝাড় ঝুঁকে পড়েছে চরের দিকে। বেশ দেখা যায়, হেঁতাল গাছের অজস্র ঘন-বিন্যস্ত শিকড়গুলি জলে ধুয়ে যাওয়া ফাঁকা জায়গায় ঝুলে আছে।

কেন জানি, আইরাজ সেই ঝুলন্ত শিকড়ের মধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে দিলো। আহত আইরাজ হয়ত আশ্রয় খুঁজছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাউলে ছুটে গিয়ে তার ফলক-কাটা লগির গোড়াটা দিয়ে রক্ত-ঝরা মাজাটা সজোরে কাদার মধ্যে চেপে ধরলো। তার দেহের ওজনের ভারে আর আপ্রাণ শক্তি দিয়ে। অন্য সব কথা ভুলে বাউলের এখন লক্ষ্য আইরাজের দীর্ঘ লেজটা। এই লেজের আওতায় একবার পড়লে বাউলেকে জড়িয়ে চেপে হাড়গোড় গুড়ো করে দেবে শত্রুর সঙ্গে লড়বার এ এক মহা অস্ত্র সর্পকুলের।

না, বাউলে প্রথমেই লক্ষ্য করে বুঝে নিয়েছে, সে-ভয়ের বোধহয় কারণ নেই। গুলির আঘাতে মাজা-ভাঙা লেজের সে-ক্ষমতা নেই। তাহলে কি হবে, তবু লেজের ডগা দিয়ে স্তিমিত ভাবে খুঁজছে তার শত্রুকে এদিক-ওদিক।

লেজের পাশ থেকে নিজের দেহকে একটু সরিয়ে নিয়েই বাউলে মরণ চিৎকার দিলো,—মের্ধা! শীগগির আয়! ছুটে আয়!

আর্তনাদ শুনতেই মের্ধা হেঁতাল ঝাড়-টাড় ভেঙে লাফিয়ে পড়েছে চরে। হাতের বন্দুক কাদায় পড়তে দেয়নি। বাউলে বলে,—গুলি কর্‌। তুরণ চোট কর! ছররা! ওই শিকড়-ঝাঁকের মধ্যে। নিরিখ করতে হবে না। শীগগির গুলি কর! আন্দাজেই কর!—হাতের লগিতে চাপ রাখতে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে রেখেই আদেশগুলি দিলো।

মের্ধা আদেশের দমকের সঙ্গেই একটা চোট্ করেছে আরেকটার জন্য তৈরি।

চোট্ করতেই বাউলে বুঝে নিয়েছে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। এতক্ষণ লগির চাপের নিচে মৃত্যু যন্ত্রণার নড়াচড়া ক্ষীণভাবে অনুভব করছিলো। এখন তা শান্ত, নেতিয়ে পড়েছে। লেজের ডগাটা তখনও একটু-আধটু নড়াচড়া করতে থাকে। লগির চাপটা একবার শিথিল করে বাউলে বুঝে নেয় সত্যি-সত্যি নিস্তেজ হয়েছে কি না। নিশ্চিন্ত হয়েই মের্ধাকে বলে,—যা এবার লঞ্চ থেকে দড়ি নিয়ে আয়, ওদের যে সাদা দড়ি আছে তাই।

বঁড়শি-গিঁট মাজায় বেঁধে চর দিয়ে টেনে নিতে হবে। বাউলের সাবধানের শেষ নেই। বারবারই মনে রাখে, এক ভয়ঙ্কর বিষধর আইরাজ নিয়েই কারবার করছে। মের্ধাকে দড়ি ধরে টেনে হেঁতাল গাছের তলা থেকে বের করে আনতে আদেশ দিলো আর নিজে বন্দুক নিয়ে তাক্ করে রইলো ওর ফণার দিকে।

· অবশেষে সবাই মিলে টেনে লঞ্চের ডেকে তুলেছে। সবাই জড়ো হয়ে দেখছে। কর্তাবাবু তো ইঞ্চি মেপে আর ওজন করে দেখলেন, সাড়ে পনেরো ফিট লম্বা আর ওজনে প্রায় এক মণ।

বাউলে বলে,—আইরাজ সাপ। বাবু জানেন, আইরাজ সুন্দরবনে ন'রকমের আছে। এর নাম হলো ধনীরাজ। দেখছেন তো কালসিটে রঙ। আর সাপেদের মধ্যে আইরাজেরই দাঁত খুব বড়ো। যেখানে ছোবল মারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আইরাজদের মধ্যে দুধরাজ আর ভীমরাজও আছে। দুধরাজ দেখতে সাদা ধবধবে। কতো বড়ো ফণা দেখেছেন! মাথায় এই দেখেন বড়ো চক্র চিহ্ন। দেখতে কি সুন্দর বলুন তো! আর কি শক্তিধর!!

বর্ণনার ঝোঁকে পুলিশ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে,—আচ্ছা কর্তাসাহেব, শুনছি আপনারা কিছু দিনের মধ্যে সুন্দরবনে ব্যাঘ্র-প্রকল্প চালু করবেন। কিন্তু আপনারা কি সুন্দরবনে আইরাজ-প্রকল্প করতে পারেন না? এদের উদ্যত ফণা দেখলে হৃৎকম্প হয় বটে, কিন্তু দেখতে কি সুন্দর! বাঘের মতো এরাও তো বনের রক্ষক, তাই না।

পুলিশ-কর্তা পুলিশী কায়দায় বলেন,—তা তো হলো! কিন্তু তুমি তো নিজেই আইরাজকে মারলে, তা আবার প্রকল্প করে ওদের বাঁচাতে বলছো!!

বাউলে এবার মাথা নিচু করে একটানা বলে চলে,—....তা জানেন, সাপটাকে আপনারা আগেই লঞ্চের চাকায় আহত করেছেন। আমরা পারতপক্ষে সাপকে কখনও আঘাত করি না, ওরাও আমাদের আমল না দিয়ে চলে যায়।.....সুন্দরবন সমাজে চালু নিয়ম—আঘাত করে কোনও সাপকে কোনও দিনও ছেড়ে দিতে নেই, তাকে শেষ করে তবে বাঁচোয়া।....এরা ভয়ানক প্রতিশোধ-পরায়ণ। আহত সাপ একদিন না একদিন শোধ নেবেই নেবে। শত্রুকে এরা অসম্ভব চিনে রাখে।....জানেন তো মনসাদেবীর শিক্ষাগুরু কে? সে-গুরু তারই বোন নেতাধোপানি। যার মন্দির আজও এই বনের মধ্যে—এই ন'বাকি দোয়ানির পাশেই।

আইরাজের গায়ে হাত ঠেকিয়ে আর নিজের কপালে হাত তুলে নমস্কার করে বাউলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে,—তা বাবু, আমরা সুন্দরবনের মানুষেরা সাপের আইন বড্ড মেনে চলি। আমাদের যে এদের সঙ্গেই বসবাস!!

বনের চোরের উপর শহরের বাটপাড়ি

গোটা সুন্দরবনকে দ্বীপময় এলাকা বলা যেতে পারে। সমুদ্রের উপকূলে প্রথমে দ্বীপের

সৃষ্টি। হিমালয়-ধোওয়া পলিমাটি এসে এইসব উঠতি দ্বীপের বিস্তৃত জল-বিভাজনগুলি ভরাট করে দিয়ে বিস্তীর্ণ টানা এলাকায় পরিণত করে দিয়েছে। তা দিলেও এলাকাগুলি আজও দ্বীপ নামটা হারায়নি। তেমনি একটি এলাকার নাম—মায়াদ্বীপ। এমন মিষ্টি নাম কি কেউ ফেলতে পারে!

পশ্চিমে মাতলা আর পূবে গোসাবা নদীর মাঝে মায়াদ্বীপ সুন্দরবনের শেষ প্রান্তে বললেই হয়। কেন এমন নাম হলো, তার কোনও ইতিহাস নেই। না থাকলেও গোটা সুন্দরবনটাই যে মায়া-মমতায় আবিষ্ট হয়ে আছে। এই মায়াদ্বীপের মায়ায় জড়িত হয়ে সুন্দরবনের লোভাতুর মানুষ মাঝে-মাঝে অঘটন ঘটিয়ে বসে।

ওরা পাঁচজনে মায়াদ্বীপে উঠেছে। ওদের দু'জনই বাউলে। হাজিরুদ্দি গাজি আর অনিলচন্দ্র। দু'জনেই গুরুভাই। এস এম শেখের দুই শিষ্য। সাহেবি কায়দায় ওরা দু'জনেই গুরুর নাম করে কেন জানি না। তবে এই নামেই তিনি এ-অঞ্চলে পরিচিত। দু'জন বাউলের হাতেই বন্দুক।

তারা এসেছে হরিণ শিকারে। মায়াদ্বীপে পাঠা-হরিণের খুব আনাগোনা। সেই শিঙেল চিতল হরিণের লোভেই ওদের আসা। ব্যাঘ্র-প্রকল্প তখনও চালু হয়নি। বাঘ বা হরিণ মারতে কোনও বাধা তখন ছিলো না, তবে সরকারি অনুমতি নিতে হতো। কিন্তু সুন্দরবনের মানুষেরা অতো অনুমতির ধার ধারে না। ওরা ভালভাবেই জানে কি করে এই আইনকে এড়িয়ে কার্যসিদ্ধি করা যায়। এ নিয়ে অবশ্য ওদের কোনও মাথাব্যথা নেই ; কেননা ওরা মনে করে, বনের সম্পদে বনের উপকূলবাসীদেরই স্বাভাবিক অধিকার।

তারা এসেছে একখানি ডিঙিতে। একটা খালের মুখে এক বাঁকে ঢুকে কেঁচকি ঝোপের আড়ালে ডিঙিখানি চরে টেনে তুলে রাখে। খালটি সাড়ি-খাল, মানে এঁকে-বেঁকে বহু দূর গিয়ে শেষ পর্যন্ত বনের চাতারে মিশে গেছে।

আশ্বিন মাস। ভোরের সূর্য আকাশে উঠেছে। বনের চারদিক বেশ আলোকিত। ওরা আর দেরি করতে চায় না। সবাই এগিয়ে চলেছে খাল ধরে। ঠিক খাল ধরে নয়। খালের কূল্ ধরে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে হেঁতাল গাছের ঝোপ। সেইসব ঝোপ এড়িয়ে ওরা খাল বরাবর চলেছে।

বেশ কিছুটা এগিয়ে দ্যাখে, অনেকখানি ফাঁকা। সেই ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে যেন বনের চারপাশে আছড়ে পড়েছে। জায়গাটা দেখেই হাজিরুদ্দি বলে,—অনিল, তুমি এখানে গাছে উঠে বোসো। এমন রোদে হরিণ আসবেই আসবে।

অনিলেরও জায়গাটি পছন্দ হয়। সে-ও তাড়াতাড়ি গাছে উঠে বসে তৈরি হয় বানরের নকল-ডাক ডাকবার জন্য। অন্যেরা দূরে চলে গেলেই অনিলের কায়দা অনিল করে নেবে। এখন ডালে বসে চারদিক ভালো করে নজর দিয়ে দেখতে থাকে।

দ্যাখে, সামনেই একটা মোটা বানগাছ, কালি-বানগাছ। বিশাল গাছ, কিন্তু মরা। একটাও পাতা নেই, কয়েকটা ডালের ছালও ঝরে পড়েছে। কিন্তু উঁচু ও মোটা গুঁড়িটা ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয়, মস্ত বড়ো খোঁড়লও আছে। অনিল ভাবলো, এই জন্যই জায়গাটা এত ফাঁকা লাগছে।

বাকি দলটি এতক্ষণে অনেকদূর চলে গেছে। অনিল বসে বসে ভাবে, যা হবার হবে, আমি তো আমার কাজ করি। কিন্তু কই, কোনও প্রাণীর সাড়া পাচ্ছি না কেন! হরিণের পায়ের কোনও খোঁচ্ দেখছি না। আশপাশে গাছে তো একটা বানরও নেই! তা হলে?—সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চুপচাপ বসে থাকে অনিল।

বেশিক্ষণ নয়, সহসা একটু খড়মড় শব্দ খোঁড়লের মাথায়। চমকে ওঠে অনিল। হয়তো বা কোনও মোটাসোটা ময়াল সাপ। আর কে-ই বা অমন খোঁড়লে আশ্রয় নেবে। মুহূর্তের মধ্যে যেন দেখতে পায়, মাথাটা খোঁড়লের ভিতর থেকে উঁচু করে তুলে ধরেছে। অনিলের নজর আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। না তো, একটা নয়, যেন দুটো.....তবে কি দুটো ময়াল সাপ !!

অনিল লহমার মধ্যে পরিষ্কার দেখতে পায়—না, বাঘের থাবা। দুটি নখ-বিস্ফারিত থাবা ভিতর থেকে খোঁড়লের মাথাটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে। গাছের ডালে শক্ত করে পিঠ ঠেকিয়ে অনিল বন্দুকের নল উঁচিয়ে ধরতে-না-ধরতে বাঘটি খোঁড়লের মাথায় উঠে টাল সামলাতে না পেরে লাফিয়ে পড়ে চত্বরে। পড়ে ঠিক অনিলের উল্টো দিকে। তারপর কোনও কিছু ভ্রূক্ষেপ না করেই খোঁড়লের আড়ালে-আড়ালে অনিলের দিকে পেছন দিয়ে তর্‌তর্‌ করে সোজা ঢুকে যায় বনের গভীরে।

হতবুদ্ধি হয়ে যায় অনিল। তার গা ছমছম করে ওঠে। আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে সটান নেমে ডিঙিমুখো চলে আসে সে। কিন্তু ডিঙিতে একা-একা অপেক্ষা করার সাহস হয় না তার। সোজা পাশের একটা গেঁয়োগাছে উঠে দলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

কিছুটা সময় কাটবার পর সূর্য পশ্চিমে গড়িয়ে পড়লে হাজিরুদ্দির দল ফিরে আসে। আসবার সময় দূর থেকে শিস দিতে দিতে আসে। ন্যাড়া বানগাছের খোঁড়লের কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে ওরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। পরক্ষণেই ডিঙির সামনে থেকে পাখির ডাকের মতো অনিলের নকল শিস শুনতে পায়। কী জানি কী হলো ভাবতে ভাবতে ওরা ডিঙিতে উঠে আসে।

নানা কথা আলোচনার পর হাজিরুদ্দি বলে,—না, আজ রাতে এ-পারে নয়। চলো, বড় নদীতে গিয়ে ও-পারে মাঝ-নদীতে চরামতো জায়গায় লগি পুঁতে রাত কাটাই।

অনিল আশ্চর্য হয়ে বলে,—তার মানে তোমাব কালকের মতলব আঁটা হয়ে গেছে।

—আঁটবো না ! এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে। তুমি তো বুঝতেই পারছো, ওটা বাঘ নয়, বাঘিনী। কোনও বাঘ কি অমন খোঁড়লে থাকে ? বাঘের হাত থেকে বাঁচবার জন্য একমাত্র বাঘিনীই খোঁড়লে ঢুকে বাচ্চাকে লুকিয়ে রাখতে পারে। ও বাঘিনী। বাচ্চা ওখানে আছেই আছে। জানো, একটা বাঘের বাচ্চার দাম কতো ?

অনিল সায় দিয়ে বলে,—দামের খবরে দরকার নেই। বাঘের বাচ্চা ধরাটাই বাউলেদের কাছে কি কম !!

সব ঠিক হয়ে গেছে। কাল খুব ভোরে সবাই উঠবে। দুই বাউলে দুটি পাশাপাশি আলাদা গাছে উঠবে। দু'জনে কখনও কিন্তু একসঙ্গে গুলি করবে না। আগে বুলেট মারবে হাজিরুদ্দি। তারপর অনিল মারবে এল জি বাক্‌শট্‌। সাত পিনের এই গুলিই অনিলের মনের মতো।

অন্যদের তিনখানা শক্ত মাঝারি লগি সঙ্গে নিতে বলে। হাজিরুদ্দি কিন্তু বারবার হুঁশিয়ার করে দেয়,—তোমাদের সঙ্গে নেবো, কিন্তু খবরদার কেউ মুখে টুঁ শব্দটি করবে না। জানোই তো মা-বাঘিনীর তেজ সাংঘাতিক। এই সময়ে বাঘও ভয় করে বাঘিনীকে।

পরদিন সাতসকালে নিঃশব্দে যে যার গাছে উঠে পড়েছে। ওদের অনুমান, শেষ রাতে বাঘিনী বাচ্চার কাছেই আসবে। আবার সকালের প্রথম প্রহরেই বেরিয়ে ঘুরতে যাবে আশপাশের বনে। দূর থেকেই বাচ্চাকে পাহারা দেবে তো।

সময়মতো যথাস্থানে দুই বাউলে তৈরি হয়েই আছে। বাঘিনী একই ভাবে খোঁড়ল থেকে

বেরিয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাজিরুদ্দির বুলেট বাঘিনীর বুকে। লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে বাঘিনী বুলেটের টাল সামলে নিতে চায়। কাছেই খাল। সেদিকেই বাঘিনী ঝুঁকছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার অনিলের এল জি বাক্‌শট্‌ বাঘিনীর কানের পিঠে।

তবু বাঘিনী টলতে টলতে খালের ধারে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বনের জীবমাত্রই আহত হলে জলের দিকে যেতে চায়। ভাল করে কিছুক্ষণ দেখে-শুনে তবে ওরা গাছ থেকে চত্বরে নামে।

দু'জন বাউলে বন্দুক হাতে পাহারাদারের মতো খোঁড়লের দু'পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বাকিদের মধ্যে হেমন্ত সাউ বেশি সাহসী ও চটপটে। তাকেই ভার দেওয়া হলো খোঁড়লে ঢুকতে। লগির সাহায্যে খোঁড়লের মাথায় উঠে গলা বাড়িয়ে দ্যাখে, দুটি বাঘের বাচ্চা দিব্যি ঘুমুচ্ছে। ছোট্ট, অবিকল বিড়ালের বাচ্চার মতো ; তবে অতো ছোট না। গায়ের রঙের ছোপ এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সাদাটে মতো দেখতে।

আরেকটা লগির সাহায্যে হেমন্ত খোঁড়লের মধ্যে নেমে যায়। তারপর যেমন করে বিড়ালের বাচ্চা ধরতে হয়, সেইভাবে ঘাড়ের তুলতুলে চামড়া টিপে ধরে বাঘের বাচ্চা দুটোকে ঝুলিয়ে নিয়ে এলো।

*　　　　*　　　　*

এবার ওদের চিন্তা যত তাড়াতাড়ি পারে কলকাতায় নিয়ে বিক্রি করা। গ্রামে জানাজানি হলে তো রক্ষে নেই। ভিড় জমে যাবে বাঘের বাচ্চা দেখার জন্য। শেষমেশ বনকর আপিসেও খবরটা পৌঁছে যেতে পারে।

সবচেয়ে বড় আশঙ্কা, কলকাতা যাওয়া অবধি বাচ্চা বাঁচিয়ে রাখা। গুঁড়ো দুধ গুলে গামছায় ভিজিয়ে ওদের মুখের কাছে ধরা হয়। বাচ্চা দুটি চুকচুক করে খেয়েও নেয়, দেখে ওরা সবাই ভারি খুশি।

পরদিন দুই বাউলে একটা ঝুড়ির মধ্যে বাচ্চাদের শুইয়ে আর দুধে-ভেজা গামছায় সুতো বেঁধে ওদের মুখের সামনে দিয়ে রাখলো। ঝুড়ির উপর পুঁইশাকের ডাঁটা বোঝাই করে চাপিয়ে দেয়। ক্যানিং থেকে এবার তরকারির ট্রেনে চেপে নির্বিবাদে ওরা কলকাতায় হাজির।

কলকাতায় কিন্তু অনিলচন্দ্রই মাতব্বর। হাজিরুদ্দি এর আগে কলকাতায় বিশেষ আসেনি। কলকাতার পথঘাটও চেনে না সে। অনিল আর কিছু না হোক, বাঘের ও তারকেলের চামড়া বিক্রির ব্যাপারে অনেক খোঁজখবর রাখে।

ওরা দু'জনেই ক্যানিং স্ট্রীটে হাজির। একটা সিনেমা হলের সামনে এক দোতালা আপিস ঘরে এসে ঢোকে।

আপিসের ঝানু ব্যবসায়ী তো প্রথমেই এক ধাক্কা মারলো,—এ কী! এ কী নিয়ে এসেছো! পুলিশ দেখলে তো তোমাদের রক্ষে নেই। বনের বাঘের বাচ্চা নিয়ে এসেছো ? দেখি, দেখি।

দেখতে চেয়েও ধারে-কাছে কিন্তু যায় না। কি জানি বাবা! হাজার হোক বাঘের বাচ্চা তো! লাফিয়ে পড়ে না আঁচড়ে দেয়। মানুষের গন্ধ পেয়ে একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড না করে ফেলে!

ব্যবসায়ীটি একটু হেসে বলে,—তা ভাইজান, কতো দাম দিতে হবে ? জানোই তো, এই বাচ্চা নিয়ে আমি কতরকম হুজ্জুতে পড়তে পারি।

হাজিরুদ্দি ও অনিল পরস্পরের দিকে তাকায়। অনিলকে শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে হয়। বলে,—বাঘের বাচ্চা তো, তা আর কতো কম করে বলবো। দেবেন....এই এক হাজার করে মোট দু' হাজার টাকা।

ব্যবসায়ী তো অবাক হয়ে যাবার ভান করে বলে,—দু' হা-জা-র!

ইতিমধ্যে বারান্দা ও আপিসের ঘরে লোকে লোকারণ্য। বড়বাজার অঞ্চল, লোকের কি কমতি আছে। সবাই বাঘের বাচ্চা দেখার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু করেছে।

হঠাৎ ব্যবসায়ী হন্তদন্ত হয়ে ভিড়ের লোকদের ঠেলেঠুলে বারান্দা দিয়ে পাশের ঘরে গেলো। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসেই বলে,—দ্যাখো, বনের মানুষ। আড়াইশো আড়াইশো, মোট পাঁচশো দেবো। আমার আবার তো পুলিশদের খুশি করতে হবে। দেখো যেন তোমাদের পুলিশে নজর না দিয়ে ফেলে। বলো, রাজি কি না?

রফা হতে না হতেই জানালা দিয়ে ওরা দ্যাখে, পুলিশের পোশাকে ক'জন লোক বারান্দায় হাজির।

পুলিশ দেখেই হাজিরুদ্দি ও অনিলের চক্ষু ছানাবড়া। আর কোনও কথা না বলে দু'জনে কোনোওমতে পাশ কাটিয়ে বারান্দায় এসে সটান রাস্তায়।

রাস্তায় এসে হাজিরুদ্দি বলে,—ওরা ঠিক পুলিশ তো? দেখে মনে হলো, নকল পুলিশ। গায়ের পোশাক-টোশাক কেমন যেন। পায়ে পুলিশের জুতোও দেখলাম না। ছেঁড়া স্যাণ্ডেল পরে এসেছে।

অনিল বিমর্ষ মুখে বলে,—তা হোক, একবার হাজতে গেলে কলকাতায় আমাদের দেখবার কেউ নেই। চলো, ফিরে যাই।

ফিরেও এলো ওরা। এসে গ্রামের উৎসুক লোকদের বোঝালো,—অতো কচি বাচ্চাকে কি অতোটা পথ বাঁচিয়ে রাখা যায়। তোমরাই বলো? মা-হারা মানুষের বাচ্চা আর মা-হারা বাঘের বাচ্চার অবস্থা তো প্রায় এক রকমই।

*   *   *

চার দিন পর খবরের কাগজের একটি ছোট্ট খবরে দুই বাউলের চোখ আটকে যায়। দমদম বিমানবন্দরে এক বিদেশী সাহেব বহু মূল্যের দুটো বাঘের বাচ্চা সুটকেসের মধ্যে লুকিয়ে পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। সংবাদটি দেখে দু'জনে মুচকি হাসে আর কপালে হাত থাবড়ায়। এরপর কোনও দিন ওদের দু'জনে আর কারও কাছে মায়াদ্বীপের বাঘের বাচ্চা ধরার বড়াই করেনি।

বীরাঙ্গনা, না সুন্দরবনের মা!

রাতের প্রথম প্রহর কেটে যাবার মতো। মা ও ছেলে একটা কেরোসিনের টেমি ধরিয়ে ঘরের খটখটে মেঝের ওপর বসে। মা বাঁ-হাতে সুঁইটা টেমির ধারে নিয়ে ডান হাতের সুতোর ডগাটা এক-একবার মুখের মোলায়েম রসে ভেজা চিকন ঠোঁটে ধরছেন আর সুঁইতে ভরবার চেষ্টা করছেন। ছেলেটি একটা কাঠি নিয়ে জ্বলন্ত পলাতের গায়ে লেগে থাকা ভুসোর কণাগুলি ছাড়িয়ে দিচ্ছে, যাতে টেমির শিখা জোরদার হয়ে ওঠে। মা যে তারই ছেঁড়া জামাটা সেলাই করতে বসেছেন।

সাতজেলে গাঁয়ের পুবে গাড়াল নদীর কূলে এক ছোটো চাষীর বাড়ি। বাড়ি বলতে

একখানা দোচালার খড়ের ঘর। তা হলে কি হবে, ভারি গোছানো বাড়িটা। ঘরের দু'পাশে দুটি দাওয়া। সামনের দাওয়াটা ঘরের মেঝে থেকে মাত্র এক ধাপ নিচুতে। তা হলেও ঘরের ভিত বা 'ডোয়া' খুবই উঁচু বলে সামনের দাওয়াটাও এই ঘোর বর্ষায় বেশ খটখটে। এটাই ওদের বৈঠকখানা। আরামে মাদুরে বসে তামাক খেতে-খেতে মজাসে গল্প-গুজব করার মতো। সংসারের বাকি যাবতীয় কাজ ঐ একখানা ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে রান্না-বান্নার জন্য পাশের ঘেরা দাওয়াটা সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছে। এই দাওয়াটা বেশ নিচুপানা যাতে উঠোন থেকে সহজে ওঠা-নামা করা যায়।

কয়েক হাত পাশেই এদের গভীর একটা ডোবা। গভীর বটে, তবে আকারে বিশেষ বড়ো নয়। ঘরের ডোয়া উঁচু করতেই এই ডোবাটা কেটেছিলো। ছোটো হলেও ছোটো-খাটো মাছ চলাফেরা করে থাকতে পারে। প্রায় গোটা ডোবাটাই কলমি লতায় ঢাকা। তাতে মাছের যেমন খাবার মেলে তেমনি নিদারুণ গ্রীষ্মেও জল একদম শুকিয়ে যায় না। ঐটুকু ডোবাতে যে কতরকম মাছ তার ইয়ত্তা নেই। টাকি, সিঙি, কই, ফলুই পুঁটি—যেন সব কিলবিল করে। এ সবের অনেকেই বর্ষায় বিল থেকে এসে জোটে। তার ওপর গতবার কয়েকটা জ্যান্ত তেলাপোয়া মাছ ছেড়ে দিয়েছিলো। তাদের দাপটে অন্য সব ছোটো-খাটো মাছ বিপদ গোনে। তা হলে কি হবে, তেলাপোয়া মাছের এমন বাড়তি যে চাষীকে সুদে-আসলে পুষিয়ে দেয়। সবাই মিলে এরা জলে এমন ঘাই মারে যে তা শুনে ইচ্ছে হয় তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে খালুই ভর্তি করি।

তাই ছেলেটি আজ এক কাণ্ড করে বসেছে। ছেলেটির নাম মানিক। মায়ের দেওয়া এই সুন্দর 'মানিক' নামটি কিন্তু আজ সবার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'মান্‌কে'। গাড়াল নদী থেকে সুন্দরবনের 'পাখিরালয়' বেশি দূর নয়। সেখানে যেতে-আসতে কত পাখি যে গাড়াল নদীর পথ নেয় তার হিসেব নেই। এই সব পাখির মধ্যে থাকে মানিক-জোড়। মানিক পাখিদের এমন ভালবাসা যে জোড়া ছাড়া এরা ওড়েই না। মায়ের খুবই মমতা ছিলো এই মানিকজোড়ের প্রতি। তাই তার প্রিয় ছোটো ছেলেটির নাম রেখেছিলেন মানিক। মা কিন্তু সব সময় তাকে মানিক বলেই ডাকেন। 'মান্‌কে' নামটা ওর ভালই লাগে না।

বাবা কালিপদ মণ্ডল আজ হাটে যাবার সময় আবদার ধরে মানিক,—বাপ, আজ তোমাকে বঁড়শি আর নাইলনের শক্ত সুতো এনে দিতেই হবে আমাকে।....দুটো বঁড়শি, এনো, একটা ছোটো আরেকটা বড়ো। বুঝলে! আনবে কিন্তু!

বাবা বলেন,—কেন রে! আজই কেন?

—বাঃ, আমি ডোবায় মাছ ধরবো। তুমি তো বাড়ি থাকো না, সকাল-সন্ধ্যায় মাছগুলো কি যে দাপাদাপি করে তা বলার নয়। আমি কাল ধরবোই। তুমি দেখো, আমি কতো মাছ ধরি!

মানিক বাবার হাত জাপটে ধরেছিলো। সে-হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে বাবা বললেন,—যা, আজ তোকে এনে দেবই। তুই কিন্তু জেগে থাকিস্। আমার আসতে দেরি হলেও হতে পারে।

সন্ধ্যা হতেই মা ওকে খাইয়ে দেন। নিয়মমাফিক সে বিছানায় চলে যায়। বিছানা মানে বাঁশের খুঁটিতে মাচা মতো বেঁধে তক্তা বিছিয়ে খাট বানানো। তার ওপর মাদুর ও বালিশ। শুয়ে ঘুম আসে না। বঁড়শি আর সুতোর কথা ভাবে। বাবার জেগে থাকার অনুরোধটাও মনে পড়ে।

একটু পরেই মা টেমি নিয়ে মাটিতে সেলাই করতে বসে যান। তার পছন্দসই জামাটা

সেলাই করতে দেখেই মানিক আর বিছানায় থাকতে পারে না। এক লাফে নেমে মার কাছে এসে বসে।

মা বলেন,—কিরে! ঘুমোলি না! রাত হয়ে গেছে যে!

—বাঃ, বাপে আমাকে জেগে থাকতে বলেনি?

—কেন রে?

—কেন রে! বাপে আজ হাট থেকে আমার জন্য বঁড়শি নিয়ে আসবে না! তাও তুমি জানো না?

—ওরা যে আজ সন্দেশখালির হাটে গেছে, আজ তো ফিরতে একটু দেরি হবেই।

কালিপদ মণ্ডল ভারি সক্ষম চাষী। তবে নিজস্ব ধানের জমি সামান্যই আছে। তার তদারকিতে সময়ও যেমন লাগে না, তেমনি মেহনতীও নয়। তারই সুবাদে বাড়ির লাগোয়া জমিতে ছোটোখাটো সুন্দর সব্জী বাগান সে গড়ে তুলেছে। জমি বেশি লাগে না অথচ ফলবতী হয় এমন সব সব্জী গাছ লাগিয়েছে। অজস্র উচ্ছে, লাউ, কুমড়ো, তরমুজ, পেঁপে—এমনি ধরনের গাছ। কাউকে ঘরের চালে, কাউকে ঘেরের বেড়ায়, কাউকে বা ছোটোখাটো মাচায় চারিয়ে দিয়েছে।

আজ হাটে বেচার জন্য দুই হাটুরে-ঝুড়ি বোঝাই হয়ে যায়। যাবেও সন্দেশখালি হাটে। সেখানেই বড় ব্যাপারীরা আসে, দামও ভালো মেলে। হাট বেশ কিছুটা দূরে, নদীপথে যেতেও বেশ সময় লাগে। তাই বড়ো ছেলেটিকেও সঙ্গে নিয়েছে।

একটু পরেই মানিক আবার শুধোয়,—বাপের আসতে অতো দেরি হচ্ছে কেন?

—বা রে! অতো দূরে গেছে, তাতে আবার গোন-বেগোনের রাস্তা। দেরি তো একটু হবেই।

আধা-খোলা দরজাটা ঠেলে মানিক পুরোটা খুলে দিতেই মা প্রশ্ন করেন,—তা অমন করে হাঁ করে খুলে দিলি কেন?

—বাঃ, দেখছো না! এবার টেমির আলো উঠোনে কতদূর চলে গেছে!

—তা উঠোনে আলো দিয়ে কি হবে?

—বাঃ, বাপে আসবে না! তারা এসেই ঘর ও দাওয়া অন্ধকার দেখলে ওদের ভালো লাগবে? বলো!

বলেই মাথাটা প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে দাওয়ার নিচু চালের তলা দিয়ে দ্যাখে আর বলে,—দ্যাখো, দ্যাখো মা! আলোটা কত দূর গেছে। সেই হুড়কো পার হয়ে ভেড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। দাঁড়াও সলতেটা আরও ঝেড়ে দিই। তখন দেখবে সে আলো বাপেরা দূর থেকেও কেমন দেখতে পাবে!

* * *

সে আলো বাপেরা দেখতে পাবে বটে, কিন্তু সে আলো আরেকজন চোরকেও তার পথ দেখিয়ে দেবে বৈ কি!

জায়গাটা মরিচঝাঁপির নিকটেই। সুন্দরবন ও আবাদ সেখানে এপার-ওপার। গাড়াল নদী এখানে নিকটেই মিশেছে ঝিলা নদীর শাখার সঙ্গে। কাজেই তে-মোহনার নিকট বলেই যা একটু দুরূহ করে তুলেছে পারাপার।

সুন্দরবনের দুর্ধর্ব অধিপতির পক্ষে এই দুরূহতাকে এত দিন অবজ্ঞা করার বিশেষ কারণ ছিলো না। কারণ মানুষকে হনন করাই তার পেশা নয়। সহজলভ্য খাদ্যই তার কাছে মূল

কথা। তাতে বাধা পড়লে সে অবশ্য মরিয়া হয়ে ওঠে। শিকারের কৌশলটা পাল্টায় তখন ওরা।

সুন্দরবন এক অদ্ভুত ধরনের বন। বাদা ও আবাদ একাকার হয়ে যায়নি কোথাও। মানুষের রাজ্য ও বাঘের রাজ্যের পরিষ্কার সীমানা টানা আছে নদী ও খাল দিয়ে। খরস্রোতা জল-রেখা দিয়ে প্রকৃতিই ঘিরে রেখেছেন বাঘের এই চারণভূমিকে। গোটা সুন্দরবনটাই যে কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি মাত্র। দ্বীপগুলি ছিলো বিস্তৃত জলে ঘেরা। ধীরে ধীরে সেই জল-বেষ্টন সঙ্কুচিত হয়ে অধুনা নদী ও খালে পরিণত হয়েছে। সেই নদী ও খাল কোথাও পাঁচ মাইল, কোথাও বা সিকি মাইল বিস্তারে খরস্রোতা হয়ে বয়ে যায় জোয়ার-ভাটার টানে।

বাঘও এই সীমাকে বরাবরই মর্যাদা দিয়ে এসেছে। কখনও যে এযাবৎ সে পার হতো না, তা নয়। এলেই অসোয়াস্তি বোধ করে দ্রুত ফিরে যেতো আপন রাজ্যে। খোলামাটা জায়গা যেন ওদের ধাতে সয় না। সে সময় তাদের সংখ্যা ছিলো অল্পই। হরিণ বা শুয়োর শিকার করা কষ্ট হলেও, তাতেই তারা তাদের ক্ষুধা মেটাতো।

কিন্তু গত বারো বছর ধরে ব্যাঘ্র-পরিকল্পের দৌলতে ওদের সংখ্যা এখন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কাজেই খাদ্যের তাগিদে নদী-খাল পার হয়ে মাঝে মাঝে ঢুঁ মারতে হচ্ছে আবাদে, মানুষের রাজ্যে।

কিন্তু খোলা মানুষালয়ে ওদের শিকার ধরতে ভিন্নতর কৌশল অবলম্বন করা অপরিহার্য। সুন্দরবনের বাঘের এই ভিন্নতর কৌশল হলো—চৌর্যবৃত্তি। এ যেন কেঁদো-বৃত্তি, চুপিসারে এসে চুরি করতে হবে।

সেই চোর আজ এসেছে গাড়াল নদীর গ্রামে। বেগবতী তেমোহনার প্রবল সব ঘূর্ণি সাঁতরে পার হয়ে নিশ্চয় নদীর জল থেকে ভেড়ির কোল অবধি সঙ্কীর্ণচরা অঞ্চল বরাবর যে বন্য গাছ ও আগাছা আছে তারই আড়ালে আড়ালে রাতের অন্ধকারে এসেছে। এই গাছ ও ঝোপগুলি আবাদের অধিবাসীরা সযত্নে রক্ষা করে। কাঠের লোভে নয়, নদীর ভাঙন রুখতে। সুন্দরবনের জোয়ার-ভাটার টানে মিশ্রিত মিষ্টি ও লোনা জলে গাছের অজস্র শিকড় আপ্রাণে আঁকড়ে ধরে নদীর পলিমাটিকে। ভাঙন রুখে দেয়।

রাতও বেশ হয়ে গেছে। চাষীরা যে যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে চোরের মতো এগিয়ে এসেছে মানিকের বাড়ি অবধি।

ভেড়ির ওপর দিয়ে টানা পথে অতি সহজেই এগিয়ে আসতে পারতো। কিন্তু হিংস্রতম এই জীব যে ভয়ানক সাবধানী। নোনা ফুটে ওঠা ভেড়িটা যে অন্ধকারেও সাদাটে দেখা যায়। তার উপর দিয়ে পদচারণ করলে তো ভেড়ির এ-পাশের বিস্তীর্ণ খোলা এলাকা থেকেও যে দেখা যাবে। তা ছাড়া খোলা জায়গায় উল্টোপাল্টা বাতাসে নিজের উগ্র গন্ধটাও তো সজাগ করে দিতে পারে শিকারকে।

না, এমন ভুল কাজ কখনও এ-জীব করে না। তবুও ভেড়ির উপর দিয়ে কোনমতে মাথাটা তুলে লোকালয়ের আবভাব বুঝে নিতে নিশ্চয় কসুর করেনি।

ফাঁকা দরজার আলোই ওকে প্রলুব্ধ করে তুলেছে। কান খাড়া করে মানিকের বকবকানির একটু আধটু আওয়াজও নিশ্চয় পেয়েছে। তবুও সোজা পথে আঙিনায় যেতে ওর সাহস হয় না। একবার জানাজানি হলেই চারিদিক থেকে মানুষেরা ছুটে আসবে তাদের লাঠি-সোটা নিয়ে।

তাই সে হুড়কোর আগল দেওয়া সোজাপথ এড়িয়ে গেলো। আগুনকে যমের মতো ভয়

করলেও টেমির আলোকে ওরা উপেক্ষাই করে।

পথ ধরলো ডোবার পাশ দিয়ে। ডোবার কাছে মাছের ঘাই যে ওর কানে যায়নি তা নয়। ওরা মাছও খায় তৃপ্তির সঙ্গে। বনের ভিতরের নদীতে চরের সামান্য জলে দুই থাবায় ঝমাৎ করে তালি দিয়ে মাছ ধরে ধরে খায়। কিন্তু তাতে যে বড় শব্দ হয়। চোরের পক্ষে তেমন শব্দ করার ঝুঁকি নেওয়া আজ কি সম্ভব!

চুপি-চুপি নিঃসাড়ে রান্নাঘরের দাওয়া থেকে ঘরের সামনের উঁচু দাওয়ায় উঠেছে। এমন নিঃশব্দ বিচরণ বোধহয় অন্য কোনও চোরের সাধ্যের বাইরে।

ভারি সতর্ক এই জীব। এমন সময়ে জোরে নিঃশ্বাসটাও ফেলে না। মাত্র মুহূর্ত সময়। শেষমেষ ওর গায়ের গন্ধটা পেয়ে আঁতকে ঘরের মানুষ দরজা বন্ধ না করে বসে! একবার বন্ধ করলে এই খোয়াড়ের মতো আস্তানায় না আটকে পড়ি! আমি তো প্রায় শত্রু ব্যূহের মধ্যে। চারিদিকে মানুষেব আলয়। পলকের মধ্যে বুঝে নিতে হবে, ঘরের মধ্যে গিজগিজ করছে না তো মানুষ! না, সেকেন্ডের মধ্যে বুঝে নেয়—না, তেমন আশঙ্কা করার নেই। তেমন সাড় মেলে না।

বিন্দুমাত্র দেরি করার অবকাশ নেই। বনের শিকারের মতো ভুলক্রমে হুঙ্কারে তেজের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে না পড়ে বসি! আমি তো এখন চোর। তবু দন্ত বিস্ফারিত করে গোল-গোল আগুনে চোখে, হাঁ করা মুখে ভ্রূ কাঁপিয়ে চকিতে টেমির স্পষ্ট আলোতে একখানা থাবা ঘরে ঢুকিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো আবির্ভূত হয় মা ও ছেলের সামনে।

দু'জনাই হতচকিত। সম্বিত হারাবার মতো। মা আড়ষ্ট। তা হলেও বালকের প্রাণের জোর প্রবল বলেই চেষ্টা করে মায়ের কোলে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যু সে সুযোগ দেবে কেন! বিদ্যুৎ গতিতে গক্ করে করাল দাঁতে পিষ্ট করে মুখে তুলে নিয়েছে। নিয়েই পেছন ঘুরে দাওয়ায় নেমে যেতে চায়।

কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে বালক একবার 'মা' বলে দারুণ আর্তনাদ করে ওঠে। ছেলের সেই মরণ-চিৎকারে মাযের ভীতির আড়ষ্টতা যেন মুহূর্তেই উবে যায়। চিৎকার করে ওঠেন,—কুকুরে আমার ছেলেকে নিয়ে গেলো রে! নিয়ে গেলো!!

সুন্দরবনের মানুষেরা বনের অন্তরালে কখনও বাঘের নাম ধরে ডাকে না। বিধিনিষেধের কথা অবচেতন মনে থাকার জন্য আর্তমুহূর্তে আবারও মা প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠেন,—কুকুরে মানিককে নিয়ে গেলো!!

কিন্তু মায়েব টান কি শুধু চিৎকারে শেষ হয়। বাঘও বেরিয়েছে দাওয়ায়, মা-ও হুমড়ি দিয়ে পাগলের মতো বেরিয়েছেন। বাঘও ছেলেকে মুখে কামড়ে রেখে দাওয়া থেকে উঠোনে লাফ দেবার উপক্রম।

মা-ও যেই দেখেন তাঁর সামনে লেজটা দোলায়িত করে উঠোনে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত, আর সহ্য করতে পেরে ওঠেন না। ঝাঁপিয়ে পড়ে লেজটা আপ্রাণ-শক্তিতে টেনে ধরেছেন....দেবেন না, কিছুতেই দেবেন না তাঁর ছেলেকে নিয়ে যেতে....লেজটা এবার লঞ্চের মোটের সাথে কাছি জড়াবার মতো দাওয়ার খুঁটিতে জড়াতে চান।'

যে কোনও জীব তার লেজ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। মানুষে যেমন তার কান ধরলে রুষ্ট হয়ে পড়ে, যে কোনও জীব, বন্যজীব তো বটেই, লেজ ধরলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। লেজ ধরতেই বাঘ তো রাগে আগুন। ভুলে যায় যে সে চুরি করতে এসেছে....এক ঝাঁকানিতে মানিককে মুখ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় উঠোনে.....তারপর গর্জে এসে পেছন ঘুরে এমন জোরে কামড়ে দেয় মা-কে যে মুঠোর লেজ আপনা থেকে আলগা হয়ে যায়—মা-কে মুখে

তুলেই উঠোনে ঝাঁপ দিয়ে ছুটে চার হাত উঁচু হুড়কো এক লাফে পেরিয়ে উধাও হয়ে যায় বিদ্যুৎ গতিতে।

জানি না, বাঘের মুখে ঝুলন্ত অবস্থায় মায়ের কতক্ষণ জ্ঞান ছিলো। হয়তো শেষমেষ দেখে গেছেন, মানিককে রক্তাক্ত হয়ে উঠোনে গড়াগড়ি করতে....নিতে পারেনি তাঁর ছেলেকে সুন্দরবনের কুকুর !! বীরাঙ্গনার, সুন্দরবনের মায়ের এইটুকুই যা তাঁর শেষ সান্ত্বনা।

বিশু বাউলে

ছিলো বিশু বৈরাগী। হলো বিশু শিকারী ৷ এখন আবার বিশু বাউলে। কেমন করে এমন অঘটন ঘটলো—সে কথা প্রশ্ন করলে, বাউলের কাছ থেকে জবাব মেলে না। মিষ্টি হেসে শুধু সুন্দরবনের দিকে তাকায়।

বাইরের কেউ প্রশ্ন করলে অবশ্য অমন করে না। তখন এটা-ওটা কথা তুলে প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। তারা তো সুন্দরবন চেনে না।

বাঘের যারা বাউলে বা ওঝা, তারা ভারি হাসিখুশি ও রসিক। হতেই হবে, মৃত্যুকে নিয়ে যাদের এতো খেলা, জীবনের রসের সমজদার তারাই তো হতে পারে।

কিন্তু বিশু বৈরাগী কেমন যেন অন্য ধরনের বাউলে। বিবাগীর মতো ধরন-ধারণ, উদাসীর মতো চলা-ফেরা। তবে বন-বাদাড়ে কর্তব্যের ডাক পড়লে কোনও কথা নেই, সে যেন তখন এক-পা। দায়িত্ব এলে সে তা পালন করবেই করবে। এই দায়িত্ব পালনের সঙ্গে যে তার জীবন জড়িত। এ যে তার জীবিকাও।

ডাক আসে—'বাউলে ! ও বিশু-বাউলে ! বিশু-বাউলে !'

কালিন্দী বন-কর আপিসের বড়বাবুর ডাক। নদীর নামেই আপিসের নাম দিয়েছে লোকেরা। কালিন্দী নদীকে দেখলে তেমন ভয় পাবার কথা নয়। কিন্তু যারা এই এলাকার মানুষ, তাদের এ-নাম শুনলেই গা শিরশির করে উঠবে। এই কালিন্দীর সামান্য গতিপথে রায়মঙ্গলের দিগন্ত বিস্তৃত মোহানা। এই মোহানা খুলনা ও চব্বিশ পরগনার সীমানা টেনে সাগরে পড়েছে। তাতেও ভীত হবার বিশেষ কিছু ছিলো না। সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ রক্ষক ব্যাঘ্রকুলের সব থেকে বড় ঘাঁটি এরই অববাহিকায়।

কলকাতার তিনজন যুবক এসে হাজির। দলের নেতা বিকাশ। বিকাশের মধ্যপ্রদেশে হরিণ শিকারে হাত পোক্ত হলেও এদের কারও বাঘ-শিকারের বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই। তবে কেন তারা এমন রাজকীয় বাঘের রাজ্য বেছে নিলো, তা বোঝাই দায়। পূর্ব-বাঙলার রক্ত ওদের গায়ে, বিপদের রোমাঞ্চে পুলকিত হবার টানে এখানে হাজির হওয়া বিচিত্র নয়।

এসেছে নদীপথে লঞ্চে করে। কালিন্দী আপিসে এসে থতমত খেয়ে গেলেও, সারা পথ মহা আনন্দে এসেছে। কার্তিক মাস। 'দখনের' খোলা আবাদ অঞ্চলে শীতের আমেজ তখন এসে গেছে। বলতে গেলে সারা পথ লঞ্চের চালের ওপর কাটিয়ে দেয়। বড় নদীতে পড়লে বন বা আবাদের বিচিত্র রূপ নজরেই পড়তে চায় না। নদীই যেন সর্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাখে। তার বিস্তৃতি, তার গাম্ভীর্য, তার স্রোতের খরতর টান, তার বিপদের বার্তাবহ ঘূর্ণি, তার কাঁকড়া ঝাঁকের লালাভ দীর্ঘ রেখা, তার শিশুকের অবিরাম চাকার মতো ঘুরপাক—একের পর একে দর্শকের মনকে বিমোহিত করে রাখে যেন।

কিন্তু এদের সবচেয়ে মজা লাগে ছোট খাড়িতে। প্রথম দিকে 'বন টেঁড়শ' তার কচিপাতার হলুদ রঙে যেন বিস্তীর্ণ রেখা চলে গেছে খাল বরাবর। কিছু দক্ষিণে অগ্রসর

হলেই 'হরগোজা' ঝাড়ের আধিপত্য। নুইয়ে নুইয়ে যেন খালের চরে লুটে পড়েছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে পলিমাটির চরের ওপর গুলো-মাছের খেলা।

'হরগোজা' ঝাড়ের পাশেই টানা ভেড়ি। দু'ধারে ভেড়ির প্রাচীরের মাঝে পড়ে লঞ্চের ভটভটি আওয়াজ প্রকট হয়ে ওঠে। দ্রুতগামী লঞ্চের ভটভটি যে এমন মজার, সে খবর ওরা আগে জানতো না। শুধু ওদের কাছে মজার নয়, আবাদী মানুষও আনমনা হয়ে ওঠে এই আওয়াজে। অজানিতে বুঝি ওরা যন্ত্র-সভ্যতার শক্তির বার্তায় পুলকিত হয়ে ওঠে। যেমন করে একদা হয়ে উঠতো মিঠেপানির গ্রামীণ মানুষেরা রেলের ইঞ্জিনের দুরন্ত ফোঁস-ফোঁসানিতে।

ধারে কাছে যারাই থাক তারা একবার ভেড়ির উপর উঠে যন্ত্র-দানবকেদেখবেই। আবাদে খুবই ফাঁকা বসতি। অনেক দূরে দূরে কয়েক ঘর নিয়ে এক একটি বসতি। বসতির ধারে এলেই দেখা যায় এইসব দুর্ধর্ষ মানুষদের। ভেড়ি এত উঁচু যে গ্রাম দেখাই যায় না। আকাশের প্রচ্ছদপটে ভেড়ির উপর দাঁড়ানো মানুষের বিচিত্র রূপ ভেসে ওঠে। নগ্নপ্রায় দেহগুলির আদল দেখলে মনে হবে না এরা খুব বলিষ্ঠ। তবে নোনায় পোড়-খাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি জানিয়ে দেয় এরা সংগ্রামী মানুষ। এমন একটা মানুষের দেখা পাওয়া ভার, যার হাতের মুঠোয় কোন না কোন অস্ত্র নেই। কুড়ুল, কাটারি, কোদাল, কোঁচ, জাল, বোঠে—একটা না একটা হাতে আছেই। কিছু না থাকলেও হাতে একটা লাঠি নিশ্চয় দেখা যাবে। না রেখে বোধহয় এদের নিস্তার নেই। অবিরাম সংগ্রাম—জীবিকার সংগ্রাম, খরস্রোতা জলধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আর সবচেয়ে বড় সংগ্রাম নোনার বিরুদ্ধে। তাই নোনায় পোড়-খাওয়া দেহগুলি দেখলেই চেনা যায়।

ছোট ছেলেমেয়েদের তো কথাই নেই। কি চিৎকারই না তারা করে। কতো কথাই যেন বলতে চায় এই লঞ্চের সঙ্গে। একবার হাত তুলে আত্মীয়তার ইঙ্গিত জানালে রক্ষা নেই—ওরা তখন সমানে ছুটতে থাকে ভেড়ির উপর দিয়ে। পাল্লা দিয়ে হারাতে চায় যন্ত্র-দানবকে।

এমনি ধারা লঞ্চ অভিযা' র অনাবিল আনন্দের অভিজ্ঞতা নিয়ে খাস সুন্দরবনে কালিন্দী-আপিসে উঠতে না উঠতেই যুবকেরা হতবাক্। হতবাকের কারণ আপিসের বড়বাবু। দেখে মনে হয়, অল্পবয়সী। কিন্তু আলাপ-আচারে গুরুগম্ভীর। চিন-পরিচয় নিতে না নিতে মেজাজী গলায় বলে বসলেন,—'না, বিকাশবাবু, বেড়াতে চান সুন্দরবনে, লঞ্চ নিয়ে বেড়াতে ভালই লাগবে। কিন্তু শিকারের কথা বলছিলেন না? লঞ্চ নিয়ে শিকার-টিকার মিলবে না, তা আগে-ভাগেই বলে রাখছি!'

যুবকের দল তো হতভম্ব। কি বলতে গিয়ে কি হবে, কে জানে। বিকাশ তো মাথা চুলকাতে থাকে।

হাবভাব দেখে বড়বাবু এবার যেন একটু বুঝিয়ে বলতে চান,—'দেশী নৌকো ভাড়া করতে হবে। মাঝদরিয়ায় লঞ্চের ভটভটিতে হরিণ বিশেষ বিচলিত হয় না। কিন্তু কূলে কিনারায় এগুতে যান, অমনি সে-আওয়াজে হরিণের পাল চকিতে উধাও হবে।....আর বাঘের কথা যদি বলেন, উধাও হবে না বরং আপনার চোখের আড়ালে পিছু নেবে। শালারা বড় মতলববাজ!'

বলেই এদিক ওদিক দেখে নেন, আবাদী লোক কেউ ধারে কাছে আছে কি না। বাঘ নিয়ে অমন ভাষা সহজভাবে নেয় না আবাদের লোকে।

হরিণ শিকারের কথা ভেবেই এসেছে বনে, বাঘের কথা ভাবেনি। তাই বাঘের গুজব

কাজ দেয়। লঞ্চের রোমাঞ্চ ছেড়ে দেশী নৌকোয় আশ্রয় নিতে হলো।

'বনে উঠবার' তোড়জোড় সবই প্রায় ঠিকঠাক। বিকাশ বললো,—'সবই তো হলো বড়বাবু। কিন্তু বসিরহাট আপিসে বনের পাশ নিতে গেলে রেঞ্জার সাহেব যে বারবার বলেছেন একজন ফকির-টকির সঙ্গে নিতে ?'

দক্ষ কাজের লোকের মতো বাঁকা হাসি দিয়ে বড়বাবু জবাব দেন,—'তা কি আর আমি ভাবিনি !'

এই কথার পিঠেই তখন বিশু বাউলের অমন ডাক পড়ে। বনের গভীরে বনকর আপিসগুলিকে দ্বীপান্তর বলা যেতে পারে ; সারা বছর যেন ঝিমিয়ে পড়ে থাকে। লোকের আনাগোনা থাকে না বললেই চলে। কিন্তু যে বার যে আপিসে কাঠ কাটবার 'ঘের' পড়ে, সে-আপিসে যেন শীতের মরসুমে গম্‌গম্‌ করে ওঠে। কাঠ কাটতে দলে-দলে সব বাহারি নৌকোর বহর আসতে থাকে। তেল-ডাল-নুন কেনাকাটির জন্য দায়সারা গোছের ছাউনিতে একখানা দোকানও বসে যায়। সেই দোকানেই বিশু বাউলে আড্ডায় জমে ছিলো। মরসুমের গোনে সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে বাউলেকেও আপিসের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে হয়। ডাক শুনতেই বাউলে হুঁকোর মুখে ঠোঁট দু'খানা চেপে দীর্ঘ এক সুখটান দিলো। তারপর নাকে-মুখে ধোঁয়ার কুণ্ডলী নিয়ে ত্রস্ত পায়ে এসে হাজির।

—'তা বাউলে, তুমি বাবুদের সঙ্গে একবার যাও না !....দেখো বাপু, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে এনো কিন্তু !!'

—'অমন কথা বলতে নেই বড়বাবু ! সবই তো বনবিবির দয়া। রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে !'—বাউলে হবার পর থেকে বিশু বৈরাগীর কাছে 'বনবিবি' বা 'কেষ্ট', সবই যেন একাকার হয়ে গেছে।

* * *

ভাটার টান সবে শুরু। নৌকোখানি সবাইকে নিয়ে ঢিমেতালে কালোবনের তল্লাটে চলেছে। কালোবন নাম দিলেও আসলে গাঢ় সবুজ বন। এমনিধারা পুরনো দুর্গম বনেই হরিণের আনাগোনা বেশি।

খাদ্যের প্রাচুর্য থাকলে খাদকেরও যে প্রাদুর্ভাব হবে, তা অনুমানের অপেক্ষা রাখে না। যে লোভে মানুষ এসে হাজির হয় এই কালোবনে, বাঘও নিশ্চয়ই সেই লোভে এখানে ঘোরাফেরা করে—বিকাশ এ-সব কথাই ভাবছিলো। তবে তার ভরসা, সঙ্গে বাউলে আছে।

কিন্তু একটা খট্‌কা ছিলো মনে। অনভিজ্ঞ বলে পরিচিত হবার লজ্জা তাকে পেয়ে বসে। বড়বাবুকে তাই বিকাশ সে-কথা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি।

এবার বাউলেকে একান্তে পেয়ে প্রশ্ন করে,—আচ্ছা বাউলে, বলো তো বাউলে কারা ? কাদের তোমরা বাউলে বলো ? মন্তরে যারা বাঘ তাড়ায়, তারাই তো বাউলে। সে-কথা তো জানি। কিন্তু রেঞ্জার সাহেব বললেন, একজন ফকির সঙ্গে নিতে, আর বড়বাবু দিলেন একজন বাউলে !'

—'ওঃ, এই কথা বলছো বাবু ! বাউলেও যে, ফকিরও সে। হতেই হবে,....ফকিরের লাগো সাচ্চা আর সত্যবাদী না হও তো, মন্তরের গুড়ে বালি ; কোনও কাজ দেবে না। বনবিবির দয়া হবে না।'

বিকাশ তার মতো করে বুঝে নিলো, ওটা বাত্‌কে বাত্‌। আসল কথা, এরা ওঝা—মন্তর দিয়ে বাঘ তাড়াবার ওঝা।

গোন-বেগোনের অনেক নদী ও খাল ঘুরে এবার ওরা বনের চাতালে উঠবে। বড় নৌকো নোঙর করে ছোট্ট ডিঙিতে চরে এসেছে। বিস্তীর্ণ চর। দুধের সরের মতো নরম পলিমাটির আস্তরণ পড়েছে গোটা চরের ওপর। নরম কিন্তু পিচ্ছিল নয়, পা দেবে যাবে অনেকখানি। চর শেষ হতেই গাছের সারি। অগুনতি গাছের সারি। বহু দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। তারপরই গাছের ঋজু ও দীর্ঘ গুড়িগুলি একাকার হয়ে দৃষ্টিকে স্তব্ধ করে দেয়। তাই বলে টানা হেঁটে যাবার মতো বনতল নয়। দৃঢ় উর্ধ্বমুখী শিকড় শূলের ফলার মতো উঁচিয়ে আছে সারা চত্বরময়।

কোনোমতে চর পেরিয়ে উঠতে না উঠতে হোঁচটের টাল সামলে বিকাশ বিস্ময়ের সুরে বলে,—'কি ফাঁকা বন! দেখবি আয় তোরা।'

বাউলে ওদের সামনে। পেছন ফিরে বিড়বিড় করে বলে,—'তা তো হলো বাবু! পেরথমেই শূলোয় হোঁচট খেলে।' বলেই তর্জনী ঠোঁটের ওপর রেখে সাবধানীর মতো ইঙ্গিত করে,—'অমনভাবে কথা বলা বনে নিষেধ।'

নির্দেশমতো নিঃশব্দে এগিয়ে চলে তিনজন বাউলের পিছু-পিছু। কাছাকাছি জটলা পাকিয়ে এগুবার ইচ্ছা থাকলেও তা হয়ে ওঠে না। উর্ধ্বমুখী শিকড় এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় একের পেছনে অন্যে লাইন দিয়ে চলেছে।

বাউলে খালের কিনারা ছাড়েনি। খালের পাশ দিয়েই এগিয়ে চলে। লক্ষ্য, চরের একটা পছন্দমতো কেওড়া গাছ। হরিণের কেওড়া পাতার লোভ প্রবল। উঠন্ত বা পড়ন্ত বেলায় চরের রোদের লোভও কম নয়। তাই ঘণ্টা তিনেক হাতে রেখে গাছে চুপচাপ বসে থাকতে পারলে, শিকারীকে হতাশ হতে হয় না। দল বেঁধে হরিণ এই সময় অমন কেওড়া তলায় আসবেই ধরে নেওয়া যায়।

প্রথমে বনকে যতটা ফাঁকা মনে হয়েছিলো, এখন তেমন নয়। এখানে ওখানে হোদো ও হেঁতাল গাছের ঝাড় আর গিলেলতার ঝোপ দৃষ্টিকে ঝাপসা করে আনে। সামনেই একটা খাদ। স্বচ্ছন্দে লাফ দিয়ে পার হওয়া যায়। বাউলেও সহজে পার হয়ে গেলো। বাকি তিনজনে নোনা কাদামাটি মেখে ফেললেও কেয়ার করে না। করবেই বা কেন, সুন্দরবনে শিকার করতে এসেছে।

খাদের দু'ধার বরাবর ওড়া গাছের ঝাড় চলে গেছে। খুব উঁচুও নয়, খুব বিস্তৃতও নয়, বেশ ঘন। এসব নিয়ে ওদের মাথা ঘামাবার অবকাশ নেই। হরিণের পদচিহ্ন নিয়েই ওরা মাতোয়ারা। অসংখ্য পদচিহ্ন। ভেবে অবাক হয়, কতো হরিণের দল না জানি এখানে আনাগোনা করে।

বেশি দূর আর যেতে হয় না। সামনেই বেশ পছন্দমতো কেওড়া গাছ একটা। বাউলে খুব খুশি। আকারে ইঙ্গিতে খানিকটা বোঝাবার চেষ্টা করে তিনজনকে কাছে ডেকে ফিস্‌ফিস্ করে বললো,—'চলো, ফিরি। নাকে-মুখে কিছু দিতে হবে। দেবতা মাথায় উঠতেই বসতে হবে, নয়তো শিকার হবে না। চলো।'

এবার বাউলে লাইনের পেছনে, আর ওরা আগে-আগে। যেমন নির্বাক হয়ে বনে প্রবেশ করেছে তেমনি নির্বাক হয়ে ফিরে আসছে। শুধু বাউলের মানা ছিলো বলে নয়, বন তার গাম্ভীর্যে মানুষকে আচ্ছন্ন করে দেয়। আপনা থেকে মনের সর্ব চপলতা স্তব্ধ করে আনে।

তিনজনে মিলে এক একবার মাটির দিকে তাকায়, পরমুহূর্তে আবার এদিক-ওদিক নজর দেয়। এত্ত হরিণের পদচিহ্ন, দু-একটা হরিণও কি দেখা যাবে না?....কিন্তু বাঘের পায়ের 'খোচ্'। কই একটাও তো দেখতে পেলাম না—ভাবনায় বন্দুকের মুঠো বুঝি দৃঢ় হয়ে

ওঠে। বাঘের সঙ্গে দেখা হলেও তো হতে পারে!

ঔৎসুক্য ও শঙ্কা কাটিয়ে এতক্ষণে চরে ডিঙির ধারে এসে পড়েছে। মনের স্বস্তি যেন ফিরে পেলো সবাই। পাহাড়ের দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ পার হয়ে ফাঁকা আকাশের তলে এলে ঠিক যেমন হয়।

ডিঙির খোলে বন্দুক দুটি রেখে ডালির ওপর দিয়ে পা ঝুলিয়ে তিনজনে বসেছে—মনের ইচ্ছা, ডিঙি জলে পড়লে ভাল করে পায়ের পলিকাদা ধুয়ে নেবে।

বাউলে কাণ্ডকারখানা দেখে না বলে থাকতে পারে না,—'করছো কি বাবু! অমন কাজ করো না। ধুতে হবে না। তা হলে দুটো পা-ই রেখে যেতে হবে। নোনাপানির কামটের খবর তো জানা নেই তোমাদের। জানো তো এই খালের নাম? কামট-কাটা খাল। নামটা সাধে হয়নি।'

বললো বটে, নিজে কিন্তু এক ধাক্কায় ডিঙি জলে ঠেলে দিয়ে পা ঝুলিয়ে পায়ের গোছা রগড়ে ধুতে ধুতে বললো,—'তা বাবু, আমাদের কথা ধরো না। আমরা হলাম গিয়ে বাউলে মানুষ। মরলেই বা কি, বাঁচলেই বা কি!'

বড় নৌকোতে বাসি ভাত-তরকারি তৈরিই ছিলো। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বেলা বারোটার আগেই গাছে উঠতে হবে। আবাদী মিষ্টি ধানের ভাত, আর ডিম-ভরা লোনা ট্যাংরার রসুন ফোঁড়ন ঝোল। এমন খাদ্য মুখে পড়লে হাজার তাগিদ থাকলেও দায়-সারা ভাবে খাওয়া যায় না। খেতে ওদের দেরিই হচ্ছে।

তিনজনে মিলে পাটাতনের ওপর ছড়িয়ে খেতে বসেছে। ফাঁকে ফাঁকে একথা সেকথা ওঠে, তাতে আরও সময় লেগে যায়।

খুপরিতে বাউলেও মাঝিদের সঙ্গে খেতে বসেছে। কান তার খাড়া ছিলো বাবুদের কথাবার্তায়। পরিচয় মাত্র এক রাতের, আপিস থেকে আসবার পথটুকুতেই। যাদের নিয়ে বনের বিপদ-আপদে উঠতে হবে, তাদের 'আবভাবের' চিন্-পরিচয় না থাকলে মুশকিল। তাই বাউলে অমন কান খাড়া করে শুনছিলো। তাড়াহুড়ার কথা ভুলে গিয়ে সে-ও আয়েসীর মতো খেয়ে চলেছে।

হঠাৎ বাউলে যেন স্তব্ধ। হাতের গ্রাস হাতেই রয়ে গেছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভাতের রাশিতে।.....একটা ধূসর রঙের মাছি! বসেছে তো বসেই আছে। এতটুকুও উড়তে চায় না। ধীরে ধীরে বাউলের মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠলো। বাঁ হাত দিয়ে ম্যাছিটা উড়িয়ে দেয়। উড়ন্ত মাছি এবার উড়ে গেলো। কিন্তু বাউলের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণিকের জন্য; তারপরই অন্যমনস্ক। কারো কথাই যেন কানে যায় না। খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, বাউলে বসে আছে তো বসেই আছে। মাঝি বললে—'কি বাউলে, উঠছো না যে? নাও, থালা-টালা ধুয়ে নাও। যাবে না? দেবতা যে মাথার উপর।'

বাউলে কোনও সায় না দিয়েই থালা ধুয়ে এনে তামুকের আশায় বসেছে। বিকাশ এসে বনে উঠবার তাগিদ দিতে থাকে। বাউলের যেন কিসের দ্বিধা। হ্যাঁ বা না, কোনোটাই জোর দিয়ে বলতে পারে না।

অবশেষে তার দ্বিধাই প্রকাশ করে বলে ফেললো,—'তা বাবু, না গেলে কেমন হয়?'

—'কেন? এতো করে গাছ বাছাই হয়ে গেলো, হরিণের আনাগোনার এতো চিহ্ন মিললো, আর এখন বলছো কি না—না গেলে হয় না!!'

বাউলের সুরে দোমনা ভাব,—'না, তা নয়; বলছি কি, তোমরা নৌকোয় একটু আরাম করো, আমি একাই ঘুরে আসছি।'

—'কেন ? আমরা এতদূর ঠেঙিয়ে এসেছি আরাম করতে বুঝি। তা হয় না, হবে না।'

বিকাশ উল্টো বুঝে নিলো। নতুন বন্দুক দেখে নিজের হাতে শিকার করার লোভ বুঝি পেয়ে বসেছে বাউলেকে। তাই একটু থেমে বললো,—'চলো বাউলে, গাছে তোমার হাতে একটা বন্দুক দেবো। তোমার শিকারের সখ মিটিও। চলো এবার, আমরা যাই।'

—'না বাবু, সখের কথা না। বনবাদাড়ের মানুষের কাছে হরিণ শিকার তো জল-ভাত। সখ-টখের কথা না।

—'তবে কি ? ভয়-টয়ের কিছু ব্যাপার ?'

—'না, তা হবে কেন ? সারা সকাল তো ঘুরেছি, কোথাও তো ভয়-টয়ের চিহ্ন মেলেনি। মিছামিছি····মিছামিছি কেন তরাসের কথা তুলতে যাবো !!'

বাউলের দ্বিধাজড়িত কথায় বিকাশ যেন আরও স্পষ্টবাদী হয়ে ওঠে,—'ওঃ, বুঝেছি ! তুমি ভয় পেয়েছো। তা বেশ, তুমি থাকো, আমরা যাই।·····চললাম আমরা।'

—'না, না বাবু ! তা হয় না। চলো, চলো, আমিও যাচ্ছি।

★ ★ ★

চারজনেই বনে উঠেছে। মতলব আর কিছু নয়, সুন্দরবনের গভীরে 'গাছাল শিকার'। গাছের উপর বসে হরিণ শিকার। কিন্তু হরিণ আসবে কেন ? লোভের ফাঁদে পা দেয়। কেওড়া পাতার লোভ যে ওদের বড্ড বেশি। গাছে বসে বাঁদরের মতো ডাকতে হবে আর কচি ডাল ভেঙে-ভেঙে ফেলতে হবে। সুন্দরবনের নিরীহ জীব বিশ্বাসীর মতো এগিয়ে আসে। একবারও তাকিয়ে দেখে না—মানুষ না বাঁদর। ওপরের দিকে ওদের যে দৃষ্টি যায় না।

গাছে বসে কি কি করতে হবে, কতোটা উঁচুতে বসতে হবে, হরিণ কি ওদের দেখে ফেলবে না—এ-সব চিন্তার ঝাঁক যে আসছে না, তা নয়। সে-সব ভাববার জন্য তো বাউলেই আছে। এমনি ধরনের এক নির্ভরতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সবাই এখন একমনে বাউলেকে অনুসরণ করতেই স্ত। এ-ছাড়া আর যা চিন্তা ছিলো, তা নিয়ে অবশ্য সাবধানতার অন্ত নেই—বন্দুক দুটি যেন ঠিক থাকে। পা পিছলে বা হোঁচটের ঝাঁকুনিতে বন্দুক যেন মাটিতে না পড়ে।

বাউলে আগে-ভাগে চলেছে। সর্বদিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বারবারই তাকায় এদিক-ওদিক নরম মাটির দিকে। বেশ ধীরে ধীরে চলেছে, পাছে ওদের 'কোল-ছাড়া' করে ফেলে। লাইন পড়ে গেছে। বাউলের পেছনে বিকাশ বন্দুক হাতে। আরও দশ-বারো হাত পেছনে সুখেন্দু, তারও হাতে বন্দুক। সবার পেছনে আনন্দ।

বিকাশ বিচলিত না হলেও সন্দিগ্ধ হয়েছে—বাউলে অমন করে বারবার মাটিতে নজর দেয় কেন ? হরিণের খোঁচ ? তা তো সকালবেলা অজস্র দেখে গেছি। বাসি না সদ্য পদচিহ্ন ? তাই হয়তো পরখ করছে····না, আর কিছু !!

সেই খাদটা সামনেই। বাউলে টপ্‌কে পার হয়ে গেছে। ওদেরও পার হতে হবে। পার হলেই সেই কেওড়া গাছটা চোখে পড়বে। খানিকটা স্বস্তির ভাব।

খাদ পার হবার জন্য বিকাশ বন্দুকের কুঁদো বগলে একটু জোরে চেপে ধরলো। সুখেন্দু তাই দেখে অতি সাবধানীর মতো বন্দুকটি কাঁধের উপর নিয়েছে—খাদটি পার হতে যে একটু লাফ দিতে হবে।····পার আর হতে হয় না ! অকস্মাৎ বজ্রাঘাত !

হিংস্র গর্জনে অতিকায় নরখাদক ঝাঁপিয়ে পড়েছে সুখেন্দুর উপর। সুন্দরবনের নিরীহতম

জীবকে ফাঁদে ফেলবার মতলবে আগত মানুষকে সেই বনের হিংস্রতমের ফাঁদে পড়তে হলো !

সুখেন্দু ধরাশায়ী,জিঘাংসায় শিহরিত দুই বলিষ্ঠ কম্পিত বাহু তার দু'পাশে। স্তম্ভিত হলেও সম্বিত হারায়নি সুখেন্দু। বাঘ সুখেন্দু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত, সে তো তার বুকের তলে। তার চিন্তা—অন্যেরা তাকে আক্রমণ না করে বসে। সেদিকেই তার সজাগ ও খরতর দৃষ্টি। তাদেরই ভীতগ্রস্ত করার জন্য ব্যাঘ্রের ভীষণতম গোঙানি ও বিকৃত মুখভঙ্গী। দু'বাহুর উপর ভর করে তির্যকভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে বিস্ফারিত দন্তের আস্ফালনে সে গর্জাতে থাকে—'খবরদার ! এগিয়েছো তো শেষ করবো !'

বাউলের স্তম্ভিত হবার অবকাশ নেই। সে-ও বিকটতম চিৎকার করে ওঠে। মূর্ত প্রতিহিংসায় সে-ও মত্ত। বিকাশের পাশে ঝটিতে ছুটে এলো। মুখে অশ্লীল গালি।

দানবের আস্ফালন ও আক্রোশে হতচকিত বিকাশ বাউলকে নিকটে পেয়ে যেন ধাক্কা সামলে উঠলো। বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছে। কিন্তু কোথায় গুলি করবে শত্রুর বুকের নিচে যে সুখেন্দু !

তবুও গুলি করে দেয় বিকাশ। দোনালায় পরপর দুটি গুলি। শঙ্কান্বিত মনে কম্পিত হাতের নিরিখ লক্ষ্যভ্রষ্ট। তা হোক। গুলির আওয়াজে সুখেন্দু বেপরোয়া, শায়িত অবস্থায় শায়িত বন্দুকের ঘোড়া সে-ও টিপে দিলো। দুর্দান্ত আওয়াজে নির্গত হয়ে গুলি কোথায় গেলো তার হদিশ নেই। মৃত্যুর মুখে লড়বার নেশাই বুঝি সুখেন্দুর তাকদ জুটিয়েছে।

ব্যাঘ্রের আস্ফালন তবু থামে না। বীরবিক্রমে একই ভঙ্গিতে বসেছিলো। মুহূর্তের ব্যবধান মাত্র। ডান দিকে কি যেন নড়ে ওঠে।

আনন্দের নিঃসহায় অবস্থা। দলচ্যুত সে। প্রাণভয়ে ডানদিকের খালে ছুটে চলেছে। খালের জলে পড়তে পারলে হয়তো প্রাণে বাঁচবে। দৌড়ে চর অবধি এসেছে। হিংস্র জীবের হিংস্রতা পরিমাপ করা দায়। মারণ অস্ত্রের পরপর আওয়াজে ক্ষুন্নিবৃত্তির কথা ভুলে জিঘাংসায় মত্ত হয়ে উঠেছে বুঝি। সব কিছু ফেলে বাঘ ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র ও পলাতক আনন্দের উপর। এক থাবার আঘাতে ঘাড়ের মাংস উপড়ে ফেলে যেমন বিদ্যুৎগতিতে এসেছিলো তেমনি বিদ্যুৎগতিতে উধাও। শেষ গর্জনের প্রতিধ্বনি মেলাতে না মেলাতে কোথায় উধাও হলো, তার কোনোও চিহ্ন রইলো না। আনন্দ রক্তাপ্লুত হয়ে চরের কাদায় লুণ্ঠিত।

.... বন এবার আগের মতই শান্ত ও ফাঁকা। মনে হয়, সেতারের মতো সামান্য ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে বুঝি। কিন্তু বাউলকে তো শান্ত হবার উপায় নেই। বিক্ষুব্ধ সুরে বলে উঠলো,—'সর্বনাশ করে গেলি !!'—বলেই বিকাশ ও সুখেন্দুকে নিয়ে চরের ওপর দ্রুত পায়ে এলো। আনন্দকে তিনজনে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে ডিঙির পাটাতনে শুইয়ে দিলো। আনন্দ জ্ঞানহারা হলেও তখনও প্রাণে বেঁচে আছে।

*   *   *

দ্রুত লঞ্চে ওরা চারজনেই কলকাতা এসেছে। বড় হাসপাতালে এনে সা
আনন্দকে বাঁচাবার বৃথাই প্রয়াস।

হাসপাতালের প্রাঙ্গণে সবে প্রভাতের রোদ এসে পড়েছে। শায়িত শবদেহ সামনেই সযত্নে আবৃত। ওদের হাতের বন্দুকের নলে বুঝি তখনও বারুদের গন্ধ লেগে আছে ; আর ওদের দেহে ও পোশাকে সুন্দরবনের নোনা মাটি এতক্ষণে শুকিয়ে সাদাটে হয়ে উঠেছে।

সবার সঙ্গে বাউলে পাশেই আনমনা হয়ে বসে আছে। শবের ধারে বন্দুকধারী যুবকদের দেখে মানুষের আনাগোনার অন্ত নেই।

আবৃত্ত আনন্দের দেহে কয়েকটি মাছি এসে বসতেই বাউলের আনমনা দৃষ্টি এবার অপলক হয়ে ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে। চোখে লোনা জলের ধারা নিয়ে আচমকা বিকাশকে বলে,—'বাবু! বাবু ঠিকই!....নৌকোতে বাঘের মাছিকে ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।'

—'কি বললে!! তবে বলোনি কেন? কেন তখন বলোনি?'

—'বাবু, বাউলে আমি ঠিকই.... ফকির হতে পারিনি!!.....তাই!'

দুগ্যো-সদ্দার

'সদ্দার! বনটা যেন বড্ড 'গরম' লাগছে!'

—'রাখো তোমার 'গরম'!! কাটবো তো ঝরার পাশের গোলপাতা। চিলতেপানা গোল ঝাড়, তা ছাড়া লাও কোলের কাছেই। অতো নরম-গরমের হিসেব কিসে!!'

সদ্দারের চোটপাট কথায় লজ্জা পেয়ে হোক বা বনের মাঝে বাক্-বিতণ্ডার অনিচ্ছায় হোক সবাই কাজে মন দেয়।

গল্প আর প্রত্যক্ষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দরবনের বনচারীরা বনের গভীরে এলেই তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে ওঠে। চারিদিকে জীবনের সহজ স্পন্দন পেলেই ওদের মনও সায় দেয়,—না, তেমন কিছু অঘটন ঘটবার আশঙ্কা নেই। বনে পাতার ছাতার নিচে ঝিরঝিরে বাতাসে বিচ্ছিন্ন পাতা ও ডগা একটু-আধটু দুলবে। হরিণের কিছু না কিছু সাড়া পাওয়া যাবে দূর থেকে। নতুন নতুন দু-একটা পাখির ডাকও শোনা যাবে। এক-আধটা সাপও দেখা যাবে এখানে-ওখানে। এক-আধটা গো-সাপও ওঠা-নামা করবে ছোটো খালে ও ঝরায়। আব সর্বোপরি বানরের লাফালাফি ও কিচির-মিচির তো শান্ত বনের মূর্ত প্রতীক বলা যেতে পারে। এমনি ধারা সুন্দরবনের সহজ আবহাওয়া ব্যাহত হলেই বনচারী আবাদী মানুষের মন সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। অনুভূতি আসে—বন গরম। কেন না, সুন্দরবনের রাজার একবার আগমন হলে বনের সে-অঞ্চলে যেন সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যায়। নিঃশব্দ পদচারণে চুপিসারে এলেও তার আগমন বার্তা যেন কানে কানে পৌঁছে যায় সমস্ত জীব, পাখি ও গাছ-গাছড়ার কাছে। তা না হলে এমন হবে কেন!

তবু দুর্গা সর্দার কিছুই তোয়াক্কা করতে চায় না। দীর্ঘকায় সবল দেহ। নাম দুর্গা সর্দার; পেলব পলিমাটির মানুষ অমন দুর্দান্ত নামকে সহজ করে নিয়ে ডাকে 'দুগ্যো সদ্দার'। কৃষ্ণ বর্ণের মাংসপিণ্ডগুলি যেন ফুলে ফুলে উঠেছে তার দেহে। দেখলেই মনে হবে অসীম শক্তিধর। অমন বিশাল এবং ডাগড়া দেহের মানুষেরা সাধারণত স্থবির হয়। কিন্তু সদ্দার তার বিপরীত। কেমন করে সে অতো চট্‌পটে হয়েছে, তা ভাবাই দায়।

তা হলেও সে কিন্তু দলের নেতা নয়। দলের নেতা কালিপদ। দল বলতে তিনজন। তৃতীয় জন সবের আলি। এমনি ধরনের ছোট ছোট পঁচিশ ত্রিশটি দল এক-একটি বড় ডিঙি নিয়ে একত্রে বহর বানিয়ে এসেছে সুন্দরবনের পশ্চিমাঞ্চলে হরিভূষণ বনে। সবাই এসেছে গোল-পাতা কাটতে। বনের কোনো কোনো নিচু ও নরম 'চাতারে', কখনও বা ঝরার পাড় ঘেঁষে গোলগাছের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। কোনো কাণ্ড নেই বললেই চলে; সোজা মাটি থেকে ঝাঁক বেঁধে নারকোল গাছের মতো সুদীর্ঘ পাতা ঊর্ধ্বে উঠে চারদিকে নুইয়ে মাথা নিচু

করে দেয় খানিকটা ফোটা ফুলের পাপড়ির মতো। নারকোল গাছের পাতার মতো দেখতে হলেও গোল-পাতা কিন্তু তেমন কর্‌করে নয়। পাতা, কাঠি ও ডগাও খুবই নরম, পেলব ও মসৃণ। অমন কমনীয় হলে কি হবে, অত্যন্ত তেজী—আর কোনও গাছ ও গাছড়াকে ওর চাতারের ত্রিসীমানায় হতে দেবে না কিছুতেই। একটানা বিস্তীর্ণ গোল-ঝাড়ে ঘন সন্নিবিষ্ট সবুজের ওপর ঈষৎ লালাভ বিনম্র পাতাগুলি ঝিরঝিরে হাওয়ায় যখন দুলতে থাকে, তখন সুন্দরবনের সৌন্দর্য যেন ফেটে পড়ে।

সৌন্দর্য ফেটে পড়ে বটে, কিন্তু গোল-ঝাড় সুন্দরবনের অন্যতম বিভীষিকা। শিকারের জন্য নরখাদক গোল-ঝাড়ের আড়ালে ওত পাততে আসে না। আসে নিশ্চিন্তে বিশ্রামের জন্য। মাটি স্পর্শ না করে নরম ডগাগুলি চেপে তার ওপর শুতে ওরা ভালই বাসে। তার চেয়েও বড় কথা, এই ধরনের ঝাড়ে কারও পক্ষে বিনা শব্দে অনুপ্রবেশ করা দায়। ঝাড়ের গভীরে নিশ্চিন্তে যখন নরখাদক ঘুমোয় তখন দক্ষ শিকারীর পক্ষেও নিঃসাড়ে এগিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করা দুরূহ। দুরূহতর করার জন্যই বোধহয় নরখাদক বিশ্রামের আশায় বিস্তৃত গোল-ঝাড়ই বেছে নেয়। এই কথা জানা ছিলো বলেই দুগ্যো সদ্দার চিলতে-পানা ঝাড় দেখে অমন বেপরোয়া কথাবার্তা বলছিলো।

ভোর সকাল থেকেই তিনজনে কাজে লেগেছে। হু হু করে পাতা কেটে চলেছে। ভারি পুরুষ্টু ঝাড়। ভালো দাম পাবার আনন্দে ওরা মাতোয়ারা। এতো লম্বা যে একটা করে পাতার চাপান দিলে বুঝি চাষী-বাড়ির কুঁড়েঘরের ঘর ও বারান্দার ছাউনি একই সঙ্গে হয়ে যাবে।

গোলপাতা আহরণে জনের হিসেবে কমপক্ষে তিনজন লাগে। একজনে উবু হয়ে এক একটা পাতার ডগা ধরে মাটির কাছাকাছি কোপ মেরে কাটতে থাকে। তার হাত থেকে প্রায় লুফে নিয়ে দ্বিতীয়জন সঙ্গে সঙ্গে দা-এর সূতীক্ষ্ণ মাথাটা আলগোছে ডগার মাঝে বসিয়ে একটানে গোটা ডগাটা দ্বিখণ্ডিত করে চিরে ফেলে। দ্বিখণ্ডিত হতে না হতে তৃতীয়জন পাশাপাশি দুটি প্যাইলে দুটি খণ্ডকে সাজাতে থাকে।

তালে তালে যেন কাজ এগিয়ে চলেছে। তিনজনের হাতে তিনখানি পাতা-কাটা দা—মাথা বাঁকা ক্ষুরধার কাটারি। এমন ধার যে গোলের ডগা ছুঁতে না ছুঁতেই দ্বিখণ্ড হয়ে যায়। এই মাথা-ভারি সূতীক্ষ্ণ অস্ত্র যখন হাতের মুঠোয় আঠার মতো লেগে থাকে তখন বনচারীদের মনে হয়, এ যেন কোনো অস্ত্র নয়, তাদের অঙ্গেরই অঙ্গ বুঝি। দুগ্যো সদ্দারের তো কথাই নেই ; তার দীর্ঘায়িত আঙুলের বজ্র বেষ্টনীতে পিষ্ট ওই অস্ত্রের হাতলে তার দেহের সর্বশক্তি চালনা করতে এতটুকুও আয়াস করতে হয় না। বন্দুক মনের জোর বাড়ায় বটে, কিন্তু তার অনেক হুজ্জত—তাকে কাঁধে তুলতে হবে, তার ঘোড়া চাপতে হবে, নিরিখ করতে হবে, ট্রিগার টিপতে হবে—তবেই তার মারণ অস্ত্র নির্গত হবে। কিন্তু গোলপাতা কাটবার দা যখন হাতের মুঠোয় জমে থাকে, তখন মানুষের হাত যেমন আত্মরক্ষায় সহসা উদ্যত হয়, তেমনি এই অস্ত্র হানবার জন্য অস্ত্রধারীর কোনো চিন্তা-ভাবনার আবশ্যক হয় না।

দুগ্যো সদ্দার পাতা-কাটার কাজে দ্বিতীয়জনের দায়িত্ব পালন করছে। বিরাট দেহখানা প্রায় সোজা রেখেই দাঁড়িয়ে পাতার ডগা বিদীর্ণ করে চলেছে তড়িৎ গতিতে ও একমনে। প্রথমজনের কাজের দায়িত্বে নেতা কালিপদ উবু হয়ে ঝাড়ের মধ্যে প্রায় ডুবে গিয়ে পাতা কাটছে। দলের নেতারাই এই কাজের দায়িত্ব নেয়। এদেরই সবচেয়ে বিপদ। পেছনটা থাকে উঁচু হয়ে আর মাথা থাকে ঝোপের মধ্যে নামানো। এমন সুযোগ ছাড়বে কেন নরখাদক। ঝাঁপিয়ে পড়ে কোমরে দাঁত বসিয়ে সোজা মুখে তুলে একটানে নিয়ে চলে যায়।

তৃতীয়জনের দায়িত্ব সবের আলির—একটু দূরে সে খণ্ডিত পাতাগুলি পাইল করছে। ঠিকমতো থাকে থাকে রাখবার জন্য ডগাগুলি উঁচু নিচু করে নাড়াচাড়া করতেই হচ্ছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, সে তার চারপাশে যেন অনবরত লাঠি ঘোরাচ্ছে।

যতই না একমনে কাজ করুক, শঙ্কা যে ওদের মনে ছিলো না তা নয়। কিন্তু তা নিবদ্ধ ছিলো গোল-ঝাড়কে নিয়ে। ফাঁকেফুকে ওরা সেদিকেই নজর রাখে। দ্যাখে, দূরে ঝাড়ের কোনো পাতা অস্বাভাবিক ভাবে কেঁপে ওঠে কি না।

ঝাড় আজ ওদের বিপদ আনে না। দুগ্যো সদ্দারের পেছনে ছিলো একটু ফাঁকা 'চাতার'। সেই পথেই এলো বিপদ।

এলো দানবীয় হুঙ্কারে। নরখাদক উদ্যত থাবা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সদ্দারের কাঁধ লক্ষ্য করে। দুর্দান্ত শক্তিধর থাবার আঘাতে আর তীক্ষ্ণ নখের দংশনে ধরাশায়ী করতে চায় তার শিকারকে।

সচকিত হয়ে দুগ্যো সদ্দারের ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার অবকাশ হয় না। তার চোখের কোণে এক ঝলকে প্রতিবিম্বিত হয় শুধু বিস্ফারিত থাবার শ্বেতাভ বক্র নখগুলি আর রক্তাভ গহ্বরের সামনে হিংস্রতায় উজ্জ্বল দুটি বিশাল দাঁত। উড়ন্ত নরখাদকের আর কোনও কিছুই সদ্দারের চোখে প্রতিবিম্বিত হয় না—না তার আক্রোশে উদ্বেলিত স্ফীতকায় দেহ, না তার উগ্রতায় অগ্নিসম চোখ, বা তার ঊর্ধ্বমুখী কম্পিত লেজ।

দুগ্যো সদ্দার আর দুগ্যো সদ্দার নেই,—নেহাতই হিংস্রতম জীবের লব্ধ শিকার। মৃত্যুর মুখ-গহ্বর থেকে বাঁচবার তাগিদেই মাথাটা ডান পাশে হেলিয়ে বাঁ হাতের কনুই উঁচু করেছে। গোলপাতা ধরে রাখতে হাতখানা ভাঁজ করা ছিলো। ভাঁজ খুলে সটান হাতে শত্রুর রোখ্‌কে রুখবার অবকাশ হয়নি। বিপদকে আড়াল দিতে ভাঁজ করা কনুই উঁচু হয়েছে যেন আপনা থেকেই।

নরখাদকের থাবা পড়ছে বাঁ হাতের বাহুর ওপর। দৃঢ় মাংসপেশিগুলিতে যেন অতি সহজে বসে গেলো থাবার বিস্ফারিত নখগুলি। তবু দাঁড়িয়েই ছিলো শক্তিমান দুগ্যো সদ্দার, বাঘকেও তেমনি দাঁড়িয়ে [illegible]ড়তে হয়েছে দু-পায়ের ভরে।

ঝাঁপিয়ে পড়ার বেগ স্তব্ধ হতেই নরখাদক তার বিস্ফারিত মুখ-ব্যাদানকে আরও বিস্ফারিত করে সদ্দারের মাথাটাকে এক-কামড়ে ধরবার জন্য গলা বাড়িয়েছে।

দুগ্যো সদ্দার বুঝি আবার দুগ্যো সদ্দার হয়ে ওঠে! ডান হাতের মুঠোতে ছিলো পাতা-কাটা দা। অমন কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাতে সজোরে দা-এর আঘাত হানা দুরূহ ছিলো, মুহূর্তের অবকাশও বোধহয় তার জন্য ছিলো না। আগুয়ান করাল মুখ-গহ্বরে সোজা দা-খানা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আত্মরক্ষার সর্বশক্তি জড়ো করে সজোরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। লব্ধ শিকারের হাতখানাকে মুখের মধ্যে পেয়েছে ভেবে নরখাদক করকর করে কামড়ে গুড়িয়ে দিতে চায়! সঙ্গে সঙ্গে দুগ্যো সদ্দার প্রাণপণে দা-খানাকে মোচড় দিয়ে 'ঘুলিয়ে' দেয়। ক্ষত-বিক্ষত মুখ-গহ্বর। দিশেহারা হয়ে বাঘ আরও সজোরে কামড়ে ধরে; সদ্দারও তার শেষ অস্ত্র হাত-ছাড়া হবার ভয়ে প্রাণপণে হাতের মুঠোয় হাতল চেপে ধরেছে। যন্ত্রণা নিশ্চয় এবার অসহ্য। রক্তধারাও গাল বেয়ে ঝরতে আরম্ভ করেছে। বিদ্ধ নখাগ্রে সদ্দারের বাহুর মাংস ছিঁড়ে নিয়ে যন্ত্রণা-কাতর নরখাদক মাটিতে নেমে পড়লো আর সেই সঙ্গে বুঝি গোলপাতার ডগার চেয়েও নরম মাংসে বিদ্ধ দা-এর অগ্রভাগ গোটা জিঘাংসু জিহ্বা চিরে বেরিয়ে এলো।

মাটিতে থাবা নামিয়েই নরখাদক মুখ নিচু করে মাটিতে প্রায় ঘষতে-ঘষতেই ছুটে গেলো

অনেকখানি। এমনভাবে সুন্দরবনের হিংস্রতম জীবকে সরে পড়তে কেউই কখনও দেখেনি। তবু টানা ছুটে পালায় না। কিছু দূর এগিয়ে দুগ্যো সদ্দারের দিকে তাকায় আর বারবার থাবাখানা মুখের ধারে এনেও স্পর্শ করতে যেন সাহস পায় না। সে-ও বুঝি কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

দলের অন্য দু'জন হকচকিয়ে এতক্ষণ জায়গায় দাঁড়িয়ে দা-এর আস্ফালন করে প্রাণপণে চিৎকার করছিলো। চিৎকারে আশপাশের অন্যান্য দলগুলি একত্রে হৈ-চৈ করে ছুটে এসেছে। দুগ্যো সদ্দার রোখের মাথায় রক্তাক্ত দাখানি উদ্যত করে তখনও দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ-হাতের নখ-দংশন থেকে তারও গা বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

বাঘ দূরে বসে হুঙ্কার দেবার চেষ্টা করছিলো কি না বোঝা যায় না। বিদীর্ণ জিহ্বায় সে-ক্ষমতা বোধহয় লুপ্ত। ছিন্নমস্তার মতো নিজের রক্ত নিজেই পান করতে করতে অবশেষে ছুটে পালালো।

*   *   *

দুগ্যো সদ্দার আজও এই অভিজ্ঞতার কথা গল্প করে রাঙিয়ে রসিয়ে। কিন্তু প্রতিবারই গল্পের শেষে তার পাটাতনের মতো বুকে হাত বোলাতে বোলাতে ভক্তের মতো বলে,—জানো। শেষমেশ বাঘ অমন জব্দ হলো কেন ? মা বনবিবি ওকে নিশ্চয় সেদিন ও-তল্লাট ছেড়ে যেতে বলেছিলেন। মা-র কথা মানেনি, অমান্য করেছে। তাইতে তো অমন হলো!

ভক্তের মতো দুগ্যো সদ্দার অমন কথা বলে বটে, কিন্তু তার বনে যাবার বিরাম নেই। কতো কাজে আর কতোবার যে সে তারপর বনে উঠেছে, তার ইয়ত্তা নেই—কখনো মাছ ধরতে, কখনো বা গোলপাতা কাটতে, কখনো বা মধু কাটতে। আর প্রতিবারই সে তার সযত্নে রক্ষিত সেই দা-খানা সঙ্গে নিতে ভুল করে না, কখনও না!

'বাঘের দেখা'

বাঘের সঙ্গে দেখা হবার কাহিনী ও গল্পের অন্ত নেই। এই সব গল্পে হয় মানুষ অনেক তোড়জোড় করে, অনেক ফন্দি-ফিকির এঁটে শিকার করতে বেরিয়েছে বাঘকে ; না হয়, বাঘ সুচতুর বুদ্ধি খাটিয়ে সহসা আচমকা আক্রমণে মানুষকে শিকার করতে মত্ত।

কিন্তু সুন্দরবনে আরেক ধরনের 'বাঘের দেখা' আছে। অন্য কোন বনে-জঙ্গলে তেমন 'বাঘের দেখা'-র কাহিনী আছে বলে আজও শুনিনি বা পড়িনি।

সুন্দরবনে এক ধরনের মানুষ আছে, তাদের বলে—বনওয়ালি বা বাওয়ালি বা সহজ ভাষায় বাউলে। এই সব বাউলেরা আবার ফকিরও বটে। এদের ফকিরদের মতো শুদ্ধ ও সৎ জীবন যাপন করার আদেশ মানতে হয়। মানুষের প্রতি ভালবাসাও এদের অপরিসীম। সুন্দরবনে তো বিপদ ও আপদের অন্ত নেই। প্রতি বিপদ ও আপদে এরা তেজ ও বীর্য নিয়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়ায় বলেই তো এরা বাউলে বা ফকির।

মঙ্গলা মোড়ল সুন্দরবনের তেমনি এক বাউলে। সেবার সে সুন্দরবনের ৭২ নং লাটের ঘেরে কাঠ কাটার এক দলের গার্জেন হয়ে গেছে। বাউলেরা সত্যি সত্যি গার্জেন। প্রথম গার্জেনগিরি করতে হয় পথ-প্রদর্শক হিসেবে। পথ মানে জলপথ। অসংখ্য নদ ও নদী। শহরের ছোট-বড় পথ, অলি-গলি, লেন-বাইলেনের মতো সুন্দরবনে চারিদিকে বড়ো নদী,

ছোটো নদী, খাল, খাড়ি ও শিষে ছড়িয়ে গেছে। যেন জলপথের গোলকধাঁধা। বাউলেদের কিন্তু নদী ও খালের এই গোলকধাঁধা নখদর্পণে।

পথের বিপদের পর আছে বাঘের বিপদ। বাউলেরা বনবিবির উপাসক। ওদের কাছে বনবিবি বনের দেবী। আর সে দেবীর বাহন হচ্ছে—বাঘ। কাজেই এই বাহনের হাত থেকে কাঠুরিয়াদের রক্ষা করে বনবিবির সাধকেরা। মন্ত্র আউড়ে বাউলেরা কাঠ কাটার ঘেরকে আগুন করে দিতে পারে বলে দাবি করে; সে আগুনে নাকি বাঘেরা আর এগিয়ে আসতে পারে না। আবার মন্ত্রের জোরে যেখানকার বাঘ সেখানেই আটক করে বন্দী করে দিতে পারে; এতটুকুও তার নড়বার ক্ষমতা থাকে না নাকি। তেমনি মন্ত্রের দাপটে বাঘের চোয়ালে খিল লাগিয়ে দেয়; সে খিল খুলে বাঘকে নাকি আর হাঁ করতে হয় না। অবিশ্বাসীদের এসব মন্ত্রে বিশ্বাস না হলে কি হবে, বনের উপকূলবাসীরা আজও পূর্ণ আস্থা রাখে এই সব মন্ত্রে।

মঙ্গলা বাউলের মুখ থেকে এই সব মন্ত্রের পদ শুনেছি। শুনিয়েছে একটা শর্তে—লিখে নিতে পারবো না। ঝড়ের বেগে বলে গেছে মন্ত্রের পদ। বাঙলা ভাষায় পদগুলি। যেটুকু বুঝেছি তাতে বলা যায়, কিছু হিন্দু দেব-দেবী, কিছু মুসলমান পীর-পয়গম্বর, আর কিছু লোক-সাহিত্যের মানুষ যেমন চাঁদ সওদাগর, লক্ষ্মীন্দির বা দক্ষিণা রায়—এদের সবার নামে শপথ ও কিরে মাত্র।

বাঘের হাত থেকে বাঁচতে হলে শুধু বাউলেদের মন্ত্র নয়, কাঠুরিয়াদেরও কিছু নিয়ম পালন করার আদেশ থাকে। এতো মন্ত্র সত্ত্বেও 'ঘের' থেকে হামেশাই বাঘে মানুষ নিচ্ছে। তাতে কিন্তু মন্ত্রে এদের বিশ্বাস এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় না। কাঠুরিয়াদের সবাই তখন দোষে—বলে, ওরাই ঠিকমত নিয়ম পালন করেনি; তাতেই তো সকলের এমন বিপদে পড়তে হলো।

দুর্গম অরণ্যে যে ভয়ঙ্কর বিপদের তুলনা নেই, তার সম্মুখেও বাউলেরা রুখে দাঁড়ায়। মন্ত্রে যাদের ভক্তি, তারা অবাক হয়ে ভাবে, মন্ত্রশক্তি ছাড়া এ কেমন করে সম্ভব?

সম্ভব-অসম্ভব জানি না। তবে অমন ভাবে রুখে দাঁড়াবার সময় বাউলেদের সঙ্গে থাকলে দেখা যাবে, এই ভয়াল মুহূর্তে বাউলেরা কিন্তু মন্ত্রের কোনও ধার ধারে না। বাঘের আচার ও বাঘের চরিত্র এদের নখদর্পণে। তারই জোরে এবং বুকের পাটার সাহস নিয়ে এরা অমন অসাধ্য সাধন করে।

মঙ্গলা পাটনি তেমনি এক বেপরোয়া বাউলে। ৭২ নং লাটে নিজের দলকে তুক্‌তাক করে আগল দিয়ে রাখছে। কাঠও বেশ কাটা হয়ে গেছে। যা কাটা হয়েছে তাতে ওদের চিতনাই নৌকোগুলি বোঝাই হয়ে যাবার কথা। এইবার তাড়াতাড়ি ডালপালা ছাঁটাই করে ও খণ্ড খণ্ড করে হাতে-হাতে নৌকোয় এনে ফেলতে পারলেই এই খেপের মতো কাজ হয়ে যায়।

ঘড়ির কাঁটার মতো ওদের কাজ এগিয়ে চলেছে। বিপদের কোনও চিহ্ন নেই। তবু বিনামেঘেও তো বজ্রপাত সুন্দরবনে ঘটে। তাই বাউলেরও বিশ্রাম নেই। ঘুরছে, ফিরছে। একবার এদিক, একবার ওদিক। তীক্ষ্ণ নজর কিন্তু বনের গভীরে। কখনও হাসি-মস্‌করা করে, কখনও বা সাহস দেয়। বলে—খবরদার! বিপদ হলে ভয়ে নেড়ি-কুত্তার মতো নোড়াবি না; ছুটে পালাতে যাও তো রক্ষা নেই।

এমন সময়ে হঠাৎ ভয়ার্ত চিৎকার। একসঙ্গে অনেকের আর্তনাদ মঙ্গলা বাউলের দলের লোকেরা নয়। দূরের ঐ সঙ্কেতের দিকে কান রেখে বাউলে চেঁচিয়ে ওঠে,—শুয়

নেই। তোরা নোড়াবি না কেউ।

কেউই দৌড়ায়নি, ছুটেও পালায়নি। কিন্তু যে যার কাজ ফেলে আস্তে আস্তে জড়ো হয়েছে। বাউলে কিছুক্ষণ সঙ্কেতের পানে কান পেতে হঠাৎ দৃঢ় হুকুম দিলো,—যা, সকলে তোদের লাও-তে যা। আমার এখন যেতে হবে। কোনও ভয় নেই তোদের। দূরে মাঝ-নদীতে নোঙর ফেলে লাও রাখবি কিন্তু।

দলের এক মাতব্বর রেগে উঠেছে। রাগের মাথায় বললো,—বাঃ বেশ। আমরা আনলাম তোমাকে খরচ গায়ে মেখে, আর তুমি কি না চললে কাদের কি বিপদ ঠেকাতে! বেশ, বাউলে!

মঙ্গলা বাউলে রাগের বদলে রাগ দেখায় না। আগের মতই দৃঢ়ভাবে বলে,—তা হয় না। বাদায় বিপদের কথা কানে এলেই বাউলেদের যেতেই হবে। বনবিবির গোঁসা ঠেকাবো, না তোমাদের গোঁসা ঠেকাবো! তা হয় না।

তাড়াতাড়ি সবাইকে নৌকোয় তুলে দিয়ে নিজে ছোট্ট এক ডিঙি নিয়ে তীর বেগে চললো আর্ত মানুষের চিৎকার লক্ষ্য করে। কিছুদূর এসে দেখে, জনা কুড়ি লোক এক নৌকোর উপর লাঠি-সোটা নিয়ে হৈ-হল্লা করছে। কেউ-কেউ বা কাঁদাকাটি করছে।

তাদের কাছে সব শুনে বাউলে বললো,—তোরা কি চাস্ এখোন? লাস নিয়ে যাবি তো? তবে চল্, এনে দিতে পারি····কিন্তু দু-তিনজনকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

তিনজন সঙ্গী নিয়ে বাউলে বনে উঠলো। ভাল করে বুঝিয়ে দিলো ওদের কি কি করতে হবে। মোট কথা, বাউলে যখন যা করবে তাই শুধু নকল করে যাবে ওরা। আর হাজার বিপদ আসুক দৌড়ে পালাতে বা গাছে উঠতে যাবে না। যে পালাতে চেষ্টা করবে তার মৃত্যু অনিবার্য।

প্রথমে বাউলে সঙ্গীদের কাছাকাছি নিয়ে এগিয়ে চললো খুবই চুপি-চুপি। বাঘের থাবার খোঁচ দেখে-দেখে নিঃশব্দে ও নিঃসাড়ে। বাঘের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে, কিন্তু বাউলেকেই আগে বাঘকে দেখতে হবে। বাঘ যদি আগে বাউলেকে দেখে বসে, তা হলে আর তাকে পাওয়া যাবে না। তক্ষুনি সে গা-ঢাকা দেবে। শুধু গা-ঢাকা দেবে না, লুকিয়ে ঘুরে এসে যে কোনও দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণে ওর পেছনে লাগবার শোধ তুলবে। তাই বাঘ ওকে দেখবার আগে বাউলেকেই প্রথম বাঘকে দেখতে হবে।

ধীরে অতি ধীরে গাছের বা ঝোপের আড়ালে নুইয়ে নুইয়ে এগুতে একটু দেরি হচ্ছে। তা হোক। বাউলে চায় একটু দেরিই করতে। ক্ষুধার্ত বাঘেব রাগ ও রোখ্ সহসা দমানো কঠিন। পেটে কিছুটা পড়লে রাগের ও রোষের তীব্রতাও কিছুটা কম থাকে।

মঙ্গলা বাউলে এগিয়ে চলেছে, চার-পাঁচ হাত পেছনে সঙ্গীরা। কিসের ইঙ্গিতে যেন হঠাৎ মাজা টান্‌টান্ করে বাউলে দাঁড়িয়ে গেছে। দু-পা আগে-পিছু করে খুঁটি নিয়েই বুক ফুলিয়ে চিৎকার করে ওঠে। ভীষণ চিৎকার। তুই-তোকারি বীভৎস গালাগালি। সঙ্গীরাও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে সমানে। কিসের ইঙ্গিত কীভাবে পেলো তা বলা শক্ত। হয়তো সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে ফেলেছে সামনের ঝোপেই বাঘ আছেই আছে।

সাড়া পেতেই নরখাদকও খাড়া হয়ে গলা বাড়িয়ে চাপা গোঁ গোঁ করে উঠলো। দু তরফেই চোখাচোখি। হঠাৎ দেখে হঠাৎ আক্রমণ বাঘ কখনও করে না। এইবার পরস্পরে বোঝাবুঝি।

বাঘকে বুঝ দিতে হবে, ভয় পায়নি। নরখাদকের রোষকষায়িত চক্ষুর সামনে সমতালে তীব্র রাগ ও কটাক্ষ নিয়ে তাকিয়ে থাকতে হবে সমানে। তাকিয়ে আছেও মঙ্গলা মোড়ল।

চাহনির প্রোব্লেমের অবকাশ নেই। এদিক-ওদিক দৃষ্টি দিলেই নরখাদক বুঝে নেবে অন্য কথা। চোখের রাগানিও যথেষ্ট নয়, রাগান্বিত বাঘের মতো গজরাতে হবে, গালাগালি দিতে হবে। সে চোখে যদি বিন্দুমাত্র ভীতি থাকে—বাঘের তা বুঝতে এতোটুকু দেরি হয় না।

কিন্তু আস্ফালন শুধু চোখ আর গলার আওয়াজে নয়। বাঘও যেমন লালা-ঝরা উন্মুক্ত ওষ্ঠে বিস্ফারিত দাঁতের খিচুনিতে মত্ততা দেখাবে, তেমনি এদেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তেজস্বীতার আস্ফালন করে যেতে হবে। বাউলে এবং বাউলের দেখাদেখি সঙ্গীরাও হাত-পা ছুঁড়ে ও লাঠির আতালিপাতালি বাড়িতে সোরগোল তুলেছে।

এযাবৎ যতো কিছু আস্ফালন, জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু। প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে এগুতে দেখলে সমূহ বিপদ। তেড়ে এগিয়ে আসতে দেখলে মুহূর্ত অপেক্ষা করবে না এই জীব—ঝাঁপিয়ে পড়বে সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণকারীর ওপর।

আগেই বাউলে সাবধান করে রেখেছে—খবরদার! লাঠি যেন দৈবক্রমে বন্দুকের মত কাঁধে না ওঠে! শত শত বছরের অভিজ্ঞতায় সুন্দরবনের বাঘ বন্দুক ভয়ানক চেনে। যেমন বানর চেনে তীর-ধনুক। বন্দুকের কোনও ইঙ্গিত পেলে নরখাদক জীবন-মরণ সংগ্রামের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠবে।

ভয় পেলেও যেমন রক্ষা নেই, বাঘের সামনে বেপরোয়া হলেও তেমনি রক্ষা নেই। ভয় একবার ভাঙলে বেপরোয়া হতে মানুষের সময় লাগে না। বাউলে তার দলকে সংযত করে রেখেছে হাত আগলে।

দলের আস্ফালন চলে বেশ কিছুক্ষণ, প্রায় পনেরো মিনিট তো বটেই। বাঘ তবুও সমানে তাকিয়ে আছে। মাঝে একবার একইভাবে তাকিয়ে থেকে গজরাতে গজরাতে নড়ে-চড়ে ঠিক হয়ে বসেছে, যেন দরকার হলেই ঝাঁপ মেরে পড়তে পারে।

বাউলে এবার বীর পদক্ষেপে সদলে এগোয়। এগুলো বটে, কিন্তু বেশি না। মাত্র চার-পাঁচ কদম। বাউলে বাঘকে বোঝাতে চায়,—তোমার ভয়ে আমরা কম্পিত নই। শুধু কম্পিত নই না, এগিয়ে যাবারও সাহস রাখি। হ্যাঁ, শুধু সাহস আছে এইটুকুই দেখাতে হবে। সত্যি-সত্যি বেশি এগুলে রক্ষা নেই। বেশি এগুতে গেলে শক্তি-পরীক্ষায় পলকের অবকাশ দেবে না এই হিংস্রতম জীব।

সাহস আছে বলে যেমন বাউলে দেখাতে চায়, তেমনি বনবিবির এই দুর্ধর্ষ বাহনকে কতখানি সমীহও করে, তাও দেখাতে চায়। সমশক্তিশালী কিন্তু তোমাকে সমীহও করি। একই বনে সমশক্তি সম্পন্ন জীব, যেমন বাঘ ও গণ্ডার পরস্পরে যে ব্যবহার করে—এও যেন তেমনি!

এগুতে দেখেই বাঘ বাহু ও গায়ের লোম ফুলিয়ে গজরানি তীব্র করে তুললো। পেছনে বিক্ষিপ্ত লেজের ডগা দুলিয়ে যেন সাবধানবাণী উচ্চারণ করে—এগিয়েছো তো শেষ করবো। বাউলে সবাইকে হাত আগলে খুঁটি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আবার আগের মতো আস্ফালন কিছুক্ষণ চলে। দলের লোকের গলা ভেঙে এসেছে তবু বাউলে তাদের চিৎকার ও তড়পানি থামাতে দেবে না। দেবার অবস্থা নেই, সাহসও নেই।

একইভাবে বাউলে দ্বিতীয়বার এগিয়ে যায়। আগের মতোই চার-পাঁচ কদম মাত্র। বাঘেরও গর্জন চলেছে তখনও, তবে গর্জনের তীব্রতা এবার যেন বিশেষ বাড়ালো না। বাঘ এখনও আশি-নব্বই হাত দূরে।

মঙ্গলা বাউলে এবার চিৎকারে গালি দেবার মতো করেই সঙ্গীদের জানায়,—ভয় নেই; এবার নরমপানা!

নরমপানার কি দেখলো বাউলে তা সে-ই জানে। দীর্ঘ লাল-কালো রেখায় যেন একখণ্ড আগুন লক্‌-লক্‌ করছে ওদের সামনে। চক্‌চকে স্ফীত লোম-রেখার উপর দিয়েই বাহুযুগলের তেজ ও শক্তি যেন ফেটে পড়ছে। দেহের কম্পনে ও ভয়ঙ্কর কালো ভ্রূ-রেখায় টক্‌টক্‌ ওঠা-নামার সঙ্গে গোলগোল চোখের তীব্র চাহনিতে তেজ ও ক্রোধ ঠিক্‌রে পড়ছিলো। ভ্রূ-রেখার টক্‌টকানিতে এবার কোথাও একটু শীথিলতার আভাষ পেয়েই বোধহয় অমন অনুমান করে বসে বাউলে।

অনুমান সত্যই হলো যখন আরেক ধাপ এগিয়ে ওরা খুঁটি নিলো। বাঘ এই প্রথম তার চাহনি ফেরায়। ঘাড় বাঁকিয়ে অলসভরে এদিক-ওদিক কয়েকবার তাকালো। ওদের গালির ও তড়পানির কিন্তু কামাই নেই। বাঘ গোটা শরীরটা তুলে বাঁ-পাশে কয়েক কদম সরে যায়। আবার দাঁড়ালো। এপাশ-ওপাশ আরেকবার রাজকীয়ভাবে দেখে নিয়ে মাটির দিকে মুখ নিচু করে যেন ভীষণ এক প্রতিবাদ হুঙ্কার ছাড়ে। সে হুঙ্কারে সারাবন থরথর করে কেঁপে ওঠে।....বনের সে কাঁপুনি ও প্রতিধ্বনির ঝঙ্কার বিলীন হতে না হতে নরখাদকের প্রস্থান। রাজার মতো প্রস্থান একদম বনের আড়ালে। সত্যই কি প্রস্থান !!

তবু ওরা সারাক্ষণ মুখে চিৎকার রেখে লাসটা দু'খানা গামছায় বেঁধে ফেলে। আধ-খাওয়া লাস কোনও মতে জড়িয়ে নেয়। বাউলে তো বাঘের গতিপথ তাক্‌ করে তড়পিয়ে চলেছে। এবার ওদের ফিরে আসার পালা। মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে কেউ কি সহজে ছাড়ে !

বাদশাহের দরবারে যে-ভাবে সামনে মুখ রেখে কুর্নিশ করতে করতে পিছু হটতে হয়, মঙ্গলা বাউলে বুঝি তারই অনুকরণ করে বনের এই হিংস্রতম বাদশাহের কথা ভেবে। বাঘের গতিপথের দিকে মুখ করে ছন্নছাড়া গালি দিতে দিতে পিছন হেঁটে হেঁটে যেতে থাকে। সহজভাবে সরলপথে সটান যে ফিরে আসবে তার অবকাশ নেই। আদেশ দিলো,—তোরা লাস ঘাড়ে করে সামনে মুখ রেখে তোরাও পিছু হাঁট। গালির মতো করে কথাগুলো বললো। আরও সাবধানবাণী উচ্চাবণ করলো,—ও ঠিক পিছু নিয়েছে, পিছু নেবেই। তোরা নরমপানা হয়েছিস কি 'বাদাই ভালো' হয়ে যাবে। চেল্লা, চিল্লিয়ে যা !!

ডাঙ্গা ছেড়ে ডিঙিতে এসেও 'বাদাই ভালো' হওয়া থেকে, মৃত্যুর আক্রমণ থেকে নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। নোঙর তুলে সরে পড়বে—তাও বাউলে হতে দেবে না। তাতে তো কাপুরুষতার পরিচয় পাবে বনবিবির বাহন। ডিঙি নোঙর করেই থাকতে হলো সেখানেই সন্ধ্যা অবধি। তারপর ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরতে দিলো মঙ্গলা বাউলে।

এমনি ধারা ঘটনা সুন্দরবনে ঘটে অনবরতই। কার জয়, কার পরাজয়—কে বিচার করবে !! দল থেকে মানুষ মুখে তুলে নেওয়াও যেমন সত্য, তেমনি মুখ থেকে আধ-খাওয়া লাস কেড়ে আনাও সত্য।

সুন্দরবনে হঠকারিতা

'স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্‌, কামারের এক ঘা'—এই দাপটিকথা বাবার মুখেই শুনতো নিতাই তার কচি বয়সে। সে-সব দিনের অনেক কথাই নিতাই ভুলে গেছে কিন্তু 'কামারের এক ঘা' আজও ভোলেনি। শুধু ভোলেনি না, কথাটি তাকে পেয়ে বসেছে তার সর্বকর্মে।

কিশোর বয়সে নিতাই বাবাকে দাপটি করে বলতো,—অতো বুঝি না, সারাদিন ধরে ধানের আঁটি বইতে পারবো না। বলো, কত আঁটি আমার আনতে হবে ; তাই নিয়ে এলেই

হলো তো!

কথায় যেমন, কাজেও তেমনি। দিনভোর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবে কিন্তু হঠাৎ একবার এসে অন্যের চার ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় সেরে ফেলবে। যেমন ডবল-ডবল বোঝা ঘাড়ে তুলে নেবে, তেমনি ঘোড়ার মতো ছুটে দেখতে না দেখতে সে কাজ শেষ করবে।

'কামারের এক-ঘা' নিতাই ভুলবে কি করে। বাবার সঙ্গে হাটে যাবার বয়স হলে সে একবার হাড়োয়ার হাটে যায়। খুবই বড়ো হাট। সে-হাটের কী-ই বা মনে আছে তার। কিন্তু মনে আছে কামারের চালাটির কথা। হাপরের হাঁফুনিতে দমকে-দমকে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ছে তারাবাজির মতো। আর নেহাইয়ের ওপর লৌহপিণ্ডের রক্তাভ ছটা ছড়িয়ে পড়ছে যেন ফিন্‌কি দিয়ে। তারই সামনে ঘর্মাক্ত মানুষটির উত্তোলিত বলশালী দুই বাহু, আর ঈষৎ কুব্জ দেহের সর্বশক্তি মুষ্টিবদ্ধ হাতুড়ির মাথায় নিবদ্ধ। ভারী হাতুড়ির একঘায়ে লৌহপিণ্ড নিমেষে পিষ্ট হয় অতি সহজে। রক্তাভ আলোর ঝলকে উদ্ভাসিত সেই শক্তির প্রতীক বালকের মনে যেন চিরতরে খোদিত হয়ে রইলো।

নকুল যে নিতাইকে অমন ভালবাসবে আর মনে-মনে অমন শ্রদ্ধা করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিলো না। নকুল ছিলো ঢিলে-ঢালা গোছের। তার দেহে অমন শক্তিও ছিলো না, মনে অমন রোখও ছিলো না। নকুল নিতাইয়ের শুধু আত্মীয় নয়, বন্ধুও বটে। পাশাপাশি সংসারে দু'জনে লালিত। নিতাইও নকুলকে ছাড়া এক পা-ও চলতো না ; নকুল যে তার প্রতি-কাজের একজন বড়ো সমঝদার।

নিতাই ও নকুল দুই বন্ধুই এখন বড়ো হয়ে উঠেছে, বলতে গেলে যৌবনের কোঠায়। আবাদ অঞ্চলে যৌবনের পরীক্ষা কিন্তু বাদায়। সুন্দরবন যেন যৌবনকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি না দাঁড়ালে যৌবনের কোনও মর্যাদা নেই বনাঞ্চলে।

অনেকদিন ধরে ওরা বনে যাবো-যাবো করছে ; কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। অভিজ্ঞ কাঠুরিয়ারা হঠকারী যুবকদের সহসা সঙ্গে নিতে চায় না। অদ্ভুত এই বন, এখানে যেমন ভিতু মানুষের স্থান নেই, তেমনি হঠকারী ও একবোখা মানুষেরও এখানে নিস্তার পাওয়া দায়। এখানকার বনের রাজা দর্দান্ত সাহসী, কিন্তু ঝোঁকের মাথায় কখনও সে কিছু করে বসে না। ধীর স্থির,—হঠকারী নয়। যখন সে আক্রমণ করবে, ধীর স্থির ভাবে সব কিছু বুঝে নিয়ে আক্রমণ করবে—হঠাৎ দেখা হলে, হঠাৎ আক্রমণ সে করে না। তেমনি তার রাজ্যে যে দাপটি করতে আসবে, তাকেও সমভাবে সাহসী ও ধীর স্থির হতে হবে, নইলে নিস্তাব নেই।

শেষ পর্যন্ত বনে উঠবার এক সুযোগ আসে। ফাল্গুন মাসের হাল্কা দিনগুলিতে কিছু বাড়ন্ত আয়ের আশায় এক দল কাঠ কাটতে যাবে। দলের অনেকেই নিতাইকে জানে ও চেনে। হাড়োয়া-হাটের নৌকোয় এখন নিতাই ও নকুল এদের সঙ্গী।

বনে যাবার কথা উঠতেই নিতাইয়ের উৎসাহের সীমা নেই,—'চলো না মামু, এবার আমাকে নিয়ে চলো।'

মামাবাড়ির গ্রামের লোক বলে নিতাই রসিদ গাইনকে 'মামু' বলেই সম্বোধন করে। বাঙলাদেশের মানুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনাত্মীয়কে অতি সহজে আত্মীয় বানিয়ে ফেলে আত্মীয়তার সম্বোধন করে। সুন্দরবনেও তার ব্যতিক্রম নেই।

রসিদ গাইন মাঝারি বয়সের লোক। সবল দেহে আর প্রশান্ত মুখমণ্ডলের আধাপাকা দাড়িতে তাকে বেশ মানায়। দলের নেতা বলেই সহসা সকলে তাকে মেনে নেয়। ধীর স্থির ভাবে কথাগুলি চিবিয়ে চিবিয়ে বললো; "আমাদের নাওখানাও বেশ একটু বড়ো হয়ে

[illegible]...ভাবছিলাম; জনে একটু ভারী হলে ভালই হতো....তাড়াতাড়ি লাও ভরাট করা যেতো...দু'জনে যাচ্ছি, আরেকজন হলে মন্দ হতো না।"

পাশেই নকুল ছিলো। এমনিতে ঢিলে-ঢালা হলে কি হবে, কোথায় কখন কি ঘটতে চলেছে তা চট্ করে ধরে ফেলে। রসিদমামুর কথা শেষ না-হতেই নিতাইকে নকুল আড়ালে চিম্‌টি কাটলো।

ইঙ্গিত পেতেই নিতাই খানিকটা আব্দারের সুরে বললো, 'দ্যাখো মামু, আমি তো যেতেই চাই ; ভারি মজা হবে। কিন্তু একটা কথা কী, তোমরা সবাই হলে কি না আমাদের গুরুজন....তাই বলি কী....নকুলকে সঙ্গে নিয়ে চলো....তা অমন দেখতে হলে হবে কি, কাজে কিন্তু নকুল ভারি পটু....আমরা হলাম কি না দু'জনেই সমবয়সী।'

—'তা তুই ঠিক বলেছিস....কিন্তু কথা হলো কী, আবার একজন মন্ত্রপড়া বাউলেও তো নিতে হবে! অতো লোক লাওয়ের খুপরিতে ধরবে তো?'

—"তা মামু, অতোশতো দরকার নেই। বাউলে তোমার নিতে হবে না। আমিই তোমার বাউলের কাজ করে দেবো। বনবিবিকে পুজো দিয়ে 'মা' বলে ডাকলেই মা সাড়া না দিয়ে যাবে কোথায়! দেখো তুমি!"

কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে যায়। সবাই মিলে মাসখানেকের মতো খোরাকি আর মিঠে পানি নিয়ে বনকর অপিসে নৌকো নিয়ে যায়।' কাঠ কাটার পাশ নিতে হবে।এমনি ধারা দু-দশখানা নৌকো এ-সময়ে রোজই বনকর অপিসে আসে। আর তখনই তারা দল বেঁধে নৌকোর বহর বানিয়ে বনের ভিতর প্রবেশ করে।

চামটার বন। এবার এখানেই 'ঘের' পড়েছে। 'ঘের' ছাড়া অন্য কোথাও কাঠ কাটা সুন্দরবনে বে-আইনী। বন যাতে উজাড় না হয়ে যায়, তার জন্যই এমনি ধারা আইন।

চামটার বন আসতেই নিতাই বহর থামিয়ে সবার আগে মাটিতে পা দিলো। সবাইকে হাত উঁচু করে চিৎকার করে বললো,—'এবার মায়ের পুজো হবে! তোমরা সবাই নেমে এসো।'

বনকর অপিস থেকেই নিতাই একজন কেউ-কেটা হয়ে উঠেছে। আমোদে-ফুর্তিতে, হাসি ঠাট্টায় নতুন নতুন ফন্দি-ফিকিরে সবারই মন জয় করে ফেলেছে।

সঙ্গে ছিলো নকুল। তার হাতে গামছায় বাঁধা একটি মোরগ। আর নিতাই এনেছে একটি ছোটো কাঁচামাটির মূর্তি। অনেকে এসে জড়ো হলে মূর্তিটি মাটিতে রেখে নিতাই বলে ওঠে, 'ব-ন-বি-বি-র পুজো! মা! মা! মা!'

এমন জোরে 'মা' ডেকে উঠলো যে গোটা চামটা বনের মুখটা বুঝি গম্-গম্ করে ওঠে। সবাইকে এবার 'মা' বলে একত্রে ডাকিয়ে মোরগটা জবাই করলো। মোরগটা বেশ বড়ই ছিলো। তা হলেও অতো লোকের ভাগে কী-ই বা পড়বে। সেদিকে বিশেষ কারও মনও ছিলো না। নিতাই যে একটা কাজের কাজ করেছে তাতেই সবাই খুশী।

ঝাড়-বাছাই করে কাজকর্ম শুরু হয়েছে। কাঠও বোঝাই হচ্ছে নৌকোয়-নৌকোয়। নকুলও সাধ্যমতো কাজ করে চলেছে। যতটা পারে সে নিতাইয়ের কাছে-কাছে থাকে। কথা নেই মুখে, কাজ করে চলে চুপচাপ। তবু নিতাই তাকে কথা বলিয়ে আর উদ্ভট সব প্রশ্ন করে মুখর করে রাখতে চায়। একদিন রসিদমামু কয়েকজনকে একপাশে ডেকে বলে, 'দেখো, আমার মন কিন্তু ভালো বলছে না। তোমরা দেখেছো নকুলকে? দেখছো না! শুঁড়িতে একটা করে কোপ্ মারে আর এদিক-ওদিক তাকায়। গুঁড়ির ফাঁকে-ফাঁকে উঁকি মেরে দ্যাখে কিছু আছে কি না! আমার মন কিন্তু ভালো বলছে না।'

তখন বেলা দুটো। একটু পরেই বনে অন্ধকার নেমে আসবে। দিনের কাজও শেষ হয়ে যাবে। বাদায় আবাদের অনেক আগেই দিনের আলো নিস্তেজ হয়ে আসে।

রসিদমামু কাজ শেষ হবার অপেক্ষা না করে নকুলকে সঙ্গে নিয়ে আগেভাগেই নৌকোয় চলে গেলো। নকুল অবশ্য প্রথমে যেতে চায়নি, বিশেষ করে নিতাইকে ফেলে রেখে। তা হলেও এটা-সেটা অজুহাত দিয়ে মামু প্রায় হাত ধরেই টেনে নিয়ে গেলো।

সেদিন মাঝ-রাতে নকুল সহসা ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে ওঠে, 'একটু সামলে নাও, সামলে নাও।'

চিৎকারে নিতাই হুড়মুড় করে উঠে নকুলকে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ মামু চাপা গলায় সাবধান করে, 'খবরদার! কেউ ওকে খোয়াবের কথা জিজ্ঞেস করবি না। ভরসা দিবি, আর কিছু বলবি না।'

নকুল ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠলেও বন্ধুর হাসি ও ভরসার কথা শুনে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সবাই মিলে নাস্তা খাবার পর রসিদমামু বুঝিয়ে বললো,—'দ্যাখ্ নকুল, তোর ব্যামো হয়েছে। তুই ক'দিন মালে উঠিস্ না। শেষে ব্যামো বাড়াবাড়ি হলে তো বাদায় ঝাড়ফুক দেবার মতো ফকির পাওয়া যাবে না।'

নকুলের বেজার মুখ দেখে মামু মিষ্টি করে আশ্বাস দেয়,—'কতক্ষণ আর! পহর-টেক খুপরির মধ্যে ছাপরা বেঁধে শুয়ে থাকবি ; আমরা তো কাছেই থাকবো। আর দুপুর হলেই তো কেউ না কেউ গুঁড়ি এনে ফেলতে থাকবে এ-নৌকোয় না হয় ও-নৌকোয়।'

হাজার হোক, নকুলের মন যুবকের মন। ক'দিন আর এমনভাবে নৌকোর খুপরিতে বন্দী হয়ে থাকা যায়। প্রথম দিন নিজেকে অসুস্থ মনে করে ঘুমুবার চেষ্টা করেছিলো ; ঘুমিয়েও পড়েছিলো। কিন্তু দ্বিতীয় দিন আঁকুপাকু করতে থাকে।

খুপরিতে বন্দী হয়ে যতো সব আজে-বাজে ভয়-ভীতির কথা মনে হতে থাকে। কোথাও একটু শব্দ হলেই সচকিত হয়ে ওঠে। একটা পাখি ডাকলেও কী পাখি তা দেখবার উপায় নেই নৌকোর খুপরি থেকে

তার উপর বিকেলে সবাই বন থেকে উঠে এলে যখন কাঠ কাটা নিয়ে হাসি-ঠাট্টার গল্প করতে থাকে, তখন নকুলের টেকাই দায় হয়।

পরদিন সাত-সকালে ঘুম থেকে উঠে নকুল সোজা জানিয়ে দেয়,—না, সে আজ বনে উঠবেই, ব্যামো-ট্যামো তার সেরে গেছে।

অতো আগ্রহ দেখে কেউ আর বাদ সাধেনি।

বনে কিছুক্ষণ কাজ করার পর নকুলের বড় জল তেষ্টা পেয়েছে। সে-কথা জানতে পেয়ে মামু বললো,—'না, তাই বলে একা-একা এখন নৌকোয় যাবি না, পরে ব্যবস্থা হবে।'

সবাই পাল্লা দিয়ে গুঁড়ি কাটছে। কারুরই আর সময় হয় না দেখে নকুল সবার অজানিতে কুড়ুলখানা কাঁধে ফেলে একা-একাই চলে যায় জলের তেষ্টা মেটাতে। যেতে আসতে ওর বেশি সময় লাগে না। দু'পাশে গোলঝাড়, মাঝে আগাছা কেটে 'সড়' বানানই আছে আগে থাকতে। শুধু নিজে জল খায়নি, অন্যদের জন্য এক ভাঁড় নিয়ে আসছে দেখতে পেয়ে মামু তো অবাক—'তোকে বারণ করলাম, শুনলি না! অমন সাহস দেখাতে যাস্ না! নতুন এসেছিস্, অমন হঠকারিতা করিস্ না!'

নকুল মিচ্‌কি হেসে তেষ্টার জল মামুর দিকে এগিয়ে ধরে।

ছিটকে পড়লো তেষ্টার জল। যেন বজ্রপাতের বিদ্যুৎ। মেঘ গর্জনে গোলগাছের

উর্ধ্বমুখী পাতাগুলি বিদীর্ণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সুন্দরবনের হিংস্রতম জানোয়ার। মুহূর্ত-মধ্যে নকুলকে ধরাশায়ী করে মুখে তুলে উধাও।

মামু যেমন দাঁড়িয়েছিলো, তেমনি ভাবেই হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশের সবাই মামুর 'কোলে' এসেছে। নিতাই কিছুটা দূরে ছিলো। ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হয়নি তারও। ছুটে এসেছে উর্ধ্বে উত্থিত দু-বাহুতে কুড়ুল ধরে। সে-যে নিজেই এ-দলের বাউলে বনেছে, রুখে দাঁড়াতে হবে সকল বিপদের সামনে। 'কী হলো! কী হলো!'—চিৎকার করে যেন হরিণের মতো ছুটে এসেছে।

নিতাইয়ের কোন-কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। গোলঝাড় ভেদ করে যেন তীরের মতো ঝাড়ের ওপারে হাজির। দু-হাতে বাগানো কুড়ুল তখনও উদ্যত। শত্রুকে সামনে পেলে গুঁড়িয়ে দেবে যেন কামারের এক ঘায়ে। না, কিছুই দেখতে পায় না। বজ্রপাতের কোন চিহ্নই যেন নেই। দাঁড়িয়ে পড়ে। কী করবে? কোন্‌দিকে যাবে? দূর থেকে মামুর ডাক, 'নিতাই এগুবি না, দাঁড়া আসছি!'

ভীতি-বিহ্বল মানুষগুলির দিকে একবার তাকিয়ে মামু বললো, 'চল্ তোরা, নিতাইয়ের কাছে চল্!'

ওদের কাছে পেতেই নিতাই গর্জে ওঠে, 'চলো, নকুলকে বাঁচাতে হবেই! বাঁচাতে হবেই!'

নিতাইয়ের রোখ্ ঠেকানো দায় দেখে মামু ধমক দেয়, 'দাঁড়া, যাই বললেই বড়মেঞার মুখে যাওয়া যায় না! দাঁড়া, সবাই মিলে ডাল কাট্, বড় বড় লাঠি বানা।'

লাঠি বানানো হলে মামু একখানা শুকনো ডালের মাথায় গামছা বেঁধে মশাল জ্বালিয়ে দিলো। এবার সে নিজেও ব্যস্ত—'চল্ তোরা, নোড়াবি না, চেল্লা। একনাগাড়ে চেল্লা, গালি দে—মার্, মার্!!'

নিতাই কিন্তু লাঠির ধার ধারেনি। উদ্যত কুড়ুল তুলে সবার আগে আগে চললো। মুখে গালি।

থাবার খোঁচ দেখে দেখে ওরা এক ঝোপে এসে গেছে। মামু ঝোপের মধ্যে উঁকি মেরে দেখতে চায়—নরখাদক আছে কি নেই। নিতাই ততক্ষণে ঝোপের ফাঁকা চত্বরে প্রবেশ করেছে।

প্রবেশ করেই ভীষণ চিৎকারে আপ্রাণ ডাক দেয়,'নকুল! নকুল!' অর্ধভুক্ত লাশ কিই বা সাড়া দেবে। নিতাই দেহের সর্বশক্তি দিয়ে হাতের উদ্যত কুড়ুল বসিয়ে দিলো মাটিতে। বনের সিক্ত মাটিতে ফলক বসে গেলো হাতল অবধি। মুহূর্তের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর কোমর থেকে একটানে গামছা খুলে অতি দ্রুত হাতে রক্তাক্ত অর্ধভুক্ত লাশ বেঁধে ফেললো।

মামু কিন্তু চিন্তান্বিত। ধারে কাছে বাঘ না থেকে পারেই না। মুখে শুধু বলে,—'চেল্লা, তোরা চেল্লা।'

হাতের মশালে গামছা পুড়ে ছাই। পোড়া ডাল থেকে ধিক্‌ধিক্ করে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। দ্রুত আরও কিছু ডালপালা মশালে বেঁধে নিলো।

নিতাই কারও মতামতের অপেক্ষা না রেখে একাই ঝমাৎ করে লাশ কাঁধে তুলে আদেশের সুরে বললো,—'জলদি'! বলেই জোর কদমে ঝোপের বাইরে এসে গেলো।

জলদি ওরা ফিরবেই তো, কিন্তু মামুর চিন্তা,—বাঘ ধারেকাছে না-থেকেই যায় না, নিশ্চয় ওত পেতে আছে কোথাও; মুখের খাবার কেউ কেড়ে নিতে দেয়! রাগত ভাবেই চিৎকার

দিলো,—'দাঁড়া নিতাই ! দাঁড়া....চল্ তোরা, জড়ো হয়ে চল্, আস্তে আস্তে....নোড়াবি না !! নোড়াবি তো মরবি !....চিল্লানো থামালেই গেছিস !!'

নৌকোর ধারে ফিরে আসতেই মামুর আরেক ভাবনা,—এবার কি করা ? লাশ পোড়াবে, না মাটি দেবে ? সুন্দরবনে যে জীবন দেয়, তার দেহও সুন্দরবনে রেখে যাওয়াই কড়া রীতি।

কিন্তু নিতাইয়ের মতলব নিতাইয়ের কাছে। এখনও তার মাথায় রোখ্ চেপে আছে। সোজা ছোট্ট ডিঙিটার গলুইতে লাশ তুলে বোঠে হাতে বসে গেছে। সবাই তো অবাক !

নিতাইয়ের রুদ্ধ কণ্ঠ এবার ফেটে পড়ে,—'নকুলকে নিয়ে যাবই....নকুলের মা-কে কাঁদতে দিতে হবে....কাঁদতে দিতে হবে।

প্রাণপণ জোরে বোঠের খোঁচায় ডিঙি ছুটে চলে। ও একাই নিয়ে যাবে। এক জোয়ারের পথ ও বুঝি একাই নিমেষে ঠেলে নিয়ে যাবে।

সবাই চুপচাপ ; মামু কোনও পথ না-পেয়ে একবার শুধু চিৎকারে টেনে টেনে বললো,—'পেছন নেবে শালা, সাবধানে যাস্, তুরন বড় গাঙে পড়বি ! পেছন নেবেই শালা !'

মামু মিথ্যা বলেনি। কিছুদূর এগুতেই দ্যাখে একপাল হরিণ এপার থেকে সাঁতরে পার হয়ে গেলো। বাঘের গন্ধ না পেলে অমন করে হন্তদন্ত হয়ে ওরা পালাতো না। ইঙ্গিত পেয়ে নিতাইও মাঝ-নদী ছেড়ে ওপারের কূল ঘেঁষে সাঁই-সাঁই করে চললো।

রোখের মাথায় নিতাইয়ের বড় গাঙে পড়তে দেরি হয়নি ; কিন্তু হাঁপাচ্ছে, দম ফুরিয়ে গেছে। বড়গাঙে জোয়ারের স্রোতের শিরায় ডিঙি ভাসিয়ে এবার দম নিতে চায়। দম নেবে কী ! রুদ্ধ অশ্রু বাধা মানে না। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। মা-কে কাঁদতে দেবে কী, নিতাই নিজেই কেঁদে আকুল।

এক যে ছিল সুন্দরবন

'বিরাট বন। গাছ আর ঝোপের শেষ নেই। সে বনে না আছে এমন জীব নেই। এরা কেউ কারো কথা শোনে না, যে যাকে পারে মেরে খায়।

এ-গাছে, সে-গাছে কতো যে মৌচাক তার ইয়ত্তা নেই। চাকের ধারে যেতে কেউ সাহস করে না। তা হলে কী হবে। সকালে মৌমাছিদের মধু আনতে বেরুতেই হয়। তখন ওদের ফুলে ফুলে একা-একা ঘুরে বেড়াতে হয়। পাখির দল তখন একা পেয়ে ধরে ধরে খেয়ে ফেলে।

একদিন হলো কী ! মৌমাছিরা সব দল বেঁধে পাখিদের কাছে হাজির। পাখিরা তো ডানা মেলে উড়ে খেতে বেরিয়েছে। এমন সময়ে দ্যাখে—মৌমাছিরা সব দল বেঁধে আসছে। মৌমাছিতে আকাশ প্রায় কালো। অতো মৌমাছি দেখে পাখিরা তো ভয়ই পেলো।

মৌমাছিরা এসে বললো,—'গুন-গুন-গুন, শুনছো পাখির দল ? তোমরা কি আমাদের ফুলে ফুলে মধু আনতে দেবে না ? এসো না, আমরা মিলে মিশে থাকি এই বনে। তোমরাও কিছু বলবে না আমাদের, আমরাও কিছু বলবো না তোমাদের।'

পাখির দল কিচির-মিচির করে বললো,—'কু-কু-কু, কা-কা-কা, তা বেশ। কিন্তু আমাদের বাচ্চাকে যে সাপের দল এসে খেয়ে যায়। তাদের কে ঠেকাবে ?'

মৌমাছিরা বললো,—'বেশ। বেশ'। চলো, আমরা সবাই মিলে একবার সাপের কাছে

যাই।'

তারপরই মৌমাছি আর পাখিরা গেলো সাপের গর্তের মুখে মুখে। মৌমাছি আর পাখির ডাক শুনে গর্তের ভিতর থেকে সাপেরা মুখ বাড়ালো। লম্বা লম্বা চেরা জিভ বের করে ফণা তুলে বললো,—'কারা তোমরা?'

—'আমরা এই বনের মৌমাছি আর পাখি।'

—'কেন তোমরা দল বেঁধে এসেছো?'

—'দেখো, এই বনে আমরাও থাকি, তোমরাও থাকো। এসো না! আমরা সবাই মিলে একসাথে শান্তিতে বাস করি।'

সাপের দল কাটা-কাটা জিভ বের করে বললো,—'তা বেশ! কিন্তু আমাদের ধরে ধরে যে বুনো মুরগির দল খেয়ে ফেলে। তাদের রুখবে কে!'

তখন মৌমাছি আর পাখিরা সব একসঙ্গে বলে ওঠে,—'চলো না, আমরা সবাই মিলে বুনো মুরগির কাছে যাই।'

মৌমাছি, পাখি, আর সাপ,—এবার সবাই মিলে বুনো মুরগির কাছে হাজির। সাপের দল ছিলো সামনে। সাপ দেখে তো মুরগির দল পাখনা ফুলিয়ে তেড়ে এলো।

সাপেরা তো জোরে কথা বলতে পারে না। তাই মৌমাছিরা ভন্-ভন্ করে আর পাখিরা কিচির-মিচির করে বললো,—'দেখো, আমরা সবাই এই বনে থাকি। কেন আমরা একে অন্যকে মারি। এসো না, আমরা মিলে-মিশে থাকি!'

বুনো মুরগি বললো,—'কক্-কক্-কক্, ভালো কথা। আমরা রাজি আছি। কিন্তু শেয়াল এসে যে আমাদের খেয়ে ফেলে!'

মৌমাছি, পাখি, সাপ,—সবাই তখন একসঙ্গে বলে,—'তা তো ঠিক কথাই বলেছো। চলো না, আমরা সবাই শেয়ালমামার কাছে যাই!'

এবার ওরা সবাই মিলে চললো শেয়ালের কাছে।

শেয়াল ভারী ধূর্ত। ওদের দেখতে পেয়েই এক শেয়াল ডেকে উঠলো,—'হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া'। আর অমনি আশেপাশে সব শেয়ালই ডেকে ওঠে,—'হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া'।

ডাক শুনে মৌমাছি, পাখি, সাপ, বুনো মুরগি—সবাই মিলে দাঁড়িয়ে পড়ে। ডেকে বললো,—'ভয় নেই মামা, আমরা এসেছি একটা কথা বলতে।'

—'বলো, তোমাদের মতলবখানা কী?'

সবাই তখন চিৎকার করে জানায়—'দেখো, আমরা সবাই থাকি একই বনে। কেন আমরা ঝগড়া বিবাদ করি। এসো না, আমরা মিলে-ঝুলে একসাথে থাকি!'

শেয়ালের দল বললো,—'তা বেশ, তা বেশ, আমরা নিশ্চয় অমত করবো না। কিন্তু বুনো শুয়োর কি এমন কথায় রাজি হবে? তারা যে আমাদের দেখতে পেলেই বাঁকা দাঁত দিয়ে ফাল্-ফাল্ করে দেয়।'

তখন সবাই বললো,—'তোমরা ঠিকই বলেছো, মামা। আচ্ছা, চলো না, আমরা এবার দল বেঁধে বুনো শুয়োরের কাছে হাজির হই!'

তারপর মৌমাছি, পাখি, সাপ, বুনো-মুরগি, শেয়াল—সবাই একত্রে এলো বুনো শুয়োরের কাছে। ওদের দেখতে পেয়েই বুনো শুয়োরের দল তো ক্ষেপে ধবধবে বাঁকা দাঁত উঁচিয়ে গৎ-গৎ করে তেড়ে এলো।

কিন্তু কাকে ফাল্-ফাল্ করবে? কাকে মারবে? ওরা এসেছে আজ দলে-দলে। সবাই বললো,—'শুয়োর-দাদু! দেখো, আমরা সকলে মিলে এসেছি। তুমি অমন গৎ-গৎ করো

না। আমরা সবাই এই বনেরই বাসিন্দা। এসো না! আমরা সবাই মিলে বন্ধুর মতো থাকি। কেউ কাউকে কিছু বলবো না।'

শুয়োর-দাদু বলে,—'তোমাদের কথার কি মূল্য? বাঘ কি আমাদের ছেড়ে কথা কইবে? দেখলেই তাড়া করে আসবে। আর খাবলে-খাবলে আমাদের পেছনের মাংস খাবে। তখন তাকে ঠেকাতে তোমরা কেউ কি থাকবে?'

শুয়োর-দাদুর কথায় সবাই প্রতিবাদ করে উঠলো। বললো,—'না-না-না, তা হবে না। চলো, আমরা দল বেঁধে বাঘের কাছে যাই। রাজি!'

শুয়োর-দাদু অতোজনের ভীড়ের সামনে বেগতিক দেখে বললো,—'বেশ! তোমরা সবাই গেলে, আমরাও যাবো।'

মৌমাছি, পাখি, সাপ, বুনো-মুরগি, শেয়াল, বুনো-শুয়োর,—সবাই মিলে এবার চললো বাঘের কাছে। বনে শোরগোল পড়ে গেছে। হৈ-হৈ করতে করতে ওরা হাজির বাঘের আড্ডায়।

বাঘ তখন বন কাঁপিয়ে হাঁক দিচ্ছে—'হালুম, হালুম'! হাঁক শুনে ওরা প্রথমে থমকে যায়। তারপর আবার চললো। গুটি-গুটি এগিয়ে দূর থেকে বাঘকে ডেকে বলে,—'বিড়াল-পিসী! বিড়াল-পিসী! আমরা সবাই এসেছি তোমার দরবারে।'

বাঘ হাঁক দিয়ে উঠলো,—'হালুম! খবরদার, এগুলেই আক্রমণ করবো!'

—'না, না, না! আমরা তোমার কাছে উপদেশ নিতে এসেছি। আমাদের কথা আগে শোনো, তারপর যা হয় করো।'

—'হালুম! বেশ, কী কথা তোমাদের?'

—'দেখো, তোমারও এই বনে না থেকে উপায় নেই, আমাদেরও থাকতে হবে। তাই আমরা মিলেমিশে থাকলে সুখেই থাকবে। এসো না, আমরা এই বনে সবাই শান্তিতে বসবাস করি।'

—'হালুম! ইশ্, মিলেমিশে থাকবে। শিকারিরা তো আমাকে মারতেই আসবে। তোমরা তখন কে কোথায় ভয়ে পালাবে, তার ঠিক নেই! আসবে তখন তোমরা আমাকে বাঁচাতে?'

—'না, বিড়াল-পিসী! এই বন আমাদের সবার। এই বনে আমরা কাউকে ঢুকতে দেবো না। এসো, আমরা সবাই শান্তিতে বাস করি।'

বাঘ তো চিন্তায় পড়লো। ওদের কথায় বিশ্বাস করতে চায় না। বললো,—'বেশ! কাল নিশ্চয় শিকারি কেউ না কেউ আসবে। দেখি, তোমরা তখন কি করো। যদি এসে ঠেকাও, নিশ্চয় মিলেমিশে থাকবো।'

পরদিন। সবাই এসে হাজির। মৌমাছি, পাখি, সাপ, বুনো মুরগি, শেয়াল, বুনো-শুয়োর, বাঘ,—সবাই জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে বনে ঢুকবার পথে। শিকারি এলে এই পথেই আসবে।

মৌমাছির রাগ শিকারির উপর। সে এসে মধুর চাক ভেঙে নিয়ে যায়।

পাখির রাগ শিকারির উপর। সে এসে ওদের ধরে নিয়ে খাঁচায় পুরে রাখে।

সাপের রাগ শিকারির উপর। সে এসে ওদের হাঁড়িতে পুরে ধরে নিয়ে যায়। সাপুড়ের হাতে দেবার জন্য।

বুনো-মুরগির রাগ শিকারির উপর। ওদের পেলেই সে ধরে নিয়ে যায় খাবার জন্য।

শেয়ালের রাগ শিকারির উপর। শিকারির একটা কুকুর আছে; তাকে সে লেলিয়ে দেয় ওদের পেছনে।

শুয়োরের রাগ শিকারির উপর। সে ওদের দেখলেই মারবে। ওদের নরম মাংসের উপর শিকারিদের বড্ড লোভ। আর ওদের ধবধবে দীর্ঘ বাঁকা দাঁত পেলে তো কথাই নেই।

আর বাঘ! বাঘের রাগের তো অবধি নেই। বাঘ মারতেই শিকারি আসে বনে।

এমন সময়ে শিকারি বনে এলো। শিকারি আর আসবে কি! বনে ঢুকতেই সবাই,—মৌমাছি, পাখি, সাপ, বুনো-মুরগি, শেয়াল, বুনো-শুয়োর, বাঘ,—সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো শিকারির ওপর।

মৌমাছির ঝাঁক হুল বেঁধাতে লাগলো শিকারির নাকে, মুখে, চোখে। পাখি উড়ে উড়ে ছোঁ মেরে ঠোকরাতে লাগলো তার মাথায়। সাপ ছোবল মারবার জন্য ফণা তুলে ধরেছে। বুনো-মুরগি তো জামার নিচে ঢুকে পিঠ আঁচড়াতে লাগে। শেয়াল কাপড় কামড়ে ধরে টেনে ছিড়ে ফেলবে আর-কি! শুয়োর গৎ-গৎ করে পায়ের গোছা দাঁতে ফাল্-ফাল্ করে দেয় আর কি। বাঘ তো থাবা মেরে শিকারির ঘাড় ভেঙে ফেলবার জন্য দু-পায়ের উপর ভর করেছে।

শিকারি তো অস্থির। ভয়েই আধখানা। দৌড়ে পালিয়ে এ-যাত্রা প্রাণে বাঁচলো।

এরপর আর কোনও শিকারি এই বনে আসতে চায়নি। আসবেই বা কোন্ সাহসে!

এবার বনের সকলে মিলেমিশে বাস করতে থাকে। বনে শান্তি নেমে আসে। শুধু তাই নয়! সে-বনের অধিবাসীদের কেউ আর বন্য বলে না।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র
স্কেল
কিলোমিটার
২
০
৫
প্রদেশ সীমানা
ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকা
ব্লক সীমানা
ঘের সীমানা
পাখীরালয়
প্রিমিটিভ' বা উঠতি বন
কোর বা মধ্যমণি
প্রকল্পের বাকি অঞ্চল
বাফার' বা সীমান্ত রক্ষক অঞ্চল
উত্তর
হরিণভাঙ্গা নদী
চাঁদখালি
চামটা
ছোট চামটা খাল
বড় চামটা খাল
গোসাবা নদী
বড়দোয়ানিয়া খাল
চাঁদখালি খাল

কল্পের মানচিত্র
উত্তর
বাঘমারা
বকুলতলা খাল
বাঁকা খাল
মাছুয়া খাল
গোনা নদী
ভাঙাদুনি দ্বীপ
গোনা
বাজারপথ খাল
বঙ্গোপসাগর